# উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত





মাঘ ১৩৯৩

৮৯ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়

কলিকাতা

# উদ্বোধন

৮৯তম বর্ষ

( মাঘ, ১৩৯৩ হইতে পৌষ, ১৩৯৪ ; ইংরেজী : ১৯৮৭ )

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী নির্জরানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী প্রমেয়ানন্দ ( আশ্বিন, ১৩৯৪ পর্যন্ত )
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ( কার্তিক, ১৩৯৪ হইতে )






উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

বার্ষিক মূল্য ২৫·০০ টাকা

প্রতিসংখ্যা ২·৫০ টাকা

# উদ্বোধন—বর্ষসূচী

## ৮৯তম বর্ষ

### ( মাঘ, ১৩৯৩ হইতে পৌষ, ১৩৯৪ )



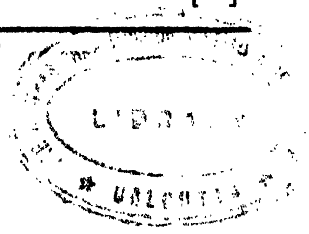




## চিত্রসূচী



৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।




# উদ্বোধন : মাঘ ১৩৯৩

## সূচীপত্র

# উদ্বোধন

৮৯তম বর্ষ, ১৩৯৩-৯৪

( মাঘ, ১৩৯৩ হতে )

## 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি আবেদন

● যাঁরা এখনও 'উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের ( ৮৯ তম বর্ষ ) বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা ২৫.০০ টাকা জমা দেননি, অবিলম্বে আপনার নাম ও গ্রাহক নম্বরসহ ২৫.০০ টাকা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

● কার্যালয়ে নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া চলে।

● অনুগ্রহ করে "Udbodhan Office" এই নামে মনিঅর্ডার/ব্যাঙ্ক-ড্রাফ/পোস্ট্যাল অর্ডার/যোগে পাঠাবেন। চেক্ পাঠাবেন না।

● বার্ষিক সডাক চাঁদার হারঃ

ভারতের সর্বত্র ২৫.০০ টাকা, বাংলাদেশ ৪৩.০০ টাকা

বিদেশের অন্যত্র { ৮৮.০০ টাকা [ সমুদ্রের ডাক ]
২৩৩.০০ টাকা [ বিমান ডাক ] }

● এককালীন ৪০০.০০ ( চারশত ) টাকা, অথবা কমপক্ষে প্রথম কিস্তিতে ৪০.০০ টাকা দিয়ে, পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে বাকী টাকা জমা দিয়ে আজীবন-গ্রাহক ( ৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ সাপেক্ষ ) হওয়া যায়।

● কার্যালয়ের সময়ঃ

সকাল ৯.৩০ থেকে বিকাল ৫.৩০

শনিবার সকাল ৯.৩০ থেকে দুপুর ১-৩০

রবিবার বন্ধ।

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৩



৮১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৯৩

# দিব্য বাণী

আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি—এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশায় চেয়ে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিস আশা করছে। নির্বোধ মিশনারীরা, ম—ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পারবে না। তোমাদের কি মন মুখ এক হয়েছে? তোমরা কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তুচ্ছ ক'রে নিঃস্বার্থভাবে থাকতে পারো? তোমাদের হৃদয়ে প্রেম আছে তো? যদি এইগুলি তোমাদের থাকে, তবে তোমাদের কোন কিছুকে—এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করবার দরকার নেই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ। সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উৎসুক নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেবল ভারতেই সে জ্ঞানালোক আছে—ইন্দ্রজাল, মূক অভিনয় বা বুজরুকিতে নয়, আছে প্রকৃত ধর্মের মর্মকথায়, উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমময় উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখদুর্বিপাকের মধ্য দিয়েও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন সময় হয়েছে। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' ডাকে ভয় পেও না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেও না—খাড়া হয়ে ওঠ, ওঠ, কাজ কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃ: ৪১৭-১৮ ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন' ৮৯তম বর্ষে পদার্পণ করিল। স্বামীজী পরিকল্পিত এই পত্রিকাখানি এই যুগের নূতন বাণী প্রচারের যন্ত্ররূপে বাংলা ১৩০৫-র ১ মাঘ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুআরি) প্রথমে পাক্ষিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া এবং দশম বর্ষ হইতে উহা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'য় স্বামীজী 'উদ্বোধনে'র আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জন্মলগ্ন হইতেই 'উদ্বোধন' স্বামীজী-নির্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ৮৯তম বর্ষের শুভ সূচনায় 'উদ্বোধনের' পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণকে জানাই আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা, আর 'উদ্বোধনের' সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায় হওয়ার জন্য সকলকে জানাই সাদর আহ্বান। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

## বিশ্বমানব বিবেকানন্দ

বিশ্বতোমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রেই বিশ্ব-মানব। স্ব-দেশ ও স্ব-যুগ-পরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ পরিধির সীমা অতিক্রম করিয়া সর্বযুগের সর্ব-মানবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন—বিশ্বতো-মুখী প্রতিভার অন্যতম ধর্ম। স্বামীজীকে আমরা বিশ্বমানব বলিয়া থাকি। তাঁহার কর্মবহুল জীবনের কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার প্রতিভা-ভাস্বর ব্যক্তিত্ব দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের অন্তরেই একটা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে 'বিশ্ব-মানব' সংজ্ঞায় আখ্যায়িত করিবার মধ্যে কোন অত্যুক্তি বা অযৌক্তিকতা আমরা দেখি না। স্বামীজীর নিজের কথায়ও তাঁর সমর্থন পাই। তিনি প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গাকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের।" অপর এক পত্রে মিঃ স্টার্ডিকে লিখিয়াছেন, "আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই নারায়ণেরই সেবক।" (বাণী ও রচনা, ৩য় সংস্করণ, ৭।১৯৬ ও ১৯১)।

যাঁহারা বিশ্বমানব তাঁহারা একদিকে ভাবের জগতে গতানুগতিকতা-বর্জিত চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে বিশ্বমনে যেমন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেন, অপরদিকে কর্মজগতেও সৃষ্টিধর্মী কর্মাদর্শ স্থাপন করিয়া বিশ্বমানবের মনকে জীবনের চরম লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেন। স্বামীজীর সর্বতোমুখী অলৌকিক প্রতিভা সর্বযুগের সর্ব-দেশের মানুষের সম্মুখে একদিকে যেমন ভাবময় আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি-হীন কর্মপ্রেরণাও সর্বযুগের সর্বদেশের মানুষের মনকে মানবহিতকর নিত্য নূতন কর্মে আকর্ষণ করিতেছে। সমগ্র বিশ্বে আজ যে সর্বগ্রাসী লোভ-প্রবণতা, পরস্পরের মধ্যে হানাহানির উন্মত্ততা ও সম্ভোগ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা দেখা

দিয়াছে, স্বামীজীর মতো বিশ্বমানবের সমন্বয়ী চিন্তা ও কর্মের সুমহান আদর্শই জগতের এই 'স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-ভোগ-কোলাহল'-রূপ সংঘর্ষ প্রতিরোধ করিয়া ধ্বংসপথযাত্রী মানবসমাজকে অবশ্যম্ভাবী এই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে—বিশ্বের বহু চিন্তাশীল মনীষীই তাহা আজ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তায় ও প্রকাশে তাহা সুস্পষ্ট।

স্বামীজী আধুনিক বিজ্ঞানযুগের মানুষ। বিজ্ঞানসাধনায় প্রগতিশীল পাশ্চাত্য দেশসমূহের জীবনের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও অপ্রতিহত শক্তি ঐসব দেশের ঐহিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানকে যেভাবে উন্নীত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানকে অজস্র সাধুবাদ জানাইয়াছেন, স্বাগত জানাইয়াছেন বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিকে। শুধু তাহাই নয়, পাশ্চাত্যে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি স্বামীজীকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছিল, বিজ্ঞানে অনগ্রসর স্বদেশের অপরিসীম ঐহিক দুঃখ-দৈন্য তাঁহার পরদুঃখকাতর অন্তরকে তেমন বেদনাহত করিয়াছিল। তাঁহার বহু চিঠিপত্র ও বক্তৃতা-আলোচনায় তাঁহার এই মনোভাব তিনি ব্যক্তও করিয়াছেন। ঐহিক জীবনের মান উন্নয়নে বিজ্ঞান-চর্চার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন: "আমাদের চাই কি জিনিস, জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর Science (বিজ্ঞান) পড়ানো, চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরী না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৯।৪০৩)

আধুনিক বিজ্ঞানের জয়গান গাহিলেও, এই বিজ্ঞানশক্তি ভোগ-বিলাসের উপকরণ-সম্ভার বাড়াইয়া পাশ্চাত্যদেশের জীবনদৃষ্টিকে যে একান্তভাবে জড়বাদী করিয়া তুলিয়াছে—মননশীল স্বামীজীর মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি-দর্পণে তাহা অতি স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হইয়াছিল। তাই তিনি জড়বাদীসর্বস্ব পাশ্চাত্যকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন: "জড়ভূমির লীলাভূমি ইওরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়া আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৫।৫১-৫২) বলা নিষ্প্রয়োজন, কথাগুলি ইওরোপকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও জড়বাদীসর্বস্ব পাশ্চাত্যের সকল দেশের উদ্দেশ্যেই স্বামীজী ইহা বলিয়াছেন। কারণ অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন: "সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত, কালই ইহা ফাটিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।" (বাণী ও রচনা, ২য় সংস্করণ, ৫।১৭২)

স্বামীজী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহামানব। তাই তিনি তাঁহার দিব্যদৃষ্টি-সহায়ে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের এই জড়বাদ শুধু যে তাহাদিগকেই ইহজীবনসর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে তাহা নহে, এই বিজ্ঞান-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহার দুষ্ট প্রভাব প্রাচ্যজীবনেও ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাই ইহজীবন-সর্বস্ব জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি 'প্রবল বিভীষিকা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই 'বিভীষিকা' হইতে বাঁচাইবার জন্য ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম-জীবনকে আশ্রয় করিয়া থাকিবার জন্য তিনি বারবার সাবধানবাণী শুনাইয়াছেন। ভারত-বাসীকে সাবধান করিয়া তিনি বলিয়াছেন: "আধ্যাত্মিকতা বিসর্জন দিয়া যদি তোমরা জড়াশ্রয়ী পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে অগ্রসর হও,

তাহা হইলে তিন পুরুষ পরে এই জাতির লোপ অনিবার্য। ইহার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাইবে, জাতীয় সৌধের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িবে; ফলে সামগ্রিক ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" (ভারত কল্যাণ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেণ্ট্‌স হোম, বেলঘরিয়া, ৮ম সংস্করণ, পৃঃ ১১৭)। তাই নির্বিচারে জড়-বিজ্ঞানকে গ্রহণ না করিয়া ভারতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিতে তিনি বলিয়াছিলেন। বলিয়াছেন: "চাই Western Science-এর (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের) সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়" (বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৯।৪০১)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর উপরি-উক্ত সবগুলি বাণীই একসঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই তাঁহার বিশ্বমানবতার তথা বিশ্বমনার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বিশ্বমানব স্বামীজী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহজীবন-সর্বস্ব বহির্মুখী জীবনদৃষ্টি সংক্রামক ব্যাধির প্রবলতা লইয়া প্রাচ্য-জীবনকে সংক্রামিত ও কলুষিত করিতে চলিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উৎসমুখে তাহার গতিরোধ করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে মানুষ লোভী হিংস্র জন্তুর পর্যায়ে উপনীত হইবে। তাই তাঁহার প্রচারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ভোগমুক্ত জীবনের কথা বারবার উল্লেখিত হইয়াছে, যাহাতে বিশ্বমানবকে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমময় জীবনদর্শনের দিকে আকর্ষণ করা যায়। এখানেই স্বামীজীর মানব-মুক্তির চিন্তার স্বাতন্ত্র্য, বিশ্বমনার পরিচয়। আধুনিক বিজ্ঞানশক্তির কল্যাণময় অবদানকে অস্বীকার করা তো দূরের কথা, বিজ্ঞানশক্তির এই অবদানকে বরং তিনি স্বাগত জানাইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে বিজ্ঞানশক্তি মানুষের দম্ভ-দর্পকে স্ফীত ও ভোগ প্রবৃত্তিকে সর্বগ্রাসী করিয়া মানুষের মধ্যে পর্বত প্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেই মানব-বিরোধী দুষ্টশক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য সংগ্রাম করিতে শুধু ভারতবাসীকে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি আহ্বান জানাইয়াছেন।

স্বামীজীর সাধনা, সমষ্টিমুক্তির সাধনা। আর এই সাধনা তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতেই। এক সময় স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে "শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কতকটা উত্তেজিত কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস্?" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৮৩)। ব্যষ্টিমুক্তির সংগ্রাম স্বামীজীর জীবনে কিভাবে সমষ্টি-মুক্তির রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীতেই তাহা প্রমাণিত। তাঁহার আত্ম-মুক্তি কামনা শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমষ্টি-মুক্তির রূপ লাভ করতঃ স্ব-দেশ ও স্ব-জাতির সীমা অতিক্রমপূর্বক ক্রমশঃ সমগ্র বিশ্ব-মানবের মুক্তি কামনার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাই পদব্রজে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিবার সময় তিনি যখন অগণিত নিঃস্ব-নিপীড়িত দরিদ্র ভারতবাসীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন, তখন তাঁহার ব্যক্তিগত মুক্তিকামনা কোথায় উড়িয়া গেল। ব্যক্তিগত মুক্তিকামনাকে বিসর্জন দিয়া স্বদেশ-বাসীকে সর্বপ্রকার গ্লানি হইতে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টা তখন তাঁহার জীবনে প্রকট হইয়া উঠিল। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া স্বামীজী যখন বুঝিলেন যে

ভোগৈশ্বর্যের দিক দিয়া পাশ্চাত্য যতই সমৃদ্ধ হউক না কেন, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া তাহাদের দৈন্য অপরিমেয়, তখন আত্মার সঞ্জীবনী মন্ত্রের সাহায্যে অধ্যাত্মবাদ দান করিয়া তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টায় সমভাবে রত। বর্তমান বিশ্বের অধ্যাত্মচিন্তাশূন্য মানুষকে সুস্থ-সবল করিয়া তুলিতে একদিকে যেমন প্রয়োজন প্রাচ্য-জীবনের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ঐহিক সম্পদের বৃদ্ধি, তেমন পাশ্চাত্য-জীবনের ঐহিক সমৃদ্ধির সঙ্গে প্রয়োজন প্রাচ্য-জীবনের আধ্যাত্মিক সম্পদের বৃদ্ধি। স্বামীজীর চিন্তায় ও জীবনব্যাপী কার্যে এই মিলন ঘটাইবার অপূর্ব প্রচেষ্টা তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত। স্বামীজী তাঁহার সমষ্টি চিন্তায় আধুনিক বিশ্বসমস্যা সমাধানের যে নিগূঢ় ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি চিরকালের মানবেতিহাসে বিশ্বমানব হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হইবেন—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

# স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

Mohula ( মহুলা ),
Murshidabad
24-5-97

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়েষু—

আজ আপনার এক পোষ্টকার্ড পাইলাম, কিন্তু আপনার নিকট হইতে এক পোষ্টকার্ড প্রাপ্তে কখনই তৃপ্ত হইতে পারি না। বোধহয় মাতৃবিয়োগ হেতু আপনি কিছু অন্যমনস্ক আছেন, আপনার পত্রখানির লেখার ভাবেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। যাহা হোক অবকাশমত আমার পত্রের যথাযথ উত্তর দিয়া আমাকে সুখী করিবেন।

অর্থসহ যে যে মহাপুরুষ আমার নিকট আসিয়াছেন তাঁহাদের একজনের নাম স্বামী নিত্যানন্দ, আর একজনের নাম ব্রহ্মচারী সুরেশ্বর ( আনন্দ ? )। আপনার সহিত ইহাদিগের বোধ করি সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। ইঁহারা খুব উৎসাহের সহিত আমার সঙ্গে কাজ করিতেছেন। শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামী স্বয়ং এবং কলিকাতা মহাবোধি সভাই কেবল আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাদিগকে এই সুমহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ অর্থদ্বারাই আমাদিগের এই কার্য্যের উপক্রম হইয়াছে। স্বামীজি এককালীন ১০০৲ একশত টাকা দিয়াছেন, তিনি কোথা হইতে দিয়াছেন তাহা আমি জানিনা। মহাবোধি সভার টাকাও উহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক মাত্র। এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের যে ভীষণ প্রকোপ তাহাতে আমাদের এই ক্ষুদ্র Fund ( ফণ্ড ) শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। আমরা প্রতিদিন প্রাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে বয়ঃক্রমানুসারে দেড়পো, একপো, আধপো হিসাবে চাউল বিতরণ করিয়া থাকি। চাউলের দর এখানে প্রায় ( ৫৲ ) পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যহ ছোট বড় লোক সংখ্যা প্রায় ( ২০০ ) দুইশত হইবে। ১৫ ই মে হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রায় ( ১॥০ ) দেড় মণ চাউল বিতরিত হইতেছে। নিত্যই যেরূপ লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে আমাদের এই ক্ষুদ্র ফণ্ড ( Fund ) হইতে

অধিক দিন নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। তবে স্বামীজির আদেশে আমরা আমাদিগের সকল বন্ধুবান্ধবদিগকে লিখিতেছি ও জানাইতেছি, তাঁহারা যদি আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করেন ত আমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবা করিতে কখনই আলস্য করিব না। মূল কথা—ভগবানই আমাদের মুখ্য সহায়, তিনিই একমাত্র আমাদের আশা ভরসা। তিনি যেমন করাইবেন তেমন করিব। ইহাতে আমাদের কোন হাত নাই।

আজ আরও কয়েকখানি পত্র লিখিতে হইবে বলিয়া আমি বড় ব্যস্ত। সেজন্য অধিক লিখিতে পারিলাম না। ৺কাশীতে যে অন্ন বিতরণ করা হইতেছে তাহা কোথায় এবং কাহার অর্থে? আপনারা সকলে আমার শ্রদ্ধা সম্মান ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি আপনার

অখণ্ডানন্দ।

শিরোনামায় কেবল এই নাম লিখিলেই চলিবে। ইতি—

# স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি

## শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি—১৯১২ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে, পিতা-মাতার সঙ্গে। তখন আমার বয়স মাত্র চার বছর। কাজেই ঐ দর্শনের স্মৃতি বিশেষ কিছু আমার মনে নেই। তাঁকে সজ্ঞানে দর্শন করলাম ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। কানপুর 'রামকৃষ্ণ আশ্রম' ছিল তখন 'রজা মঞ্জিল'-এ; রাম নারায়ণ বাজারের পথের মধ্যে একটি সরু গলির এক প্রান্তে। পাশেই 'সার্বজনীন দুর্গাপূজা'র ক্লাব এবং আশ্রমের ব্যায়াম সমিতি। যে ঘরে তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন তার দ্বার-প্রান্তে গিয়ে দেখি—ঘরে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তিনি চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফুঁ-উ-উ দিচ্ছেন। মনে হল মাথায় বুঝি একটু ছিট্ আছে। আমায় দেখে মিষ্ট হাসি হেসে বল্লেন, "কি করছি, জান? Bacteria (বীজাণু) ছড়িয়ে দিচ্ছি; সব জায়গায় তো যেতে পারি না, কিন্তু সর্বত্র তাঁর (ঠাকুরের) নাম ছড়িয়ে দিচ্ছি। নামের Bacteria (বীজাণু)।"

রুণু বিশ্বাস বলে একটি ছেলের উপর পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজের সেবার দায়িত্ব ছিল। তার বয়স ১৬ বা ১৭ বছর হবে। মাস্টার মহাশয় বা নেপাল মহারাজ (পরে স্বামী নিত্যানন্দ) এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ও তাঁর সহযোগী দুটি ছেলে—অলোপী (পরে স্বামী চিদাত্মানন্দ) ও বসন্ত, স্বামী বিজ্ঞান মহারাজের সেবার সকল ব্যবস্থা করেছিলেন। পূজনীয় মহারাজজী আমাকে পরদিন সকালে আসতে বল্লেন। রুণুকে নিয়ে 'বিঠুর' যাবেন। যথা সময়ে পর দিবস উপস্থিত হলাম। তিনি এক্কায় করে যাচ্ছেন আর আমি সাইকেল চড়ে তাঁর পাশে পাশে। পথে তিনি খুব হাসিখুশি মেজাজে ছিলেন। সারা পথ নানা কথা জিজ্ঞেস করতে করতে গিয়েছিলেন। মহাপুরুষরা বালকবৎ আচরণ করেন, একথা শুনেছিলাম, এবার স্বচক্ষে তা দেখলাম। দেবতাজীর আশ্রমে গিয়ে আমরা থামলাম। তাঁর বাড়ি তালা বন্ধ ছিল, তিনি অন্যত্র গিয়েছিলেন। পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজ এক্কা থেকে নামলেন না। রুণুকে একদিকে পাঠালেন, আমাকে আর একদিকে; বল্লেন, "কোথায় গেছে, কবে আসবে খোঁজ নাও।"

পরে জানলাম দেবতাজী তীর্থে গেছেন। কবে ফিরবেন তা নিশ্চিত জানা নেই। দেবতাজী দীর্ঘকাল স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে এলাহাবাদে সেবাকার্য করেছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর নিঃস্বার্থ সেবায় লোকে শ্রদ্ধাপূর্বক নাম দিয়েছিল 'দেওতাজী'। কিন্তু কিছু বৎসর পূর্বে তিনি কানপুরে পালিয়ে আসেন এবং জানান, "আর এলাহাবাদ যাব না।" আর 'বিঠুরে' তিনি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে বসেন। আসবার পথে তিনি বলেছিলেন, "এই (লাঠি দিয়ে তার ঘাড়ে) আঁকশি দিয়ে ধরে নিয়ে যাব।" কিন্তু তা হল না। নীরবে আট মাইল পথ ফিরে চল্লেন। খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তা বুঝতে পারলাম। দীর্ঘপথে আর একটি কথাও বলেননি

তার পরদিন মহারাজজী এলাহাবাদে ফিরবেন। আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে বললেন। রুণু ও আমি ঠিক তিন ঘণ্টা পূর্বে তাঁকে নিয়ে স্টেশনে পৌঁছালাম। স্টেশনেও একটি পিঠ দেওয়া কাঠের বেঞ্চিতে আমরা বসে ছিলাম। নানা কথার অবসরে জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ! এত তাড়াতাড়ি স্টেশনে কেন এলেন?" তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "পৌঁছে গেলাম! এখন নিশ্চিন্ত! ট্রেন আমাকে ফেলে দিয়ে পালাবে না-ত!" এই তিন ঘণ্টার মধ্যে বহুবার তাঁকে অনুরোধ করলাম, "কিছু উপদেশ দিন, মহারাজ!" কিন্তু তিনি সেকথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। আমারও মনে দারুণ অভিমান হয়েছিল; শেষের দিকে আমি গুম হয়ে বসেছিলাম। তিনি ট্রেনে উঠলেন, রুণু সঙ্গে গিয়ে তুলে দিল; কিন্তু আমি চুপ করে বসে রইলাম। এমনকি প্রণাম করার কথাও মনে হয়নি। তিনি হাসতে হাসতে প্রসন্ন মনে উঠে গেলেন। ট্রেন ছেড়ে দিল; দেখি পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ দরজার কাছে দুপাশের রড্ ধরে ঝুঁকে রয়েছেন, কাছে আসতেই খুব জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন, "মাথা ত ঠুকতে পার, মাথা ত ঠুকতে পার।" ট্রেন চলে গেল।

মনে ভাবলুম হ্যাঁ! এ কার্যটি ত করেই থাকি। কিন্তু এতেই কি সব হবে? তাঁর মুখে এ কথাটি দুবার শুনেছিলাম। তখন জানতাম না আমাকে তিনি মহামন্ত্র দিলেন। সে কথা বুঝতে বহু বৎসর লেগেছিল।

আবার দর্শন পেলাম ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। আশ্রম উঠে এসেছে, 'আগা কোঠী'র বাড়িতে। আমি শুনলাম, বিজ্ঞান মহারাজ আশ্রমে এসেছেন। পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরতির পর হলঘরে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজ একটি হাতল দেওয়া চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁর মাথায় কান-ঢাকা গেরুয়া টুপী, গেরুয়া আলখাল্লা। পরনে গেরুয়া ধুতি, ডবল মোজা, পায়ে জুতা। তিনি কথা বলছেন, হাত নেড়ে বলে যাচ্ছেন; তাঁর দিকে সকলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে, এ যেন কোনও অন্য জগতের কথা হচ্ছে। সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন কিন্তু আমার তা মনে নেই। শুধু একটি কথা স্মরণ আছে। কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন মৃত্যুর কথা। ইঙ্গিতে (শরীর গেলে) "থাকব মায়ের মধ্যে। কোথায় আর যাব?"

সেবার প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ ছিল, ১৯৩৫ বা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। আমার মামা স্নান করতে প্রয়াগে যাবেন। স্থির হল সঙ্গে যাব আমি ও শ্রীঅলোপী বন্দ্যোপাধ্যায়। মুঠিগঞ্জ মঠে আমরা সকালেই পৌঁছালাম। বিজ্ঞান মহারাজ অন্যান্য সকলকে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে আশ্রমেই থাকতে বললেন। আর বললেন তিনি আর আমি যাব না। আমার তো

খুব আনন্দ। কারণ তাঁকে একা অনেকক্ষণ কাছে পাব। তাঁর মেজাজ খুবই ভাল ছিল। 'বেণী' তার গ্রাম থেকে ফিরল একটু বেলায়। বাহিরের বারান্দায় বিজ্ঞান মহারাজ একটি চেয়ারে বসেছিলেন। বেণীকে নানা প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু যেতে পারছিল না। বিজ্ঞান মহারাজের লাঠি তার ঘাড়ে আঁকশি হয়ে তাকে টেনে রেখেছিল। খানিক পরে তাকে ছেড়ে দিলেন, তখন সে নিজের কাজে গেল। একটু পরেই বিজ্ঞান মহারাজ রান্নাঘরে তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং রান্নার তদারক করতে লাগলেন। ভাত ফোটাবার জন্য কতটা জল দিতে হবে; ফুট্ ধরলে তাতে দু' পলা ঘি দিতে হবে; চালে আলু সিদ্ধ করতে দিতে হবে, ইত্যাদি সব খুঁটিনাটি বলতে লাগলেন।

তারপর ঘরে গিয়ে বসলেন। সেদিন অনেক গল্প হল। অনেকগুলি বই লিখেছিলেন তা জানালেন। আমি শুধু 'সূর্য্য সিদ্ধান্ত'র কথাই জানতাম। এক কপি পিতৃদেবকে দিয়েছিলেন। 'ইঞ্জিনিয়ারিং' সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন ও 'হাত দেখা'র একটি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখেছিলেন, তা শুনেছিলাম। হস্তরেখা সম্বন্ধে পুস্তকটি দেখতে চাইলাম। তিনি বললেন, "যদি থাকে তো তোমাকে দেব।" রামায়ণ ইংরেজীতে লিখেছিলেন জানতাম। জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "ও হয়ে গেছে। আর লিখছি না।"

কথায় ছেদ টেনে তিনি বললেন, "স্নান করে নাও। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে।" স্নানের জন্য প্রস্তুত হতেই কাছে এসে দাঁড়ালেন ও বললেন, "তেল মাখতে হয়।" তাঁর সম্মুখেই গা খুলে তেল মাখতে হল। আমার মুখের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, "ও বাঁদর! কলা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?" তাঁর চোখের ইঙ্গিতে বুঝলাম তিনি রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করছেন, আমি ঠাকুরের বাঁদর হয়ে জগতের নাথকে দর্শন করতে চাই কিনা? খুব আনন্দের সঙ্গে আমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলায় তিনি সন্তুষ্ট হলেন। মনে হল, রহস্যটা বুঝতে পেরেছি জেনে প্রসন্ন হলেন।

স্নান করে এসে তাঁর কাছে যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুরকে প্রণাম করেছ?" আমি মাথা নেড়ে জানালাম 'হ্যাঁ', কিন্তু তিনি খুব ভাবে বললেন, "কিছু হয় নি।" আমি ত্রস্ত ও ভীত; কি অন্যায় হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম না। অল্পক্ষণ পরেই বললেন, 'চল'। গেলাম আবার তাঁর সঙ্গে ঠাকুর ঘরে। তিনি অঙ্গুলি নির্দেশে ভিতরে যেতে আদেশ করলেন। ভিতরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণ দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে তিনি ঢুকলেন। হাঁটু ভেঙ্গে মেঝের উপর মাথাটি ছোঁয়ালেন। সেই মুদ্রায় কিছুক্ষণ রইলেন। তারপর কোন দিকে না চেয়ে বাহিরে চলে গেলেন। সেই যে বলেছিলেন "ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকলেই হবে" তার অর্থবোধ তখন হয়নি। এখন মনে হল ঠাকুর সামনে রয়েছেন, তাঁর শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করছি দেহে মনে প্রাণে এইটি অনুভব করতে হবে।

হায়! সে রকম প্রণাম আজও হল না। শিক্ষা পেলুম; রাস্তাও অতি সহজ। কিন্তু অন্তর ও বাহির সব ঠাকুরকে দেওয়া কি কঠিন তা যতই দিন যাচ্ছে, ততই তা বুঝছি।

পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর ব্যক্তিগত কোন সেবা করার অধিকার সহজে কাউকেও দিতেন না। অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁর হাতে জল দিতেও তিনি অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তবে শেষকালে তাঁর স্নানান্তে বস্ত্র ও কৌপীন ছাদে শুকোতে দিয়েছিলাম। আমাকে আহার করিয়ে

নিজে ঘরের মধ্যে একাকী অন্নগ্রহণ করেছিলেন। বেণী তাঁর জন্য অন্য হাঁড়িতে অন্ন ভোগ প্রস্তুত করেছিল। তাঁর ঘরে একা বসে আছেন চেয়ারে। হঠাৎ গাইতে লাগলেন—

কোই কাহু মেঁ মগন, কোই কাহু মেঁ মগন
হম্ ওহি মেঁ মগন, হম্ ওহি মেঁ মগন।

ইহার ভাবার্থ : এ জগতে কেউ কিছু নিয়ে মেতে রয়েছে, আমি ঈশ্বরে ডুবে আছি ; আমি তাঁরই মধ্যে তাঁকে নিয়ে মেতে আছি।

দুপুরবেলা নানা কথা হল। রামায়ণ-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "হনুমানের কি লেজ ছিল?" হেসে তিনি বললেন, "থাকলই বা?" তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি মনে হয়?" আমি কোথাও শুনেছিলাম "A tail of light হয়ত ছিল—তাই বললাম।" তিনি হাসলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

তারপর হাত দুটি সামনে প্রসারিত করে বললেন, "কত আয়ু বল দেখি!" তাঁর হাত দুটি রক্তিমাভ, গ্রহগুলি উচ্চ, রেখাগুলি অভগ্ন ও গভীর। মনে ভাবলাম, "অতি চমৎকার হাত। রাজার হাত এমন হয়।" মুখে বললাম, "আশীর উপর।" তিনি হেসে হাত সরিয়ে নিলেন, বললেন, "তুমি জান না? যোগীরা ইচ্ছা-মৃত্যু? কখনও সাধুর আয়ু গণনা করো না। তারপর বলেছিলেন, "হাত দেখা ভাল নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা। তুমি ছেড়ে দাও। একদম ছেড়ে দাও।"

বিকাল চারটার সময় বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "চল, ক্যাম্পে যাই।" এক্কা করে আমরা যাত্রা করলাম। সমগ্র এক্কা জুড়ে তিনি সহজাসনে বসলেন। তাঁর মাথা প্রায় এক্কার ছাতে ঠেকছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় বসবে?" আমি চালকের এক পাশে গুটিশুটি হয়ে বসলাম। এক্কার ভারসাম্য বজায় থাকবে না বলে এক্কা-চালক আমাকে পিছিয়ে বসতে বলল। যাহোক কোন রকমে নিজ ভারসাম্য বজায় রেখে এক্কায় বসা হল।

ক্যাম্প ত্রিবেণীর চরে। সেখানে সকলেই জানতেন পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজ ক্যাম্পে আসবেন না। হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেয়ে কয়েকজন দ্রুত কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটি চেয়ার ক্যাম্পের মাঝখানে পাতা হল। অনেকে তাঁকে প্রণাম করে নিজ নিজ কাজে চলে গেলেন। পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ কিছুক্ষণ একাকী নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। খানিকক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে খুব কাতর-ভাবে অনুনয় করে বলতে লাগলেন, "মহারাজ, কৃপা করুন।" তিনি উদাসীনবৎ বসে রইলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে বললেন, "সারা জীবন সংসারে দিয়ে শেষকালে মনে পড়লে কি হয়? যাও, যা করছ তাই কর।" সেবার ওই ব্যক্তিকে তিনি আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেও পরে জেনেছি তাঁকে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। আমি ঐ রাত্রে ক্যাম্পে রইলাম। পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজ মঠে ফিরে গেলেন।

সম্ভবতঃ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। সংবাদ পেলাম পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজ মৃণ্ময় মূর্তি গড়িয়ে শ্রীশ্রীদুর্গা-মাতার পূজা করবেন। সংবাদ পেয়ে পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজকে চিঠি লিখলাম এলাহাবাদ মঠে থেকে চণ্ডীপাঠের অনুমতি যেন দেন। তিনি ইংরেজীতে একটি পোষ্টকার্ডে লিখে পাঠালেন 'না'। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়িতেই পাঠ সাঙ্গ করলাম। পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজের দ্বিতীয় পোষ্টকার্ড পেলাম যাতে তিনি লিখেছেন, "তুমি আসতে পার।" সেই দিনই বন্ধুবর "অলোপীকে দশমীর দিন দীক্ষা দেওয়া হবে" বলে এক পত্র পেলেন শ্রদ্ধেয় নেপাল মহারাজ। অলোপী এসে জানালেন "আমাকেও যেতে হবে।" যথা-

সময়ে মুঠিগঞ্জ মঠে উপস্থিত হলাম দুইজনে। পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজ খুব খুশি। বললেন, "এসে গেছ?" বললাম, "হ্যাঁ, মহারাজ! কয়েকদিন পূর্বে এ চিঠি পেলে আরো ভালো হত তিনি হেসে বললেন, "তা এলেই পারতে!" বললাম, "আসব কেমন করে? আপনি তো বারণ করে-ছিলেন।" তিনি গম্ভীর মুদ্রায় বললেন, "আমি কে? এ ঠাকুরের স্থান! তুমি নিজের জায়গা ভাবলে, এসে পড়লেই পারতে!" তারপর বললেন, "তুমি লিখলে পাঠ করবে; কি সংকল্প করবে কে জানে? এখানকার সংকল্প 'বিশ্ব-হিতায়।' তোমার যদি আর কিছু থাকে?" বুঝতে পারলাম তাঁর কোন কাজই খেয়ালখুশি মতো নয়; প্রত্যেক কথার গভীর অর্থ আছে যা আমরা বুঝতে পারি না।

দশমীর পূজা সম্পন্ন হল। অলোপীরও দীক্ষা হয়ে গেল। তার স্কন্ধে মহারাজের হাতখানি। দেখে মনে হয় "কাঁচ পোকা কুমুরে পোকাকে ধরেছে।"

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতার নিকট বিজ্ঞান মহারাজের পত্র এল। ছোট বোনকে নিয়ে যেতে হবে দীক্ষার জন্য। কোন কারণে কয়েকদিন বিলম্ব হল। এলাহাবাদ মঠে গিয়ে জানলাম 'মহারাজ' বেলুড় গেছেন। তাই সেবার দর্শন হয়নি। তবে জীবনে বহুবার তাঁকে দর্শন করেছি, তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনেছি। সেও কম ভাগ্য নয়। সে কথা স্মরণে বারংবার প্রণাম করি তাঁর শ্রীচরণে।

# মানুষ ও মানুষের সত্য

শ্রীমতী অনিমা সেনগুপ্ত

মানুষ জগতকে ভোগ করছে; সচেতনভাবেও ভোগ করছে, আবার কেবল অভ্যাসবশে প্রায় কোন চিন্তা না করেই অনায়াসেও জগতের অনেক ভোগ মানুষ ভোক্তারূপে আস্বাদন করছে। জগতের এইসকল বিচিত্র ভোগানুভূতি দ্বারাই বোনা হয় প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিজীবনের কার্পেটখানি। আবার দেখা যায় যে প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বের মধ্যমণিরূপে মানুষের যে অনুভূতি সর্বক্ষণ তাকে জীবন-ভোগে উৎসাহিত করছে, তা হল এক বিশেষ 'আমিত্বের' অনুভূতি, যাকে সাধারণতঃ 'আমি-বোধ' বলা হয়ে থাকে। মানুষের 'দেহ-মন' আশ্রয় করেই এই বিশেষ ও স্বতন্ত্র 'আমি-বোধ' প্রকাশ পেয়ে থাকে। প্রত্যেকটি দেহের কেন্দ্রবিন্দুরূপ এই বিশেষ আমিত্ব-বুদ্ধি কিন্তু নিত্যও নয়, অমৃতও নয়। এ আমি স্বরূপে বিনাশশীল ও বিলয়ধর্মী। এই আমিত্ব-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ সর্বদা সকল রকম সংসার ভোগে লিপ্ত থাকে। এই 'আমি'র তাগিদেই মানুষ ধন, খ্যাতি, মান সংগ্রহ করার জন্য নিরন্তর নিজেকে ব্যস্ত করে রেখেছে; কারণ—ধন, খ্যাতি, মান ইত্যাদি এই বিশেষ 'আমিটির'ই ভোগের বিচিত্র উপকরণ। এই আমিকে ব্যবহারিক অহং বলা হয়। ব্যবহারিক অহং বা বিশেষ আমির কাজই হল জগতের বিষয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নানা-রূপ বিষয়-স্বাদ গ্রহণ করা এবং এই সকল বিচিত্রানুভবের দ্বারা নিজেকে নানাভাবে রঞ্জিত করে প্রকাশ করা। ব্যবহারিক অহং দ্বারা জীবন-ভোগের যা কিছু উপকরণ সংগৃহীত হয়, তা ব্যবহারিক অহংই ভোগ করে। এই বিশেষ 'আমি-ভাব'ও আমার-ভাব দ্বারাই মানুষ স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে সকল বিষয়কে কুক্ষিগত করে

ভোগ করতে চায়, সঞ্চয় করতে চায়; এবং বিষয়-সম্পদ যথেষ্টভাবে সঞ্চিত হলে বিষয়-সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠে। এই মরণ-ধর্মী ব্যবহারিক অহং-এর স্বভাবই হল ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করা ও সঞ্চিত সম্পদকে আঁকড়ে ধরে রাখা। সংগৃহীত সম্পদও যেন তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য সম্পদনাশে মানুষ ব্যাকুল হয়, বিহ্বল হয়, মনে করে যেন তার আত্মনাশ ঘটেছে। ব্যবহারিক অহং বোধের সংকীর্ণ সীমা-রেখা দ্বারাই প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সীমা নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকে এক-একটি বিশেষ মানুষে পরিণত হয়। স্বতন্ত্র স্বভাব-বোধযুক্ত এই মানুষের রুচি, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা সমস্তই তার বিশেষ আমিটিকে কেন্দ্র করে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। প্রতিটি ব্যক্তিত্বই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ব্যক্তিত্বের এই স্বতন্ত্রতা অবলম্বনেই মানুষে মানুষে ভিন্নতা। কিন্তু এই সংকীর্ণ ভেদ সৃষ্টিকারী অনিত্য আমির গণ্ডীতে আবদ্ধ, স্বার্থকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বটুকুই মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। তাই যদি হত, তাহলে মহাপুরুষগণ যুগে যুগে বিবিধ উপায়ে বৃহৎ হবার জন্য, মহৎ হবার জন্য, ভূমার সঙ্গে এক হবার জন্য এবং অসীম জ্ঞানে ও প্রেমে নিজের সত্তাকে বিস্ফারিত করার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে ত্যাগের পথে, দুঃখের পথে অমিত সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হতেন না। বিশ্বপ্রেমিক যখন বিশ্বের কল্যাণ কামনায় নিজের সকল স্বার্থসুখে আগুন জেলে দিয়ে নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেন, তখন তিনি অবশ্যই সংকীর্ণ আমিত্ব-বুদ্ধির সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করে কোন বৃহত্তর উপলব্ধির ভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন তিনি সংকীর্ণ ব্যবহারিক অহং দ্বারা সীমায়িত, ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট কোন বিশেষ দেশ বা কালের একটি ক্ষুদ্র মানুষ মাত্র নন। তিনি তখন বৃহৎ হয়ে, সকল মানব-সত্তাতে অনুস্যূত হয়ে এক বিরাট মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। তাঁর মধ্যে তখন বৃহত্ত্বের, অসামান্তের অপূর্ব প্রকাশ দর্শন করে সাধারণ মানুষও শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে তাঁকে প্রেম-ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করে। 'মানুষ যে বৃহৎ' এই অনুভবের আনন্দে সাধারণ ব্যক্তিও যেন জেগে ওঠে। এই ভূমা-বোধে জেগে ওঠার জন্যই বৈদিক ঋষিগণ ডাক দিয়েছেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' মানুষ স্বরূপে বৃহৎ—তার জ্ঞান বৃহৎ, প্রেম বৃহৎ, কর্ম বৃহৎ। সংকীর্ণ 'আমি-বোধ'ই যদি মানুষের চরম পরিচয় হত, তবে এই 'আমি-বোধের' গণ্ডীটুকুর মধ্যেই নিজের সকল চাওয়া-পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে মানুষ সুখে জীবনধারণ করত। কিন্তু তাতো মানুষকে করতে দেখা যায় না। বরং বৃহৎ হবার এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা তাকে সর্বদাই সুখের সীমা-বদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকে। মানুষ কেবল তার ক্ষুদ্র 'আমি'র গণ্ডীটুকুতে সীমাবদ্ধ থেকে সুখী হয় না। কারণ মানুষের অন্তরেই নিহিত রয়েছে বৃহৎ হবার উপাদান এবং সুতীব্র বাসনা। এই বাসনার প্রেরণায় মানুষ বড় হবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। বৃহৎ হবার এই প্রবল ও স্বাভাবিক বাসনাই প্রমাণ করে যে মানুষ সত্যি সত্যি সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক সীমাতে সীমায়িত এক ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। 'আমি বড় হব'—এই ইচ্ছা মানুষের এক বড় স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা। বড় হবার জন্যই মানুষ ধন সংগ্রহ করে ও খ্যাতির জন্য উন্মাদ হয়, এবং যশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু এই সকল সম্পদই তার সংকীর্ণ 'আমি-বোধ' আত্মসাৎ করে বলে সংকীর্ণ আমির সীমিত পরিধিতে আটকে গিয়ে মানুষ ক্ষুদ্র হয়ে যায়। আত্মকেন্দ্রিক ভোগের বন্ধনে বাঁধা পড়ে মানুষের জীবন তখন হয় ক্ষুদ্র ও

সীমিত। ভূমার আস্বাদ তার ভাগ্যে আর ঘটে না। ভূমা কিন্তু লুকিয়ে আছেন মানুষের অন্তরে। তিনি 'গুহাহিতম্'। হৃদয়-গুহায় তাঁর স্থান। তিনিই মানুষের বাস্তবিক সত্তা ও স্বরূপ। মানুষের সত্য পরিচয়। একটি ক্ষুদ্র ফুলগাছ, ক্ষুদ্র হয়ে, বিশেষ হয়ে সাধারণের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তার এই ক্ষুদ্রতাই তার সবটুকু পরিচয় নয়। যে বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট আশ্রয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ, সেই বিশ্বপ্রকৃতির এক বিশেষ অভিব্যক্তিরূপেই ফুলগাছটি সত্য। এই তার আসল পরিচয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে বিরাট প্রাণ-প্রবাহের এক সৌন্দর্যময় লীলাখেলা চলেছে, সেই খেলা অবিরাম গতিতে চালিয়ে যাবার গুরু-দায়িত্বই গ্রহণ করেছে ফুলে, ফলে সুশোভিত সকল বৃক্ষ ও লতাগুল্ম। ক্ষুদ্র ফুল গাছটিতে যে প্রাণশক্তি গুহাহিত রয়েছে, তা যে অসীম ও অনন্ত।

মানুষের ক্ষেত্রেও তার প্রতিদিনের ব্যবহার্য পরিবর্তনশীল 'আমিটি'ই তার নিত্যকালের স্বরূপ নয়। মানুষের মধ্যে যে সত্য রয়েছে তা বৃহৎ, তা ব্যাপক। সে সত্য সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, সমস্ত ভেদ-ভাবনার অতীত নিত্যকালের এক অক্ষয় সম্পদ। এ সত্য চেতন, জ্যোতির্ময়। কারণ এই সত্তা হতেই মানুষ চেতনা পাচ্ছে, জ্ঞানের আলো পাচ্ছে, হৃদয়ের প্রেম পাচ্ছে, কর্মের প্রেরণা পাচ্ছে। কোন সাধক নিজেকে জানার সাধনা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, তবে এই নিত্য সত্যের মুখোমুখী তাঁকে দাঁড়াতেই হবে। প্রতিটি মানুষের ব্যবহারিক 'আমি' সাংসারিক জীবনে এরই আশ্রয়ে লালিত-পালিত হচ্ছে। কারণ বড়তে আশ্রিত হয়েই ছোট পরিপুষ্ট হয়। সেইজন্যই সর্বদা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সকল দিক দিয়ে বড় হবার জন্য চেষ্টা করে।

মানুষ কেবল তার জৈব-জীবনের সুখটুকু মাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। নিজের ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করার দুর্বার বাসনা তাই মানুষকে অনেক সময়েই কেবল জৈব-জীবনের সুখের গণ্ডী হতে বাইরে বের করে এনে, দুঃখের পথে, দুঃসাধ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। মহাপুরুষের বাণীতে তাই বলা হয়েছে, 'Man does not live by bread alone।' বৃহত্ত্বের উপলব্ধিতেই মানুষের জাগরণ -এই হল তার মনুষ্যত্বের মহত্তম বিকাশ। মানুষ যখন আত্ম-কেন্দ্রিক স্বার্থসুখে মগ্ন হয়ে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং কেবলমাত্র একটি গণ্ডীবদ্ধ জীবনের ধারক হয়, তখন তার মনুষ্যত্বও সংকুচিত, আবৃত এবং অপরিস্ফুট থাকে। মনুষ্যত্বের সাধনা হল নিজেকে ভূমার সঙ্গে মিলিত করে দেখার সাধনা, বিশ্বনিখিলের সঙ্গে এক হবার সাধনা, সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হবার সাধনা এবং আত্ম-কেন্দ্রিক অস্তিত্বকে অতিক্রম করে এক বিরাট অস্তিত্বে উত্তীর্ণ হবার সাধনা। বৈদিক দৃষ্টিতে মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির এই সাধনাই হল আধ্যাত্মিক সাধনা। এই আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা মানুষ যখনই নিজের অখণ্ড ভূমারূপ উপলব্ধি করে, তখনই তার হৃদয় বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সংকীর্ণ 'আমি-বোধে'র সীমা অতিক্রম করতে না পারলে বিশ্ব-প্রেম ও বিশ্বসেবার ভার বহন করার আগ্রহ মানুষের হৃদয়ে কখনও জাগ্রত হয় না। বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বসেবায় মানুষ যে সত্তাকে প্রকাশ করে সেই সত্তাই ভূমা—সেই সত্তাই মানুষের পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ পরিচয়। এই সত্তাতে জাগ্রত হওয়াকেই বৈদিক ঋষিগণ অমৃতের জাগরণ বলেছেন এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেছেন যে এই বৃহত্তর জীবনই হল ঈশ্বর-সত্তায় সংলগ্ন লোকোত্তর জীবন। সাংসারিক আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে এই

জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায় না,—অথচ এই জীবনকে অস্বীকার করাও মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছু নয়।

খ্রীষ্টধর্মে যখন মানুষের অন্তরে christ spirit জাগ্রত করার উপদেশ প্রদান করা হয়, তখনও এই ব্যবহারিক 'আমি-বোধে'র সীমা অতিক্রম করে এক বৃহৎ 'আমি-বোধ' জেগে ওঠার কথাই বলা হয়। মানুষকে এই দৃষ্টিতে দেখাই তাকে তার সম্পূর্ণ মর্যাদায় দেখা,—তাকে অনন্তের বুকে রেখে দেখা। তাকে মনুষ্যত্বের মহিমা প্রদান করে দেখা। মানব-হৃদয়ে মহত্ত্বের উন্মেষ হলেই মানুষ সত্য হয়ে ওঠে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংসার সংলগ্ন থেকেও মানুষ সংসারাতীতে স্থিতি-লাভ করে সংসারের ভার হতে নিজেকে মুক্ত রাখে। সংসারের ঢেউগুলো মানুষ তখন নির্ভয়ে এবং নিরুদ্বেগে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। কারণ মানুষ যে তখন নিজের বৃহত্ত্বকে সাক্ষাৎ করেছে, মহত্ত্বকে উপলব্ধি করেছে এবং জীবনের সত্যকে অন্তরের আলোয় দর্শন করেছে। নিজের মধ্যে যে বিরাট সত্য লুকিয়ে আছে, তাকে প্রত্যক্ষ করার সাধনাই হল মানবোচিত সাধনা। এই সাধনায় ব্রতী হয়ে সিদ্ধিলাভ করার শক্তি কেবল মানুষেরই আছে। সেইজন্যই মানুষের শ্রেষ্ঠতা ও মানুষের অপরিমেয় মহিমা। মানুষের হৃদয়ে নিহিত সত্য স্বতঃই বৃহৎ। একে বড় করার চেষ্টা করতে হয় না। বড় হবার তাগিদ অন্তরে রয়েছে বলেই মানুষ কেবল বড় হবার জন্য সংসারে ছুটোছুটি করে। তার বৃহত্ত্ব যে বাইরে থেকে অর্জিত হবার সম্পদ নয়, এসত্য সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত। মানুষের সত্য তার অন্তরের সম্পদ। এই সত্যকে খুঁজে পেতে হয় নিজের অন্তরে এবং প্রকাশ করতে হয় নিজের চরিত্রে। এই হল মানুষের সত্যকার জীবন-সাধনা। বৈদিক ঋষিগণ এই সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তাঁরা বাইরের সম্পদ, শক্তি সংগ্রহ করে বড় হবার সাধনা করেন নাই। বৈদিক ঋষি যখন মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত', তখন তিনি মানুষকে মানুষ্যত্বের মহিমায় জাগ্রত হয়ে নিজেকে ভূমারূপে, সত্যরূপে উপলব্ধি করতেই আহ্বান করেছেন। নিজেকে ভূমারূপে, সত্যরূপে উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বমানবের সঙ্গে এক হয়ে বিশ্ব-কল্যাণের আহ্বানে ভোগ ও ত্যাগে অনুবিদ্ধ হৃদয়টি উৎসর্গ করে দিতে হবে ভূমার উপাসনায় ও সর্বভূতের কল্যাণে। খণ্ড অখণ্ডে আশ্রিত হয়ে অখণ্ডেরই ইঙ্গিত বহন করে আনছে। বৃক্ষ, নদী, তরুলতা, অগ্নি সকল খণ্ডবস্তুই তাদের মধ্যে অনুস্যূত অখণ্ডের কথাই বলছে। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ-সবই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। এই অনন্তের অনুভূতিকে সেইজন্য সুস্পষ্টরূপে জাগিয়ে তোলাই মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্তব্য। অনন্ত জীবনের অনুভূতির সঙ্গে যখন কোন ব্যক্তি বিশেষের অনুভূতি মিলে যায়, তখনই সেই ব্যক্তির অনুভূতি হয় অনন্ত। সর্বানুভূতির আলো হৃদয়ে জাগিয়ে তোলার অর্থ ই হল বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজের বৃহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করা এবং নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে অতিক্রম করে এক বৃহৎ আমিতে আত্মপ্রকাশ করা। বৃহৎকে এভাবে পাওয়াই হল মনুষ্য-জীবনের সত্যকে পাওয়া এবং শ্রেয়কে পাওয়া। সেইজন্য বৈদিক অধ্যাত্ম-সাধনায় সংযম, শ্রদ্ধাপূর্ণ দান ও ত্যাগ বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। সকল সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হতে হলে সংযমের বিশেষ প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় সংযম ও মনের সংযমে অভ্যস্ত না হলে নিজেকে স্বার্থপর ও সংকুচিত-ভাবনা কামনা হতে মুক্ত করে বৃহতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে

যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে মানুষের সেবায় দান করেন, তখন সেই আত্মদানই তাঁকে অসীম প্রেমানুভূতিতে বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম করে দেয়। তাঁর ক্ষুদ্র 'আমি-বোধের' সীমা অতিক্রম করে তিনি তখন বিশ্বনিখিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিরাট হয়ে ওঠেন। ত্যাগ প্রেমের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে, তখন ভালবাসার পাত্রটির সঙ্গে হৃদয়ে যুক্ত হয়ে তার মঙ্গল কামনায় ত্যাগ করতে প্রেমিক মানব স্বতঃই উন্মুখ হয়ে ওঠে। বৃহৎকে ভালবেসেও মানুষ তাঁকে পাবার জন্য, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য নিজের সকল স্বার্থ ত্যাগ করে ভূমার সঙ্গে মিলিত হবার সাধনা করে। সেইজন্যই প্রেমের পথ, ত্যাগের পথ ও সংযমের পথ সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত করার পথরূপে বৈদিক সাধনায় স্বীকৃত হয়েছে।

মানুষ যখন নিজেকে ভূমা হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, ক্ষুদ্র করে দেখে এবং পৃথক সত্তাযুক্ত বলে অনুভব করে, তখনই তার দৃষ্টি হয় মিথ্যা দৃষ্টি এবং জীবন হয় মিথ্যা জীবন। মানুষের ক্ষুদ্র সীমিত সাংসারিক জীবনকে তার একমাত্র জীবন বলে গ্রহণ করাই মিথ্যা জ্ঞান। জীবনকে কেবল খণ্ড ও পৃথক করে দেখলেই জীবন হয় ভ্রান্তি বা মায়া। কিন্তু জীবনের সত্যস্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম হলে, জীবনকে কোনমতেই মিথ্যা বলা যায় না। কারণ যে বৃহৎ প্রাণ, বৃহৎ আনন্দ, বৃহৎ চৈতন্য মানব-জীবনের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নিয়মকে রূপে রূপে প্রতিভাত করছে, তা যে পরম সত্য। যা সত্য হতে উৎসারিত, তা সত্যেরই প্রকাশ, মিথ্যার বিলাসমাত্র কখনও নয়। সত্যের বৃন্তে ফুটে আছে যে ফুল তা সৎ, তা বাস্তব। এই ফুলকে তার সত্য বর্ণবৈচিত্র্যেই দেখতে হবে, নিজের ভ্রান্ত কল্পনার রঙ লাগিয়ে নয়। এটা যখন সম্ভব হয় তখনই সে জীবনকে সুষমামণ্ডিত এক বৃহৎ সত্যরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। জীবনের এই মহিমাময় প্রকাশ দ্বারাই মানব-ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে।

স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা অজ্ঞানপ্রসূত বলেই শুদ্ধদৃষ্টির বিরোধী এবং মিথ্যা। মানুষ যখনই জ্ঞানে, প্রেমানন্দে ও কল্যাণকর্মে নিজের বৃহত্ত্ব প্রকাশ করে, তখনই তার অশুদ্ধ দৃষ্টি দূরীভূত হয়ে যায়। তার মধ্যে যে বৃহত্ত্ব আছে তা জেগে উঠেছে বলেই মানুষ তখন বৃহৎ হয়ে সংসারে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের সত্য পরিচয় হল সে মানুষ। মনুষ্যত্ব তার আসল সম্পদ। জ্ঞান ও প্রেম যেন দুইখানি বাহু—যা দ্বারা সাধিত হয় বিশ্বের কল্যাণ। শুদ্ধ কর্ম তার চলার শক্তি, যে শক্তি তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় মানবের যা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, সেই পথে। এই এগিয়ে চলা মানুষের পক্ষে এত স্বাভাবিক যে সে যখন সাধারণ জীবনে তার অন্তরে নিহিত ভূমাকে বিস্মৃত হয়ে থাকে, তখনও সে অজ্ঞাতসারে ক্ষণে ক্ষণেই ভূমার সঙ্গে মিলিত হবার পথে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তার সাধারণ খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে নিজের সুখ, দুঃখকে কেন্দ্র করেই প্রাত্যহিক জীবন-যাপন করে। কিন্তু এই সাধারণ জীবনেও সে অসাধারণের বা ভূমার তাগিদে অনেক সময় অসাধারণ কাজও করে বসে। যেমন কোন আর্তব্যক্তির দুঃখ দূর করার জন্য এক সাধারণ ব্যক্তিও নিজের সুখ ও স্বার্থ অকুণ্ঠিত চিত্তে বিসর্জন দিয়ে বসে। এই ত্যাগবিদ্ধ কাজটি যে তাঁর 'বড় আমি' করেছেন, 'ক্ষুদ্র আমি' নয়,—এই সত্যটুকুই কেবল সেই ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হয় না। 'বড় আমি'র ঘরে মানুষ স্বভাবতঃই সময়ে সময়ে প্রবেশ করে থাকে; কেবল সেই বৃহত্ত্বকেই আপনার সত্যস্বরূপ জেনে, সে ঘরেই সর্বদা বাস করার সাধনা মানুষ তার সাধারণ জীবনে করে না। বৃহৎ সত্তাতে নিত্য স্থিতি হলেই মানুষ বৃহৎ হয়, জ্ঞানে, প্রেমে

ও কর্মে বিরাট হয়ে ওঠে এবং মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। বৃহতে নিত্য স্থিতিই মানুষের স্বরূপে স্থিতি বা মুক্তি। বৃহৎ হেতুই এই বৃহৎ সত্তাকে ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্ম বিশ্বের সর্ববস্তু ও সর্বজীবে অনুস্যূত, আবার বিশ্বাতীতও। তাঁর প্রেরণাতেই জগতের সৃষ্টি, জগতের পুষ্টি ও জগতের স্থিতি। তিনি প্রতিটি মানব-হৃদয়ে বৃহত্বানুভূতিরূপে অবস্থিত রয়েছেন। তিনি হলেন মানুষের পরমতম, কল্যাণতম সত্তা। অতএব প্রত্যেক মানুষই ব্রহ্মাশ্রিত। মানুষের খণ্ডজীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে কেবল অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধিতে। ব্রহ্ম, ভূমা, কল্যাণ, আনন্দ এবং মানুষ তারই এক বিশেষ প্রকাশ। মানুষ ভূমাতে আশ্রিত এবং ভূমা মানুষে অন্তর্ভাবিত। সুতরাং মানুষের জীবন, মানুষের সাংসারিক সম্বন্ধ,মানুষের সাংসারিক প্রেম কোনটাই হেয় অথবা মিথ্যা নয়। বৈদিক সাধনায় সাধক, মানুষের মধ্য দিয়ে, সংসারের সকল সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম বা বৃহৎকে লাভ করতে পারেন ; এবং বৃহতের মধ্যে আবার সকল মানুষকে দর্শন করে সকলের সঙ্গেই নিজের একাত্মকতা জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে অনুভব করতে পারেন। মানব-অন্তরের নিহিত বৃহত্বের বোধই ব্রহ্মের বোধ। ব্রহ্ম সর্বাত্মক বলেই ঋক্ সংহিতার মন্ত্রে এই বিরাটকে নানা নামে স্তুতি করা হয়েছে।

'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'—

ব্রহ্মদ্বারাই জগতের সবকিছু উদ্ভাসিত হয়েছে,—এই কথা বলেছেন উপনিষদের ঋষি।

ব্রহ্মের মহাশক্তির বিচ্ছুরণে জগতে জীবনের প্রবাহ অবিরল ধারায় বয়ে চলেছে। জগৎ যেন ব্রহ্মের মহাশক্তি-সমুদ্রে জেগে ওঠা এক বিচিত্র তরঙ্গায়িত প্রবাহ,—গতিমান, পরিবর্তনশীল কিন্তু সত্য। ব্রহ্মের মহাশক্তিই যখন প্রবহমান জগতের উদ্‌গমস্থল, তখন জগতের তরঙ্গপুঞ্জকে কি করে অলীক অবাস্তব ও মিথ্যা বলে গ্রহণ করা যায়? বিশ্বকে ত্যাগ করে ব্রহ্মের সাধনা নয়। বিশ্বকে গ্রহণ করেই তার সাধনা। কিন্তু এই গ্রহণ আত্মকেন্দ্রিক গ্রহণ নয়। বিশ্বকে কেবল নিজের ভোগারূপেই গ্রহণ করা নয় ; নিজের অন্তর দিয়ে বিশ্বকে গ্রহণ করে বিশ্বাত্মাকে আপনার আত্মা করে নিতে হবে। বিশ্বকে যখন সাধক নিজের আত্মাতে গ্রহণ করতে পারেন, তখনই তিনি আপনার মধ্যে এবং বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে এক অখণ্ড বৃহৎকে দর্শন করতে সক্ষম হন। বিশ্বের সকল চেতন, অচেতন প্রকাশই ব্রহ্মের প্রতিমা। সুতরাং জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করার পথই হল ব্রহ্ম হবার পথ।

ব্রহ্মকে উপনিষদের ঋষিগণ যেমন সত্যের সত্য বলেছেন, তেমনি জ্যোতির জ্যোতিও বলেছেন। বিশ্বের সকল বস্তু-প্রকাশের উৎসই হল ব্রহ্ম-জ্যোতি বা চৈতন্য-জ্যোতি। 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্।' এই জ্যোতিই হল মানুষের সত্য সম্পদ এবং সেই কারণে বিরাট জ্যোতি হওয়ার সাধনা, ভূমা হওয়ার সাধনা, সত্য হওয়ার সাধনাই বৈদিক দৃষ্টিতে মানুষের সত্যরূপে প্রকাশিত হবার বাস্তবিক সাধনা।

"আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।
বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

# প্রতাপচন্দ্র হাজরা

## স্বামী চেতনানন্দ

ধর্মের গৌরব ভাল মানুষকে ভাল করবার মধ্যে নয়, দুষ্টকে শিষ্ট করার মধ্যে। ধর্ম মানুষের পশু প্রবৃত্তিকে মানবিকতায় এবং মানব প্রবৃত্তিকে দৈব প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করে। প্রতি যুগে অবতার মূর্তিমান ধর্মরূপে আবির্ভূত হন এবং মোহান্ধকারে নিমজ্জিত খল, দুষ্ট, ভণ্ড, পতিত মানবদের আলোর পথ দেখিয়ে দেন। অবতার-লীলার দুটি মহান উদ্দেশ্য—ধর্মকে ধূর্ত, স্বার্থপর, বকধার্মিকদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং মানুষের কলুষ কালিমা ধুয়েপুঁছে ধর্মপথে টেনে নেওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে প্রতাপচন্দ্র হাজরার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হাজরা ছিল অহংকারী, লোভী, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ, পরনিন্দুক। এরূপ চরিত্র হামেশাই সমাজে দেখা যায়। এরূপ লোকদের সঙ্গে বাস করা দুর্বিবহ। তারা নিজেরা জলে আর অপরকে জ্বালায়। এ-হেন ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ছয় বছর দক্ষিণেশ্বরে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেছিলেন। হাজরার বাসস্থান ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর-সংলগ্ন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, "হাজরাকে দেখলাম শুষ্ক কাঠ! তবে এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে। জটিলে-কুটিলে* থাকলে লীলা পোষ্টাই হয়।" (শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ কথামৃত, ১।৬।৩)

প্রতাপচন্দ্র হাজরার জন্ম শিহড়ের নিকটবর্তী মড়াগোড় গ্রামে। তার পিতা মাহেন্তী হাজরা ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ এবং পেশা ছিল চাষ-বাস। প্রতাপ গ্রামের স্কুলে কিছু লেখাপড়া শিখেছিল এবং বৈষ্ণব ভাবধারায় বর্ধিত হয়েছিল। সে ছিল শুষ্ক বিচারপরায়ণ এবং ভগবানে তার বিশেষ ভক্তি বিশ্বাস ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব তার উপর পড়ে। প্রতাপের মা, স্ত্রী ও দুটি পুত্র ছিল। যদিও কৃষি ছিল তার পেশা, কিন্তু তার মন ঐ কাজে ছিল না। ফলে তার পরিবার হাজার টাকার উপর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে সংসার পালনে অকৃতকার্য হয়ে ভগবানের শরণ নিল। তার ধারণা হয়েছিল ভগবানের নাম জপ করলে তিনি অর্থ দেবেন। যাহোক, খেতখামার থেকে যা ফসল ও সামান্য আয় হত তাতে কোনমতে হাজরার পরিবারবর্গ বেঁচে ছিল।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবার কামার-পুকুরে যান, এবং ঐ কালে তিনি হৃদয়ের বাড়ি শিহড়েও গিয়েছিলেন। ওখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে হাজরার প্রথম সাক্ষাৎ। হৃদয়ের সঙ্গে হাজরার পূর্বে পরিচয় ছিল এবং ঠাকুরের বিষয় সে হৃদয়ের কাছেই শুনেছিল। ঠাকুরকে প্রণাম করে হাজরা বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বলে এসেছিলাম।" "কি কথা গো?" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন সহানুভূতির সুরে। হাজরা—"ভগবানের কি কান আছে? এত যে ডাকি, ডাক পৌঁছায় কি তার কানে?" শ্রীরামকৃষ্ণ—"তুমি তো চাষীর ছেলে গো। কেমন করে জল ছেঁচে ক্ষেতে নিয়ে যেতে হয়, তা জান। মাঝ পথে নালায় যদি ঘোগ থাকে, জল কি পৌঁছাবে ক্ষেতে? সমস্ত পুকুর ছেঁচে ফেললেও ক্ষেতে

* কৃষ্ণ অবতারে গোপীশ্রেষ্ঠা রাধার শাশুড়ী জটিলা এবং ননদ কুটিলা তাঁর কৃষ্ণ মিলনের পথে অন্তরায় ছিল। এই দুই ভয়ংকরী নারী রাধাকে যন্ত্রণা দিত, অপবাদ রচনা করত। তাদের নীচতা, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা, ঘৃণা রাধার চরিত্রকে মহান করেছে। সে যত বাধা পেয়েছে, কৃষ্ণের প্রতি ততই তাঁর প্রেম বৃদ্ধি হয়েছে।

জল যাবে না। সব জল চলে যাবে মাঝ পথে ঘোগের ভিতরে। বাসনা-ঘোগ বন্ধ কর আগে, তবে তো পৌঁছাবে তোমার ডাক ( উদ্বোধন ৬৭ তম বর্ষ, পৃঃ ৩১৬ )

শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মর্ম হাজরা বুঝল, কিন্তু তার সন্দিগ্ধ মন তো আর একদিনের মধ্যে পরিবর্তন হবার নয়। যাহোক, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হাজরা কপট বৈরাগ্য অবলম্বন করে ঘর ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে সাদরে গ্রহণ করে তার আহার ও বাসস্থান ঠিক করে দিলেন, এমন কি কাপড়-চোপড়ও দিলেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, উদ্যান, প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গা, ফলফুলে পরিশোভিত বৃক্ষরাজি, পক্ষীর কাকলি, নহবতের সুরলহরী ও সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ সান্নিধ্য হাজরার মনে নিশ্চয়ই আলোড়ন জাগিয়েছিল। পূর্বেই তার হরিবাই ছিল, এখন সেই হরিনাম জপের জন্য সে আসন পাতল শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায়।

গ্রাম্য লোকেরা ধর্মকে যেভাবে দেখে থাকে, হাজরাও সেভাবেই ধর্মকে মেনে চলত। সে পূজা-পাঠ, মালাজপকেই ধর্মের অঙ্গ বলত। যে পূজা-পাঠ, মালাজপ, তিলক, ইত্যাদি করে না, তাকে সে ধার্মিক বলে গণ্য করত না। দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন বাস করার পর হাজরা দেখতে পেল ঠাকুর পূজা, পাঠ, মালাজপ, তিলক ইত্যাদি কিছুই করেন না। তাই একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঠাকুরকে উপদেশ দিতে বসল : '"দেখ গদাধর ! এ-রকম করা ত বাপু উচিত হচ্ছে না ! এ-রকম করলে বেশীদিন লোকে তোমায় মানবে না। লোককে ভোলাবার জন্য অন্ততঃ কিছু কর—আমার মত মালাটা নিয়ে ত জপতে পার। এত লোক আসে, তোমায় মালা জপতে দেখলে তবু তারা ভাববে যে তোমার সাধনভজন কিছু আছে।

হাজরার এই কথা শুনে ঠাকুর হাসতে লাগলেন এবং লাটু, হরিশ, গোপাল, রামলাল প্রভৃতিকে ডেকে বললেন, "ওগো, শুনেছ—হাজরা কি বলছে ? আমায় মালা জপতে বলছে। আমি বাপু, এখন আর ওসব করতে পারি না। ও বলছে—মালা জপতে না দেখলে লোকে আমায় মানবেক না। হ্যাঁগা, হাজরার কথা সত্যি না কি ?"

ঠাকুরের এই কথা শুনে সেবকবৃন্দ হাজরার উপর ভারী বিরক্ত হয়ে উঠল। হরিশ বলে বসল—"ওর কথা ছেড়ে দিন, যেমন গেঁয়ো লোক তেমনি গেঁয়ো বুদ্ধি।" ঠাকুর—"না গো না, গেঁয়ো বুদ্ধি বলো না—ওর মুখ দিয়েই তো মা বলাচ্ছেন।" হরিশ—"কি যে বলেন ! মা আর লোক পেলেন না—হাজরার মুখ দিয়ে আপনাকে কথা শোনালেন।" ঠাকুর—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! এমনি করেই 'মা' জানান দেন !"' ( লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০৬—৭ )

হাজরাকে নিয়ে ঠাকুর প্রায়ই মজা করতেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুআরি ঠাকুর হাজরার সামনে কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের বললেন, "হাজরা একটি কম নয়। যদি এখানে বড় দরগা হয়, তবে হাজরা ছোট দরগা।" (কথামৃত, ৪।১।৪) ভক্তেরা হেসে খুন, কিন্তু হাজরার অহংকার বেলুনের মতো ফুলে উঠল।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর, শ্রীম কথামৃতে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"ভক্তের মজলিস্ ভাঙ্গিলে পর, মহিমাচরণ হাজরাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টারও আছেন।

মহিমাচরণ ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, সহাস্যে )—মহাশয়, আপনার কাছে দরবার আছে। আপনি কেন হাজরাকে বাড়ী যেতে বলেছেন ? আবার সংসারে যেতে ওর ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওর মা রামলালের কাছে অনেক দুঃখ করেছে; তাই বললুম, তিন দিনের জন্য না হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো। মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বর সাধনা হয়?···আর সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?

মহিমাচরণ (সহাস্যে)—মহাশয়, জ্ঞান হলে তো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাজরার সবই হয়েছে। একটু সংসারে মন আছে—ছেলেরা রয়েছে, কিছু টাকা ধার রয়েছে। মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, একটু কসুর আছে। (সকলের হাস্য)।

মহিমা—কোথায় জ্ঞান হয়েছে, মহাশয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—না-গো, তুমি জান না। সব্বাই বলে, হাজরা একটি লোক রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে আছে। হাজরারই নাম করে, এখানকার নাম কেউ করে? (সকলের হাস্য)।

হাজরা—আপনি নিরুপম—আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন কাজ হয় না; তা এখানকার নাম কেউ করবে কেন?

মহিমা—মহাশয়, ও কি জানে? আপনি যেরূপ উপদেশ দেবেন ও তাই করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, তুমি ওকে বরং জিজ্ঞাসা কর। ও আমায় বলেছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনা-দেনা নাই।

মহিমা—ভারী তর্ক করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয়। (সকলের হাস্য)। তর্ক যখন করে, হয়তো আমি গালাগালি দিয়ে বসলুম। তর্কের পর মশারির ভিতর হয়তো শুয়েছি; আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম করে যাই, তবে হয়।"

(কথামৃত, ১।১৩।৭)

আধ্যাত্মিক অহংকার অতি সূক্ষ্ম। একটু জপধ্যান হাজরার 'হামবড়া-ভাব'কে বাড়িয়ে তুলল। শাস্ত্রে তার গভীর জ্ঞান ছিল না, কিন্তু সে ভক্তদের কাছে নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ বলে ভান করত, যার ফলে তাদের মনে ধাঁধাঁর সৃষ্টি হল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বহুবার সংশোধন করেছিলেন। একদিন তিনি হাজরাকে বললেন: "তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য ভাবি, তখন তাকে ঈশ্বর বলি। শুদ্ধাত্মা কিরূপ যেমন চুম্বুক পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে। চুম্বুক পাথর চুপ করে আছে—নিষ্ক্রিয়।" (কথামৃত, ১।১৩।৭)

আর এক দিন হাজরা শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা শুরু করলেন।

"হাজরা—তত্ত্বজ্ঞান মানে কি—না চব্বিশ তত্ত্ব আছে, এইটি জানা।

একজন ভক্ত—চব্বিশ তত্ত্ব কি কি?

হাজরা—পঞ্চভূত, ছয় রিপু, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়—পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়; এই সব।

মাষ্টার (ঠাকুরকে, সহাস্যে)—ইনি বলছেন, ছয় রিপু চব্বিশ তত্ত্বের ভিতরে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঐ দ্যাখো না। তত্ত্বজ্ঞানের নামে কি করছে আবার দ্যাখো। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান! তৎ মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।" (কথামৃত, ৪।২২।১)

অপ্রস্তুত হাজরা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় নিজের আসনে গিয়ে বসল।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতিকে)—ও কেবল তর্ক করে। এই একবার বেশ বুঝে গেল—আবার খানিক পরে যেমন তেমনি

"হাজরা বলে, 'ব্রাহ্মণ শরীর না হলে মুক্তি হয় না।' আমি বল্লাম—সে কি! ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস যার খাবার সময় ঘণ্টা বাজতো—এরা সব শূদ্র। এদের ভক্তির দ্বারাই মুক্তি হয়েছে। হাজরা বলে, 'তবু!'…

"আমি বলি, কামনাশূন্য ভক্তি অহেতুকী ভক্তি—এর বাড়া আর কিছুই নাই। ও কথা সে কাটিয়ে দেয়।…

"মাষ্টার—হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র করে বকে। চুপ না করলে কিছু হচ্ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক একবার বেশ কাছে এসে নরম হয়। কি গ্রহ, আবার তর্ক করে। অহংকার যাওয়া বড় শক্ত। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দিলে আবার তারপর দিন ফেকড়ী বেরিয়েছে। যতক্ষণ তার শিকড় আছে ততক্ষণ আবার হবে।" ( কথামৃত, ৪।২২।১ )

সত্যিই বিস্ময় জাগে—ঠাকুর কি করে দিনের পর দিন এই হাজরার সঙ্গে বাস করেছেন। তিনি একদিকে যেমন ভক্তদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন আবার হৃদয়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, হাজরার নিন্দা ও সমালোচনাও কম পানান। হাজরা লোকদের কাছে ঠাকুরের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে নিজেকে বড় করবার চেষ্টা করত, অথচ এই ঠাকুরই ছিলেন তার আশ্রয়দাতা। তার মুখ ছিল কটু এবং সে শুচিবাইগ্রস্ত ছিল। ঠাকুর ছিলেন নিন্দাস্তুতির ঊর্ধ্বে এবং সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। একদিন তিনি হাজরাকে বললেন, "বেশী খেয়ো না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না।" ( কথামৃত, ৪।৮।২ ) "কারু নিন্দা কোরো না—পোকাটিরও নয়।…যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে—'যেন কারু নিন্দা না করি।'" "হাজরা—ভক্তি প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক-শো-বার। যদি ঠিক হয়—যদি আন্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে সেরূপ ঈশ্বরের জন্য কই কাঁদে?" ( কথামৃত, ৪।২০।৫ )

ঠাকুরের উপদেশ সাময়িকভাবে হাজরার মনকে উচ্চভূমিতে তুলে দিল। সে অতি বিনয়ের সঙ্গে ঠাকুরের পায়ের ধূলা নেবার চেষ্টা করল।

হাজরা বুঝেছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে সেবা করবার বা পদস্পর্শ করার মতো পবিত্রতা তার নেই; তাই সে এক উগ্র তপস্যা করবার সঙ্কল্প করল। সে মশারির ভিতর মালা হাতে কম্বল-শয্যায় শুয়ে পড়ল। মাথার কাছে এক তাল গঙ্গামাটি। পর্যায়ক্রমে একপাক মালাজপ ও একটি করে গঙ্গামাটির গুলি ভক্ষণ চলল সারা দিন সারা রাত্রি। ভক্তবৎসল অন্তর্যামী ঠাকুর প্রসন্ন হলেন। তিনি ধীরপদে গেলেন হাজরার সাধন কক্ষে এবং ডাকলেন স্নেহভরে। হাজরা নিরুত্তর। সে অভিমানভরে রোখ করে জপ করতে লাগল। শেষে ভক্তাধীন ঠাকুর হাজরার হাত ধরে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "পায়ে হাত বুলিয়ে দাও।" দীর্ঘকাল অবহেলিত হাজরা আজ প্রাণভরে পদসেবা করে ধন্য হল। একটু পরেই ঠাকুর বললেন, "হয়েছে গো, এখন যাও। বিশ্রাম করগে।" ( উদ্বোধন, ৮৭তম বর্ষ, পৃঃ ৩১৮-১৯ )

পুঁথিকারের ভাষায়—

"অতি অল্পক্ষণ মধ্যে কন গুণমণি।
পরিতৃপ্ত সেবায় সন্তুষ্ট এবে আমি ॥
আপন শয্যায় তুমি করহ গমন।
হাজরা বলেন নাহি ছাড়িব চরণ ॥"

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৪৬৫ )

হাজরা ছিল চালাক ও হিসাবী। সে শ্রীরামকৃষ্ণের ধনী ভক্তদের হাত করে কিছু বাগাবার

চেষ্টা করত। সুযোগ পেলেই সে তাদের ডেকে নিয়ে উচ্চ ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গ করত। তার মতলব ছিল ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেনা শোধ করা। ভণ্ডামি ও আধ্যাত্মিকতা একসঙ্গে চলে না। হাজরার জটিল চরিত্র লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেন, "হাজরা এখানে অনেক জপতপ করত, কিন্তু বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেপুলে, জমি এসব ছিল, কাজে কাজেই জপতপও করে ; ভিতরে ভিতরে দালালিও করে। এ সব লোকের কথার ঠিক থাকে না। এই বলে মাছ খাব না, আবার খায়!…হাজরা টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকত—ডেকে লম্বা লম্বা কথা শোনাত।" (কথামৃত, ৫।১৪।৩)

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় হাজরা বসত। যখন কোন আগন্তুক হাজরাকে জিজ্ঞাসা করত, "মশায়, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কোথায় থাকেন এখানে?" হাজরা বললেন, "তাঁর কাছে যাবার কি দরকার? তত্ত্বকথা শুনবেন? বসুন, আমিই শোনাব।" (উদ্বোধন, ৬৭তম বর্ষ, পৃঃ ৩১৬) ভক্ত হয়তো কাঁচুমাচু করছেন। এমন সময় ঠাকুর হাজির হলেন। দেখেই বুঝে নিলেন হাজরার মতলব। শেষে ভক্তকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। নাগ-মহাশয় ও সুরেশচন্দ্র দত্ত যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে যান, তখন ঠাকুরের দ্বার-পার্শ্বে এক শ্মশ্রুধারী পুরুষকে পরমহংসদেব কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করেন। ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, "হাঁ, একজন আছেন। তিনি আজ চন্দননগর গিয়াছেন তোমরা আর একদিন এস।"

এই কথা শুনে দুজনেই খুব বিমর্ষ হলেন। কি আর উপায়। উভয়ে বিদায় লইবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় নাগ মহাশয় লক্ষ্য করলেন, দরজার ভিতর থেকে অঙ্গুলি সংকেত করে কে যেন তাদের ডাকছেন। নাগ মহাশয় ভিতর থেকে অনুভব করলেন—ইনিই পরমহংসদেব। শ্মশ্রুধারীর বাক্য উপেক্ষা করে তারা ঘরের ভিতর গেলেন।

এই শ্মশ্রুধারীই প্রতাপচন্দ্র হাজরা। নাগ মহাশয় বলতেন, "হায়, হায়, ভগবানের কি আশ্চর্য মায়া! বার বৎসর কাল নিকটে অবস্থান করিয়াও হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে চিনিতে পারেন নাই, ফুট তাঁর হাতে, তিনি কৃপা করিয়া জানাইয়া দিলে তবে জীব তাঁহাকে জানিতে পারে। শত বছর জপ-ধ্যান করলেও তাঁর কৃপা না হলে কেহই তাঁকে জানিতে সমর্থ হয় না।"
(সাধু নাগ মহাশয়, ১১শ সংস্করণ পৃঃ ৩৬-৩৭)

মিথ্যাই তো সত্যপথের কণ্টক। তাই মিথ্যার মুখোশ পরে হাজরা অবতারের দরজার কাছে বসে থাকত। লোকের সঙ্গে ছলচাতুরী খেলত। ইহাও শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারলীলার অংশ। নাটকের নিয়ম হল—হিরণ্যকশিপু বা রাবণ প্রভৃতি দানবীয় চরিত্র যত নিষ্ঠুর, ক্রূর ও ভয়ংকর হবে ততই শ্রোতার মন প্রহ্লাদ ও সীতার প্রতি আকৃষ্ট হবে। সত্যি বলতে কি হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে, রাবণ রামকে মহান্ করেছে। হাজরা চরিত্র উপেক্ষার নয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র উজ্জ্বল করে তুলেছে।

এরপর হাজরা শ্রীরামকৃষ্ণের নামে অপবাদ রটাতে শুরু করল। সে ঠাকুরকে বলল, "ধনীর ছেলে দেখে, সুন্দর ছেলে দেখে তুমি ভালবাস।" ঠাকুর উত্তরে বললেন, "তা যদি হয়, হরিশ, নোটো, নরেন্দ্র—এদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রের ভাত নুন দেখাবার পয়সা জোটে না।" (কথামৃত, ৪।২৩।৮) যাহোক হাজরার এইরূপ সমালোচনা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবিত করে তুলেছিল। অন্য একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি ভক্তদের বললেন, "হাজরা আবার শিক্ষা দেয়,

তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাবো? গাড়ী করে বলরামের বাড়ী যাচ্ছি এমন সময় পথে মহা ভাবনা হলো। বললুম, 'মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য আমি অত ভাবি কেন, সে বলে—ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে এসব ছোকরাদের জন্য চিন্তা করছ কেন?' এই কথা বলতে বলতে একবার দেখালে যে তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেই রূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙলো, হাজরার উপর রাগ করতে লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ করে দিছলো। আবার ভাবলুম, সে বেচারীরই বা দোষ কি, সে জানবে কেমন করে? আমি এদের জানি সাক্ষাৎ নারায়ণ।" (কথামৃত, ২।৬।১)

হাজরার সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন: "ঠাকুরকে হাজরা বলেছিল, 'আপনি কেন নরেন্দ্র, রাখাল, এ-সবের জন্য এত ভাবেন? সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকুন না।' ঠাকুর বললেন, 'এই ছাখ, ঈশ্বরের ভাবে থাকি।' এই বলে তাঁর সমাধি হল। দাড়ি, চুল, লোম সব খাড়া হয়ে উঠলে, এই অবস্থাতে তিনি ঘণ্টাখানেক ছিলেন। রামলাল তখন নানারূপ ঠাকুরদের নাম শুনাতে লাগল। নাম শুনাতে শুনাতে তবে তাঁর চৈতন্য হয়। সমাধিভঙ্গের পর তিনি রামলালকে বললেন, 'দেখলি, ঈশ্বরের ভাবে থাকতে গেলে এই অবস্থা। তাই নরেন্দ্র এদের নিয়ে মনকে নিচে নামিয়ে রাখি।' রামলাল বললে, 'না, আপনি আপনার ভাবেই থাকুন।'" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম খণ্ড, ৯ম সংস্করণ, পৃঃ ৩২৬-২৭)

হাজরার অশেষ দোষ থাকা সত্ত্বেও ছিল জপে নিষ্ঠা। সে বিশ্বাস করত জপের দ্বারা সে অর্থ, নামযশ, শক্তি, সিদ্ধি লাভ করবে। হাজরা একদিন দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসে মালা নিয়ে জপ করছে। ঠাকুর মা-কালীর মন্দির থেকে এসে ভাবে হাজরার হাত থেকে মালা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "এখানে (অর্থাৎ তাঁর কাছে থেকে) আবার মালা জপ করা কলকাতায় তো অনেকে মালা জপ করে—কেউ কুড়ি বৎসর—কেউ পঁচিশ বৎসর ধরে, তাদের কি হচ্ছে? ব্যাকুলতা না হলে কিছুই হয় না। এখানে (অর্থাৎ তাঁকে) দেখলেই চৈতন্য হয়ে যায়।" (শ্রীম-কথা, ১।২৪৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ কখন কখন হাজরাকে বকুনি দিয়েছেন, কিন্তু কোনদিন ঘৃণা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেননি। তিনি হাজরাকে সম্মান দেখিয়েছেন এবং যুবক ভক্তদের শিখিয়েছেন কি করে এরূপ কপট লোকের সঙ্গে বাস করতে হয়। তিনি একদিন হাজরার সামনে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকোটুকো আছে? আমি বলি আছে। কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবোল দেবে।" (কথামৃত, ২।১৫।২) শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার হাজরার ছোবোল খেয়েছেন।

শ্রীম কথামৃতে লিপিবদ্ধ করেছেন:

"হাজরা উত্তরপূর্ব বারান্দায় বসিয়া হরিনামের মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছেন। ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ও হাজরার জপের মালা হাতে লইলেন। মাস্টার ও ভবনাথ সঙ্গে। বেলা প্রায় দশটা হইবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—দেখ, আমার জপ হয় না। না, না, হয়েছে! বাঁ হাতে পারি, উদিক (নাম জপ) হয় না!

এই বলিয়া ঠাকুর একটু জপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জপ আরম্ভ করিতে গিয়া একেবারে সমাধি!

ঠাকুর এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। হাতে মালাগাছটি এখনও রহিয়াছে। ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন। হাজরা নিজের আসনে বসিয়া—তিনিও অবাক হইয়া দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে হুঁশ হইল।" (কথামৃত, ২।১৭।৩) [ক্রমশঃ]

# স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

আজ ৩০ জন্মতিথি, ছোট গ্রামখানি
মাতিয়াছে উৎসবে। প্রভাত হইতে
দূর দূর হ'তে আসি ভক্ত শত শত
জানায় চরণে নতি বেদীতল ছুঁয়ে।
আজি হ'তে বহু বর্ষ আগে এই দিনে
অপরূপ দেবশিশু নামিয়া আসিলে
ধূলা-ধরণীতে আলো করি মা-র কোল
উলুধ্বনি সনে আর শুভ শঙ্খনাদে।
শৈশবের লীলা খেলা জীবন প্রভাতে
গুরু শিশু সঙ্গী সাথে ;—নির্জন প্রান্তরে
ধ্যানে ধ্যানী বুদ্ধসম রহিতে মগন।
ছাড়ি সে শিশুর ক্রীড়া আবার কখনো
কাটাইতে যোগাসনে যোগীন্দ্রের মতো।
শত-সুখ বিজড়িত গত জীবনের
কোন স্মৃতি পড়িত কি স্মরণে তোমার
চলচ্চিত্রে চিত্রসম স্পষ্ট সমুজ্জ্বল।
যৌবনের সন্ধিক্ষণে নূতন অধ্যায় ;
জননীর সুশীতল স্নেহাঞ্চল খানি
পিতার ঐশ্বর্য ধন, পত্নী ভালবাসা
কে যেন মঙ্গল হস্তে দিল ধুয়ে মুছে ;
নেপথ্যে রহিয়া কেবা দিল হাতছানি ;
গৃহের সুখের শয্যা, আপন স্বজন
পর হ'য়ে গেল সব ; সংসারের সুখ
হইল অদৃশ্য যেন মায়ামৃগ সম।
জগতের মহাগুরু—তাঁহার চরণে
নিজেরে সঁপিয়া দিলে সব কিছু ভুলে।
তুলে নিলে অঙ্গে তব ফকিরের সাজ।
শিশুর মতন অতি সহজ সরল
সদা আত্মভোলা যোগী দয়ার হৃদয়,
গুরুভ্রাতা অনুগামী সবাই আপন
সবাই সমান তারা, নাই ভেদাভেদ
ছোট বড় জাতি কিম্বা দীন ধনবানে।
কেহ নহে পর তারা, আত্মার আত্মীয়।
সুধা পাত্র হাতে নিয়ে বিতরিলে সবে
অমৃতের ধারা—স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা,
কি যাদু পরশে পর করিলে আপন।
রাজা মহারাজ হলে চির উদাসীন
জাগে নাই কর্তৃত্বের কোন অভিমান।
কঠিন কর্মের ভার করেছ বহন
তবুও ভ্রূক্ষেপহীন—সদা হাসি মুখ ;
আবার কখনো তুমি বজ্রাদপি দৃঢ়।
আকাশে অশনি সম তোমার কিরণ
সহসা পশিয়া দূর করিল আঁধার।
ভক্তগণ গাহিতেছে তব জয়গান
এ পুণ্য তিথিতে তব আবির্ভাব স্মরি।
আমিও সবার সাথে আসিয়াছি আজ
জানাতে অসংখ্য নতি চরণ কমলে।
চেয়ে আছি তব পানে, চাহ মোরে তুমি,
তুমিময় কর প্রভু মোর চিত্ত-ভূমি।

# স্বামীজীর আমেরিকান নারীভক্ত—
# জোসেফিন ম্যাকলাউড

শ্রীমতী চিত্রা বসু

শিকাগো ধর্মসভার মধ্যে দিয়ে উদীয়মান সূর্যের মতো জগতের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপর কয়েকবার তিনি ভ্রমণ করেছেন আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে, পরিচিত হয়েছেন সে দেশের সংস্কৃতি, বহু মানুষের ও মনীষীদের সঙ্গে। এক কথায় বলা যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে দক্ষিণে এবং বামে রেখে মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামীজী। মিলন এবং সৃজন করবার প্রতিভায় দীপ্ত স্বামীজীর উপদেশ ছিল ভারতবর্ষের ও পশ্চিমের সাধনাকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করবার। পাশ্চাত্যে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন কয়েকজন বিদুষী ধর্মপিপাসু ও ভক্তিমতী নারীর। এঁদের তিনি গ্রহণ করেছিলেন মাতা, ভগ্নী, শিষ্যা ও বন্ধু হিসাবে। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, স্নেহে শুধু স্বামীজীর জীবনের সঙ্গেই এঁরা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিলেন না, তাঁর আদর্শের এবং আধ্যাত্মিক ও কল্যাণধর্মী সংগঠন কাজেও এঁরা উৎসর্গীকৃত ছিলেন। এঁদেরই অন্যতমা মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড,—স্বামীজীর প্রিয় 'জো' বা জয়া। এই মহিয়সী নারীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর চিরস্থায়ী গভীর প্রীতির হার্দ্য সম্পর্ক গড়তে সমর্থ হয়েছে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুআরি নিউইয়র্কের ওয়েস্ট স্ট্রীটের বাড়ির এক ড্রইংরুমে জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ। ম্যাকলাউড তাঁর ভগিনী মিসেস্ স্টারজিসের (পরে যিনি মিসেস্ লেগেট হয়েছিলেন) সঙ্গে ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছেন স্বামীজীর বেদান্ত ভাষণ শ্রবণ-মানসে। ম্যাকলাউড সেই স্মৃতিপ্রসঙ্গে বলেছেন: "তাঁর সব কথাই সেদিন আমার কাছে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল; তাঁহার প্রথম বাক্যটি সত্য ছিল, দ্বিতীয়টি সত্যতর, তৃতীয় বাক্যটি আরও সত্য।...সেইদিনকার সেই বিশেষ মুহূর্তের পর হইতে জীবন আমার কাছে নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।"[১] জো বলতেন জানুআরি মাসের ঐদিনটি তাঁর প্রথম জন্মদিন। স্বামীজীকে দেখার পর তিনি যেন দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হলেন, এবং পরবর্তী সময়ে ঐদিন থেকেই তিনি তাঁর বয়স গণনা করতেন। অপরিচিত হিন্দু-সন্ন্যাসীর দর্শন তাঁর পূর্বস্মৃতি ভুলিয়ে তাঁকে নবজীবন দান করেছিল। সেই মুহূর্ত থেকে সমস্ত জীবনের অর্থই তাঁর কাছে পাল্টে গিয়েছিল। জড়সর্বস্ব পাশ্চাত্য জগতের নারী সেদিন স্বামীজীর কাছে শুনলেন অন্তর্জগতের বাণী—দেববাণী। মানুষের দুর্বলতা ও পাপ অলীক কল্পনা, অন্তর্নিহিত দেবত্বই চিরন্তন সত্য। জো-কে তিনি বললেন: "সবসময় মনে রেখো তুমি ঈশ্বরের সন্তান, কেবল বাইরের দিক থেকেই একজন আমেরিকান এবং নারী।"[২] স্বামীজীর অনুপ্রেরণাময় এই বাণী জো-র হৃদয়ে সাড়া জাগিয়ে তুলল; সব বন্ধন উপেক্ষা করে যুগাচার্যের জগদ্ধিতায় আদর্শে প্রস্তুতির সূচনা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল।

প্রথম সাক্ষাতের পর জো স্বামীজীর কাছে কিভাবে ধ্যান করতে হয় তার শিক্ষা নিয়েছেন। যদিও পূর্বেই তিনি ধ্যান অভ্যাস করতেন, এবং গীতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এজন্যই বোধহয় স্বামীজীর

১ Reminiscences of Swami Vivekananda, 2nd Edition, p. 233
২ ঐ ঐ P. 234

মহাশক্তিকে অনায়াসেই চিনে নিতে পেরেছেন। স্বামীজীর কাছে শুনেছেন জীবনের সব কিছুই পবিত্র, এবং নিজের সত্তা উপলব্ধি করা এক পরম লক্ষ্য। স্বামীজীর আধ্যাত্মিক শক্তি এই নারীর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল তাই তাঁর মনে হত মহাপুরুষ-সঙ্গই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর আমেরিকার ইলিয়নেস্ শহরে জোসেফিন ম্যাকলাউডের জন্ম। পিতা ডেভিড ও মাতা মেরী অ্যান স্কটিশ হাইল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় চলে এসেছিলেন। এঁদের পাঁচটি সন্তান; সকলেরই নামকরণ হয়েছিল বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে যুক্ত করে। পরিবারটির সকলেই ছিলেন গতিশীল জীবনে আগ্রহী। জোসেফিনের কাছে ভারতীয় বেদান্ত-ধর্মের নতুন তত্ত্ব শুনে তাঁর মৃত্যুপথ যাত্রী পিতা পরম শান্তিলাভ করেছিলেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষিত ও অভিজাত যুবক জোসেফিনকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু পার্থিব চঞ্চলতার কাছে এই নারী ধরা দেননি। জীবন কাটিয়েছেন চিরকুমারী থেকে, বিবেকানন্দ-রূপ ধ্রুবসত্যকে প্রত্যক্ষ করে ও আন্তর-সৌন্দর্যের গভীরতায় মগ্ন হয়ে।

জোসেফিন ম্যাকালউড বা জো, অথবা জয়া, বা নিবেদিতার প্রিয় ইয়ুম, নিজেকে স্বামীজীর বন্ধু বলে পরিচয় দিলেও তিনি ছিলেন স্বামীজীর অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁর বোনের মেয়ে ফ্রান্সিস্ তাঁর মাসীর রূপটি আঁকতে গিয়ে লিখলেন, "বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই জো-র জগতের সবকিছুই তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। এর জন্যই জো কোনদিন ওল্ড মেড হলেন না। তাঁর সাদা চুল, নীল চোখ এবং বাঁধা জীবনযাত্রার জন্য তাঁকে নারীঋষি বলেই মনে হত। প্যারিস ফ্যাসানের পোষাক পরিহিতা আধুনিকা থেকে জো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রতধারিণী নারী—ট্যাণ্টিন, জয়ানন্দ, সার্বজনীন আণ্ট,—পরিবারের নারী পুরোহিত।"[৩] জো-র মধ্যে মিশনারী রূপটি কেউ কেউ স্বামীজীর জীবনকালেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যেমন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "রাজ্ঞী জোসেফিন হয়েছেন সেণ্ট জোসেফিন।"[৪] স্বামীজীও কৌতুক করেছেন জো-র মিশনারী ভূমিকা নিয়ে। পত্রে লিখেছেন "জো জাপান থেকে ভারতে আসছেন, সঙ্গে ধর্মান্তরিত জাপানীগণ।"[৫] বিবেকানন্দের মতো অমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গও এই মহিয়সী নারীকে কম সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করেননি। জো-র প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর নানান্ পত্রে এ সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়। লিখেছেন, "সে খাঁটি মহিলা ষ্টেটস্‌ম্যান, সে রাজ্য চালাতে সমর্থ, কদাচিৎ অমন দৃঢ় অথচ মঙ্গলকর সহজবুদ্ধি দেখেছি।"[৬] কখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জো-কে জানিয়েছেন, "কেবল তুমি আমার ভার বহন করতে এবং আমার সকল নিষ্ঠুর বিস্ফোরণ সহ্য করতে সমর্থ।"[৭] নিবেদিতা তাঁর প্রিয় ইয়ুম সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে স্বামীজী বলতেন অন্যরা তাঁকে দেখার পর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু জো ব্যতিক্রম; সে আগেই ঈশ্বরীয়ভাবে পরিপূর্ণ। অন্যরা এসেছিলেন মহামানবের কাছে শান্তির আশায় কিন্তু বন্ধু জো এসেছিলেন তাঁকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও শান্তি দিতে।

প্রথমবার নিউইয়র্কে বক্তৃতার পর স্বামীজী

৩ এক অসামান্যা নারী, একটি পরিবার ও স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু, শারদীয়া যুগান্তর ১৩৮৬, পৃঃ ৪২

৪ Letters of Nivedita, vol. I, p. 348

৫ এক অসামান্যা নারী ও একটি পরিবার, পৃঃ ৩৬

৬ ঐ, পৃঃ ৩৭ ৭ ঐ, পৃঃ ৩৬

বিশ্রাম মানসে সহস্রদ্বীপোদ্যানে যান, এবং সেখান থেকে প্যারিসে যান তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু মিঃ লেগেটের সঙ্গে জোসেফিনের ভগ্নী বেটির বিবাহ উপলক্ষে। তারপর স্বামীজী লণ্ডনে চলে যান। ইতিমধ্যে জো তাঁর অনুগামী বিশ্বস্ত ভক্ত হয়ে উঠেছেন; তাই লণ্ডনে গিয়ে স্বামীজী সেই পরিচিত মুখখানি খুঁজছিলেন, "যে মুখ কখনও নিরুৎসাহের রেখা পড়ত না, যা কখনও পরিবর্তিত হত না আর যা সর্ব্বদা আমাকে সহায়তা করত এবং শক্তি ও উৎসাহ দিত।"[৮] লণ্ডন থেকে স্বামীজী গুডউইন ও সেভিয়ার-দম্পতির সঙ্গে ভারতে ফিরে যান।

যুগাচার্য বিবেকানন্দকে জো জীবনের সত্য-স্বরূপ বলে জেনেছিলেন। তাই স্বামীজীর প্রিয় স্বদেশ ভারতে আসার জন্য স্বামীজীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। উত্তরে স্বামীজী তাঁকে স্বাগত জানিয়ে, এটা লিখতে ভুললেন না যে, "কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত লোকের ছবি তোমায় সয়ে যেতে হবে; আমাকেও তুমি ঐরূপেই দেখতে পাবে। সর্বত্রই ময়লা ও নোংরা, আর সব 'কালা আদমী।'"[৯] তবে আশ্বাস দিয়ে এও লিখলেন, "তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করার মতো লোক ঢের পাবে।...তোমার সঙ্গে বহু জায়গায় ভ্রমণ করবো এবং তোমার ভ্রমণকে সুখময় করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"[১০] সব অসুবিধা জেনেও জো ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁর অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুর জন্মভূমি ভারতকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন।

স্বামীজীর সম্মতি পাওয়ার পর জো ১২ জানুআরি মিসেস্ ওলি বুল (ধীরামাতা) ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে যাত্রা করে লণ্ডন ও রোম হয়ে ১২ ফেব্রুআরি ১৮৯৮ বোম্বে পৌঁছান। এরপর তাঁরা কলকাতা এসে পৌঁছালে স্বামীজী নিজে স্টেশনে উপস্থিত থেকে তাঁর বিদেশিনী-ভক্তদের অভ্যর্থনা জানান। কলকাতা পৌঁছবার পর স্বামীজী নিবেদিতার সঙ্গে এই দুই নারী-ভক্তকে বেলুড় মঠের নতুন বাড়িতে রাখেন। এখানে গঙ্গাতীরের ঐ ছোট বাড়িটি বিদেশিনীদের অতি প্রিয় ছিল। এখানে তাদের আচার্যদেব দিনের পর দিন তাঁদের কাছে বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এই সময়কার স্মৃতিচারণে ম্যাকলাউড বলেছেন, তিনি যখন রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ বর্ণনা করতেন "তখন মনে হইত আমাদের চারিদিকে যে মহাজাগতিক শক্তিসমূহ বর্তমান, সেইগুলির উৎস উন্মোচন করিয়া তাহারই ভিতর তিনি বর্তমান আছেন।"[১১] স্বামীজী এই পাশ্চাত্য মহিলাদের 'জীবন্তবেদান্তী' আখ্যা দিয়েছিলেন। বলতেন, "তোমরা যখন কোনও জিনিসকে সত্য ব'লে বিশ্বাস কর তা নিয়ে স্বপ্ন না দেখে তোমরা তাকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে তোল, সেইটাই তোমাদের শক্তি"[১২] বেলুড়মঠে থাকাকালীন স্বামীজী পাশ্চাত্যশিষ্যাদের শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, এবং শ্রীশ্রীমাও তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেছিলেন বলে অত্যন্ত আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা এঁদের সঙ্গে আহারও করেছিলেন। গোপালের মাও স্বামীজীর পাশ্চাত্যশিষ্যাদের আদর করে তাঁর গৃহে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সেদিন প্রাচীন ভারত ও আধুনিক পাশ্চাত্যের

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৭।২৯০

৯ ঐ, পৃঃ ৭৩৮ ১০ ঐ, পৃঃ ৩৬৮

১১ Raminiscences of Swami Vivekananda, 2nd Edition, p. 240

১২ ঐ, p. 240

অলৌকিক মিলন সম্ভব হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিতে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে স্বামীজী নিবেদিতা ও ধীরামাতার সঙ্গে জো-র কাশ্মীরযাত্রা। হিমালয়ের পথেও স্বামীজী ভারতের স্বকীয়তা, তার আধ্যাত্মিক ভাবধারা, দর্শন ইত্যাদি বিদেশিনী নারীদের হৃদয়ে চিরকালের জন্য অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন।

জো-র স্বামীজীর পূতঃসঙ্গ লাভ ঘটে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময়, ক্যাটস্‌কিল পর্বতের মধ্যস্থলে হাড্‌সন নদীর তীরে রিজলী-ম্যানরে লেগেট দম্পতির গৃহ। বিশ্ববিজয়ের পর রণক্লান্ত সন্ন্যাসী তখন প্রকৃতির শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী। সেখানে দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হয়েছে এই বেদান্তকেশরীর প্রাণস্পর্শী ধর্মশাস্ত্রব্যাখ্যা শোনার জন্য। তাঁর ভক্ত-শিষ্য ও গুরু-ভাইরা উপস্থিত রয়েছেন। জো সেখানেও সকল বিষয়ে স্বামীজীর সাহায্যকারিণী। স্বামীজীর ন্যায় সিংহমানব তাঁর জো-র মতো ভক্ত-বন্ধুর পরামর্শে একান্ত নির্ভরশীল

রিজলীম্যানরে থাকাকালীন, ভ্রাতা টেলরের আসন্ন মৃত্যুর খবর পেয়ে, ম্যাকলাউড দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় গমন করেন। সেখানে কয়েক-দিনের মধ্যেই ভ্রাতার মৃত্যু হয়। মিসেস্ ব্লজেট নাম্নী এক বৃদ্ধার গৃহে তাঁর ভ্রাতা অবস্থান কর-ছিলেন। বৃদ্ধা শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, "যদি এই পৃথিবীর মাটিতে কখনও কোন ভগবান থাকেন তবে ইনিই তিনি।"[১৩] স্বামীজী দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার লস্ এঞ্জেলসে এঁর গৃহে বেশ কয়েকদিন ছিলেন এবং সেইসময় জো-ও সেখানে থাকতেন। বৃদ্ধার হুবহু স্বামীজীর একটি বড় প্রতিকৃতি ছিল, পরে ম্যাকলাউড সেই ছবিটি রিজলিম্যানরে তাঁর ঘরে সযত্নে রেখেছিলেন। জো উত্তর ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার লস্ এঞ্জেলস্ ইত্যাদি স্থানে স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার 'হোম অফ ট্রুথে' 'ন্যাজা-রেথ জেসাস' ( Nazareth Jesus ) বিষয়ক বক্তৃতায় দৈব-মুহূর্তের সাক্ষী জো। তাঁর অভিজ্ঞায় এই সর্বোত্তম ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের "সমগ্র দেহ এক শুভ্র আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল—তিনি খ্রীষ্টের শক্তি ও মহিমার বিস্ময়ের মধ্যে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন।"[১৪] জো নিজেও জ্যোতির উদ্ভাসে অভিভূত হয়ে পড়েন। জো দর্শন করেছেন উচ্চভাবসমূহের সুউচ্চ শিখরে বক্তৃতা প্রদানের পরই আবার এই মহাযোগী কেমন করে কত সহজে নিম্নতর পৃথিবীর দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে নিজেকে নামিয়ে আনতে পারতেন। কখন তিনি রান্নাঘরে ঢুকে ভারতীয় রান্না প্রস্তুতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন বা হাস্যপরিহাসে ভক্তবৃন্দের মধ্যে হাসির ঢেউ তুলতেন। মহা-পুরুষের দিব্যসান্নিধ্য যেমন জো-কে নতুন জীবন-যাপনে, 'ওঁ' এই মহাশব্দের উপর ধ্যানে নিমগ্ন হতে, এবং পরবর্তী জীবনে তাঁর আরব্ধ কাজ রামকৃষ্ণ-মিশনের বেদান্ত প্রচারকার্যে সহায়তা করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, তেমনি স্বামীজীও জো-র মধ্যে পেয়েছিলেন এক প্রখর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না, বুদ্ধিমতী, পরামর্শদায়িনী সমুন্নতচরিত্রা নারী; যিনি নিঃস্বার্থ, ভগবৎপ্রেমী, পূর্ণসেবা-পরায়না ও নবীন ভারতগঠনে সহায়িকা। সেজন্যই যখন স্বামীজী ও নিবেদিতা নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য বহু বাধার সম্মুখীন হন, তখন স্বামীজী উল্লেখ করেছিলেন যদি ধীরামাতা ও জো এখানে ভারতে এসে বাস করেন তাহলে

১৩ Reminiscences of Swami Vivekananda, 2nd Edition, p. 245

১৪ ঐ, p. 246

ভারতের নরনারী উজ্জীবিত হবেন, কারণ তাঁদের পবিত্রতার স্পর্শ ভারতবাসীর দেহ ও আত্মাকে উন্নত করবে। এই আত্মভোলা সন্ন্যাসীকে পাশ্চাত্যে আধুনিক নরনারীর সভায় উপস্থিত হবার প্রাক্কালে, জো তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে ভুলতেন না। কোথাও বক্তৃতা দেবার জন্য সময়মত ট্রেন ধরার সময়টির দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। আবার যখন স্বামীজী গভীর চিন্তামগ্ন ও নীরবতার মধ্যে সুষুপ্ত, জো ভাবছেন বোধ হয় কোন নতুন আলোকের সূত্রপাত এই সিংহের অন্তরে; তারপর বাস্তব পৃথিবীতে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সেবা-যত্নে ও হাস্য-পরিহাসে বিশ্রাম উপভোগ করার সুযোগ এনে দিতেন এই নারীই। স্বামীজী তাই জো-কে চিঠিতে লিখেছেন, "জো লণ্ডনে কোন কাজ হবে না, কারণ তুমি এখানে নেই। তুমিই দেখছি আমার নিয়তি।"[১৫] বিবেকানন্দ তাঁর চিঠিপত্রে নিবেদিতা, মিসেস্ বুল, মেরী হেল ও ম্যাকলাউডের কাছেই নিজেকে সর্বাধিক উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত ও মর্মস্পর্শী চিঠিখানি অ্যালামেডা থেকে জো-কে লেখা, যেখানে তিনি স্মৃতিরোমন্থন করেছেন অতীতের সেই অতি আনন্দের দিনগুলির, যখন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে বালক নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহচ্ছায়ায় পরমপুরুষের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত ও বিভোর হয়ে যেত। স্বামীজী লিখেছেন, "বন্ধন সব খসে যাচ্ছে,···কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর আহ্বান!—'তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়।' যাই প্রভু যাই!···আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি।··· শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—প'ড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!"[১৬] রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক চিহ্নটির ব্যাখ্যাও স্বামীজী জো-র কাছেই প্রথমে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন।

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের শেষপর্বে প্যারিসে জো-র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে মাদাম কালভে ও জো-র সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য যাত্রা স্বামীজীর শেষ বিদেশ ভ্রমণ। সেখানেও জো স্বামীজীকে নানাভাবে সাহায্য ও দেখাশোনা করেছেন। যখন স্বামীজী তাঁর মাতৃভূমি স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য মুহূর্ত মধ্যে মনস্থির করেছেন, তখনও জো প্রশ্নমাত্র করেননি বা বাধা দেননি; নীরবে তাঁর প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করতে সাহায্য করেছেন। জো জাপানে গিয়ে ভারত ও তার বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কথা প্রচার করেছেন এবং স্বামীজীর বেদান্ত ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে স্বামীজীর জাপান যাওয়া হয়ে ওঠেনি। জো সঙ্গে করে জাপানের বিখ্যাত শিল্পী ওকাকুরাকে ভারতে নিয়ে এসেছেন এবং ওকাকুরা স্বামীজীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। জো-ই স্বামীজী ও ওকাকুরার মধ্যে অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র।

জো জাপান ঘুরে কলকাতায় আসেন। এই সময় তাঁর আরাধ্য বিবেকানন্দের সঙ্গে শেষ সাক্ষাত। সে-বারেই বেলুড় মঠে স্বামীজী জো-র কাছে বলেছেন: "আমি চল্লিশ পেরোবো না।

১৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৮।৫৯

১৬ ঐ, ৮।১৩২

…আমার যা কিছু বলার ছিল সে সবই বলা হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই হবে।"[১৭] অন্তরঙ্গদের মধ্যে জো-ই ছিলেন সবচেয়ে সাহসী, তাই তিনি বললেন, "আপনি যাবার জন্য এত উতলা কেন?" উত্তরে তিনি বললেন: "বড় গাছের ছত্রছায়ায় ছোট গাছ বাড়তে পারে না। আমাকে চলে যেতে হবে কারণ অপরকে বাড়তে দিতে হবে।"[১৮]

[ক্রমশঃ]

১৭ Reminiscences of Swami Vivekananda, 2nd Edition, p, 248

১৮ ঐ, ঐ, ঐ

# বিবেকানন্দ প্রণাম

শ্রীপ্রদোষকুমার পাল

বাংলা মায়ের রত্ন তুমি মোদের তুমি প্রাণ
জনম লগ্নে আজকে মোরা তোমায় করি ধ্যান।
তোমার নামের মাঝেই আছে—একই বীণার সুর
বিবেক মাঝেই আছে আনন্দ সুর বাজে সুমধুর।
ঠাকুরের তুমি যোগ্য শিষ্য মানব সেবার কাজে
দেশের আসন করলে শ্রেষ্ঠ এই ধরারই মাঝে।
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম ও বাণী জগৎবাসীর কাছে
স্থাপিলে তুমি অতি সহজেই, জগৎ সভার মাঝে।
মানুষের মাঝে ভেদাভেদ নাই শোনালে তোমার বাণী
তোমার মন্ত্রে দূরে সরে যায় মানব মনের গ্লানি।
জীবের মাঝেই আছেন ঈশ্বর তোমার মুখের গান
সেই জীবেরই প্রেম মাঝে রয় সেবারই ভগবান।
দেশ গঠনে তোমার বাণীতে রয়েছে গভীর শিক্ষা
আজ শুভদিনে আমরা সকলে নিয়েছি তোমার দীক্ষা।
প্রণাম লহ গো মোদের আজিকে হে প্রভু বিবেকানন্দ
তোমারই বাণীতে মানব সেবায় লভি যেন প্রেমানন্দ।

# শতাব্দীর আলোকে বিজ্ঞানী আর্যভট্ট

শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

ভারতে জ্যোতিষ চর্চার প্রথম পথপ্রদর্শক আর্যভট্ট ছিলেন এক অনন্য প্রতিভা। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি ছিল। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি তিনি পরম নিষ্ঠা সহকারে আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি একসময় তাঁকে বিজ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। শুধু তাই নয়, ঐ দুই শাস্ত্রে তাঁর অনিঃশেষ অধিকার এবং পাণ্ডিত্য সমকালীন ভারতে দৃঢ় বিস্তৃত হয়েছিল। কেবল প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চেতনাকেই নয়, জাতির জীবন-সাধনাকেও উদ্বোধিত করেছিলেন আর্যভট্ট। তাঁর যুগান্তকারী জনপ্রিয়তার উৎস এখানেই।

জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে আর্যভট্টের মতো অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সমকালীন ভারতে আর কারুর ছিল না। গ্রীকবাসীদের কাছে তিনি 'অর্দ্ধ বেরিয়স' নামে পরিচিত ছিলেন। সে যুগের আরববাসীরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন, 'অর্জভর' অথবা 'আরজভজ'। এই থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, একটি বিশেষ যুগে আর্যভট্টের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিজ্ঞান তাপস আর্যভট্টের জন্ম ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৯৮ শকে*। জন্মস্থান, কুসুমপুর। কুসুমপুর বলতে বর্তমান বিহার রাজ্যের পাটনা সহর। উপযুক্ত বয়সে তিনই ভারতে প্রথম জ্যোতিষ গণনার প্রচলন শুরু করেন। তাঁর 'কুট্টক বিধি' গ্রন্থটি অনুধাবন করে তৎকালীন বিদেশী পণ্ডিতেরা বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন।[১]

আর্যভট্ট এবং তাঁর পরবর্তী যুগের বেশ কিছু সময় ভারতবাসীদের জ্ঞান ও গরিমা দূর-বিস্তৃত হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় ভারতবাসীর স্থান ছিল অতি উচ্চে। বিখ্যাত আরবীয় দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং তত্ত্ববিদ্ জাহিদ তাঁর একটি আখ্যায়িকায় ভারতবাসীকে উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে লিখেছেন,—"ভারতবাসীরা চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। অঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থপতি বিদ্যায় তাঁদের তুলনা নেই। তাঁরা দাবা খেলার আবিষ্কারক। এছাড়া সুন্দর শিলাশোভিত তালোয়ার নির্মাণে অতিশয় নিপুণ। শুধু তালোয়ার নির্মাণ কার্য্যেই তাঁদের শিল্প-নৈপুণ্য সীমাবদ্ধ নয়, তালোয়ার চালনার ক্ষেত্রেও, তাঁরা সমান পারদর্শী। মন্ত্রবলে তাঁরা বিষ ও বেদনা নির্মূল করতে পারেন। তাঁদের বাদ্য-সঙ্গীত অতীব মধুর। বাদ্য-যন্ত্রের নাম 'কঙ্কলা'। যন্ত্রটি দেখতে তানপুরার মতো। বাদ্য-ধ্বনিও অনেকটা তানপুরা বা কিছুটা শাঁখের মতো। নানা ধরনের নৃত্য এদেশে প্রচলিত আছে। কবি ও বক্তা হিসাবে এদেশের লোকেরা কোন অংশে কম নয়। দর্শন ও নীতি-শাস্ত্রে তাঁরা সুপণ্ডিত। সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি তাঁদের প্রবল। চীনাদের তুলনায় তাঁরা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের আকৃতি দীর্ঘকায় এবং সুশ্রী। গন্ধ-দ্রব্যের প্রতি তাঁদের একটা বিশেষ রুচি আছে! দেশের-রাজপুরুষেরা মৃগনাভি ব্যবহার করেন। ফলিত-জ্যোতিষের আবিষ্কারক তাঁরা। তাঁদের রমণীরা সঙ্গীত নিপুণা।"

জাহিদ ছাড়াও সমকালীন যুগের অপর

* আর্যভট্টের জন্মকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু কিছু মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রখ্যাত দার্শনিক ও তত্ত্ববিদ্ কোলব্রুকের ( Colebrooke ) মতে আর্যভট্টের জন্মকাল ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দ। ( Essay on Hindu Astronomy )

একজন পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক তাকির্ত্তবী আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ভারতবাসীরা উদার ও বুদ্ধিমান। তাঁরা যেকোন জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের জ্যোতিষ গণনা অনেকাংশে নির্ভুল। 'সিদ্ধান্তে' (আর্য সিদ্ধান্ত) তাঁদের প্রতিভা চরম বিকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থটির দ্বারা গ্রীক ও ইরানীয়গণ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন। এছাড়া চিকিৎসা বিদ্যায় ভারতবাসীর সূক্ষ্মদৃষ্টি অত্যন্ত বিস্ময়জনক। 'চরক' ও 'নাদন' এই দুটি তাঁদের প্রধান চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আরও অনেক গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলি সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। তর্ক ও দর্শনশাস্ত্রেও তাঁরা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। রচনাগুলি মূল্যবান।"[১] তাকির্ত্তবী একদা ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন। আনুমানিক ২১৮ হিজরী* সনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অপর একজন আরবীয় পণ্ডিত আবু জেইদ সেইরাফি (তৃতীয় হিজরীর শেষ ভাগে আবির্ভূত) ভারত সম্পর্কে লিখেছেন, "ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ। তাঁদের মধ্যে যাঁরা কবি তাঁরা রাজপ্রাসাদে ধন্য হয়েছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ এবং ঐন্দ্রজালিক আছেন।"

আর্যভট্টের সময়কালে ভারতে বীজগণিত চর্চার যে রকম উন্নতিসাধন হয়েছিল তা থেকে অনুমিত হয়, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে এদেশে বীজগণিতের চর্চা অব্যাহত ছিল। ঐ সময় আরব-বাসীরা এদেশ থেকে বীজগণিত আয়ত্ত করে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়। ভারত থেকে হিন্দু গণিত তাঁরা স্বদেশে নিয়ে যায় ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় খালিফ অল মনশুর (৭৫৪—৭৫) ছিলেন আরবের সম্রাট। একই সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র' আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। খালিফ অল এর নাম অনুসারে বীজগণিতের ইংরেজী নামকরণ হয়, এলজেব্রা (Alzebra)। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে লিওনার্দো (Leonardo of Pisa) ইউরোপে প্রথম বীজগণিতের প্রচলন শুরু করেন; কিন্তু এর বহু পূর্বে আর্যভট্ট, শ্রীধরাচার্য, ভাস্করাচার্য প্রমুখ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাঁদের সুমহান্ কীর্তি-আলোকে স্বদেশের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন।[২] 153763

আর্যভট্টের 'আর্যভট্টীয় তন্ত্র' রচনাটি চার ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) গীতিকা পাদ, (২) গণিত পাদ, (৩) কালক্রিয়া পাদ ও (৪) গোল পাদ। প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ গীতিকা পাদে এক মহাযুগের গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির ভগন—সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ 'গণিত পাদ'-এ পাটীগণিত বিষয়ে আলোচনা আছে। এখানে একক, দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যার বিশদ বিবরণ আছে। বিভিন্ন গাণিতিক তত্ত্ব, যথা,—বর্গমূল, ঘনমূল, বৃত্ত, সমীকরণ ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ 'কালক্রিয়া পাদ'-এর আলোচ্য বিষয় বলতে,—কাল ও ক্ষেত্র। এই অধ্যায়ে সময়, দিন, মাস, বছর প্রভৃতির বিবরণ আছে, যথা—

৩০ দিনে = ১ মাস
১২ মাসে = ১ বছর
১ দিন = ২৪ নদী (ঘণ্টা)

চতুর্থ অধ্যায়, 'গোল পাদ'-এর উপজীব্য বিষয় বলতে, গোল গণিত। এই অধ্যায়টি গণিত প্রসঙ্গে কতকগুলি বিচার সিদ্ধান্তের মূল্যবান

১ হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা, ডঃ সুকুমার রঞ্জন দাশ, বিশ্ব বিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
২ ঐ,
* হজরত মহম্মদ যেদিন মদিনা যাত্রা করেছিলেন, সেই দিনটি হতে গণিত চান্দ্র অব্দ, অর্থাৎ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ

সংযোজন। এই অধ্যায়টিকে পৃথক একটি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয় না। আলোচ্য অধ্যায়ে আর্যভট্ট প্রমাণ করেছেন, পৃথিবী স্বীয় কক্ষে আবর্তন করতে করতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই মতবাদের তিনিই প্রথম আবিষ্কারকর্তা। তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থে তিনি ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যার পরিবর্তে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণমালার ব্যবহার করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থটি এক কালজয়ী রচনা।[৩]

কালের যেরূপ বিভাগের উপর হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাকে 'কেলাপ' ( kalap ) বলে। পৌরাণিক যুগের মতো একটি বিশেষ যুগেও হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন যে, চন্দ্র, সূর্য, শনিশ্চর প্রভৃতি গ্রহগুলি নভোমণ্ডলে একই সময়ে বিষ্ণুপদ বা বিষুবরেখা ও অয়ন মণ্ডলের সংযোগ স্থলে ( vernal equinion ) আবির্ভূত হয় এবং একই সময়ে আবর্তন শুরু করে। হাজার হাজার বছর পরে এই সপ্ত গ্রহ একই স্থানে মিলিত হলে মহাপ্রলয় হবে এবং পুনরায় বিশ্বের সৃষ্টি হবে। এই দুয়ের অবস্থার মধ্যবর্তী সৌর বৎসরগুলিকে কেলাপ বলা হয়। জ্যোতির্বিদ্ ব্রহ্মগুপ্তের* মতে, একটি 'কেলাপ' চারশো বত্রিশ কোটি বছরের সমান। লক্ষ কোটি হিসাবে গণনা দুরূহ বলে আর্যভট্ট পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে গণনা সহজ-বোধ্য করার উদ্দেশ্যে কেলাপকে সহস্রভাগে বিভক্ত করেন, এবং অংশগুলিকে 'যগ' ও 'মহা-যগ' নাম প্রদান করেন [ 'যগ বা 'মহাযগ'— যুগ বা মহাযুগ ]। এই নীতি অনুসারে আরব-বাসীরা আর্যভট্টের গ্রন্থকে 'অরজভর' অথবা 'আরজভজ' ( Arjbahdh ) আখ্যা দিয়েছেন। 'যগ'-শব্দটিকে তাঁরা আর্যভট্টের যুগ বলেন। 'আরজভজ' অর্থে সহস্রতম অংশ,—গণনার একটি নিয়ম।[৪]

আর্যভট্ট রচিত মোট তিনটি রচনার এযাবৎ সন্ধান পাওয়া গেছে। 'আর্যভট্টীয় তন্ত্র' ছাড়া আরও দুখানি গ্রন্থের নাম, (১) 'দশ গীতিকা-সূত্র', (২) 'আর্যাষ্টশত'। শেষের গ্রন্থটিতে গণিত বিদ্যা সম্পর্কে একটি বিশেষ অধ্যায় আছে। এই গ্রন্থগুলি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে রচিত।

জ্যোতিষ বিদ্যায় আর্যভট্ট ছিলেন তাঁর যুগে একমাত্র বিশেষজ্ঞ। তাঁর আবির্ভাবের এক হাজার বছর পরে ইউরোপের কোপার্নিকাস* দিন রাত্রির প্রকার ভেদ সম্পর্কে গবেষণা করে পৃথিবীর আবর্তন তত্ত্বটি স্বীকার করেছিলেন।

উত্তরকালে ভারতে আর্যভট্ট বা আর্যভট নামে

৩ জীবনীকোষ ( ভারতীয় ঐতিহাসিক ), নারায়ণ ভক্ত।

* ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় ব্রহ্মগুপ্ত একজন স্মরণীয় পুরুষ। ভারতের জ্যোতিষী পণ্ডিতদের মধ্যে আর্যভট্ট, বরাহমিহিরের পরে তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লেখা 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। ৫৫০ শকাব্দ গতে শ্রীব্যাঘ্রমুখে নৃপতির রাজ্য শাসনকালে জিষ্ণুপুত্র ব্রহ্মগুপ্ত ত্রিশ বছর বয়সের সময় 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মগুপ্তের জন্মকাল ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ ( ৫২০ শক ) বলে অনুমিত হয়। তাঁর আর একটি গ্রন্থ 'খণ্ড খাদ্যক'। আলবীরুণী ব্রহ্মগুপ্তের রচনা পাঠ করেছেন। আরবীয়গণের নিকট তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রন্থটি 'সিন্দ হিন্দ' নামে খ্যাত ছিল। ( ভারতকোষ ৫ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা, পৃঃ ১৯১ )

৪ ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিতের ইতিহাস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী, আষাঢ় ১৩১০

* নিকোলাই কোপার্নিকাস ( ১৪৭৩-১৫৪৩ ) একজন বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। তিনি পোলাণ্ডের অধিবাসী। টল্লাস ও গ্যালিন প্রতিষ্ঠিত ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে পরিত্যাগ করে তিনি সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অপর একজন বিজ্ঞানী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আর্যভট্ট নামে পরিচিত। তাঁর আবির্ভাব কাল, ৮৭২ শক। তিনি প্রথম আর্যভট্টের গ্রন্থ অবলম্বনে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম, 'আর্য সিদ্ধান্ত'। এই দ্বিতীয় আর্যভট্ট সুপণ্ডিত আলবীরুণীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনিই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি আবিষ্কার করেন। অনেকে তাঁর সঙ্গে প্রথম আর্যভট্টকে পৃথক করে দেখেন না। অবশ্য এরূপ অনুমান নেহাৎই যুক্তিহীন। একই নাম হলেও তাঁরা দুজন যে পৃথক ব্যক্তি, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৫]

জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে ভারতের মহাবিজ্ঞানী আর্যভট্টের মৌলিক অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সূত্র ধরে উত্তরকালের বৈজ্ঞানিকেরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান করেছেন। বিশেষ করে জ্যোতিষ চর্চার ক্ষেত্রে এই মহাবিজ্ঞানী প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে আজও বিশ্ববরেণ্য, এক কালজয়ী পুরুষ।

৫ ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিতের ইতিহাস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী, আষাঢ় ১৩১০

# বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার: চতুর্থ দিনের কথা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

হেমচন্দ্রের কাছে আবার যাই ২০ এপ্রিল, ১৯৭৮। উনি খাটের উপর বসেছিলেন। একটি বিশ-বাইশ বছরের যুবক ওঁকে একটি চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন: 'বসুন'। মুখে দেখলাম স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। বুঝলাম বিরক্তির কারণ ঐ চিঠিটি। খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন: 'তোষামোদ আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। এই একজন আমাকে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছেন। উনি স্বাধীনতা-আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করছেন। আমাকে লিখেছেন: "ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের আপনি জীবন্ত সাক্ষী। শুধু জীবন্ত সাক্ষী নন—আপনিই জীবন্ত ইতিহাস।" আহাম্মক আর কাকে বলে! ভাবছেন এসব শুনলে আমি গদগদ হয়ে যাব। আমার কাছে তিনি আসবেন, আমার কথা টেপ-রেকর্ড করবেন। আমার অনুমতি চেয়েছেন। যত সব চাটুকার, বাক্যবাগীশ। এঁরা লিখবেন ইতিহাস!'

আমি: ওঁকে আপনি আসতে বলবেন না?

হেমচন্দ্র: না, কখনও না। বিশেষণ দিয়ে ইতিহাস হয় না। উনি কি লিখবেন সে আমার জানা হয়ে গিয়েছে।

ওঁর বিরক্তি আর রাগ দেখে আর ঐ প্রসঙ্গে কোন কথা বললাম না। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললাম: স্বামীজীর সঙ্গে আপনাদের যে কথা হয়েছিল, বিশেষ করে স্বামীজী আপনাদের কি বলেছিলেন তা যদি একটু বলেন।

গত কয়েকদিনে বুঝে গিয়েছিলাম ওঁর দুর্বলতা বিবেকানন্দ এবং তাঁর কথা। এখন

আবার বুঝলাম, আমার বোঝায় ভুল হয়নি। স্বামীজীর প্রসঙ্গ তুলতেই নরম হয়ে গেলেন। শান্তভাবে বললেন : প্রায় পঁচিশ বছর আগে স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেনবাবুকে (ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে) স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের একটি বিবরণ লিখে দিয়েছিলাম। ভূপেনবাবু তা তাঁর স্বামীজীর উপর বই 'Swami Vivekananda : Patriot-Prophet'-এর মধ্যে দিয়েছেন। অবশ্য ভূপেনবাবুকে যা জানিয়েছিলাম তা স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ ছিল না। কিছু কথা আমি ইচ্ছে করেই ওখানে বলিনি। আমার মনে হয়েছিল ঐসব কথা লিখলে লোকে স্বামীজীকে ভুল বুঝবে। বলবে ধর্মনায়ক হয়ে তিনি কিভাবে হিংসার পথে, রক্তপাতের পথে আমাদের অনুপ্রাণিত করলেন—হোক না সে রক্তপাত বৃটিশের, যারা লুট করেছিল আমাদের স্বাধীনতা? স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন : 'যেভাবে পার, যে-প্রকারে পার মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচন করার ব্রতে নিজেদের নিয়োজিত কর।' লোকে বলবে : 'যেভাবে পার, যে-প্রকারে পার'—একথা স্বামীজী কেন বললেন? 'উদ্দেশ্যও যেমন মহৎ হবে, উপায়ও তেমনি মহৎ হতে হবে'—এতো স্বামীজীরই কথা। একটি কথা কূটনীতির, আরেকটি ধর্মনীতির। যাঁরা এসব প্রশ্ন তুলবেন তাঁদের জন্যে আমার বক্তব্য : তাহলে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে আপনারা কী বলবেন? শ্রীকৃষ্ণকে তো আমরা বলি স্বয়ং ভগবান, সাধারণ অবতারমাত্র নন। মহাভারতে এই ঘটনাগুলির পিছনে শ্রীকৃষ্ণের যে ভূমিকা আমরা দেখি সে-সম্পর্কে তাঁরা কি বলেন : জরাসন্ধবধ, ভীষ্মবধ, জয়দ্রথবধ, দ্রোণাচার্যবধ, কর্ণবধ এবং দুর্যোধনবধ? শ্রীকৃষ্ণের যে ধর্মরক্ষা ও ধর্মস্থাপনের 'মিশন' তার জন্যে এসবের প্রয়োজন ছিল। সেকথা হাজার হাজার বছর ধরে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলি এবং ধর্মধারকগণ তা প্রচার করে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনভাষ্য যে 'গীতা' যাতে তিনি অর্জুনকে নির্বিচারে শত্রুমর্দন করতে উৎসাহিত করছেন, আমি বলব প্ররোচিত করছেন, সক্রিয় সাহায্য করছেন, সেই গীতাই কিন্তু হিন্দুদের আজও সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় ঈশ্বরকল্প পুরুষ। শুধু তাই নয়। শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের চোখে স্বয়ং দেহধারী ঈশ্বর। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ঐ শ্রীকৃষ্ণের পুনঃপ্রকাশ। ক্ষমা, অহিংসা এসব সন্ন্যাসীর ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে তো ক্ষমা ও অহিংসার পরাকাষ্ঠা ছিলেন। কিন্তু তিনি তো সারা জাতটাকে গেরুয়া পরানোর জন্য আসেননি। সংসারীর ধর্ম নিশ্চয়ই নিজেকে রক্ষা করা, মা-বোনকে রক্ষা করা, প্রতিবেশীকে রক্ষা করা, সমাজ ও দেশকে রক্ষা করা। আমাকে যদি শত্রু আক্রমণ করে, আমার ধনসম্পত্তি দস্যুরা লুঠ করে, আমার মা-বোনকে অপমান করে, আমি তাদের কাছে অহিংসার বুলি কপচাব, তাদের সঙ্গে প্রেমে কোলাকুলি করব, না সর্বশক্তি দিয়ে ঐ আচরণের প্রতিরোধ করব? স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন : 'লুঠেরাদের মেরে ছিঁচে দেবে'। এই হল বীরবাণী। বীরধর্ম। বুদ্ধদেব সম্পর্কে স্বামীজী কত প্রশস্তি করেছেন, বুদ্ধদেবকে নিজের 'ইষ্ট' পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে বুদ্ধের অহিংসা ও ত্যাগের বাণীর সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগের নির্বিচার প্রয়াস ও তার বাস্তব রূপকে কঠোর ভাষায় ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন স্বামীজী। সে তো তাঁর 'রচনাবলী' থেকে আমরা জানতে পারি। ক্ষাত্রধর্ম যে যথার্থ ধর্ম ঈশ্বরের অবতার হয়ে তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত

দেখিয়ে গেছেন রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ। স্বামীজী ছিলেন তাঁদের সার্থক উত্তরসূরী। যাই হোক স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের বিবরণ আমি আপনাকে যে লেখাটা দেব ('স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' সম্পর্কে তাঁর লিখিত মন্তব্যের জন্য হেমচন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন: ২৬ মার্চ ১৯৭৮) তার মধ্যে পাবেন। ওর মধ্যে আপনি পাবেন স্বামীজীর এমন কিছু কথা যা স্বামীজীর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে আমি তখন জানাইনি। তাই ঐ সাক্ষাতের বিবরণের পুনরুক্তি আর এখন করছি না। আপনি যখন আমার কাছে এলেন এবং স্বামীজীর কথা শুনতে চাইলেন তখন আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্যে বসে আছি। সুতরাং লোকে যা ভাবে ভাবুক যুগাচার্যের কাছে আমি যা শুনেছিলাম, এতদিন যা কোথাও লিখিনি—যদিও মুখে অনেককে ইদানীং বলেছি—তা লিখে যাওয়া উচিত বলে মনে করি। তাই সে কথা আমার ঐ লেখায় আপনি দেখবেন।[১]

স্বামীজীর কাছে যা আমরা শুনেছিলাম তা থেকে বুঝেছিলাম সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয়ে কত গভীর দেশপ্রেম ছিল, ভারতের জন্য তাঁর হৃদয়ে কী গভীর যন্ত্রণা ছিল। দেখেছিলাম ভারতকে নিয়ে তাঁর কী বিরাট গর্ব, কী অহঙ্কার, কত স্বপ্ন! আবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের হীনম্মন্যতায় তাঁর কী নিদারুণ লজ্জা ও বিরক্তি! আজকের ভারতবর্ষের মানুষের, বিশেষ করে যুবক ও ছাত্রদের, জানা দরকার যে আমাদের দেশমাতৃকা কী বিরাট এক পুরুষকে, কত বড় এক দেশপ্রেমিককে প্রসব করেছিলেন। তাদের জানা দরকার চীন, রাশিয়া বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কাছে তাদের 'বৈপ্লবিক' এবং 'প্রগতিশীল' চিন্তার জন্য হাত পাততে হবে না। তাদের জানা প্রয়োজন অন্যত্র কোথাও কোন 'চেয়ারম্যান' অথবা কোন 'ম্যানিফেস্টোর' জন্যে তাদের বৃথা অন্বেষণ করে শক্তিক্ষয় করার প্রয়োজন নাই। ভারতের উন্নতির জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি তারা পাবে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে। বিদেশের কোন নেতার পথ ও আদর্শ অথবা বিদেশ থেকে আমদানী করা কোন 'ইজম' ভারতের কোন কাজেই আসবে না। স্বামীজী কঠোর ভাষায় আমাদের অন্ধ পরানুকরণকে সমালোচনা করেছেন। বলেছেন ভারতের মৌলিকতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, ভারতের ঐতিহ্য ও অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভারতবর্ষকে ইউরোপ বা আমেরিকা বানানোর চেষ্টা করলে তা হবে চূড়ান্ত হঠকারিতা। নেব আমরা নিশ্চয় যা আমাদের উন্নতির সহায়ক, যা আমাদের সমৃদ্ধির পরিপূরক। কিন্তু কখনও সেই নেওয়া নিজেদের ঐতিহ্যের বিনিময়ে নয়, নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে নয়। ব্রিটিশকে আমরা তাড়িয়েছি দেশ থেকে, কিন্তু শিখিনি কি কিছু তাদের কাছে, নিইনি কি কিছু তাদের থেকে? শিখেছি অনেক, নিয়েছিও অনেক। এই নেওয়ার কথা, শেখার কথা স্বামীজীই আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে নেব, কতটা নেব? সেটাই প্রশ্ন: তাও শিখিয়েছেন স্বামীজী। সেই কৌশল হল: স্বকীয়তাকে বিসর্জন না দিয়ে, যা কল্যাণকর, যা বলপ্রদ, যা জীবনপ্রদ তাকে গ্রহণ করা। নিবেদিতাও সে কথা

১ হেমচন্দ্র তাঁর ঐ স্বাক্ষরিত (তারিখ ২৩ এপ্রিল ১৯৭৮) প্রবন্ধটি আমাকে দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের শেষ দিন—২৬ এপ্রিল ১৯৭৮। প্রবন্ধটি বিখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে আমি দিই। তিনি তার অংশ বিশেষ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (৬ষ্ঠ খণ্ড) গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

আমাদের বলেছেন। নিবেদিতার মুখে বহুবার শুনেছি : 'India must grow in her own line of growth. India must remain India always and ever.' ( ভারতবর্ষকে তার স্বকীয় বিকাশের ধারাতেই এগিয়ে যেতে হবে। ভারত চিরকাল ভারতই থাকবে। ) এ আসলে স্বামীজীরই কথা নিবেদিতা তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। দেশের বর্তমান ঐতিহাসিকদের উচিত ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণে স্বামীজীর ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা। বৃটিশের অত্যাচারে ভারতবর্ষ যখন জর্জরিত, তখন স্বামীজী ভারতবর্ষকে কি দিয়েছিলেন তার যথার্থ মূল্যায়ন করা তাঁদের একটি পবিত্র দায়িত্ব। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে স্বামীজীর জীবন ও কর্ম প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর স্বাধীনতা চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। সে-সময় এদেশের মানুষের ভারতবাসী বলে কোন গর্ববোধ ছিল না। উল্টে ছিল হীনম্মন্যতাবোধ। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর বীর্যদৃপ্ত আবির্ভাব ভারতবাসীর মনে জাগ্রত করে দিয়েছিল নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে এক প্রবল গর্ববোধ যার ফলে উন্মোচিত হয়েছিল পরবর্তী জাগরণের ক্ষেত্র এবং সঞ্চারিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উজ্জ্বল আশা ও উদ্দীপনা। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ভারতবর্ষের মানুষ প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিল ভারতবর্ষ হীন নয়, ভারতবাসী নয় দুর্বল, সভ্যতা ও কৃষ্টির দিক দিয়ে নয় পাশ্চাত্যের চেয়ে কোন অংশে অনুন্নত, বরং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই সাংস্কৃতিক ঐক্যচেতনা একালের ভারতবর্ষে স্বামীজীরই দান। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের মানুষকে যেমন বোঝালেন ভারতবর্ষের সাহিত্যও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির কথা, শোনালেন তার ঐতিহ্যের গৌরবগাথা, তেমনি ভারতবর্ষের মানুষকেও সচেতন করলেন তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে, অবহিত করলেন তাদের আগামী সম্ভাবনা সম্পর্কে। পাশ্চাত্য শিখল ভারতবর্ষ ও তার মানুষদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হতে আর নিজেদের শক্তি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে চেতনা জাগল ভারতবাসীর মধ্যে। উঠল জাগরণের হুঙ্কার, জাগল স্বাধীনতার স্পৃহা, গাইল শেকল ভাঙার গান। অবশেষে তারই পরিণতিতে এল স্বাধীনতা। বিবেকানন্দ তাই ভারতের জাগরণের অগ্রদূত, স্বাধীনতার মন্ত্রচৈতন্যদাতা। তিনি ভারতের ঐতিহ্য, একতা, আবহমানতা ও শক্তির প্রতীক, বিগ্রহ।

কেউ কেউ স্বামীজীকে বলেন রিঅ্যাকশনারী; বলেন রিভাইভ্যালিস্ট; বলেন, স্বামীজী আসলে ছিলেন বুর্জোয়া এবং ধর্ম হল তাঁর ছদ্মবেশ। বলেন, ভারতের নবজাগরণের অগ্রগতিকে তিনি বিপরীত পথে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মের কথা বলে। একটা কথা ইদানীংকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন যে, ভারতবর্ষ যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল, পাকিস্তানের জন্ম হল, তার জন্যে অনেকাংশে দায়ী হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এঁরা বলছেন বিপ্লবী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল যে এই আন্দোলন বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রাথমিক দৃষ্টিতে এই তথ্যকে এক কথায় ভুল বলা যাবে না এবং ভয়টা সেখানেই। যা মিথ্যা বলে সঠিক জানা যায় তার সম্বন্ধে মানুষ সাবধান হতে পারে। কিন্তু মিথ্যার চেয়ে ভয়াবহ জিনিস হচ্ছে অর্ধ সত্য, যার মধ্যে কিছুটা সত্য রয়েছে। এটা সত্য যে স্বামীজীর প্রচারের ফলে হিন্দুধর্মের মরা গাঙে বান এসেছিল এবং পাশ্চাত্যে তাঁর একটি প্রধান পরিচয়ও ছিল তিনি

হিন্দু সন্ন্যাসী—'দি হিন্দু মঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া'। কিন্তু তখনকার পাশ্চাত্য দেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে আবার এও বলা হয়েছে যে তিনি বৌদ্ধ। আবার বলা হয়েছে তিনি রামমোহন রায়ের অনুগামী, এও দেখেছি। আবার বলা হয়েছিল : তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসী। কিন্তু ঐসব ঐতিহাসিকরা শুধু ঐ 'হিন্দু মঙ্ক্ অব্ ইণ্ডিয়া' এবং সে হিসেবে তাঁর প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকেই বড় করে দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্মের যে সার্বজনীন রূপ, যে বিরাট উদারনৈতিক দিক, যা অবশ্য হিন্দুধর্মেরই সত্যিকার রূপ, যার প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরু সর্বধর্ম সমন্বয়মূর্তি রামকৃষ্ণদেব, যার প্রতিফলন ঘটেছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মধ্যে, বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মধ্যে—সেই দিকটিকে এঁরা হয় দেখতে পাচ্ছেন না অথবা ইচ্ছা করে দেখছেন না। এইসব ইতিহাস লেখকরা খবর রাখেন কিনা জানি না যে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ সরকারের দিক থেকে বিশেষ রকম চেষ্টা করা হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করার। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সূত্রে ব্রিটিশ সরকারের এই চেষ্টার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের গোপন রিপোর্ট, শুধু উচ্চপদস্থ নয়, উচ্চতম ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সে-বিষয়ে মন্তব্য প্রভৃতি তিনি নিজে দেখেছেন বলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের অপরাধ মিশনে এমন অনেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে ছিলেন 'সন্ত্রাসবাদী'। তাছাড়া আরও বহু মানুষ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ছিলেন বিপ্লব-আন্দোলনের সমর্থক। তাঁরা ছিলেন মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, মিশনের ভক্ত, মিশনের শুভানুধ্যায়ী। ইংরেজ সরকার এও লক্ষ্য করেছিল বহু দেশপ্রেমিক শিক্ষিত যুবক, ছাত্র মিশনে যাতায়াত করে, মিশনের উৎসবে, বন্যাত্রাণ প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে। তারা বিবেকানন্দের ভক্ত। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের বদ্ধমূল ধারণা হল : রামকৃষ্ণ মিশনও গোপনে গোপনে বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি লালন করে এবং বিপ্লবীদের মদত যোগায়। রমেশচন্দ্র মজুমদার ব্রিটিশ সরকারের সেইসব গোপন রিপোর্ট স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, সেই রিপোর্টগুলির কোন জায়গায়, কোন সূত্রে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এ অভিযোগ করা হয়নি যে রামকৃষ্ণ মিশন অথবা তার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ অথবা তার সমকালীন কর্তৃপক্ষ কোনরকম সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। সহায়ক-তথ্য হিসেবে এটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ ডঃ মজুমদার দেখেছেন এই গোপন রিপোর্টগুলির বিষয়বস্তু স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বিপ্লবীদের উপরে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচণ্ড প্রভাব যা কিনা ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে বড় রকম আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যে রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করার কথা তাঁরা গুরুত্বসহকারে ভাবছিলেন এবং কি ভাবে তা করতে পারেন তার জন্য ফন্দি-ফিকির খুঁজছিলেন। সেক্ষেত্রে কূটনৈতিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে 'সাম্প্রদায়িকতার প্রচারক' এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে তার প্রতিষ্ঠাতার অনুগামী একটি 'সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান' আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করার কাজটি খুব সহজ হত। অথচ সে আখ্যা তাঁরা দিতে পারলেন না। উপরন্তু, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে শুনেছি

তিনি নিজে দেখেছেন বৃটিশের গোয়েন্দা পুলিশের গোপন রিপোর্টে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত ধর্মের উদারতা ও সার্বজনীনতাকে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অসাম্প্রদায়িক কাজকর্মকেই নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। অভিযুক্ত করতে গিয়ে এমন একটা বিরাট সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন তাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে যা এখন আমাদের কাজে লাগবে। ব্রিটিশের গোয়েন্দা পুলিশ এই তথ্যটিকে স্বীকার না করে পারেননি। তাই তাঁরা তাঁদের গোপন রিপোর্টে তা নথিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে-সব ঐতিহাসিক স্বামীজীকে তথাকথিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক আখ্যা দেন এবং ঊনবিংশ শতকের জাগরণকে মূলতঃ হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ বলেন যার ফলে পরবর্তিকালে ভারত খণ্ডিত হয়েছিল বলে থীসিস লেখেন তাঁদের এই বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। 'হিন্দু' অর্থে যদি সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে বোঝায় তাহলে নিশ্চয়ই স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের আগে এবং তাঁর সময়েও বিদেশের মানুষ 'হিন্দু' বলতে ভারতবর্ষের মানুষকে বোঝাত—সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক অথবা আর কিছু হোক—এবং 'হিন্দু' বা 'হিন্দুস্থান' বলতে ভারতবর্ষকে বোঝাত। যতদূর মনে পড়ছে বোধ হয় ট্রট্স্কির একটা লেখায় পড়েছিলাম যে তিনি লিখছেন একজন ভারতীয় মুসলমানের নাম, তারপর কমা দিয়ে লিখছেন 'A Hindu' (একজন হিন্দু)। স্বামীজী যদি হিন্দু জাগরণ ঘটিয়ে থাকেন তা সেই বৃহত্তর অর্থেই—সারা হিন্দু বা হিন্দুস্থানের জাগরণ। আমার অনেক মুসলমান বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন, অনেক মুসলমান বিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, শহীদও হয়েছেন। তাঁরাও তো আমাদের মতো স্বামীজীকে আদর্শ বলে জানতেন। আমি যে-সব বন্ধুদের নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম তার মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান—আলিমুদ্দিন, 'মাষ্টার সাহেব' নামে যাঁর পরে পরিচিতি হয়েছিল বেশি। তিনিও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন আমাদেরই মতো স্বামীজীরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে স্বামীজীর কি ধারণা ছিল, তাঁর স্বপ্নের ভবিষ্যৎ ভারতের জাগরণ যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাগরণ ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে তাঁর সরফরাজ হোসেনকে লেখা সেই বিখ্যাত চিঠিতে যেখানে তিনি বলছেন : 'For our own motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam —Vedanta brain and Islam body—is the only hope. I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body.' (আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির একমাত্র আশা হিন্দু ও ইসলাম এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ। আমি মানসচক্ষে দেখছি, এই সব বিবাদ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারতবর্ষ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহামহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছে)।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে যাঁরা বলেন তিনি তথাকথিত হিন্দুধর্ম প্রচার করতে বিদেশে গিয়েছিলেন তাঁরা মূর্খ। তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে প্রচার করতে। আর যদি ধর্ম প্রচার করে থাকেন সে ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। তাহল বেদান্ত যার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে ধর্মের সমগ্র রূপ, ধর্মের সার্বজনীন রূপ। তা কোন বিশেষ ধর্ম নয়, তাই হল 'ধর্ম' যা মানুষের অনন্ত

বিকাশের কথা বলে, সাহসের কথা বলে, সবাইকে আলিঙ্গন করতে শেখায়। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকলের জন্য সেই ধর্ম। বিবেকানন্দের সেই ধর্ম হচ্ছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ধর্ম। হিন্দুধর্মের কথা যেখানে তিনি বলেছেন সেখানে সেই হিন্দু-ধর্মকে বুঝিয়েছেন উদারতায় যা আকাশের মতো, গভীরতায় যা সমুদ্রের মতো। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম আসলে বিশ্বধর্ম। যে হিন্দুধর্মের রূপ আমরা সাধারণতঃ জানি সে ঐ হিন্দুধর্মের বিকৃত রূপ। আর হিন্দুধর্ম বলেও কোন ধর্ম তো আসলে নেই। 'হিন্দু' শব্দ তো একটা ভৌগোলিক শব্দ। সিন্ধু-নদের এদিকে যারা থাকত প্রাচীনকালে পারসি-করা, গ্রীকরা তাদের 'হিন্দু' বলত। তারা 'স' উচ্চারণ করতে পারত না। আমাদের ধর্মের সঙ্গে 'হিন্দু' শব্দটি জুড়ে গিয়েছে মুসলমান আমলে, প্রধানতঃ বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে। অন্য-ধর্মের সঙ্গে আমাদের ধর্মের পার্থক্য বোঝাতে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে তো 'হিন্দুধর্ম' বলে কোন ধর্ম পাই না, শঙ্করাচার্যও তো 'হিন্দুধর্ম' বলছেন না। যা আছে তা হল 'সনাতন ধর্ম', 'বেদান্ত-ধর্ম'। এসব তো ইতিহাস। আসলে যে-সব ইতিহাস লেখক স্বামীজীকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বলেন, হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট বলেন, রিঅ্যাকশ-নারী বলেন তাঁরা তা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বলেন। স্বার্থান্বেষী চক্রের এইসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াস-কে বানচাল করতে যথার্থ ও সৎ ঐতিহাসিকদের এগিয়ে আসতে হবে। এটা একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত এবং ভারতের প্রত্যেক বিবেকবান দেশ-প্রেমিক মানুষের উচিত সর্বশক্তি নিয়োগ করে একে ব্যর্থ করে দিতে উদ্যোগী হওয়া। যাঁরা বলেন স্বামীজী রিঅ্যাকশনারী তাঁদের কাছে আমার চ্যালেঞ্জ যে শুধু বর্তমান ভারতের ইতিহাসেই নয়, সারা পৃথিবীর আধুনিককালের ইতিহাসে স্বামীজীর চেয়ে বেশি প্রোগ্রেসিভ চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একজন মানুষের কথা কেউ আমাকে বলুন। আমি জানি, মুক্ত মন নিয়ে বিচার করলে একজনের কথাও তাঁরা বলতে পারবেন না।

বিবেকানন্দ একজন সাধারণ ধর্মগুরু ছিলেন না, একজন সাধারণ সন্ন্যাসী ছিলেন না। ছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, একজন শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী। কিন্তু সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় বলে অন্ততঃ আমি মনে করি। বিবেকানন্দ আমার চোখে পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। পৃথিবীর যেখানে যত দরিদ্র মানুষ আছে, শোষিত মানুষ আছে, অবহেলিত মানুষ আছে সকলের বন্ধু বিবেকানন্দ। যেখানে সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার, ঔপনিবেশিকতার শোষণ সেখানে বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠ সরব হয়ে উঠেছে। ভারত-বর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলে আসল আঘাতটি হেনেছিলেন তিনিই। তাই ব্রিটিশ সরকারের মহা উদ্বেগ ছিল বিবেকানন্দকে নিয়ে, তাঁর অনু-রাগী হাজার হাজার স্বদেশপ্রেমিক যুবকদের নিয়ে বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শে যারা হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে নেয়, ফাঁসির আগে যাদের শরীরের ওজন বেড়ে যায়। আর ব্রিটিশ সরকারের মহা উদ্বেগ ছিল বিবেকানন্দের দেহান্তের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনকে নিয়ে স্বদেশপ্রেমিক মানুষদের যা ছিল সেকালে একটি প্রধান প্রেরণাস্থল, অনেক স্বদেশী যেখানে আশ্রয় নিতেন চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে। আজকের বস্তুতান্ত্রিক ঐতিহাসিকদের কাছে স্বামীজীর ধর্ম প্রচারের ব্যাপারটা মনঃপুত না হতে পারে। কিন্তু একথা তো অনস্বীকার্য যে তাঁর যে মানবিকতা, মানুষকে উন্নত করার যে প্রয়াস, মানুষকে তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করা, তাকে সাহস

যোগানোর যে প্রচেষ্টা তা অসাধারণ। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের ধর্ম তথাকথিত ধর্ম নয়। তা মানুষের সার্বিক কল্যাণের কথা বলে এবং মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের যে সমস্যা তা লাঘব করার প্রয়াসী হতে মানুষকে প্রেরণা যোগায়। স্বামীজীর এই ধর্ম মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বিজ্ঞান। স্বর্গের কোন দেবতা নয়, মানুষই সেই ধর্মের কেন্দ্র। স্বামীজীর আদর্শের মধ্যে আমি খুঁজে পাই ম্যাক্সিম গোর্কির MAN-কে। আমি মনে করি না বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। তিনি যদি কোন কিছু প্রচার করে থাকেন তা হল পৃথিবীর সকল মানুষ এক আর প্রত্যেক মানুষ অমৃতের সন্তান, প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে পূর্ণের স্ফুলিঙ্গ। আর, আমি আগেই বলেছি, যদি কিছু তিনি প্রচার করে থাকেন তা হল ভারতবর্ষ। ধর্ম প্রচার তিনি করেননি, ভারতবর্ষকে প্রচার করেছিলেন তিনি।

স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন: 'তোরা মানুষ হ। মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীদের দেশ থেকে দূর করে দে। পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নাই, পরাধীন জাতির শ্রাদ্ধাধিকার নাই।' ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন: "বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি আমাকে ব্যাকুলভাবে বলেছিলেন, 'ভাই, সকলের আগে 'মানুষ' চাই। সত্যিকারের মানুষ। মানুষ না হলে কিছু হবে না। স্বাধীনতা পাঁচ বছর পরে আসবে, কি বিশ বছর পরে আসবে, কি পঞ্চাশ বছর পরে আসবে সেটা বড় কথা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বাধীনতা অর্জন করার যোগ্য আমরা হয়েছি কিনা, আরও বড় কথা স্বাধীনতা পেয়ে তা বজায় রাখতে পারব কিনা।'" বিবেকানন্দ তাই বলতেন 'Man-making is my mission'—প্রকৃত মানুষ গড়াই আমার ব্রত। স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও দেখছি স্বামীজী কতবড় সত্যি কথা বলেছিলেন। আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু 'মানুষ' হইনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু জাতি গঠন হয়নি।

আমার জ্যাঠতুতো ভাই বেলুড় মঠে সাধু হয়েছিল। তার নাম হয়েছিল স্বামী মোক্ষানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তার দীক্ষা হয়েছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সে আমাকে স্বামীজীর দুটি অসাধারণ ভবিষ্যৎ বাণীর কথা বলেছিল। সে বলেছিল যে স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বলেছিলেন 'আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অভাবনীয়ভাবে বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে এবং স্বাধীনতা লাভের পর চীনের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবে।' আমরা দেখেছি স্বামীজীর এদুটি ভবিষ্যৎবাণী কত অভ্রান্ত। আর আমাদের কাছে স্বামীজী যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তাও কম চমকপ্রদ নয়। স্বামীজী বলেছিলেন: 'পৃথিবীতে শূদ্র জাগরণ আসছে। সে জাগরণ প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং তারপর চীনে। তার পর পালা ভারতবর্ষের।'

এই অসাধারণ মানুষটিকে আমি দেখেছি। জীবনে আর দ্বিতীয় একজন মানুষকেও দেখিনি যাকে স্বামীজীর পাশে দাঁড় করাতে পারি। গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম যখন আমার দেখা হয় তখন দেখলাম তাঁকে সবাই প্রণাম করছেন। কিন্তু আমি করিনি। একজন সেবিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেন গান্ধীজীকে প্রণাম করার কথা। আমি বললাম: আমার এই দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমি স্বামী বিবেকানন্দের চরণ স্পর্শ করেছি। আমার এই দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আর কারও পা আমি স্পর্শ করতে পারব না। যে মস্তক স্বামী বিবেকানন্দের চরণতলে নত হয়েছে সে মস্তক, আর কোথাও নত হবে না। জীবনে কখনও আর কাউকে প্রণাম করিনি, আর কারও পায়ে মাথা নোয়াইনি।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দ

## স্বামী অশেষানন্দ

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ। আমি আর আমার বন্ধু নীরদ (পরবর্তিকালে স্বামী অখিলানন্দ) তখন কলকাতার সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে পড়ি। নীরদ একদিন আমাকে বলল: 'আজ তোমাকে একজন মহাপুরুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তিনি যে পবিত্রতার কথা মুখে খুব বেশি বলেন তা নয়।...কিন্তু পবিত্রতাই তাঁর জীবন।'

সেই সময় আমি খুব পাশ্চাত্য-' ছিলাম। আমি সেজন্য কোন হিন্দু কলেজে পড়তে যাইনি। স্বামী প্রভবানন্দ আর স্বামী বিবিদিষানন্দও তা-ই,—ওঁরা গিয়েছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের কলেজে। আমি যে কলেজটা বেছে নিয়েছিলাম—সেন্ট পলস্ কলেজ—সেটা ছিল আবাসিক কলেজ। সেখানে ফাদাররা পড়াতেন, তাঁদের প্রতি আজও আমি কৃতজ্ঞ। ছাত্ররা একসঙ্গে খেলাধুলো করতাম। অধ্যাপকদের সঙ্গেও নিঃসঙ্কোচে মিশতাম। তাসত্ত্বেও সেখানে কঠোর শৃঙ্খলা ছিল। কলেজে প্রথম প্রথম ভাবতাম, একটা কৃতী ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলব। এছাড়া ক্রিকেট আর টেনিস খেলতে আমি খুব ভালবাসতাম; ফুটবল আর হকিও ছিল। কাজেই, কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার পরিকল্পনা কখনই আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন অখিলানন্দ ঐ প্রস্তাব করলেন। তখন টেনিস খেলছিলাম। বললাম: এখন তো খেলছি, তবে খেলা শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। অখিলানন্দ ধৈর্য ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করলেন। খেলার পরে অখিলানন্দর সঙ্গে বলরাম বসুর বাড়ি গেলাম। সেখানেই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আমার প্রথম দর্শন।

তাঁর মতো একজন মহাপুরুষকে দর্শন করবার ফলেই আমি ত্যাগের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে অনুপ্রাণিত করলেন এই জীবনযাপন করতে—যাতে আমি ঈশ্বর উপলব্ধি করতে পারি। সেসব দিন কী সুন্দর কেটেছে। বলরাম-মন্দিরে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমায় একবার তাঁর সঙ্গে তাঁর ঘরে বসে ধ্যান করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেকথা আমি কখনও ভুলব না। মহারাজের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া একটা বড় হলঘর ছিল। সেখানে রামনাম হত। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আসতেন ঐ ঘরেই কলকাতার ভক্তদের দর্শন দিতেন। এই কারণে ঘরটির বিশেষ মাহাত্ম্য। মহারাজের সেবক ছিলাম না বলে সাধারণত আমি মহারাজের কাছাকাছি যেতে পারতাম না। মহারাজের ব্যক্তিগত সেবার কাজ যাঁরা করতেন, কেবল তাঁদেরই সুযোগ হত মহারাজের সঙ্গে ধ্যান করবার। সুধি্যি মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দ), ঈশ্বর মহারাজ, ভবানী মহারাজ, গোঁসাই মহারাজ—এঁরা সব মহারাজের সেবক ছিলেন এবং বলরাম-মন্দিরেই থাকতেন। কেষ্টলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) আমাকে স্নেহ করতেন, আমিও তাঁকে খুব ভালবাসতাম। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম: 'আমি কি মহারাজের সঙ্গে ধ্যান করতে পারি?' উনি বললেন: 'তুমি আসতে পার ধ্যান করতে; তবে খুব ভোরে আসতে হবে।' এখন আমার ঠিক মনে নেই কটার সময় পৌঁছেছিলাম ধ্যান করতে—পাঁচটা—সাড়ে পাঁচটা হবে সম্ভবত। গিয়ে দেখলাম, মহারাজ তাঁর ঘরে ধ্যানস্থ।

মহারাজকে চোখে দেখাই ছিল এক দুর্লভ

সৌভাগ্য। এ যেন বিশ্বহিতে ধ্যানস্থ শিবের দর্শনলাভ। মহারাজের মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভব করা যেত। তাঁকে দেখামাত্রই যে-কেউ পবিত্র হয়ে যেত। অখিলানন্দ তাঁর দীক্ষিত ছিল। এরকম অনেক সময় হত যে, আমি আর অখিলানন্দ হয়তো গেছি, মহারাজ বারান্দায় পায়চারি করছেন কিন্তু আমাদের দিকে তাকাচ্ছেনই না। তিনি তখন আর এক জগতে রয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ মহারাজ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠতেন: 'আরে, কখন এলি তোরা?' মহারাজ বলতেন যে, আমি নীরদের (অখিলানন্দের) ছায়া।···

অখিলানন্দকে খুব স্নেহ করতেন মহারাজ। একটা ঘটনা বললে সেটা বোঝা যাবে। আমি আর অখিলানন্দ দুজনেই ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলাম। তাই আমরা মুরগীর ডিম এবং আরও কয়েকটা জিনিস আগে কখনও খাইনি। কিন্তু হস্টেলে দেখলাম, অখিলানন্দ রোজ একটা করে মুরগীর ডিম খায়। আমি বললাম: 'তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণ। হিন্দু-রীতি অনুযায়ী তোমার কিন্তু মুরগীর ডিম খাওয়া চলে না। তুমি একেবারে সাহেব বনে গেছ।' অখিলানন্দ বলল যে, মহারাজ তাকে আদেশ করেছেন মুরগীর ডিম খেতে। মহারাজ বলেছেন: 'তোমার স্বাস্থ্য ভাল নয়; প্রোটিন দরকার। তুমি মাছ খেতে পারতে, কিন্তু মাছ তো আর কেউ সকালবেলার খাবারের সঙ্গে খায় না। তুমি বরং একটা করে মুরগীর ডিম খেও।' আমি তখন বললাম: 'ও, মহারাজ বলেছেন বলে খাচ্ছ!' আর কিছু বলতে পারলাম না।

এক সময় বলরাম বসুর বাড়িতে রামনাম হত। স্বামী অখিলানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ আর আমি তাতে যোগ দিতাম। আমরা তখনও ছাত্র। আর সেখানকার প্রসাদটাও খুব ভাল ছিল। আমি প্রসাদ পছন্দ করতাম। খুব শক্তসমর্থ ছিলাম তো; খেতেও পারতাম বেশ। ···যেদিনকার কথা বলছি, সেদিন মহারাজ (রামনামে) এলেন। তিনি যে সব সময়ই এ-রকম আসতেন, তা নয়। কয়েকজন সন্ন্যাসী সেদিন একসঙ্গে গান করছিলেন; আমরাও সঙ্গে যোগ দিয়েছি। মহারাজ আমাদের দিকে তাকিয়ে খুব উৎসাহভরে বললেন: 'চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও।' কিন্তু একটু পরেই স্বামী নির্বাণানন্দ লক্ষ্য করলেন যে, মহারাজ তাঁর নিজস্ব জগতে চলে গেছেন। তাঁর আর বাইরের কোন হুঁশ নেই। নির্বাণানন্দ মহারাজকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। মহারাজ সেখানে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ভাবস্থ হয়ে রইলেন। আমি অবশ্য এটা দেখতে পাইনি, আমাকে হস্টেলে ফিরে আসতে হয়েছিল। পরে অন্য সন্ন্যাসীদের মুখে শুনেছিলাম যে মহারাজ সেদিন বলেছিলেন: 'রামনাম আমাদের মনটাকে একটা উচ্চস্তরে তুলে দিয়েছে।'

মহারাজের সাহচর্য পেয়ে স্বভাবতঃই আমি তাঁকে খুব ভালবেসে ফেললাম। শেষ পর্যন্ত একদিন গিয়ে তাঁকে বললাম: 'আমার কিছু নির্দেশের প্রয়োজন।' মহারাজ বললেন: 'ঠিক আছে, এসো একদিন।' সেই অনুযায়ী একদিন গেলাম, কিন্তু সেদিন তিনি বললেন: 'আমার শরীরটা আজ ভাল বোধ হচ্ছে না; আর একদিন এস।' এই রকম কয়েকবার হল। শেষ পর্যন্ত মহারাজ নিজেই একটা দিন ঠিক করে দিয়ে আমাকে বললেন খুব সকাল করে যেতে। নির্দিষ্ট দিনে ভোর পাঁচটার সময় তাঁর কাছে যেতে হল। মহারাজ সেদিন আমাকে বললেন: 'সত্য এবং ব্রহ্মচর্য—এই দুটো জিনিস অভ্যাস কর। এর ফলে তোমার অন্তর্জীবন দৃঢ় হবে। তোমার জীবন ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত হবে।'

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমি স্বামী সারদানন্দের

সঙ্গে ছিলাম। আমি ছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত সেবক ও সচিব। স্বামী সারদানন্দই আমাকে একদিন বললেন : 'তুমি মহারাজের কাছে গিয়ে বল না তোমায় ব্রহ্মচর্য দিতে।' আমি বললাম : 'মহারাজ, কি করে তা বলব? আমি সঙ্ঘে যোগ দিয়েছি সবে ১৯২১-এ। সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ, যিনি সেই সময় সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং পরবর্তিকালে সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন) চান ব্রহ্মচারীরা আগে তিনবছর অপেক্ষা করুক, তারপর গিয়ে মহারাজের কাছে (ব্রহ্মচর্যের জন্য) বলুক।' স্বামী সারদানন্দজী বললেন : 'না, না, না। শুদ্ধানন্দ ওরকম নিয়ম করতে চাইতে পারে; কিন্তু আমাদের কাছে মহারাজই সব। মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তোমাকে ব্রহ্মচর্য দিতে পারেন। সেইজন্যই আমরা কোন রকম নিয়ম করিনি। একটা জিনিসই কেবল প্রয়োজন···মহারাজের অনুগ্রহ। তোমায় মহারাজের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে।'

আমি অন্য জায়গায়[১] বলেছি যে, আমি যখন মহারাজের কাছে গিয়ে ব্রহ্মচর্য প্রার্থনা করলাম মহারাজ মজা করে বলেছিলেন : 'আমাকে একশ আট টাকা দাও।' কিন্তু আমাকে কিছুই দিতে হয়নি। স্বামী সারদানন্দ এসে পড়েছিলেন—তিনিই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন।

যাদের ব্রহ্মচর্য হবে মহারাজ একদিন তাদের বেলুড় মঠে ডেকে পাঠালেন। আমাদের আচার্য ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে মহারাজ আমাদের বললেন : 'এই মন্ত্রগুলো তোমরা শুধু মুখে উচ্চারণ কর, অথচ কাজে কিছু কর না। তোমরা যে বারোটা ব্রত নিচ্ছ, সবগুলোর অর্থ তোমাদের জানা দরকার।' এই বলে যাদের যাদের ব্রহ্মচর্য হবে তাদেরকে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে গিয়ে মন্ত্রের অর্থ জেনে নিতে বললেন।

অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে মহারাজ ব্রহ্মচর্য-দীক্ষার্থীদের সবাইকে একসাথে ডাকলেন। আমাদের মধ্যে একজন এসেছিল শিলেট থেকে, সে গান গাইতে পারত। মহারাজ তাকে একটা গান গাইতে বললেন। সে 'অরূপ সায়রে লীলা-লহরী' এই গানটা গাইল। গানটিতে বলা হয়েছে যে, সেই পরমতত্ত্বের জগৎ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। মহারাজের খুব ভাল লাগল গানটা। সেখানে গোবিন্দ নামে একজন ছিল—এর পরে তার পালা এল। মহারাজ তাকে বললেন : 'আমি তোকে ব্রহ্মচর্য দেব যদি তুই নাচ করিস আর তার সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া গায়করা যেভাবে গান গায় সেভাবে একটা উড়িয়াগান করিস।' এখন, উচ্চাঙ্গ রীতি অনুযায়ী গান আর নাচ কখনও একসঙ্গে হয় না। বঙ্গদেশে যদিও এটা দেখা যায়, তথাপি একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-শিল্পীর নাচ করা উচিত নয়, এবং একজন উচ্চাঙ্গ নৃত্যশিল্পীরও গান করা উচিত নয়। যাই হোক, আমার যতদূর মনে আছে, গোবিন্দ নাচ-গান দুটোই একসাথে করেছিল। ব্যাপারটা একটু উদ্ভট—তাহলেও সে ভালই করেছিল। মহারাজ খুব মজা পাচ্ছিলেন আর হাসছিলেন। অন্য সময়ে মহারাজ সাধারণত গম্ভীর থাকতেন, উচ্চতর বিষয়ে ডুবে থাকতেন।

স্বামী নির্বেদানন্দকে[২] স্বামী সারদানন্দ একবার বলেছিলেন : 'আমি যদি কোন কিছু বলি,

১ দ্রষ্টব্য : Glimpses of a Great Soul—Swami Asheshananda, pp. 72-3

২ স্বামী নির্বেদানন্দ একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা এখন 'রামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হোম, বেলঘরিয়া' নামে পরিচিত।

তোমরা সেটা করতে চেষ্টা কোরো এবং প্রয়োজন হলে পালটাতেও পার। কিন্তু মহারাজ যদি কোন কিছু বলেন, একদম তা পালটাবে না। মহারাজ অভ্রান্ত। আমি বুদ্ধি-বিবেচনার স্তর থেকে কথা বলি—মহারাজ বলেন তার চেয়েও উঁচু স্তরে থেকে। তিনি সমাধিমান পুরুষ, ঈশ্বর-উপলব্ধি করা মানুষ। সব সময় ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার স্তরে বিরাজ করেন। তাঁর প্রতিটি কথা সমাধি-ভূমি থেকে আসে।' শ্রীরামকৃষ্ণের সব শিষ্যেরই মহারাজের সম্বন্ধে এমন একটা শ্রদ্ধা ছিল যে, মহারাজ যা-কিছু বলতেন তাকেই তাঁরা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেই মনে করতেন।

আমার প্রতি মহারাজের কত দয়া! আমার মনে আছে একদিন বলরাম বসুর বাড়িতে তিনি আমাকে তাঁর পদসেবার অনুমতি দিয়েছিলেন। হঠাৎই বললেন: 'ম্যাসাজ কি-করে করে জানিস্?' আমি ম্যাসাজ করতে শুরু করে দিলাম। একটু পরে তিনি বললেন: 'আর একটু জোরে; আর একটু জোরে।' আমি তা করতে পারতাম, কারণ সে-সময় আমি খুবই শক্ত-সমর্থ ছিলাম। কিন্তু আমার ভয় হল আমি যদি আরও জোরে টিপি তাঁর হয়তো গায়ে লাগতে পারে। কারণ তাঁর শরীর ছিল খুবই নরম। আমি পাছে তাঁর শরীরের কোন হাড় মচকে ফেলি, তাঁকে ব্যথা দিয়ে ফেলি, এই ভেবে আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। আবার একই সঙ্গে নিজেকে তাঁর খুব কাছের বলে মনে হচ্ছিল। আমি এই কাজে দক্ষ না—তবু যে তিনি আমায় তাঁকে স্পর্শ করতে, তাঁর পদসেবা করতে দিলেন, সে তাঁর কৃপা। সেই স্পর্শের মধ্যে দিয়ে আমি এমন কিছু পেয়েছিলাম যা বর্ণনা করতে পারি না। সেই স্পর্শে আমার মন পবিত্র ও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। তার ফলেই সম্ভব হয়েছে অবিচল ভালবাসায় সম্পূর্ণ নিবেদিত-প্রাণ হয়ে এই ত্যাগের জীবনযাপন করে চলা।

আমাদের ব্রহ্মচর্য দেওয়ার পর মহারাজ কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে চলে এলেন। তারপর এপ্রিল মাসে তাঁর কলেরা হল; তার পরেই হল ডায়াবেটিস। স্বামী সারদানন্দ প্রতি-দিন তাঁকে দেখতে যেতেন; কখন কখন দিনে কয়েকবারও যেতেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা থেকে হোমিওপ্যাথিক, তারপর হোমিওপ্যাথিক থেকে আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করা হল। মহারাজ মজা করে বলেছিলেন: 'হাকিমীটা আর বাকী থাকে কেন?' 'হাকিমী' হল আরব-দেশের একরকম চিকিৎসাপদ্ধতি। শেষকালে তাঁকে তাঁর ঘর থেকে বড় হলঘরে নিয়ে যেতে হল। কয়েকজন সন্ন্যাসীর দরকার হল তাঁকে বয়ে নিয়ে যেতে। মহারাজ তখন মন্তব্য করেছিলেন: 'মরা হাতি লাখ টাকা।' এটা তিনি কৌতুক করে বলেছিলেন। বোঝাতে চাইছিলেন যে, তাঁর আয়তন ও ওজন একটুও কমেনি; কাজেই তাঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা কথা না। আমি কিন্তু এর এই অর্থ করেছি যে, একজন উপলব্ধিমান পুরুষের প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরও শত শত বৎসর ধরে থাকে।

অসুস্থতার সময় তাঁর শরীরের অবস্থা খারাপ হয়ে চলল, কিন্তু মন ছিল অত্যন্ত সবল। সব সময় মহারাজ ভাবস্থ হয়ে থাকতেন, আর মাঝে মাঝে উচ্চারণ করতেন—কমলে কৃষ্ণ, কমলে কৃষ্ণ। এই কথাগুলোর পেছনে একটা ইতিহাস আছে: স্বামী সারদানন্দ একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনেছিলেন যে, রাখাল কৃষ্ণসখা। পরে, তাঁর বই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'তে মহারাজের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি এর উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ স্বামী সারদানন্দকে বললেন: 'ঠাকুর যদিও বলেছেন মহারাজ "কৃষ্ণসখা",' তবুও তোমার এটা উল্লেখ

করা উচিত নয়। মহারাজ এটা পড়লে তাঁর শরীর ছেড়ে দিতে পারেন।' এই শুনে স্বামী সারদানন্দ তাঁর বইতে এটা আর ছাপালেন না। যোগীন-মা স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন: 'মহারাজ যদি একবার নিজের স্বরূপ চিনতে পারেন, তোমরা তাঁকে আর রাখতে পারবে না।'

এই কারণে মহারাজ কখনও গয়া যাননি। শ্রীরামকৃষ্ণও কখনও গয়া বা পুরী যাননি। তিনি এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ দুজনেই অবশ্য কাশীতে গেছিলেন। যদি তাঁরা সেখানে যেতেন তবে তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের পুরনো পরিচয়ের স্মৃতি মনে পড়ে যেত এবং তাঁরা তাঁদের স্থূল শরীর ছেড়ে দিতেন। আমাদের কল্যাণের জন্যই তো তাঁদের জীবন ধারণ!

মহারাজের এই অসুখের সময় আমি তাঁর খুব কাছে যেতে পারতাম না, তাঁর সেবকরা যেতে দিতেন না। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহারাজ বলে উঠলেন: 'আমি শরৎকে দেখতে চাই।' একজনকে দিয়ে বলে পাঠানো হল, স্বামী সারদানন্দ এলেন। মহারাজ তাঁকে বললেন: 'তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছ আমাকে এখানে রাখবার, কেননা তুমি আমাকে ভালবাস। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ চাইছেন আমি তাঁর নিজস্বলোকে ফিরে যাই। তাঁর আদেশ আমাকে অবশ্যই মানতে হবে।' এর আগে মহারাজের একবার টাইফয়েড হয়েছিল। তখনও তিনি ঠিক এই ধরনের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু সেবার স্বামী সারদানন্দ মায়ের মতো যত্নে তাঁর সেবা করেছিলেন, টাইফয়েড সেরে গিয়েছিল। সেইবারেই প্রথম মহারাজ শরৎ মহারাজকে বলেছিলেন: 'তুমি আমাকে রাখতে চেষ্টা করছ; কিন্তু যদি ঠাকুর চান, আমি যেতে প্রস্তুত।' ঐ একই কথা আর একবার বলে মহারাজ এবার বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি শরৎ মহারাজের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি এবারও ঠিক একই জিনিস করছেন, তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। আসলে মহারাজ ইঙ্গিত করছিলেন: এইবারে ডাক এসে গেছে—কেউই এখন তাঁকে ধরে রাখতে পারবে না। স্বামী সারদানন্দের উপর স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু দৈবী আহ্বান এসে গেছে; সেই আহ্বান তাঁকে শুনতেই হবে।

এই মারাত্মক অসুখের শেষের দিকে স্বামী সারদানন্দ একদিন মহারাজকে বললেন: 'সব ঠিক আছে; তুমি একজন ব্রহ্মজ্ঞানী।' এর পরে কয়েকজন সন্ন্যাসীকে ডাকা হল। অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ, পরে যিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়েছিলেন) মহারাজের একেবারে কাছে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করলেন। দুজনের মধ্যে একটু ভুলবোঝাবুঝি হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ শঙ্করানন্দের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করানন্দের সমস্ত মনঃকষ্ট দূর হয়ে গেল—সূর্য উঠলে যেমন কুয়াশা দূর হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, কখন কখন গুরু কিন্তু খুব শক্ত এবং কঠোর হন। কারণ তাঁর প্রকৃতিই হল: 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—বজ্রের চেয়েও কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। এ থেকে বোঝা যায়, গুরুর মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ দুটো সত্তা থাকে—রুদ্ররূপ আর শিবরূপ, ভয়ঙ্কর রূপ এবং মধুর রূপ। শিবরূপের প্রকাশে গুরু শান্ত, করুণামূর্তি। রুদ্ররূপের প্রকাশে গুরু প্রদর্শন করেন রূঢ়তা, নিরুত্তাপ কঠোর উদাসীনতা। খ্রীষ্টীয় তাত্ত্বিকরা বলেন যে, মোজেস দিয়েছেন অনুশাসন আর যীশুখ্রীষ্ট দিয়েছেন প্রেম। কিন্তু সেই প্রেমিক খ্রীষ্টও বলেছিলেন যে, 'I have not come to

bring peace, but a sword.'* ( আমি শান্তি আনয়ন করতে আসিনি; এসেছি তরবারি আনতে।' ) শ্রীরামকৃষ্ণও দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ নরেনের সঙ্গে কথা বলেননি। নরেনন্দ্রকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র তবুও আসত। শেষকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: 'আমি তোর সঙ্গে কথা বলিনা, তবুও তুই আসিস! কেন? নরেন উত্তর দিয়েছিল: 'আমি আপনাকে ভালবাসি, তাই আসি। আপনি আমার সঙ্গে কথা বললেন কি বললেন না তাতে কিছু যায় আসে না।' ভালবাসার প্রকাশ ঘটে করুণার রূপে, মাধুর্যের রূপে, আনন্দের মধ্যে এবং সর্বশেষে আনুগত্যের মধ্য দিয়ে, আর সেটাই হয় স্থায়ী। যদি কেউ প্রকৃতই কাউকে ভালবাসে তবে সে স্বাধীন থাকবে—আর তার ভালবাসার পাত্রও থাকবে স্বাধীন।

আমি যখন মাদ্রাজে ছিলাম আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। আমার মনে আছে মহাপুরুষ মহারাজ—স্বামী শিবানন্দজী—আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে আমাকে তিনি 'পাহারাওয়ালা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। 'পাহারাওয়ালা' অর্থাৎ শরৎ মহারাজের দেহরক্ষী আর মায়ের বাড়ির নজরদার। তিনি বলতেন: 'তুই আমার নাতি।' চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন: 'তুমি ভাল হয়ে যাবে; আমি নিশ্চয় করে বলছি তুমি ভাল হয়ে যাবে।' ঐ চিঠি পেয়ে আমি প্রচণ্ড জোর পেয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, দিব্যালোক-প্রাপ্ত এইসব মহাত্মারা যদি কিছু বলেন, তবে তা ঘটতে বাধ্য। আর বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।

মহারাজ তাঁর শেষ দিনগুলিতে বহু ভক্তকে আশীর্বাদ করেছিলেন। স্বামী নির্বাণানন্দকে তিনি বলেছিলেন: 'সোনা-রূপা কিছুই আমার নেই; আমি যে সন্ন্যাসী! জাগতিক বিষয়-আশয় আমার কিছুই নেই। কিন্তু তোর সেবায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোর ব্রহ্মজ্ঞান হোক, তোর নির্বাণলাভ হোক।'

এর কিছু আগে মহারাজ আমাদের আরও বলেছিলেন: 'বাবারা! ঠাকুর সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য। তাঁকে ধরে থাকিস্, তোদের জীবন আনন্দে ভরে যাবে।'

আমি মহারাজের মহাসমাধির মুহূর্তে উপস্থিত ছিলাম না। মহারাজের শরীর বলরাম বসুর বাড়ি থেকে নৌকা করে বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন মঠে যাবার জন্য। রাস্তায় স্বামী শিবানন্দ আমাকে দেখতে পেয়ে বললো: 'ঐ যে কিরণ।' তিনি আমাকে তাঁদের সঙ্গে আসতে বলেন। একটু ইতস্তত করছিলাম। যাই হোক, তাঁদের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে বরানগর এলাম, সেখান থেকে নৌকায় বেলুড় মঠ।

মহারাজ চলে গেলেন, আর কখনও তাঁকে দেখতে পাব না, আর কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারব না! দাহর কাজ যখন চলছে, তখন এইসব ভাবতে ভাবতে আমার মন দুঃখে ভরে উঠল। তিনি আমার ব্রহ্মচর্য-গুরু। আমি ভাবতে লাগলাম, 'কি হবে আমার? কি হবে আমাদের সঙ্ঘের?'

কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট যেমন তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, 'আমি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকব', ঠিক তেমনি এইসব মহাত্মারা বাইরের জগৎ থেকে বিদায় নিলেও ধ্যানের গভীরে প্রকট হয়ে ওঠেন। ধ্যান

* The New Testament, St Matthew 10/34 ( Revised Standard Version, Thomas Nelson and Sons, 1957 )

করলে ওঁদের উপস্থিতি অন্তরে উপলব্ধি করা যায় ভগবানের প্রতি ভালবাসা গড়ে তোলবার জন্য জপ-ধ্যানের অভ্যাস করা দরকার। তার ফলে ঈশ্বরকে দর্শন করবার তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠবে। মহারাজ বলতেন: 'নাম কর্ আর হৃদপদ্মে ইষ্টের ধ্যান কর্।' তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন: 'জপধ্যান করবি; জপধ্যান করবি।' জপ মানে ভগবানের নাম-উচ্চারণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানসচক্ষে ইষ্টমূর্তিকে দেখা। কেন? ব্যাকুলতা গড়ে তোলার জন্য। ব্যাকুলতা মানে ভগবানের দর্শন লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই কারণেই মহারাজ আমাদের সঙ্ঘে রামনাম প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি আমাদের কাছে মহাবীর বা হনুমানকে নিয়ে এলেন কেন? কারণ, মহাবীর হচ্ছেন ব্রহ্মচর্য বা সংযমের প্রতিমূর্তি। ব্রহ্মচর্য-অভ্যাসের ফলে শুদ্ধ চিত্তে ধ্যান করা সম্ভব হয়। ভগবানের জন্য ছটফট করা, তাঁর দর্শন লাভের জন্য জলন্ত ইচ্ছা জাগা—তার জন্য প্রয়োজন নির্মল চিত্তে ধ্যান। পবিত্র অন্তঃকরণ অরুণোদয়ের মতো ঘোষণা করে দেয় যে, প্রকৃত জ্ঞানের সূর্য উদিত হতে চলেছে।

মহারাজ ছিলেন মূর্তিমান 'নিত্যোৎসব'। যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই তিনি একটা উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। ধ্যানজপও সকলের ভাল হত। ভাল খাবারও আসত। বেলুড় মঠে যেরকম খাবার ছিল, তাতে কোন-রকমে শরীরটা বাঁচিয়ে রাখা চলত। উদ্বোধন বা অন্যান্য ধর্ম-কেন্দ্রগুলিতে ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বেলুড় মঠে ছিল না। কিন্তু মহারাজ মঠে এলে ভাল ভাল খাবার জিনিসও আসত।

মহারাজ আমাদের সবাইকে বলতেন: 'বাবারা, তোমরা এখানে বক্তা বা লেখক হতে আসনি, তোমরা এসেছ ঈশ্বর-উপলব্ধি করতে। সেই অনুযায়ী সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর।'

যদিও মহারাজকে কারও সঙ্গেই তুলনা করা যায় না তবুও আমার তাঁকে যীশুখ্রীষ্টের সবচেয়ে কনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য জনের সঙ্গে তুলনা করতে ভাল লাগে। স্বামী বিবেকানন্দের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। তিনি যেন সেই পিটার যাঁকে লক্ষ্য করে যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন: 'On this rock I will build my church' (এই পাথরের উপরে আমি আমার ধর্মসঙ্ঘ গড়ে তুলব)।

একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী আমাকে বলে-ছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে এনেছিলেন গোটা জগতের জন্য, অদ্বৈত প্রচারের জন্য—কারণ অদ্বৈততত্ত্বের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মহারাজকে শ্রীরামকৃষ্ণ এনেছিলেন তাঁর নিজের জন্য এবং তাঁর প্রধান শিক্ষা ঈশ্বর-ভক্তি প্রচারের জন্য।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মহারাজের কাছে কি শিখেছি? এর উত্তর দিতে হলে আমি বলব: 'গুরুভক্তি, গুরুভক্তি।'

স্বামী প্রভবানন্দ এবং স্বামী বিবিদিষা-নন্দের[৪] মহারাজের প্রতি কিরকম ভক্তি ছিল আমি দেখেছি। একবার স্বামী বিবিদিষানন্দ অসুস্থ অবস্থায় ট্রেনে করে পোর্টল্যাণ্ডে আসছিলেন। মহারাজ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন: 'ভয় পাস না, ভয় পাস না। সবচেয়ে বড় বৈদ্য ঠাকুর। আমাদের বৈদ্য ঠাকুর।' আমি তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বললেন যে একটা অপারেশন করতে হবে। একটা জায়গা বেড়ে গেছে, সেটা কেটে বাদ দিতে হবে। স্বামী বিবিদিষানন্দ আমাকে

৪ স্বামী প্রভবানন্দ এবং স্বামী বিবিদিষানন্দ দেহত্যাগ পর্যন্ত যথাক্রমে হলিউড এবং সীয়াটলের বেদান্ত সোসাইটির প্রধান ছিলেন। দুজনেই মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন মহারাজের কাছে।

বলেছিলেন যে, তিনি খুবই ভয় পেয়ে গেছিলেন। তখন মহারাজ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন: 'ভয় পাসনা। ঠাকুর আমাদের বড় বৈদ্য। ঠাকুরই তোকে রক্ষা করবেন। তুই ঠাকুরের কাজ করতে এসেছিস; তিনি তোর হাত ধরে থাকবেন এবং তোকে চালাবেন' তিনিই তোর শক্তির উৎস, আনন্দের গোমুখী, চিরকালের সঙ্গী। স্বামী বিবিদিষানন্দ বলেছিলেন যে, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর ভয় সম্পূর্ণ চলে গেল। অফুরন্ত শক্তি ও আনন্দে তিনি ভরপুর হয়ে উঠলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে আলো এনে দিয়েছেন বলে মনে মনে তিনি মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

আমার নিজের ক্ষেত্রে যখনই আমি 'গুরু-ভক্তি'র প্রসঙ্গ ভাবি, শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে এসে যায়। কিন্তু মহারাজই যেন আমায় শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী সারদানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মায়ের দেবীত্ব সম্পর্কে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন স্বামী সারদানন্দ। আমি প্রথমে মাকে বুঝতে পারিনি। আমি তাঁর মানবী দিকটাই শুধু দেখে-ছিলাম—একজন অশিক্ষিতা মহিলা, এইটুকুই। আমি তখন এম. এ. বা ডক্টরেট ডিগ্রীতে খুব গুরুত্ব দিতাম; কিন্তু শ্রীশ্রীমার তো কোন স্কুলের বিদ্যা ছিল না। অবশ্য স্বামীজীর খুব অনুরাগী ছিলাম আমি। তাঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা, শক্তি-গর্ভ চিঠি আর চমৎকার কথোপকথন—এগুলির খুব অনুরাগী ছিলাম। আমি সঙ্ঘে যোগ দিয়ে-ছিলাম স্বামীজীর জন্মতিথিতেই। গত বৎসর স্বামীজীর জন্মতিথির দিন—১৯৮৫-র জানুয়ারিতে—আমাদের হলে যাবার পথে তাঁর ছবিটা দেখে তাঁকে বলেছিলাম: 'স্বামীজী, আমি আপনাকে দেখিনি কিন্তু আপনার জ্বলন্ত দেশপ্রেমের জন্য আমি সবসময়ই আপনাকে যৌবনের বীর হিসেবে পূজা নিবেদন করে এসেছি। ১৯২১ আপনার বেলুড় মঠে এসেছিলাম একজন অতিথি এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য। কিন্তু আপনার এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, আপনি আমাকে আপনার সঙ্ঘের একজন সন্ন্যাসী হিসেবে স্থায়ীভাবে সেখানে রেখে দিলেন। আমাকে এখন আপনি আশীর্বাদ করুন, যাতে আপনি যেভাবে খুশি হবেন, ঠিক সেইভাবে আমি এই পাশ্চাত্যের মানুষের সেবা করে যেতে পারি। কারণ, আমার আমেরিকা-বাসের জীবনে আপনার আশীর্বাদ আমার প্রধান অবলম্বন।'

শ্রীশ্রীমা এবং মহারাজ সম্বন্ধে আর একটা ঘটনা আছে, যেটা আমি অন্য কোথাও বলিনি। একবার শ্রীশ্রীমা, মুড়ি আর বেগুনভাজা খেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ তাঁকে তা খেতে দিতে চাননি কারণ মায়ের তখন কালাজ্বর হয়েছে, ঐসব খেলে তাঁর শরীরের খুব ক্ষতি হবে। সরলাদেবী, পরে যিনি প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা হয়েছিলেন, মায়ের সেবা করতেন। তিনি স্বামী সারদানন্দকে এসে খবর দিলেন যে, মা বাচ্চা মেয়ের মতো ঐ জিনিসগুলো—মুড়ি আর বেগুন-ভাজা—লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন। স্বামী সারদা-নন্দের তো দায়িত্ব আছে, কাজেই মাকে তাঁর বলতেই হবে ওগুলো না খেতে। তিনি মায়ের ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে মাকে বললেন: 'মা, আমি খুব খুশি হব, যদি আপনি পেছনে যা লুকিয়ে রেখেছেন সেটা আমাকে দিয়ে দেন।' মা তখন তা-ই করলেন। স্বামী সারদানন্দ তখন ভেবেছিলেন যে, মা সুস্থ হয়ে উঠলে মাকে মুড়ি-বেগুনভাজা খাওয়াবেন। কিন্তু হায়! তা আর কখনই হল না।

মায়ের মহাসমাধির পর স্বামী সারদানন্দের মনে হল মাকে যা খেতে দেওয়া হয়নি, মহারাজ যদি উদ্বোধনে এসে তা গ্রহণ করেন তবে তিনি

মহারাজের মধ্যে মায়ের উপস্থিতি অনুভব করে খুশি হবেন। তিনি একদিন মহারাজকে উদ্বোধনে আসতে নিমন্ত্রণ করলেন। মহারাজ এলেন। স্বামী সারদানন্দ উপরে গিয়ে মায়ের ঘরে মায়ের ছবির সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর যে-সন্ন্যাসী পূজো করছিলেন তাঁকে বললেন মাকে ঐ মুড়ি-বেগুনভাজা নিবেদন করতে—যা মাকে স্থূলশরীরে খেতে দেওয়া হয়নি। এরপর তিনি সেই জিনিসগুলিই প্রসাদ হিসেবে মহারাজকে দিলেন। মহারাজ খুব সম্ভবত নিচের তলায় চেয়ারে বসেছিলেন। মহারাজ সেগুলি একটু একটু করে খাচ্ছেন আর মজা করে বলছেন: 'ও, খুব সুস্বাদু, খুব সুস্বাদু···অমৃত, অমৃত।' এরপরে প্রত্যেকেই প্রসাদ গ্রহণ করলেন। যখন মহারাজ খাচ্ছিলেন, স্বামী সারদানন্দ অনুভব করলেন যে, শ্রীশ্রীমা-ই মহারাজের মধ্য দিয়ে খাচ্ছেন। স্বামী সারদানন্দের মনে মহারাজের জন্য কতটা শ্রদ্ধা-ভক্তি জমাট ছিল, তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

আমি এখানে আর একটা ঘটনা বলতে ভুলে গেছি। কাশীতে একবার শ্রীশ্রীমা স্বামী, তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দকে একটা করে সূতির কাপড় দিলেন; কিন্তু মহারাজকে দিলেন একটা সিল্কের কাপড়। রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) মাকে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজকে এরকম বিশেষ জিনিস দেওয়া হল কেন। মা উত্তর দিলেন: 'ছেলে যে, ছেলে যে।' রাখাল হচ্ছে ছেলে, কাজেই তাকে সব সময়ই বিশেষ কিছু দিতে হবে। শিষ্য আর ছেলে দুয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। শিষ্যকে ভালভাবে আদর-যত্ন করা যেতে পারে; কিন্তু সন্তানের প্রতি উৎসারিত হয় বাৎসল্য ও ভালবাসা প্রসূত বিশেষ স্নেহ।

মায়ের সম্বন্ধে একটু বলি। পাশ্চাত্যে এসে আমি অনেক বদলে গেছি। আমি উপলব্ধি করছি যে, আমার গুরু শ্রীশ্রীমা সমস্ত বিপদ-আপদ দুঃখকষ্টের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর অপরিসীম কৃপায় আমাকে আমার ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অনুগ্রহ করে চালিত করছেন। আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব যদি তিনি তাঁর দৈবী করকমল আমার মাথায় রেখে আমায় আশীর্বাদ করেন যাতে আমার অচলা বিশ্বাস হয়। আমি যেন কখনও তাঁকে না ভুলি। আমার প্রার্থনায় আমার ধ্যানে আমি যেন তাঁকে আমার গুরুরূপে, ইষ্টরূপে, আমার সর্বস্বরূপে সর্বদা স্মরণ করতে পারি। তাঁর কাছে সর্বান্তঃকরণে এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈতবাদী হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরাগী। তিনি যে বলেছেন, নির্বিকল্প সমাধির পর থেকে ধর্মজীবনের সূচনা হয়, এটা বলেছেন তাঁর নিজস্ব অনুভূতি থেকে। সেইজন্যেই আমি বলি যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ একজন শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতী। কিন্তু সেই অবস্থায় পৌঁছনোর উপায় হিসেবে তিনি ইষ্টভক্তির উপরে জোর দিয়েছেন। ভক্তি পাকলে ধর্ম তার চরমে পৌঁছয় অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টরূপে চিন্তা করলে মানুষ তাঁর কৃপা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং শেষকালে উপলব্ধির চরম শিখরে পৌঁছে যায়। সেই চরম শিখর হল—জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একত্ব।

বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) যখন মহাসমাধিতে প্রবেশ করতে চলেছেন, তখন মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: 'ভাই, ঠাকুর কি সত্যি? ঠাকুর কি সত্যি? তুমি কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ?' বাবুরাম মহারাজ তখন কোন ওষুধ খেতে চাইছিলেন না। বলছিলেন: 'আমি শুধু চরণামৃত খাব, ঠাকুরের চরণামৃত।' মহারাজ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। সেবক যখন মহারাজকে বললেন যে, বাবুরাম মহারাজ

কোন ওষুধ খাবেন না তখন মহারাজ এসে তাঁকে বললেন: 'শরীর কিন্তু তোমার নয়—ঠাকুরের।' তখন বাবুরাম মহারাজ বললেন: 'তুমি ঠাকুরের প্রতিনিধি; আমাকে বল কি করা উচিত।' মহারাজ তখন বললেন: 'আগে চরণামৃত খাও; তার পরে ওষুধ খেও।' বাবুরাম মহারাজ রাজি হলেন। মহারাজ তখন বাবুরাম মহারাজকে বললেন: 'আমাদের ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস হবে।' আমাদের শেখানোর জন্য তিনি বললেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য; তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের চালাচ্ছেন, প্রেরণা দিচ্ছেন; হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন। বাবুরাম মহারাজ একটু ধ্যান করলেন, তারপর চোখ খুললেন—মুখে হাসি। বললেন: 'আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি; খুব স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখছি। খুব স্পষ্টভাবে।' এর একটু পরেই বাবুরাম মহারাজ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। মহারাজ ছোট শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। এত বড় উপলব্ধিমান পুরুষ, এত বড় মহাশক্তির মানুষ, হিমালয়-প্রমাণ ব্যক্তিত্ব—তিনিও গুরুভাই-এর প্রতি ভালবাসায় কাঁদছেন! এই ভালবাসা শ্রীরামকৃষ্ণের সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের সব সন্তানরা সুসমঞ্জসভাবে গ্রথিত হয়ে গঠন করেছিলেন অভিন্ন এক আত্মা, অভিন্ন এক দেহ—যে-দেহ অতীন্দ্রিয়, মানবজাতির কল্যাণার্থে যা বিশ্বজনীন ভালবাসার বাণী প্রচার করে চলেছে।*

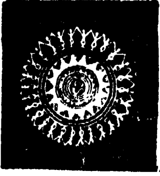
* Vendanta for East and West পত্রিকার নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' শীর্ষক লেখাটির বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক: স্বামী বলভদ্রানন্দ।

# বিবেকানন্দ-স্তুতি

( গান—বৃন্দাবনী সারঙ—দাদ্‌রা )

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শুনাও তোমার বজ্রকণ্ঠ ওহে দিব্যলোকের ঋষি।
ভোগ-স্বার্থমত্ত দৈত্য নাশ হে বীর সন্ন্যাসী॥
সেদিন গত প্রায় চিকাগোতে গেলে তুমি।
সর্বজাতি শুনল সেথা ভারত দেবভূমি॥
কত অজ্ঞলোক সভ্য হল প্রাচ্য কথা শুনি।
ভ্রান্ত মন শান্ত হল আর্যপ্রবর দেখি॥
তরুণ তপন সুনীল নভে, ঘুচল অমানিশি।
মুগ্ধ হল বিশ্ব-ভুবন, পেয়ে হৃদয়-শশী॥
ভারতের আত্মা তুমি, যতি সাজে বিশ্বজ্যোতি।
জাগাও মোদের যোগ ধর্ম, ঘুচাও মূঢ় নীতি॥
বহাও তোমার প্রেমধারা ওহে যুগপতি।
দীপ্ত কর সর্বজনে নিয়ে শুভমতি॥
তোমার তরে জন্ম-মরণ, স্মরণ দিবানিশি।
তবপদে আশিস মাগ—মুক্ত কর দৈন্য নাশি॥



# অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

## ভক্তের জাতি

[ ভক্তমাল হইতে গৃহীত ]

ভগবানের যে প্রকৃত ভক্ত, তাহার জাতি বিচার নাই। ভক্তেরা এক স্বতন্ত্র জাতি। এই শাস্ত্রবাক্যের কার্যে পরিণতির অনেক উদাহরণ বৈষ্ণব ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়।

মুরারিদাস নামে এক ভক্ত ছিলেন---তিনি জাতিতে চর্মকার। তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ ছিল। তিনি অতিশয় শান্তস্বভাব, মিষ্টভাষী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কথা কহিতেন না। তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহার বশীভূত ছিল এবং তিনি সর্বদা ভক্তিরসানন্দে বিভোর থাকিতেন।

সেই স্থানে রসিক মুরারি নামে একজন মোহান্ত বাস করিতেন। তিনি সেই দেশের রাজার গুরু। তিনি সদ্‌গুণের অতিশয় আদর করিতেন বলিয়া মুরারিদাসকে চর্মকার জানিয়াও তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া একদিন হঠাৎ তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। মুরারিদাস মোহান্তজীকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একবার এগিয়ে যান আবার পিছু হাঁটিয়া আসেন, ঘরে তাঁহাকে বসিতে দিবার উপযুক্ত আসন নাই। কি করিবেন, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দূরে গিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রসিক মুরারি তাঁহার দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন মুরারিদাস অতি কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঠাকুর, আমাকে কেন স্পর্শ করিতেছেন? আমি অতি নীচ জাতি—আমি কুকুরের অধম।' তখন রসিক মুরারি কহিলেন, 'আপনি কি বলিতেছেন? আপনি সাধুশ্রেষ্ঠ—আপনার আবার জাতি কি? আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্রতা লাভ করিব।' এইরূপ বলিয়া কোনরূপ কৌশলে ঐ চর্মকারের পাদোদক পান করিলেন ও তাঁহাকে নানারূপ স্তবস্তুতি করিয়া নিজস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে রাজা পরম্পরায় ঐ সংবাদ শ্রবণে গুরুর উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। মোহান্তজী একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে পূর্ববৎ সম্ভাষণাদি কিছুই করিলেন না। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার গুরু, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, অথচ আপনি আমাকে সম্ভাষণ পর্যন্ত করিতেছেন না কেন?' রাজা মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এখানে কেন আসিয়াছেন? যান, সেই মুরারিমুচির বাড়ী যান।' মোহান্তজী দেখিলেন, রাজার অতিশয় জাত্যভিমান। তাঁহার ঐ জাত্যভিমান দূর করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন, 'রাজা, আপনি অতি মূর্খ। বুঝিলাম, ভগবান্ যে আমায় মুরারিদাসের পাদোদক পান করাইয়াছেন, সে কেবল আপনার তমোনিবারণের জন্য। আপনি আপনাকে একজন ভগবদ্ভক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু জানেন না কি, ভক্তে যে জাতিবুদ্ধি করে, তাহার কখন ভক্তিলাভ হয় না? তাহার প্রতি ভগবানের কৃপাও হয় না, তাহার সকলধর্মই নষ্ট হয়। অতএব ভক্ত যে কোন বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি পরম পবিত্র।'

এই সকল উপদেশে রাজার চৈতন্য উদয় হইল।*

* 'উদ্বোধন'-এর ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

# পুস্তক সমালোচনা

**গৃহীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ**—সুবোধরঞ্জন রায়। জানুআরি ১৯৮৫, বাগুইআটি শ্রীমা সারদা সেবাসদন, ২১ বাগুইআটি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৮। পৃঃ ২+৯৬, মূল্য : বারো টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে নিত্যসিদ্ধের থাক বলতেন, সেই পর্যায়ের কয়েকজন ত্যাগী ভক্ত তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর নির্দেশে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ঈশ্বরানুরাগী কয়েকজন বিশিষ্ট পুরুষ (গৃহী) তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর মুখে সহজ সরল ভাষায় গূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা আর উপদেশ শুনে—বিশেষতঃ তাঁর জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত ঈশ্বরীয় আবেশ প্রত্যক্ষ করে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তা ছাড়াও অগণিত 'সাধারণ গৃহী ভক্ত ঠাকুরের সংস্পর্শে আসতো তাদের দৈনন্দিন সংসার-জীবনের মূল ক্ষত কোথায় তা জানতে, সেই ঐহিক যন্ত্রণা থেকে একটু পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পেতে, আর যদি সম্ভব হয় তবে তাঁর পবিত্র সাধন-বহ্নি থেকে নিজেদের হৃদয়ে ঈশ্বর-ভক্তির একটি ক্ষীণ শিখা জ্বালিয়ে নিয়ে পবিত্র হতে।' (পৃষ্ঠা ৫)—লেখক ত্যাগী ভক্তদের জন্য ঠাকুরের আকুলতা, গৃহী ভক্তদের জন্য তাঁর আগ্রহের কথা বলে এই শেষোক্ত ভক্তসাধারণের ভূমি থেকে ঠাকুরকে মুখ্যতঃ কথামৃত অনুসরণ করে পেতে চেয়েছেন।

তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস নিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীর ঠাট বজায় রেখেছিলেন। সাধারণ গৃহীর মতোই বেশভূষা,—গৃহীর ধর্ম পালন করার জন্য সহধর্মিণীও গ্রহণ করেছিলেন (যাঁর স্বরূপ অবশ্য ভক্তসাধারণের কাছে অনেক পরে আভাসিত হয়েছে), কিন্তু সংসার তিনি করেননি। সংসারজীবন যাপন না করলেও সংসার যে কী বস্তু তা তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, সুতীব্র অনুভূতিবলেও জেনেছিলেন। সংসার-জীবনের গ্লানি বা জ্বালার কথা নানাভাবে বলে তিনি সংসারের প্রতি বিরাগ আর ঈশ্বরে অনুরাগ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু সংসারের হাজার নিন্দা করলেও সংসারী মানুষের দুর্বলতা, শক্তির সীমাবদ্ধতা তিনি জানতেন। তাই আবার তাদের অভয়ের কথা শুনিয়েছেন, তাপিত হৃদয়ে স্নেহবারি নিষেক করেছেন, সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রাখার উপদেশ দিয়েছেন, এমন কি সংসারজীবনে চলার ব্যবহারিক উপদেশও দিয়েছেন। সাধারণ গৃহীর কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ করুণার আকর, পরম আশ্বাস, নির্ভরের নিধান।

গ্রন্থের লেখক ডক্টর সুবোধরঞ্জন রায় একজন প্রবীণ অধ্যাপক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ থেকে উপাদান চয়ন ও গ্রন্থন করে (কিছু কিছু সহায়ক গ্রন্থও আছে) একটি অপূর্ব মালিকা রচনা করে গৃহীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অর্পণ করেছেন। গ্রন্থটি তত্ত্বমূলক বা তথ্যসর্বস্ব নয়; লেখক বিদগ্ধ পুরুষ হলেও সাধারণ প্রাবন্ধিকের আলোচনাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। অবিচল শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত ভক্তের মনীষায় ভাবময় পুরুষ ঠাকুরের যে রূপটি প্রতিভাত হয়েছে, সেটি অনবদ্য ভাষায় সরসমধুর ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থকার ঠাকুরের অনুরাগী গৃহীদের কৃতজ্ঞতাভাজন (অবশ্য সন্ন্যাসীদেরও প্রশংসাভাজন) হয়েছেন।

গ্রন্থটির মুদ্রণাদির পারিপাট্য প্রশংসনীয়। কচিৎ দৃষ্ট অশুদ্ধি উপেক্ষণীয়। সুঠাম প্রচ্ছদ-লিপি সরলশোভন।

গ্রন্থস্বত্ব 'বাগুইআটি শ্রীশ্রীমা সারদা সেবা-সদন'-এ নিবেদিত।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

**সারদাতত্ত্ব**—শ্রীঅর্চনাপুরী, প্রকাশক : স্বামী মৃগানন্দ, শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, ১ ইব্রাহিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০০৩২। পৃঃ ১১ (ক-ট)+৪১, মূল্য : তিন টাকা।

পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮২ বঙ্গাব্দে। প্রকাশকের তাৎকালীন নিবেদনে পুস্তকটি রচনার পশ্চাৎপট বর্ণিত। স্বামী নির্বেদানন্দজীর ঘরে এক সীটিং-এ এই রচনার পাঠ যাঁরা শুনলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পুস্তকটির প্রকাশকালীন তথ্যসমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ ভূমিকার লেখক শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক। ভূমিকা হতে লেখিকা সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—"স্বামী সত্যানন্দের মানসকন্যা শ্রীঅর্চনাপুরী মা···। একাধারে তিনি মৈত্রেয়ী ও মীরাবাঈ।···তিনি প্রজ্ঞাভাস্বর যোগিনী, মন্দিরের পূজারিণী।···এঁরই লেখা 'জননী সারদেশ্বরী' সর্বভাবময়ী মায়ের···এক অপূর্ব দিব্যভাবসঞ্জীবনী কবিত্বপূর্ণ জীবন-আলেখ্য

'সারদা তত্ত্ব' নামেই সুস্পষ্ট যে পুস্তকটি প্রধানতঃ তাত্ত্বিক। তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবান্বিত করার জন্যই ঘটনাশ্রয়ী তথ্যও লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যে-সব ঘটনা বা কাহিনীকে ঐশ্বরিক লীলার উদাহরণ বলে এবং একই পরমাশক্তির বিভিন্ন পটভূমিতে প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করে পুলকোদ্ভূত সন্তুষ্টি ছাড়িয়ে আর এগোতে পারি না, যোগিনী লেখিকা সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাত্ত্বিক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। তন্ত্রশাস্ত্র ও শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন বিশেষ শক্তিমূর্তি শ্রীশ্রীসারদামায়ের জীবন-লীলায় আত্মপ্রকাশ করেছিল, তিনি তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

পুস্তকের প্রারম্ভে আদ্যাশক্তি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও দেখানো হয়েছে—Energy বা শক্তিই হচ্ছে আদি তত্ত্ব।" ভারতীয় শক্তিতত্ত্বকে মাতৃরূপে কল্পনা করা কেন হল এই প্রশ্নের উত্তরে পুস্তকটির ৩-৫ পৃষ্ঠায় সমাজতত্ত্ব থেকে শুরু করে, প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগসমূহের প্রাসঙ্গিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রণিধানযোগ্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মুখে সারদা মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা উপলক্ষে উক্তি করে গেছেন ও ষোড়শীরূপে মাকে পূজা করেছিলেন। এরই ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে সারদা জননীর জগদ্ধাত্রী, কালী (রুদ্র ও শান্ত), দুর্গা, সরস্বতী ও ষোড়শী-রূপে প্রকাশ শুনে এসেছি। উক্ত ৫টি রূপের প্রকাশ, পশ্চাৎপট ও তত্ত্ব এই পুস্তকেও যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। পুস্তকটিতে সারদা জননীর নিম্নলিখিত তদতিরিক্ত রূপসমূহে আত্ম-প্রকাশও বর্ণিত হয়েছে :

কুমারী গৌরী, অষ্টমবর্ষীয়া শুদ্ধা ব্রহ্মচারিণী, শাকম্ভরী প্রভৃতি শ্রীশ্রীচণ্ডীরূপের বিভূতি ও দশমহাবিদ্যার আরও তিনটি রূপ—ভুবনেশ্বরী, বগলা ও কমলা। তাছাড়াও জননী সারদার জীবনলীলাতে কৌশিকী দেবীর দুবার আবির্ভাবের বিবরণ গ্রন্থতে আছে।

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের মা জননী সারদার সার্বিকতা তাঁর শ্রীমুখের একটি বাণীতে প্রকট হয়ে উঠেছে। সন্তান শুধায়—"তুমি কেমন মা?" বলেছেন জননী—"হ্যাঁ, আমি মা, সকলের মা, পাতানো মা নয়—সত্যিকারের মা।" সন্তানের প্রশ্ন : "এই কীটপতঙ্গ এদেরও মা?" জননীর মুখে অপরূপ উত্তর : "হ্যাঁ, ওদেরও মা। ওদের মায়ের মধ্যে দিয়ে ওরা আমার স্নেহ পাবে। এখানে জননী নিজের সত্তাকে ওতপ্রোত করে দিয়েছেন বিশ্বমাতৃত্বের মাঝে (পৃঃ ৪০)।

প্রশ্ন করেছেন জনৈক ভক্ত—"মা, আপনার স্বরূপ মনে পড়ে না?" আনমনে মা উত্তর

দিয়েছেন—"সব সময় স্বরূপ মনে থাকলে কি আর এখানে থাকতে পারি বাবা? বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে বসে থাকতুম।" সূক্ষ্মপ্রজ্ঞাসম্পন্না লেখিকা একথার গভীর তাৎপর্য বুঝাতে লিখেছেন—"কিন্তু আমরা বলবো—এ তাঁর স্বরূপ-বিস্মৃতি নয়, এ রূপ তাঁর অণোরণীয়ান্ রূপ, অসীমের সীমায় বিলাস। এইটাই যেন সারদাতত্ত্বের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। যুগপৎ তিনি মানবী ও দেবী। সেই বিরাট শক্তি অতি সহজরূপে ধরা দিলেন আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মাঝে।"

মার 'মাতৃরূপ সর্বরূপ তার'। পুস্তকের শেষ কয়েক লাইনে তার উজ্জ্বলতম প্রকাশ: আর মাও যে সর্বকালের মা, সর্বযুগের মা, এর প্রমাণ মা নিজেও দিয়ে গেছেন তাঁর সারদালীলাবসানের মুহূর্তে: "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা—আমার ভালবাসা আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।" তাই সারদা-তত্ত্ব অনন্তকালের সার্বিক তত্ত্ব।

—শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

## প্রাপ্তি-স্বীকার

**ব্রহ্মানুচিন্তন** (শাস্ত্রীয়-বচন সংগ্রহ): শ্রীযতীন্দ্রনাথ সান্যাল, প্রকাশক ও সম্পাদক: শ্রীমানসকুমার সান্যাল, ১৮২, এস. এন. রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০৩৮, পৃঃ ৪৯, মূল্য: ৫·০০

**শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শ্লোক-সংখ্যা-নির্ণয়ে:** লেখক ও প্রকাশক: শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, মীরারানী প্রচারমন্দির, ডী ৩২।৮ এম্বরবটতলা, বাঙ্গালীটোলা, বারাণসী-২২১০০১, পৃঃ ৩১; মূল্য: ৫·০০

**আশ্চর্য্য এক শুকপাখী:** লেখক: শ্রীসুকুমার বর্দ্ধন, প্রকাশক: কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা-৭০০০৭৩, পৃঃ ৫১; মূল্য: ৮·০০

**পরলোকের প্রাঙ্গণে** লেখক ও প্রকাশক: শ্রীহৃদয় রঞ্জন ভট্টাচার্য, ৩০ই, দ্বারিক জঙ্গল রোড, পোঃ ও গ্রাম ভদ্রকালী; জেলা হুগলী, পৃঃ ১৯০; মূল্য: ৫·০০

**Eleven Great Indians in their youth** —A commemorative volume to the International youth year celebrations, 1985 : Published by: Swami Vedantananda; Ramakrishna Mission Ashrama, Ramakrishna Avenue, Patna,-800004, Offering: Rs. 10·00

**তরুণদের বিবেকানন্দ:** লেখক: শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী, প্রকাশিকা: শ্রীমতী রঞ্জিতা চৌধুরী, ৩৭২ যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৭০০০৬৮ পৃঃ ১৫৪; মূল্য ১৫·০০।



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ **স্বামী গম্ভীরানন্দজীর** সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৭৭তম বার্ষিক সভা গত ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৬, রবিবার বিকাল ৩-৩০ মিনিটে **বেলুড় মঠে** অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রদত্ত ১৯৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পরিচালক সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ :

এইকালে উল্লেখযোগ্য বিষয় মিশন কর্তৃক ত্রাণ ও পুনর্বাসন সেবাকাজে ১৪ লক্ষ ৭৬৫ টাকা ব্যয়। এই অর্থ ব্যয়িত হয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিবাত্যা প্রভৃতি নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগে কবলিত মানুষের মধ্যে। এই সঙ্গে বিতরিত হয়েছে ১১ লক্ষ ৮ হাজার ৫২ টাকা মূল্যের ত্রাণ সামগ্রীও। এগুলি পাওয়া গেছে মানবসেবায় সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ হতে। এই কাজে রামকৃষ্ণ মঠের ব্যয়ের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৮৬ টাকা।

মঠ ও মিশনের বহু শাখা কেন্দ্র পল্লীমঙ্গল অর্থাৎ সার্বিক গ্রামোন্নয়নে প্রভূত অর্থ খরচ করেছে। এই প্রকল্পের কাজগুলি হল : কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। এই বাবদে বেলুড় মঠের প্রধান কার্যালয়ের নিজস্ব খরচ ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৪৩ টাকা।

এই বছরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক সেবাকাজগুলি : বেলুড় সারদাপীঠে "শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শনী" ও "সমাজ সেবক শিক্ষণমন্দির" (এখানে গ্রামোন্নয়নের কাজে গ্রামীনযুবকদের হাতেকলমে শিক্ষাদান), এর দ্বারোদ্ঘাটন, মধ্যপ্রদেশে বস্তার জেলায় অবুঝমাড়-পার্বত্য এলাকায় রায়পুর কেন্দ্র কর্তৃক পাহাড়িদের জন্য একটি বহুমুখী প্রকল্পের সূচনা। বিনামূল্যে শিক্ষাদান, চিকিৎসা ও বৃত্তি-মূলক শিক্ষণ প্রভৃতি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

আগরতলাতে আরম্ভ হয়েছে মিশনের একটি শাখা কেন্দ্র। ইটানগর ও রাজমহেন্দ্রী গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের সেবায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় চালু করেছে।

অন্যান্যবারের ন্যায় পর্ষদ বা সংসদের বার্ষিক পরীক্ষায় মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রেরা স্থান পেয়েছে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং বিংশতম এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় স্থানগুলি হল তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, নবম এবং ত্রয়োদশ।

কাঁথিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তি স্থাপন ও রাজকোট আশ্রমে ৫ হাজার লিটার সম্পন্ন সৌর জল প্রণালীর উদ্ঘাটন এই বছরে রামকৃষ্ণ মঠের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মিশন ৮টি হাসপাতাল, ৬৬টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ১০টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৮৮ জন রোগীকে সেবা করেছে। এর মধ্যে ৩২টি দাতব্য-চিকিৎসালয় ও সমস্ত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়গুলি গ্রামাঞ্চলে ও পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত।

মঠে আছে ৫টি হাসপাতাল, ১৭টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ৪টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়। এতে ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ১২১ জন রোগীকে সেবা করা হয়েছে। গ্রামে ও পাহাড়ী এলাকায় রয়েছে ৩টি হাসপাতাল, ৮টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ৩টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র।

শিক্ষাক্ষেত্রে মঠ ও মিশনের সুনাম অব্যাহত। বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির ক্রমাগত আবেদনই এর প্রমাণ। মিশনের ৯৬৬ শিক্ষালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯৯৯ জন ও মঠের ৯২টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৯ হাজার ৬৭৬ জন ছাত্র ছিল। গ্রামে ও পাহাড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা হল ৪২৮টি; বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রসহ ৮৬৩টি।

"জাতীয় যুবদিবস"টি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত করেছে বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রগুলি। বেলুড়মঠে যুবমহাসম্মেলনে প্রায় ১১ হাজার যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল

ভারত বহির্ভূত মঠ ও মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতেও শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কৃতিও আধ্যাত্মিক সেবাকাজ অব্যাহত রয়েছে। বেলুড়মঠের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত সারা পৃথিবীতে মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৭০ এবং ৭৫।

## নতুন শাখাকেন্দ্র

শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মস্থান আঁটপুরে (হুগলী জেলা) অবস্থিত রামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রমটি জমি ও বাড়িসহ নতুন শাখা-কেন্দ্ররূপে রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী এক জনসভায় ঐ আশ্রম কর্তৃপক্ষের নিকট হতে দানপত্র গ্রহণ করে আশ্রমটিকে রামকৃষ্ণ মঠের নতুন শাখাকেন্দ্র-রূপে ঘোষণা করেন। আশ্রমটির নতুন নাম হল—**রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর।**

## ছাত্র কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের নয়জন ছাত্র ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৭শ, এবং যুগ্মভাবে ১৮শ স্থান অধিকার করেছে।

মাদ্রাজ সারদা বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী এ বছর (১৯৮৭) টকিওতে যে **'ইণ্টারসিটি মীট'** (Intercity Meet) নামে ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তাতে ভারতের প্রতি-নিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে রাজ্য ও জাতীয়স্তরে খেলা-ধূলার ক্ষেত্রে সে বহু কৃতিত্বের অধিকারিণী।

## ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২১ নভেম্বর ১৯৮৬, অ্যালং কেন্দ্রস্থ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন বিদ্যাভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অরুণাচল প্রদেশের উপরাজ্যপাল শ্রীশিব স্বরূপ।

# শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

## আবির্ভাব তিথি পালন:

গত ৯ ডিসেম্বর **শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ-জীর** এবং ২৭ ডিসেম্বর **শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের** জন্মতিথি উপলক্ষে সন্ধ্যায় তাঁদের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বিকাশানন্দ ও স্বামী শান্তরূপানন্দ।

**শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব:** গত ৭ পৌষ (২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬), মঙ্গলবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৪তম আবির্ভাব তিথি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজনগান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অগণিত ভক্ত নরনারী মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করেন। সকলকেই হাতে হাতে মায়ের প্রসাদ দেওয়া হয়।

সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত 'সারদানন্দ

হলে' শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ। তারপর বেলা ১২টা পর্যন্ত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীতপন সিন্‌হা ও শ্রীধ্রুব চৌধুরী। সন্ধ্যার পর পুনরায় শ্রীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'রামকৃষ্ণ-সারদা' লীলাগীতি পরিবেশিত হয়।

**শ্রীষ্টোৎসব :**

গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬, 'সারদানন্দ হলে' **ভগবান্ যীশুখ্রীষ্টের** আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর প্রতিকৃতির সামনে আরতির পর তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী শাস্তরূপানন্দ। আলোচনা শেষে ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

**স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্ম-জয়ন্তী :**

গত ৫ জানুআরি ১৯৮৬, সোমবার **শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ** মহারাজের ১২৩তম জন্ম-জয়ন্তী এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা ভোগ-রাগ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন-গান প্রভৃতি হয়। বহু সাধু ও ভক্ত এদিন স্বামী সারদানন্দজীকে প্রণাম নিবেদন করতে আসেন ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয় সন্ধ্যায় তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

## সংবাদ

### পরলোকে

করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন অক্লান্ত সেবক পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **কালীসদয় পশ্চিমা** গত ১৭ ডিসেম্বর '৮৬, ৯০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করে শ্রীশ্রীগুরুপদে চিরলীন হয়েছেন। পাঠ্য-জীবনের প্রথম দিকে তিনি করিমগঞ্জে ছিলেন। সেই সময় থেকেই করিমগঞ্জের শিক্ষিত সমাজ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কালীসদয়ের চরিত্রের দৃঢ়তা সততা ও সমাজকল্যাণ তৎপরতা দর্শনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। এই সময়ে করিমগঞ্জে নতুন মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হলে উহার হেডক্লার্ক-রূপে কালীসদয়কে মনোনীত করা হলে কালীসদয় কলেজের পড়া ছেড়ে করিমগঞ্জে চলে যান। ওখানে গিয়েই তিনি স্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিয়ে শ্রীহট্ট আশ্রমের ইন্দ্রদয়ালবাবুর (পরবর্তি-কালে স্বামী প্রেমেশানন্দ) পরিকল্পনা অনুযায়ী রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি নামে জনসেবামূলক একটি সংস্থা গঠন করে পূর্ণ উদ্যমে সমাজসেবার কাজ আরম্ভ করেন।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে কালীসদয় সাধু হওয়ার জন্য কয়েকবারই পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আব্দার করেছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ কিছুতেই তাতে সম্মতি দান করেননি। তিনি বার বার কালীসদয়কে বলেছেন, "এই পথ তোমার নয়; তুমি যে-ভাবে আছ, সেই ভাবেই থাক এবং করিমগঞ্জেই থাক। তোমার সবকিছু হবে। শ্রীগুরুর এই নির্দেশ সম্বল করে কালীসদয় ইহার পরও ৫০।৬০ বৎসর ধরে স্থিরভাবে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিত জপধ্যান করে পরম আনন্দে ছিলেন।

তাঁর বিদেহী আত্মা ইষ্টপদে চিরশান্তি লাভ করুক

# উদ্বোধন : ফাল্গুন ১৩৯৩



## সূচীপত্র

॥ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহা যুগসঙ্কটে জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল। আজ দেড়শত বর্ষ অতিক্রান্ত। তাঁর তমনাশক জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। শিল্পী শ্রীশিবরাম দত্তের মানসলোকের এই চিন্তারই প্রচ্ছদ-মুদ্রণ।

# উদ্বোধনের নিয়মাবলী

● **লেখক-লেখিকাদের জন্য :** ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার ও গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে রেজেষ্টারি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা ডাকটিকিট সম্বলিত কার্ড / ইন্ল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

● **গ্রাহকদের জন্য :** মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৫'০০ টাকা, বাংলাদেশ ৪৩'০০ টাকা, ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে সি মেল-এ ৮৮'০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২৩৩'০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২'৫০ টাকা। বছরের যে কোন সময়ে বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে মাঘ মাস থেকে।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।

● **আজীবন-গ্রাহকদের জন্য :** এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে ( প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০.০০ টাকা ) ৪০০'০০ ( চারশ ) টাকা দিলে আজীবন-গ্রাহক ( ৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ ) হওয়া যায়। যে কোন মাস থেকে আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পত্রাদি লিখবার সময় গ্রাহক-সংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানাতে হবে।

কার্যালয়ে নিজে এসে অথবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া, অথবা মনিঅর্ডারযোগে বা ডিমাণ্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট্ "Udbodhan Office" এই নামে করতে হয়।

● **প্রকাশকদের জন্য :** সমালোচনার জন্য দুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন।

● **বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :** কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাবে।

● **কার্যালয়ের সময় :** সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০, রবিবার বন্ধ।

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৩
ফোন : ৫৫-২৪৪৭




৮৯তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩৯৩

# দিব্য বাণী

## হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত "বেদ" বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য, যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

"সত্য" দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বিজ্ঞান" বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বেদ" বলা যায়।

"বেদ" নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম "বেদ"।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্ম্মানুভূতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন "ধর্ম্ম" কেবল "কথার কথা" ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ কাল পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশ-বিদেশে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র "বেদ"। অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদি দেশীয় ধর্ম্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্ত্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্ব প্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ "বেদ" নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশির সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই "বেদ"।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতি নীতিও এই কর্ম্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে

কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচার সকলও সৎশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়া গৃহীত হইবে। সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্ত্তী হওয়াই আর্য্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্ত ভাগই নিষ্কামকর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশ, কাল, পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায় সার্ব্বলৌকিক সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অধিক ভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র, বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত বর্ণন মুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিতেছেন; এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্য্যসন্তান, এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ-শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরক ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্য্যজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি? এবং সতত বিবদমান আপাতপ্রতীয়মান বহুধা বিভক্ত সর্ব্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্মনামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়? এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্বদেশিক স্বরূপ, স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ লোকের হিতের জন্য আপনাকে প্রদর্শন করিতে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি বর্ত্তমান সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্ত্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্তসংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার পুনঃ স্থাপন ও পুনঃ প্রচার হইবে, এই জন্য বেদমূর্ত্তি ভগবান্ এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্ম্ম-শিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান্ বারম্বার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়; প্রত্যেক পতনের পর আর্য্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্য্যবান হইতেছে। ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ, অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

এবং সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য, বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

পতনাবস্থায় সনাতনধর্ম্মের সমগ্রভাবসমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে, নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান, বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ, শ্রীভগবান্ পরম কারুণিক, সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাবসমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহায়, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

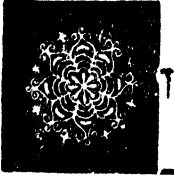
মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সেরূপ আর প্রদর্শন করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক; এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[ উদ্বোধন, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## মহামিলন-মন্ত্রের উদ্‌গাতা শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। যুগে যুগে কত মুনি-ঋষি, জ্ঞানী-গুণী ও ভক্তসাধক আবির্ভূত হইয়াছেন এই পুণ্যভূমিতে, মানুষকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির্ময়রাজ্যে লইয়া যাওয়ার জন্য। শুধু তাহাই নয়; জীবদুঃখে কাতর করুণাবিগলিত স্বয়ং ভগবান্‌কে বহুবার আসিতে হইয়াছে এই পুণ্যভূমিতে—ত্রিতাপদগ্ধ মানবকে শান্তির সুশীতল ছায়ার সন্ধান দিতে, ধর্মের গ্লানি অপনোদন-পূর্বক ধরণীর ভার লাঘব করিয়া প্রকৃত ধর্মকে পুনঃসংস্থাপন করিতে। এইভাবেই আমরা পাইয়া আসিয়াছি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণকে, এবং বর্তমান যুগে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে। তাঁহাদের আবির্ভাবের পটভূমি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বিভিন্ন যুগে তাঁহাদিগকে আসিতে হইয়াছে। স্বামীজীর কথায় আছে, "বারংবার এই ভারত-ভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় সংস্করণ, ৬।৫) ভগবানের আবির্ভাবের তাৎপর্যটি শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার স্বকীয় অননুকরণীয় প্রকাশভঙ্গিতে দুই-একটি কথায় যে-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলিয়াছেন: "সরকারী লোক—তাঁহাকে জগদম্বার জমিদারির যেখানে যখনই কোন গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে।" (শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়)

শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের পটভূমি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, যখন নানা ধর্মের অভ্যুদয়ে ও বিবাদে মানবমন বিভ্রান্ত, কোন্ ধর্ম সত্য, কোন্ ধর্ম ঈশ্বরলাভের যথার্থ পথ—এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইয়া মানুষ ধর্মের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছিল, তখন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের ধর্মে নূতন প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য এমন একজন শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, যাঁহার জীবনের গভীর ও বিশাল অনুভূতিতে সকল ধর্মের নিহিত আধ্যাত্মিক সত্য-গুলি প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে। এমন একজন শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল যাঁহাকে গ্রহণ করিলে কাহাকেও বর্জন করিতে হয় না, পরন্তু সকলকেই গ্রহণ করা হয়। সেই প্রয়োজন মিটাইতেই সর্বভাবের ঘনীভূত মূর্তি 'সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাব-সমন্বিত, সর্ববিদ্যা-সহায় যুগাবতাররূপে' শ্রীরাম-কৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁহার ভাব সমন্বয়ের ভাব; প্রেম প্রীতি, শান্তি-সাম্য ও সামঞ্জস্যের ভাব। কাজেই তাঁহাকে গ্রহণ করিলে কাহাকেও বর্জন করিবার প্রশ্নই আসে না; বরং সকলকেই গ্রহণ করা হয়।

'সমন্বয়' কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের নামের সহিত চিরসংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। সমন্বয় সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলে তাঁহাকে টানিয়া আনা চাই-ই। তাহা না হইলে আলোচনাই যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের নামের সহিত সমন্বয় কথাটির চিরসংযুক্তির সার্থকতা

কোথায়—তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। প্রকৃত সমন্বয়ের ভাব আসে জ্ঞানের দৃষ্টিতে, প্রেমের অনুভূতিতে। অন্য কোন কিছুতেই নয়। আর এই জ্ঞানের দৃষ্টি, প্রেমের অনুভূতি তখনই আসে যখন আমরা পরকে আপন করিয়া লইতে পারি। গীতায় (১৮।৬১) আছে: 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'—হে অর্জুন অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। যদি জানি যে অন্তর্যামীরূপে নারায়ণ সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, যদি জানি যে আমারই প্রিয় নানা রূপ ধরিয়া বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেছেন তবে কি আমি তাঁহার নানা রূপ ও নানা নামের প্রত্যেককে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি? এই ভালবাসা, পরকে আপন করিয়া লওয়ার মধ্যেই প্রকৃত সমন্বয়ের ভাব নিহিত।

প্রাচীন ভারতের ঋষিদের তপোবন ধ্বনিত করিয়া একদা উত্থিত হইয়াছিল এক মহামিলন সঙ্গীত—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—জগতের সবকিছুই ব্রহ্ম। উপনিষদের এই সত্যটি সাধনা দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া জড়বাদী যন্ত্র-সভ্যতার প্রারম্ভে তাঁহার মধুর কণ্ঠে সুমধুর সুরে আবার ধ্বনিত করিয়াছিলেন। জগতের সবকিছুই ব্রহ্ম—বেদান্তের এই নিগূঢ়তম সত্যকে, শাশ্বত ঐক্যমন্ত্রকে তিনি অতি সহজ-সরল ভাষায় সহজবোধ্য নানা উপমার সাহায্যে জনসমক্ষে প্রকাশিত করেন। তাঁহার সাধনলব্ধ সত্যের অন্যতম 'যত মত তত পথ' ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে কোন বিরোধ নাই—তত্ত্বটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে নানা উপমার সাহায্যে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন এক স্থলে ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন: "বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্ছে, কলসী করে—বলছে 'জল'। মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে, চামড়ার ডোলে করে—তারা বলছে 'পানী'। খ্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে—তারা বলছে 'ওয়াটার' (water)। যদি কেউ বলে, না, এ জিনিসটা জল নয়, পানী; কি পানী নয়, ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়, জল; তাহলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া; ধর্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি, কাটা-কাটি; এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে, আন্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই, তাঁকে লাভ করবে।" (কথামৃত, ২।১৩।৩) শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তত্ত্বকথা শুনাইয়া ক্ষান্ত হন নাই। নিজের সাধনলব্ধ অনুভূতিদ্বারা যুক্তিবাদের প্রতিটি তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের রহস্যগুলি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া প্রতিটি ধর্মের সঙ্গে রচনা করিয়াছেন অপূর্ব 'সমন্বয়-সেতু', উদ্বোধন করিয়াছেন এক উদার-মধুর সমন্বয়-যুগের। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের মহাবাণী 'যত মত তত পথ'-এর নির্দেশ শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের ধর্মসাধনার ইতিহাসে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহার সর্বজনীনত্ব। সাধারণতঃ দেখা যায় তত্ত্বের দিক হইতে তো বটেই, সেই সঙ্গে ব্যবহার ও আচার-অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপের দিক হইতেও ধর্ম-বিশেষের অবশ্য-পালনীয় অলঙ্ঘ্য কিছু নিয়মকানুন থাকে। যাহারা ঐ-সকল তত্ত্ব গ্রহণ বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, সেই ধর্মে তাহাদের স্থান নাই। সেই ধর্ম অনুযায়ী চরম লক্ষ্য স্বর্গ বা মুক্তি—কোনটাই তাহাদের জন্য নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মতে প্রকৃত ধর্মলাভের ক্ষেত্রে ইহাদের কোনটাই গ্রহণ বা পালনের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এইসব

আচার-অনুষ্ঠান নিতান্তই ধর্মের বহিরঙ্গ, অর্থাৎ গৌণ। আন্তরিকতাই মুখ্য। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ—যে কেহ আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে চাহিবে, সে-ই তাঁহাকে লাভ করিবে।

ধর্মসাধনার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি বিশেষ অবদান—ধর্মকে তথাকথিত পণ্ডিতদের ও আচার-অনুষ্ঠান-অনুরাগীদের কঠিন শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া জীবন-রাজপথের কেন্দ্র-বিন্দুতে স্থাপন করা। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবন যে পরস্পর বিরোধী নয়, বরং একে অন্যের পরিপূরক—একে অন্যকে পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ করে, এবং প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের প্রতিফলন কিভাবে সম্ভব তাহার স্পষ্ট নির্দেশ তিনি দিয়াছেন তাঁহার কথিত জীবশিববাদের মধ্যে। একদিন প্রাচীন ভারতে ঋষিকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল 'জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ, স জীবঃ কেবলং শিবঃ'—জীবই শিব, শিবই জীব। কিন্তু এতদিন এই কথা শাস্ত্রগ্রন্থে ও পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগের পথ নির্দেশ করিলেন নিজের জীবন ও বাণীর আলোকে। তিনি বললেন: "জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা"।—জীব যদি ঈশ্বরই হয় তবে জীবসেবাই তো ঈশ্বরের সেবা! সুতরাং উপাসনার্থে ঈশ্বরের সেবা-পূজাকে জীব-বহির্ভূত কল্পিত কোন ঈশ্বরে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া আমাদের চতুষ্পার্শে যে-সব মানুষ রহিয়াছে ঈশ্বরবোধে তাহাদের সেবা করার মধ্যেই রহিয়াছে আত্মোন্নতির প্রকৃষ্ট পথ। আর তাহাই হইল ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের প্রয়োগ। স্বামীজীর ভাষায় যাহাকে বলা যায় "বনের বেদান্তকে ঘরে আনা।"

সকল ধর্ম যেমন মূলতঃ এক, যাঁহাদের ভিতর দিয়া এই সকল ধর্ম অভিব্যক্তি লাভ করে, তাঁহাদের নিকট নানারূপ বাহ্য বৈষম্য সত্বেও সমগ্র মানবজাতিও মূলতঃ এক। বহুর মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দর্শনই তাঁহাদের সাধনার মূল কথা। এই ঐক্য ও সামঞ্জস্যের দিকটি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উপলব্ধ বহুর মধ্যে একের বা মৌলিক ঐক্যের যে জ্ঞান—একমাত্র এই জ্ঞানই বর্তমান জাতিধর্ম-বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা বহুধা-বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে প্রেমের যোগসূত্র স্থাপন করিয়া বিশ্বভ্রাতৃত্বের তথা বিশ্বমৈত্রীর বন্ধনে বিশ্বকে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম। এই জ্ঞান ব্যতিরেকে সাম্য, মৈত্রী, স্বার্থহীনতার কথা উচ্চারণ করা নিতান্ত মৌখিক ও ভিত্তিহীন।

ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির মূর্ত প্রতিচ্ছবি, ভারতাত্মার পূর্ণ প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম জীবন-সাধনার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে বুদ্ধি-সামর্থ্য অনুযায়ী দুই-একটি কথায় আলোচনার মাধ্যমে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান এখানেই সমাপ্ত করিলাম। তাঁহার পুণ্য আবির্ভাবের সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার চরণে আমাদের বিনীত প্রার্থনা:

"হে যুগদেবতা, মঙ্গলময়, চরণে তোমার
দাও আশ্রয়
মোদের জীবনে হোক্ তব জয় শুভমতি
দাও তব সেবায়।"

# শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বাভাস

## স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

সর্ব্বলোকললামভূত, বিজ্ঞানময় বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট স্বীয় বিভূতির কিয়দংশ বর্ণন করিয়া কহিলেন, "এ জগতে যেকোন জীবে বিশেষ শক্তি, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব দেখিতে পাইবে, তাহাকে মদীয় অনন্ত তেজোরাশির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিও।" সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়ভূতা এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতনধর্মাবলম্বী পুরুষমাত্রেই দেবকীনন্দনকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেহ কেহ আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি পাঠ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন, এমন কি, কেহ কেহ আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, নাস্তিকতা বা সন্দেহবাদ অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধিদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।...

যেখানে এই কালশক্তির বিকাশ সমধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়, সেইখানেই ঈশ্বরত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ভিতর এই মহাকালীর বিকাশ যে প্রভূত পরিমাণে ছিল, ইহা যে কেহ তাঁহার জীবনী শ্রীমদ্ভাগবতাদি পরম পবিত্র পুরাণসমূহে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন! কোন মহাশক্তিই তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি তাৎকালিক যাবতীয় রাজশক্তিকে পদানত করিয়া, নিজ অভিমত ধর্মপ্রাণা-রাজশক্তিরই অভ্যুদয় সাধনপূর্বক গীতোক্ত স্ববাক্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" "অর্জ্জুন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ, এবং ধর্ম্মের জয় সাধনের জন্যই আমি প্রতিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।" বিশ্বরূপ দর্শনপূর্বক পরম ভীত হইয়া অর্জুন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপ নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ। বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥" "দেববর, প্রসন্ন হউন, আমি আপনাকে নমস্কার করি, উগ্ররূপধারী আপনি কে? আপনি চরাচর বিশ্বের আদিভূত। আপনার অভিলাষ কি তাহা জানি না বলিয়া আমি আপনার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।" এইরূপে পৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ কহিলেন, "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" "আমি সর্ব্বলোক সংহারকারী অনাদি কাল"। আবার কহিলেন, 'ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে', 'তোমার ন্যায় কতিপয় ধর্মপ্রাণ লোক ভিন্ন আর কাহাকেও রক্ষা করিব না।' এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অনাদিমধ্যান্ত কাল ধর্মেরই পক্ষপাতী, কারণ ধর্মসংস্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক কালশক্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইনি অনাদি কাল হইতে ধর্ম্মেরই অভ্যুদয় সাধন করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ধর্ম্মের জয় লক্ষিত হয় বটে কিন্তু কলিতে ধর্ম্মের চারিটি পাদের মধ্যে কেবল একটি বর্ত্তমান আছে বলিয়া অধুনা অধর্ম্মেরই জয় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এ সিদ্ধান্তটি সত্য নহে, কারণ যদিও মিথ্যাবাদ, চৌর্য্য, নৃশংসতা ও অধার্ম্মিকতাকে আশ্রয় করিয়া কখন কখন কোন কোন মনুষ্যকে সুখলাভ করিতে দেখা যায়,

তথাপি যদি তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে ব্যক্তি ধর্ম্ম বা অধর্ম্মদ্বারা অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক পার্থিব সুখ ভোগ লাভে সমর্থ হইয়াছে, সে কখনও আপনাকে অধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিবে না পরন্তু তুমি তাহার ধার্ম্মিকতায় সন্দিহান হইয়াছ বলিয়া তোমার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হইবে। অধর্ম্ম এখনও নিশাচর পেচকের ন্যায় রজনীযোগেই বাহির হয়, দিবাভাগে লোক-সমক্ষে বাহির হইবার শক্তি তাহার কখনও ছিল না এবং হইবেও না। এখনও জগতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুল, ধর্ম্মরক্ষক শ্রীবিষ্ণুর অবতারসমূহ শঙ্করাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শেষাবতার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, আঞ্জনেয়াবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, ধর্ম্মময় বিগ্রহ জরতুষ্ট্র, ঈশা ও মহম্মদ এবং জ্ঞানময়বিগ্রহ পূজ্যপাদ শাক্যসিংহ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব সমগ্র জগৎকে শাসন করিতেছেন। ইঁহারা বর্ত্তমান সম্রাট্ ও রাজগণের উপর এখনও আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। অতএব কালশক্তি যে ধর্ম্মেরই পক্ষপাতিনী, ইহা নিঃসন্দেহ, এবং ইহার বিকাশ যাঁহাতে প্রভূত পরিমাণে লক্ষিত হয়, তাঁহাকে লোকে ঈশ্বরাবতার না বলিয়া থাকিতে পারে না।…

বর্ত্তমানকালে এই কালশক্তি মহাকালীর মূল স্থান কোন্ মহাপুরুষ অধিকার করিয়া আছেন, কাঁহার শ্রীচরণতরণী আশ্রয় করিলে সংসারসাগরে মগ্নপ্রায় শত শত নরনারী নিষ্কৃতি লাভ করিবে? নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদরূপ রাক্ষসদ্বয়ের করাল-কবলে পতিত অন্ধ, বিপন্ন মানবগণকে কোন্ মহাবীর রক্ষা করিতে সমর্থ? বর্ত্তমান মহান্ ধর্ম্মবিপ্লবের সময় অজ্ঞানান্ধকারতিতীর্ষু সত্য-পিপাসুগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া কাঁহার প্রত্যাশায় রহিয়াছেন? মাতৃকণ্ঠনিঃসৃত অমৃতময় বাক্য-তুল্য কোন্ স্নেহময়ী গুরুমূর্ত্তির সুললিত, সরল বাক্যামৃতবিন্দু ত্রিতাপতপ্তের নৈরাশ্যময় হৃদয়ে স্বর্গের জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে সমর্থ? বিজ্ঞানময়বিগ্রহ, ভক্তিরস-পরিপ্লুত অলৌকিক ভাবরাশির অদ্বিতীয় আধার, কোন্ লোকোত্তর পুরুষের নিরক্ষরতার সম্মুখে, অদ্য পৃথিবীর যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ভীতভীতের ন্যায়, শিষ্য প্রশিষ্যের ন্যায় যুক্ত করে অবস্থিত? কোন্ ছদ্মবেশী মায়াধিনায়ক আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া শ্রীমদ্বিবেকানন্দ-রূপ স্বকীয় বিজ্ঞান দীপ্তি দ্বারা অদ্য সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন?

বস্তুতঃ, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সকলই অলৌকিক। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, 'সে ঘরের উল্‌টো চাবি' অর্থাৎ জ্ঞানের ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পার্থিব উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণও এরূপ উপদেশ দিয়াছেন যথা,—যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র উক্ত উপদেশের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ইহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। কারণ, লোকে যাহাকে ভাল বলে, তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে মন্দ, লোকে যাহাকে সুখশান্তির কারণ বলিয়া জানে, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা দুঃখ ও অশান্তির হেতু। তাঁহার শক্তি দুর্নিবার্য্য ও অতুলনীয়া। এ-সকল বিষয় উত্তম রূপ হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে তাঁহার পরমপাবন জীবনের দুই চারিটী ঘটনার আভাস দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যেখানে শক্তির বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরত্ব পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, নিরক্ষর সপ্তমুদ্রামাত্র বেতনভোগী জনৈক পুরোহিতের এমন কি শক্তি থাকা সম্ভব, যদ্দ্বারা লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারে? মনুষ্যদৃষ্টিতে অসম্ভব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যদিও কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি লোকবুদ্ধির অগোচর ছিল,

অধুনা সভ্য জগতে এমন কেহই নাই, যিনি উক্ত মহাশক্তির পূজা না করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে আমরা বলি যে, নিরক্ষরতা ও নির্ধনতাই তাঁহার অতুলশক্তির পরিচায়ক। উপায় দ্বারাই উপেয় বস্তু লাভ করা যায়, সাধন দ্বারাই সাধ্য বস্তু আয়ত্তাধীন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বিনা উপায়ে বিনা সাধনে সাধ্য বস্তুকে আপন আয়ত্তে অনায়াসে আনিতে পারেন, তিনি যে বিপুল শক্তিসম্পন্ন, ইহা বুঝিতে কি আর প্রমাণ প্রমেয়ের আবশ্যক হয়? অস্ত্রশস্ত্র ও বিপুল বাহিনী সহায় যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়, কিন্তু যিনি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া একাকী বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন অসংখ্য সৈন্য সহায় বাহিনীপতিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি যে ঈশ্বরীয় শক্তির আধার ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বর্তমানকালে পণ্ডিত হইতে হইলে লোকে গ্রন্থরাশির আশ্রয় লয়েন। যিনি যত পরিমাণে গ্রন্থাভ্যাস করিতে শিখিয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে পণ্ডিত বলিয়া গণনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রন্থপাঠ একবারে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কখন কখন গ্রন্থকে গ্রন্থিস্বরূপ বলিতেন। কারণ অনেকস্থলে গ্রন্থপাঠ পাণ্ডিত্যাভিমানের কারণ হয় ও তজ্জন্য নানাবিধ গ্রন্থিল বন্ধন মানবমনকে সংসারে আবদ্ধ রাখে। যুবাকালে জনৈক বুদ্ধিমান্ বেদান্তশাস্ত্রাধ্যায়ীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এ ব্যক্তির নিকট তিনি সর্বদাই জগতের মিথ্যাত্ব, অবস্তুত্ব এবং ব্রহ্মের সত্যত্ব ও বস্তুত্ব সম্বন্ধে শুনিতেন, এবং উক্ত বেদান্তধ্যায়ী যে সর্বতোভাবে সাংসারিক বাসনাশূন্য, ইহা তাহার তর্ক ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা এক প্রকার স্থিরই করিয়াছিলেন। কিন্তু যৎসামান্য তণ্ডুলের লোভে একদা তাহাকে হীন পৌরোহিত্যকর্মে ব্রতী হইতে দেখিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, গ্রন্থপাঠে জ্ঞান লাভ হয় না, তাহার অন্য উপায় নিশ্চয়ই আছে। এইরূপে তিনি গ্রন্থপাঠে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। সামাজিক পণ্ডিতগণ সভামধ্যে বেদান্ত শাস্ত্রের অপার্থিব সত্যসমূহের আলোচনা করিতেছে দেখিলে তিনি তাহাদিগকে সুদূর গগনগামী গৃধ্রাদি খেচর সমূহের সহিত তুলনা করিতেন। কারণ, তাহারা গগন প্রদেশের মহোচ্চস্থান অধিকার করিলেও সর্ব্বদা পূতিগন্ধময় মৃত জীবদেহের অন্বেষণে পৃথিবীর অতি কদাকার স্থানসমূহে ন্যস্তদৃষ্টি হইয়া থাকে। তদ্রূপ পণ্ডিতগণের বদন হইতে তত্ত্ববাক্যের স্রোত প্রবাহিত হইলেও তাহাদের মন সর্ব্বদা অর্থের উপর পতিত থাকে। একদা জনৈক মূর্খ শিষ্য তাঁহার সংসারতারিণী অভয়দায়িনী সেবা পরিত্যাগ করিয়া ফার্সি গ্রন্থপাঠে অভিনিবিষ্ট হইলে তিনি মধুরবাক্যে তাহাকে কহিয়াছিলেন, "বৎস, ঈদৃশ গ্রন্থপাঠে মন বিক্ষিপ্ত হয়। এমন কি ইহাতে ভগবদ্ভক্তির হানি হয়।" তাঁহার এই শাসন বাক্যে উক্ত শিষ্যের চৈতন্য লাভ হইয়াছিল।

বহু গ্রন্থ অভ্যাস করিলে মানব মন অন্যের চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয় ও স্বকীয় চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে। গ্রন্থপাঠ যদি কাহারও চিন্তার সহায় হয়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই উপাদেয় কিন্তু যদি তাহা কাহারও চিন্তাশক্তির নাশক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার পরম পবিত্র মনোমধ্যে সুগুপ্ত অতুল জ্ঞানরাশির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং স্বল্পকাল মধ্যে এত জ্ঞানধনের অধিকারী হইলেন যে, স্বীয় অক্ষয় কোষ হইতে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে তাহা অহরহ অবাধে বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী নির্ধনী তাঁহার অক্ষয়জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানধন লাভ করিয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতেন।

আমরা উপনিষদে পাঠ করিয়াছিলাম যে, দুই প্রকারের বিদ্যা আছে, পরা ও অপরা। তথায় বেদ বেদান্তাদি পাঠ অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু পরা বা শ্রেষ্ঠা, বিদ্যা ঈশ্বর-প্রাপিকা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা তখন আমরা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বুঝিলাম, পরা বিদ্যা কাহাকে বলে। এই পরা-বিদ্যা বলেই তিনি মহাপণ্ডিত হইতে মহামূর্খেরও মোহ আবরণ অপসারিত করিতে পারিতেন। এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্বের বিশেষ পরিচায়ক।

ইদানীং ধন না থাকিলে জগতে কাহারও সম্মানলাভের সম্ভাবনা নাই। ধনে মূর্খকেও পণ্ডিত করায়। ধনে অসম্ভব সম্ভবপর হয়। সুতরাং অধুনা সর্বত্র অর্থশক্তিরই পূজা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থকে সর্বানর্থের মূল জানিয়া তাহার ধাতুময়ী মূর্তির প্রতি এতদৃশ ঘৃণাপরায়ণ হইয়াছিলেন যে, কোনও ধাতুময় দ্রব্য তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না, তাহা করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। তিনি এইরূপ ধনস্পর্শলেশশূন্য ছিলেন বলিয়াই মহাধনিগণ তাঁহার দাসত্ব করিয়া, তাঁহার জন্য বিপুল অর্থব্যয় করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যিনি অর্থ চাহেন না, অর্থ যে আপনা আপনি তাঁহার নিকট আইসে, অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।...

শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎপ্রসূতি কালীকেই আপনার জন্মদাত্রী বলিয়া জানিতেন। শিশু যেরূপ কখনও মাতৃ অঙ্ক ত্যাগ করিতে চাহে না, তিনিও সেইরূপ কখনও মাতৃ অঙ্ক হইতে উত্থিত হইতে চাহিতেন না। অহরহ মাতৃ সমক্ষে থাকিয়া নির্ভয়ে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেন এবং জানিতেন, এ সংসারে মাতৃপাদমূল ভিন্ন আর কুত্রাপি নির্মল আনন্দভোগের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই তিনি আনন্দপ্রিয় মানবগণকে নিজ জননীর নিকট লইয়া যাইতে চাহিতেন। বাস্তবিকই যতদিন স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার মাতৃভাব থাকে, ততদিন তাঁহারা তোমায় সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু যখনই তাঁহাদের প্রতি তুমি কামভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ কর, তখনই বিবাহেচ্ছা তোমার হৃদয়ে বলবতী হয়। বিবাহের পর নারীকে পত্নীরূপে লাভ করিলে লালন পালনের ভার আর নারীতে থাকে না, তাহা তোমার উপর আসিয়া পড়ে। পত্নী ভার্য্যা বা ভরনীয়া হয়েন। এতদিন বালকের ন্যায় লালিত পালিত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলে, এক্ষণে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চিন্তারূপ জ্বরে শরীর মনকে মলিন করিয়া দুঃখময় সংসারে দুঃখের ভার মস্তকে ধারণ করতঃ অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছ। নির্মল ললাটে চিন্তার রেখা দেখা দিল, হৃদয় হইতে শান্তি চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ এইজন্য বলিতেছেন যে, "দেখ, নবজাত গোবৎস কেমন সুন্দর, কত আনন্দময়, ইতস্ততঃ কেমন লম্ফঝম্ফ দিয়া বেড়াইতেছে। যেন জগতে কেবল আনন্দভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে উহার গলায় রজ্জু সংলগ্ন হইবে, সেই দিন হইতেই উহার রূপ ও আনন্দ উভয়ই ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে। বিবাহ বন্ধনের পূর্ব্বে মানব সন্তানও ঐরূপ আনন্দে জীবনযাপন করে, কিন্তু সংসারের রজ্জু গলদেশে একবার সংলগ্ন হইলে, সে সুখ কোথায় পলাইয়া যায়।"

স্বাধীনতাই সুখের মূল। স্বাধীনতাই মানবকে অমিততেজঃসম্পন্ন করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্বাধীনতাধন কখনও নষ্ট করেন নাই।

কোনও রূপ বন্ধন তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ করতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয় অনন্ত আকাশের ন্যায় বিশাল ছিল। এই হেতুই তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন। তিনি কহিতেন, "ভগবানের কখন ইতি করিও না। কেহ কখন তাঁহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয় নাই, হইবেও না। তিনি চিৎসমুদ্রস্বরূপ, শিব শুক সনক নারদাদি সেই সমুদ্রের এক এক ফোঁটা জল পান করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সাকার নিরাকার, ও এতদুভয়ের অতীত, ইহা জানিয়াছি। আর যে তিনি কি তাহা জানি না। পৃথিবীতে যত ধর্মমত আছে, তৎসমস্তই তাহার শ্রীপাদমূলে যাইবার এক একটি পথ। তুমি যে পথে আজন্ম স্থাপিত হইয়াছ, সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হও, কালক্রমে চিরশান্তিনিকেতন বিভু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর আমিত্ব ছিল না। তিনি "আমি, আমার" এই দুই কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। যে স্থলে সচরাচর লোকে "আমার" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, তিনি সেই স্থলে নিজ হৃদয়ে হস্তস্থাপন পূর্বক "এখানকার" শব্দ প্রয়োগ করিতেন যথা "আমার ভাব এরূপ নয়" বলিতে হইলে তিনি "এখানকার ভাব এরূপ নয়" ইহা বলিতেন। তাঁহার নিজের আমিত্ব তাঁহার ভিতর ছিল না বলিয়া জগৎ-প্রসূতি কালীর আমিত্বই তাহার ভিতর দিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ পাইত। অর্থাৎ বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার অসংখ্য পুত্রকন্যাগণকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে মানব, শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস আমি তোমায় দিলাম। আমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র জীব তাঁহার অনন্ত শক্তির এক কণাও বিবৃত করিয়া বলিতে সমর্থ নয়। তুমি যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হও, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বলোকপ্লাবন নিখিল সন্তাপহর চরিত্র সাগরে অবগাহন কর। ক্রমে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি দ্বারা তোমার হৃদয় সমুদ্ভাসিত হইবে। প্রাণে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইবে। মন আনন্দময় হইয়া যাইবে ও তুমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে।*

* 'উদ্বোধন'-এর ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ( ১৫ ফাল্গুন, ১৩১২ ) থেকে সংক্ষেপিত আকারে পুনর্মুদ্রিত।

# যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

## স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা যুগাবতার বলে থাকি। প্রশ্ন হতে পারে, তিনি এমন কী কাজ করেছেন যার জন্য এতবড় আখ্যা তাঁকে দেওয়া চলে? কথাটি একটু বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে ধর্ম হচ্ছে একটা কৃত্রিম জিনিস, যা নাকি জনকয়েক মতলববাজ লোক—যারা ধনী বা পুঁজিবাদী (capitalist)—মতলব করে গরীবদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যাতে তাদের শোষণ করতে পারা যায়। ধর্ম কিছু স্বাভাবিক জিনিস নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সে কথার জবাবে কি করলেন? আমরা দেখতে পাই, ছেলেবেলায় তিনি মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, হাতে রয়েছে একটা টেকোতে মুড়ি—তা চিবোতে চিবোতে তিনি যাচ্ছেন। এমন সময়ে আকাশে একখানি কাল মেঘ উঠল। সেই মেঘের বুক চিরে এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে যাচ্ছে। সেই সৌন্দর্য দেখে তাঁর ভেতরে তিনি এমনভাবে ডুবে গেলেন যে বাইরের কোন জ্ঞান তাঁর রইল না। তিনি আত্মহারা হয়ে গেলেন। "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—সেই সুন্দরের ভেতরে তিনি এমনভাবে ডুবে গেলেন

যে বাহ্যজ্ঞান লোপ হল। এই সুন্দর, এই সত্য আপনা থেকে প্রকাশিত হন তাঁদের কাছে, যাঁরা এই সত্যকে চান। আরও কি দেখতে পাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে? দীক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, সেরূপ দীক্ষা তাঁকে কেউ দেয়নি। কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দেয়নি কেমন করে ভগবানকে ডাকতে হবে, বা দেখিয়ে দেয়নি কেউ ইনি হচ্ছেন ভগবান। তাহলে তাঁর ভেতরে এই সুদূরের আহ্বান কি করে এল, কি ক'রেই বা তিনি অসীমের ভেতরে এমনভাবে ডুবে গেলেন? রবি ঠাকুরের ছোট্ট একখানি কবিতা মনে পড়ে—"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" ভগবান এই ছোট্ট মানুষের ভেতর দিয়ে নিজেকে আপনা থেকেই প্রকাশ করেছেন। মানুষের ভেতরে ভগবান রয়েছেন, সেকথা গীতাতে বলেছেন—'আমি সর্বভূতের হৃদ্দেশে, অন্তঃকরণে বর্তমান রয়েছি।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভগবদ্দর্শন বা স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া—এটা তাঁকে কারোর শিখিয়ে দেওয়া নয়। ভগবান তাঁরই ভেতরে ছিলেন। এমনিভাবে তিনি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করলেন।

আর একদিনের কথা। শিবরাত্রিতে গ্রামে যাত্রা হবে ঠিক হয়েছে। রাত্রি জাগরণের যাতে সুবিধা হয় তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু যাত্রার অধিকারী এসে বললেন, আমাদের একটা মস্ত-বড় অসুবিধা হয়ে গেছে। যে শিব সাজবে তার অসুখ করেছে। 'তাহলে তো যাত্রা হওয়া সম্ভব নয়'—গ্রামের লোকেরা প্রমাদ গুণলে। 'কি হবে তাহলে'? তখন একজন বললে, 'কেন এই তো আমাদের গদাই রয়েছে।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম গদাই। 'গদাই তো সুন্দর অভিনয় করতে পারে, তাকে সাজিয়ে দিলেই হবে।' তাই হল। তাঁকেই শিব সাজিয়ে অভিনয়ের জন্য নিয়ে আসা হল আসরে। কিন্তু তিনি শিবের ভাবেতে এমনি বিভোর হয়ে গেলেন যে অভিনয় আর তাঁর দ্বারা করা হল না।

আরও একদিনের কথা। গ্রামের মেয়েরা যাচ্ছিল ৺বিশালাক্ষী দেবী দর্শনের জন্য। গদাইও সঙ্গে। গদাই ভাল গান গাইতে পারেন। পথে যেতে যেতে দেবীর মহিমাসূচক গান আরম্ভ হল। কিন্তু গদাই সেই গানের ভাবেতে এমনি বিভোর হয়ে গেলেন যে ৺বিশালাক্ষীর মন্দিরে পৌঁছবার আগেই তিনি বাহ্যহারা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মেয়েরা তখন কেউ জল দিচ্ছে, কেউ বা হাওয়া করছে। এইভাবে তাঁর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে হল।

এই যে দেখা যাচ্ছে বারবার একটা ভগবদ্ভাব তাঁর ভেতরে আসছে, একটা অসীমের ডাক, একটা অনন্তের ডাক যেন তাঁকে আপনা আপনি টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোথা থেকে কোথায়,—এটা কি করে হল? এর প্রকৃত উত্তর হল, মানুষের ভেতরে কেউ ধর্মভাব ঢুকিয়ে দেয়নি। ওটা মানুষের ভেতরে আছেই। আমরাই নানারকম কৃত্রিম আবরণের দ্বারা সেটাকে ঢেকে রাখি। ভগবানকে আমরা প্রকাশিত হতে দিই না—এটা আমাদের দুর্বলতা। কিন্তু ভগবান নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সর্বদাই ব্যাকুল। তিনি সব সময়ে আত্মপ্রকাশ করতে চান। এ কথাই ঠাকুরের জীবনের দ্বারা প্রমাণিত হল।

আর একটা কথা আমরা শুনতে পাই। টাকা-কড়ি না হলে মানুষ কি করে বাঁচবে? সভ্যতাটা এগোয় উদরপূর্তির ভেতর দিয়ে—Civilization moves on the belley। উদর-পূর্তি যদি না হয় তাহলে মানুষ সংস্কৃতির দিকে এগুতে পারে না। এবং গরীবদের কখনও ধর্ম হয় না। যে অশিক্ষিত, পড়াশোনা করেনি,

শাস্ত্র পড়েনি, সে আবার ধর্ম করবে কি তার কি ধর্ম হতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতর এই সমস্ত কথার উত্তর আমরা পেতে পারি। অবশ্য বলতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণ তো ঠিক নিরক্ষর ছিলেন না। উত্তরে বলি, তিনি সামান্য একটু লেখাপড়া করেছিলেন—পাঠশালাতে যেটুকু হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তা তাঁর ছিল না। আমরা যাকে পাণ্ডিত্য বলি, তা তাঁর না থাকলেও কথামৃতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁর যে সমস্ত কথা আমরা দেখতে পাই, তাতে বুঝতে পারি যে, সমস্ত পণ্ডিতদের ছাড়িয়ে কত দূরে তিনি চলে গেছেন। সব তাঁর আছে, সব পাণ্ডিত্য তাঁর মধ্যে রয়েছে। তিনি বলতেন, 'মা রাশ ঠেলে দেন।' যে ধান ওজন করছে, ধান যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন আর একজন ধানের রাশ তার দিকে ঠেলে দেয়। সেইটি নিয়ে সে আবার ওজন করতে থাকে। ভাগনে হৃদয় ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'সব কথা একসঙ্গে বলে ফেল কেন ? আমি ভাবছিলাম পরে অন্য কিছু বলবে।' ঠাকুর বললেন, 'আমি কি বলছি ? মা আমাকে বলাচ্ছেন। মা রাশ ঠেলে দেন।' কাজে কাজেই মা সেইরকম ভাবে তাঁকে রাশ ঠেলে দিতেন, আর সেই জ্ঞান তাঁর পুঁথি-পড়া জ্ঞান নয়। জ্ঞান তাঁর আপনা থেকেই হয়েছিল।

আর টাকাকড়ি ? শ্রীরামকৃষ্ণ এক হাতে নিলেন টাকা, অন্য হাতে নিলেন মাটি। তারপর এটা ওহাত, ওটা এহাতে করছেন। 'টাকা মাটি মাটি টাকা'—এই ভাবতে ভাবতে যখন বোধ হয়ে গেল যে মাটিটা ও টাকাটাতে আসলে কোন তফাৎ নেই, তখন দুটোকেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মা গঙ্গায়, ছুঁড়ে দিয়ে আবার বলছেন,' তখন একটু পাটোয়ারী বুদ্ধি এলো, ভাবলাম মা লক্ষ্মীকে ছুঁড়ে ফেললাম, তাহলে আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হব ?' 'লক্ষ্মী' কথাটির এক অর্থে যেমন টাকা-কড়ি বোঝায়, তেমনি আর এক অর্থে মঙ্গলও বোঝায়। লক্ষ্মী মঙ্গলের দেবী। অর্থাৎ ভাবটা হল আমি কি অমঙ্গলের ভিতর গিয়ে পড়ব ? তখন বললেন, 'মা, তাহলে তুমি হৃদয়েতে থাকো।' মা 'মঙ্গলময়ী' হয়ে তাঁর হৃদয়েতে অবস্থান করেছিলেন।

তাই ঠাকুরের ভাব ছিল যে ধনদৌলত না হলে ভগবানকে ডাকা যায় না, বা গরীব হলে ভগবানকে ডাকতে পারে না—এমন কোন কথা নেই। বরং গরীবদের ভেতরে ধর্মভাব আরও বেশি দেখতে পাওয়া যায়। আমার মনে আছে একজন ভদ্রলোক আমেরিকা থেকে এসে-ছিলেন। তাঁর জুতো সেলাইয়ের দরকার ছিল। জুতো সেলাই করতে দিয়েছেন এক মুচিকে। সেলাই শেষ হলে পর তিনি মুচিকে একটা টাকা দিলেন। তখনকার এক টাকা এখনকার দিনের এক টাকা নয়। তা মুচি বার আনা ফেরৎ দিয়ে চার আনা সে রাখল। ভদ্রলোক নিতে বলায়ও সে নিল না। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'এই দেখুন যারা টাকা চায় না তারা গরীব তো চিরকাল থেকেই যাবে।' কেমন উল্টো ভাবে জিনিসটা বুঝা হল ভাবুন। মুচির যে একটা ধর্মভাব আছে, 'আমার ন্যায্য পাওনা যা পাচ্ছি তার চেয়ে বেশি আমি নেব না'—গরীবের ভেতরে এই যে ভাবটুকু আছে, পাশ্চাত্যের লোকেরা সেকথা বুঝতে পারবে না, ধরতেও পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে গরীব ছিলেন, অজ্ঞ ছিলেন, পাণ্ডিত্য তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর ভেতর ধর্মের যা বিভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয় ? একথাই প্রমাণিত হয় যে মানুষের ভেতরের একটা স্বাভাবিক জিনিস আছে যা ধনের উপর নির্ভর করে না, পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না, লেখাপড়া বা

অন্য কোন কিছুর উপরই নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে মানুষের আত্ম-বিকাশের চেষ্টার উপরেতে, ব্যাকুলতার উপরেতে, সত্যবাদিতার উপরেতে।

আরও কত কথাই বলতে পারা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। বলতে পারা যায় তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা। বুদ্ধ-চরিত থেকে আমরা পাই যে তিনি রাজার ছেলে ছিলেন। রাজত্ব ছেড়ে, তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে ছেড়ে, সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী হয়েছিলেন সত্য কথা, কিন্তু অন্য কথাগুলি ইতিহাসের দিক থেকে অনেকটা সত্যি, তবে পুরোপুরি নয়। রাজার ছেলে যে তিনি ছিলেন তা নয়। ওখানে সত্যিই কি ছিল? জনকয়েক ধনীলোক ছিলেন। তাঁরা নিজে থেকে, মিলেমিশে একসঙ্গে রাজত্ব চালাতেন—ইংরেজীতে যাকে বলে Oligarchi—নির্দিষ্ট অল্প সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা শাসিত রাজ্য। এঁরা প্রত্যেকেই রাজা নামে অভিহিত হতেন। বুদ্ধদেবের পিতা সেইরকম এক রাজা ছিলেন বলা যায়। সেই রাজ্য বুদ্ধদেব ত্যাগ করেছিলেন। এটা তাঁর ত্যাগ বটে। ঠিক কথাই।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতরে আমরা কি ত্যাগ দেখতে পাই? তাঁর তো ছাড়বার মতো কিছু ছিল না। পরবার মতো কাপড়ই তাঁর ছিল না। কাজেই তিনি ছাড়বেনটা কি? বেশ, তাঁর ছাড়াটা দেখুন। ধাতু দ্রব্য তিনি স্পর্শ করতে পারতেন না। (অবশ্য সব সময়ের জন্য নয়)। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব আসত। একটা সময় এমনি এসেছিল যে ধাতুদ্রব্য তিনি স্পর্শ করতে পারতেন না। অজান্তে যদি ছুঁয়ে ফেলতেন তাহলে বিষের জ্বালার মতো কষ্ট হত। একসময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বা তখনকার নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তখন কলকাতায় গেছেন। এই অবসরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিছানায় চাদরের তলায় একটি টাকা (ধাতু) লুকিয়ে রাখলেন। পরীক্ষা করে দেখবেন যে ঠাকুরের যে ধাতু স্পর্শ করলে কষ্ট হয় তা সত্যি কিনা। খানিকক্ষণ পরে গাড়ির আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলেন ঠাকুর আসছেন। তাই ঠাকুরের ঘরে ঢুকলেন। এদিকে ঠাকুরও ঘরে প্রবেশ করে বিছানায় বসতে যাচ্ছেন, অমনি লাফিয়ে উঠলেন, যেন কিছুতে কামড়াচ্ছে—খুব কষ্ট হচ্ছে। উঠে সেবককে বললেন, 'দেখ্ তো রে, বিছানা ঝেড়ে দেখ্ তো এখানে কি রয়েছে!' বিছানার চাদর সরাতেই টাকা বেরিয়ে পড়ল। বুঝলেন কেউ পরীক্ষা করছে। নরেন্দ্রনাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝলেন এটা নরেনেরই কাণ্ড। বললেন,—'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি'। এইরকম ছিল ঠাকুরের ত্যাগের ভাব।

সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন বুদ্ধদেব। ঠাকুর কি করলেন? শ্রীশ্রীমা যখন নাকি জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, তখন নিজের ঘরেতে তাঁকে থাকতে দিলেন। শুধু নিজের ঘরেতে থাকতে দেওয়া নয়, নিজের বিছানায় তাঁকে শুতেও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন সাংসারিক সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে রাখেননি। তার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমা নহবতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন এবং ঠাকুর নিজের ঘরেই রইলেন। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এই যে একটা অসাংসারিক সম্বন্ধ, এরকম সম্বন্ধের কথা আমরা জগতের ইতিহাসে দেখতে পাই না—এ এক বিরল ব্যাপার। সত্যপ্রভৃত ঠাকুরের জীবনেই এটা আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই। একে আপনারা ত্যাগ বলতে হয় ত্যাগ বলুন, গ্রহণ বলতে হয় গ্রহণও বলুন, কিন্তু এটা ত্যাগ-গ্রহণের সম্বন্ধের বাইরের যেন

একটা অপূর্ব অদ্ভুত ব্যাপার।

এইভাবে ঠাকুরের জীবনের নানান ঘটনার আলোচনা করা যায়। যীশুখ্রীষ্টের জীবনে একটি মাহাত্ম্যের কথা বলা হয় যে, তিনি রোগীদের প্রতি ও গরীবদের প্রতি অত্যন্ত করুণাপূর্ণ ছিলেন। তাদের যাতে মঙ্গল হয় সেজন্য তিনি চেষ্টা করতেন। ঠাকুরের জীবনেও সেই সেবার ভাব নানা কাজেতে, নানাভাবে দেখতে পাই। যেমন তিনি যাচ্ছিলেন তীর্থ দর্শনে মথুরানাথের সঙ্গে। দেওঘরে উপস্থিত। সেখানে দেখলেন কতগুলো লোক অত্যন্ত গরীব, তাদের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো হয়ে আছে, অস্থিচর্মসার শরীর। দেখে তাঁর মনে অত্যন্ত কষ্ট হল, দুঃখ হল। তিনি মথুরানাথকে বললেন 'এদের একমাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।' মথুরানাথ চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা, এরাও সংখ্যায় অনেক,এদের যদি এতগুলো টাকা দাতব্য করতে যাই তাহলে আমাদের তীর্থ দর্শনের কী হবে?' ঠাকুর ওসব কথা কিছু না শুনে ঐ গরীবদের মধ্যে বসে পড়লেন, বললেন, 'দূর শালা আমি কাশী যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব।' এই শ্রীরামকৃষ্ণই দক্ষিণেশ্বরে মায়ের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, 'মা আর একটা দিন বৃথা চলে গেল এখনও দেখা দিলি না,' তখন মা তাঁর ব্যাকুলতা দেখে দর্শন দিয়েছিলেন, মৃন্ময়ীতে তিনি চিন্ময়ীর দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি মা কালীর নাকের কাছে তুলো রেখে দেখেছিলেন যে তুলো মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নড়ছে। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছিলেন অপরদের অপপ্রচার থেকে। তারা বলত কিনা হিন্দুরা পৌত্তলিক। সেই পৌত্তলিকতার অপবাদ থেকে তিনি হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, মা কালীর দর্শন পেয়ে এবং সকলকে সেইকথা জানিয়ে। সেই শ্রীরামকৃষ্ণ আজকে বললেন কি? না, আমি শিব দর্শনে পর্যন্ত যাব না। কেন বললেন? তিনি ঐ গরীবদের মধ্যে শিবকে দর্শন করেছিলেন। তিনি নিজেই বলে গেছেন,'দয়া ভগবান করতে পারেন। মানুষে দয়া করতে পারে না।' মানুষ কি করতে পারে? না 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করতে পারে। সে শিবজ্ঞানে জীবের যে সেবা, তিনি নিজ-হাতে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। মথুরানাথকে বাধ্য হয়ে লোক পাঠিয়ে কলকাতা থেকে কাপড় আনাতে হয়েছিল, লোককে খাওয়াতে হয়েছিল।

এইভাবে এই সেবাকার্য ঠাকুরের জীবনে অন্যান্য ঘটনায়ও আমরা দেখতে পাই। যেমন মথুরানাথকে একসময়ে বলেছিলেন, সাধুদের আবশ্যকীয় দ্রব্য দিয়ে একখানি ঘর পূর্ণ করে রাখতে। মথুরাবাবু তাঁর কথা শুনে ঘর ভর্তি করে জিনিসপত্র রেখেছিলেন এবং ঠাকুর সে-সব জিনিস দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আগত বা সাগরস্নানে যেতে উদ্যত সাধুদের সেবা করেছিলেন। এমনিভাবে সকলের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত এবং সকলের সাহায্যের জন্য তিনি যতটুকু যেমনভাবে পারতেন তাই করতেন।

তারপর তাঁর সত্যবাদিতার কথা। সত্যবাদিতার কথায় আমরা শুনতে পাই যে শ্রীরামচন্দ্র সত্যবাদিতার জন্য, পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাজ্য ত্যাগ করে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে চলে গেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যবাদিতার দৃষ্টান্ত আমরা কোথায় পাই? তিনি একসময়ে নবদ্বীপ দর্শনে গিয়েছিলেন। নবদ্বীপ দর্শনে গিয়ে তাঁর মনে হল, 'এ কোথায় এলুম? কোনোরকম ভাব আমার আসছে না। এখানে যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন, নিত্যানন্দ ছিলেন, তাদের ভাবে

একটা বিহ্বলতা আসা, সেরকম কিছু বিহ্বল ভাব এখানে তো আমার হচ্ছে না! কেন এরকম হল?' তারপরে তিনি যখন নৌকো করে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ দেখতে পেলেন যে গৌর-নিতাই আকাশপথে তাঁর দিকে ছুটে আসছেন। দেখে 'ঐ এলোরে, এলোরে' বলে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেন। তারপরে জানা গেল, নবদ্বীপে আসলে যেখানে মহাপ্রভুর জন্মস্থান ছিল সেটা ভেঙ্গে গঙ্গা গর্ভে চলে গেছে। এই যে সত্যবাদিতা, যেটা সত্য সেটা তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল আপনা থেকে। তিনি নিজে সত্যকে যে ধরেছিলেন তা নয়, সত্য যেন তাঁকে ধরেছিল। ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন, 'যে বাবার হাত ধরে চলে, সে বরং পড়ে যেতে পারে। কিন্তু বাবা যার হাত ধরে, সে পড়ে না।' সত্য তাঁকে টেনে আগলে রেখেছিল বলে তিনি কখনও পদস্খলিত হতেন না।

এমনি আর এক দৃষ্টান্ত। তিনি একদিন শম্ভুমল্লিকদের বাড়িতে বসে কথাবার্তা বলছেন। তাঁর একটু পেটের অসুখ ছিল। শম্ভুবাবু শুনে বললেন, 'আমার কাছ থেকে একটা ঔষধ নিয়ে যাবে। যাবার সময়ে আমি সেটা দেব।' ইতিমধ্যে কথাবার্তার মধ্যে শম্ভুবাবু একটা কাজের জন্য বাড়ির ভিতরে গেলেন। ফিরতে অনেক দেরি হচ্ছে। ঠাকুরের এদিকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরতে হবে। মন্দিরের প্রায় ফার্লংখানেক দূরে ছিল শম্ভুবাবুর বাড়ি। এখন সে বাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আমরা সে বাড়ি দেখেছি। তা ঠাকুরকে যেতে হবে অন্ধকারের মধ্যে। তিনি ভাবলেন, 'শম্ভু তো ওষুধের পুরিয়াটা রেখে গেছে, ওটা হাতে করে নিয়ে গেলেই হল।' সেটা তুলে নিয়ে তিনি চললেন দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরের দিকে। কিন্তু রাস্তায় যখন বেরুলেন, আর পথ দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর পা কে যেন টেনে নালার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার সব। আবার যখন ফিরে তাকাচ্ছেন শম্ভুবাবুর বাড়ির দিকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। তখন মনে পড়ল, তাইতো, আমি মিথ্যা কাজ করেছি। শম্ভু বলেছিল, 'আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে।' কিন্তু ও ফেলে গেছে, আর আমি তার কাছ থেকে না নিয়ে ওষুধের পুরিয়াটা নিজেই তুলে নিয়ে এসেছি। এ তো ঠিক সত্যবাদিতা হল না।' সুতরাং তিনি আবার ফিরলেন। ফিরে গিয়ে দেখলেন তাদের বাড়ির বাইরের দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। জানালাটা খোলা ছিল। সেই জানালার ফাঁক দিয়ে পুরিয়াটা ভিতরে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, 'এই তোমাদের ওষুধ রইল গো, আমি চললুম।' এইবার যখন দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাচ্ছেন, তখন সব পরিষ্কার। এমনি করে সত্য তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল।

কাজে কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে যে সমস্ত অপপ্রচার চলেছে যে সত্যবাদিতা বলে কোন জিনিস নেই, বা ব্যাকুলতা বলে কিছু থাকতে পারে না, বা কিছু ত্যাগ সম্ভবপর নয়, তার প্রতিবাদস্বরূপ আমাদের সামনে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁদের জীবন-কথাও রয়েছে। তাঁদের ছবিও অনেক সময়ে বেরোয়। কিন্তু তার অনেকটাই আমাদের কল্পনা-প্রসূত। তখনকার দিনে আলোকচিত্র তোলবার (photography-র) ব্যবস্থা ছিল না। আর কেউ ছবি এঁকেও রেখে যায়নি। শতশত বৎসর পরে কেউ হয়তো তাঁদের কথা গ্রন্থাকারে, কেউ কবিতাকারে লিখেছেন। তেমনি করে মহাভারত লিখেছেন ব্যাস কত বৎসর পরে তা কে জানে? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের যা কিছু ঘটনাবলী, তাঁর আত্মচরিত—নিজের মুখে যা বলে গেছেন তিনি, কথামৃতের পৃষ্ঠায় যা ছাপা হয়ে আছে, বা

লীলাপ্রসঙ্গে যা ছাপা হয়ে আছে, তা থেকে আমরা পরিষ্কার জানতে পারছি। এবং তখনকার দিনে তাঁর ছবি তুলে রাখা হয়েছিল—তাও আমরা সামনে পাচ্ছি। এ তো কবি কল্পনা নয়, গল্প নয়; এ সত্যিকারের ঘটনা। আজকালকার লোকেরা চোখের সামনে না দেখলে তো কিছু বিশ্বাস করবে না। তাই তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেলেন—"এই দেখ। আমাকে দেখ। আমার জীবন দেখ। আমি যা বলছি শোনো। ভাল করে বুঝে নাও, দেখে নাও, যাচাই করে নাও।" যাচাই না করে পরীক্ষা না করে তো কিছু গ্রহণ করা হয় না। ঠাকুর নিজেও বলতেন, ধর্মটা কথার কথা নয়। ধর্ম হচ্ছে অনুভূতির জিনিস। অনুভবের জিনিস। তবে অনুভবের জন্য একটা নতুন যন্ত্র চাই। আমরা বিজ্ঞানেতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে নানা জিনিস দেখে বা পর্যবেক্ষণ করে থাকি। একবার একজন ডাক্তার ভালভাবে পাশ করেছিলেন বলে একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (microscope) তিনি উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল ঠাকুর দেখবেন সেই যন্ত্রটা কি। ঠাকুরের কাছে যখন যন্ত্রটা নিয়ে আসা হল, তখন তিনি ফিরেও তাকালেন না। কেননা তিনি তখন অন্য অণুবীক্ষণের সন্ধান পেয়ে গেছেন—অনুভূতির ভিতর দিয়ে। ভগবানকে উপলব্ধি দিয়ে অনুভব করা, সেই সত্যকে তিনি জেনে গেছেন। তিনি ভগবানকে হাতে-নাতে পেয়েছিলেন, নিজের প্রাণের ভিতরে, মনের ভিতরে, সর্বতোভাবে। তাঁর মনপ্রাণ সেই ভগবদ্ভাবেতে অনুস্যূত ছিল। এইজন্যই আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন এক অপূর্ব জীবন।

এই সমস্ত দেখে যদি তাঁকে বলা হয় যুগাবতার, তা বলব খুব বেশি যে তাঁকে কিছু বলা হল তা নয়। বরং আমরা তাঁকে এখনও বুঝতে পারিনি। যুগাবতার নাম দিয়ে তাঁকে বলছি, কিন্তু কত যুগ যে তাঁর এই প্রভাব চলবে কে জানে? স্বামীজী বলে গেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো একজন অবতার হাজার বছরের মধ্যে একবার মাত্র আসেন। হাজার বছর কি পাঁচ হাজার বছর তাঁর প্রভাব চলবে, ও হিসাব আমাদের করার দরকার কি? আমরা কতটুকু বুঝি? কতটুকু বুদ্ধি আমাদের? তবে যেটুকু বুঝছি, তাতে করে বুঝতে পারছি এ এক অভিনব পুরুষের আগমন হয়েছে। শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়েছে, ভগবান লীলা-বিগ্রহ ধারণ করেছেন। এ অতি অপূর্ব।*

* গত ২১ মার্চ ১৯৮৬ তারিখে গৌহাটি আশ্রমে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ-কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

তিনি নরলীলা করবার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন, যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব। অবতারকে চিন্তা করলেই তাঁর চিন্তা করা হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ



# শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ও দর্শন

## শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

### ॥ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ॥

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের পুনর্জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি মানবমুক্তির মন্ত্র ও সমন্বয়ের বাণী কণ্ঠে নিয়ে ধরার ধূলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুআরি বাংলার এক অখ্যাত, অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে তাঁর জন্ম, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অগস্ট* সীমিত সংখ্যক শিষ্য ও অনুরাগীর শোকাশ্রুর মধ্য দিয়ে তাঁর নশ্বর দেহাবসান। তাঁর জীবনসীমা মাত্র পঞ্চাশ বছরের। এই পঞ্চাশ বছরে বাংলা তথা ভারতের সমাজে ও ধর্মে নতুন ভাবের যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তার শীর্ষবিন্দুতে শ্রীরামকৃষ্ণ আজও ভাস্বর। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির কঠোর সমালোচনার জবাবে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে ব্রাহ্মসমাজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এদেশে যে সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে, তার সার্থক পরিণতি ও বাস্তব রূপায়ণ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই। বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হলেও বিগত শতাব্দীর ষাটের ও সত্তরের দশকে ব্রাহ্মসমাজ—বিশেষত কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে—ক্রমশঃ খ্রীষ্টিয়ানী-ঘেঁষা সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে ও বৃহত্তর হিন্দুসমাজ থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সত্তরের দশকে বাংলায় জাতীয়তাবাদের যে বিশেষ স্ফুরণ হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রাণবন্ত করে তোলেন। হারানো আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল জাতীয়তাবাদের মধ্যে। তৎকালীন আর্যসমাজে (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) এই জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল। দয়ানন্দ সরস্বতী এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় বৈদিক পণ্ডিত, সংস্কৃতে ও বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের উপর তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। 'শুদ্ধি' অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে তিনি হিন্দুসমাজের জন্য নতুন মেয়াদ সংগ্রহ করেছিলেন। 'আক্রমণাত্মক হিন্দুধর্ম' (Aggressive Hinduism) তাঁর সময়ে জন্ম নেয়। হীনম্মন্যতার মোহ থেকে দেশবাসীর মনকে মুক্ত করতে তিনি ছিলেন ব্রতবদ্ধ। তৎকালে আর একটি আন্দোলনও আমাদের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠতে প্রচুর সাহায্য করেছিল। সেটা হল থিওজফিস্ট আন্দোলন। কিন্তু ঐ আন্দোলনের মধ্যে ভারতীয় অতীত কীর্তিকাহিনীর জয়গান ছিল মাত্রাতিরিক্ত এবং রক্ষণশীলতার প্রবণতাও এতে ছিল স্পষ্ট। এই আন্দোলনগুলি আসলে ছিল ধর্মীয় আবরণে সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন। ইংরেজী শিক্ষিত নব-আলোকপ্রাপ্ত যৌবনের দল হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা যেমন বর্জন করতে চেয়েছিল, তেমন চেয়েছিল খ্রীষ্টিয়ানী-ঘেঁষা ব্রাহ্মধর্ম। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম বা দয়ানন্দের আর্যসমাজ-ধর্ম কোনটাই প্রবক্তার গভীর আত্মোপলব্ধি থেকে জন্ম নেয়নি। আর এখানেই

* স্বামী প্রভানন্দ তাঁর "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে ('বিশ্ববাণী' কার্তিক, ১৩৯২) শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের সঠিক তারিখ কোনটি (১৫ বা ১৬ অগস্ট, ১৮৮৬) তা নির্ধারণের জন্য অনেক তথ্য পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সকল ঘটনা পর্যালোচনা করে আমরা নিঃসংশয় যে শ্রীরামকৃষ্ণ ইংরেজী মতে ১৬ অগস্ট রাত ১টা থেকে ১টা ৬ মিনিটের মধ্যে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্ততা নিয়ে স্বমহিমায় আবির্ভূত হলেন।[১] তাঁর উদার বাণীর মধ্যে, তার চেয়েও বড় কথা তাঁর জীবনের মধ্যে, শিক্ষিত সন্দিগ্ধবাদী তরুণদের দল তাদের ধর্মীয় সন্দেহ ও প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পেল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যে যৌবনের দল সমাগত হল তারা রক্ষণশীল সমাজের ও ধর্মের অনুরাগী ছিল না, তাদের অনুরাগ ছিল উদার-নৈতিক ও জাতীয়তাবাদভিত্তিক নতুন সমাজ ও ধর্মের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিশ্বজনীন হিন্দুধর্ম ও মানবতাবাদের ( humanism-এর ) সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এই নবীনীকৃত হিন্দুধর্ম কাউকে বর্জন করে না, জাতিভেদ মানে না, সকলকে আপনার বুকে গ্রহণ করে। এই মানবতাবাদের মোদ্দা কথা মানুষের সেবা, নরনারায়ণের পূজা। এ চিন্তা জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, আধ্যাত্মিকতার নিরেট বনিয়াদ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিকতামুখী মানবতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি ও উদ্গাতা। জন্মের আভিজাত্য বা শিক্ষার কৌলিন্য তাঁর ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনি সমাজনেতা বা কেশবচন্দ্র সেনের মতো তিনি বাগ্মীও ছিলেন না। দয়ানন্দ সরস্বতীর পাণ্ডিত্যও তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সত্যকার আত্মজ্ঞানসম্পন্ন উপলব্ধির মানুষ। নিজের উপলব্ধি থেকেই তিনি কথা বলতেন। তাই সেগুলি ধর্মপিপাসু মানুষের মনের দরজায় এমন ঘা দিত।[২] তাঁর সংস্পর্শে নাস্তিকও আস্তিক হয়ে পড়েছিল।

## ॥ দক্ষিণেশ্বরে সাধনপর্ব ॥

প্রায় নিরক্ষর কিন্তু অধ্যাত্মভাবে ভরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপ্রাণা নারী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পূজারী হিসাবে নিযুক্ত হন। মৃন্ময়ী ভবতারিণী তাঁর কাছে ছিল চিন্ময়ী মাতৃরূপিণী। তিনি নতুন করে প্রমাণ করলেন সাধকের সাধনাই মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীরূপে রূপান্তরিত করে। ভগবৎ-দর্শনের নেশা তাঁকে পাগল করে তোলে। মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ীরূপে পাবার জন্য ঐ বছর থেকে ( ১৮৫৫ ) তাঁর যে কঠোর ও নিরলস সাধনার সূত্রপাত, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সে সাধনায় তাঁর পরিপূর্ণ সিদ্ধি। কখনও শাক্ত মতে, কখনও শৈব মতে, কখনও বৈষ্ণব মতে, কখনও বেদান্ত মতে, কখনও মুসলমানধর্ম মতে, আবার কখনও খ্রীষ্ট মতে তিনি ধর্মসাধনায় নিমগ্ন হলেন। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মপ্রণালী অনুসরণ করে তিনি অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করলেন যে, ধর্মের পথ আলাদা আলাদা হলেও সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য এক ও অভিন্ন—ব্রহ্মানুভূতি ( God-realization )।

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনা নতুন কিছু নয়। সুদূর অতীতে ঋগ্বেদের ঋষিদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—জগতের চরম সত্তা এক, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নামে তা বর্ণনা করে। এরপর শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় আরও স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন যে, সকল পন্থাই তাঁর কাছে পৌঁছাবার পথ-বিশেষ।[৩] খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেন—যে ধর্মের

১ The Growth of Nationalism in India. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, Presidency Library, Calcutta, 1957 pp. 69-72

২ Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance, Swami Nirvedananda, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1938, pp. A-16

৩ Great Saviours of the World, গ্রন্থে ( Swami Abhedananda, Ramakrishna Vedenta Math, Calcutta ) সন্নিবিষ্ট Krishna and His Teachings অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মূলমন্ত্র হল "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ"—সেই ধর্মের অষ্টমার্গ নৈতিক উন্নয়নের, অহং বুদ্ধিনাশের ও চিত্তশুদ্ধির সার্বজনিক ও শাশ্বত বিধান ছাড়া আর কিছু নয়। মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে যে ভক্তি আন্দোলন প্রবল তরঙ্গাঘাত সৃষ্টি করেছিল —যার পুরোভাগে ছিলেন নামদেব, রামানন্দ, রামানুজ, কবীর, নানক, মীরাবাঈ, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ব্যক্তি[৪]—তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্বস্তরের মানুষকে — হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে — ঐক্য ও সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত করা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সমন্বয় সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রখ্যাত মনীষী বিনয় সরকার ধর্মের প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় পূজারী বলে চিহ্নিত করেছেন। বই-পড়া বিদ্যা দিয়ে নয়, গভীর আত্মোপলব্ধির শক্তিতে তিনি ঘোষণা করলেন "যত মত তত পথ"। এই মহামন্ত্রের প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম-সাধনার শেষ পর্বে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নিজের বিবাহিতা পত্নীকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে ষোড়শীরূপে পূজা করলেন এবং পূজাসমাপ্তে মহাভাবাপ্লুত ঠাকুর মাতৃরূপিণী ষোড়শীর পদপ্রান্তে তাঁর সাধন-ভজনের সমস্ত অর্ঘ্য, এমন কি নিজের সত্তাকেও নিঃশেষে নিবেদন করলেন।[৫] নিজের পত্নীকে দেহজ্ঞান-বর্জিত অবস্থায় মাতৃরূপে পূজা করার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় দ্বিতীয় আর নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "...সর্বগুণবিভূষিতা স্বীয় পত্নী সারদা দেবীকে তিনি জগজ্জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, নারী-মাত্রেই ছিল তাঁহার চোখে সাক্ষাৎ জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। কামজিৎ হইয়া বিবাহিতা পত্নীকে দেবীজ্ঞান করিবার ও রমণীকে প্রথমেই গুরুরূপে বরণ করিয়া সমগ্র নারীজাতিকে উচ্চাসন প্রদানের জলন্ত দৃষ্টান্ত একমাত্র পাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই।"[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যে মহিয়সী নারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই গুরুরূপে বরণ করেছিলেন তিনি হলেন তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধা ভৈরবী ব্রাহ্মণী; নাম ছিল যোগেশ্বরী। যশোহর জেলার কোনও এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিকট প্রায় দুবছর ধরে তন্ত্রসাধনা শিক্ষালাভ করেন ও সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। প্রথমাবধি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শাস্ত্র-বর্ণিত 'মহাভাবে'র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার-পুরুষ বলে স্বীকৃতি দেন এবং তাঁর অভিমতের যাথার্থ্য ভক্তিশাস্ত্রে পারদর্শী বৈষ্ণবচরণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী গৌরীকান্ত অল্পদিন পরেই সত্য বলে ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে, "ভৈরবী যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ মহিমা ঘোষণা করিলেন, বস্তুতঃ তখন হইতেই ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর অদ্ভুত সেবকের নাম লোক-

৪ Creative India, Benoy Kumar Sarkar, Motilal Banarasi Dass, Lahore, 1937, pp. 339-42

৫ The Ramakrishna Movement, Swami Budhananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 1980, p. 1

৬ 'মেগাফোন' কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত ৭৮ আর. পি. এম. ডিস্কে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকীতে স্বামী অভেদানন্দজীর ভাষণ দ্রষ্টব্য।

মুখে প্রচারিত হইতে থাকে। বহু সাধুসন্ত এবং ধর্মপিপাসু ব্যক্তি ঐ সময় হইতেই দক্ষিণেশ্বরে আসিতে আরম্ভ করেন।"[৭]

॥ শিবজ্ঞানে জীবসেবা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ধর্মচিন্তায় ও ধর্ম-সাধনায় বহুত্বনিষ্ঠার পূজারী। মানবমনের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে তিনি সন্দেহ বা ভীতির চোখে দেখতেন না। সকল মানুষ তো সাধনার সমস্তরে অবস্থিত নয়। স্তরভেদে মানুষে মানুষে ধর্ম-সাধনা-প্রণালী আলাদা আলাদা হবেই। মানুষের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল বলেই সকলের ধর্মসাধনা তিনি এক ছাঁচে ঢালতে চাননি। আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রতিটি মানুষকে তিনি ধর্মসাধনায় অগ্রসর হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতার স্থান তাঁর জীবনদর্শনে ছিল না। কোন মানুষকে—সে অভিজাত হোক্ বা পণ্ডিত হোক্, ধনী হোক বা নির্ধন হোক, হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক বা খ্রীষ্টান হোক—যেমন তিনি অবহেলা করেননি, তেমন তিনি অনাদর করেননি ধর্মসাধনার কোন পথকে।[৮] মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত দেবত্ব তার জাগরণের জন্য সকল ধর্মপন্থাই সত্য। বেদনাহত, নৈরাশ্য-কবলিত মানুষকে তিনি শোনালেন বেদান্তের অভয় মন্ত্র আর তার ললাটে পরিয়ে দিলেন অমৃতস্য পুত্রের জয়তিলক। এই উদারতার জন্য তাঁর আত্ম-সমাহিত ভাবোপলব্ধি থেকে। মানবমনের বৈচিত্র্যশীল গড়নের প্রতি তাঁর অফুরান শ্রদ্ধাই তাঁর প্রচারিত ধর্মকে করেছে বিশ্বজনীন। সাম্প্রদায়িক যে-কোন ধর্ম থেকে এ-বস্তু স্বতন্ত্র। মানবতাবাদ-এর বৈশিষ্ট্য। শিবজ্ঞানে জীবসেবা এ ধর্মের প্রাণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী দার্শনিক অগাস্ত কঁৎ (Auguste Conte) পাশ্চাত্য-দেশে যে 'পজিটিভিজম্' (positivism) দর্শন প্রচার করেন[৯]—যার সারমর্ম মানবতাবাদ, লোকহিত ও সমাজসেবা—তা থেকে শ্রীরাম-কৃষ্ণের দর্শন আলাদা। কঁৎ সমাজসেবার দর্শন প্রচার করেছিলেন ধর্মের আদর্শ হিসাবে, শ্রীরাম-কৃষ্ণ সেই দর্শন প্রচার করলেন চরম আত্মো-পলব্ধির আবশ্যকীয় সোপান হিসাবে। কঁতের মেজাজ সংসারনিষ্ঠ মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ; শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনা আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় ভাবধারায় আপ্লুত। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ কোঠা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ শিবজ্ঞানে জীবসেবার ধর্ম প্রচার করেন। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীর মন্ত্রগুরু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। বিনয় সরকার 'বৈঠকে' বলেছেন, 'বিবেকানন্দ'র দরিদ্র-নারায়ণ-পূজায় কঁৎ-অমর হয়ে রয়েছে।[১০] বর্তমানে লেখকের বিচারে বিবেকানন্দ কঁৎ-দর্শনের দ্বারা কিঞ্চিৎ-কিছু প্রভাবিত হলেও তাঁর দরিদ্র-নারায়ণ তত্ত্বের মূল উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতায়।

৭ শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী, উদ্বোধন কার্যালয় ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০২

৮ The Religions of the World, Vol. I, 1938, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, pp. 112-13

৯ শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত 'বিনয় সরকারের বৈঠকে', ২য় খণ্ড, ১৯৪৫, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা ৪৫, পৃঃ ৬৪

১০ ঐ, পৃঃ ৬৭

# শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

## স্বামী ভূতেশানন্দ

নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে জানবার জন্ম আগ্রহ দেখে আমাদের মনে এই আশা হয় যে, যুগাবতারের আবির্ভাব যে সার্থক হয়েছে এটি তারই পূর্বাভাস।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যেভাবে অন্তরে গ্রহণ করা দরকার এখনও আমরা তা পারিনি কারণ তাঁকে অন্তরে গ্রহণ করলে আমাদের অন্তর যতটা শুদ্ধ পবিত্র হওয়া উচিত তা হয়নি। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের একটু আত্মবিশ্লেষণ করা দরকার। কেবল বাহ্য দৃষ্টিতে নয় অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি কিনা বা সেই পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছি তা বিচার করে দেখতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যারা চাল কাঁড়ে তারা চালটা মাঝে মাঝে তুলে দেখে কিরকম কাঁড়া হল। ঐরকম আমাদের প্রত্যেকের মনকে তুলে দেখতে হয় যে আমরা শুদ্ধি, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতার পথে কতটুকু এগোচ্ছি, অথবা ভগবানের প্রতি আমাদের ভালবাসা কতটুকু হয়েছে। শুধু মুখে ভালবাসি বললে হবে না, তাঁকে ভালবাসলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হবে। তাঁকে যত ভালবাসব ততই আমাদের জীবনযাত্রা তিনি যাতে সন্তুষ্ট হন এমনভাবে চলবে।

সদ্বংশজাত ব্যক্তিদের জীবন সেই বংশের অনুরূপ হবে। আমরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসি অথবা মনে করছি ভালবাসি তাদেরও মনে রাখতে হবে যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণবংশজাত, তাঁরই সন্তান আমরা, কাজেই আমাদের পা বেচালে পড়বে না। ভাগবত বলছেন, 'যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥' (ভাগবত, ১১. ২. ৩৫.)

যারা ভগবানের শরণাগত হয়েছে তারা যদি চোখ বুজে দৌড়ায় তাহলেও তাদের পদস্খলন হয় না। তাদের স্বভাব এমনই হয়ে যায় যে তাদের দ্বারা কোন গর্হিত বা নিন্দিত কর্ম করা সম্ভব হয় না। যেমন ঠাকুরের দৃষ্টান্ত, স্পর্শমণি লোহার তলোয়ারকে ছুঁলে তলোয়ার সোনা হয়ে যায়। আকার হয়তো তলোয়ারের মতো থাকে কিন্তু তা দিয়ে হিংসা হয় না।

সেই স্পর্শমণিরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ যদি আমাদের লাগে তাহলে আমরাও সোনা হয়ে যাব আর যদি তা না হই তাহলে বুঝতে হবে ছোঁয়া লাগেনি। আমাদের নিজেদের বিশ্লেষণ করে এই কথাটুকু ভেবে দেখতে হবে। ভাগবতে আছে—গোপীরা বনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, চারদিকে খুঁজছেন কোথায় শ্রীকৃষ্ণ জানেন না। একজন বলছেন, তিনি নিশ্চয়ই এইপথে গিয়েছেন কারণ তাঁর অঙ্গসৌরভ পাচ্ছি। যেখানে ভগবানের ছোঁয়া লেগেছে সেই হাওয়ায় তাঁর গন্ধ পাওয়া যায়। তাৎপর্য হল, যদি অন্তর তাঁকে একটুও স্পর্শ করে তাহলে সেই অন্তর শুদ্ধ পবিত্র হবে। আর তা যদি না হয় তাহলে যতই আমরা নিজেদের শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত বলে পরিচয় দিই না কেন প্রকৃতপক্ষে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের ছোঁয়া লাগেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো স্পর্শমণি জগৎ কালেভদ্রে দেখে সেই স্পর্শমণির সান্নিধ্যে আমরা রয়েছি। সান্নিধ্য বলছি এইজন্য যে তাঁর স্থূলশরীর অবসানের পর মাত্র একশ বছর হয়েছে। তাই এই সময়ে যদি আমরা তাঁর স্পর্শকে অনুভব না করি তাহলে আমাদের মতো অধঃপতিত, সংসারতাপে তপ্ত জীবের জন্য যে অবতারের আগমন হয় তা ব্যর্থ হয়ে যায়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, সেই

স্বর্ণযুগে আমরা জন্মেছি যে-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভা চারিদিকে উজ্জ্বল।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীনকালের ইতিহাস বা কিংবদন্তী নন। যাঁরা সাক্ষাৎভাবে তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে থেকেছেন তাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে এরকম মানুষ এখনও অনেকে জীবিত আছেন। তাই সেই স্পর্শ এখনও আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও নিকট। তবু যদি আমাদের জীবন তার দ্বারা উন্নততর, পবিত্রতর না হয়, আমাদের মধ্যে ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষা যদি তীব্রতর না হয় তাহলে এই যুগে জন্মে কি লাভ হল একথা ভাবতে হবে।

আমাদের দেশে তিনি জন্মালেন, আমাদের সঙ্গেই বাস করলেন অথচ তার মূল্যায়ন করছে দূরের লোকেরা, আমরা অজ্ঞ হয়ে রইলাম, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে লণ্ঠনের আলোয় লোকে রাস্তা দেখে কিন্তু তার নিচেই অন্ধকার। তেমনি তাঁর এত নিকটে থেকেও আমরা অন্ধকারে রইলাম। অন্ধকার কেন বলছি? না, যেভাবে তাঁকে জানা উচিত, আপন করা উচিত তা আমরা করতে পারলাম কোথায়? এটি আমাদের ভাবতে হবে।

আমাদের সব আছে। রোগের ওষুধ আছে, বিচক্ষণ বৈদ্য আছে, সবই আছে কিন্তু রোগী যদি ওষুধ না খায় রোগ ভাল হয় না। এও ঠিক সেইরকম। তাঁর ভাব চতুর্দিকে প্রবহমান অথচ সেই ভাবসমুদ্রের তীরে বসে আমরা তার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। অন্ততঃ এর দ্বারা আমাদের যতটা প্রভাবিত হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে না।

অবতার দু-চারজনের জন্য আসেন না, সকলের জন্যই আসেন। কোথায় তাঁর আগমন হল সেটা দৈব-নির্ধারিত। তবে তাঁর আগমনের ফল দূর-প্রসারী হয়। আমরা সগর্বে বলে থাকি শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের দেশে জন্মেছেন কিন্তু সে কি কেবল আত্মগৌরব খ্যাপন করবার জন্য? আমাদের কাছে জন্মেছেন বলেই তো আমাদের জীবন কতটা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে হলে জীবনচর্যায় তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, তাঁর ভাবসমুদ্রে ডুব দিতে হবে। ঠাকুরেরই কথা, ভাসা ভাসা থাকলে হবে না, ডুব দিতে হবে। কিন্তু আমরা তা কতদূর পারছি? এই না পারার কারণ আমাদের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা নেই, আন্তরিকতা নেই। তাই আমরা গতানুগতিক-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা জানাই, অন্তর দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে পারি না।

জীবনে এমনভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে যাতে জীবন তাঁর ভাবে ভাবিত, রূপায়িত হয়। আমরা সকলকে শেখাতে, সংশোধন করতে যাই, জগতের সংস্কার করতে যাই কিন্তু যে মন নিয়ে আমরা এসব কাজ করব সে মনের শুদ্ধি-পবিত্রতা কতটুকু সেটা আগে দেখতে হবে। স্বামীজীর কথায়, সরষের ভিতরে ভূত থাকলে তা দিয়ে ভূত তাড়াব কি করে? বাইবেলে একটি কথা আছে—যীশুখ্রীষ্ট বলছেন, লোকের চোখে কোথায় একটু কুটো পড়েছে তুমি তা দূর করতে যাচ্ছ, তোমার চোখে যে একটা কড়িকাঠ পড়ে আছে। আগে তোমার নিজের চোখকে মুক্ত কর, শুদ্ধ পবিত্র কর, তবে তুমি কার কি ত্রুটি ভাল করে দেখতে পাবে, তারপর সেটি দূর করতে পারবে। এ না করলে সংস্কারের প্রয়াস, জীব উদ্ধার সব ব্যর্থ হবে।

অতএব আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে যুগাবতার বলি, পরমকল্যাণময়রূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের কল্যাণ করছেন বলি তখন আমাদের অন্ততঃ এইটুকু দেখার প্রয়োজন যে আমরা তাঁর সেই কল্যাণময় বাণী গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়েছি

কিনা। তাঁর নাম নেবার জন্য, তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্য দলে দলে লোক আসে, তাদের যখন বলি তোমরা কথামৃত পড়েছ? তখন চুপ করে থাকে। সমস্ত জগতের অধ্যাত্মজ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিদের যে গ্রন্থ আকর্ষণ করছে, সাধারণ মানুষের উপযোগী সুবোধ্য ভাষায় যা পরিবেশিত হয়েছে, সে বইখানিও আমরা ভাল করে পড়ি না। হয়তো ঘরে তাঁর ছবি রাখি সেখানে ফুলও দিই কিন্তু তিনি কি করতে বলছেন তার সন্ধান রাখি না। তাঁর উপদেশ পড়িই না, পালন করা তো বহু দূরের কথা। পালন করতে বললে বলে, আমরা সংসারী জীব, আমরা কি ওসব পালন করতে পারব? তা যদি না-ই পারব তাহলে তাঁর ভক্ত হব কেমন করে? কথামৃত পড়া আছে কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে শুনি, কত কাজ সময় পাই না। সব করবার সময় আছে আর সদ্‌গ্রন্থ পড়বার, সৎচিন্তা করবার সময় নেই। ঠাকুর গাইতেন, 'রোগে বাঁচি কি না বাঁচি তন্নামে অরুচি'—আমাদেরও সেইরকম তাঁর নামে অরুচি। নাম বলতে কেবল 'শ্রীরামকৃষ্ণ' শব্দটি নয়, সেই নাম যে ভাবের প্রতীক তার সঙ্গে পরিচয় চাই। একজন ঠাকুরকে বলছে, আমি শুদ্ধাভক্তি চাই, জ্ঞান চাই না। ঠাকুর বললেন, যাঁকে ভক্তি করবি তাঁকে না জানলে কি করে ভক্তি করবি? অন্ততঃ তাঁর সম্বন্ধে একটা ধারণা না হলে আমরা ভক্তি করব কাকে? শ্রীরামকৃষ্ণ নামটি মাত্র আমরা জানি আর জানি যে অনেক লোক তাঁর নাম করছে, নামে আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তাতে আমার জীবনে কি লাভ হয়েছে? এই কথা ভাবতে হয়।

আমরা নানা স্থানে যাই যেখানে বহুলোক আসেন দীক্ষা গ্রহণের জন্য। যাঁরা আসেন তাঁদের ভিতরে কয়জন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের সঙ্গে পরিচিত? তাঁর বই পড়েছ জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলে, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পড়েছি যা উপন্যাসের মতো করে লেখা। অথচ যাঁকে অবলম্বন করে এই বহুল প্রচারিত গ্রন্থ রচিত সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে আর কিছু জানবার কৌতূহল বা প্রবৃত্তি হল না। কেউ বলে, কথামৃত একটু একটু পড়েছে। 'একটু একটু কেন? পড়তে ভাল লাগে না?' 'খুব ভাল লাগে।' 'তাহলে সবটা পড়নি কেন?' 'সংসারের কাজ করতে হয় কখন পড়ব?' সে হয়তো সিনেমার খবর সব দিতে পারবে। কোথায় কে কতজন নট-নটী আছে, কোথায় কি ছবি চলছে সব বলে দিতে পারবে। 'রামকৃষ্ণ'-কে জানবার, পড়বার সময় নেই। আমরা কাকেও কটাক্ষ করে একথা বলছি না, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলছি। দীক্ষা নেওয়া বা তাঁকে ভক্তি করা এসবই তো জীবনের অবলম্বন যা আশ্রয় করে আমরা জীবন কাটাব। এই জীবন কাটানর জন্য আমাদের কি মালমশলা সংগ্রহ করা রইল? কি অবলম্বন করে আমরা জীবনটাকে ধরে থাকব? ঠাকুর কতবার বলেছেন যে, এক হাতে ঈশ্বরকে ধরবে আর এক হাতে সংসার করবে। তিনি বললেন না দুহাতে সংসার আর ঈশ্বর দুই-ই ধর। তিনি সব দেশটাকে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে বলছেন না। কাকেও কাকেও এমনও বলেছেন যে, বাড়ি গিয়ে মা বাপ স্ত্রী পুত্রাদির সেবা কর।

তাঁর নিজের জীবনে ঈশ্বর ছাড়া অন্য লক্ষ্য ছিল না। বার বার বলেছেন, সত্যি বলছি আমি ঈশ্বর বই আর কিছু জানি না। তাঁর সমগ্র জীবন তার জন্য ব্যয় করেছেন যাতে আমরা সেইভাবে একটু ভাবিত হতে পারি। তাঁর সমস্ত জীবনই অপরের কল্যাণের জন্য। তাই দেখি, সমাধির অপরিমেয় আনন্দ যখন সহজলভ্য হয়ে আসছে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন জগন্মাতাকে বলছেন, মা আমায় বেহুঁশ করিসনে,

আমি ভক্তদের সঙ্গে কথা কব। ভক্তদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি নিজের দেহ, নিজের সমাধিকে পর্যন্ত উপেক্ষা করছেন। আবার তাঁর প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ যখন বললেন, আমি সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই তখন ঠাকুর তাঁকে ভৎর্সনা করলেন। বললেন, সে কিরে! আমি ভেবেছিলাম তুই একটা বিরাট বটবৃক্ষ হবি, যার ছায়ায় এসে পথশ্রান্ত পথিকেরা শ্রান্তি দূর করবে, আর তুই কি না নিজের মুক্তির আনন্দ চাইছিস? লোকে ভগবানকে ভুলে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের দিকে না চেয়ে নিজের মুক্তি বা সমাধির আনন্দ চাওয়া তাঁর কাছে গর্হিত। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর জীবন তাদের জন্য উৎসর্গীকৃত। বলছেন, এই শরীরটা তো কখনও কোন অন্যায় কাজ করেনি তাহলে এত রোগের কষ্ট কেন? নানান রকম মন্দকাজ করে যারা আসে তাদের সব পাপের বোঝা আমাকে নিতে হয়, তাই শরীরে এত কষ্টভোগ। তিনি যে কঠোর সাধনা করেছেন তাও নিজের জন্য নয়। মানুষ এক মতের সাধনা একটু করে সামান্য অধ্যাত্মভাব লাভ করে তাতেই ভরপুর হয়ে যায়। আর শ্রীরামকৃষ্ণ একটির পর একটি পথ ধরে সাধনা করেছেন, দেখাচ্ছেন কিভাবে তাতে সিদ্ধিলাভ হয়। তারপর আবার আর একটি মত ধরছেন। কারণ তাঁর অদম্য কৌতূহল যে মাকে অপরে কিরকম করে দেখে জানতে হবে। মুসলমান, ক্রীশ্চান, হিন্দুদের নানা সম্প্রদায় তারা কিরকম করে দেখে সব তিনি দেখতে চান। কেন? না, ধর্ম সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা ও মতভেদের জন্য জগতে এত অশান্তি তা তিনি দূর করতে চান। তাঁর শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁর অনুভবের ভিতর দিয়ে জগৎ শিখুক যে, সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই এক পরমতত্ত্বকে অন্বেষণ করছে। নিজের জীবনাচরণের দ্বারা এরকম প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সামনে তুলে ধরবার উদাহরণ জগতে আর কোথাও নেই। মানুষ সাধারণতঃ একটা ধারায় চলে, তার অনুভব একজায়গায় পেঁৗছে দেয়, সেখানেই তার সমাপ্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সেরকম নয়। তিনি সর্বভাবময়। কল্পনা নয়, অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিতর দিয়ে এই জিনিসটি এমন করে কেউ সামনে ধরেননি কখনও। শাস্ত্র, বিশেষ করে হিন্দুশাস্ত্র যে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন তা অনেকবার অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কত দ্বন্দ্ব বিবাদ-বিসংবাদ আমাদেরও আছে, অন্যত্রও প্রবলভাবে আছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এই বিভিন্ন পথ দিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে পথগুলি ভিন্ন হলেও গন্তব্যস্থল ভিন্ন নয়।

দীর্ঘকাল ধরে এত সাধনার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল? তারপরেও লোককল্যাণের জন্য প্রতি রক্তবিন্দু যেন দিয়ে গিয়েছেন। যখন রোগে শরীর জীর্ণ শীর্ণ, কথা বলতে পারছেন না তখনও তাঁর চেষ্টা যতটুকু সময় আছেন তা কল্যাণের জন্য ব্যয় করবেন। ভগবান বুদ্ধের জীবনে আছে যে, তিনি যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, তখন দূর থেকে কোন ব্যক্তি উপদেশ নিতে উপস্থিত হয়েছে। শিষ্য আনন্দ তাঁকে বললেন, তুমি বড় দেরি করে এসেছ, ভগবান বুদ্ধ এখন পরিনির্বাণ লাভের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু বুদ্ধ সেই অবস্থাতেই বলছেন, আনন্দ, কে জিজ্ঞাসু এসেছে তাকে নিয়ে এস। বুদ্ধের শেষ নিঃশ্বাসটিও এক জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে, একজনকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে যদি শেষ হয় তবে তাই হোক। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত ঠিক এমনি দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি। বলা যায় তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটিও জগৎ-কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়েছে।

এই অপূর্ব জীবনলীলা এত কাছ থেকে দেখেও আমরা তার দ্বারা প্রভাবিত হই না। অধ্যাত্মদৃষ্টি তো অনেক পরের কথা, প্রতিবেশীর জীবনে কোথায় কি দুঃখকষ্ট তা-ও দেখি না, আমাদের বিলাস-ব্যসনের পাশাপাশি উৎকট দারিদ্র্য আমরা তাতে বিচলিত হই না সাড়া দিই না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেশে এ কি করে সম্ভব? যাঁর হৃদয়ে জগৎবাসীর ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করে আমরা অপরের প্রতি এত উদাসীন থাকি কেমন করে? শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি সর্বাবগাহী আদর্শ দিয়ে গিয়েছেন যা প্রত্যেকের পক্ষে অনুসরণীয়। গৃহী অথবা সন্ন্যাসী, জ্ঞানী কিংবা ভক্ত, পণ্ডিত অথবা মূর্খ সকলের পক্ষেই তা কল্যাণকর।

সার কথা হল আমাদের প্রত্যেককেই আত্ম-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের এত নিকট সান্নিধ্যে এসে আমাদের জীবনে সেই আলোক কতটুকু প্রতীত ও অনুভূত হচ্ছে, জীবন কতটুকু সেইভাবে ভাবিত ও যাপিত হচ্ছে? এটা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং আরও আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে চলতে হবে। পথও তিনি, চরম লক্ষ্যও তিনি।*

* গত ৪. ১০ ৮৫ তারিখে মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে-প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

# প্রলাপ না সত্য?

## শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ

একটী গল্প আছে যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভূকৈলাসের রাজারা আবাদের নিমিত্ত মাটী খনন করিতে করিতে, মাটীর নীচে সমাধিস্থ একজন মহাপুরুষকে পান। মহাপুরুষকে ভূকৈলাসে আনিয়া, সমাধি ভঙ্গের নানাবিধ চেষ্টা হয়, কিন্তু কিছুদিন কোনও রূপে সমাধি ভঙ্গ হইল না। ক্রমে—নানা উপায়ে সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তৎপরে মহাপুরুষের দেহত্যাগ হয়। এ-কথা পরমহংস দেবের নিকট উঠিয়া ছিল। এক ব্যক্তি পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, এ কিরূপ হইল? এরূপ সমাধিস্থ মহাপুরুষের অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগের কারণ কি?" পরম-হংসদেব উত্তর করিলেন, সে সমাধিস্থ মহাপুরুষের দেহের আর আবশ্যক ছিল না। উপমা দিলেন যে, বৈদ্যেরা বোতলে করিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করে—যখন মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলে।

সাময়িক কথার উত্তর হইল, কিন্তু সে কথার যত আন্দোলন করা যায়, ততই মনুষ্য দেহধারী জীবের অবস্থা উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরজ্ঞানলাভের নিমিত্ত দেহের প্রয়োজন। ঈশ্বরজ্ঞান হইলে দেহের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রথম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের বস্তু-জ্ঞান লাভ হয়। আবার দেখা যায়, সেই ইন্দ্রিয়েরাই প্রলোভিত করিয়া মনকে ঈশ্বরপথ হইতে অন্তর করে। ইন্দ্রিয়প্রলোভনে মন সুখ আশে ব্যাকুল হয়। অনিত্য বস্তুতে আসক্তি জন্মে। উচ্চাশয় ব্যক্তিরা সাধারণের ন্যায় ইন্দ্রিয় প্রলোভনে মুগ্ধ না হোন, নানাবিধ তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। কিন্তু যতই তত্ত্ব অনুসন্ধান করুন, যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয় বিস্ফারণ পূর্ব্বক, যতই জড় নিয়মের জ্ঞান লাভ করুন, মানসিক চিন্তার দ্বারা যতই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি করুন, স্থির চিন্তায় বুঝিতে পারেন, যে জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছে, তাহা আপেক্ষিক জ্ঞান। নিশ্চিত জ্ঞান তাঁহার আদৌ জন্মে নাই।

সুবোধ ভাবুক তখন বুঝিতে পারেন, "রামকো যো জানা নেই, সো জানা হায় কেয়া রে!" সার তত্ত্ব লাভের যতই চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ অসার আপেক্ষিক জ্ঞানে বিজড়িত হন। কিছুই নিশ্চিত হয় না অথচ শোনেন, ঈশ্বর আছেন, পুনর্জ্জন্ম আছে, দেহের মৃত্যুতে জীবের মৃত্যু হয় না। শোনেন মাত্র, স্থির নিশ্চয় করিতে অক্ষম হন। তিনি তখন বোঝেন যে, অপর কোন দৃষ্টি ব্যতীত, অপর কোন ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত না হইলে নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি বিদ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হন, ব্যাকুল হন, কোথায় কি উপায়ে সেই নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। কেহ বা নিরাশ হইয়া, বৃথা চেষ্টা বিবেচনায় নিরস্ত থাকেন।

কিন্তু যে পুরুষের সেই জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, যন্ত্রণায় আকুল হন, নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান। শাস্ত্র পাঠে শুনিয়াছেন, প্রার্থনা করিতে হয়। চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিয়া—দেখিয়াছেন, কৈ সে নিরপেক্ষ জ্ঞান তো জন্মিল না। কি করিব? কোথায় যাব? কে পথ বলিয়া দেবে? নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া দেখেন; এ একথা বলে, সে সেকথা বলে, শাস্ত্র পাঠে যে গণ্ডগোল দেখিয়াছিলেন, সে গণ্ডগোল আর ঘোচে না। কি শোনেন, মনুষ্য নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করে? বিস্তর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাইয়াছেন, লোকের মুখেও শোনেন। কখনও বলেন মিথ্যা, কখন সন্দেহে জড়িত হয়ে বলেন, কৈ দেখিলাম না তো। ভাবেন, যাক্ আর ও কথায় কাজ নাই। কিন্তু সম্মুখে মৃত্যু—ভাবেন, হায়, চোখ বাঁধা বলদের মত ঘুরিলাম, কিছুই জানি না! কোথায় কে আমার উপায় বলিয়া দেবে? প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা তো তিনি করিয়াছেন।

যখন একান্ত আকুল, কি এক আশ্চর্য্য নিয়ম সংসারে চলে, এমন কথা তাঁর কানে আসে, এমন ব্যক্তিকে দেখিতে পান যে, একেবারেই স্থির করেন, এ ব্যক্তি যা বলে শুনিব, দেখি, এ পথে কি হয়! তাঁর কথায় বুঝিতে পারেন যে, তাঁর প্রার্থনা বিফল হয় নাই; যদিচ অন্ধকার পথে চলিয়াছেন, তথাপি তিনি অগ্রসর; আরো কিছু অগ্রসর হইলে আলো পাইবেন। সেই পথে চলিতে থাকেন, ক্রমে কিঞ্চিৎ আলোর আভাস পান এবং উপলব্ধি করেন যে, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের রুচি প্রভেদ। যে সকল পান ভোজন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক ছিল, সে সকল আর তৃপ্তিকর নয়, এমন কি, দেহের অসুখপ্রদ। দেখিতে পান, যে সকলে মনের রুচি ছিল, যে সকল আলোচনা করিতেন, সে সকল নীরস এবং যৎকালীন ইন্দ্রিয়মুগ্ধ ছিলেন, তৎকালীন যে সকল বিষয় নীরস ছিল, একণে তাহা ব্যতীত আর সরস জিনিষ নাই। পূর্ব্বে যে সকল জ্ঞান লাভে তিনি ভাবিতেন যে, আমি উন্নতি সাধন করিতেছি, তাহা বুঝেন উন্নতি নয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এক বিষয় মীমাংসা করায় শত সহস্র মীমাংসার বিষয় উদয় হয়। ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, পাতালতত্ত্বের এক বিষয়ের প্রশ্ন পূর্ণ না হইতে শত সহস্র প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়। ঐ "একঘেয়ে," একই রকম। সে সকলে আর রস থাকে না। কেবল ঐ যে একটী কথা শুনিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার মন বিষয় চিন্তা হইতে অন্তর করিয়া অন্য চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছে, তাহাই সরস।

এখন সত্য সত্যই তাঁহার দেহের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সে তীব্রতা নাই কেন? সুখ ইচ্ছা নাই কেন? অপর চিন্তা নাই কেন? দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেহের বিকার না জন্মিলে ইন্দ্রিয়েরা সতেজ থাকে, তাহাদের স্পৃহাও সতেজ থাকে। তবে এ কি বিকার উপস্থিত? একি পীড়া? স্থূল দৃষ্টিতে

পীড়াই বটে। মস্তিষ্কের বিকার,—নচেৎ অত বড় পণ্ডিত, অত বড় বিজ্ঞ, অত বড় মানী, সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া, দীন-হীনের ন্যায় পরের চরণ সেবা করিতে ব্যাকুল, দিবারাত্র রোদন করে, রোদনের ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নাসিকার দিকে চক্ষের ধারা না বহিয়া চক্ষের অপর কোণ হইতে গণ্ডস্থল বহিয়া ধারা বয়। পরম উপভোগের দ্রব্য ভোগ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করাইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। সুললিত নারীসঙ্গ কালসর্পের ন্যায় জ্ঞান হয়। দেহেও সেরূপ তীব্র-যন্ত্রণা বোধ নাই, যে সকল কঠিন রোগে সকলে ব্যাকুল হয়, তাহাতে তিলমাত্র কাতর নয়—যেন অঙ্গের সাড় নাই, দিবারাত্র বিভোর। অধিক সুরাপানে যেরূপ বিভোর থাকে, সেইরূপ বিভোর।

দেখা যায়, এমন কথা বলে, যাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে আর কিছু নয়, ও Clairvoyance—একটা রোগ বিশেষ। এ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নয়, এই ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য, তবে ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা মাত্র। এ কি বলা যায় না, রোগের প্রলাপ অবস্থায় ওরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এর কিছু স্বতন্ত্র,—একি সব বলে? —প্রলাপ?—প্রলাপই বটে—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—শাস্ত্রে এরূপ অবস্থার কথা আছে। জ্ঞানীর এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। আবার মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহার একটী কথাও প্রলাপ নয়। অবশ্যই যে সব অতীন্দ্রিয় কথা বলে, তাহা যদি প্রলাপ হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিত না, প্রলাপে মিল থাকে না,—আজ এক রকম, কাল এক রকম। পাগলের মুখেও কখনো কখনো ভবিষ্যৎ কথা শোনা যায়—সত্য হইতেও দেখা যায়; কিন্তু ইহার এক আধটা নয়, যাহা মিলান যায়, তাহার সমস্তই সত্য। আবার কতকগুলি শক্তিরও বিকাশ দেখা যায়,—এই উন্মাদ ব্যক্তি মন আকৃষ্ট করে, তাহার কথায় দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি আসে, মৃত্যুভয় দূর হয়, এ এক অদ্ভুত পাগল। এ পাগল যথায় যায়, তথায় ইষ্ট। গ্রাম মাতায়, দেশ মাতায়, ইষ্ট ব্যতীত ইহার দ্বারা অনিষ্ট হয় না।

যে ছবি আমরা দিলাম, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ কি সত্য?—সত্য। আমরা এ পাগল দেখিয়াছি, এবং যে পাগল তাহাকে পাগল করিয়াছে, তাহাকেও দেখিয়াছি। বিবেকানন্দের সহিত রামকৃষ্ণের যিনি সম্বন্ধ জানেন, তিনি আর আমাদের বর্ণনা অলীক বিবেচনা করিবেন না। বোতলের মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়াছিল, বৈদ্য বোতল ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

তবে কি আমাদেরও দেহবোতলে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে? পরমহংসদেব বলিতেন, নিশ্চিত। সে কথায় নিশ্চিত ধারণা কেন না করিব?—যে কথায় যমভয় দূর হয়, যে কথায় সংসার-সাগরতরঙ্গে বিচলিত করে না, যে কথার ফলিত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি,—সে কথায় কেন না নির্ভর করিব? যাহাতে সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়, সে পথে কেন না চলিব? আরে বাতুল, তুমি আমায় বাতুল বল? অহঙ্কার করিয়া বলিব,—অহং তাঁহার—আমার নয়। অহঙ্কার করিয়া বলিব,—আমি বাতুল নই। মনুষ্যত্ব লাভের উপায় পাইয়াছি—মনুষ্যত্ব লাভ করিব।—মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে, বোতল যাক্ না।—জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসের জয়!*

* 'উদ্বোধনের'-এর ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

# জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী গর্গানন্দ

সকল যুগের তপ এককালে আচরিলে তুমি,
জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম মহোত্তম সুনিপুণভাবে ;
ধন্য হল ভূমণ্ডল, পুণ্যব্রতা এ ভারতভূমি,
বিস্ময়ে গাহিল জয় যুক্ত করে গম্ভীর আরাবে।
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অতিক্রমি বেদ-সিন্ধুতটে,
মিশাল অসীমে চলি সসীমের পথধারা বাহি ;
শাস্ত্রের সত্যতা ঘোষি উজলিয়া বিশ্ব-মনোপটে,—
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতন সর্বভাবগ্রাহী।
দেখালে করমে দীপ্ত আদর্শের পরাকাষ্ঠা স্থির,
ত্যাগের মাহাত্ম্য সাথে সত্যের সার্থক রূপায়ন ;
সাধনার গূঢ়মর্ম, ব্যাকুলতা-মহিমা গভীর,
প্রকাশি অধ্যাত্ম সত্য তত্ত্ব-উপলব্ধি সুধাঙ্গন।
শ্রীরাম চৈতন্য কৃষ্ণ পুন সত্যে নিত্য হল সাজি,
তোমার জীবন মাঝে, যুগ-মূল্যায়ন অদ্বিতীয় ;
সার্থক উঠিল ফুটি বেদান্ত পুরাণ তন্ত্ররাজি,
সমস্যার সমাধানে তব কীর্তি অনির্বচনীয়।
সর্ব বিরোধের হল অবসান—বিস্ময় যুগের,
প্রতি পদক্ষেপে তব—রহস্যের নব মূল্যায়ন ;
ধন্য হল মনুবংশ, সম্প্রদায় সকল ধর্মের,
উপকৃত ত্রয়ীলোক কৃপা লভি—বন্ধন-তারণ।
যুক্তি-শক্তি-মুক্তিবাদী ভক্তকুল মাতিল পুলকে,
নাস্তিকে পাইল পথ, দিক্‌হারা আর কভু নয় ;
মাতৃত্বের উদ্বোধনে দিগ্বিদিক্ সৌভাগ্যে চমকে,
'দরিদ্র দীনের দেব'—সমস্বরে গাহে তব জয়।
বর্ণিতে রোমাঞ্চচিত্তা বাণীরূপা জ্ঞানদা সারদা,
সহজ সরল তুমি বুদ্ধি তব ধরিতে পারে না ;
অন্তরে বাহিরে রাজো সর্বঘটে বিশ্বেতে সর্বদা,
অনুরাগ-কৃপাভরে আসো কাছে হইয়ে আপনা।
তোমার তুলনা তুমি একমাত্র ত্রিভুবনেশ্বর,
অসীম-সীমার দ্বারে তব দ্যুতি স্ব-মহিমাধীন ;
'জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ' অবতার নরদেববর,
হোক্ ক্ষুদ্র মর্ত-মন তব পদে প্রণতি-বিলীন।

# পরমহংস

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

শিশুর মতোন সরল হাসি হাসতে যখন খিলখিলিয়ে
দাঁড়িয়ে যেত—পাশে যে সাপ চলতে চলতে কিলবিলিয়ে
বিষদাঁতে যার বিষের আধার, ছোবলানো যার স্বভাবে ;
সেও তো যেত স্তব্ধ হয়ে দেবতা তোমার প্রভাবে ।
শিশুর মতো কান্না তোমার—বাপরে সে কি কাঁদার ঠেলা,
তোমার মায়ের সাধ্যি ছিল করতে তোমায় অবহেলা ?
কাঁদতে কাঁদতে চেতনহারা—ধুলোয় দেহ পড়তো লুটে,
যেখানে মা থাকুন কেন—আসতে তাঁকে হতোই ছুটে ।
এই যে তোমার ব্যাকুলতা, রোদনভরা অন্বেষণ,
এই যে বিষয় আসক্তিহীন, মোহের খোলস উন্মোচন ;
এই যে তোমার রসের বশে জীবনটাকে রসিয়ে তোলা—
রসিক-সাধু তাই তো তোমায় কোনকালেই যায় না ভোলা ।
জটিল যত তত্ত্বকথার মর্মবিহীন ছোব্ড়া ফেলে—
শাঁসটি তুলে মিশিয়ে দিলে ভক্তিরসের মিষ্টি ঢেলে ;
প্যাঁচপাকানো সেই জটিলা সহজ হল কথামৃতে,
পরমমহংস স্ব-স্বভাবেই—গোলকধাঁধা ঘুচিয়ে দিতে ।

# আবেদন

শ্রীমতী হিমানী রায়

অনেক দিয়েছ প্রভু ধন, পরিজন,
তবু কেন মোর ভরে নাকো মন,
কোথা যেন ফাঁক থেকে যায় ।
সব কিছু পরিহরি,
যবে তোমারে স্মংণ করি,
চিত্ত মোর ভরে পূর্ণতায় ।
তব কাছে আবেদন,
ক্ষণিকের সে স্মরণ,
ব্যাপ্ত করে দাও মোর সমগ্র সত্তায় ।
যাহা কিছু করি কাজ,
তুমি থাক হৃদি মাঝ,
চরণের ধ্বনি শুনি অন্তরের আঙিনায় ।
পরিপূর্ণ হবে প্রাণ তোমার প্রসাদে,
সকলি অঞ্জলি দিব তব পদ কোকনদে ।

# শ্রীরামকৃষ্ণ ও জাতীয় সংহতি

## স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

বহুবিধ সমস্যা নিয়ে আমাদের দেশ এখন জর্জরিত। এখন দরকার এই সব সমস্যার সমাধানের জন্যে সকলের মিলিত চেষ্টা। কিন্তু এই মিলিত চেষ্টার জন্যে যে ঐক্যবোধের প্রয়োজন তা আমাদের নেই। আমরা যে এক দেশ, এক জাতি, তা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। আমাদের পরিচয়—আমরা বাঙালী বা পাঞ্জাবী, হিন্দু নাহয় মুসলমান। অর্থাৎ ভাষা, বর্ণ বা ধর্মকে ভিত্তি করে আমাদের পরিচয়, ভারতবাসী বলে নয়। আজ সবার মুখে এক কথা—'জাতীয় সংহতি বিপন্ন, দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।' স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশ দ্বিখণ্ডিত হল। সে ব্যথা, সে গ্লানি এখনও আমরা ভুলতে পারিনি। তবু কি আমাদের শিক্ষা হয়েছে? আবার সেই সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, অপরের প্রতি ঘৃণা, অবিশ্বাস আমাদের জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বড় করে দেখি, জাতির স্বার্থকে না। কি করে তা হলে আমরা এক সঙ্গে থাকব?

'সংহতি' মানে 'একাত্মতা'। প্রশ্ন উঠতে পারে—ভারতে কি কখনও একাত্মতা ছিল? যেখানে এত ভাষা, এত ধর্মমত, সকল ক্ষেত্রে এত বৈচিত্র্য, সেখানে কি করে একাত্মতা থাকতে পারে? কেউ কেউ এমন প্রশ্নও করেন জাতীয়তাবোধ বলে কিছু ভারতে কখনও ছিল কিনা। অনেকগুলি খণ্ড রাজ্য নিয়ে আমাদের এই দেশ। অশোক ও আকবরের সময়ে এই খণ্ড রাজ্যগুলিকে এক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনার চেষ্টা হয়েছিল। আকবরের পর থেকে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে যায়, আর প্রান্তীয় রাজ্যগুলি স্ব স্ব প্রধান হতে শুরু করে। এক দেশ, এক জাতি—এই বোধ ছিল না। ছিল না বলেই মুষ্টিমেয় ইংরেজ এত বড় দেশকে জয় করে নিতে পেরেছিল, আর প্রায় দুশ বছর ধরে শাসন করে গেছে শাসন করেছে তো এই দেশের মানুষ দিয়ে! কোথায় ছিল দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ? স্বামী বিবেকানন্দ এই দেশের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ভারতের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, সুমহান, তা যেমন পাশ্চাত্যদেশকে শোনালেন, তেমনি ভারতবাসীকেও শোনালেন। পাশ্চাত্যদেশ ভারতকে আবিষ্কার করল, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা ভারত ভারতকে চিনল। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে প্রচার করেননি, হিন্দু ঐতিহ্যকে প্রচার করেননি, প্রচার করেছেন সমগ্র ভারতের ভাবসম্পদকে, সমগ্র ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের মিলিত অবদানে পুষ্ট যে ঐতিহ্য, তাকে। এই ঐতিহ্য যেমন হিন্দুর অবদান, তেমনি ঐস্লামিক, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায়ের অবদান। এতে আদিবাসীর অবদান, আবার যারা নবাগত তাদেরও অবদান। স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের চোখ খুলে দিলেন, আমরা আমাদের চিনলাম। পাশ্চাত্যের মোহ ভেঙে গেল। পাশ্চাত্য স্বর্গ নয়, যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তাহলে ভারতই স্বর্গ। এত পরমত-সহিষ্ণুতা আর কোথাও নেই। এত উদারতা, এত প্রেম, পরস্পরের প্রতি এত শ্রদ্ধা আর কোথাও নেই। সত্যিকারের জাতীয় চেতনা স্বামী বিবেকানন্দই এনে দিলেন। পাশ্চাত্য-দেশে তাঁর সাফল্য একটা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সাফল্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সাফল্য। ভারত-কৃষ্টির সাফল্য। স্বামীজীর প্রেরণাতেই জাতীয়

আন্দোলনের সৃষ্টি। ক্রমে স্বাধীনতা। কিন্তু যে সাম্প্রদায়িকতা ভারতের ভূমিতে কখনও ছিল না, চতুর ব্রিটিশ শাসক তার বীজ বপন করে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে গেলেন। কিন্তু সেই সাম্প্রদায়িকতা এখনও কাজ করে চলেছে। তাই আমরা হয় বাঙালী, নাহয় পাঞ্জাবী; হয় হিন্দু, নাহয় মুসলমান; হয় ব্রাহ্মণ, নাহয় শূদ্র। আমরা কেউ ভারতবাসী নই। আমরা যে একসূত্রে গাঁথা বহু ফুলের মালা, তা ভুলে গেছি। আমাদের বিভেদবুদ্ধি প্রবল, ঐক্যবুদ্ধি লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু ভারত চিরকাল বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী। এক লক্ষ্য, কিন্তু পথ ভিন্ন—এই নীতিকে কেন্দ্র করে ভারতের কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। মানুষ তো কাদার তাল নয় যে এক ছাঁচে তাকে গড়া চলে। প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র মানুষ, স্বতন্ত্র রুচি। তাই শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে বলা হয়েছে—'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিলনানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'। সকলের গন্তব্যস্থল ঈশ্বর। যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থল সমুদ্র। কোন নদী সোজা চলে না, এঁকেবেঁকে চলে। প্রত্যেক নদীর পথও ভিন্ন। তেমনি মানুষও এক পথ দিয়ে চলে না, সোজাও চলে না। প্রত্যেকে চলে নিজের পথে, যে পথ সে নিজের রুচি অনুসারে বেছে নিয়েছে। পথ যার যাই হোক, লক্ষ্য কিন্তু সকলের এক—ঈশ্বর। এই বিশ্বাস থেকেই এত বৈচিত্র্য। কত বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদ, কত বিচিত্র ভাষা, ধর্মমত, আকৃতি, আচার-ব্যবহার। একই পরিবারের মধ্যেই কত বৈচিত্র্য। তবু সংঘাত নেই। পরস্পরের মধ্যে কত শ্রদ্ধা ও প্রীতি। রাজা এক নয়, রাজ্যও এক নয়। দেশ বহু ভাগে বিভক্ত। তবু এক। কিসে এক? জীবন-দর্শনে এক। কি সেই জীবন-দর্শন? সত্য এক, ঈশ্বর এক—এই জীবন-দর্শন। এই জীবন-দর্শন এসেছে ঋগ্বেদের এক মন্ত্র থেকে। সেই মন্ত্র হচ্ছে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' এই মন্ত্রের দ্বারা ভারতের ইতিহাস, ভারতের কৃষ্টি গঠিত হয়েছে। এই মন্ত্র ভারতকে রক্ষা করেছে। ভারতের ইতিহাসে প্রেমের কাহিনী আছে, করুণা ও মৈত্রীর কাহিনী আছে প্রচুর। হিংসা ও রক্তপাত? তার কাহিনীও আছে, কিন্তু কম। সত্যের জন্যে, ধর্মের জন্যে হিংসা ঘটেছে। বহিরাগত শক্তির আক্রমণের ফলেও ঘটেছে। এত সহিষ্ণুতার জন্যে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে দেশকে। অনেকে মনে করেছে, এ দুর্বলতা। অথচ কত বীর জন্মেছে এ দেশে। কিন্তু দেশ তাদের কাছে বড় নয়। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বড় নয়। বড় হচ্ছে নীতি, ধর্ম, সত্য। সত্যের জন্যে তারা সব ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু কোন কিছুর জন্যে সত্যকে ত্যাগ করতে পারে না। স্বদেশ বিদেশ তাদের কাছে ছিল না। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—তাদের কাছে। সবার মধ্যে এক ঈশ্বর বিদ্যমান। নামরূপ যাই হোক, মূলতঃ আমরা সবাই এক। এক জাতি, এক পরিবার। বৈচিত্র্য থাকবেই, কারণ বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। বৈচিত্র্য না থাকলে ব্যষ্টির বিকাশ ঘটে না। সর্বাঙ্গিক স্বাধীনতা চাই, তবেই বিকাশ সম্ভব। ভারত এই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই ভারতে এত বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য আছে, বিভেদ আছে, তবু সংঘর্ষ নেই। সংঘর্ষ নেই কারণ পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিদ্যমান। মূলতঃ এক, তাই শ্রদ্ধা ও প্রীতি। বৈচিত্র্য গৌণ, ঐক্য মুখ্য। ভারতের সংহতি রাজনৈতিক আদর্শে নয়, আধ্যাত্মিক আদর্শে। জাতি, ভাষা, বর্ণ, পরিচ্ছদ গৌণ, স্বরূপ মুখ্য। আমাদের সকলের স্বরূপ এক। আমরা এক আত্মা। এই একত্ববোধেই আমাদের সংহতি। একাত্মতার অপর নাম সংহতি। এই সংহতিই আসল, অন্য যে কোন সংহতি নকল। রাজনৈতিক সংহতি সংহতিই নয়।

সে সুবিধাবাদীদের জোট! তেমনি ভাষার বা ধর্মের সংহতি কৃত্রিম, অসার, স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র। একমাত্র প্রেমের সংহতিই সংহতি। একাত্মবোধের সংহতিই সংহতি। ভারত এই সংহতিকেই সংহতি মনে করে। তাই ভারত বৈচিত্র্যকে সম্মান করেছে। সকলকে সমান স্বাধীনতা ও মর্যাদা দিয়েছে। অতীতে কত জাতি মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে এসেছে। ভারত তাদের আশ্রয় দিয়েছে। তারা সসম্মানে স্বকীয়তা রক্ষা করে ভারতে বাস করে আসছে ইহুদী, পার্শী, খ্রীষ্টান—এর দৃষ্টান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতাত্মা। সংহতির প্রতীক। সকল মতের, সকল পথের মিলনভূমি। তিনি এক, আবার তিনি অনেক। কত বৈচিত্র্য তাঁর মধ্যে। তিনি স্বরাট, আবার তিনিই বিরাট। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সব ধর্ম একাধারে। তিনি সকলের, সকলে তাঁর। সবাই গ্রাহ্য, ত্যাজ্য কেউ নয়। সব পথই পথ, কারণ সব পথের শেষ ঈশ্বর। সব রূপই ঈশ্বরের রূপ, সব নামও ঈশ্বরের নাম। তাই সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম। এই বৈশিষ্ট্য ভারতীয় কৃষ্টির। এই বৈশিষ্ট্য শ্রীরামকৃষ্ণেরও। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতাত্মা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বজনীন। তাঁর জীবন ও আচরণ বৈচিত্র্যময়, কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই উজ্জ্বল। ঐক্য উজ্জ্বল বলেই এত প্রেম, এত আপনার বোধ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের পথই পথ। বিচ্ছিন্নতা থেকে ভারত-সংহতি রক্ষার একমাত্র পথ শ্রীরামকৃষ্ণের পথ।

# বর্ধমানে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণের যখন আবির্ভাব, সেই সময়ে বর্তমান কামারপুকুর গ্রামের নামটি ততটা পরিচিত ছিল না। পরবর্তিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমার আলোকে কামারপুকুর গ্রামটি হয়ে ওঠে খ্যাতিমান এবং বর্তমানযুগে সেই গ্রাম লাভ করেছে তীর্থের মাহাত্ম্য।

স্বামী সারদানন্দ-রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ' অনুসরণ করে জানতে পারি, কামারপুকুর থেকে বর্ধমানের দূরত্ব বত্রিশ মাইল। সে-সময় হাঁটাপথেই এই বত্রিশ মাইল রাস্তা পার হতে হত। গরুর গাড়ি পাওয়া গেলেও সেটা ছিল খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তবে দামোদর পেরিয়ে বর্ধমান শহরে যাওয়ার পথটুকু অনেকেই গরুর গাড়িতে যেতেন। কথামৃতেও দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ গরুর গাড়িতেই গেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই স্মরণীয়। বর্তমান বর্ধমান শহর যে-সব রেল স্টেশন ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড-কেন্দ্রিক নগরজীবনের ধাত্রী, সে যুগে তেমন ছিল না। এখন কার্জন গেট বা বিজয় তোরণই যেমন শহরে ঢোকার সিংহদ্বার, তখন কিন্তু অধুনা লুপ্তপ্রায় কাঞ্চননগর ছিল শহরে ঢোকার সিংহদ্বার। কাঞ্চননগরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। তখন বাঁকা নদীর যোগসূত্রে ছিল নগরসভ্যতার প্রধান ধারক। আর সেই-সঙ্গে সংযুক্ত ছিল দামোদর নদের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা। অর্থাৎ, সে যুগে (শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) বর্ধমানের সদাচঞ্চল সম্মুখভাগ ছিল কাঞ্চননগরের দিকেই—এখন যেটা অন্ধকার-প্রায় পশ্চাৎভাগ। আর কামারপুকুর থেকে বর্ধমানে আসার পথও ছিল ওই দামোদর এবং বাঁকা নদী পেরিয়ে কাঞ্চননগরের গা ছুঁয়ে কিংবা সেহেরাবাজারের মধ্য দিয়ে।

স্মরণ করা যেতে পারে, এই কাঞ্চননগরই ছিল একদা ইস্পাতের ছুরি, কাঁচির জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে দামোদরের উপর দিয়ে কৃষক সেতু তৈরি হয়ে গেছে। ফলে কামারপুকুর থেকে আরামবাগ হয়ে সটান বর্ধমানে আসা যায় বাসে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ( ১ম ভাগ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, ১৩৭৭ সংস্করণ, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ২৭ ) অনুসরণ করে আমরা জানতে পারি কামারপুকুর থেকে বর্ধমান শহর প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত শহর থেকে কামারপুকুরে আসবার বরাবর পাকা রাস্তা আছে। রাস্তা কামারপুকুরে এসেই শেষ হয়নি; ওই গ্রামকে অর্ধবেষ্টন করে রাস্তাটি দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে পুরীধাম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পাদচারী যাত্রী এবং বৈরাগ্যবান সাধুসকলের অনেকে ওই পথ দিয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমনাগমন করতেন।

কামারপুকুর থেকে বর্ধমানে যাওয়ার পথ ছিল কোন্‌টা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই সেদিন কামারপুকুরের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিলাম। তাঁরা বললেন, সেদিন যে পথ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ধমানে যাতায়াত করতেন, এখনও সেই পথটা বর্তমান, এবং সেটাই সংক্ষিপ্ত পথ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে সেটাকেই "প্রায় বত্রিশ মাইল" পথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্থানীয় লোকেরাও বললেন, হ্যাঁ, পথটা ত্রিশ মাইলেরও বেশি।

কামারপুকুর থেকে বেঙ্গাই চার মাইল। বেঙ্গাই থেকে তারকেশ্বর পেরিয়ে একলক্ষী। শুরু হল বর্ধমান জেলা। তারপর উচালন হয়ে সেহেরাবাজার। সেখান থেকে সদরঘাটে দামোদর পেরিয়ে বর্ধমান।

এ ব্যাপারে বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁদের মধ্যে ডঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন প্রবীণ এবং তথ্যভিজ্ঞ মানুষের মতটাও গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে বর্ধমান হয়ে যেতেন। কামারপুকুর থেকে পায়ে হেঁটে তিনি আসতেন। তারপর ভাতশালার কাছে বাঁকা নদীর উপর যে ব্রিজটা আছে, সেটা পেরিয়ে বর্ধমানে ঢুকতেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। এবং তার কয়েক বছরের মধ্যেই লাইন সম্প্রসারিত হয় বর্ধমান পর্যন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কলকাতায় আসেন ১৮৫৩। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পূজারী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর মা জগদম্বার পূজার ভার অর্পিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের উপর। তার পরবর্তী সময়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে যাওয়ার অন্যতম সহজ পথ ছিল বর্ধমান পর্যন্ত রেল গাড়িতে যাওয়া। তারপর সেখান থেকে কামারপুকুর।

কামারপুকুর গ্রামের সঙ্গে বর্ধমানের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্কও ছিল। স্বামী সারদানন্দজী রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ( প্রথম ভাগ, পূর্ব-কথা ও বাল্যজীবন, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ২৫-২৬ ) অনুসরণে জানতে পারি হুগলি জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে মিশেছে, সেই সন্ধিস্থলের অদূরেই তিনখানি গ্রাম ত্রিকোণমণ্ডলে পরস্পরের সন্নিকট অবস্থিত। গ্রামবাসীদের কাছে ওই তিনটি গ্রাম শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুর নামে পরিচিত থাকলেও গ্রামগুলি এতবেশি ঘন-সন্নিবেশে অবস্থিত যে, পথিকের কাছে একই

গ্রামের বিভিন্ন পল্লী বলে মনে হয়ে থাকে। সেইজন্য চারপাশের সকল গ্রামে ওই গ্রাম তিনটি কামারপুকুর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ওই গ্রামে স্থানীয় জমিদারদের বাস বহুকাল থেকে থাকাতেই বোধহয় কামারপুকুরের সেই সৌভাগ্যের উদয় হয়েছিল।

তারপরই স্বামী সারদানন্দজী বলেছেন: "আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেইকালে কামারপুকুর শ্রীযুক্ত বর্ধমান মহারাজের গুরু-বংশীয়দিগের লাখরাজ জমিদারিভুক্ত ছিল এবং তাঁহাদিগের বংশধর শ্রীযুক্ত গোপীলাল, সুখলাল প্রভৃতি গোস্বামিগণ ঐ গ্রামে বাস করিতে-ছিলেন।" (ঐ, পৃঃ ২৬)

অর্থাৎ, বর্ধমানের সঙ্গে কামারপুকুরের একটি স্পষ্ট যোগসূত্রও সে সময় লক্ষণীয়। তাছাড়া সে সময় বর্ধমান রাজ্যের প্রভাব বর্ধমান ও হুগলী জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত ছিল। বিশেষ করে ধর্মস্থান এবং মন্দির তৈরি করার ব্যাপারে বর্ধমানের খ্যাতি তখন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সে কথায় পরে আসছি।

আমরা দেখলাম, বর্ধমান হয়ে কামারপুকুরে যাওয়ার একটা পথ সে সময় ছিল। এছাড়া আরও কয়েকটি পথও ছিল।

কামারপুকুর থেকে শৈবতীর্থ তারকেশ্বরের দূরত্ব প্রায় বিশ মাইল। তারকেশ্বর থেকে অসংখ্য ছোটখাটো খাল-বিল এবং দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীর মতো দুটি প্রবল খরস্রোত পেরিয়ে আসা যেত আজকের আরামবাগে, সেদিনের জাহানাবাদে; তারপর সেখান থেকে দ্বারকেশ্বর পেরিয়ে হাঁটা পথে বা গরুর গাড়িতে কামার-পুকুর। এখন অবশ্য তিনটি নদীর উপরই সেতু তৈরি হয়েছে। ফলে একদা যে আরামবাগ ছিল ভয়াবহ এবং দুর্গম—এখন সেটাই হয়ে উঠেছে সুগম।

এছাড়া কামারপুকুরের দক্ষিণে প্রায় আঠার মাইল দূরে অবস্থিত ঘাটাল দিয়ে আসা-যাওয়া যেমন করা যেত, তেমনি স্টিমারে বালি-দেওয়ানগঞ্জে এসে সেখান থেকেও হাঁটাপথে কামারপুকুরে আসতেন অনেকে। শ্রীরামকৃষ্ণও এসেছেন। আরেকটি পথ ছিল কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত বন-বিষ্ণুপুর দিয়ে। ওখান থেকে চওড়া রাস্তা আছে।

॥ ২ ॥

এবার আমরা মন্দিরময় বর্ধমানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। বর্ধমানের ধর্মপ্রাণ রাজা তেজচন্দ্রের সময় ওই জেলার বিভিন্নস্থানে গড়ে ওঠে ছোটবড় অনেক দেবালয়। মহারাজার মা বিষণকুমারী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান শহরের অদূরে নবাবহাটে ১০৯টি শিবমন্দির এবং প্রত্যেক মন্দিরে একটি করে ১০৯টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিরাট মন্দির-এলাকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তাঁর ইষ্টদেবতা রাধাহরির করুণা লাভ করতে চেয়েছিলেন। সমান মাপে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরগুলি শুধু সেকালেই নয়, আজও এক মহৎ দ্রষ্টব্যস্থান এবং পুণ্যার্থীদের কাছে তীর্থস্বরূপ।

এখানে ধর্মক্ষেত্র বর্ধমানের পরিচয়ও একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে শ্রমণ ভগবান মহাবীর বর্ধমান এসেছিলেন এই নগরে। তবে মহাবীরের নাম থেকেই যে এই নগরের নাম বর্ধমান হয়েছে—এমন তত্ত্ব ঐতিহাসিকরা মানতে রাজি নন। তাঁদের বক্তব্য, মহাবীর যখন এসে-ছিলেন, তখনই এই নগরের নাম ছিল বর্ধমান। বেদবতী বা দেবানদ, দেবনদ বা দমোদা বা অধুনা দামোদরের তীরে এই বর্ধমানই মহাবীরের সেই আস্থিক গ্রাম বর্ধমান। আগে বোড়োডোমন নামেই এই শহর ছিল পরিচিত। বলা যায়,

পূর্বভারতের অন্যতম প্রাচীন নগর-সভ্যতার ধারক এই শহর।

সে যাইহোক, কুলীন গ্রাম থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই বর্ধমানেরই কানাই নাটশালে এসেছিলেন। এই বর্ধমানই সাধক কমলাকান্তের সাধনপীঠ।

মহারাজা তেজচন্দ্রের সময়েই আরেকটি পবিত্র পীঠস্থান গড়ে ওঠে বর্ধমানের বুকে—সেটি হচ্ছে ঈশানেশ্বর মন্দির। তেজচন্দ্রের পিতা তিলকচাঁদও যেমন ধর্মপ্রাণ ছিলেন, তেমনি তাঁর মাতা বিষণকুমারীও ছিলেন ভক্তিমতী মহিলা। তেজচন্দ্র তাঁর মায়ের নামেই ঈশানেশ্বর মন্দিরটি স্থাপন করেন। আর এই মন্দিরটির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে-প্রসঙ্গ পরে উত্থাপন করছি।

বর্ধমান শহরে তিনটি বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে একটির নাম শ্যামসায়র। এই শ্যামসায়রের ঈশান কোণে মূর্তিটি পাওয়া যায় বলেই নাম হয় ঈশানেশ্বর। পাথরের এই মূর্তিটি মাটির তলা থেকে পাওয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা নগরে সাড়া পড়ে যায়। সহস্র সহস্র মানুষ আসতে থাকেন মূর্তিটি দেখতে। খবর চলে যায় রাজবাড়িতেও। খবর পেয়েই মহারাজ তেজচন্দ্র লোকজন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তারপর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই মন্দিরের যাবতীয় ব্যয়ভার রাজকোষ থেকে বহন করার আদেশ জারি করেন। সেইসঙ্গে পুণ্যার্থীদের জন্য তৈরি করে দিলেন সুন্দর অতিথিশালা।

এই শ্যামসায়রের তীরেই বর্তমান মেডিকেল কলেজ এবং ঈশানেশ্বর মন্দিরের কাছেই স্থাপিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নামে একটি সংগঠনও। বর্তমানে মন্দিরের পুরোহিত দেবদত্ত তেওয়াড়ি। তাঁদের মুখ থেকেও জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। তাঁরা শুনেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষের মুখে। এই মন্দিরে একসময় শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু তোতাপুরীও এসেছিলেন বলে তাঁরা জানালেন।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন মন্দির এবং দেবস্থান দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দিরও বর্ধমান শহরের আরেকটি পীঠস্থান। এই মন্দিরের খ্যাতি দীর্ঘকাল ধরেই দেশদেশান্তরে বিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে কবে যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—সন তারিখ মিলিয়ে সেই ইতিবৃত্ত আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়। অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী সিংহবাহিনী এই দেবী সর্বমঙ্গলার নিত্যপূজা ও সেবার দায়িত্বও বর্ধমান রাজাই বহন করতেন। বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত এই মন্দিরেও শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন বলে স্থানীয় প্রবীণ লোকেরা বললেন। এসম্বন্ধে লোকপরম্পরায় জনশ্রুতি প্রবাহিত।

এক্ষেত্রে একটি প্রসঙ্গ অবশ্যই স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পূর্ববর্তী সাধকদের মধ্যে সাধক কমলাকান্তের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বারবার মা ভবতারিণীর কাছে অনুযোগ করে বলেছেন, মা তুমি সাধক কমলাকান্তকে দেখা দিলে, আর আমাকে দেখা দেবে না? 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতে' (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২) দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, তখন তিনি বলছেন: "মা, তুমি যখন রামপ্রসাদ, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছ, তখন আমাকেও দেখা দিয়ে কৃতার্থ কর।"

সাধক কমলাকান্ত (১৭৭২—১৮২১ খ্রীঃ) গৃহী হয়েও ছিলেন সন্ন্যাসী। একদিকে তিনি যেমন অপূর্ব সব শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন, তেমনি গায়ক হিসেবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র তন্ত্রসাধক কমলাকান্তের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং

তাঁকেই বরণ করেন নিজের গুরুপদে। শুধু তাই নয়, বর্ধমান শহরের কোটালহাটে তাঁর জন্য বাড়ি তৈরি করে দেন এবং তাঁকে সভাপণ্ডিত রূপে বরণ করেন।

কথিত আছে, কমলাকান্ত এখানেই কালী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সাধনপীঠ রচনা করেন। তবে বর্তমানে ওই কালীমন্দিরে যে কালীমূর্তি আছে, সেটি সাধক কমলাকান্ত-পূজিত প্রতিমা নয়, সেটি মৃন্ময়ী। অনেকে বলেন, বড়বাজের চিত্রগঞ্জে শ্মশান সন্নিহিত কালীমন্দিরে শিবহীন যে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, সেটিই আসলে সাধক কমলাকান্তের পূজিত প্রতিমা।

সে যাইহোক, কমলাকান্তের গান যে শ্রীরাম-কৃষ্ণের খুব প্রিয় ছিল, সেটাতো আমরা বারবার দেখছি কথামৃতের পাতায়। সেইদিক থেকে বিচার করলে বর্ধমানের প্রবীণ লোকদের বক্তব্যই সার্থক বলে মনে হয়। তাঁরা বললেন, যদিও কোন গ্রন্থে সেভাবে উল্লিখিত নেই, তবু একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বর্ধমান শহর হয়ে যাতায়াত করেছেন, অথচ কমলাকান্তের মন্দির দর্শন করতে যাননি, যাননি ওই মন্দির সন্নিহিত বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন দর্শন করতে। আসলে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে সংঘটিত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের ঘটনাবলী তেমনভাবে নথিবদ্ধ নেই বলেই হয়তো এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য সূত্রের অভাব। তবে অনেকক্ষেত্রে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত জন-শ্রুতিও ঐতিহাসিক তথ্য এবং উপাদান হিসেবে গৃহীত হয় এবং হয়েছে। এক্ষেত্রেও সেভাবেই গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।

যেমন বাঁকা নদী পার হয়ে এতবার বর্ধমানে এসেও বাঁকা নদীর তীরেই অবস্থিত সেকালের বিখ্যাত সর্বমঙ্গলার মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ যাননি, এটাও কি সরলসূত্রে মেনে নেওয়া যায়? আসলে এগুলিও যে নিছকই অনুমান নয়, এবং এই অনুমান পুরোপুরি বাস্তব তথ্যের উপর নির্ভরশীল—সেটা আমরা এরপরই দেখতে পাব।

॥ ৩ ॥

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' অন্তত দুবার লক্ষ্য করেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর বর্ধমান যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, বর্ধমানের স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে কিছুমাত্র ঔজ্জ্বল্য হারায়নি। নগর বর্ধমান হয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে যাতায়াত তখন খুবই প্রচলিত ছিল বলেই এমন অনুমান করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বেশ কয়েকবারই বর্ধমান শহর হয়ে গমনাগমন করেছেন।

রামকৃষ্ণ কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগে (১৩।২) দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ঘোষ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একবার বর্ধমানের কথা উল্লেখ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ বলছেন: "গিরিশ ঘোষ আগেকার সব সঙ্গ ছেড়েছে।" প্রত্যুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি বর্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞেস কল্লুম, এ কি হলো! এ তো দামড়া! তখন গাড়োয়ান বল্‌লে, মশাই, এ বেশী বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।"

এখানে দেখছি, শ্রীরামকৃষ্ণ গরুর গাড়িতে চেপে যাচ্ছিলেন। তাই গাড়োয়ানের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে।

'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকায় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অগস্ট বর্ধমানের রাজবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আগমনের যে বিবরণটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি উল্লেখ করার আগে আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে উল্লিখিত বর্ধমান-প্রসঙ্গে দ্বিতীয়

ঘটনাটির কথা স্মরণ করতে পারি।

কথামৃতে দ্বিতীয়বার যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ধমান যাত্রার প্রসঙ্গ পাই, সেখানেই দেখি, তিনি গরুর গাড়িতে চেপেই যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের তৃতীয় ভাগে (৩।৩) দেখি, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসে বলরাম প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি তাঁর কামারপুকুর যাওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন এখানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "ওদেশে (কামারপুকুরে) যাচ্ছি বর্ধমান থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়িতে বসে,—এমন সময় ঝড়বৃষ্টি। আবার গাড়ির সঙ্গে কোত্থেকে লোক এসে জুটলো। আমার সঙ্গের লোকেরা বললে, এরা ডাকাত!—আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি, কখনও কালী কালী,—কখনও হনুমান হনুমান, সব রকমই বলছি এ কি রকম বল দেখি

ঠাকুর এখানে বোঝাতে চাইছেন, একই ঈশ্বর, তাঁর অসংখ্য নাম, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ করে মরে।

এতো গেল একদিক, অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে তৎকালীন বর্ধমানের পথঘাটে চলাফেরার যে প্রবল আতঙ্ক ছিল, সেটাই পরিস্ফুট। পথে পথে ডাকাত এবং বাগ্দীদের ভয় ছিল খুবই বেশি।

এবার আসি 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকার বিবরণে। ওই পত্রিকায় 'মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ওই প্রবন্ধ থেকেই জানতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ধমান রাজবাড়িতে গিয়েছেন। শুধু একবার নয়, প্রবন্ধকার লিখেছেন, "মধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমানের রাজবাটীতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় জানসেন কলাবৎ না হইলেও বর্ধমানের রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত।"

প্রথমত, এই প্রবন্ধটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "মধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমানের রাজবাটীতে আসিতেন।" অর্থাৎ একবার নয়, মাঝে মাঝেই তিনি আসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মানুষ মাঝে মাঝে রাজবাটীতে যদি গিয়ে থাকেন, তাহলে একবারও বর্ধমানের ১০৯ শিবমন্দির দর্শন করতে যাননি, বা যাননি রাজবাটী সন্নিহিত সর্বমঙ্গলা মন্দির দর্শন করতে, এটা কি ভাবা যায়?

উক্ত প্রবন্ধেই লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে বলেছেন: "লোকে যে সময় ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া বিগলিত হইতেন।"

একদিকে আমরা যেমন বর্ধমান রাজবাটীতে কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণের তথ্য পেলাম, অন্যদিকে পাই তাঁর ঈশানেশ্বর মন্দিরের শুভ অবস্থানের বর্ণনাও।

শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে (পৃঃ ১৩৭-৩৮) যে বর্ণনা পাই, তা থেকে জানতে পারি, সেবার শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরছিলেন। ফেরার পথে বর্ধমানে এসে তিনি ঈশানেশ্বর শিবমন্দির সন্নিহিত অতিথিনিবাসে অবস্থান করেছিলেন। এই অতিথিনিবাসের কাছেই ছিল একটি কাঁটাবন—শিবের প্রিয় সেই কাঁটাবন দেখে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত হন।

রামকৃষ্ণ পুঁথিতে (৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৩৮)

বলা হয়েছে—

"কি এক কণ্টক তার নাম নাহি জানি।
পূজিলে তাহায় বড় তুষ্ট শূলপাণি॥
* * *
কণ্টক লইয়া মত্ত হইল পূজায়॥
আবেশে মহেশ পদে কণ্টক প্রদান।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানেশ্বর শিবের পূজা করেছিলেন সেদিন—এই তথ্য জানেন সর্বজন। তাই ঈশানেশ্বর মহিমা আজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ঈশানেশ্বর মন্দির থেকে বর্ধমান রেল স্টেশনের দূরত্ব এক মাইলের মধ্যে। তাই, স্টেশনে যাওয়ার আগে বা স্টেশন থেকে এসে আরও কয়েকবার তিনি সেখানকার অতিথিনিবাসে অবস্থান করেছিলেন, স্থানীয় প্রবীণ তথ্যাভিজ্ঞ মহলের এই দাবিকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

# শ্রীম-কথা

## ব্রহ্মচারী যতীন্দ্রনাথ

ঠাকুর যে সব গান গাহিতেন তাহাই তিনি ( শ্রীম ) গাহিতেন, অন্য গান তাঁর ভাল লাগিত না। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা'—গান শ্রীম এইরূপে গাহিতেন—

'তোমারেই করিয়েছ জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর আমায় কোরো নাকো পথহারা॥'

বলিতেন—আমাদের সাধ্য কি যে আমরা তাঁহাকে জীবনের ধ্রুবতারা করি। তিনি কৃপা করিয়া, যদি করান—তবেই উহা সম্ভব। যেসব গান শুনিয়া ঠাকুরের সমাধি হইত সেসব গান এক-একটি মন্ত্রস্বরূপ, উহার ভিতর তাহার শক্তি আছে।···এদেশ অদ্ভুত দেশ। যে যাহা কিছু করিবে, গাহিবে তাহা যদি ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায় তবে গ্রাহ্য নতুবা ত্যাজ্য। আহারাদিও যদি সত্ত্বগুণবর্ধক হয় তবে গ্রাহ্য নতুবা পরিত্যাজ্য।

একদিন মঠের এক সাধু আসিয়া তাঁহাকে গান শুনাইতেছেন। প্রথম দুটি গান রামকৃষ্ণ সম্পর্কশূন্য। উহা শ্রীমর মনঃপূত হইল না। তৃতীয় গান—'মা আছেন আর আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার—মায়ের হাতে খাই পরি মা নিয়েছেন আমার ভার॥'—গায়ক এই দুটি লাইন বেশ ভাবের সহিত গাহিলেন। শ্রীম আর বাকি অংশটা গাহিতে দিলেন না। বলিলেন—'আর কি! মা নিয়েছেন আমার ভার'। এখন আমরা নিশ্চিন্ত। এরপর আর চলে না।

পিতামাতার সেবা না করিয়া কোন সেবা-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। একদিন রাত্রিতে আসিয়া একজন বলিল—শোভাবাজারের একটি ১৮।১৯ বছরের ছেলে মাতৃশোকে আত্মহত্যা করিয়াছে ও একটি কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছে—'মা আমি তোমার নিকট চলিলাম।' এই শুনিয়া শ্রীম অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—আহা সে স্থানটি মহাতীর্থ। লোকে সন্তান, স্ত্রী, স্বামীর শোকে কেহ অর্থাভাবে প্রাণত্যাগ করে শুনিয়াছি, কিন্তু মার শোকে শরীর ত্যাগ করিয়াছে ইহা শুনি নাই। ধন্য সেই পুত্র। ভগবান নিশ্চয় তার কল্যাণ করিবেন। আজকাল জগতে সব ভাবই মলিন হইয়াছে কিন্তু মাতৃভাবটি এখনও পূর্ণমাত্রায় পবিত্র আছে। মাতৃভাবে তিনি শীঘ্র প্রসন্ন হন—ঠাকুর বলিয়াছেন।

সেদিন কেমন একটি দৃশ্য দেখিলাম! রাস্তার একদিকে জাঁকজমক করিয়া বিবাহ করিতে বরযাত্রীর দল চলিয়াছে—অপর দিকে 'রাম নাম

সত্য হ্যায়' বলিয়া শবযাত্রা চলিয়াছে। যে মারা গিয়াছে, কত অফুরন্ত আশা তাহার প্রাণে ছিল, কোথায় সব বিলীন হইয়া গেল। তবু লোকে মনে করে যে সে মরিবে না। সেই মৃত্যুই মৃত্যু যে মৃত্যুর পর আর মৃত্যু হইবে না।—'এ জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর'।

নির্জনে একলা একঘরে থাকিলে কাম সর্বাগ্রে উগ্রমূর্তি হইয়া উঠে। অন্য কামনা বাসনা যাহা দশজনের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিতে সুযোগ পায় নাই তারা প্রবলভাবে আক্রমণ করে। নির্জনে যাইলে নিজের স্বরূপ চেনা যায়, অহংকার দূর হয় ও ভবিষ্যতের জন্য সাধক সাবধান হন। চঞ্চলচিত্ত সাধকের পক্ষে নির্জনবাস বিপজ্জনক।

যিনি ভগবান দর্শনের জন্য সঙ্ঘে থাকিয়া নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর না দিয়া নিষ্কাম দাসভাবে সকলের সেবা করিয়া দীনহীনভাবে সারা জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন—তিনিই ধন্য। সঙ্ঘ হইল ভগবানেরই একটি মূর্তি, ইহার ভিতর দিয়াই তাঁর প্রকাশ হয়। সঙ্ঘ না থাকিলে সে ধর্মের প্রসার হয় না। লোপ পায়। মূল উদ্দেশ্য ভগবানলাভ, ত্যাগের ভাব ঠিক থাকিলেই সঙ্ঘ ঠিক থাকে। দুটির একটির অভাব হইলেই সঙ্ঘের পতন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীম কত ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। জুতা খুলিয়া, হাতে মুখে জল দিয়া সেই দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিল পরিমাণ প্রসাদ মাথায় ও কপালে ঠেকাইয়া গ্রহণ করিতেন। যেন সাক্ষাৎ সেই দেবদেবী দর্শন করিতেছেন। বলিতেন—'আমাদের কি সৌভাগ্য কোথায় রামেশ্বর, দ্বারকা, পুরী—এখানে বসিয়াই প্রসাদলাভে ধন্য হইতেছি। তাঁহাদের সহিত এখন আমাদের touch হইয়া গেল। প্রসাদ অধিক গ্রহণ করিতে নাই!'

দক্ষিণেশ্বরে গেলে শ্রীম সর্বক্ষণ খুব গম্ভীর-ভাবে থাকিতেন। তাঁহার দৃষ্টি, আসন, চলন দৃষ্টে মনে হইত তিনি অতীতের সেই রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে—প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গেই যেন বেড়াইতেছেন। ঠাকুর যেখানে বসিতেছেন যেন তাঁহার পাশেই বসিতেছেন ও তাঁর কথামৃত পান করিতেছেন। নাটমন্দিরে একটি স্তম্ভকে আলিঙ্গন করিতেন। ঠাকুর একসময় এই স্তম্ভটি আলিঙ্গন করতঃ বলিয়াছিলেন যে অন্তরঙ্গভক্ত হইল যেন এইরূপ ভিতরের স্তম্ভ। যে সব বৃক্ষ-গুলি ঠাকুর স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহা তিনি আলিঙ্গন করিতেন। কুঠি বাড়ীর যে ঘরে ঠাকুর রাসমণি ও মথুরবাবুর জীবদ্দশায় থাকিতেন সেই ঘরটিও দর্শন করিতেন। ঠাকুরের ঘর, বেলতলা, পঞ্চবটী আদি স্থানে বসিবার বা চলিবার সময় বা যেখানে দাঁড়াইতেন সেখানে ভক্তদিগকে খুব সাবধানে থাকিতে হইত। তিনি যে ঐ সকল স্থানে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছেন—ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিত না। মায়ের মন্দিরে খোলা চাতালে তিনি বসিয়াছেন। সকলের ফটো নেওয়া হইবে। একজন ভক্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁর পাশে বসিতে যাইতেছে, অমনি তিনি বলিলেন—'না, না, না, এখানে বসিবেন না, এখানে ঠাকুর বসিয়াছেন। আমরা তাঁরই পার্শ্বে বসিয়াছি। তাঁরই ফটো নেওয়া হইতেছে, আমাদের নয়। মন্দির হইতে বেলতলা পর্যন্ত রাস্তায় বা পুকুরের ঘাটে যে যে স্থানে ঠাকুরের সহিত দাঁড়াইয়া কথাবার্তা হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইতেন এবং দিনক্ষণ উল্লেখ করিয়া কখন কখন ঠাকুরের কথা বলিতেন।

একদিন পঞ্চবটীতে বনভোজন হইতেছে। আহারের পূর্বে রামলালদাদাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ দধি-মিষ্টান্নাদির প্রায় অর্ধেকাংশ রামলালদাদার

বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—'এঁরা হইলেন গুরুবংশ, আমাদের পূজ্য। যে বংশে ভগবান জন্ম ধারণ করিয়াছেন এঁরা সেই বংশের, কত ভাগ্যবান এঁরা।'

কোন ভক্ত কামারপুকুর দর্শন করিয়া আসিলে তাহাকে দেখাইয়া ভক্তদের বলিতেন—'He is coming from the Holy land —Jerusalem' (তিনি পুণ্যতীর্থ জেরুজালেম হইতে আসিয়াছেন) এবং সানন্দে তাঁহাকে মিষ্টান্নাদি খাওয়াইতেন। বলিতেন—'আমি যখন প্রথম কামারপুকুর যাই, রাস্তার লোক, ক্ষেতে চাষী সকলকে গিয়া ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি. সকলকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইত যেন কত আপন। পশুপক্ষী বৃক্ষ সকলকে ধন্য মনে হইত কারণ ইহারা ঠাকুরকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়াছে। যিনিই ঠাকুরের কথা বলিয়াছেন তাঁকেই প্রণাম করিয়াছি। ঠাকুর চোখ বদলাইয়া দিয়াছেন কিনা।'

ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজে প্রায়ই যাইতেন এই জন্য শ্রীম কখন কখন ঐসব স্থানে যাইতেন। নববিধান মন্দিরে যেখানে ঠাকুর বসিয়াছিলেন সেই অংশেই তিনি বসিতেন। ঠাকুর যেদিন নববিধানে আসিয়াছিলেন প্রতিবৎসর ঐদিনে তিনি অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হইতেন।

কালীপূজার দিন সন্ধ্যায় কালীঘাট দর্শনে যাইবেন বলায় কেহ কেহ ভীড়ের জন্য আপত্তি করিল। বলিলেন—'একি Station-এ টিকিট কাটিবার ভীড় না Cinema-র টিকিট কাটিবার ভীড়? এ ভীড়ের প্রতি ব্যক্তির উদ্দেশ্য মাকে দর্শন করা। কত মহৎ উদ্দেশ্য। এ ভীড়ের ধাক্কায় যদি শরীর যায় তাও ভাল। আজ বিশেষ দিন। গৃহস্থদের এসব দিন প্রতিপালন করা একান্ত কর্তব্য। হিন্দুর জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একটা একটানা ধর্মপ্রবাহ। শাস্ত্র-বিধিনিষেধ যাহারা যথাযথ মানিয়া চলেন সেইসব নিষ্ঠাবান পরিবারেই মহাপুরুষগণ এবং অবতার পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন। উচ্ছৃঙ্খল পরিবারে তাঁরা জন্মান না।'

দুর্গাপ্রতিমা দেখিতে গিয়া Cornwallis Street-এ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেখিয়া বলিতেছেন—'মা দুর্গা দেখুন—কেমন আনন্দময়ী আনন্দ করিতেছেন।' ছেলেমেয়েদের মিষ্টান্নাদির জন্য আব্দার করিতে দেখিয়া বলিলেন —'দেখুন মা এখানে কেমন লীলা করিতেছেন। মা বুঝি শুধু প্রতিমাতেই আছেন? তা নয়, যাকিছু আনন্দ সবই তিনি।' College street market-এ শাকসব্জি দেখিয়া বলিতেছেন—'ঐ দেখুন, মা এখানে শাকরূপে বিরাজ করিতেছেন। এটি খাইয়া তবে আমরা বাঁচিয়া আছি। মা-ই আমাদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এইরূপে বিরাজ করিতেছেন।'

একদিন শ্রীম বলিলেন—'চলুন আমরা বৃন্দাবন দর্শন করিতে যাই'—বলিয়া ছাদে গিয়া চন্দ্রদর্শন করিয়া বলিলেন—'এই চাঁদই বৃন্দাবনে উঠিয়াছিল ও রাসলীলা দর্শন করিয়াছিল। এই চন্দ্রদর্শনে আমাদের বৃন্দাবনের সঙ্গে touch হইয়া গেল। আমরা এখন বৃন্দাবনে আছি। স্থান কালের ব্যবধান মনের পক্ষে নয়।'

শ্রীম—এই কথামৃত লিখিবার জন্য তিনি কত পূর্ব হইতে তাঁর মনের মতো লোক তৈরি করিতে-ছিলেন তা আমরা জানি না। Class VII-এ যখন পড়ি তখন থেকে আমি Diary লিখিতে আরম্ভ করি। Town Hall, Senate Hall-এ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের lecture, school college-এর সব আলোচনায়—সব খুব মন দিয়া শুনিতাম ও সময় তারিখ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করিয়া Note বই-এ লিখিয়া রাখিতাম। ১৫।১৬ বছর এইরূপ অভ্যাসের পর ঠাকুরের সঙ্গে দেখা

কি শুভ মুহূর্তে দেখা হইল। জীবনের সব programme বদলাইয়া গেল। পূর্বের ও বর্তমান আদর্শ আকাশ পাতাল তফাৎ হইয়া গেল। (সহাস্যে) একদিন Town Hall-এ meeting-এ দেরীতে গিয়াছি। সভা তখন শেষ। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,'President কি বলিলেন?' তিনি বলিলেন—'কি বিষয় President বলিয়াছেন তা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না তবে বেশ বলিয়াছেন।'

কেশববাবুর lecture খুব ভাল লাগিত। যেন প্রাণের কথা টানিয়া খুব ভাবের সহিত বলিতেন। পরে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হইবার পর বুঝিলাম কেশববাবুর কথা কেন এত ভাল লাগিত। কেশববাবু পূর্ব হইতেই ঠাকুরের কাছে যাইতেছেন—সেই সব কথা নিজের ওজস্বিনী ভাষায় বলিতেন। তাই এত ভাল লাগিত।

একদিন কিছুতে আমায় কামড়ায়। তাতে যেন মৃত্যুযন্ত্রণা বোধ হইতেছিল তখন অসুস্থ ঠাকুরের সে দীর্ঘ-যন্ত্রণার কথা মনে করিলাম। তাহাতে আমার যন্ত্রণা আগুনে জলপড়ার মতো শান্ত হইয়া গেল।

তাঁর আশ্রয় যে নেয় সেও অপরের আশ্রয়-স্থল হয়। 'ত্বামাশ্রিতা হি আশ্রয়তাং প্রযান্তি॥'

পূজা তাঁর সঙ্গে Direct touch, পূজার বাহ্য কর্মভাগটা যথাসম্ভব কমাইয়া এক মনে অধিক জপই উত্তম।

(একজন গাহিতেছেন—'কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার…আপনি মাতিয়ে, জগতকে মাতাব…') শ্রীম—'আবার জগৎকে মাতানো চাই। জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত। যদি তোমার কাঁদা আন্তরিক হয় তবে তোমার সংস্রবে যে আসিবে সে আপনা হইতেই কাঁদিবে। সেই জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না। অপরকে কাঁদাইবার ইচ্ছাটি হইলেই তোমার নিজের কান্নাটি বন্ধ হইয়া যাইবে।'

# শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারীসমাজ

শ্রীমতী কবিতা সিংহ

এ বছর আমরা শ্রীচৈতন্যের পাঁচশততম জন্ম বার্ষিকী পালন করছি, আর স্মরণে রাখছি শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাবের দেড়শত বর্ষ। এই দুই অসামান্য সমাজ-সচেতন, সহজ অথচ মনস্বী পুরুষকে আমরা সম্পূর্ণভাবে ও বাস্তবতার নীরিখে যত বেশি বুঝতে চেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি কলরব করে এঁদের মহাপ্রভু, পরম-পুরুষ বা পরমহংস রূপটিকে বড় করে তুলে কেবল ধর্মের মার্কামারা করে তাকে তুলে রাখতে চেয়েছি।

কিন্তু এঁরা যে মানবধর্মের প্রবক্তা, নতুন রেনেসাঁর জনক, এবং ধূলা মাটির দরিদ্র পশ্চাদপদ ও নারীসমাজের প্রেরণা এবং অবহেলিতের সর্বস্ব, একথা আমরা সচরাচর স্মরণে রাখি না। আমাদের গণমাধ্যমগুলির হতাশাবাদী পতনশীল অস্তিত্বের মধ্যদিয়ে যদিও আমরা সমাজের শুভ ও অগ্রগামী দিকগুলির সংবাদ কদাচিৎ পাই, তবু একথা আজ পূর্বের মতো সত্যি যে ভারতে নারীদের মধ্যে এক গোপন বিপ্লব ঘটে গেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সেন্সাস রিপোর্টে এই নিঃশব্দ বিপ্লবের চিত্রটি সংখ্যা ও অঙ্কের আকারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতে নারীর সংখ্যা ক্রমে কমে যাচ্ছিল। অশিক্ষা, অনাহার, অপুষ্টি, অতিপ্রসব, কন্যা-সন্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যুসাধন, পাশবিক অত্যাচার, শোষণ, স্বল্পব্যয়ে অধিক শ্রমদান—এইসব সামাজিক ও মানবিক অন্যায়ের ফলেই এই

ঘটনা ঘটে চলেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে ভারতে নারীর সংখ্যা আর কমছে না। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে সমাজের নানা ক্ষেত্রে, নানা দিকে তাঁদের বিকাশ লাভ হচ্ছে। সেন্সাস বলেছে 'এ এক চাঞ্চল্যকর বিপ্লব'। সমাজপুরুষ চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের সমন্বয়ের কথা যেমন অবতারে, ভাবে এবং চিন্তাধারার অনন্যতায় আমরা জেনেছি, ঠিক তেমনি, আজ আমরা অবশ্যই বলতে পারি এঁদের প্রভাব, যাকে অনেকে প্যান-হিন্দুইজম্ বলে সংকীর্ণ করে দেখেন, এবং যা যথার্থই মানবধর্ম ও সাম্যধর্ম তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। কেবল পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখলেই আজ স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাব রামকৃষ্ণের চিন্তাধারায় বিবেকানন্দের কর্মযোগকে সম্বল করে কত বিশিষ্ট নারীর উত্থান ঘটেছে। সমাজের এবং সংস্কৃতির বহু দায়িত্বপূর্ণ সম্মানীয় মঞ্চে রয়েছেন রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের সারথি বহু আধুনিক বুদ্ধিজীবী নারী। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছেন এমনি বহু বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব যাঁরা নিঃশব্দে নিষ্ঠার সংগে সমাজ পরিবর্তন করে চলেছেন কথা দিয়ে নয় কেবল কাজ দিয়ে। বিশ্বের কোণে কোণে নানা জাতি নানা ভাষাভাষী নারীর মধ্যে এই আদর্শের রূপমূর্তিই ক্রমশঃ প্রতিভাত হয়ে উঠছে। এই ফলস্বরূপের দিকে চোখ রেখে, যদি আমরা আজ তার পুষ্প, পত্র, প্রশাখা, শাখা এবং কাণ্ড শিকড় অতিক্রম করে মূল বীজে পৌঁছে যাই তাহলে দেখতে পাব কোন উচ্চতম গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নারীচিন্তাধারার তারটি বেঁধে নিয়েছিলেন।

যিনি ব্রহ্ম, তিনি কালী। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তিনি ব্রহ্ম। কিন্তু সেই নিষ্ক্রিয় যখন সক্রিয় হয়ে ওঠেন তখন তিনি আর ব্রহ্ম নন। তিনি নারী, তিনি কালী, আদিশক্তি, তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্রী। এই গভীর তত্ত্বকেই সহজ করে তিনি বলেছেন 'মায়ের টান বাপের চেয়েও বেশি। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলেনা।' বাস্তবেও আমরা তাইই দেখেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বল্প মাত্র শিষ্য সংখ্যা, এবং তাঁদের নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণের যে কঠোরতা তা শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষা দানের পদ্ধতির মধ্যে ছিল না। তিনি সকলকে নির্বিশেষে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি পিঁপড়েটিরও মা। বলেছিলেন, 'আমি সতেরও মা অসতেরও মা। জগৎ জুড়ে আমার ছেলে রয়েছে তিনি সকলের মঙ্গল করুন।' বলেছিলেন, 'তোমাদের পায়ে কাঁটা বিঁধলে—আমার বুকে শেল বাজে'। শ্রীরামকৃষ্ণের সারাজীবন এই মাতৃশক্তির পূজা, গুণকীর্তন এবং বাস্তবে প্রতিদিনের জীবনে নারীকে সম্মান প্রদর্শন।

অনেকে বলেন তিনি নারী সম্বন্ধে বহু বক্রোক্তি করেছেন, তিনি নারীকে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে হেয় করেছেন।

এখানে আমাদের স্মরণ করতে হবে, মাহুত নারায়ণ এবং হাতী নারায়ণের কথা। গঙ্গাজল এবং নর্দমার জলের কথা। তিনি কি মন্দপুরুষ নষ্টচরিত্র ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সবাইকে সাবধান করেননি? নিজের ভর্ৎসনা ব্যক্ত করেননি? পুরুষদের মধ্যে যারা মেশার অযোগ্য তাদের সম্বন্ধে প্রিয়বর্গকে সাবধান করেননি? পুরুষ ভক্তদের যখন তিনি কামিনীকাঞ্চন থেকে দূরে থাকতে বলতেন তখন নারীরা ছিলেন অন্তঃপুরবর্তিনী। কেশবচন্দ্র সেন যখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রাস্তার এপার থেকে ওপারে হেঁটে গিয়েছিলেন তখন প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনভ্যস্ত পুরুষমনে নরনারীর দোলা লাগা অনেক সহজ ছিল। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে

স্ত্রী-পুরুষ যেভাবে অবলীলায় এগিয়ে চলেছেন, কর্মে বন্ধুত্বে পরস্পরকে স্বাভাবিক চোখে দেখছেন, সেদিন সে পরিবেশ তো ছিল না। লক্ষ্য করলে দেখব তখনকার সমাজে অগ্রসর ব্রাহ্ম মহিলাদের উপাসনায় উপস্থিতি নিয়ে তিনি আনন্দ করেছেন, রহস্য করেছেন কিন্তু ক্রুদ্ধ হননি। প্রতিবাদও জানাননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তঃস্থল থেকে শক্তি উঠে আসত যে শক্তি তাঁকে প্রেরণা দিত সে শক্তি কিন্তু নারী শক্তিই।

ব্যক্তিজীবনে তিনি পেয়েছিলেন এক পবিত্র পরিশুদ্ধ জননীকে। যিনি কখন লক্ষ্মীর আকাঙ্ক্ষা করেননি, ভক্তির আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিক্ষা মা ছিলেন এক কামারকুলের ভক্তিমতী রমণী। উনবিংশ শতাব্দীর এক অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাণী রাসমণি। এই নারী না হলে ভবতারিণীর এমন দক্ষিণেশ্বর সম্ভব হত কী? এঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিতেই তো শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম গুরু এক রমণী। যাঁকে তিনি ব্রাহ্মণী বলতেন। গঙ্গামায়ীকে তিনি শ্রদ্ধা করেছিলেন। তাঁর আর এক মায়ের নাম গোপালের মা। যাঁর ছবি স্মরণীয় হয়ে আছে শিল্পী নন্দলালের কলমের ছোঁয়ায়

যদি সময়ের যথার্থ হিসাব করা যায় তাহলে একথা কি বলা যায় না যে তাঁর প্রথম শিষ্যাও এক নারী? গৌরী মা? এবং একথাও কি স্পষ্ট নয় যে ভগিনী নিবেদিতা যেমন বিবেকানন্দের মানসকন্যা, তেমনি সেই নিবেদিতারই পূর্বসূরী এই নিঃশঙ্কা একাকিনী সযৌবনা সন্ন্যাসিনী গৌরদাসী?

শ্রীরামকৃষ্ণ কি কখন গৌরদাসীর নিজস্ব নারী-স্বাধীনতাকে ভৎ'সনা করেছেন?—খর্ব করেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ নারীকে দেখেছেন প্রথমতঃ আদি শক্তি হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁকে দেখেছেন মাতৃশক্তি হিসাবে। বলেছেন, 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—তিনিই মা হয়েছেন। মা, মহামায়া দ্বার না ছাড়লে ঈশ্বরের দর্শন হয় না। তৃতীয়তঃ আমরা দেখি তিনি নারীকে দেখেছেন পুরুষের সঙ্গে সমান ও যুগ্ম ভাবে। শিবশক্তি ভাবে। হাঁড়ি আর সরা কি আলাদা থাকে? এই সৃষ্টিতে এই সংসারে—তাই নারদাদি স্তব করেছিলেন—হে রাম যত পুরুষ সব তুমি; আর প্রকৃতির যতরূপ, সব সীতা ধারণ করেছেন। তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রানী, তুমি শিব, সীতা শিবানী, তুমি নর, সীতা নারী।

এই যুগলশক্তির, সমদৃষ্টির পর, চতুর্থতঃ আমরা দেখি তাঁর নিজস্ব ভাব। মাতৃভাব। শ্রীমা বলেছেলেন—'ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই ভাব বিকাশের জন্য এবার আমাকে রেখে গেছেন।' যাঁকে তিনি ইষ্টদেবী বলে জেনেছিলেন, যাঁর জন্য তিনি বালিতে কাঁকরে মুখ ঘষে ঘষে রক্তপাত করেছিলেন, যার দেখা পাবার জন্য তিনি গলায় খড়্গ দিতে গিয়েছিলেন, তিনিও তো এক নারীদেবতা—কালী, মা ভবতারিণী। তিনি সংসারীকে এত দূর পর্যন্ত উপদেশ দিয়েছিলেন যে মা ব্যভিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না। বৃন্দে ঝিকেও তিনি মাতৃভাবেই দেখেছিলেন। রূপোপজিবিনী এবং অভিনেত্রীদের তিনি আনন্দময়ীর মূর্তিতে দেখতেন। কখন তাঁদের ঘৃণা করেননি। প্রণাম গ্রহণ করে, করুণা ভরে বলেছেন—থাক্ মা, থাক্। চৈতন্যলীলা দর্শন করে তিনি যা বলেছিলেন তার মূল ভাব হল, কি হয়েছে তাতে? যদি বেশ্যারা অভিনয় করে? অভিনয়ের মধ্যে তারা যা সেজেছে সেটাই তো দেখবার। তাদের

ব্যক্তি জীবন তো বিচার্য নয়। তাদের অভিনয় অংশটিই বিচার্য। সোনার আভা দেখে, সত্যকার আভার উদ্দীপন হলেই তো হল।

পঞ্চমতঃ পরম বিধান, পরম শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যে শাস্ত্রে আছে মানুষ যখন জন্মায় তখন সে কিছু ঋণ নিয়ে জন্মায় যেমন দেশের প্রতি ঋণ এবং—'দেবঋণ, ঋষিঋণ, মাতৃঋণ, পিতৃ-ঋণ এবং স্ত্রীঋণ।' মাতৃপিতৃঋণ পরিশোধ না করলে তো কোন কাজই হয় না। আর স্ত্রীর ঋণ না শোধ করলে, অর্থাৎ তাঁর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করলে কর্তব্যচ্যুত হতে হয়—ঋণমুক্ত হওয়া যায় না।

ষষ্ঠতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিদ্যাশক্তি ঈশ্বর উদ্দীপনারও উদ্ঘাটন করতে পারেন। নীল-বসনা এক নারীকে দেখে তাঁর মনে সীতার উদ্দীপনা হয়েছিল। গোপীজীবন তাঁর পরম প্রেরণা ছিল। তাঁর জীবনের অন্যতম নারী-পূজা, যা তাঁর পূর্বেও কখন হয়নি এবং পরেও না, তা হল নিজের স্ত্রী শ্রীমায়ের পূজা। ষোড়শী পূজা।

সপ্তমতঃ তাঁর দেয় উপদেশমালায় নারীর উপমার অসামান্য প্রয়োগে তিনি সংসার জীবনে সাধারণ নারীর স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধ সাধনার উপমা বার বার দিয়েছেন। এক পতিব্রতা নিষ্ঠাবতী নারী কাক-বক ভস্ম করা সন্ন্যাসীর চেয়েও অনেক বড়। সৃষ্টি প্রলয়ের বিশাল ঘটনাকে তিনি গৃহিণীদের 'ন্তাতাক্যাতার হাঁড়ি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। গৃহিণীরা যেমন একটি হাঁড়িতে সংসারের আসল বীজগুলি সঞ্চয় করে রাখেন তেমনি প্রলয়কালে সৃষ্টির আদিবীজগুলি সংরক্ষিত করে রাখেন আদ্যাশক্তি। তিনি বলেছেন—মা যেমন বোঝেন কোন সন্তানটির কোন খাদ্যটি সইবে, তেমনি প্রকৃত গুরুও বোঝেন শিষ্যকে কোন পথে চালনা করা উচিত। এমনি অজস্র উদাহরণে তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বশেষে তাঁর নিজের ব্যক্তিজীবনে, প্রতি-দিনের আচরণে, তিনি শ্রীমাকে, সেই ষোড়শী পূজার সম্মান মঞ্চ থেকে কখনও নামিয়ে আনেননি। যখন শ্রীমায়ের সঙ্গে এক শয্যায় রাত্রিবাস করেছেন, তখন থেকেই তিনি বিদ্যার সংসার কেমন হবে তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ-স্থাপন করেছেন। মা বলেছেন, ঐ কাল থেকে সর্বদা এমন মনে হত, যেন হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত রয়েছে। সেই ধীর, স্থির, দিব্যোল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকত, তা বলে বোঝাবার নয়।

এই কথাতেই কি পতিপত্নীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের সাক্ষ্য মেলে না?

সেই কিশোরীকে তিনি নিজের জ্ঞানরাশি ঢেলে দিতে দিতে শেখাতেন 'প্রদীপে সলতেটি কেমন করে রাখতে হয়, বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়। তারপর ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি বীজমন্ত্রের কথাও হত।

কত হাস্য পরিহাস, হাত-ইশারায় ফাঁদি নথ দেখিয়ে মাকে বোঝানো, মায়ের প্রথম যুগের রান্না নিয়ে রসিকতা। দুজনের মধ্যে এত সুন্দর পরস্পরকে বোঝার শক্তি ছিল যে একটি বাক্যে, একটি ভঙ্গিতেই পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় হয়ে যেত। মা কোথায় গেলে ঠাকুর খুশি হন, কোথায় না গেলে, তা যেমন মা এককথায় বুঝতেন তেমনি, মার কথাতেই ও সুবিচারে ঠাকুর মাড়োয়ারীর দেওয়া টাকা পরিত্যাগ করেছিলেন। জীবনে কখন মাকে একটিও কটু কথা বলেননি। একদিন ভাইঝি লক্ষ্মী ভেবে অজানিতে মাকে 'তুই' বলে ফেলেছিলেন, সেজন্য অনুতাপে সারারাত ঘুমোতে পারেননি। সকালে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ঠাকুর বলেছিলেন আমি ষোল আনা করে দেখালাম, তোরা এক আনা কর। সংসার জীবনযাপনের

ক্ষেত্রে একথা আজকের নারীসমাজকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। এখানে আজকের জীবন থেকে বিশেষতঃ দাম্পত্য বা সংসার জীবন থেকে তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত নানা ধরনের পালিশ লাগান মানুষের অন্তর্জীবনের কুশ্রী উদাহরণ না তুলেই ফিরে আসি গুরুর কথায়।

আজকের নারীদের মধ্যে যে বিত্তাশক্তির ক্রমশঃ প্রকাশ ঘটছে, তার প্রস্তাবনা বিকাশ ও গঠনে সমাজ পুরুষ রামকৃষ্ণের সব দানের দু-একটি নিদর্শন অতি সংক্ষেপে এখানে পরিবেশন করা হল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আলোচনা যত বেশি হয়, ততই যে দেশের ও দশের কল্যাণ—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

# সভ্য-মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

## ব্যক্তি ও জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণে একটি আদর্শ প্রয়োজন

প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির একটি আদর্শ আছে। সেই আদর্শকে অবলম্বন করেই কোন ব্যক্তি এবং জাতি তার লক্ষ্যে পৌছাতে চেষ্টা করে। এই লক্ষ্যের প্রতি প্রকৃষ্টরূপে অগ্রসর হওয়ার চর্চা এবং চর্যাই জাতির প্রগতির লক্ষণ। এই লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ফলশ্রুতিই ব্যক্তি বা জাতির সংস্কৃতি। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, "ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসকলকে ধ্রুবসত্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিতে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত নিজ সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছে এবং ঐরূপ সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিকেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের চরম সীমারূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। উহার সমগ্র চেষ্টা এক অপূর্ব আধ্যাত্মিকতায় চিরকালের জন্য রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, অবতরণিকা)

এই আধ্যাত্মিকতার বিস্মরণ এবং আধ্যাত্মিকতাবিরোধী ভাবনা ও চিন্তার আচরণই ভারতীয় দৃষ্টিতে অপসংস্কৃতি। আধুনিককালে সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির আলোচনার সময় যদি আমরা ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্পর্কে সচেতন থাকি তা হলেই বুঝতে পারব আমরা লক্ষ্যের পথে প্র-গতি হচ্ছি না লক্ষ্য থেকে পরাগত হচ্ছি। ভোগাতীত ত্যাগে প্রতিষ্ঠ হওয়াই ভারতীয় জীবনাদর্শ। কারণ,—একমাত্র ত্যাগ-প্রতিষ্ঠাতেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। আর শান্তিই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য।

## ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণই বর্তমান যুগের আদর্শ

সাম্প্রতিক দুই শতাব্দী যাবৎ জড়বিজ্ঞানের খুবই অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। এই বিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সুখ এবং আনন্দের উপাদান প্রচুর যোগান দিচ্ছে সত্যি। কিন্তু মানুষের চিরকাম্য শান্তি ও তৃপ্তি-বোধকে ব্যাহত করছে। জড়-বিজ্ঞান মানুষকে শান্তি দান করার পরিবর্তে অপরোক্ষভাবে স্বার্থপর করে তুলছে। স্বার্থপরায়ণ ভোগের মধ্যেই অশান্তির বীজ নিহিত। ভোগে শরীর মন স্বতঃই ক্লান্ত হয়ে উঠে। আর, স্বার্থপর ভোগ বঞ্চিত প্রতিবেশীর ঈর্ষা ও ক্রোধের উদ্রেক করে। বর্তমান জড়বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র ভোগপ্রাচুর্যে ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ অনুভব করছে এবং ভোগবঞ্চিত প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের ক্রোধ ও হিংসার



শ্রীরামকৃষ্ণ



কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাড়ি



কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোগসম্ভারের অসাম্য এবং দ্বেষজনিত অশান্তি বর্তমান বিশ্বের একটি সাধারণ ব্যাধি, এবং আধুনিক ধর্মগ্লানির অন্যতম লক্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সাধনায় যে আধ্যাত্মিকতা মূর্ত হয়েছে তার লৌকিক উপলব্ধির দুইটি দিক।—এক, তাঁর জীবনের অভূতপূর্ব ত্যাগ;—দুই, তাঁর জীবসেবাব্রতের নব-বিধান। ত্যাগের দ্বারাই যে জীবন-সমস্যার সমাধান করতে হবে,—এর বিকল্প যে কোন পন্থা নেই, তা আমাদের উপনিষদ্ এবং পরবর্তী সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন। এই ত্যাগ 'ষোল টাং' পূর্ণ হলে যে কি হতে পারে তার আধুনিকতম ঐতিহাসিক বস্তুবিজ্ঞান-নির্ভর ভোগপন্থী মানুষের কাছে—শ্রীরামকৃষ্ণের এই দৃষ্টান্তের বিশেষ প্রয়োজন। গার্হস্থ্য এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের আদর্শে সমন্বিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সন্ন্যাসীর এবং গৃহীর উভয়েরই যুগপৎ আদর্শ। ত্যাগীশ্বর এই 'নরচন্দ্রমা'র জীবনালোকেই আমাদের শান্তি ও শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হতে হবে।

নরনারায়ণ সেবার, জীব-রূপী শিবের সেবার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নির্দেশ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের এক অভিনব অবদান। এই যুগের পক্ষে—এই জাতীয় একটি ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বস্তু-বিজ্ঞানের মাত্রাতিরিক্ত অগ্রগতি-জনিত ভীতির প্রতিষেধক—এই সেবা-বিজ্ঞান। বর্তমান আন্তর্জাতিক যুদ্ধাতঙ্কের কারণ জাতিতে জাতিতে,—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভোগ-বৈষম্য। গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে অধিকার-সাম্য এবং ভোগসাম্যের কথাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত। সাম্যবাদ তাত্ত্বিক আদর্শের দিক থেকে যদিও স্বীকৃত—কিন্তু ব্যক্তি ও জাতির জীবনে এখনও তার আশানুরূপ প্রতিফলন ধরা পড়েনি। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শেই এই তত্ত্বের মীমাংসা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিহিত। নিরীশ্বরবাদী হয়েও যদি কোন ব্যক্তি বা জাতি সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন, তা হলেও তাঁর জীবনে শান্তি এবং মানব জীবনের চরম সার্থকতা উপলব্ধ হবেই।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু অধ্যাত্মবাদীরই আদর্শ নন, তিনি সাম্যবাদী রাজনীতিবিদ্‌দেরও আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন বর্তমান যুগের সামগ্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র দিক্‌দর্শক বললে অত্যুক্তি হয় না।

## শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের রূপকার শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

যে কোন ভাবাদর্শই কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত হয় এবং ইহা ব্যক্তি-পরম্পরাকে অবলম্বন করেই যুগযুগান্ত প্রচলিত থাকে। ভাবের উপলব্ধকারী ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হলেও চিরন্তন হতে পারেন না। তাই তিনি তাঁর ভাবকে তাঁর অনুগত শিষ্যে সঞ্চার করেন এবং তাই শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরায় চলতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণও জানতেন তাঁর উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সাধনাকে মানব-কল্যাণে 'ত্যাগ' এবং 'সেবাদর্শের' মাধ্যমে বিশ্বে প্রচার করতে হবে—আগত এবং অনাগত কালের জন্য। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন শিষ্যকে তাঁর জীবনের আদর্শে বিশেষভাবে গড়ে তুলেন। তাঁর অবর্তমানে যাতে তাঁর ভাবরাজি জীবন্ত থাকে সেই উদ্দেশ্যে তিনি নির্বাচিত কয়েকজন শিষ্যকে ত্যাগ-ব্রতে দীক্ষা দেন—এবং তাঁদের পরোক্ষভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করেন।

## কাশীপুরে রোগশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক সঙ্ঘের সূচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদ হিসাবে যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে—"ভক্তসঙ্ঘ গঠন করাই

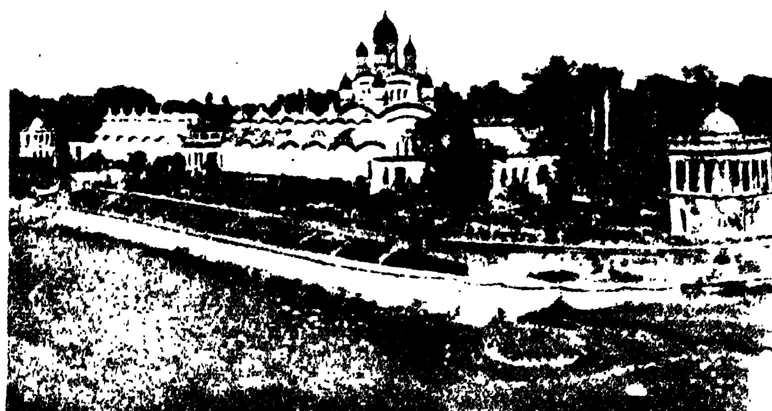
ঠাকুরের ব্যাধির কারণ।" "শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর-উদ্যানে উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক এত দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের অনেকে তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, দ্বাদশ অধ্যায়, ১ম পাদ ) এই রোগ শয্যায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী সারদা দেবীকে এবং নরেন্দ্রনাথকে ( পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ ) ভাবী সঙ্ঘ পরিচালনার বিশেষ দায়িত্ব এবং তদনুরূপ শিক্ষা দিয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রিরত্ন শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীর শক্তি সম্পর্কে বহু প্রশংসা উক্তি করতেন। তাঁরই শক্তিকে সারদা ও নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে পরবর্তিকালে রূপায়িত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ রোগশয্যায় শীর্ণঅবস্থাতেও তাঁদের বিশেষ শিক্ষা দিয়ে যান। সারদাদেবী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি "ও আমার শক্তি," "ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে"—( শ্রীমা সারদা দেবী—পৃঃ ১২১ )—উক্তিটি বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়েছে—শ্রীশ্রীমার সঙ্ঘ সৃষ্টি এবং সঙ্ঘ পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে। কাশীপুরের রোগশয্যায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে লোকশিক্ষা দেবার লিখিত সনদ দিয়ে যান—"নরেন শিক্ষে দেবে।" তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার এবং সঙ্ঘনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্র কাশীপুর উদ্যান বাটী। নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরেই ভাবী সন্ন্যাসজীবনের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—এবং গুরুভ্রাতাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে বিশ্বে প্রচার করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। "একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ অন্য দিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে, এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল।···ঐরূপে শেষপর্যন্ত এখানে থাকিয়া তাহারা সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিল।" ( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পরিশিষ্ট—কাশীপুরে সেবাব্রত ) কাজেই এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে, কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতেই, শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃকই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।

## কাশীপুর থেকে বরাহনগর, আলমবাজার, নীলাম্বরবাবুর বাড়ি—বেলুড়

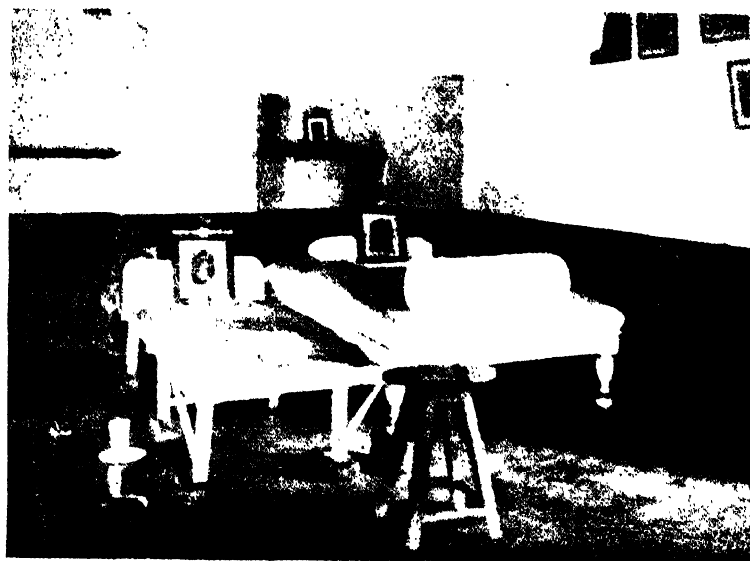
শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর ( ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, অগস্ট ) তাঁর ত্যাগী সন্তানদের জন্য একটা আবাস এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র দেহাবশেষ সংরক্ষণের জন্য একটি পবিত্র স্থানের প্রয়োজনীয়তা গৃহী এবং ত্যাগী উভয় ভক্তগণ সমভাবেই অনুভব করেন। এমনি সময়ে ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ অগ্রণী হয়ে বললেন,—"ভাই তোমরা আর কোথা যাবে; একটা বাসা করা যাক। তোমরাও থাকবে আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই, তা না হলে সংসারে এরকম করে রাতদিন কেমন করে থাকবো। সেইখানে তোমরা গিয়ে থাক। আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচা চলিবে।···( সুরেন্দ্র ) শেষে ১০০৲ টাকা পর্যন্ত দিতেন। বরাহনগরে যে বাড়ী লওয়া হইল তাহার ভাড়া ও ট্যাক্স ১১৲ টাকা। পাচক ব্রাহ্মণের মাহিয়ানা ৬৲ টাকা। আর বাকী ডাল-ভাতের খরচ।···ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনিসপত্র লইয়া সেই বাসা



শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী



দক্ষিণেশ্বর মন্দির



দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর

বাড়ীতে গেলেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, পরিশিষ্ট) 'মঠ' সন্ন্যাসীর তপস্যা ও সাধনার পুণ্যক্ষেত্র;—গৃহীর শান্তি ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা লাভের উৎস। বরানগরের মঠেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সন্ন্যাসীর প্রতীক গেরুয়া বস্ত্র ধারণ এবং শ্রীশঙ্করাচার্য প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়োচিত 'আনন্দ' নাম গ্রহণ। এই মঠেই ত্যাগী সন্তানদের কঠোর সাধনা,—এবং সঙ্ঘ-সংগঠনের ভাবী পরিকল্পনা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মঠ বরানগর থেকে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৩-১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী পাশ্চাত্যে ভারতীয় সনাতন ধর্ম—বেদান্তের প্রচার করে আলমবাজার মঠেই গুরুভ্রাতা এবং গৃহী ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হন। আলমবাজারে মঠ থাকা কালেই স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে সন্ন্যাসী ও গৃহী-ভক্তদের একত্র করে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। "এখানেই আত্মমোক্ষ এবং জগদ্ধিতের" আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণের কর্মসূচী স্বামীজী সকলের সম্মুখে সবিস্তার প্রকাশ করেন। 'মিশন' —শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবেরই প্রতীক—এবং দ্বিধাসংশয় পরিত্যাগ করে সকলকে এই ব্রতে অগ্রণী হতে স্বামীজী আহ্বান জানান।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন প্রবল ভূমিকম্পে আলমবাজার মঠ-বাড়ির বিশেষ ক্ষতি হওয়ার জন্য ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বেলুড় গ্রামে (বর্তমান বেলুড় মঠের দক্ষিণ দিকে) ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে মঠকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই মঠে শ্রীমা সারদাদেবী বিশ্বকল্যাণে পঞ্চতপাদি বহু তপস্যা এবং স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য প্রার্থনাদির অনুষ্ঠান করে শ্রীরামকৃষ্ণভাবকে সদা জাগ্রত রাখেন। এখানেও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতাস্থিই ছিল তাঁর জীবন্ত প্রতীক।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর নীলাম্বর বাবুর বাটীর বাগান থেকে স্বামীজী বর্তমান বেলুড় মঠের আদি মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি ও ভস্মাধারকে (আত্মারামের কৌটা) নিজ মস্তকে বহন করে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন,—"নরেন আমাকে যেখানে রাখবে,—আমি সেখানেই থাকব।" ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুআরি থেকে বর্তমান বেলুড় মঠই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্থায়ী প্রধান কেন্দ্র।

## শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ত্রিরত্ন

বৌদ্ধ সঙ্ঘে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘকে সর্বদাই স্মরণ করা হয়—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"—ইত্যাদি মন্ত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনুগামিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমাসারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দকে অভেদ-জ্ঞানে স্মরণ করেন জয়ধ্বনি ঘোষণা দ্বারা। "জয় শ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়, জয় মহা-মাইকি জয়—জয় স্বামীজী মহারাজজী কি জয়।" ঠাকুর এবং মা অভিন্ন—এই উক্তি বিভিন্ন স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদাদেবী উভয়েই করেছেন—এবং সংশয়াপন্ন অনুগামীদের বিশেষ-ভাবে উভয়ের ঐক্য ভাবনায় উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর শ্রীমা সারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে নিজ জীবনে প্রকট করে রেখেছেন এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী-ভক্তদের মধ্যে ঐ ভাবকে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করেছেন। স্বামীজীকে—তাঁর সর্ব আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী করে এবং ভাবী সঙ্ঘের অধিনায়কপদে বরণ করে শ্রীরাম-কৃষ্ণ নিজের সত্তাকে বিবেকানন্দেই লীন করে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমাও দিব্য দর্শনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনের মধ্যেই লীন হয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায়,—শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি

সারদাদেবী কর্তৃক এই সঙ্ঘ লালিত এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা এবং পরিকল্পনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বিবর্ধিত। তাই সঙ্গত কারণেই সঙ্ঘানুগামিগণ এই ত্রিত্বকে সমবুদ্ধিতে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও পূজা করে থাকেন। এই তিনে মিলেই এক। ভিন্ন কল্পনা, শ্রীরামকৃষ্ণভাবকে উপলব্ধির অজ্ঞতার পরিচায়ক!

## সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণেরই বিগ্রহ

শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন ব্যক্তি অপেক্ষা একটি মহান ভাবের মূর্তরূপ বলাই সমীচীন। শ্রীরামকৃষ্ণকে ইতিবাচক কোন ভাবের মধ্যে সীমিত না করেও বলা যায়,—তাঁর জীবন,—তাঁর ভাব, সর্বমানবের—সর্বকালের সর্বসমস্যার একমাত্র সমাধান। তাঁর "জীবনে অসীমের লীলা পথের" যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেই পথ দিয়ে 'দেশ বিদেশের'—যুগ যুগান্তরের যাত্রীরা শান্তির চির-আশ্রয়ের সন্ধান পাচ্ছে এবং পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবমূর্তিকে স্বামীজী সঙ্ঘের কর্মযজ্ঞের সাধনায় রূপ দিয়েছেন,—রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ কি?—জানতে হলে জানতে হবে স্বামীজী প্রবর্তিত মঠ ও মিশনের কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের মধ্যেও এমন দুই একজন ছিলেন, যাঁরা প্রথমে স্বামীজীর প্রবর্তিত সেবাকার্য বা মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠাকে শ্রীরামকৃষ্ণভাব বিরোধী বলেই মনে করতেন। প্রমদাদাস মিত্র মশায়ের মতো বিজ্ঞপণ্ডিত,—যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলে বন্দনা করেছেন এবং যে প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইগণ মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন,—তিনি ও 'মঠ' বা সেবা-কার্যাদির জন্য 'মিশন' প্রতিষ্ঠাকে সন্ন্যাসীর পক্ষে 'অ-ব্যাপার' বলেই মনে করতেন! কিন্তু, বেদান্তবাদী এবং রামকৃষ্ণঅনুগত হয়েও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই স্বামীজী ও তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণ প্রমদা দাস মিত্র মশায়ের ব্যক্তিত্বের ও বুদ্ধিমত্তার অগভীরতা উপলব্ধি করতে পারলেন। শ্রীমা সারদাদেবী কিন্তু স্বামীজীর প্রত্যেকটি কাজকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবানুগ বলে সমর্থন করতেন, এবং প্রত্যেক কাজেই তাঁর সন্তানদের আশীর্বাদ, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন। সঙ্ঘের কোন ব্যাপারে সংশয় এবং দ্বিধা থাকলে শ্রীমাই 'হাইকোর্ট' হয়ে চরম সিদ্ধান্ত দিতেন—এবং পরে সকলেই স্বামীজীর কার্যাবলীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবেরই প্রকাশ বলে গ্রহণ করতেন।

## শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নববেদান্ত,—জীব-শিববাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মসাধনায় যে অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তা শুধু সমাধির অব্যক্ত আনন্দরসানুভবেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাধি হতে ব্যুত্থিত অবস্থায়ও তিনি পদ দলিত দূর্বাঘাসের বেদনাকে উপলব্ধি করেছেন,—ছিন্নপত্র বিল্ববৃক্ষের যন্ত্রণাও তাঁকে পীড়া দিয়েছে—দূরগত নাবিকের পারস্পরিক প্রহারের ক্ষতচিহ্ন তাঁর নিজপৃষ্ঠকে ক্ষত করেছে। অবিশ্বাস্য এই 'সহ'-অনুভূতি,—এই 'সম'-বেদনা, সমস্ত বিশ্বের চেতন, অর্ধচেতন, অচেতন সত্তার সঙ্গে ছিল তাঁর একত্বানুভব! সর্বজীবে এই একত্বানুভবই অদ্বৈত-সাধনা। সেবার মাধ্যমে এই একত্বানুভবের সাধনাই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে কর্মযজ্ঞের ফলশ্রুতি। এই সেবাব্রতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের 'মোক্ষ' এবং জগতের হিত অন্বেষণ করার অনুপ্রেরণা। 'আত্মমোক্ষ' এবং 'জগদ্ধিতের'—সাধনার মধ্যেই বর্তমান সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত আছে।

## 'আত্মারাম'—শ্রীরামকৃষ্ণের পীঠ

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে বলেছিলেন স্বামীজী তাঁকে যেখানে রাখবেন—সেখানেই তিনি

প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কাশীপুরে দেহাবসানের পর শ্রীরামকৃষ্ণের চিতাভস্মের কিছুটা অংশ গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মশায় তাঁর কাঁকুড়গাছি বাগানে স্থাপন করে পূজার্চনা করতে থাকেন। আর অন্য অংশ শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ সঙ্গে সঙ্গে বহন করে, বিভিন্ন সময়ে বরানগরে, আলমবাজারে, বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে এবং পরে বর্তমান বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পূতাস্থি ভক্তহৃদয়ের এক বিশেষ প্রেরণা নিঃসন্দেহ। শ্রীবুদ্ধের দেহধাতুর সামান্যতম অংশ এবং তাঁর চিতাভস্মকে প্রতিষ্ঠা করে দেশে বিদেশে বহু চৈত্য, গুম্ফা-বিহারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই বেলুড় মঠ শ্রীরামকৃষ্ণের পূতাস্থির অবস্থানে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ-তীর্থ। এই পূতাস্থি—এমন এক দিব্য-পুরুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যিনি বর্তমান যুগের সর্বদেশের সর্বমানবের সকল শান্তির আশ্রয়। যাঁর মহান ভাব সর্বমানুষের সাম্য-স্বাধীনতা এবং শাশ্বত শান্তির এক বিরাট আশ্বাস।

**'বহুজন হিতায়-বহুজন সুখায়'—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভস্মাস্থি প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী সমবেত ভক্তগণকে সম্বোধন করে বললেন—"আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে একে সবধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করে রাখেন।" ( বাণী ও রচনা ৯।১১২ )

বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ভারতে ৮৯টি এবং ভারতেতর দেশে ৩০টি মোট ১১৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে বহুমুখী সেবাকার্য পরিচালনা করছেন। বর্তমান বিশ্বের বহু গণতান্ত্রিক দেশ বহুজনের হিতে কার্যরত। কিন্তু বেদান্তের আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে সেই আদর্শ রূপায়ণ সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাদর্শের বিশেষ প্রয়োজন বর্তমান রাজনীতির সাফল্য প্রতিষ্ঠায়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত সঙ্ঘকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রতিভূ মনে করেন—"একীভূত সঙ্ঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ, সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন তিনি প্রভুকে পূজা করেন; এবং সংঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন। আমরা সংঘমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রণাম জানাই—কারণ আমরা এখানেই তাঁর ভাব-মূর্তিকে পাই।

# রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—আদর্শ ও ইতিহাস

**স্বামী পরাশরানন্দ**

ধর্ম ভারতের প্রাণ—ধর্মকে কেন্দ্র করেই এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যশালী দেশের জীবন স্মরণাতীত কাল থেকে আবর্তিত হচ্ছে। মহান এই দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রাচীনত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকেরা কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে না আসতে পারলেও পাঁচ থেকে ছ হাজার বছর আগেও যে এখানে একটি সুসভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি বাস করত, সে-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। পৃথিবীর অন্যান্য সব জাতি যখনও অসভ্য বা অর্ধসভ্য অবস্থায় রয়েছে, শুধুমাত্র মিশর, চীন ও মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতার আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে, ইতিহাসের সেই আদিকালে ভারতের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঋগ্বেদের মহান্ মন্ত্র, ভারতের শাশ্বত বাণী,—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'[১] এক থেকে দেড় হাজার বছর বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের বিবিধ প্রক্রিয়ার পর ভারতের উত্তরণ ঘটল উপনিষদের যুগে।

প্রাচীনকাল থেকে অতি আধুনিক ভারতীয়

১ ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬

জীবনেও উপনিষদের প্রভাব এত বেশি যে এখানকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার সঙ্গে তা একীভূত হয়ে গেছে। সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যকের পর বেদের অন্তভাগে এসে উপনিষদের বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল,—স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-ঐশ্বর্য-যাগযজ্ঞ স্বর্গ নয়, এমনকি ব্রহ্মলোকও নয়,—চাই সেই জ্ঞান যার দ্বারা অন্তহীন কালের অজ্ঞান চলে যাবে, চাই সেই বিদ্যা যার দ্বারা জগদতীত অবিনাশী সত্যবস্তুর সঙ্গে অভেদানুভূতিতে মানুষ প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল দ্বিধা ও সংকোচ থেকে মুক্ত উপনিষদ্ নির্ভীক ভাষায় ঘোষণা করলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?'[২]—যার দ্বারা সেই আত্মবস্তুরূপ অমৃতত্ব পাওয়া যাবে না, তাতে আমার কি প্রয়োজন? 'কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মা অয়ং লোকঃ?'[৩]—আমরা প্রজা বা সন্তান নিয়ে কি করব,—এর দ্বারা তো সেই আত্মাকে জানা যাবে না? 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'[৪]—কর্ম, ধন বা সন্তানের দ্বারা নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্ব লাভ সম্ভব। উপনিষদের ঋষি আপসহীন ভাষায় বললেন, সমস্ত এষণা (বাসনা) ত্যাগ না করলে, সন্ন্যাসগ্রহণ না করলে ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি সম্ভব নয়। তাই ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস এই স্বাভাবিক চতুরাশ্রম জীবনের উপরও ঘোষিত হল—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'[৫]—যখনই এই জগত-সংসারে তাঁর বৈরাগ্য হবে, এর নশ্বরতা চঞ্চলতা অস্থির-স্বভাব তিনি বুঝতে পারবেন, তখনই তিনি সন্ন্যাস নেবেন। ধর্মের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি আর তার মূলমন্ত্র হচ্ছে ত্যাগ। এই ত্যাগরূপ ভিত্তির উপরেই এই সুমহান জাতির সৌধ প্রতিষ্ঠিত থাকায় হাজার হাজার বছরের শত শত বিদেশী আক্রমণের ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে আজও ভারত পৃথিবীতে গৌরব-আসনে প্রতিষ্ঠিত।

পাকা বনিয়াদ ও সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর গড়া ইমারতেরও কালে মেরামত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে—হয়তো কোনও অংশটি ভেঙে গেল—সেটি পাল্‌টে দিতে হয় ইত্যাদি। বেদান্তরূপ বনিয়াদ ও ত্যাগরূপ স্তম্ভের উপর গড়া এই ভারতীয় জীবনধারাতেও মাঝে মাঝে মেরামতির দরকার হয়। পৃথিবীরূপ সংগীত-আসরে ভারতের বরাবরেরই কাজ হচ্ছে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সুর বাজিয়ে যাওয়া। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে তা অনুভব করার ও জগতে প্রচারের ভার বিধাতাপুরুষ যেন এই জাতির উপর ন্যস্ত করেছেন। সেখানে আধ্যাত্মিকতার সুর যাতে বিশুদ্ধ থাকে সে চিন্তাও যেন তাঁর। তাই তাঁকে নিজে মাঝে মাঝে মানুষের রূপে এসে পথের ভুলভ্রান্তিগুলি সংশোধন করে যথাযথ পথের নির্দেশ দিয়ে যেতে হয়। মনবুদ্ধির রাজ্যের পারে অবস্থিত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা ঈশ্বর যে মানববিগ্রহে এই অবতরণ ক্রিয়াটি করেন, তাঁকে অবতার বলা হয়। প্রয়োজনানুযায়ী অবতারের শক্তি-প্রকাশে তারতম্যও দেখা যায়।

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, সংশয়বাদ ও ভোগসর্বস্বতা গত দু-তিনশো বছর ধরে গোটা পৃথিবীর চিন্তাধারায় একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। চিন্তাজগতে এই বিপ্লবের সাথে সাথে তথাকথিত ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মানুষের মূল্যবোধ ইত্যাদি সবগুলিই তাদের রূপ আংশিকভাবে বা পুরোপুরি পাল্‌টে ফেলতে লাগল। মনে হল এই বিরাট তরঙ্গাঘাতে এই জাতির জীবনেও

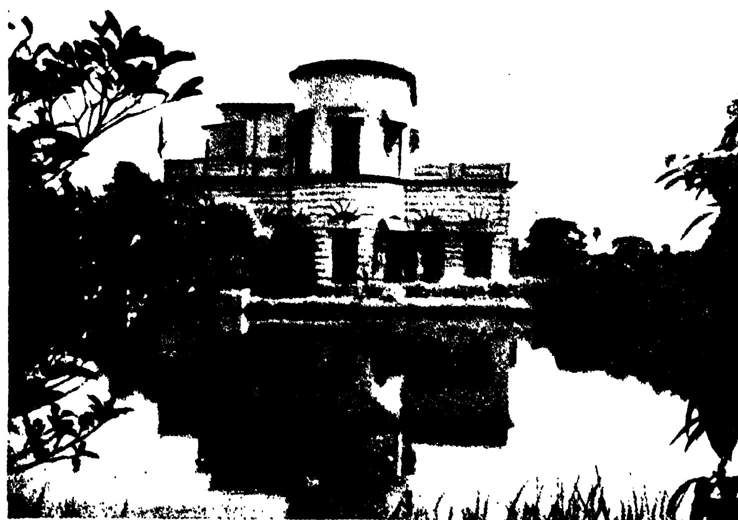
২ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৪।৩ ৩। ঐ, ৪।৪।২২
৪। কৈবল্য উপনিষদ্, ৩ ৫। জাবালোপনিষদ্, ৪



স্বামী বিবেকানন্দ



শ্যামপুকুরবাটী



কাশীপুর উদ্যানবাটী

বুঝিবা এক বিরাট পরিবর্তন আসছে। দেশের জনমানস সাময়িকভাবে বিভ্রান্তও হয়ে পড়ল। দেশের সবকিছুর প্রতি একটা ঘৃণা-অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্যের ভাব আর বিদেশীদের যা কিছু সবই ভাল—এই মানসিকতা দেশের সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। চিন্তাশীল মনীষীরা দেশাচার-লোকাচার ও যুক্তিহীন কুসংস্কারগুলি বাদ দিয়ে দেশের ধর্ম, সনাতন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্নভাবে সমাজ-সংস্কার শুরু করলেন। পূর্ব ভারতে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন, পশ্চিমে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য সমাজ আর দক্ষিণে কর্ণেল অল্‌কট্ ও মাদাম ব্ল্যাভেট্‌স্কির থিয়োসফি আন্দোলন শুরু হল। এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে নব্য শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ ঐ আন্দোলনে মেতে উঠল; খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের প্রবণতায় একটু ভাঁটা আর দেশীয় মূল্যবোধের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব—ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, জাতি-ভেদ দূরীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব আন্দোলনের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু এসব আন্দোলনের নেতারা একটি বিরাট ভুল করলেন। দেশের ও জনসাধারণের যত অবনতি তার মূল কারণ হিসাবে নির্দেশ করলেন ধর্মকে। ধর্মের উপর অহেতুক দোষারোপ, জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণের অযথা নিন্দা আর বিদেশীর্ঘেঁষা মনোভাবের জন্য এসব আন্দোলন বিশাল জনসাধারণের প্রাণে বিশেষ কোনও সাড়া জাগাতে পারল না। দেশের এই ঘোর দুর্দিনে, সমগ্র হিন্দুজাতির এই তমসাচ্ছন্ন যুগে বাংলার এক অখ্যাত গ্রাম কামারপুকুরে শ্রীভগবান স্বয়ং সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আবার মানববিগ্রহ ধারণ করে আবির্ভূত হলেন।

গ্রাম বাংলার মুক্ত পরিবেশে, প্রকৃতির উদার কোলে বেড়ে উঠতে লাগল একটি সুন্দর ফুটফুটে দেবশিশু,—শিশু পরিণত হল বালকে। বালক অবস্থাতেই উপনয়ন অনুষ্ঠানে ধনী কামারনীকে ভিক্ষামাতা করার দৃঢ়তায় বর্ণকৌলিন্যের বেড়া ভেঙে নবযুগধর্ম-চক্রের গতি শুরু করলেন। তার-পর একটির পর একটি দৃপ্ত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ; চাল-কলা বাঁধা অপরাবিদ্যার পরিবর্তে চাইলেন পরাবিদ্যা, পাষাণী প্রতিমাকে পূজা করতে করতে আন্তরিক ব্যাকুলতায় সাক্ষাৎ করলেন মার চিন্ময়ী রূপ, তন্ত্র-বৈষ্ণব ইত্যাদি হিন্দুধর্মের যতগুলি প্রধান সাধনপথ ও অদ্বৈতমত সব পথেই সাধনা ও সিদ্ধিলাভ; এরপর ইসলাম ও খ্রীষ্টমতানুযায়ী সাধনা। অপূর্ব সাধন-ইতিহাস রচিত হল দক্ষিণেশ্বরে। সব পথানুযায়ী সাধন করে সেই দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করলেন যে সব পথই এক লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছে—পথের ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আর তাই নিয়েই ঝগড়া-বিবাদ। এই অনুভবের ফলে তিনি অত্যন্ত উদার মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন; বিশ্বজনীন এই মন হওয়ার জন্য তিনি সমগ্র জগতের কোনও ধর্মপথ বা মতকে আর নিন্দা করতে পারতেন না। তাঁর এও অনুভব হল যে, তাঁর দেহমনরূপ যন্ত্রকে অবলম্বন করে শ্রীভগবান এযুগে আবার ধর্মস্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

এই সময়ে কলকাতার অভিজাতবংশীয়, সুদর্শন, প্রতিভাদীপ্ত, কলেজের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ তাঁর নিকটে এলেন। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে সন্দেহের দোলায় দুলছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ সহজেই চিনে নিলেন তাঁর বার্তাবহকে, তাঁর ধর্মস্থাপন কার্যের প্রধান সহায়ককে। শুরু হল নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তার বিষময় ফল সন্দেহ ও

নাস্তিকতা থেকে হিন্দু ঋষিদের উত্তরণের শিক্ষা। গঙ্গাতীর-পঞ্চবটী-দেবালয় ঘেরা 'দক্ষিণেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে' এই শিক্ষার অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই সংঘর্ষ ও মিলনের ফলে জন্ম নিতে লাগল এক নতুন সত্তা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের এই মিলনের ফলে জন্ম নিল বিবেকানন্দ—যা ভারতের হাজার হাজার বছরের ঘনীভূত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের এক অপূর্ব সমন্বয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যুগান্তকারী এই মিলনের সাথে সাথে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বীজ মাটিতে প্রোথিত হয়ে গেল। তারপর দক্ষিণেশ্বরে একে একে অন্যান্য যুবকভক্তদের আগমন। ঠাকুরের গলরোগকে উপলক্ষ্য করে প্রথমে শ্যামপুকুরে ও পরে কাশীপুরে অন্তরঙ্গ ভক্তদের সেবার মধ্য দিয়ে ভাবী সঙ্ঘের সূচনা। আর লীলাবসানের দু-দিন আগে কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথকে ডেকে যখন বললেন, "দেখ্ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।"[৬] সেদিন এই সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের মূল কাঠামো গড়া হয়ে গেছে। নরেন্দ্রনাথকে তিনি নেতা করে গেলেন আর বলে গেলেন নেতা হওয়ার মূলমন্ত্র হচ্ছে সকলকে ভালবেসে আপন করে নেওয়া। যুবকভক্তদের ঘরে ফিরে যেতে নিষেধ করলেন আর খুব সাধনভজন করতে বললেন। অতএব, তাঁর নামাঙ্কিত সঙ্ঘের স্রষ্টা যে তিনি নিজেই এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য-লীলায় প্রবেশ করলে বরানগরের ভাড়াবাড়িতে ঐ বছরেরই ১৯ অক্টোবর প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ শুরু হল, আঁটপুর থেকে ফিরে এসে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা বিরজা হোম করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তারপর শুরু হল এক অত্যাশ্চর্য তপস্যা ও কৃচ্ছ্রতার ইতিহাস। ১৮৯১-এ[৭] মঠ আলমবাজারে স্থানান্তর করা হল। দেশের সর্ব-স্তরের মানুষ ও তাদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ তখন আসমুদ্র-হিমাচল পদব্রজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরিব্রাজক অবস্থাতেই আমেরিকার শিকাগো নগরীতে বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলন হচ্ছে জেনে আমেরিকায় গেলেন। তাঁর ঐশীশক্তির বিকাশে ও অসাধারণ বাগ্মীতায় গোটা পাশ্চাত্যদেশের বুধমণ্ডলী চমকিত হয়ে উঠল। এরকম কথা তারা আগে কখন শোনেনি; পাপ নয়, পাপি নয়; মানুষ হচ্ছে অমৃতের সন্তান, তবে পাপি বলাটাই হচ্ছে পাপ। বিভিন্ন ধর্ম সেই এক ভগবানকে পাবার বিভিন্ন পথ মাত্র,—সব ধর্মেই সত্য আছে, উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি আছে। অতএব বিবাদ-বিসংবাদ-বিনাশ নয়, প্রেম-মৈত্রী-ভালবাসা। বেদান্তধর্মের শাশ্বত সনাতন সত্য গোটা পাশ্চাত্য-মনীষায় এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল আর তাঁর প্রবক্তা হয়ে উঠলেন 'নতুন যুগের প্রেরিত পুরুষ।' তিন বছরেরও বেশি আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে বেদান্তপ্রচার করে বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুআরি ভারতে ফিরে এলেন। সমগ্র দেশবাসী অভূতপূর্ব অভিনন্দন ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে সনাতন ধর্মের পুনঃ-

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম ভাগ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৮

৭ History of the Ramakrishna Math and Mission, Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama. 1st Edition, p. 68 (অতীতের স্মৃতির মতে—৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৪১—১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে)

প্রতিষ্ঠাপক বরেণ্য সন্ন্যাসীসন্তানকে সাদরে বরণ করে নিল।

মঠ তখনও আলমবাজারে; সেখানেই গুরু-ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদেরই একজন হয়ে স্বামীজী থাকতে শুরু করলেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই যুগাচার্যকে নতুন ভূমিকায় দেখা গেল। ১ মে বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের একত্র করে তাঁদের সকলের সাহায্যে 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে একটি প্রচার-সমিতি তিনি গঠন করলেন যার উদ্দেশ্য হল "মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতি-কল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা।"[৮] এই সমিতির কার্য-প্রণালী হবে "মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত-করণ, শিল্প ও শ্রমজীবিকার উৎসাহ বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।"[৯] অনেকদিন ধরে যে পরিকল্পনা তাঁর হৃদয়-মন অধিকার করেছিল তাকে বাস্তবে রূপদান করতে পেরে স্বামীজী খুবই স্বস্তিবোধ করলেন। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরাও তাঁর ইচ্ছাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশ মনে করে উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আলমবাজার মঠবাড়ির ভূমিকম্পে খুব ক্ষতি হওয়ায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে মঠ নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে (বর্তমান বেলুড়মঠের দক্ষিণ দিকে) উঠে আসে। সেখান থেকে ঐ বছরেরই ৯ ডিসেম্বর স্বামীজী স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি ও ভস্মাদিসহ পাত্র (আত্মা-রামের কৌটা) মাথায় করে নিয়ে গঙ্গাতীরে কেনা জমি বর্তমান বেলুড় মঠে নিয়ে আসেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুআরি থেকে এই বেলুড় মঠই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্থায়ী প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে স্বামীজী বেলুড় মঠের তাঁর দোতলায় ঘরটিতে সমাধিযোগে শরীর ত্যাগ করলেন। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্বাচিত নেতার এই আকস্মিক তিরোধানে অত্যন্ত ব্যথিত হলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে সঙ্ঘশক্তি ধীরে ধীরে ভারতে এবং বহির্ভারতেও প্রসারলাভ করতে লাগল। সঙ্ঘের কার্যকলাপকে সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘের প্রচার-বিভাগকে রামকৃষ্ণ মিশন নামে রেজিস্ট্রি করা হল। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘেরই দুটি দিক; এদের মধ্যে আইন-গত পার্থক্য থাকলেও আদর্শ হিসাবে মূলতঃ ঐক্যই রয়েছে। মিশনের গভর্ণিং বডি বেলুড় মঠের ট্রাস্টিগণ দ্বারাই সংগঠিত; উহার কর্মী প্রধানতঃ রামকৃষ্ণ মঠেরই সন্ন্যাসি ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং বেলুড় মঠই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্মিলিত প্রধান কেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য-লীলায় প্রবেশের মাত্র একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর নামাঙ্কিত সঙ্ঘ সমগ্র জগতের সবরকম মানুষের মধ্যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার ও বিভিন্ন সেবাধর্মের অনুষ্ঠান করে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন মনে ওঠে। অবতার প্রবর্তিত এই মহান সঙ্ঘের আদর্শ কি, অর্থাৎ, অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই সঙ্ঘের কি

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সংস্করণ, ৩।৫৬
৯ ঐ

কিছু পার্থক্য আছে? এর উত্তর হচ্ছে, পার্থক্য নেই আবার আছে। সন্ন্যাসজীবনের যা লক্ষ্য, সমস্ত এষণা ত্যাগ করে আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তা করে ধারণা-ধ্যান-সমাধির দ্বারা জীব-ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া,—সেদিক থেকে এই সঙ্ঘ পূর্ব পূর্ব সব মঠ ও সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সঙ্গে একই। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে ভারতের সন্ন্যাসজীবনের সনাতন যে ধারা,—নগর-গ্রাম-জনপদ ত্যাগ করে নির্জন অরণ্যে কুটির বেঁধে বা গিরিগুহায় স্বরূপের চিন্তা করে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা, এদিকে এই সঙ্ঘ আলাদা। পৃথিবীর মানুষের সমস্যার প্রতি উদাসীন না থেকে সমাজের সমস্যা-সমাধানের প্রচেষ্টাকেই সাধনের অঙ্গ হিসাবে এই সঙ্ঘ বেছে নিয়েছে।

আমাদের সব শাস্ত্রই বলছেন যে প্রতি মানুষের অন্তরে সেই প্রেমস্বরূপ ভগবান রয়েছেন; অতএব দরিদ্র-অশিক্ষিত-আর্ত ব্যক্তিদের যদি ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা করা যায়, তা হয়ে যায় কর্মযোগ। যে ইষ্টদেবতাকে হৃদপদ্মে বসিয়ে সাধক ধ্যান করেন, সেই দেবতাকে যদি মানুষের হৃদয়ে দেখার চেষ্টা করা যায় আর সেইভাবে তাকে সেবা করা যায়,—সেটি পূজায় পরিণত হয়। প্রতিমা পূজার সময় প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে হয়,—কিন্তু এই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েই আছে, শুধু চিন্তা-ধারাটি ঠিক রাখলেই হল। এই ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবাভাবে কাজ করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হবে, রজো ও তমোভাব পুরোপুরি চলে গিয়ে চিত্ত সত্ত্বভাবে পূর্ণ হবে আর সেই শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্ম-চৈতন্যের যথার্থ প্রতিফলন পড়বে। সাধক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কৃতকৃত্য হবেন। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ—এই চারিটি ভাব সহজাতভাবেই প্রতি মানুষের মধ্যে থাকে। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ে সাধারণতঃ এই ভাবের একটিকে পথ হিসাবে বেছে নিয়ে সাধককে শুধুমাত্র সেই পথের সাধন করতে বলা হয়। কিন্তু এই সঙ্ঘের আদর্শ হচ্ছে, উপরের চারটি যোগের সমন্বয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র গঠন করা,—অর্থাৎ জপধ্যানের দ্বারা যোগ, ঈশ্বরের পূজা-গান-স্তবস্তুতি-লীলাকীর্তনের দ্বারা ভক্তি, শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে যত্নপূর্বক পড়ে বিচারের দ্বারা জ্ঞান আর সমাজের সকল শ্রেণীর (মুখ্যতঃ পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত) মানুষের সেবার দ্বারা কর্ম,—এই চারিটি যোগ সাধক এক-সাথেই করে যাবেন। এর ফলে নিজের জ্ঞানলাভ ও মুক্তির সাথে সাথে সমাজের মানুষের সেবাও সাধিত হবে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করে জনসাধারণ ধর্মপথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা ও সহায়তা লাভ করবে। খাদ্য-বস্ত্র-ঔষধ-সুচিকিৎসা লাভ করে তারা সমাজের সুস্থ নাগরিক হয়ে বাঁচতে পারবে আর ধর্মভিত্তিক সুশিক্ষা লাভ করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশকে যথার্থ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ না করলে বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবা যায় না,—তাই বৈদিকযুগ থেকেই ত্যাগের ভাব ভারতে প্রচারিত হয়েছে। এই সঙ্ঘও ত্যাগরূপ বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ দিয়ে সাধকের যাত্রা এখানে শুরু হয়, আর শেষ হয় দৃশ্য যা কিছু, সবকিছুর ত্যাগে;—নামরূপাত্মক জগৎ প্রপঞ্চ, অহং-মম বুদ্ধিরও আত্যন্তিক ত্যাগে। সেই অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সব ভেদ তিরোহিত হওয়ায় সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করে ধন্য হন।

# রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাতীর্থ

## প্রথম পর্ব

### স্বামী প্রভানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ যে প্রণালীর মধ্য দিয়ে সারা ভারতে পরিচিত হয়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে সেবাযোগ—শিবজ্ঞানে জীবসেবার ব্রত। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় নরনারায়ণ সেবাই সর্বজনীন মহাব্রত যা "আবালবৃদ্ধবনিতা, আচণ্ডাল, আপশু, সকলেই" বুঝতে পারে। মুর্শিদাবাদে মহুলা-অঞ্চলে স্বামী অখণ্ডানন্দ সর্বপ্রথম সেবাযোগ অনুষ্ঠান করেছিলেন একনাগাড়ে প্রায় তিন মাস। তার প্রভাব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছেন: "ঐ যে কাজ, অতি অল্প হলেও ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বলবে, লোকে তাই শুনবে। এখন 'রামকৃষ্ণ ভগবান' লোককে আর বুঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কর্ম—কথায় কি চিঁড়ে ভেজে?" স্বামী অখণ্ডানন্দের কৃতিত্ব, তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের একটি দিক সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন এবং বারংবার স্বামীজীর কাছ থেকে স্বীকৃতি[১] পেয়েছিলেন। রূপকার স্বামী অখণ্ডানন্দ সেবাযোগ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহুলা গ্রামকে তীর্থিকৃত করেছেন। মহুলা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাতীর্থ।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে স্বামী অখণ্ডানন্দ ঐ অল্প সময়ের মধ্যে এমন কী কাজ করেছিলেন যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাকে ঐ অঞ্চলে এত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। বিচিত্র সুন্দর মর্মস্পর্শী সে কাহিনী।

শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি নবদ্বীপ দর্শন করে পরিব্রাজক অখণ্ডানন্দজী চলেছিলেন ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ দেখবার জন্য। প্রেমিক সন্ন্যাসীর যেমন হৃদয়বত্তা তেমনি সেবাপরায়ণতা। বছর তিনেক আগে তিনি রাজপুতানায় ভ্রমণকালে সেখানকার দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে উঠেছিলেন। পথনির্দেশের জন্য লিখেছিলেন স্বামীজীকে। উত্তরে এসেছিল আদর্শে উদ্বোধিত করবার জন্য কয়েকটি বিস্ফোরণ। তার ফলে সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অখণ্ডানন্দজী সেবাযজ্ঞে নিজেকে সমর্পণ করলেন। পরবর্তিকালে এ-ঘটনার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছিলেন: "চিঠি পড়ে বুঝলাম—ওখানে তুফান উঠেছে। তাঁর বিরাট হৃদয়ে সেবাধর্মের যে বান ডেকেছিল, তাই এসে এখানে (বুকে হাত দিয়ে) ধাক্কা দিল। আমার জীবন ও কর্মের ধারা সেদিনই ঠিক হয়ে গেল।"[২] 'দরিদ্রদেবো ভব' 'মূর্খদেবো ভব' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ স্বামী অখণ্ডানন্দ দরিদ্র-মূর্খ-অজ্ঞানী-কাতর এদের সেবাকেই পরমধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তাঁর পথের দুধারে দেখতে পেলেন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। পথে ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র দেখে তিনি এসে পৌঁছলেন দাউদপুরে। রাত্রিযাপন করলেন একটি দোকানে। সকালে বাজারের দিকে যেতে পথে দেখতে পেলেন একটি শীর্ণকায় মুসলমান মেয়ে হাপুস-নয়নে কাঁদছে—তার পাশে পড়ে রয়েছে একটি মাটির কলসি,

১ স্বামীজীর স্বীকৃতির অন্যতম প্রমাণ নিবেদিতার ১০।৮।৯৯ তারিখে লেখা পত্রাংশ। তিনি অখণ্ডানন্দকে লিখেছেন: 'All through the voyage, I have been intending to write to you—and tell you how often and how warmly Swamiji has spoken of you for the way in which you have struggled to do and *carry out the ideas, that we have all received.*'

২ স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়, পৃঃ ৫৬

খানিকটা মাটি জলে ভিজে গেছে। পরিব্রাজক খোঁজ করে জানলেন দেশে আকাল, মানুষ খেতে পায় না। ঘরে জল আনবার একটি কলসিই ছিল। তার মা মারবে, সেই ভয়ে কাঁদছে। প্রেমিক সন্ন্যাসী বাজার থেকে একটি কলসি ও দু-পয়সার কিছু চিঁড়ে-মুড়কি কিনে দেন, মেয়েটি খুশিমনে বাড়ি চলে যায়। মেয়েটি যেতে না যেতেই বারো-চোদ্দজন বুভুক্ষু ছেলে-মেয়ে এসে সন্ন্যাসীকে ঘিরে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর বাকী পয়সায় চিঁড়ে-মুড়কি কিনে তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। তারা যেতে না যেতেই আর এক দল এসে উপস্থিত। তখন তিনি কপর্দকশূন্য, খয়রাতি করবার মতো কিছুই নাই। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে নিকটেই জনৈক সরকারী কর্মচারী দুর্ভিক্ষপীড়িত অক্ষমদের এলোমেলোভাবে কিছু চাল বিতরণ করছেন। দাউদপুরে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী একজন মরণাপন্না নব্বই বছরের বুড়িকে কয়েকদিন সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুললেন। সন্ন্যাসীর হাতে ঝোল-ভাত খেতে খেতে বৃদ্ধা চোখের জল ফেলে বলে, "বাবা, তুমি আমার জন্মজন্মান্তরের ছেলে।" সন্ন্যাসী তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, "আমি তোমার এ জন্মেরও ছেলে।"

সন্ন্যাসী এগিয়ে চলেন। নপুকুর গ্রামে একরাত্রি বাস করে বেলডাঙ্গা ছাড়িয়ে ভাব্‌তা পৌঁছান। সেখানে দেখেন কার্যক্ষম দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কিছু লোক রাস্তায় মাটি কাটছে। গরীব মানুষ তাদের ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না। সন্ন্যাসী ওভারসিয়রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। এই সকল ঘটনার মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে সন্ন্যাসী-ঠাকুরের গরীব-গুর্বোর জন্য দরদ, উদ্বেগ ও সহানুভূতি। এদিকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মন বিদ্রোহ করে ওঠে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। তাঁর হৃদয়-যাতনা ফুটে উঠেছে তার লেখাতে: "যাত্রাপথে নপুকুর, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় অতিশয় বিচলিত হইল এবং উঠিতে বসিতে, পথে চলিতে চলিতে ভগবানকে দয়াময় বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতে লাগিলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি পাপে যে অনাহারে দয়াময় ভগবানের রাজ্যে মারা যায়, তাহা আমার বোধ-গম্য হইল না। এখন দয়াময়ের রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা হইল।"[৩]

কিন্তু তাঁর আর পালান হল না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাব্‌তার বাজারে একটি দোকানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বহরমপুর যেতে উদ্যত হয়েছেন, সে-সময়ে তিনি শুনলেন—স্পষ্ট শুনলেন কে যেন বলছে: "কোথায় যাবি? তোর এখানে ঢের কাজ আছে।" একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার এই অশরীরী বাণী শুনতে পেলেন। শুধু তাই নয়। যতবার তিনি উঠতে যান, কে যেন তাঁর কোমর ধরে টেনে বসিয়ে দেয়। সন্ন্যাসী-ঠাকুর বহরমপুর যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেন। নিমন্ত্রিত হয়ে মহুলা গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ৺অন্নপূর্ণা পূজায় যোগদান করলেন। তাঁর মনে হল দুঃস্থ নিরন্ন মানুষের অন্নকষ্ট দূর করবার জন্যই যেন ৺মা-অন্নপূর্ণা তাঁকে আহ্বান করেছেন। মাতৃভক্ত সন্ন্যাসী অভিমানভরে মাকে বলেন: "এবার তোমার সঙ্গেই আমার বোঝাপড়া হবে।"

৺মায়ের ছেলের বোঝাপড়া বিচিত্রভাবেই শুরু হল। অখণ্ডানন্দজী ৺মায়ের সম্মুখে চণ্ডীপাঠ করলেন। মণ্ডপে সারারাত্রি ৺মা-অন্নপূর্ণার কাছে বসে রইলেন। রাত্রি প্রায় চারটার সময় এসে একদল চাষী পাইজর পায়ে নাচতে নাচতে ৺মাকে 'বোলান গান' শোনাল। "অন্ন ব্যগোরে প্রাণ গেল, জল ব্যাগোরে প্রাণ গেল" ইত্যাদি

৩ স্বামী অখণ্ডানন্দ: স্মৃতিকথা, ১৩৪৪, পৃ: ২২৭

গানটি-সহ দুর্ভিক্ষের বিবরণ তিনি লিখে পাঠালেন আলমবাজার মঠে ও মাদ্রাজ মঠে। কয়েকদিন পরে, ১৩০৩ সনের চৈত্রসংক্রান্তির দিন, তিনি সান্যালদের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ভট্টাচার্যদের চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটি ঘরে আশ্রয় নেন, সাগ্রহে অপেক্ষা করেন আলমবাজার মঠের নির্দেশের, আর অবসর সময়ে 'যোগবাশিষ্ঠ' গ্রন্থ পড়তে থাকেন। গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলের কাছেই তাঁর পরিচয় 'দণ্ডীঠাকুর'। অবশ্য পরবর্তিকালে তিনি 'বাবা' নামেই সমধিক পরিচিত হয়েছিলেন।

অখণ্ডানন্দজী প্রতিদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সামনে "দুর্ভিক্ষ-পীড়িত-জনসাধারণের জন্য হাপুস নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করতেন। কয়েকদিন পরে তিনি তাঁর প্রার্থনায় সাড়া পান। একদিন তিনি অনুভব করেন শ্রীশ্রীঠাকুর যেন তাঁকে বলছেন, 'ছাখ না কি হয়'।" ইতিমধ্যে মাদ্রাজ থেকে রামকৃষ্ণানন্দজী ও আলমবাজার মঠ থেকে প্রেমানন্দজী তাঁকে মঠে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখলেন। স্বামীজীর নির্দেশে ব্রহ্মানন্দজীও তাঁকে একটি বিশেষ কাজের জন্য কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য লিখেন। এদিকে অখণ্ডানন্দজীর 'ধনুর্ভঙ্গ পণ' তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে যাবেন না, তাদের সমস্যার সমাধান করবেনই। 'মহাবোধি সোসাইটি'র সম্পাদক চারুচন্দ্র বসুর আলমবাজার মঠে যাতায়াত ছিল, তিনি সোসাইটির তরফ থেকে অর্থসাহায্যের প্রস্তাব দেন। এ খবর প্রেমানন্দজী লিখে জানালে অখণ্ডানন্দজীর নিরাশার মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। এমন সময়ে স্বামীজী দার্জিলিং থেকে নেমে আলমবাজার মঠে এসে স্বামী অখণ্ডানন্দের লেখা তিনখানি চিঠি পড়েন। আর্তপীড়িতদের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি গুরুভাই অখণ্ডানন্দকে লিখে পাঠালেন, "সাবাস বাহাদুর! ওয়া গুরুকী ফতে!! কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে আমি দেবো।" স্বামীজীর লেখনির আঁচড়ের মাধ্যমে অখণ্ডানন্দজীর মধ্যে বজ্রশক্তি সঞ্চারিত হল।

স্বামীজীর আদেশে কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ আলমবাজার মঠ থেকে দুজন সাধুকর্মী—স্বামী নিত্যানন্দ[৪] ও ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রকে[৫] কিছু অর্থসহ মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা মহুলাতে পৌঁছান ১২ মে, ১৮৯৭। স্বামী নিত্যানন্দ ১৬ মে মাদ্রাজে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার সম্পাদককে লিখে পাঠালেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের হৃদয়বিদারক দুঃখের বিবরণ।

মহুলা গ্রামের দুটি ভাগ—চকের মাঠ ও কেদারহাটি। ত্রাণকাজের প্রথম সেবাকেন্দ্রটি খোলা হল কেদারহাটি—মহুলায় মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের চণ্ডীমণ্ডপে। দিনটি ছিল ১৫ মে, ১৮৯৭। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পনেরো দিন পূর্বে। অখণ্ডানন্দজীর চিঠির ভাষাতে এটাই প্রথম "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সেবাব্রত।" সেবাযজ্ঞের ইতিহাসে, মিশনের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। প্রথম দিনে সাহায্য পায় ১৮ জন দুঃস্থ। অখণ্ডানন্দজী নিজ হাতে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে চাল মেপে দিলেন। দ্বিতীয় দিনে সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬৯ জন। ২২ মে সাহায্য পেল ১৯৬ জন। ২৯ মে ও ২০ জুন সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল

৪ পূর্বনাম যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বরাহনগরে বাড়ি, ১৮৯৭ খ্রীঃ আলমবাজার মঠে স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাস নেন।

৫ পূর্বনাম সুরেন্দ্রনাথ বসু। ইনি অমৃতলাল বসুর ভাইপো। আহিরীটোলায় জন্ম। মার্চ, ১৮৯৩-এ স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাস নেন। নতুন নাম হয় স্বামী সুরেশ্বরানন্দ।

যথাক্রমে ২৬০ ও ৪৫০ জনে। ২৪ মে তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা অখণ্ডানন্দজীর চিঠি-খানিতে সেবাকাজের একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, "অর্থসহ যে ২ জন মহাপুরুষ আমার নিকট আসিয়াছেন তাহাদের একজনের নাম স্বামী নিত্যানন্দ ও আর একজনের নাম ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দ।...ইঁহারা খুব উৎসাহের সহিত আমার সহিত কাজ করিতেছেন। শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামী স্বয়ং এবং কলিকাতা 'মহাবোধি সভা'ই কেবল আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাদিগকে এই সুমহৎ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারাই আমাদিগের এই কার্যের উপক্রম হইয়াছে। স্বামীজী এককালীন ১০০৲ একশত টাকা দিয়াছেন। তবে তিনি যে কোথা হইতে দিয়াছেন তাহা আমি জানি না। 'মহাবোধি সভা'র টাকাও উহাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক মাত্র। এ-অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের যে ভীষণ প্রকোপ তাহাতে আমাদের এ ক্ষুদ্র ফণ্ড শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। আমরা প্রতিদিন প্রাতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে বয়ঃক্রমানুসারে দেড়পো, একপো ও আধপো হিসাবে চাউল বিতরণ করিয়া থাকি। চাউল দর[৬] এখানে প্রায় পাঁচ টাকায় মণ বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যহ ছোট বড় লোকসংখ্যা ২০০ দুই শত হইবে। ১৫ মে হইতে আজ পর্যন্ত প্রত্যহ (গড়ে) প্রায় ১॥০ (দেড় মণ) চাউল বিতরিত হইতেছে। নিত্যই যেরূপ লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে আমাদের এই ক্ষুদ্র ফণ্ড হইতে আর অধিক দিন নির্বাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। তবে স্বামীজীর আদেশে আমরা আমাদিগের সকল বন্ধুবান্ধবদিগকে লিখিতেছি ও জানাইতেছি তাঁহারা যদি আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করেন ত আমরা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা করিতে কখনই আলস্য করিব না। মূল কথা, ভগবানই আমাদের মুখ্য সহায়। তিনি আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। তিনি যেমন করাইবেন তেমনি করিব ইহাতে আমাদিগের কোন হাত নাই।"

সেবাকাজের নেতা অখণ্ডানন্দজীর অনন্ত ভূমিকার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে ব্রহ্মচারী 'সুরেশ্বরানন্দের' ২ জুনের চিঠিখানিতে। সেখানে তিনি লিখেছেন: "Everyone here is full of wonder and admiration at seeing the indefatigable energy, and all embracing love of Swami Akhandananda. The Swami sometimes spends the whole night by the side of a sick-bed, sometimes goes from village to village to bring the helpless and the needy for supplying them with food. If anyone wants to learn what it is to feel for the poor he should come and see the works of Swami Akhandananda." স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে সহানুভূতিহীন সমাজের অন্ধকারের মধ্যে অসহায় দুর্গতদের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার করেছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দই রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের পথপ্রদর্শক।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মহান আদর্শ অনেকেই বুঝে উঠতে পারেননি। এমন কি স্বামীজীর ত্যাগী ও গৃহী গুরুভাইদের কেউ কেউ এবিষয়ে গভীর সন্দেহ দীর্ঘদিন পোষণ করেছেন। এই মহান আদর্শের দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করে স্বামীজী ৩জুলাই একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

[৬] স্বামী অখণ্ডানন্দজীর ২৯।৫।৯৭ তারিখের চিঠি থেকে জানা যায় সেদিন চালের দর ছিল মন প্রতি ৪৷৵০ আনা।

"জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তয়োঃ সেবাপ্রেমরূপকর্মণোরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ— জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা সা দয়া, ন প্রেম; আত্মনা হি প্রেমাস্পদত্ব শ্রুতিস্মৃতিপ্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ যদবাদীৎ ভগবান্ চৈতন্যঃ, 'প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে' ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তো জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধিৰ্বন্ধনায় ইতি। অস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোঽপি সাহসিকজল্পিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নানুকম্পানুভূতিরস্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্বাস্মিন্।"

কিন্তু দর্শনতত্ত্বাভিজ্ঞ প্রমদাদাস মিত্র পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন তুলেছেন জীবসেবায় সন্ন্যাসীর যোগ্যতা সম্বন্ধে। এবিষয়ে পণ্ডিত মিত্রমশায়ের খোঁচা কয়েকবার সহ্য করে প্রেমিক অখণ্ডানন্দজী যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। তিনি একটি চিঠিতে[৭] মিত্র মশায়কে লিখলেন: "আত্মজ্ঞানই মনুষ্যের পরম কল্যাণস্বরূপ এবং সেই আত্মজ্ঞান ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎপ্রসাদ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যদি স্বীয় ক্রিয়ার নিদর্শন দ্বারা ও বাক্যদ্বারা ভগবদারাধনার উপদেশ করিতে হয় তবে লোকের প্রধান অভাব দূর করিতে হইবে। দেশের রাজা মহারাজ ও ধনাঢ্য জমিদারগণ যদি লোকের সে অভাব দূর করিতেন তাহা হইলে আর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা লোক-দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এত শ্রম ও যত্ন করিতেন না। দেশের বড় বড় গৃহস্থেরা যে পাষাণ দিয়া বুক বাঁধিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় এমন বজ্রোপম কঠিন উপাদান নির্মিত বর্মদ্বারা আবৃত যে আর্তের সকাতর ক্রন্দনধ্বনিও সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না। আর শুষ্ক শাস্ত্রীয় কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদা-কালই থাকিবেন। আমার প্রভু কেবল গিরিশৃঙ্গে বা নানা মন্দিরেই বসিয়া নাই! আমার প্রভু আমার আত্মা সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবানকে আমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি, যথা, "'ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষেই রামকৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা দেখছিসনি?' একথা যে শোনে তার কি আর স্থির থাকিবার যো আছে! এই মানুষ-ভগবানের সেবায় জীবন ত দিয়াইছি আরও কত জীবন দিতে হইবে বলিতে পারি না।" শ্রীরামকৃষ্ণ-বিধৃত আদর্শে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত স্বামী অখণ্ডানন্দের স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী যেমন তাঁর লেখাতে, তেমন তাঁর আচরণেও সুস্পষ্ট।

সেবাকেন্দ্রের পরিচালক অখণ্ডানন্দজী চাল-বিতরণের কাজ শেষ করে বিকালে ও রাতে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে দুঃস্থ পীড়িত মানুষদের খোঁজ খবর নিতেন। 'দণ্ডীঠাকুর' কোন গ্রামে গেলেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত। 'দণ্ডীঠাকুরের' প্রশ্নের উত্তরে জানাত তারা অন্নাভাবে কচু, ঘেঁচু ও কাঁটানটে এসব সিদ্ধ করে খাচ্ছে। 'দণ্ডীঠাকুর' আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের হাতে টিকিট তুলে দিতেন। পরদিন সকালেই তারা মহুলা সেবা-কেন্দ্রে গিয়ে চাল নিয়ে আসত। বুভুক্ষু সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। অথচ সেবা-কেন্দ্রের অর্থসামর্থ্য খুবই সীমিত। তৎসত্ত্বেও সেবাকাজ কিভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে তার ধারণা করা যায় পরপৃষ্ঠার তালিকা থেকে।[৮]

৭ নবপ্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রম থেকে ১০।১।৯৯ তারিখে লেখা।

৮ The Brahmavādin, July 17, 1897, p. 268

| সংখ্যা তারিখ | বয়স্ক পুরুষ | বয়স্ক স্ত্রী | বালক বালিকা | শিশু | অনুপস্থিত সাহায্য-প্রার্থী | মোট সাহায্য-প্রার্থী | মোট চালের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ জুন | ২৭ | ২৮ | ৩৮ | ৭৩ | ১৮ | ২৩৬ | ১॥৮৮/০ ( ১ মণ ১৮ সের ৩ পোয়া ) |
| ৮ জুন | ২৩ | ৯৯ | ৫৬ | ৯৪ | ২ | ২৭৪ | ১৮১॥০ ( ১ মণ ৩১ সের ২ পোয়া ) |
| ১৫ জুন | ৩৩ | ১৫১ | ৮০ | ১১৪ | ২৩ | ৪০১ | ২॥৩।০ ( ২ মণ ২৩ সের ১ পোয়া ) |
| ২২ জুন | ৩৯ | ১৭৬ | ১০০ | ১২৫ | ১১ | ৪৫১ | ৩/১।০ ( ৩ মণ ১ সের ১ পোয়া ) |

বাইশ দিনে এ সকল সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে (৪৭৮।৵০ মোট ৪৭ মণ ৩০ সের ১½ পোয়া) চাল বিতরণ করা হয়। তাছাড়া পঙ্গু অতিবৃদ্ধ অসুস্থ সাহায্যপ্রার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে চাল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার পরিমাণ ৫/৭৵০ (৫ মণ ৭ সের ২ ছটাক)।

এ-সকল সাহায্য বিতরিত হচ্ছিল গঙ্গার পূর্ব পাড়ে বড়ুয়া থানার (বর্তমান বেলডাঙ্গার) অন্তর্গত পঞ্চাশটি গ্রামের দুঃস্থদের মধ্যে। পশ্চিম-তীরের কয়েকটি গ্রামের শোচনীয় অবস্থার খবর এসে পৌঁছাল সেবাকেন্দ্রে। অখণ্ডানন্দজী স্থানীয় একজন মুরুব্বি চন্দ্রভূষণ অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদপাড়া, দবকৈ, অরোয়ান, যদুপুর, মাধাপুরা, দিকতি ও বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পরিদর্শন করলেন ১২ জুন।[৯] অধিকাংশ বাড়িতেই দেখতে পান চালে খড় নেই, ঘরে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই। সবচেয়ে ভুক্তভোগী শিশু ও নারীগণ; বিশেষতঃ মুসলিম নারীগণ। অনেকক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুত্রকন্যা ত্যাগ করে পুরুষেরা অন্যত্র চলে গেছে রুজি-রোজগারের আশায়। তিনি অতি দুঃস্থ ৮৮জন মানুষের জন্য টিকিট বিলি করে দেন। দরদী সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন আরও সাহায্য দেওয়া দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায়? ২৩ জুন অখণ্ডানন্দজী মাদ্রাজে গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দকে কাতরভাবে পুনরায় জানালেন অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করবার জন্য। জানালেন ৫০০ জনের বেশি নিরন্ন মানুষকে সেবা করার জন্য প্রয়োজন মাসে ২৫০ টাকার বেশি।

১২ জুন বিকালে পরিদর্শনের পর ফিরবার পথে অখণ্ডানন্দজী মহুলা গ্রামের অপর পারে খেয়াঘাটে বসেছিলেন, সে-সময়ে প্রবল ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প[১০] চারিদিকে ধ্বংসের চিহ্ন রেখে যায়। পরদিন অখণ্ডানন্দজী জানতে পারেন যে বহরমপুর, সৈদাবাদ ও গোরাবাজারে বহুসংখ্যক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই নতুন বিপদের ফলে ত্রাণকাজে বহরমপুরবাসীদের যে সাহায্য প্রত্যাশা করা গেছিল তা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

অভিজ্ঞতার অভাব, অর্থাভাব, সময়মত সরকারি সহযোগিতার অভাব প্রথমদিকে সেবা-ব্রতীদের কিছুটা হতাশ করে তুলেছিল। স্বামী নিত্যানন্দ[২০] যে আলমবাজার মঠে জানালেন তাঁর হতাশাপূর্ণ অভিজ্ঞতা। ব্রহ্মানন্দজীর পক্ষ থেকে তুরীয়ানন্দজী ২৪ মে তাঁকে লিখে পাঠালেন, "ভগবান স্বয়ংই সৎকর্মে উৎসাহদাতা

৯ ঐ, July 3, 1897, p. 265

১০ এই ভূমিকম্পে মিশনের মঠকেন্দ্র আলমবাজারের মঠবাড়ি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই কথা মনে রাখিয়া পূর্ণ বিশ্বাসে কাজ কর। যখন নামিয়াছ তখন কিছুতেই ছাড়িবে না। চেষ্টা সফল হইবেই হইবে।" স্বামী নিত্যানন্দ সাময়িকভাবে হতাশাগ্রস্ত হলেও নেতা অখণ্ডানন্দজীর শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপার উপর ছিল অটুট বিশ্বাস।

দিন পনেরো কাজ চলার পরে বহরমপুরের দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতির (Relief Fund Committee)[১১] সম্পাদক ডেপুটি মেজিস্ট্রেট নিত্যগোপাল মুখার্জি এবং আরও কয়েকদিন পরে জেলা-মেজিস্ট্রেট লেভিঞ্জ সাহেব (Mr. E. V. Levinge) মহুলা সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করে নিঃস্বার্থ সেবাকাজ দেখে অভিভূত হন। নিরন্ন কার্যক্ষম গ্রামবাসীদের সাহায্য করবার জন্য বড় রাস্তা থেকে মহুলা গ্রামে যাবার একটি রাস্তা তৈরির প্রস্তাব রাখেন অখণ্ডানন্দজী। জেলা-মেজিস্ট্রেট সানন্দে অনুমোদন করেন। উপরোক্ত 'দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি'র সভাপতি জেলা-জজ্ প্যাণ্টন সাহেব ও অন্যতম সদস্য বৈকুণ্ঠনাথ সেনের সৌজন্যে সমিতির গুদাম থেকে ২৲ টাকা মণ দরে বর্মাদেশের চাল সরবরাহের অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সময়ে এই সস্তাদরে চাল কেনবার ক্ষমতাও ছিল না সেবাকেন্দ্রের। রেশম ব্যবসায়ী সুধাংশুশেখর বাগচীর সহায়তায় অখণ্ডানন্দজী সমিতির গুদাম থেকে চাল ধার করে আনেন। আশ্চর্যের বিষয় দু-একদিন পরেই প্রত্যাশিতভাবে মাদ্রাজের জনৈক দাতার ৫০০৲ টাকা পাওয়া যায় এবং ঋণ শোধ করে দেওয়া হয়।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি ও মঠের ডায়েরি থেকে জানা যায় কার্যক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান, অসমর্থদের মধ্যে চাল বিতরণ ছাড়াও অবহেলিত পীড়িতদের বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া ও কলেরা আক্রান্তদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা সেবাকার্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সে সময়ে কলেরা ছিল আতঙ্ক বিশেষ। একদিন সন্ধ্যায় অখণ্ডানন্দজী মহুলায় সান্যাল-মশায়ের বাড়িতে বসেছিলেন, সেখানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের মোড়ল। এমন সময়ে একজন এসে খবর দিল বাগ্দী বুড়ী কলেরা রোগে আক্রান্ত। মোড়লকে নির্বিকার দেখে অখণ্ডানন্দজী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মোড়লের সাফ্ উত্তর, "ওলাওঠা! বাবা, আমরা কি করব?" অখণ্ডানন্দজী তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন। ডাক্তার রাধাসুন্দরকে ডাকতে তিনি বললেন, "ওসব ওলাওঠা কেস। ওসব আমরা চিকিৎসা করি না, যাই না।" অখণ্ডানন্দজী ডাক্তারের কাছ থেকে কয়েক মোড়ক ওষুধ নিয়ে বৃদ্ধার কুটীরে পৌঁছে দেখেন তার অন্তিম দশা। তিনি সারারাত জেগে বৃদ্ধার সেবা করলেন, ভগবানের নাম শুনালেন। প্রভাতে বৃদ্ধা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। পরে অবশ্য অখণ্ডানন্দজী এই ডাক্তারকে অন্য কলেরা রুগীর পাশে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সন্ন্যাসীর নির্ভীক সেবায় অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামবাসীদের কলেরা ভীতি অনেকটা দূর হয়েছিল। সেবাকাজের এই নতুন দিগন্তের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বামীজী ৪ জুলাই মার্গারেট নোবলকে লিখেছিলেন: "বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত।"

ইতিমধ্যে এক সাংগঠনিক সমস্যার উদ্ভব হয়। 'মহাবোধি সোসাইটি' সাড়ম্বরে প্রচার করতে থাকে যে সোসাইটি মহুলাতে সেবাকাজ করছে। Indian Mirror পত্রিকার ৬ জুন, ১৮৯৭

১১ সে-সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় চার-পাঁচটি Government Relief Fund Committee অগোছালো ভাবে কাজ করছিল।

সংখ্যায় ঘোষিত হল, "We are glad to announce that the Mahabodhi Society, which has collected a decent sum from the Buddihst countries, has placed its relief operations under the most able supervision of Swami Akhandananda.[১২] ব্রহ্মানন্দজী সোসাইটির সম্পাদক চারুবাবুকে মৌখিক প্রতিবাদ জানান। অনুমিত হয়, এর ফলেই ঐ পত্রিকার ২৪ জুন সংখ্যায় লেখা হল, "The Society has placed its relief operations in most competent hands. Swami Akhandananda of Alum Bazar Math with two other Sannyasins are now in charge of the works···The Society has remitted Rs. 100 as 2nd Instalment in aid of the relief works there." একই দৃষ্টিকোণ থেকে Journal of the Maha-Bodhi Society জুলাই অগস্ট সংখ্যায় জানাল: "The money placed at the disposal of Swami Akhandananda, has been supplemented by the following donations, which were received by him, namely a friend of the Alumbazar Math Rs. 100, Babu Girija Bhusan Burman ( Berhempore ) Rs. 15 and Bepin Behari Roychowdhury M. A. ( Cal. ) Rs. 10." এখানে 'A friend of the Alumbazar Math' হচ্ছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর প্রেরিত টাকা দিয়ে মহুলাতে ত্রাণকাজ আরম্ভ হয়েছিল। মহাবোধি সোসাইটির মনোভাব পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়ে ব্রহ্মানন্দজী সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দকে জানিয়ে দিলেন। সোসাইটি ত্রাণকাজের জন্য দুমাসে রামকৃষ্ণ মিশনকে সর্বসমেত ২৫০, টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল।

এদিকে প্রেরণা-সূর্য স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় অখণ্ডানন্দজী সকল বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছিলেন। স্বামীজী ১৫ জুন তাঁকে লিখেছিলেন: "সাবাস! লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম even unto death।···ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহো-ভাগ্যম্। It is the heart that conquers, not the brain।···এই তো পূজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে।' এই তো আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ—পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য!"

আবার ৩০ জুলাই তাঁকে লিখেছিলেন: "তুমি খুব চুটিয়ে কাজ করে যাও, ভয় কি? আমিও 'ফের লেগে যা' আরম্ভ করেছি। শরীর তো যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায়? It is better to wear out than rust out. মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্‌কি খেলবে, তবে ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটিকে ছেয়ে ফেলতে হবে—'এর কমে হবেই না।' তাল ঠুকে লেগে যাও—'ওয়া গুরুকী ফতে।'"

এভাবে প্রেরণা-গোলক একটির পর একটি বর্ষিত হতে থাকে। এর গভীর প্রভাব সম্বন্ধে অখণ্ডানন্দজী পরবর্তিকালে বলেছিলেন, "তাঁহার প্রত্যেক পত্র বারংবার পড়িতে পড়িতে নববলে বলীয়ান হইয়া 'মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরং বা পাতয়েয়ম্' মন্ত্রে আমার বুক ভরিয়া যাইত। ওঃ, কি অনাবিল কর্মস্রোতে আমি তখন মগ্ন হইয়া থাকিতাম। মনে হইত, আমাদের এই সাধনার

১২ Swami Vivekananda in Indian Newspapers, 1893-1902 গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।



স্বামী অখণ্ডানন্দ



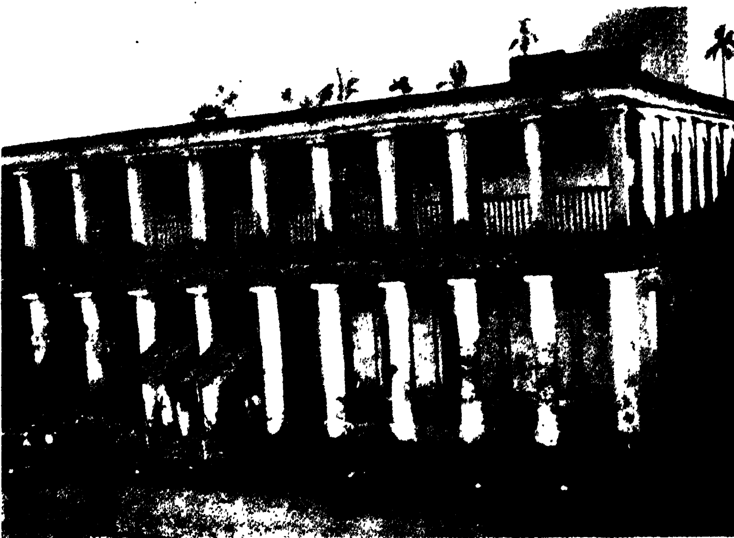
সান্যালদের চণ্ডীমণ্ডপ : ১৮৯৭ অন্নপূর্ণাপূজার দিনে স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ
প্রথম এখানে আগমন করেন।



ভট্টাচার্যদের চণ্ডীমণ্ডপ : ১৮৯৭, মে থেকে ১৮৯৮ অক্টোবর পর্যন্ত স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ
এখানে অবস্থান করেন।



বরানগর মঠ



আলমবাজার মঠ



নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি



বেলুড় মঠ

ফলে অচিরকালমধ্যেই এক অভূতপূর্ব নবীন যুগের অভ্যুদয় হইবে।"

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার পরেই অখণ্ডানন্দজী নীলাম্বর মুখার্জির বাড়িতে অবস্থিত মঠ থেকে রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখেছিলেন, "ভাই! আমাদের famine work তোমারই পরিশ্রমে সুসম্পন্ন হইয়াছে।" এর পিছনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণানন্দজী গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে দুর্ভিক্ষের রাজ্য পরিত্যাগ করে মঠে ফিরতে উপদেশ দিয়েছিলেন। স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী অখণ্ডানন্দ সেবাকাজ আরম্ভ করেছিলেন ১৫ মে। তার পূর্বেই স্বামীজীর আদেশানুসারে তুরীয়ানন্দজী ৯ মে তারিখে মান্দ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে নির্দেশ দেন সঙ্ঘের পত্রিকা 'ব্রহ্মবাদিন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে' দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ও প্রস্তাবিত সেবাকাজের বিবরণ প্রকাশ করবার জন্য। এদিকে স্বামী অখণ্ডানন্দকে নির্দেশ দেওয়া হয় ত্রাণকাজের বিবরণ মান্দ্রাজে পাঠাবার জন্য। তদনুযায়ী 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা ৫ জুন অখণ্ডানন্দজীর পত্রাংশ উদ্ধৃত করে লিখল, "It is impossible to count the number of men and women that are already dead, as well as those that are on their death bed, for want of food." তাঁর দ্বিতীয় পত্রাংশ উদ্ধৃত করে লিখল, "when I imagine the agonies of the starving men, I almost shrink to go to their side, for I will not be able to do anything to them save seeing their extreme pain." ধনীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়ে অখণ্ডানন্দজী এই চিঠিতেই লিখেছিলেন…"যেসব হৃদয়হীন জীবগুলি এই সংকট সময়েও নিশ্চিন্ত বিলাসের মধ্যে শুয়ে হাস্য-পরিহাস করে সময় কাটাচ্ছে তারা ঈশ্বরের বৈধ সন্তান নয়, শয়তানের বাচ্চা।" তাঁর তৃতীয় পত্র থেকে 'ব্রহ্মবাদিনের' পাঠকগণ জানতে পারলেন ত্রাণকাজ আরম্ভ হয়েছে। 'ব্রহ্মবাদিন' ১৯ জুন সংখ্যায় ত্রাণকাজের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হল। ৩ জুলাই, ১৭ জুলাই ও ২৮ অগস্ট সংখ্যায় আরও তথ্যাদি প্রচারিত হল। প্রায় প্রতি সংখ্যাতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অর্থ-সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেলারির একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র আর. গোপাল আইয়ার তিনবারে ১৫০০৲ টাকা পাঠালেন। আমেরিকার ডেট্রয়েট শহর থেকে জনৈক দাতা পাঠালেন ৫ পাউণ্ড ২ শিলিং। কলকাতা, বারাণসী ও মান্দ্রাজ থেকে 'Swami Vivekananda Famine Fund'-এ অর্থ অল্পস্বল্প আসতে থাকল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই সংগৃহীত অর্থ পাঠিয়ে দেন আলমবাজার মঠে। ব্রহ্মানন্দজীর ১৭ জুলাইয়ের চিঠি থেকে আরও জানা যায় মিঃ সেভিয়ার ৫০৲ টাকা ও যতীন্দ্রকুমার মুন্সী ২৫৲ টাকা দিয়েছিলেন। অবশ্য এই ত্রাণকাজের জন্য মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ—যার বিবরণ Journal of the Mahabodhi Society তে প্রকাশিত হয়েছিল—আলমবাজার মঠে জমা পড়েছিল কিনা জানা যায় না।

আদর্শবাদী অখণ্ডানন্দজী দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য সংগৃহীত অর্থ নিজেদের জন্য ব্যয় করতে নারাজ ছিলেন। তিনি আলমবাজার মঠ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করলে ব্রহ্মানন্দজী ১৯ মে তারিখের চিঠিতে লিখলেন, "তোমরা যদি গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিতে না পার তাহা হইলে ১০৲ টাকা ঐ ফণ্ড হইতে আপাততঃ লইয়া নিজ ব্যয়ের জন্য নির্বাহ করিবেক। এখান হইতে টাকা গেলে সেই টাকা হইতে উক্ত ফণ্ডে দিবে।" স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনীকার মন্তব্য করেছেন, "একমাস ধরিয়া দুর্ভিক্ষমোচন কার্য চলিতেছে।

সেবাকেন্দ্রে রন্ধনের কোন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নাই, কারণ শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির সনির্বন্ধ অনুরোধে অখণ্ডানন্দ সহকারীর সঙ্গে পালাক্রমে এক-একদিন এক-এক বাড়িতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন।"[১৩] মনে হয় কিছুদিন পরে কর্মীদের জন্য সেবাকেন্দ্রে রান্নার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এর জন্য মঠ থেকে সামান্য অর্থসাহায্য ছাড়াও অখণ্ডানন্দজী তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকেও অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, তিনি ৮ জুলাই তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছেন, "আপনি আমাকে কিছু খরচ পাঠাইয়া দিবেন। আমি ইহা আপনার নিকট নিজের ভিক্ষাদি ব্যয়ের জন্য চাহিতেছি। এ অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, এখানকার লোকের তেমন অর্থসঙ্গতি নাই। সেইজন্য আপনা হইতে কিছু খরচ করিতে না পারিলে চলে না।" কলকাতা মঠ থেকে নিয়মিত অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হলে এ-সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়।

কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতিরূপে ব্রহ্মানন্দজী মঠ থেকে অর্থ ও কাপড় পাঠানো ছাড়াও নিয়মিতভাবে কর্মীদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন, কাজকর্ম সম্বন্ধে খুঁটিনাটি পরামর্শ দিচ্ছিলেন, আবার কখনও ভুল-ত্রুটির জন্য জবাব-দিহি চাইছিলেন। একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক। আর্তদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ সম্বন্ধে অভিযোগ উঠলে স্বামীজীর আদেশে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তথ্যানুসন্ধানের জন্য লিখেন। এতে ভুল বুঝে স্বামী অখণ্ডানন্দ মনঃক্ষুণ্ণ হন। প্রখর-বুদ্ধি ব্রহ্মানন্দজী ১৩ জুলাই তারিখের চিঠিতে তাঁকে লিখলেন, "আমি যে তোমার নিকট explanation চাহিয়াছিলাম, সে কোনও প্রকার অবিশ্বাসবশতঃ নহে, কেবল অপর পাঁচজনকে উহা দেখাইয়া তাহাদের ভ্রম নষ্ট করিবার জন্য। তোমার যেরূপ সহৃদয়তা তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। তোমার করুণ হৃদয়, সর্বসাধারণের জন্য সহানুভূতি, অদম্য অধ্যবসায় আমাদিগকে শ্রদ্ধা দিতেছে। গুরুদেবের কৃপায় তুমি আরও উৎসাহের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত থাক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।" ত্রাণকাজ পরিচালনা সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দজীর ৫ জুলাইয়ের চিঠির নিম্নোক্ত অংশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরবর্তিকালেও তাঁর এ-সকল নির্দেশই সঙ্ঘের সাধুকর্মীগণ অনুসরণ করে চলেছে। তিনি লিখেছেন, "তোমাদের সেবা-কার্য সম্বন্ধে কয়েকটি পরামর্শ দিতেছি: (১) সরকার যদি ঐ মূল্যে চাউল সরবরাহ করিতে রাজী না হয়, তোমাদের চাউল বিতরণ সম্বন্ধে সংযত ও হুঁশিয়ার হইতে হইবে। (২) সাহায্য বিতরণের জন্য একমাত্র সেই সকল ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করিবে যাহারা প্রকৃতই অভাবগ্রস্ত এবং জীবিকা উপার্জনে অক্ষম। (৩) তোমরা যাহাদের বাস্তবিকই সাহায্যলাভের যোগ্য বিবেচনা করিবে শুধু তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিবে; অন্য লোকের অভিমত দ্বারা পরিচালিত হইবে না।"[১৪] স্বামী ব্রহ্মানন্দকে 'Secretary of the Alum Bazar Famine Relief Works' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আলমবাজার মঠ থেকেই দানাদির প্রাপ্তি স্বীকার করা হত। ত্রাণকাজ আলমবাজার মঠ থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল।

মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অখণ্ডানন্দজী প্রতি সপ্তাহে কার্যবিবরণী সম্বলিত পত্র আলমবাজার মঠে পাঠাতে থাকেন। মাঝে মাঝে মাদ্রাজ মঠেও চিঠি লিখে স্থানীয় সংবাদ জানাতে থাকেন।

১৩ স্বামী অখণ্ডানন্দ: স্বামী অন্নদানন্দ, পৃঃ ১০৪

১৪ 'ব্রহ্মানন্দচরিত', পৃঃ ১৪৫

ব্রহ্মানন্দজীর ইচ্ছা স্বামী অখণ্ডানন্দ সরাসরি পত্রিকাগুলিতে কার্যবিবরণী পাঠান। তিনি ১ জুন তারিখে লিখেন, "তাঁহার (স্বামীজীর) ইচ্ছা যে কাগজে লেখা, বাস্তবিক কাগজে লেখা হইলে আমরা fund-এর জন্য subscription তুলিতে পারিব, কারণ কেহ জানে না সেখানে তোমরা কিরূপ কার্য করিতেছ।...অতএব তোমরা যত শীঘ্র পার correspondance Mirror এবং Patrika তে পাঠাইবে। তোমাদের correspondance বাংলা এবং ইংরেজীতে বাহির হইলে চাঁদার চেষ্টা করা যাইবে।..নিত্যানন্দের পত্রে জানিলাম যে পত্রাদি ছাপাইবার তোমাদের ইচ্ছা নাই, শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। যাহা হউক obedience না থাকিলে কোন কার্য হইবে না।" চিঠি পেয়ে অখণ্ডানন্দজী পত্রিকার জন্য বিবরণী লিখতে বসেন, পারেন না, তাঁর চোখের জলে লেখার কাগজ ভিজে যায়। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে গিয়ে মানসনয়নে দেখেন, ঠাকুর এসে তাঁকে বলছেন, "তুই আমাকে চাস, না পাবলিক-কে চাস?...পাবলিককে যদি চাস, তাহ'লে খবরের কাগজে দস্তুর মত লিখতে হবে। এখন ছাখ, একদিকে পাবলিক, একদিকে আমি।" তিনি কাঁদতে কাঁদতে বিহ্বল হয়ে পড়েন, কার্যবিবরণী আর লেখা হল না। অতঃপর আলমবাজার মঠ ও মাদ্রাজ মঠে লেখা তাঁর চিঠিগুলি যথাক্রমে 'বসুমতী' ও 'ব্রহ্মবাদিনে' ছাপা হতে থাকে। এইকালে অখণ্ডানন্দজীর লেখা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ 'বসুমতীতে' 'শূন্যভারত' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, মারগারেট নোবলের চেষ্টায় লণ্ডনে Mr. Eric Hammond-এর সভাপতিত্বে ৪ অক্টোবর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। Daily Chronicle কাগজে অর্থ সাহায্যের আবেদন প্রকাশিত হয়।

পূর্বোক্ত ১৫ জুনের চিঠিতে স্বামীজী স্বামী অখণ্ডানন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "ঐ রকমে বিস্তার কর, আর তাদের তুমি inspect করে বেড়াও—ক্রমে দেখবে যে, ঐ কার্যটী permanent হবে—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও ধর্মপ্রচার আপনা-আপনিই হবে।...ঐ রকম কাজ করলেই আমি মাথায় করে নাচি—ওয়া বাহাদুর!" স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল অখণ্ডানন্দজীর নেতৃত্বে ত্রাণকাজ ব্যাপক আকারে সংগঠিত হয়, সে-সঙ্গে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনও ছড়িয়ে পড়ে। আলমবাজার মঠ থেকে পাঠানো কয়েকটি কার্যবিবরণী পাঠ করে স্বামীজী ১১ জুলাই মঠে লিখে পাঠালেন একটি চিঠি যা ভবিষ্যতের ত্রাণকাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিগনির্দেশ। সেখানে তিনি লিখেছেন, "অখণ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কর্ম করছে বটে, কিন্তু কার্যপ্রণালী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। মনে হয়, তারা একটা গ্রামেই তাদের শক্তিক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বিতরণের কার্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচারকার্যও হচ্ছে—কই, এরূপ তো শুনতে পাচ্ছি না। জন-সাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।... ব্রহ্মানন্দকে বলো বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ করা যায়। আরও মনে হচ্ছে, এপর্যন্ত ঐ কার্যে ফল কিছু হয়নি; কারণ তাঁরা এখনও পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে তেমন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারেননি, যাতে তারা লোকের শিক্ষার জন্য সভাসমিতি স্থাপন করতে পারে এবং ঐ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক না থাকে, এবং

ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।...যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন করছেন, তাঁদের এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জুয়াচোরেরা যেন গরীবের প্রাপ্য নিয়ে যেতে না পারে।... ব্রহ্মানন্দকেই বলো, যাঁরা দুর্ভিক্ষে কাজ করছেন, তাদের সকলকেই এই কথা লিখতে, যাতে কোন ফল নেই, এমন কিছুর জন্য টাকা খরচ করতে তাঁদের কখনই দেওয়া হবে না—আমরা চাই, যতদূর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশি সম্ভব স্থায়ী সৎ-কার্যের প্রতিষ্ঠা।" স্বামীজীর এই চিঠি ১৬ জুলাই পেয়ে ব্রহ্মানন্দজী পরদিনই মহুলাতে লিখলেন, "গতকাল স্বামীজীর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন famine relief-এর সাথে সাথে preaching যেন হয়, কোনমতে অন্যথা না হয়।" তিনি পুনরায় ২১ জুলাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখলেন, "Swamiji ক্রমাগত পত্রে লিখিতেছেন, যাহাতে Preaching হয়...এবং কার্য করা হয়। Trigunatita-কে ওখানে পাঠাইতেছি। তাহা হইলে তুমি আলাহিদা centre খুলিতে পারিবে এবং কোনও স্থানে Preaching কার্য ভাল হইবে।" বলা বাহুল্য, অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর এই নির্দেশকে বাস্তবে রূপদান করেছিলেন।

আলমবাজার মঠ থেকে কিছু নতুন ও পুরাতন কাপড় পাওয়া গিয়েছিল। অখণ্ডানন্দজীর ইচ্ছা হয় সেবাকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত প্রত্যেককে একখানি করে নতুন কাপড় দেন। বহরমপুর শহর থেকে কিছু সংখ্যক নতুন ধুতি ও শাড়ি সংগৃহীত হয়। অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি দিনে সেবাকেন্দ্রে সভার আয়োজন করা হয়। জেলা-মেজিস্ট্রেট মিঃ লেভিঞ্জের হাত দিয়ে ৫০০টি নতুন ধুতি ও শাড়ি বিতরণ কর' হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি-মেজিস্ট্রেট নিত্যগোপাল মুখার্জি, ডিস্ট্রিক ইঞ্জিনিয়র প্রিয়নাথ মিত্র, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, নীল ও রেশম-কুঠির ম্যানেজার আলেকজাণ্ডার কেউ (Keogh) প্রভৃতি। জেলা-মেজিস্ট্রেট রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অখণ্ডানন্দজী তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং যে সকল ব্যক্তি ও সংস্থা সাহায্য করেছিলেন তাদের ধন্যবাদ দেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দও জেলা-মেজিস্ট্রেট ও অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানান।[১৫] সভার শেষে দরিদ্র নরনারায়ণদের ভাত, ডাল, তরকারী, দই ও ভুরো দিয়ে ভুরিভোজন করান হয়। পরিতৃপ্ত অখণ্ডানন্দজী পরবর্তিকালে স্মৃতিচয়ন করে লিখে-ছিলেন, "আমার জীবনে সহস্রাধিক[১৬] দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকে এক জায়গায় বসাইয়া খাওয়ান এই প্রথম।...তাহাদের ঐরূপ অসম্ভব খাওয়া দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম।" এই উৎসবের পরিমণ্ডল অধিকতর আনন্দময় হয়ে উঠেছিল অতুল চম্পটির সংকীর্তনের দ্বারা।

'মধুরেন সমাপয়েৎ' এই শিষ্টবাক্যের সম্মানার্থেই যেন সন্ধ্যাকালে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল। জলাভাবে নষ্টপ্রায় আউসধান যেন নতুন প্রাণ পেল। সকলে আনন্দ করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল।

১৫ স্মরণ করা যেতে পারে অখণ্ডানন্দজী 'ব্রহ্মবাদিন' ২৮ অগস্ট, ১৮৯৭ সংখ্যায় সকল দাতাদের এবং মুকুন্দলাল বর্মন, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, গিরিজাভূষণ বর্মন, সুধাংশুশেখর বাগচী ও ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র প্রিয়নাথ মিত্রকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

১৬ আলমবাজার মঠে ১৩ অগস্ট তারিখে লেখা অখণ্ডানন্দজীর চিঠিতে জানা যায় সেদিন দরিদ্র-নারায়ণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৫০০ জন। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য অখণ্ডানন্দজীর একটি স্বীকারোক্তি। পরবর্তিকালে তিনি বলেছিলেন, 'সত্যিই বলছি—সবাইকে খাওয়ালে ঠাকুর খান, এ বিশ্বাস আমার আছে,—এ আমি দেখেছি।' (স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়, পৃঃ ৫৮)

এরকম সময়ে কার্যক্ষম দুঃস্থ ব্যক্তিদের দিয়ে পূর্বোক্ত নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। এদিকে সরকারি কর্মচারীদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ইংরেজ সরকার অগস্ট মাসের প্রথম দিকে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকাজ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। বহরমপুর রিলিফ ফণ্ডের উদ্বৃত্ত পাঁচ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় রিলিফ ফণ্ডে জমা দেওয়া স্থির হয়। প্রায় এই সময়ে অখণ্ডানন্দজী জঙ্গীপুরে গিয়ে জানতে পারেন কাঁদি মহকুমার নবগ্রাম থানার জনসাধারণ বিপন্ন।[১৭] পাঁচগাঁ ইত্যাদি কয়েকটি গ্রাম তিনি সরজমিনে তদন্ত করে এসে জেলা-মেজিস্ট্রেটকে জানান। পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে জেলাবোর্ড পাঁচগাঁয়ে নতুন সেবাকেন্দ্র খুলবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে ২৫০৲ টাকা মঞ্জুর করেন। মহুলায় চাল বিতরণ আপাততঃ বন্ধ করে পাঁচগাঁয়ে সেবাকেন্দ্র পূর্ণোদ্যমে চালু করা হয়। স্বামী নিত্যানন্দ প্রায় আড়াই মাস কাজ করে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। অখণ্ডানন্দজী ব্রহ্মচারী সুরেন ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে সেবাকেন্দ্র পরিচালনা করতে থাকেন।

অখণ্ডানন্দজী বুঝতে পেরেছিলেন যে মহুলা সেবাকেন্দ্র নতুন ধান না ওঠা পর্যন্ত একেবারে বন্ধ করা যাবে না। দুচারদিন পর থেকেই প্রতিদিন আট-দশজন করে অক্ষম দুঃস্থ নরনারী সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। এদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অখণ্ডানন্দজী প্রকৃত অক্ষমদের বাছাই করে চাল বিতরণ করতে শুরু করেন। এভাবে বেশ কিছুকাল ধরে ত্রাণকাজ অব্যাহত থাকে। মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ প্রকাশিত 'সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে'র ষোড়শ বর্ষের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে স্বামী অখণ্ডানন্দ সেবার অন্নবস্ত্র ঔষধাদি দানে 'অনধিক একবর্ষকাল' নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে উদ্ভাসিত এই সেবাযোগের উদ্গাতা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। মূলকেন্দ্র আলমবাজার মঠ থেকে এই সেবাব্রত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন ব্রহ্মানন্দজী। আর অখণ্ডানন্দজী সেই সেবা-যোগকে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষের উপর সার্থক প্রয়োগ করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। দুর্ভিক্ষ ত্রাণকাজে এ-সকল প্রবর্তকগণের কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কয়েকটি নীতি যা ভবিষ্যতে মিশনের সকল ত্রাণকাজের পথনির্দেশক রূপে গৃহীত হয়েছে। নীতিগুলির সারকথা হচ্ছে :

(ক) আর্ত-পীড়িতদের ত্রাণকাজ রামকৃষ্ণানুরাগীগণের সাধনভজনের অঙ্গস্বরূপ। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' আদর্শের আলোকে আর্ত-পীড়িতদের 'সেবা-পূজা' করতে হবে।

(খ) ত্রাণকাজের লক্ষ্য আর্তপীড়িতদের স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দেওয়া, 'সুখীভিক্ষু' তৈরি করা নয়।

(গ) অর্থ, কর্মী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার

১৭ অখণ্ডানন্দজী মহুলা থেকে আলমবাজার মঠে লিখে পাঠালেন, 'আমি ১০ দিন পরে ২।৩ দিন হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কাঁদি মহকুমার নবগ্রাম থানা এলাকায় কতকগুলি গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখিয়া আসিলাম এবং তন্নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রামে বীরভূম জেলার ততোধিক কষ্ট দেখিতে পাইলাম। কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে কথা হইয়াছে। তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা শীঘ্রই সেখানে একটি relief খুলিব মনে করিয়াছি। আর এখানকার কাজ এখন বন্ধ করিলেও হয়। এখানে একটি স্থায়ী মঠ খুলিবার চেষ্টায় আছি। স্বামীজীকে plan আদি লিখিয়াছিলাম। তিনি encourage করিয়াছেন।' স্বামীজী তাঁর ২৪ জুলাইয়ের চিঠিতে লিখেছিলেন Orphanage সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় তা অতি উত্তম ও শ্রীমহারাজ তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত।'

পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে এরূপভাবে যাতে "আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ করা যায়।"

(ঘ) 'মহাবোধি সোসাইটি' প্রমুখ সংস্থা যারা মিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে গুলি ছুঁড়তে চায় তাদের সংস্রব ত্যাগ করে মিশনের স্বাবলম্বী হয়ে কাজ করাই বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) সেবাকাজের পরিচালনায় মূলকেন্দ্র নীতি-নির্ধারণ করবে, কর্মী ও অর্থসংগ্রহে সাহায্য করবে, হিসাব পরীক্ষা ও প্রচারের দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু সেবাকেন্দ্রের পরিচালকের উপরই থাকবে সেবাকাজের সংগঠনের মুখ্য দায়িত্ব।

(চ) জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই পত্রপত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

(ছ) বড় রকমের ক্ষতিগ্রস্ত আর্তদের সেবার জন্য প্রাথমিক ত্রাণকাজের পর প্রয়োজন হয় পুনর্বাসন। সেখানেও লক্ষ্য থাকবে সেবিতগণ যেন স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

স্বামীজী, অখণ্ডানন্দজী প্রমুখ সেবাযোগের প্রবর্তকগণের মনোভঙ্গীতে বিস্ফুরিত হয়ে উঠেছিল একটি ভাব, যেটি মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর চিঠির একটি অংশে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। স্বামীজী লিখেছেন, "মানুষের মুখচ্ছবিতে জীবন্ত আত্মার প্রতিফলনে যে সৌন্দর্য, জড়জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যের চেয়ে তা অনেক বেশী আনন্দজনক।"[১৮] এই আধ্যাত্মিক কাব্য-সাধনাই সেবাযোগের প্রাণ। এই সাধনাই সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেবাতীর্থ মঙ্গলাতে।

১৮ পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫৮১

# শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা

## স্বামী প্রমেয়ানন্দ

দেবীর বহুবিধ রূপের মধ্যে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশটি রূপ দশ মহাবিদ্যা নামে খ্যাত। মহাভাগবতপুরাণে[১] বলা হয়েছে, 'এতাঃ সর্বাঃ প্রকৃষ্টাস্তু মূর্তয়ো বহুমূর্তিষু' —দেবীর বহুবিধ মূর্তির মধ্যে দশমহাবিদ্যাই প্রকৃষ্টা। বলা বাহুল্য, ষোড়শী দশমহাবিদ্যার অন্যতমা দেবী। এই দেবী শ্রীবিদ্যা, ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরী, বালা, রাজরাজেশ্বরী ইত্যাদি নামেও অভিহিতা হয়ে থাকেন। সর্বদা 'শ্রী' প্রদান করেন বলে ষোড়শীকে শ্রীবিদ্যা বলা হয়। এই ষোড়শীর প্রভাব সমগ্র ভারতেই পরিলক্ষিত হয়। আচার্য শঙ্কর স্বয়ং শৃঙ্গেরী মঠে প্রধান উপাস্যরূপে শ্রীবিদ্যার যন্ত্র স্থাপন করে গিয়েছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠ-চতুষ্টয়ে—শৃঙ্গেরী, দ্বারকা, পুরী ও বদরিকাশ্রমে—গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রীযন্ত্রে দেবী শ্রীবিদ্যা পূজিতা হয়ে আসছেন। এতেও ষোড়শীর সর্বভারতীয় প্রভাবই প্রমাণিত হয়। ষোড়শী সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে[২] আছে, "ঠাকুর এই কালে ( তন্ত্রসাধন কালে ) দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্যন্ত কত যে দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না।...ঐ মূর্তি-সমূহের সবগুলিই অপূর্ব সুরূপা হইলেও শ্রীশ্রীরাজ-রাজেশ্বরী বা ষোড়শী মূর্তির সৌন্দর্যের সহিত

১ তন্ত্রতত্ত্ব, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃঃ ১০২
২ সাধকভাব, একাদশ অধ্যায়, ১৩৭৭ সংস্করণ, পৃঃ ২১৪

তাঁহাদিগের রূপের তুলনা হয় না—একথা আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন—'ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্তির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্দর্য গলিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম।' ”

কালীই ষোড়শী। নারদপঞ্চরাত্রে[৩] এ-সম্বন্ধে সুন্দর একটি কাহিনী আছে। একবার স্বর্গের অপ্সরারা কৈলাসে মহাদেবকে দর্শন করতে যান। শিব তাঁদের সামনেই দেবীকে কয়েকবার 'কালী' 'কালী' বলে ডাকেন। এতে দেবী লজ্জা পেয়ে মনে মনে স্থির করলেন যে, কালীরূপ ত্যাগ করে তিনি গৌরীরূপ ধারণ করবেন। যেমন সঙ্কল্প তেমন কাজ। তাই গৌরীরূপ ধারণের সঙ্কল্প নিয়ে তিনি কৈলাস থেকে অন্তর্হিতা হলেন। ফলে শিব তখন কৈলাসে একা রয়েছেন। এমন সময়ে একদিন নারদ কৈলাসে এসে উপস্থিত। শিবকে একা দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, দেবী শিবকে ত্যাগ করে অন্তর্হিতা হয়েছেন। নারদ তখন ধ্যানস্থ হলেন এবং ধ্যানযোগে জানতে পারলেন যে, দেবী সুমেরুর উত্তর দিকে অবস্থান করছেন। নারদ তখন সেখানে গিয়ে হাজির হলেন এবং অনেক স্তব-স্তুতি করে দেবীকে প্রসন্না করলেন। তারপর দেবীকে বললেন, মহেশ্বর আবার বিয়ের উদ্যোগ করছেন, তুমি শিগ্‌গির কৈলাসে গিয়ে তা বন্ধ কর। নারদের কাছ থেকে একথা শুনে দেবী তখন এমন এক সুন্দর রূপ ধারণ করলেন কোথাও যার তুলনা মিলে না, এবং কালবিলম্ব না করে মুহূর্তমধ্যে কৈলাসে শিবসন্নিধানে উপস্থিত হলেন ও শিবের হৃদয়ে নিজের ছায়া দেখতে পেলেন। কিন্তু এ ছায়া যে তাঁর নিজেরই তা বুঝতে না পেরে ভাবলেন ইনি বোধহয় অন্য কোন নারী হবেন। তাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়ে শিবকে অকৃতজ্ঞ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ইত্যাদি বলে তিরস্কার করতে লাগলেন। শিব বললেন, শুধু শুধু তুমি আমাকে তিরস্কার করছ কেন? ধ্যানস্থ হয়ে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ। দেখবে, আমার হৃদয়ে তোমারই ছায়া, অন্য কারুর নয়। শিবের কথানুযায়ী ধ্যানস্থ হয়ে দেবী শিবের হৃদয়ে নিজের ছায়া দেখতে পেয়ে শান্ত হলেন এবং শিবকে এই ছায়ার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে শিব বললেন—ত্রিভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করেছ বলে তুমি স্বর্গে মর্তে অনন্তা সুন্দরী পঞ্চমী 'শ্রী', এবং ত্রিপুরসুন্দরী নামে অভিহিত হবে; আর সর্বদা ষোড়ববর্ষীয়া বলে ষোড়শী বলে খ্যাত হবে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-সঙ্কলিত 'বৃহৎ তন্ত্রসার'[৪] গ্রন্থে 'মহাকাল সংহিতা' থেকে গৃহীত শ্রীশ্রীষোড়শী মহাবিদ্যার একটি সুদীর্ঘ কবিত্বময় ধ্যান আছে। তবে সাধারণ পূজায় এই ধ্যানমন্ত্র পাঠ করা হয় না। নিত্যব্যবহার্য হিসাবে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত ধ্যানমন্ত্রটিই প্রচলিত।

**মন্ত্রটি এরূপ:**

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশ-শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে॥

দেবীর দেহকান্তি উদয়কালীন সূর্যমণ্ডলসদৃশ, ইনি চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, চার হাতে পাশ, অঙ্কুশ, (পঞ্চ) শর ও ধনু ধারণ করে আছেন। এই মঙ্গলময়ী দেবীকে আমি আশ্রয় করেছি, আমি তাঁর শরণ নিচ্ছি।

এবার আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজার প্রসঙ্গে আসি। তাঁর জীবনীপাঠকদের সকলেরই জানা আছে বাংলা ১২৮০[৫] সনের ফলহারিণী

৩ প্রাণতোষিণী তন্ত্র, ৫ম কাণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৭-৭৮
৪ ৬ষ্ঠ বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ২৮২-৮৩
৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, বিংশ অধ্যায়, ১৩৭৭ সংস্করণ, পৃঃ ৩৬৫

কালীপূজার পুণ্য দিনটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী-পূজা সম্পন্ন করেছিলেন। তবে এ পূজা সাধারণ পূজা থেকে ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরনের। পূজা তিনি মন্দিরে করেননি, বা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মূর্তি, ঘট, পট বা অন্য কোন যন্ত্রেও দেবীর আবির্ভাব কল্পনা করে করেননি; পূজা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে, এবং এক মানবীর দেহাবলম্বনে তাঁতে আদ্যাশক্তির অবতরণ ঘটিয়ে। যে মানবীর দেহাবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ আদ্যাশক্তির অবতরণ ঘটিয়ে পূজা করেছিলেন, সেই মানবী তাঁরই সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। পূজাকালে "সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।'"[৬] শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন "আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জন পূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।··· মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল।"[৭] ধর্মজগতের ইতিহাসে এরূপ পূজার আর দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিচিত্র পূজানুষ্ঠানের তাৎপর্য সম্বন্ধে 'শ্রীমা সারদাদেবী'[৮] গ্রন্থে আছে, "ক্ষুদ্র বালিকাকে (শ্রীশ্রীমাকে) ঠাকুর পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কামারপুকুরে অবস্থানের সুযোগে তাঁহাকে দিব্যপ্রেমের আস্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে লৌকিক ও দেবজীবনোচিত অপূর্ব সম্পদরাশিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। অধুনা নারীর দেবীত্বের উদ্বোধনের সময় সমাগত। যাঁহাকে ঠাকুর অতঃপর স্বীয় লীলা সম্পূরণের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাঁহাকে অন্তরের পূজা প্রদানপূর্বক নিজসকাশে ও জনসমাজে সম্মানিত ও মহিমমণ্ডিত এবং সেই দেবীকে স্বীয় শক্তি বিষয়ে অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই ষোড়শী-পূজার আয়োজন।"

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিকে যেমন "তাঁহাকে···নিজসকাশে ও জনসমাজে সম্মানিত ও মহিমমণ্ডিত এবং সেই দেবীকে স্বীয় শক্তি বিষয়ে অবহিত"—করে তাঁর দেবীত্বের উদ্বোধন করেছিলেন, অপরদিকে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে। এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। তা থেকে সংঘের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে তথা সংঘজননীরূপে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ভূমিকা কত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। শ্রীশ্রীমা বুদ্ধগয়ায় গেছেন। ওখানকার মঠের অতুল ঐশ্বর্য, অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের স্থায়ী আশ্রয়ের অভাব, অবর্ণনীয় কষ্ট ও মঠপরিচালনের জন্য অসীম দৈহিক ক্লেশ ইত্যাদির বিপরীত চিত্র সংঘজননীকে বিচলিত করে তুলেছিল। পরবর্তিকালে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: "ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে, আনন্দ

৬ ঐ, পৃঃ ৩৬৬ ৭ ঐ, পৃঃ ৩৬৬-৬৭

৮ স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৪

করে চলে গেলে; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আমার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই।...আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়।...আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এই জন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে।"[৯]

শ্রীশ্রীমায়ের উপরি-উক্ত কথাগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর অসীম মাতৃস্নেহ ও সংঘপ্রীতি, সংঘের বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর স্থির-নিশ্চয় এবং স্থায়ী মঠস্থাপনের আকুল আগ্রহ। এ-সব আশা-আকাঙ্ক্ষা যে শুধু তাঁর মনে উঠেই বিলয়প্রাপ্ত হয়েছিল তা নয়, যতদিন তিনি মর্তধামে ছিলেন সংঘ যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হয় তার প্রতিও ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমকে কেন্দ্র করে। স্বামীজীর জীবনী-পাঠকরা জানেন, স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল এমন একটি আশ্রম হবে যেখানে অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপাদি-বিরহিত শুদ্ধ অদ্বৈত সাধনা চলতে থাকবে, ও যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিষ্যবৃন্দ পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলবেন এবং উভয় ভূখণ্ডের ভাবরাশির আদান-প্রদানের অবকাশ পাবেন। তাঁর এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম সেভিয়ার-দম্পতির আনুকূল্যে। এই আশ্রমবাসীদের একজনের মনে দ্বৈতবাদের দিকে ঝোঁক ছিল। এক্ষেত্রে অদ্বৈত আশ্রমের সদস্য হওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে সন্দিহান হয়ে তিনি সর্বোচ্চ-বিচারকরূপে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে মীমাংসা চেয়েছিলেন। মাতাঠাকুরানী তাতে উত্তর দেন, "গুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী; তিনি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তোমরা তাহলে অদ্বৈতবাদ অনুসরণ কর না কেন? তাঁর সকল শিষ্যই অদ্বৈতবাদী।"[১০]

সংঘ-পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিরত না থাকলেও শ্রীশ্রীমা এভাবে সিদ্ধান্ত-পরামর্শ দিয়ে, আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করে এবং সর্বোপরি জননীর স্নেহ-ভালবাসার প্রভাব দৃঢ়তর করে সংঘের গতি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করতেন।

সর্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্বসৌভাগ্যসুন্দরীম্।
সর্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্বশক্তিময়ীং শিবাম্ ॥—

সর্বমন্ত্রময়ী, সর্বসৌভাগ্যদায়িনী এবং সর্বলক্ষ্মী ও সর্বশক্তিস্বরূপ, আর সর্বোপরি সর্বমঙ্গলময়ী শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা ষোড়শীরূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদা আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করুন।

৯ শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৪

১০ একটি ঐতিহাসিক পত্র, অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, উদ্বোধন, ৭৪ বর্ষ, পৃঃ ৫০৮

# বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার: পঞ্চম ও শেষ দিনের কথা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

হেমচন্দ্রের সঙ্গে পঞ্চম বার আমি দেখা করেছিলাম ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। সেটি আমার তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। যাওয়ামাত্র হেমচন্দ্র বললেন: 'আপনি এসেছেন, এই নিন আপনার লেখা।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, আমি হেমচন্দ্রকে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন অনুরোধ করেছিলাম 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' বিষয়ে তিনি যদি একটি প্রবন্ধ আমাকে দেন। জানতাম প্রবন্ধ লেখা তাঁর পক্ষে তখন সম্ভব নয়। তাই তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম তিনি বলে যাবেন, একজন কেউ লিখে নেবেন। দরকার হলে আমি নিজে এসেও তাঁর কথা লিখে নিতে পারি। তারপর তিনি সেই লেখাটিতে স্বাক্ষর করে দেবেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন লিখে নেবার জন্য আমার আসার দরকার নাই। তিনি অন্য কাউকে দিয়ে তাঁর বক্তব্য লিখিয়ে নেবেন এবং তাতে থাকবে তাঁর স্বাক্ষর। এদিন যাওয়ামাত্র তাঁর স্বাক্ষরিত (তারিখ ২৩ এপ্রিল ১৯৭৮) সেই প্রবন্ধটি তিনি আমার হাতে দিলেন। মোটামুটি বেশ বড়ই প্রবন্ধটি। দেখলাম তাতে রয়েছে স্বামীজীর সঙ্গে যখন তাঁরা সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন স্বামীজী তাঁদের কী বলেছিলেন সেকথা—যার কিছু অংশ তখনও অপ্রকাশিত, তাঁর নিজের জীবনে ও ভারতের জাতীয় জীবনে ও মুক্তি সংগ্রামে স্বামীজীর প্রভাব; নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র (চট্টোপাধ্যায়), সূর্য সেন, বাঘাযতীন, সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে তাঁর কিছু মন্তব্য এবং সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তাঁর অসাধারণ কয়েকটি বাক্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন: 'স্বামীজীর মতো এমন চরিত্র, এমন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ কোন দেশে জন্মেছেন বলে আমি জানি না। এই বিরাট পুরুষের বিচিত্র কর্মজীবনের নেপথ্যে যে মহাপুরুষের শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল, যাঁর প্রেরণা তাঁকে আজীবন পরিচালিত করেছে তিনি হলেন তাঁর গুরু, বাঙলার গুরু, ভারতের গুরু, জগতের গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে সেই মহাসাধক ভবতারিণী মৃন্ময়ী মূর্তির মধ্যে দেশমাতৃকার চিন্ময়ী সত্তাকে আবাহন করেছিলেন, পাথরের প্রতিমার মধ্যে সর্বৈশ্বর্যময়ী জগন্মাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর জাগ্রত করেছিলেন লেভিয়াথানের মতো বিরাট, হাজার বছর ধরে নিদ্রিত এই জাতটার কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে। তাঁর সেই শক্তি-সাধনার হোমাগ্নি থেকেই যজ্ঞপুরুষ বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়ে ভারতবর্ষকে উত্তোলন করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের শক্তিই স্বামীজীর ভিতর দিয়ে কাজ করেছে। তাঁর শিক্ষা এবং দীক্ষায় এই অপূর্ব পুরুষের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে মূল পুরুষ তাই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। সারা পৃথিবীর জাগরণের ক্ষেত্রেও তাই। বিবেকানন্দ সেই জাগরণের প্রক্রিয়ায় দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় গতিবেগ, প্রাণশক্তি, লক্ষ্যমুখীনতা এবং পথনির্দেশ। এই দুই মহাপুরুষ যে কী ছিলেন এবং তাঁরা যে ভারতবর্ষকে এবং জগৎকে কী দিয়ে গিয়েছেন তা উপলব্ধি করতে আমরা এখনও কেউ পারিনি—এখনও বহু যুগ লাগবে।'

ঐ প্রবন্ধের প্রথমেই দেখলাম স্বামীজীর সঙ্গে

তাঁদের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলছেন : 'বীর সন্ন্যাসীর কাছে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের পথনির্দেশ চাইতে। সারা ভারতবর্ষে তিনিই তখন সবচেয়ে আলোড়নকারী ব্যক্তিত্ব, পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু, মুক্তির মন্ত্রচৈতন্য-দাতা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সেই দিনটি আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ। সেদিন স্বামীজী পরম স্নেহে কাছে বসিয়ে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। ক্ষাত্রতেজের জলন্ত মূর্তি, বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে, তাঁর মুখ থেকে সরাসরি তাঁর অগ্নিবাণী শুনছি—একথা স্মরণ করলে এখনও সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেদিন সেই পুরুষসিংহের মুখ থেকে নির্গত বীরবাণী আমাদের দেহে-মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সে তো শুধু বাণী নয়—মন্ত্র যা অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করে।…স্বামীজীকে যখন আমি দেখেছিলাম তখন আমার বয়স, আঠারো-উনিশ বছর। আজ আমার বয়স পঁচানব্বই-ছিয়ানব্বই। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের স্মৃতি আজও আমার কাছে গতকালের ঘটনার মতো স্পষ্ট। স্বামীজীর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম প্রচণ্ড দেশ-প্রেমের প্রকাশ। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আমার দেশপ্রেমের প্রকৃত শিক্ষা তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হয়ে বুঝেছিলাম দেশের প্রতি ভালবাসা কাকে বলে। ভারতবর্ষের প্রকৃত জাগরণ এনেছিলেন তিনিই।' তাঁর উপরোক্ত মন্তব্যের শেষ বাক্যটির সূত্র ধরে হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বলছেন : 'ভারতবর্ষের প্রকৃত জাগরণ এনেছিলেন স্বামীজী'। 'জাগরণ' বলতে আপনি কি এখানে 'জাতীয় জাগরণের' কথা বলতে চাইছেন ?

হেমচন্দ্র : হ্যাঁ।

আমি : গান্ধীজী, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয় নেতাদেরও তো ভারতবর্ষের জাগরণে বিরাট অবদান আছে। আপনি শুধু স্বামীজীর সম্পর্কে ওকথা বলতে চাইছেন কেন ?

হেমচন্দ্র : তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করছি না। আমি বলছি, স্বামীজীই এনেছিলেন প্রথম জাতীয় জাগরণ এবং আমি মনে করি সেটাই প্রকৃত জাগরণ। গান্ধীজী, তাঁর পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন জননায়ক নয়, ভারতের জাতীয় জাগরণের প্রকৃত অভীপ্সাকে প্রস্ফুটিত করে দিয়েছিলেন স্বামীজী। স্বামীজীর সমসাময়িক বা পরবর্তিকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে যাঁরা পরিচালিত করেছিলেন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বামীজীর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। তিলক, সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, অরবিন্দ, বিপিন পাল, গোখলে, লাজপৎ রায়, রাজা গোপালাচারী, বাঘাযতীন, সূর্য সেন, সি. আর. দাশ, সুভাষচন্দ্র, জহরলাল চরমপন্থী নরমপন্থী সমস্ত নেতা এবং আমাদের মতো অসংখ্য সাধারণ সৈনিক যাঁরাই দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলাম, সবার পেছনে অনিবার্যভাবে ছিলেন স্বামীজী, ছিল তাঁর প্রেরণা, তাঁর আশীর্বাদ।

এই কথার সূত্রে তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক বিখ্যাত নেতার ভূমিকাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেন : 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে যত বড় নেতার আসন আমরা তাঁকে দিই না কেন, ব্রিটিশ সরকার কিন্তু তাঁকে ভয় পেত না। এটা শুধু আমার কথা নয়। ইতিহাসও সেকথাই বলবে। একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক কি বলছেন দেখুন।' অতঃপর তিনি মাইকেল এডওয়ার্ডস-এর লেখা 'দি লাস্ট ইয়ারস অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করলেন এবং তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে বইটি আমাকে তৎক্ষণাৎ দিয়ে এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা

(৪৭-৪৮) উল্লেখ করে তা মিলিয়ে নিতে বললেন। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম তাঁর স্মৃতি অসাধারণভাবে নিখুঁত। ঐ ঐতিহাসিকের মন্তব্যের সূত্র ধরে হেমচন্দ্র অতঃপর বললেন: 'ইংরেজ রাজশক্তি ভারতবাসীকে নৈতিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সকল দিক দিয়ে চিরকালের জন্যে পরাধীন করে রাখার যে সুদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল তা স্বামীজীই সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন এবং জাতিকে সেই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন। সেজন্যেই দেখবেন, আমি আমার প্রবন্ধে বলেছি, "বস্তুতঃ, স্বামীজী আমাদের চোখে ধর্মনায়কের থেকে স্বাধীনতার ঋষি, স্বাধীনতার মন্ত্রচৈতন্যদাতা হিসাবেই যেন বেশী প্রতিভাত হয়েছিলেন। দেশের পরাধীনতার বেদনা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। তাঁর বাণীতে সেই বেদনা আগুনের মতো ঝলসে উঠত, যার উত্তাপ জাতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল প্রচণ্ডভাবে। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর বাণী ও রচনাই ভারতবর্ষের বিশেষ করে অবিভক্ত বাঙলার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছিল। গীতা এবং স্বামীজীর রচনা সমস্ত মুক্তি-সংগ্রামীদের কাছেই ছিল বাইবেল—পরম পবিত্র বস্তু। আমাদের যুবক-বয়সে আমরা শুধু ঐসবই পড়েছি। পুলিশ যখনই মুক্তি-সংগ্রামীদের ঘর-বাড়ী অনুসন্ধান করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেয়েছে স্বামীজীর ছবি অথবা রচনার সন্ধান। এমনকি স্বামীজীর রচনা কোন যুবক-যুবতীর কাছে পাওয়া গেলেই বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ সন্দেহাতীত বলে পুলিশ মনে করত।"'

আমি বললাম: গত দিন আপনার শেষের কথাগুলি আমাকে খুব অভিভূত করেছে

হেমচন্দ্র: কি বলেছিলাম আমি?

আমি: আপনি বলেছিলেন, 'এই অসাধারণ মানুষটিকে আমি দেখেছি। জীবনে আর দ্বিতীয় একজন মানুষকেও দেখিনি যাকে স্বামীজীর পাশে দাঁড় করাতে পারি। গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম যখন আমার দেখা হয় তখন দেখলাম তাঁকে সবাই প্রণাম করছেন। কিন্তু আমি করিনি। একজন সে বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেন গান্ধীজীকে প্রণাম করার কথা। আমি বললাম: আমার এই দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমি স্বামী বিবেকানন্দের চরণ স্পর্শ করেছি। আমার এই দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আর কারও পা আমি স্পর্শ করতে পারব না। যে মস্তক স্বামী বিবেকানন্দের চরণতলে নত হয়েছে সে মস্তক আর কোথাও নত হবে না। জীবনে কখনও আর কাউকে প্রণাম করিনি, আর কারও পায়ে মাথা নোয়াইনি।'

হেমচন্দ্র গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন: 'আমি তাঁকে দেখেছি। আমি তাঁর পা ছুঁয়েছি। আমার মাথায়, পিঠে তাঁর অগ্নিস্পর্শ এখনও যেন অনুভব করছি আমার জীবনের চরম ক্ষণ সেই মুহূর্তগুলি যখন স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে দেশকে ভালবাসতে আমি শিখলাম, পরাধীনতার বেদনা যে কত মর্মদাহী হতে পারে তা তখন প্রাণের গভীরে অনুভব করলাম। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম ধর্মের কথা শুনব বলে। কিন্তু কী কথা যে সেদিন শোনালেন তিনি! আমাদের চোখ খুলে দিলেন। বুকের মধ্যে আগুন জ্বেলে দিলেন। সে আগুন আজও জ্বলছে হৃদয়ে। সে আগুনের নাম বিবেকানন্দ। সে আগুনের নাম ভারতবর্ষ। আসমুদ্র-হিমাচল অবিভক্ত ভারতবর্ষ। সে ভারতবর্ষকে শুধু বৃটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত করতেই নয়, তাকে বিশ্বের সভ্যতার সমাবেশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার, তাকে রাণীর আসনে অধিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমাদের উপর, সেদিনের তরুণ ও যুবক

সমাজের উপর, স্বামীজী অর্পণ করেছিলেন। সেই উত্তোলনের সূচনা বলিষ্ঠভাবে তিনিই করে গিয়েছিলেন। আমাদের উপর ভার ছিল উত্থানের সেই রথচক্রের গতিকে অব্যাহত রাখার। কিন্তু আমরা কি তা পেরেছি? পেরেছি কি তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করতে? পেরেছি কি তাঁর পতাকাকে ঠিকমতো বইতে? প্রায় একটা পুরো শতাব্দীর ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহকে চোখের সামনে তো দেখলাম। আমাদেরকে বাতিল করে দিয়ে তিনি এবার হয়তো আজকের বা আগামী দিনের যুবসমাজের ভিতর থেকে তাঁর সৈনিকদের বেছে নেবেন। কামাখ্যা মিত্রের কাছে শুনেছিলাম স্বামী সারদানন্দ নাকি একথাটা বলতেন। কামাখ্যা মিত্রের কাছে শুনেছিলাম যে স্বামীজীকে তিনি বলতে শুনেছেন, "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পঞ্চাশের দশকে পৌঁছানোর আগেই জাগ্রত ভারতবর্ষ ইংরেজকে তল্পিতল্পা সমেত ইংলণ্ডে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তারপর ক্রমে সে বিশ্ব-সভায় আপন মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।" বিবেকানন্দের স্বপ্ন কী অপূর্ণ থাকবে? তাঁর "মিশন" কী অচরিতার্থ হতে পারে? শক্তি, প্রেরণা, ভরসা সবই তো তিনিই যোগাবেন। অযোগ্য আমরা—তা পেয়েও হারিয়েছি। বিবেকানন্দ নিখাদ, নির্ভেজাল, নিটোল মানুষ চেয়েছিলেন—বেশী নয়, একশটা মাত্র ;..যে মানুষের কোথাও কোন মেকী থাকবে না। হায়! সে শর্ত আমরা পূর্ণ করতে পারিনি। অনেক প্রতিশ্রুতিময় মানুষ এসেছেন দেশের কাজ করবেন বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনীতির পঙ্কিলতা, তুচ্ছ স্বার্থ, সংকীর্ণতার আবর্তে মনুষ্যত্ব হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন। দেশপ্রেমিকের যে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ বিবেকানন্দ দাবী করেছিলেন আমরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি তা পূর্ণ করতে। কিন্তু বিবেকানন্দ এখনও মরেননি। মরতে তিনি পারেন না। ভারতবর্ষকে—তাঁর জীবনসর্বস্ব ভারতবর্ষকে—তাঁর যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত না দেখে তিনি যে স্বস্তি পেতে পারেন না। ভারতবর্ষের জন্যে তাঁর উন্মাদনা যে কত তীব্র ছিল তা যে আমরা চোখের সামনে দেখেছি। উঃ ভারতের জন্যে কী তাঁর ব্যাকুলতা, কী তাঁর যন্ত্রণা!

'তাঁর সেই ব্যাকুলতা ব্যর্থ হয়নি। ভারতবর্ষ সেদিন জেগেছিল। তাঁর জীবন ও বাণীতে পেয়েছিল আলোর সন্ধান, এগিয়ে চলার মন্ত্র। সেই আলো আজও আমাদের পথ দেখাবে, সেই মন্ত্র আজও আমাদের শক্তি যোগাবে আগামী দিনের ভারত গড়ার কাজে। বিবেকানন্দের অনুগামী আমি। আমি তাই আশাবাদী। আজ আমাদের সামনে দেশের যে অবস্থা দেখছি, তা সত্য নয়। যা আসছে সামনে তাই হবে সত্য। এখন চলছে ক্রান্তিকাল। এ আমাদের সামনে একটা বিরাট পরীক্ষা—একটা বিরাট প্রশ্ন। আমরা আমাদের ঘরের সম্পদের দিকে চোখ ফেরাব, না বাইরের হাওয়ায় ভেসে যাব? এখন আমাদের আত্মস্থ হতে হবে। স্বামীজীর বাণীতেই আমরা পাব আমাদের আত্মস্থ হবার মন্ত্র। আমি মনে করি এখন শুধু মন্থন চলছে। এই কোলাহল, এই বিভ্রান্তি থেকেই একদিন অমৃত উঠবে। এটি আমার বিশ্বাস, আমার প্রত্যয়।'

হেমচন্দ্রের ঘরে একজন ঢুকলেন। বছর সত্তর বয়স হবে। তিনি এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন হেমচন্দ্রকে। আমাকে নমস্কার করলেন। নাম বললেন হরিপদ চক্রবর্তী। বললেন: 'কাছেই থাকি। বড়দার কাছে রোজই একবার আসি। আমি শুনেছি আপনি আগেও কদিন এসেছেন। কিন্তু আমি বিকেলের দিকে কদিন এসেছি বলে আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি সকালের দিকে এসেছেন। (আমাকে

অস্বচ্ছ স্বরে বললেন যাতে হেমচন্দ্র শুনতে না পান ) বড়দার কাছেই আমার বিপ্লব-জীবনের হাতে খড়ি। তিনি আমার বিপ্লব-জীবনের গুরু। শুধু আমি কেন—আমি তো সাধারণ কর্মী। আমার মতো অসংখ্য সাধারণ কর্মীর কথা ছেড়ে দিন। কত বড় বড় বিপ্লবী নেতার গুরু বড়দা। আর, বড়দা আর আমাদের সকলের বিপ্লব-গুরু "বিবেকানন্দ"।'

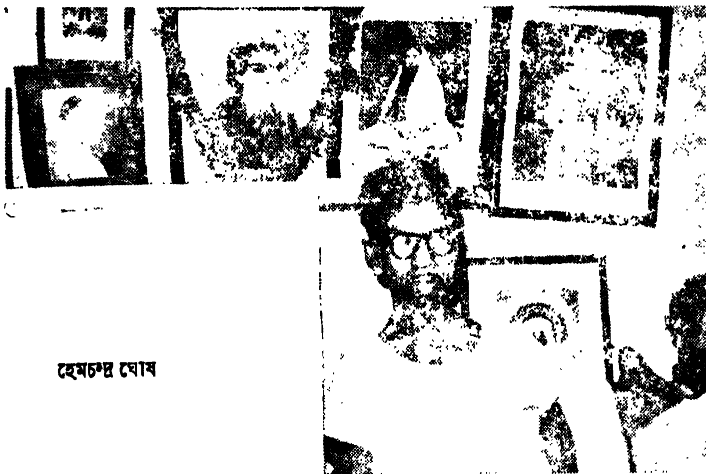
হেমচন্দ্রের মুখেও এই কদিন কতবার শুনেছি স্বামীজীর কাছে তাঁরা—বিপ্লবীরা—পেয়েছেন পথের আলো। এগিয়ে চলার মন্ত্র। আজও বলছিলেন সেই কথা। সম্প্রতি হেমচন্দ্র সম্পর্কে একজনের কাছে একটি কথা শুনলাম। এপ্রসঙ্গে সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে। বেশ কিছুকাল আগে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে গিয়েছিলেন হেমচন্দ্র। রাত্রে সেখান থেকে একাই বাড়ি ফিরছেন। পথে একটা গলি পড়ে। গলিটা ছিল অন্ধকার। আত্মীয়দের দু-একজন তাই তাঁর সঙ্গে আসতে চাইলেন তাঁকে আলো নিয়ে গলিতে এগিয়ে দিতে। সেকথা তাঁকে বলতে খুব বিরক্ত হলেন হেমচন্দ্র। বললেন: 'রাখ! আমাকে আর তোদের আলো দেখাতে হবে না। আমাকে কে আলো দেখায় জানিস? স্বামী বিবেকানন্দ। তোরা আমাকে কি এগিয়ে দিবি? আমাকে এগিয়ে নিয়ে যান স্বামী বিবেকানন্দ।' বিবেকানন্দ নামক সেই আগুন কিভাবে মানুষকে জ্বালায়, কিভাবে পোড়ায়, পুড়িয়ে নতুন করে গড়ে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হেমচন্দ্র ঘোষ। চোখের সামনে তাঁকে দেখেছি বিবেকানন্দ নামক আলোকস্তম্ভ কিভাবে হেমচন্দ্রকে আলোকদীপ্ত করে রেখেছেন।

হেমচন্দ্রের মুখ থেকে শোনা তাঁর প্রত্যয়ের কথা, এবং যে উষ্ণতা ঢেলে কথাগুলি তিনি উচ্চারণ করছিলেন তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করছিল। এর আগে চারদিন তাঁর কাছে অবাক হয়ে শুনেছি তাঁর জীবনের কোন্ গভীরতাকে স্পর্শ করে রয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। শুনেছি ভারতের জাতীয় জাগরণ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামীজীর অবদান সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত, এবং মৌলিক বিশ্লেষণ।

হেমচন্দ্র হঠাৎ বললেন: 'আর একটা কথা বলি, যেটা সেদিন আমরা বিপ্লবীরা অনেকেই তলিয়ে দেখিনি, দেখার বোধ হয় অবসর ছিল না, অথবা বলা উচিত দেখার যোগ্যতা ছিল না, তা হল ভারতবর্ষের এই নবজাগরণের কেন্দ্রীয় পুরুষটি হলেন রামকৃষ্ণদেব। জানি না, বর্তমান ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে কি বলবেন। মনে হয় এখনও এদিকটায় বিশেষ কারুর দৃষ্টি পড়েনি। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময়ের দূরত্বও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের নবজাগরণ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে যখন গবেষণা হবে তখন এই তথ্যটিই উদ্ঘাটিত হবে যে ভারতবর্ষের জীবনে গত শতাব্দীতে যে বিপ্লব-তরঙ্গ উদ্ভূত হয়েছিল তার শীর্ষে ছিলেন এই ব্যক্তিটি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন তিনিই। তাঁর আগে ইতিহাসের দিক দিয়ে কিছু বিশিষ্ট পুরুষ যাঁরা এসেছেন তাঁরা হলেন তাঁর, ইংরেজীতে যাকে বলে, "হেরাল্ড" (herald)। যে বাণী তিনি নিয়ে আসবেন, যে চেতনা তিনি সঞ্চার করবেন তার জন্যে তাঁরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন অনবদ্য দক্ষতার সঙ্গে। সম্রাট যখন দরবারে আসেন তখন তাঁর আগে দূত আসেন, ঘোষক আসেন। তাঁরা ইঙ্গিত দেন, তাঁরা জানিয়ে দেন যে সম্রাট আসছেন। আমি ঐতিহাসিক নই, পণ্ডিত নই। কিন্তু রামকৃষ্ণ-

দেবের জীবৎকালে এবং তাঁর তিরোধানের পর থেকেই যে ভারতবর্ষের পট-পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে সেটা আমার চোখে এখন ধরা পড়ছে। আরও পঞ্চাশ বা একশ বছর পরে জিনিসটি আরও পরিষ্কার হবে বলে আমার বিশ্বাস। ভারতবর্ষের জাগরণের মধ্যমণি যে শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যটি ক্রমশঃ ইতিহাসের পণ্ডিতদের নজরে আসবেই। যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তাঁদের ইতিহাস "ইতিহাস" নয়।'-

প্রথম যেদিন হেমচন্দ্রকে তাঁর ঘরে দেখেছিলাম সেদিন থেকেই একটা প্রশ্ন,একটা কৌতুহল আমার মনে জেগেছিল এবং যত তাঁর কথা শুনেছি ততই সেটা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। শেষ দিন তাঁর স্বাক্ষরিত প্রবন্ধটির উপসংহারে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং সাধনার তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য দেখে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্যটি শোনার পর আমার কৌতূহলটি তীব্রতর হয়ে উঠল। প্রসঙ্গ একটা পেয়ে গেলাম বলে সরাসরি তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখলাম। আমার কৌতূহলটি হল: প্রথম দিনেই লক্ষ্য করেছিলাম, ওঁর ঘরের দেয়ালে বেশ কয়েকখানা ফ্রেমে বাঁধানো বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির ফটো টাঙানো রয়েছে যথা স্বামী বিবেকানন্দ, সারদাদেবী, নিবেদিতা, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র এবং (যতদূর মনে পড়ছে) নজরুল। সারদাদেবী, স্বামীজী, নিবেদিতা এবং সুভাষচন্দ্রের ফটোগুলি বড় সাইজের। এছাড়া স্বামীজী এবং সুভাষচন্দ্রের আরও একটা করে অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজের দুখানি ভিন্ন ভঙ্গীর ফটোও রয়েছে ঘরে। লক্ষ্য করলাম যে একমাত্র স্বামীজী এবং নেতাজীরই একের বেশি ফটো ঐ ঘরে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে হেমচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঘরে তাঁর ফটোর অনুপস্থিতিটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে সারদাদেবীর একটি বড় ছবি যখন তাঁর ঘরে রয়েছে। শুধু রয়েছে বললে কম বলা হল। কারণ ছবিটি যেখানে টাঙানো রয়েছে তাতে অনুমান হয় যে, তাঁর প্রতিই হেমচন্দ্রের শ্রদ্ধা সর্বাধিক। হেমচন্দ্রের শয্যার শিয়রের ঠিক সোজা দেয়ালে টাঙানো রয়েছে সারদাদেবীর সেই পরিচিত ছবিটি যে ছবি মঠে মন্দিরে,


হেমচন্দ্র ঘোষ

ভক্তজনের ঘরে ঘরে পূজিত হয়ে থাকে। তাঁর ছবির এক পাশে রয়েছে স্বামীজীর একটি বহু-পরিচিত ছবি, আর এক পাশে নিবেদিতার সর্বজনপরিচিত বিখ্যাত ছবি। সবেমাত্র কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের সূত্র ধরে হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'কিন্তু আপনার ঘরে এতগুলো ফটো রয়েছে, সারদাদেবী, স্বামীজী এবং নিবেদিতার ফটো রয়েছে—কই, রামকৃষ্ণদেবের কোন ফটো দেখছি না তো?' উত্তরে হেমচন্দ্র মৃদু হেসে প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে বললেন: 'ঠাকুরের ছবি! কোথায় রাখব তাঁকে বলুন? তাই তাঁকে হৃদয়ে (নিজের বুকে দু-হাত ঠেকিয়ে) রেখেছি। (যুক্ত করে প্রণাম জানিয়ে) তিনি যে কী, তিনি যে কে তা বোঝার ক্ষমতা আমার নাই। শুধু এইটুকু জানি যে, তিনি স্বামীজীর স্রষ্টা, তাঁর সমস্ত শক্তির উৎস। যে শক্তিতে সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়েছিল, যে শক্তিতে ভারতের কয়েকশ বছরের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেছিল সেই শক্তির মূল তিনি। যাঁর সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতো মানুষ বলেছিলেন তাঁর মতো লাখ লাখ বিবেকানন্দ ঠাকুর একমুঠো ধুলো নিয়ে মুহূর্তে করতে পারতেন। তাহলে বুঝুন ব্যাপারটা! তাঁকে কি আমরা ধারণা করতে পারি! স্বামীজীকে দেখে, তাঁর জীবন, বাণী এবং কর্মের বিচিত্র প্রভাব দেখে আমার মনে হয়েছে যে, দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে রামকৃষ্ণদেব শুধু বিবেকানন্দেরই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দেননি, তিনি ওখানে বসে স্বামীজীর মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের কুলকুণ্ডলিনীকেই জাগ্রত করে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের নবজাগরণের মন্ত্রপুরুষ তাই শ্রীরামকৃষ্ণ, নায়ক বিবেকানন্দ—যোগেশ্বর রামকৃষ্ণদেব, ধনুর্ধারী বিবেকানন্দ। দক্ষিণেশ্বরে শক্তিপীঠে যে হোমানল জ্বালিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব তা থেকে উত্থিত হয়েছিলেন যজ্ঞপুরুষ বিবেকানন্দ। সকলের অলক্ষ্যে, লোকলোচনের অন্তরালে, নীরবে নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে নিরক্ষর পূজারীর ছদ্মবেশে যুগাবতার নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বিবেকানন্দকে—ভবিষ্যৎ ভারতের সেই মহান রূপকারকে—তিল তিল করে নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধির অগম্য সেই অসীম পুরুষোত্তমকে ছবির মধ্যে সীমায়িত দেখতে তাই মন চায় না। তাই তাঁর কোন ছবি আমি রাখিনি। তিনি আছেন আমার মাথায়, আমার হৃদয়ে, আমার চিন্তা ও চেতনায়।

'জিজ্ঞাসা করছিলেন মায়ের ছবি রেখেছি—হ্যাঁ, মায়ের ছবি রেখেছি আমি। ("মা"—এই শব্দটি তিনি খুব আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করছিলেন) যদিও আমি মনে করি মায়ের স্বরূপ বোঝা আরো কঠিন। কারণ স্বয়ং ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: "ও কি যে সে! ও আমার শক্তি। ওর শক্তির আলোতেই আমি শক্তিমান।"[১] দেখুন, স্বামীজী বলছেন তাঁর শক্তির উৎস ঠাকুর, আর ঠাকুর বলছেন তাঁর শক্তির উৎস মা। অর্থাৎ স্বামীজীর শক্তির উৎসেরও উৎস তিনি। স্বামীজী তো তাই মাকে ঠাকুরের উপরে স্থান দিতেন। সে তো আপনারা ভাল করেই জানেন। বলতেন "জ্যান্ত দুর্গা"। এমনি যে দুর্গার চিত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে তা কল্পনা করতেই মাথা ঘুরে যায়। আবার জ্যান্ত দুর্গা! সুতরাং মা যে কী তা ধারণা করা অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু তবু কেন রেখেছি তাঁর ছবি মাথার উপরে জানেন? মাকে আমার ভাল লাগে। মা কী, মা কত বড় তা বুঝি না। বোঝার আকাঙ্ক্ষাও নাই। শুধু বুঝি তিনি মা।'

১ সারদাদেবীর প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ অনুযায়ী উক্তিটি হল: 'ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।' শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৮৪), পৃঃ ১২৭।

প্রশ্ন করেছিলাম : মায়ের কথা বিপ্লবী জীবনে কি কিছু জানতেন ? উত্তরে হেমচন্দ্র বললেন : 'না, তেমন কিছু না। মায়ের সম্পর্কে পরে জেনেছি। তবে মায়ের নাম আমি শুনেছিলাম। কারণ আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিল। সন্ন্যাস নিয়ে তার নাম হয়েছিল স্বামী মোক্ষানন্দ। সে ছিল মায়ের মন্ত্রশিষ্য। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আমি প্রথম বেলুড় মঠে যখন যাই তখন সে মঠে ছিল। মাকে অবশ্য কখন দেখিনি স্থূল দেহে। শুনেছি, অরবিন্দ, যতীন মুখার্জী মায়ের কাছে গিয়েছিলেন এবং মায়ের আশীর্বাদ তাঁরা পেয়েছিলেন। শুনেছি, অরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাবার আগে মাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন। মাণিকতলা বোমার আসামী দেবব্রত বসু এবং শচীন সেন—রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাস নিয়ে যাঁদের নাম হয়েছিল স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এবং স্বামী চিন্ময়ানন্দ—তাঁরা তো মায়ের খুব স্নেহভাজন ছিলেন। আর বাংলার বিপ্লবীদের একজন বন্ধু গণেন মহারাজও মায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। আরও অনেকে—যাঁরা পূর্বে বিপ্লবী ছিলেন বা বিপ্লবের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত ছিলেন—বেলুড় মঠে যোগ দিয়েছিলেন। এই সমস্ত ছেলেদের বিশেষ করে দেবব্রত বসু এবং শচীন সেনের মতো বিখ্যাত বিপ্লবীদের মঠে যোগদানের ব্যাপারে শুনেছি তখনকার বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কারণ বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এই সন্দেহে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন বেলুড় মঠের উপর অসন্তুষ্ট ছিল এবং মঠকে রাজদ্রোহমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে নিষিদ্ধ করার চেষ্টাও হয়েছিল। শুনেছি এই সময় মা-ই এই সব ছেলেদের মঠে যোগদানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই এরা মঠে স্থান পেয়েছিল। মঠবাসিনী হয়ে বিপ্লবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্যে সে সময়ে সিস্টারকে (সিস্টার নিবেদিতাকে) বেলুড় মঠ থেকে চলে আসতে হয়েছিল। এই আনুষ্ঠানিক সম্পর্কচ্ছেদ তখন মঠ রক্ষার কারণে হয়তো অনিবার্য ছিল। কিন্তু মা সিস্টারকে কখনও বিপ্লবের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলেছেন বলে শুনিনি। অথচ মায়ের প্রতি নিবেদিতার যা শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল তাতে মা যদি তাঁকে এবিষয়ে কোন নিষেধাত্মক নির্দেশ দিতেন তাহলে নিশ্চয় নিবেদিতার পক্ষে বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা অসম্ভব ছিল। শুনেছি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে চলে যাওয়ার পরেও নিবেদিতা ছিলেন মায়ের পরম স্নেহের পাত্রী। এই ঘটনার পর নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক কি রকম ছিল সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে পরবর্তিকালে জেনেছি যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং মঠের অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর পূর্বের সম্পর্ক অটুট ছিল। এবিষয়ে আপনারা আরও ভাল জানবেন। আমার তো মনে হয়, স্বামীজীর শিষ্যা হওয়া ছাড়াও নিবেদিতার উপর মায়ের বিশেষ স্নেহের প্রভাবও এবিষয়ে কাজ করে থাকবে। আমাদের অল্প বয়সে অবশ্য নিবেদিতাকে যে বিপ্লবের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে চলে যেতে হয়েছিল—এই ব্যাপারটাকে আমরা ভাল চোখে দেখিনি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের উপর একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং রাগই হয়েছিল তখন। আমাদের তখন রক্ত গরম—যে কোন ভাবে দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরা তখন উন্মাদ, বেপরোয়া। নিবেদিতা তখন আমাদের চোখে "জোয়ান অব আর্ক"। আর স্বামীজী—তিনি আমাদের কাছে, বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে, মুক্তির মন্ত্রগুরু—"প্রফেট অব ইমান্সিপেশন," স্বাধীনতার মন্ত্রচৈতন্যদাতা। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাই তখন নিবেদিতার

প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবহারে মিশনের রাজভক্তির প্রকাশ দেখেছিলাম। এই মনোভাব আমাদের, বিশেষ করে আমার বহুদিন ছিল। পরে যখন জানলাম যে, মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ত্যাগ অনেকটা লোক-দেখানো ব্যাপার,[২] গভর্ণমেণ্টের সন্দেহ এবং রোষ থেকে শিশু মঠকে রক্ষার জন্য তার প্রয়োজন হয়েছিল, তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অবশ্য তখন একথাটাও আমরা অবহিত ছিলাম না যে, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন রকম সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ স্বামীজীই দিয়েছিলেন। সুতরাং সেদিক দিয়ে নিবেদিতার কাজকর্মকে সমর্থন করা মিশনের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। অবশ্য এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা আমি অনেক পরে শুরু করেছি। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমার বার বার মনে হয়েছে। তা হল: শুনেছি যে, সব রকম জটিল বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইরা মায়ের পরামর্শ প্রার্থনা করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশকেই শিরোধার্য বলে নির্বিচারে গ্রহণ করতেন। নিবেদিতাকে মঠ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে মায়ের কোন ভূমিকা ছিল না তা মনে করা অসম্ভব। যদিও কোন তথ্য প্রমাণ নেই তবু আমার নিজের ধারণা যে, নিবেদিতার ব্যাপারে যে অসাধারণ সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল তার পিছনে মায়ের সুগভীর বাস্তববুদ্ধির অবদান ছিল। এমনভাবে এটা প্রচারিত হয়েছিল যে শুধু ব্রিটিশ সরকারই নয়, জনমানস এবং বিপ্লবীরাও তাতে বিভ্রান্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল আবার অন্যদিকে দেশপ্রেমিক জনসাধারণ এতে হয়েছিল ক্ষুব্ধ। একে অবশ্য কোনভাবেই মেকিয়াভেলিয়ান চাতুরী বলা যাবে না। কারণ তাতে একে খুবই ছোট করে দেখা হবে। প্রথমতঃ এখানে মিশনের কারও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপার ছিল না। দ্বিতীয়তঃ স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মহান কল্যাণের জন্যে যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাকে অঙ্কুরে বিনাশ থেকে রক্ষা করে রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন কর্ণধারগণ একটি পবিত্র জাতীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন। সেদিন ব্রিটিশের সন্দেহের বলি হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন যদি ধূলিসাৎ হয়ে যেত তাতে কি শুধু ভারতেরই ক্ষতি হত? সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্যেই স্বামীজীর যে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা তার অকাল মৃত্যুর নিমিত্ত হলে শুধু নিবেদিতাকে নয়, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ভবিষ্যতের মানুষ ধিক্কার জানাত। সুতরাং রামকৃষ্ণ মিশন তখন যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা যে সম্পূর্ণভাবে যুক্তিপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে আমার আজ আর কোন সন্দেহ নাই। আমার শুধু মনে হয় যে এই অপূর্ব সিদ্ধান্তটির নেপথ্যে ছিল মায়ের মস্তিষ্ক এবং প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হয়েও মা ছিলেন আশ্চর্য বাস্তববুদ্ধির অধিকারিণী।[৩]

২ 'লোক-দেখানো ব্যাপার' মোটেই ছিল না। ছিল নির্ভেজাল সত্য ঘটনা। মঠের নিয়মেই (যে নিয়ম স্বয়ং স্বামীজী প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন) নিবেদিতাকে মঠের বাইরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও ঘটনা যে, মঠের কারও সঙ্গে নিবেদিতার হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়নি। তা অটুটই ছিল ঐ ঘটনার পরেও।

৩ হেমচন্দ্র ঘোষের এই মত অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত। শ্রীমা নিশ্চয়ই অসাধারণ বাস্তববুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন এবং তিনি যত দিন স্থূলদেহে বর্তমান ছিলেন মঠ-মিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। কিন্তু তিনি কখনই 'মতলব' করে কোন পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত দিতেন না। নিবেদিতার ব্যাপারে তিনি কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকলে (যদিও দিয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নাই) তা দিয়েছিলেন মঠের নিয়মকে রক্ষা করার জন্যই। মঠের নিয়ম: রাজনীতির সঙ্গে মঠের ত্যাগী সদস্যদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। মঠের

এ ব্যাপারে তাঁর তুলনা তিনিই, অথবা একমাত্র ঠাকুর।

'নিবেদিতার ব্যাপারটি—যেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আমাদের যৌবনকালে হয়েছিল এবং এখনও হয়ে থাকে—সে সম্পর্কে আমার যে ধারণার কথা বললাম তা অবশ্য খুব অল্পদিনই হল আমার হয়েছে। এ ব্যাপারে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে। উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষ করে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতার প্রতি অবিচার করেছেন এবং নিবেদিতাকে ওঁরা অবহেলা করেছেন। শঙ্করীবাবু আমাকে বলেছিলেন যে, আমার ধারণা ঠিক নয় এবং সেজন্যে নানা তথ্যপ্রমাণও উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলি এখন আমার আর মনে নাই। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ব্যাপারটিকে তক্ষুণি আমি বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু ক্রমশ: ওটির তাৎপর্য আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। ওটি একটি রেভিলেশন্ আমার কাছে। শঙ্করীবাবু বলেছিলেন, নিবেদিতাকে রামকৃষ্ণ মিশন যে কী সম্মান ও ভালবাসার চোখে দেখতেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে যা কিনা গীতা সেই স্বামীজীর "কমপ্লীট ওয়ার্কস্"-এর ভূমিকা লিখেছেন নিবেদিতা। এটি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ তখন বেলুড় মঠের পরিচালক। তাঁরা তাঁদের নেতার বাণী ও রচনাকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার দায়িত্ব অর্পণ করলেন নিবেদিতার উপর যে-নিবেদিতা তখন বাইরের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে "বিতাড়িতা," "বহিষ্কৃতা"। শঙ্করীবাবু ঠিকই বলেছিলেন যে, "এই একটি মাত্র ঘটনাই নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে সমস্ত সমালোচনাকে স্তব্ধ করে দেবে!" শঙ্করীবাবু আরও বলেছিলেন যে, "রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ থেকে নিবেদিতার সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ ব্যাপারটা যে একটা 'ফরম্যাল অ্যাফেয়ার' ছিল তার ব্যাখ্যাও কি আমরা এই ঘটনাটি থেকেই পাই না?" আমার পূর্বের দীর্ঘকালের ধারণার প্রভাবে সেদিন ওঁর কথাকে স্বীকার করিনি। কিন্তু এখন বুঝছি যে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য।

'প্রসঙ্গক্রমে নিবেদিতার সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ভুল ধারণার কথাও এখানে বলি। কথাটা হল: একটা ধারণা অনেকের মধ্যে দেখেছি যে, নিবেদিতা স্বদেশী ডাকাতির একজন বড় সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আমাদের থেকে প্রবীণতর এবং নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এমন বিপ্লবীদের কাছে এর উল্টোটাই শুনেছি। আমারও মনে হয় যে ঐ রকম ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। প্রবীণ

আদর্শ ও নিয়ম রক্ষার ব্যাপারে স্নেহময়ী সংঘজননী কত কঠোর হতে পারতেন সে-সম্পর্কে নিবেদিতার এই উক্তিটিই যথেষ্ট: 'আর যখন কঠোরতার প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে কোনোরকম ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হন না। যে-ব্রহ্মচারীকে আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা করার শাস্তি দিয়েছিলেন, তাকে তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করে চলে যেতে হবে—তাঁর আদেশ। তাঁর দৃষ্টিতে সাধুর আচরণ যে লঙ্ঘন করেছে, সে কখনই তাঁর সাক্ষাতে আসতে অনুমতি পাবে না।' (নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ১১৪) এখানে উল্লেখ্য, নিবেদিতা এই কথাগুলি লিখেছেন তাঁর মঠ-মিশন 'ছাড়া'র বেশ কয়েক বছর পরে। শ্রীমায়ের এক অত্যন্ত প্রিয় সেবক সন্ন্যাসী-সন্তান এমন কোন অপরাধ করেন যাতে তিনি তাঁকে নিষ্কম্পভাবে বর্জন করেন যদিও গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল তাঁর হৃদয়। পরে কোন সময় কোন সন্তান শ্রীমায়ের কাছে ঐ সেবক-সন্তানের উল্লেখ করলে শ্রীমা গম্ভীরভাবে বলেন: '—র নাম আমার কাছে কখনও করবে না। ওকে আমি ত্যাগ করেছি।' সঙ্ঘের মূল নিয়ম রক্ষার ব্যাপারে শ্রীমা ছিলেন আপোষহীন।

নেতাদের কাছে শুনেছি যে, নিবেদিতার পরিচিত একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের কিছু সভ্য তাঁকে বলে যে তারা কলকাতার কাছে একটা স্বদেশী ডাকাতির পরিকল্পনা করেছে। নিবেদিতা তা শুনে খুব রেগে যান এবং তাদেরকে তীব্র ভর্ৎসনা করে ঐ পরিকল্পনা ভেঙ্গে দিতে বলেন। এতেও সন্তুষ্ট না থেকে তিনি তাদের নেতাকে ঐ পরিকল্পনাটির কথা বলেন এবং তাঁকে ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়ে পরিকল্পনাটি যাতে আর কোনভাবে কার্যকরী হতে না পারে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবে নিরস্ত হয়েছিলেন। নিবেদিতা তাঁর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে বুঝেছিলেন যে, স্বদেশী ডাকাতির দ্বারা মুক্তি আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানবিক কারণে জনসাধারণ এর ফলে বিপ্লবীদের থেকে দূরে চলে যাবে। তাদের মনে বিপ্লবীদের সম্পর্কে একটা সন্ত্রাস, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ভাব দানা বাঁধবে। তাছাড়া, এতে অর্থলোভ, নৃশংসতা প্রভৃতি বিপ্লবীদের মধ্যে সংক্রামিত হবার আশঙ্কাও থাকে যথেষ্ট যার ফলে বিপ্লবীদের আদর্শভ্রষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। স্বদেশী ডাকাতির ফলে মুক্তি সংগ্রামে যে ক্ষতি হয়েছিল এ বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ নাই। সত্যি কথা বলতে কি, স্বাধীনতার জন্যে আমরাও স্বদেশী ডাকাতিতে বিশ্বাসী ছিলাম। স্বভাবে প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হলেও নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল গভীর। তখনকার জাতীয় নেতারা তাঁর পরামর্শকে খুব মূল্যবান মনে করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ অরবিন্দের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অরবিন্দকে পুনরায় বন্দি করার ব্যাপারে ইংরেজের চক্রান্ত আগেই আঁচ পেয়ে অরবিন্দকে বাঙলা ত্যাগ করায় এবং পণ্ডিচেরী যাবার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিতেও নিবেদিতার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অরবিন্দের অনুপস্থিতিতে তাঁর "কর্ম-যোগিন" এবং "ধর্ম" পত্রিকা দুটির নিয়মিত প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব নিবেদিতা নিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে সন্দেহের কোন অবকাশ না দিয়ে ঐ সুযোগে অরবিন্দ তখন তাদের হাতের মুঠোর বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

'যাক্, মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি আমি। আবার সেখানে ফিরে যাই। আমি বলছিলাম প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনে যাঁরা বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের এবং নিবেদিতার উপর মায়ের স্নেহ এবং তাঁর অসাধারণ বাস্তববুদ্ধির কথা। কিন্তু যে বিশেষ ভূমিকাটি পালন করতে মা দৈবনির্দিষ্ট ছিলেন তা চিন্তা করলে এতে অবাক হওয়ার কিছু পাই না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা সবাই জানি যে, বাবাদের চেয়ে মায়েদের স্নেহ এবং বাস্তব-বুদ্ধি সব সময়েই বেশি। আর এই "মা" তো শুধু রামকৃষ্ণ ভক্তগোষ্ঠীর মা নন। তিনি সকলের মা—জগজ্জননী। এক সর্বগ্রাসী, বিশ্বপ্লাবিনী মাতৃশক্তি—যার জাগরণের জন্যেও এবারের যুগাবতারের আসা। রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের বহু-মুখী তাৎপর্যের মধ্যে এটি শুধু অন্যতমই নয়—অন্যতম প্রধান।'

'আমি বিপ্লবী। প্রাক্তন নই, আজীবন। আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে বিপ্লবের নেশা। সে রক্ত স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শে সঞ্জীবিত। সুতরাং যতদিন এই দেহে সেই রক্ত বইবে ততদিন বিপ্লবের নেশা আমার কাটবে না। আজও তাই যাঁর মধ্যে বিপ্লবের গন্ধ পাই তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। এভাবেই ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, কামালপাশা, লেনিন, মার্কস, মাও সে তুঙ, সুভাষচন্দ্র—পৃথিবীর বিখ্যাত বিপ্লবীদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছি আমি। তাঁদের

জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডীর জীবনী তো সেই কোন্ ছেলেবেলায় পড়েছি। আর এদেশের মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে তো খুব কাছে থেকেই দেখলাম। দেখলাম তাঁর আবির্ভাব এবং উত্থান। কিন্তু স্বামীজীর কাছে এঁরা সবাই শিশু। আর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বিপ্লবীর রাজা—বিপ্লবী চূড়ামণি। এবং সেখানেও সারদা-দেবী তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। প্রশ্ন হবে—তাঁদের মধ্যে আবার বিপ্লবের চিহ্ন কোথায়? আমার উত্তর—তাঁদের ঐ শান্ত সমাহিত নীরব জীবনের মধ্যেই রয়েছে অতিবিপ্লবের বীজ। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ—এই ত্রয়ী এক মহা বিপ্লবের প্রতীক। সারা পৃথিবীর চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এক বিরাট রেভ্যুলিশন্ এনে দিয়েছেন এঁরা। এঁদের বিপ্লবে চাঞ্চল্য নাই, গতির চমক নাই। দু-একটা শতাব্দী হয়তো চলে যাবে এর বহিঃপ্রকাশ মানুষের চোখে ধরা পড়তে। কিন্তু এই বিপ্লবকে, যাকে "রামকৃষ্ণ বিপ্লব" বলে আমি অভিহিত করতে চাই, তা থেমে নাই। নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে তার কাজ ঠিক চলেছে। মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে, মানুষকে মনুষ্যত্বে পৌছে দেওয়াই হল এই বিপ্লবের প্রকৃতি। আগামীকালের মানুষ দেখতে পাবে যে, এই নীরব বিপ্লবের তরঙ্গ সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করে দিয়েছে।'

হেমচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। দুটি ঘণ্টা যে কোন্ দিক দিয়ে কেটে গিয়েছে বুঝতে পারিনি। তাঁর ক্লান্তি দেখে খেয়াল হল। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে রাস্তায় যখন নামলাম তখন বৈশাখের সূর্য মধ্য গগনে। হেমচন্দ্রের ঘরে হরিপদ চক্রবর্তী নামে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনিও আসছিলেন আমার সঙ্গে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমাকে কিছু বলছেন। কিন্তু আমার কানে কোন কথাই তখন ঢুকছিল না। হেমচন্দ্রের কথাগুলিই তখন কানে অনুরণিত হচ্ছিল শুধু। আজও যখন এই সাক্ষাতের স্মৃতিটি আমার মনে জাগে তখনও যেন তাঁর কথাগুলি প্রাণে ধ্বনি তোলে।[৪]

৪ হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আমার পাঁচ দিনের সাক্ষাতের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন হেমচন্দ্রের অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম ২ মে, ১৯৭৮। এই ব্যাপারে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আমাদের সাক্ষাতের শেষদিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। সুখের বিষয়, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদনটি তিনি অনুমোদন করেছিলেন। প্রতিবেদনে তাঁর অনুমতিসূচক স্বাক্ষরের তারিখ ৬ মে, ১৯৭৮। পাঁচটি কিস্তিতে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় সেই সুদীর্ঘ প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত করেছি।

# শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সঙ্গীত চর্চা

স্বামী সর্বগানন্দ

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে। উত্তর কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাল্যাবধি বসবাস। ঠাকুর তাঁকে সোহাগভরে সুরেন্দর, কখন বা সুরেশ বলে ডাকতেন। সুরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের 'আধা রসদ্দার' একথা শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এহেন ভক্ত-চূড়ামণি পরমসম্মানীয় অতিথির আনন্দবর্ধনার্থ যে সুকণ্ঠ, গায়ককে বা গায়কবৃন্দকে সংগীত পরিবেশন করতে নিমন্ত্রণ জানাবেন, সে কথা সহজেই অনুমেয়। সুরেন্দ্রনাথও সে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু ভগবদ্বিধানে সেই মুহূর্তে "সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ঐ দিবসে নিজ প্রতিবেশী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিবার জন্য নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন।"[১] নরেন্দ্র সাগ্রহে চললেন সুরেন্দ্রভবনে, এবং সুর-তাল-লয়সহ ভজন গান শুনিয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করলেন। অনেকেই জানেন যে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নমণি নরেন্দ্রনাথ, কেবল সঙ্গীতরসিক ছিলেন না, বলা যায় ছিলেন সঙ্গীত-পাগল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ধ্রুপদী ঢঙের ব্রাহ্মসঙ্গীত ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কেশবচন্দ্র সেনও উপাসনায় সঙ্গীতের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সে-বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজকে যথেষ্ট সচেতন করে তুলেছিলেন। কিন্তু শিমুলিয়ার দত্তপরিবারে ব্রাহ্মসঙ্গীত ছাড়াও খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, চতুরঙ্গ, ঠুংরি ইত্যাদিরও কদর ছিল,—খানিকটা নবাবী আদলে ওস্তাদ রেখে সপরিবারে সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে অবাক লাগে যে, এই দুই (অথবা আরও মুষ্টিমেয় দু-চারটি) খ্যাতনামা বনেদী পরিবারের মহৎ উদ্যোগ ও তার পরিপূর্তির মাধ্যমে কলকাতার বৃহত্তর জন-মানসের সঙ্গীত-প্রীতি ও রসবোধের এই প্রতিবিম্বন নিগূঢ় ঐতিহাসিক কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে, সম্রাট আকবর ও তার ভাবীকালে ঔরঙ্গজেবের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির যে, গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, ঔরঙ্গজেব ও তার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সঙ্গীত-প্রীতি তথা সঙ্গীতচর্চা এবং সঙ্গীতজ্ঞের রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় সঙ্গীত-জগতের অধিকাংশ গুণীজন ভারতের পূর্বপ্রান্তে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, লক্ষ্ণৌ, আসাম, ত্রিপুরা, প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই রাজা বা জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।[২] আবার কেউ কেউ নিজেই নিজের জীবিকা অর্জন করে সঙ্গীত-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে ক্ল্যাসিক্যাল বা কলাবতী সঙ্গীতের ভক্তসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অবশ্য 'বাঙ্গালীর' সম্পূর্ণ নিজস্ব গায়নশৈলী

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৩য় অধ্যায়

২ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত 'সঙ্গীতভাবনায় বিবেকানন্দ', শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫০৪-৫

কীর্তন বা/এবং বাউলগান বাঙ্গালীর জনচিত্তকে স্বকীয় মাদকতায় অধিকার করে রেখেছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর গৌড়দেশে কীর্তনাঙ্গের গান প্রাধান্য লাভ করলেও কণ্ঠ-সঙ্গীতে 'টপ্পা' নামক আর একটি বিশেষ ঢঙ ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করে—যা শেষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'বাংলা-সঙ্গীতে' একটি বিশেষ গায়নশৈলী হিসাবে আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতিলাভ করেছিল। নিধুবাবুর টপ্পার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। অবশ্য নিধুবাবুর টপ্পা অঙ্গের গানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করলেও তাঁর বহু-পূর্বেই এই গানের সূত্রপাত হয়েছিল। এই গায়ন রীতি বেশ প্রাচীন। এ ছাড়া রামপ্রসাদী গান বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে। সেইরকমই ইতিহাসের পাতায় রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারী, মহারাজ নন্দকুমার প্রমুখ এক এক দিক্‌পালের নাম দেখতে পাই, যাঁদের ভক্তিরসাপ্লুত সঙ্গীতের সুবাস বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনে, ভাষায়, প্রবাদে এমনকি সংস্কারের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে আজ পর্যন্তও।

পূর্বপ্রসঙ্গে আসা যাক্। সুরেন্দ্রনাথ যে একজন সঙ্গীতরসিক ছিলেন এমন কথা শোনা না গেলেও আমরা দেখতে পাই তাঁর মাধ্যমেই নবযুগের সূচক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল। 'জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্' মহাবীর শ্রীরাম-চন্দ্রের ভক্তাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন কিনা জানি না। কৃষ্ণ-সখা অর্জুন সুর-সাধনায় কখনও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কিনা, ভগবান বুদ্ধের প্রাণপ্রিয় আনন্দের সঙ্গীতবোধ কতটা ছিল অথবা ঈশদূত যীশুর যোগ্যতম প্রবক্তাবৃন্দ কখনও সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন কিনা, এমনকি সমবেত হরিনাম ব্যতিরেকে নিত্যানন্দের সঙ্গীত-প্রতিভা প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হৃদয় ভক্তিভাবে কখনও আপ্লুত করেছিল কিনা সে কথার বিবরণ পাওয়া না গেলেও নবযুগ প্রবর্তনের সূচনাকালে যুগনায়ক বিবেকানন্দের সঙ্গে নবযুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার যে সঙ্গীতের মাধ্যমেই হয়েছিল একথা তো ঐতিহাসিক সত্য। কাজে কাজেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সঙ্গীতের যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে তা অনস্বীকার্য।

সঙ্গীতের দুটি ধারা কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত। সাধারণভাবে কণ্ঠসঙ্গীতের স্থান যন্ত্রসঙ্গীতের উপরে ধরা হয়। যে কোন কারণেই হোক যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে প্রায় হয়নি বললেই চলে। কেবল সঙ্গতের জন্য তবলা, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, তানপুরার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ছিল সঙ্গীতময়। গান গাইতে গাইতে তিনি গানের ভাবে এতটা ডুবে যেতেন যে উপস্থিত সকল শ্রোতৃবর্গের মনও যেন সেই ভাবরাজ্যে সবলে নীত হত, এমনটি সকলেই অনুভব করতেন। আর একথাও সত্যি যে সুর ও কথার সংমিশ্রণে যে বিপুল পরিমাণ ভাব ব্যক্ত করা যায় ভাষায় তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সেই কারণেই বোধহয় প্রথম থেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গান রামকৃষ্ণসাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

সঙ্গীত ঈশ্বরারাধনার পথের অন্যতম। শ্রীভগবান-মুখে পাই, "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পাতায় পাতায় গানের বাহুল্যও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সঙ্গীত ও সাধনার একটি বিশেষ সহায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লাসিক্যাল বা কলাবতী সঙ্গীত নিজ জীবনে শিক্ষা না করলেও রাগাশ্রয়ী আলাপচারীর মাধ্যমে সুরের বিন্যাসে আনন্দলাভ করতেন এবং তাঁর ভাবসমাধি হত। কাশীতে বীণকার মহেশচন্দ্র সরকারের বীণাবাদন ঠাকুরকে

পরম আনন্দদান করেছিল। নহবতের স্বর-মূর্ছনায় যখন দক্ষিণেশ্বরে উষার আগমন সূচিত হত, কিংবা সান্ধ্য উপাসনার প্রাক্-মুহূর্তে স্বর্গীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করত, ঠাকুর ভাবসমাহিত হয়ে পড়তেন। ঠাকুরের জীবনে এবং বেলুড়মঠে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের অবস্থানকালেও একটা বিষয় অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন; মার্গসঙ্গীত তাঁরা কেউই গাইতে পারতেন না, কিন্তু গায়কগণ তাঁদের শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত শুনিয়ে যারপরনাই তৃপ্তি-লাভ করতেন। কথামৃতে একদিনের ঘটনা—কোন্নগরের এক গায়ক দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গান শোনাতে বলেন। গায়ক গানের পূর্বে মধুর কণ্ঠে রাগালাপ্তী বিস্তার করছেন, গান শুরু হবে—'মন বারণ'—ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ "গায়কের কালোয়াতী গান ও রাগিনী আলাপ শুনিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন।······( আলাপ শুনিয়া ) বাবু!—এতেও আনন্দ হয়, বাবু।"[৩]

এদিকে নরেন্দ্রনাথ ক্ল্যাসিক্যাল গানের দিগ্‌গজ পণ্ডিত এবং সঙ্গীতরসিক দত্ত পরিবারের ছেলে। তাঁকে গান-অন্ত-প্রাণ বললে হয়তো একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। "কোন কোন দিন এমন হইত যে স্নান করিয়া কোথাও যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতেছেন, এমন সময় গান আরম্ভ হইল। অমনি গানে উন্মত্ত হইয়া স্নানাহার ও বাহিরে যাওয়ার কথা সব ভুলিয়া গেলেন—শুধু গানই চলিতে লাগিল।"[৪] ১৩১৭-র ফাল্গুন সংখ্যা উদ্বোধনে প্রকাশিত একটি প্রসঙ্গে আছে, "তাল লয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল—টপ্পা, টপ্‌ খেয়াল, ধ্রুপদ, বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময়ে নরেন এমনি সহজভাবে বোলসহ ঠেকাটি দেখাইয়া দেন যে একদিনে কাওয়ালী, একতাল আড়াঠেকা, মধ্যমান এমনকি সুর ফাঁক তাল পর্যন্ত তাহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন; সেটা কেবল বাজনা কার্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়! নরেনের কিন্তু গানের কামাই নাই।" যেমন ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তেমনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও স্বামীজীর বিচরণের কথা জানা যায়। পরবর্তিকালে আমেরিকাও প্রধানতঃ ফ্রান্সে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুধ্যান খুব আন্তরিকতা নিয়েই তিনি করেছিলেন। ভারতবর্ষে হারমোনিয়ামের প্রচলন সেই সময়ে খুব ব্যাপক না থাকলেও এসরাজ, ভায়োলিন, অরগ্যান্‌ প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল।* তবে স্বামীজী এই যন্ত্রগুলি কখনও ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা নেই। স্বামীজী যেমন গাইতে পারতেন তেমন বাজাতেও পারতেন। পাখোয়াজ তবলাদি বাদ্য-বাদন-বিদ্যা তিনি প্রথমে বেনী ওস্তাদ, পরে আহম্মদ খাঁর কাছে আয়ত্ত করেছিলেন। গানের অন্তর্নিহিত যে ভাবটি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের নিবিড়

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১১।৩

৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় সং, ১।৮৭

* বেলুড়মঠে ৫, টাকার একটি হারমোনিয়াম গত শতাব্দীর শেষ দশকে কেউ দান করেছিলেন। সেই হারমোনিয়াম ১৫।১৬ বৎসর সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হলেও আরতিতে হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হত না। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অপূর্বানন্দ প্রথম আরতিতে হারমোনিয়াম ব্যবহার শুরু করেন; বস্তুতঃ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর নির্দেশানুসারে। ঐ বছর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজায় যখন মহাপুরুষজী ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে আসেন তখন সেখানে হারমোনিয়াম সহযোগে আরতি গান শুনে এতই প্রীত হন যে মঠে ফিরে এসেই স্বামী অপূর্বানন্দকে নির্দেশ দেন গদাধর আশ্রমে গিয়ে হারমোনিয়ামে আরতি গান শিখে আসার জন্য। ( লেখককে লেখা স্বামী অপূর্বানন্দের চিঠি। তারিখ ঃ বারাণসী, ১০।৫।৮৫ )

সেতুবন্ধ গড়ে তোলে, সেই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তির প্রয়াসই গায়ককে জীবন থেকে জীবনোত্তর পর্যায়ে তুলে নিয়ে যায়—সে কথা স্বামীজী প্রায়ই বলতেন। কারণ সঙ্গীতের শব্দময় রূপটির অন্তরালে তার ভাবের অভিব্যক্তি সুরের মূর্চ্ছনা, মীড় বা গমকের ব্যঞ্জনা অথবা পরিবেশনের দক্ষতার উপর যতটা নির্ভর করে, তার চেয়ে ঢের বেশি নির্ভরশীল গায়কের ইষ্টপাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও তাদাত্ম্য হওয়ার উপর। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গানের ভাব ছিল মুখ্য ব্যাপার। মঠের নিয়মাবলীতে স্বামীজীও স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ দিয়েছেন, "ভক্তিভাববৃদ্ধির জন্য ভজন-স্বরূপ ভগবানের গুণানুবাদ গীত হইবে এবং উহাতে তাল-মানাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" তাল-মানাদির ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তবে সঙ্গীতে তাল-মান একান্ত প্রয়োজনীয় ও ভিত্তিস্বরূপ হলেও তা অতিক্রম করে ভাবের উৎকর্ষ সাধন করা প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাল-মান-লয়-সচেতন নরেন্দ্রনাথকে তা একদিন মৃদু তিরস্কারে বুঝিয়েছিলেন। নরেন্দ্র বলেছিলেন "কীর্ত্তনে তাল সম্ এসব নাই—তাই অত Popular—লোকে অত ভালবাসে।"[৫] অবশ্য নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই গানের শাব্দিক এবং ব্যাকরণগত শ্রুতিমাধুর্য অপেক্ষা ভাবের ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন। একটি সামান্য ঘটনা: নরেন্দ্রনাথের তখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স। "একদিন এক বন্ধুকে পেশাদার গায়কের মত গান করিতে শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—'সুর ও তাল তো গানের একমাত্র বস্তু নয়। গানের ভেতর একটা ভাবের প্রকাশ আবশ্যক। কেউ নাকী সুরে সুর ভাঁজছে শুনলেই বুঝি আনন্দ হয়? গানের অন্তরে যে ভাবটা আছে তা গানের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠা দরকার। শব্দগুলি পরিষ্কার উচ্চারিত হবে আর সুরতালের প্রতি ঠিক ঠিক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে গান শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাব না জাগাতে পারে সেই গান গানই নয়।'"[৬]

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত-প্রীতি ও তাঁর মধুর সঙ্গীত ক্রমশঃ ভক্তদের মধ্যে অনুসঞ্চারিত হয়েছিল; মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ ভক্তরা ক্রমশঃ গান বুঝতে এবং গাইতে শিখেছিলেন। ঠিক সেইরকম ভাবে স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মহাপুরুষজী প্রমুখ সঙ্ঘের স্তম্ভস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সঙ্গীতানুরাগ ক্রমশঃ সমগ্র সঙ্ঘে অনুসঞ্চারিত হয়ে গানের একটি ধারার ( Tradition ) সৃষ্টি করেছিল

ভজন কীর্তনাদি বরাহনগর মঠ থেকেই গুরুত্ব লাভ করেছিল। 'ভোজন হয়নি তো ভজন করো'—এইভাবে সেখানে দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হত ধ্যান স্বাধ্যায় ও লীলাগুণ-কীর্তনে। কীর্তন, ভক্তিগীতি, ধ্রুপদাঙ্গের ব্রাহ্ম-সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ রচিত কিছু গান ছাড়াও বরাহনগর মঠে হিন্দি ভজনাদি গীত হত। স্বামীজী ঐ সময়ে ( ১৮৮৬।৮৭ ) 'তাথৈইয়া তাথৈইয়া নাচে ভোলা' গানটি রচনা করেন। শিবরাত্রিতে সারারাত শিবের গানে কখন যে গড়িয়ে যেত কারোর হুঁশ থাকত না। স্বামীজীর রচিত ও সুরারোপিত সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধীয় দুটি গান 'একরূপ অরূপ নাম বরণ…' এবং 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর…' কথা সুর ও তত্ত্ব-সমৃদ্ধির দিক দিয়ে অত্যন্ত উচ্চমানের। এই দুটি গানও এই সময়ে রচিত হয়েছিল 'একরূপ অরূপ নাম বরণ' গানটি ধ্রুপদাঙ্গের। তার ভাব গাম্ভীর্য, সাহিত্যসৌন্দর্য এবং পর্যায়ক্রমে

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৭।১

৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১।৫৩

সৃষ্টির বর্ণনা সত্যিই অনবদ্য। সমগ্র সত্তা দিয়ে স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইরা এই গানটি গাইতেন। প্রলয়ের গানটিতে—'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি' স্বামীজী তাঁর নির্বিকল্প সমাধির অনুভূতিকে যেন মানবীয় ভাষায় এঁকেছেন—অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াসে। 'ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল/বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ'—এত গভীর অনুভূতি থেকে উৎসারিত এই বর্ণনা যে মনে হয় স্বামীজীর ভাষা যেন শাস্ত্রীয় বচনকেও লঙ্ঘন করে গেছে। কিন্তু স্বামীজীর শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীতকীর্তি বলা যায় আরাত্রিক ভজনখানি। 'খণ্ডন ভব বন্ধন জগ বন্দন বন্দি তোমায়/নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়……।' স্বামীজী স্বয়ং সুরারোপ করেছিলেন চৌতালী এই গানে। ভাব, শব্দ, তত্ত্ব ও সুর তাল মানের যে সামঞ্জস্য এই গানে সংঘটিত হয়েছে, সংক্ষেপে তা অতুলনীয়। 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত শ্রীরামকৃষ্ণে'র দিব্য রূপটির যে অপূর্ব লেখচিত্র এই গানে পাওয়া যায় তা বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে নিঃসন্দেহে একটি দুর্লভতম সম্পদ। নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়িতে এই গান প্রথম রচিত হয়। প্রথম গীত হয় বেলুড়ে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়িতে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সময়ে। তার পূর্বে সন্ধ্যারতির সময়ে 'জয় শিব ওঙ্কার ভজ শিব ওঙ্কার/হর হর হর মহাদেব' লাইন-দুটি সুর করে কেবলমাত্র করতাল সহযোগে নেচে নেচে গাওয়া হত হৃষিকেশী ঢঙে। আরাত্রিক গানটি রচিত হওয়ার পর কিছুদিন প্রথম দুটি লাইন কেবল গাওয়া হত। পরে স্বামীজী গানটি সম্পূর্ণ করেন। গানটির ধরন ( বা শুরু ) ছিল চড়ার 'সা' থেকে। কিন্তু সকলের বেশি চড়ায় গাইতে অসুবিধার কথা ভেবে স্বামীজী নিজেই পঞ্চম থেকে ধরন নির্দেশ করেন। অনিবার্য ভাবে রাগাশ্রয়ী গানের রাগমিশ্র-বাহার থেকে কল্যাণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাতে কিছু যায় আসে না। শোনা যায় পুরো গানটি একেবারে গাওয়া হত না। দুই লাইন গেয়ে 'নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত…' গাওয়া হত। তারপর পরের দুই লাইন গাওয়া হত। সনাতন মার্গসঙ্গীত বলতে প্রধানতঃ ধ্রুপদাঙ্গের গীতকেই বোঝায়। ধামারও বহুদিন যাবৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নিজস্ব গীতিধারা হিসাবে সুপরিচিত। খেয়াল ঠুংরী গজলাদি ক্রমশঃ উত্তরোত্তর হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে স্বামীজী গম্ভীর এবং পৌরুষভাবরঞ্জিত ধ্রুপদাঙ্গের গানই সর্বাধিক পছন্দ করতেন এবং আরাত্রিক ভজনের মাধ্যমে এই সনাতন ধারাটিকে তিনি রামকৃষ্ণ-সংঘে ঈশ্বরসাধনার একটি শাশ্বত অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। সঙ্গীত সাধকদের কাছে এই স্বীকৃতি গভীর আশাব্যঞ্জক তাতে সন্দেহ নেই।

সঙ্গীত যে ঈশ্বরোপাসনার সহায়ক, একথা রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস, কবি জয়দেব, কিংবা যবন হরিদাস প্রমুখ সাধকেরা প্রমাণ করে গেছেন। রামকৃষ্ণ-সংঘের সঙ্গীত সাধনাও শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ প্রদর্শিত প্রণালীর একটি অঙ্গ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ বৈরাগ্য সম্পাদক গান গাইতেন। 'মন চল নিজ নিকেতনে', 'যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে', 'দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন'; কিংবা 'সুখের বাসনা কর আর ক'দিন' অথবা হিন্দিভজন 'চলো মুসাফির বাঁধো গাঁঠরিয়া' ইত্যাদি গান বেলুড় মঠের প্রথম দিনগুলিতে সকলের অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় গান। শোনা যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবদ্দশায়ই আন্দুলের গান-সিদ্ধ মাতৃসাধক 'প্রেমিক' মঠে যাতায়াত শুরু করেন। বহুবার তিনি মঠে এসে স্বয়ং এবং সদলবলে গান গেয়ে

গেছেন। প্রেমিকের অথবা সাধকের গানগুলি মঠে এখনও বহুল প্রচলিত এবং উৎসাহের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গীত হয়—কালীপূজা, দুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীঠাকুর বা স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে। বেদান্তের অনুভব মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের গানের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে। সাধক বলেছেন—'তুমিই একা হয়েছ দ্বিধা, পরমপুরুষ প্রকৃতি নারী/কতই নামে কতই রূপ ধরি কত লীলা কর লীলাময়ী/ সকল আকারে আছ মা অন্তরে জানিতে না পারে জীব তোমারে/তুমিই নিত্য নিরাকারা চিদানন্দ ব্রহ্মময়ী...' ইত্যাদি। অন্যদিকে দেখি ভক্তচূড়ামণি স্বামীজীর বাহিরে জ্ঞানের একটা আবরণ থাকলেও ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে স্বামীজী প্রায়শঃ ভক্তিরসসঞ্চারী কীর্তন গান গাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তো একথা বলা বাহুল্যমাত্র। গান যে ভক্ত ভগবানের চিরন্তন মধ্যস্থ একথা সার্বজনীন ও সার্বকালিক সত্য। ধ্রুপদাঙ্গের গান তাল-মান-লয় ঠিক রেখে গাইতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত হয়ে যায় সেকথা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে যাঁরা ক্রিয়াত্মক সাধন হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁরা জানেন। কাজে কাজেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা ধ্যানের একটি বড় সহায়। আর ইতিহাসের পাতায় নিশ্চয়ই চোখে পড়বে কর্মে প্রেরণাদানের কাজেও প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সঙ্গীত বহুযুগ ধরে ব্যবহৃত হয়েছে—বিশেষতঃ আধুনিক যুগের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে হাল আমলে ইউথ কয়্যার প্রভৃতি 'পপুলার' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমরা তার প্রমাণ যথেষ্ট পাচ্ছি।

পুরনো দিনের কথায় আসা যাক্‌। রাজা মহারাজের আমলে তৎকালীন বহু খ্যাতনামা সঙ্গীত-বিশারদ মঠে আসতেন—বিশেষতঃ স্বামীজীর জন্মোৎসবে। তিনের দশক পর্যন্ত স্বামীজীর জন্মোৎসব দুদিন ধরে পালিত হত—বর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের মতো বলা যায়। দ্বিতীয় দিন সারারাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসত। সমবেত সঙ্গীত কিছু হত না। নামী নামী শিল্পীর একক অনুষ্ঠান চলত। পূজনীয় মহারাজের উপস্থিতি সমস্ত পরিমণ্ডলকে এক আধ্যাত্মিক উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেত, আগত শিল্পীরা নিজেদের ভাব উজাড় করে মহারাজকে গান শুনিয়ে তৃপ্তিলাভ করতেন। মহারাজ নিজে না গাইলেও গানের একজন বড় শ্রোতা ও সমঝদার ছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে সর্বদা একটি শিল্পী সংঘও থাকত। নীরদমহারাজ বা স্বামী অম্বিকানন্দ, ভবানী মহারাজ, সূর্য মহারাজ, ঈশ্বর মহারাজ, গোঁসাই মহারাজ প্রমুখ গায়ক ও বাদকদের মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। মহারাজ ও মহাপুরুষজীই বেলুড় মঠে গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহারাজের ইচ্ছানুসারে স্বামী অম্বিকানন্দ বছরখানেক বেতিয়া ঘরানার সঙ্গীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে তালিম নিয়েছিলেন। পরবর্তিকালেও মহাপুরুষজীর অনুমতিক্রমে ব্রহ্মচারী প্রহ্লাদ মহারাজ দু-বছর গোয়ালিয়রে এবং আরও তিন বছর লক্ষ্ণৌ মরিস্ কলেজে পণ্ডিত রতনঝঙ্কারের অধীনে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। স্বামী অম্বিকানন্দ সম্বন্ধে শোনা যায় তিনি যখন ১০/১২ বৎসরের বালক তখন নাকি রামকৃষ্ণপুরে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বালক নীরদ খোল বাজিয়ে নেচে নেচে গান গেয়ে স্বামীজীর আশীর্বাদ আদায় করেছিলেন। বেলুড় মঠের প্রথম দিনগুলিতে স্বামী অম্বিকানন্দ এবং পরে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত প্রহ্লাদ মহারাজ গানের হাল ধরেছিলেন। ভগবান পাখোয়াজী বেলুড় মঠে প্রায়ই আসতেন। তবলা ও পাখোয়াজ দুটিই তাঁর প্রতিভার স্পর্শে চমৎকার বাজত। মঠের visitor's room-এ সাধু ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে তিনি কখন কখন সঙ্গত করতেন। তাছাড়া মঠে

যাঁরা যাতায়াত করতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দানীবাবু, গোপেশ্বরবাবু, জ্ঞান গোঁসাই, অন্ধ সাতকড়ি মালাকার, শ্রীরামপুরের শ্রীরামবাবু, অন্ধ পাঁচকড়িবাবু প্রভৃতি।

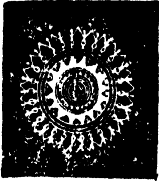
শ্রীরামকৃষ্ণের গান শেখা প্রধানতঃ যাত্রার পালা অথবা পালা কীর্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্বামীজী একাধিক ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন। তারপরে বহু ঘরানার বহু গায়কের সমাবেশ হত মঠে। পরবর্তিকালে দেখি স্বামী অম্বিকানন্দ রাধিকা গোঁসাইয়ের বিষ্ণুপুর ঘরানার ছাত্র। আবার প্রহ্লাদ মহারাজের মধ্যে ছিল গোয়ালিয়র ও লক্ষ্ণৌ ঘরানার সংমিশ্রণ। অতএব নানা কারণে মঠের নিজস্ব গায়নরীতি বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। তবে বরাবর কীর্তনাঙ্গের গান অপেক্ষা বলিষ্ঠ ধ্রুপদী ঢঙ রামকৃষ্ণ সংঘে বেশি প্রচলিত ছিল। ইদানিং গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ রেকর্ড, রেডিও ইত্যাদির বাহুল্যে সেই সাবেকী রুচিতে আধুনিকতার দোলা লেগেছে সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সংঘে ভক্তিগীতির অন্তর্নিহিত ভাবের উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া বরাবরই হয়ে আসছে।

বেলুড় মঠে যে ভজন কীর্তন বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা হত শাখা কেন্দ্রগুলিতে এক দুটি ছাড়া কোথাও সেইরকম সঙ্গীতোত্তম আশানুরূপ সঞ্চারিত হত না। কিন্তু সংঘের আয়তন ক্রমবর্ধমান। শাখা কেন্দ্রগুলিতে নতুন যাঁরা যোগদান করছে, যাঁরা ঠাকুর স্বামীজীর গাওয়া বিভিন্ন গানগুলি প্রাচীনযুগে জানতেন বা জানেন তাঁদের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ সর্বদা সম্ভব হয় না। কাজে কাজেই 'স কালেনেহ মহতা' প্রাচীন গায়নশৈলী হারিয়ে যাওয়ার পথে। তবু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর সঙ্গীতময় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক জীবনে সঙ্গীতের তাৎপর্য অনুধাবনান্তর আজকের মানুষের দহ্যমান হৃদয় শীতল করার শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বেলুড় মঠ তথা রামকৃষ্ণ সংঘ আবার সঙ্গীত মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে একথা সঙ্গত কারণেই আশা করা যায়।

# নৈবেদ্য

শ্রীশৈলেন দত্ত

আমার কি আছে তোমায় দিতে পারিব!
        কি আছে তোমায় দেব!
আমার নয়নমুকুর ধূলায় বিবর্ণ
        তুমি মুখ দেখবে কেমন করে!
আমার পায়ের তলায় নেই
        বিশ্বাসের মাটি
তুমি শক্তপায়ে দাঁড়াবে কেমন করে!
আমার ভালোবাসার নদী
        ঝড়ে টালমাটাল—
তুমি অবগাহন করবে কেমন করে!
        আছে এই হৃদয়
ভাঙা, ক্ষত বিক্ষত—
        তোমায় দিতে পারি
যদি তোমার নয়নমণির যাদুস্পর্শে
        তা সোনা হয়ে যায়
যদি তার দগ্‌দগে ক্ষতগুলো
        একটু জুড়ায়!



# পুরাতনী

ব্রহ্মচারী নির্মলচৈতন্য

## সুলক্ষণা উপাখ্যান

প্রাচীনকালে বারাণসীতে প্রিয়ব্রত নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল শুভব্রতা। তিনিও পতির ন্যায় ধর্মপরায়ণা ও সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। কালে তাঁদের সর্বশুভ-লক্ষণযুক্তা এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ দম্পতি এই প্রাণাধিকা কন্যাটির নাম রাখলেন সুলক্ষণা। রূপবতী সুলক্ষণা পিতা-মাতার স্নেহাশ্রয়ে ক্রমশঃ বড় হতে লাগল। পিতামাতার সুশিক্ষার গুণে সে বিনয়িনী, গৃহকর্মে সাতিশয় নিপুণা ও সকলের প্রিয়কারিণী হয়ে উঠল। অতঃপর বিবাহযোগ্যা হলে প্রিয়ব্রত কন্যার বিবাহের জন্য উপযুক্ত বরের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলেন না। কন্যার বিবাহের চিন্তা ব্রাহ্মণকে বড়ই বিব্রত করে তুলল। চিন্তায় চিন্তায় তিনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে লাগলেন। অতঃপর ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী হলেন। অনেক প্রকার ওষুধ প্রয়োগেও জ্বর প্রশমিত হল না। স্ত্রী-কন্যাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করে প্রিয়ব্রত মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

পতিবিয়োগে শোকে কাতর হয়ে শুভব্রতা অচিরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তিনিও স্বামীর অনুগামিনী হলেন। অনন্তর দুঃখার্তা সুলক্ষণা পাড়া-প্রতিবেশীদের সহায়তায় পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করল। পিতার যে সামান্য ধন সঞ্চিত ছিল তার দ্বারাই সে এখন দিন অতিবাহিত করতে লাগল।

সুলক্ষণা পিতা ও মাতার মৃত্যু এবং তাঁদের স্নেহ স্মরণপূর্বক মাঝে মাঝে শোকে বিহ্বল হয়ে আপন ভাগ্যের নিন্দা করে নয়নজলে ভাসত। এ সময় অনেক যুবকই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করল এবং সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবে বলে নানা প্রলোভনও দেখাতে লাগল। কিন্তু বিপন্না হলেও সুলক্ষণা ছিল স্থিরবুদ্ধিসম্পন্না। কোন প্রলোভনই তার মনকে বিচলিত করতে পারল না। কারো প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে সে সকলকেই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল।

অতঃপর সুলক্ষণা তার বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত সকল ঘটনা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। সে ভাবল, "আমার সামনে মা-বাবা দেহত্যাগ করলেন; আমার এই লাবণ্যময় দেহ তো এরূপ যে-কোন সময়ই বিনষ্ট হতে পারে! আর সংসারে সুখই বা কোথায়? কিছুদিন আগেও মা-বাবা আমাকে নিয়ে কত আনন্দে, কত সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তো সব শেষ হয়ে গেল। সুতরাং এই দেহ এবং পার্থিব সুখ খুবই ক্ষণস্থায়ী।" এরূপ চিন্তা করে করে বালিকার মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। সব জাগতিক সুখের বাসনা ত্যাগ করে সকল দুঃখের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় জীবনপাত করবে বলে সে স্থিরসঙ্কল্প করল এবং দৃঢ় ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক কাশীর এক নির্জন স্থানে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হল।

সুলক্ষণা ধ্যানে বসলে প্রতিদিন একটি ছাগী সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বীয় ছায়ার দ্বারা প্রচণ্ড দাবাগ্নির

মতো সূর্যতাপ থেকে তাকে রক্ষা করত। সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর ছাগী সামান্য তৃণ-পর্ণাদি খেয়ে নিজ পালকের ঘরে ফিরে যেত। এইভাবে ছয় বছর অতিক্রান্ত হল। সুলক্ষণার এই দীর্ঘ কঠোর তপস্যায় মহাদেব প্রসন্ন হলেন। পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেব তপস্যা স্থলে উপস্থিত হলেন। তিনি সুলক্ষণাকে বললেন, "হে সুব্রতে সুলক্ষণে! তোমার কঠোর তপস্যায় আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর।"

শঙ্করের এই মধুর বাণী শুনে সুলক্ষণা চোখ মেলে তাকাল। শিব-পার্বতীকে দেখতে পেয়ে ভক্তি-সহকারে তাঁদের প্রণাম করল। কিন্তু অনেক ভাবনা চিন্তা করেও কোন বর চাইতে ইচ্ছা হল না। কারণ তপস্যার ফলে চিত্ত নির্মল হওয়ায় তার মনের সকল কামনা-বাসনারই অবসান হয়েছিল। এখন শিব-পার্বতীর দর্শনে তার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল, কোন বর প্রার্থনার প্রয়োজন মনে উদয় হল না। তখন সামনে দাঁড়ানো ছাগীটির দিকে সুলক্ষণার দৃষ্টি পড়ল। সে ভাবল, "এই ছাগী ছায়াদান করে বহুকাল আমার সেবা করেছে। সে যদি তা না করত তাহলে প্রচণ্ড সূর্যতাপে আমার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটত। এই জীবলোকে নিজপ্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সকলেই জীবনধারণ করে। তার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই। কিন্তু যে পরের উপকারের জন্য জীবন ধারণ করে, তার জীবনই ধন্য। এই ছাগী পরের জন্য নিবেদিত প্রাণ। দীর্ঘকাল নিজে রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে আমাকে ছায়াদান করেছে। অতএব আমি ইহার জন্যই মহাদেবের নিকট বর প্রার্থনা করি।" মনে মনে এরূপ আলোচনা করে সুলক্ষণা শিবকে বলল, "হে কৃপানিধে! আপনাদের দর্শনে আমি কৃতার্থ। শিব-পার্বতীর দর্শন যখন পেয়েছি, তখন অসার পার্থিব বস্তু বা সুখ চাইবার আর কি আছে? এখন আমার শুধু একটি প্রার্থনা, দয়া করে এই নিরীহ ছাগীটিকে অনুগৃহীত করুন।" সুলক্ষণার এই কথায় মহাদেব অত্যন্ত খুশি হয়ে গৌরীকে বললেন, "হে দেবি! দেখ, সাধুগণের বুদ্ধি এই প্রকারই হয়। তাঁরা নিজের জন্য কিছুই চাহে না। সর্বতোভাবে পরোপকারই তাঁদের একমাত্র কাম্য, পরের মঙ্গলের জন্যই তাদের একমাত্র প্রার্থনা। এই কন্যা ধন্যা এবং আমার যথার্থ অনুগ্রহের পাত্রী। এখন বল, তাকে এবং এই ছাগীকে কি বর প্রদান করা যায়।" পার্বতী বললেন, হে সর্বজ্ঞ! সুলক্ষণা অতি পবিত্রা ও আবাল্য ব্রহ্মচারিণী। অতএব সে এই শরীরেই দিব্যজ্ঞানলাভ ও জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করে দিব্যস্থানে গমন করে আমাদের সঙ্গে বাস করুক। আর এই ছাগীও পশুদেহ পরিত্যাগ করে মনুষ্য শরীরে রাজকন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করে নানা উত্তম বিষয় ভোগান্তে মুক্তিপদ লাভ করুক—এই আমার একান্ত ইচ্ছা।" মহাদেব পার্বতীর ইচ্ছানুযায়ী খুশি মনে 'তথাস্তু' বলে বর প্রদান করে পার্বতীসহ স্বস্থানে গমন করলেন।

"তীব্র বৈরাগ্য হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।" "সাধন করতে করতে তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয় তার পরেই দর্শন ও আনন্দ লাভ।" সুলক্ষণা-চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশেরই বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে। সাধুসেবা ও সাধুসঙ্গ ঈশ্বরকৃপা লাভের সহায়ক। শিবভক্ত সুলক্ষণাকে ছায়াদানে সেবা করার জন্য ছাগীটিও মহাদেবের কৃপালাভ করেছিল।

[ স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড অবলম্বনে ]

# পুস্তক সমালোচনা

**কুমুদ প্রসঙ্গ—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক। পরিবেশক : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। পৃঃ ১৮৮, মূল্য : কুড়ি টাকা।**

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মহান কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মানুষ-রূপেও মহান ছিলেন। তাঁর কাব্যের ও জীবনের মহত্ব তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক 'কুমুদ প্রসঙ্গ'-গ্রন্থে নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 'সাহিত্যের সীমানা' গ্রন্থের লেখক-রূপে তিনি ইতিমধ্যেই সমালোচক-রূপে প্রতিষ্ঠিত ; বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর সুনাম বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

গ্রন্থটি বারোটি সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত অধ্যায়ে বিভক্ত : (১) কুমুদরঞ্জনের গ্রাম, (২) বীরভূম ও কবি কুমুদরঞ্জন, (৩) শিক্ষক কুমুদরঞ্জন, (৪) কবি কুমুদরঞ্জন ও সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, (৫) রবীন্দ্রনাথ ও কুমুদরঞ্জন, (৬) কুমুদরঞ্জন ও কিপ্‌লিং, (৭) কবি লিখে কেমন, (৮) কুমুদরঞ্জনের 'গরলের নৈবেদ্য', (৯) কুমুদরঞ্জন ও সমন্বয়ী দর্শন, (১০) মমমর্মী কুমুদরঞ্জন, (১১) কুমুদরঞ্জনের দিনলিপি এবং (১২) আমার বাবা।

নিজের গ্রাম ও গ্রামজীবনকে কুমুদরঞ্জন ভালবাসতেন এবং গ্রামের ছবি তাঁর কবিতায় বারংবার সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, ছাত্রদের নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। ছোট-বড় কোন পত্রিকাই দরদী কবির দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হত না। রবীন্দ্র-ভক্ত কুমুদরঞ্জনের অনেক কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখা যায় ; সে-প্রভাব অবশ্য তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করেনি। সাহিত্যানুরাগী কবি যে-সব পাশ্চাত্য লেখকের রচনা ভালবাসতেন তাঁদের মধ্যে রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং অন্যতম। মানুষকে তিনি ভালবেসেছিলেন, নিসর্গ তাঁর কাছে ছিল পরম রমণীয়। তাই তিনি 'হয়তো' কবিতায় লিখলেন :

অমর করে যাই রেখে যাই ক্ষণিক কাঁদা হাসা।
অনুভূতির ছিন্নপত্র যাই রেখে যাই যত্রতত্র
পারবে না যা করতে পরশ কালের কর্মনাশা।

সোমনাথ-মন্দির আস্তিক কবির প্রাণে গভীর সাড়া জাগিয়েছিল। বৈষ্ণব হিসাবে যুগলমূর্তির আরাধনা করে তিনি সর্বধর্ম-সমন্বয়ে পৌছান। মানবদরদী কবির 'ব্যথার ব্যাপ্তি'র কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

'কুমুদ প্রসঙ্গ' সাম্প্রতিক সমালোচনা-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পিতার প্রতিভার পরিমাপ করা পুত্রের পক্ষে কঠিন কাজ কিন্তু সেই কঠিন কাজে লেখক সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সংবেদনশীলতার অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে।

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত** ( গীতি ছন্দে )
**—শ্রীসুধাংশু শেখর নাগ। প্রকাশক : শ্রীসন্দীপ কুমার নাগ। ১২৫, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ পৃঃ ৮+১৬২, মূল্য ১২·০০ টাকা, প্রথম সংস্করণ ১ জানুআরি, ১৯৮৫ কল্পতরু দিবস।**

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, একদা কথকতা ও পাঁচালির ধারায় যে অমৃত ভক্তিরস জনসাধারণকে পরিবেশন করা হত সেই রস উপচিত হয়েছে সুধাংশুবাবুর রচনায়।

গ্রন্থকার 'সূচনা'য় লিখেছেন, "বর্তমানে পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দিব্য জীবনের সমগ্র-কর্মকাণ্ডকে লীলাপ্রসঙ্গ ও রামকৃষ্ণ পুঁথি অবলম্বনে সংক্ষেপে তিন ভাগে ভাগ করিয়া—একটি গ্রন্থে রূপ দেওয়া হইল।" উক্ত দুটি আকরগ্রন্থের উল্লেখ "লীলামৃতে" পরিবেশিত তথ্যসমূহের যাথার্থ্য ও তত্ত্বসমূহের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ রাখেনি।

প্রথাগতভাবে গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রস্তাবনায় 'রামকৃষ্ণ বন্দনা' রচিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের

শুরুতে গীতার প্রসিদ্ধ দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে যাতে শ্রীভগবান বলেছেন কখন তিনি ধরায় অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে যথাক্রমে 'রামকৃষ্ণ বন্দনা গীতি' ও 'বন্দনা' দিয়ে। দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তিতে চণ্ডী হতে নারায়ণী-স্তুতির সুপ্রচলিত তিনটি শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের শেষ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামমন্ত্রঃ ও শ্রীসারদাস্তোত্রম্-এর প্রণামজ্ঞাপক শেষ শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে।

কথকতার আঙ্গিক হিসাবে তিনটি খণ্ডেই কথকের বক্তব্য (ব্যাখ্যান) ও সার কথা বলা হয়েছে। গীতিসমূহের ও ছন্দঃ আখ্যান রচনা-সমূহের পরম্পরাগত সমাবেশ এই গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড 'বাল্যলীলায় গীতিসংখ্যা ১৬, দ্বিতীয় খণ্ড 'সাধন লীলায়' ১৮ এবং তৃতীয় খণ্ড 'ভক্ত-লীলা'য় ৩৩। প্রতিটি গীতিতে সুরের নাম দেওয়া হয়েছে। গানগুলির মধ্যে আছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ও স্বকণ্ঠে গাওয়া বেশ কয়েকটি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত রচিত গান, 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন' (১২০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গীতিটি হতে 'রূপ' কথাটি বাদ পড়ে গেছে) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গান, নরেন্দ্রনাথের (স্বামীজীর) গাওয়া বিখ্যাত গানগুলি 'মন চল নিজ নিকেতনে'। 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি', 'তুঝসে হামনে দিলকো লাগায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়' প্রভৃতি। অন্যান্য অনেকের রচিত ও প্রচলিত গানসমূহের সংগ্রহের সঙ্গে গ্রন্থকার রচিত গান তো আছেই।

গ্রন্থটির প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবনী আপামর জনসাধারণের কাছে সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন করে তাদের প্রাণ ভক্তিরসে সিঞ্চিত করা। গীতি আলেখ্য দ্বারা বিনোদনের মাধ্যমে এই পরিবেশন শহর ও গ্রাম বাংলা উভয়কেই সমানভাবে উপকৃত করেছে ও করবে। সুরসম্বলিত ছন্দোময় নিবেদন ভক্তির পরশ পৌঁছে দেবে জনে জনে; যারা আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন নয়, তারাও সুরের আবেদন উপেক্ষা করতে না পেরে অন্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী সম্বন্ধে জানার পরিধি বাড়িয়ে নিয়ে উপকৃত হবে।

আলোচ্য 'লীলামৃত' রচনায় গ্রন্থকারের বড় কৃতিত্ব হল—সংক্ষেপে লেখার কথা মনে রেখেও তিনি ঠাকুরের (কল্পতরুলীলা পর্যন্ত) জীবনের প্রধান ও অপ্রধান প্রায় সকল ঘটনাই গীতি-ছন্দোময় পরিবেশের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও উপদেশ যে সহজ সারল্যের জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে আছে, সেই সহজ সারল্যের প্রতিফলন গ্রন্থের মধ্যে আনতে পারাও কৃতিত্বের কথা। এই 'লীলামৃতে'র তৃতীয় খণ্ডে ('ভক্তলীলা'য়) ভক্ত-সমূহের পরিচিতি ও আগমন বর্ণনা ছাড়াও আর একটি বিশেষত্ব ঠাকুরের উপদেশামৃতের সংক্ষিপ্ত-সার। অল্প পরিসরের মধ্যে মনোজ্ঞভাবে ঠাকুরকে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় গ্রন্থকার ভক্ত-বৃন্দের ধন্যবাদার্হ। গীতি-আলেখ্যটি সামগ্রিকভাবে তাঁদের ভক্তিরসে আপ্লুত করবে বলাই বাহুল্য। তাই, গ্রন্থটির বহুল প্রচার আশা করা যায়।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা এর ভক্তি-রসাত্মকভাবের দ্যোতক। ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর চিত্রত্রয় গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রন্থটির বাঁধাইও সুশোভন।

পরিশেষে বলতে হচ্ছে, গ্রন্থটির শুদ্ধিপত্রে উল্লিখিত শব্দসমূহ ছাড়াও আরও কিছু কিছু শব্দেও বানান ভুল অশোধিত রয়ে গেছে। সে-গুলির একটি বড় সংখ্যার ত্রুটি 'ই' কারে বদলে 'ঈ' কারের প্রয়োগ, না হয় 'ঈ' কারের বদলে 'ই' কারের প্রয়োগ। আশা করা যায় ভুলগুলি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হয়ে যাবে।

—শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

**সতীপীঠ পরিক্রমা** ( ২ খণ্ডে )—অজিত-কুমার মজুমদার, প্রকাশক : গঙ্গোত্রী, ২৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭, ১ম খণ্ড : পৃঃ ৬+১৮৭, মূল্য : ১৮ টাকা ; ২য় খণ্ড : পৃঃ ১৯০, মূল্য : ২০ টাকা।

দক্ষযজ্ঞে সতীর শরীরত্যাগের পর তাঁর দেহ কাঁধে নিয়ে শিব শোকে উন্মত্ত হয়ে সারা পৃথিবী তাণ্ডবনৃত্য করতে লাগলেন। এতে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হল। সৃষ্টিকে রক্ষা করতে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন। কর্তিত খণ্ডগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। যে-সব স্থানে সতী-অঙ্গের পূত খণ্ডগুলি পড়ল, পরবর্তিকালে সে-স্থানগুলিই শক্তিপীঠে পরিণত হয়।

বিভিন্ন তন্ত্রে এই শক্তিপীঠগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। প্রাণতোষিণীতন্ত্রে জলন্ধর, উড্ডীয়ন, পূর্ণগিরি এবং কামরূপ—এই চারটি পীঠের উল্লেখ আছে। এছাড়াও নানাসংখ্যায় শক্তিপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায় কুব্জিকাতন্ত্রে ( ৪২টি ), জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে ( ৫০টি ), তন্ত্রসারে ( ৫১টি ), শিবচরিতে ( ৫১টি এবং সেই সঙ্গে ২৬টি উপপীঠ ), দেবীভাগবতে ( ১০৮টি ) প্রভৃতি গ্রন্থে। পীঠের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সংখ্যার মতো শক্তিপীঠের নামও বিভিন্ন তন্ত্রে বিভিন্ন রকম। তাদের মধ্যে মিল ও অমিল দুই আছে।

যাই হোক, লেখক প্রচলিত ৫১টি শক্তিপীঠ গ্রহণ করেছেন। বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভক্ত-হৃদয় নিয়ে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ ও প্রচলিত কাহিনীর পটভূমিকায় পীঠগুলি আলোচনা করেছেন। ফলে প্রতিটি পীঠের বর্ণনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। লেখক দুখণ্ডে মোট ( তারাপীঠকে ধরে ) ৫২টি পীঠের আলোচনা করেছেন। ১ম খণ্ডে 'সতীপীঠের উৎস সন্ধানে' মূল্যবান রচনাটি সংযোজনায় গ্রন্থের সমৃদ্ধি লাভ হয়েছে।

গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে থামা যায় না। মুদ্রণপ্রমাদের জন্য মাঝে মাঝে পড়ার গতি ব্যাহত হওয়ায় বড়ই বিরক্তি লাগে। মাতৃসাধক ও মাতৃভক্তের কাছে গ্রন্থটি আদরণীয় হবে বলে সমালোচকের বিশ্বাস।

—স্বামী চৈতন্যানন্দ

## প্রাপ্তি-স্বীকার

**তৈত্তিরীয়োপনিষৎ :** লেখক ও প্রকাশক : ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, সন্ত আশ্রম, কল্যাণী, নদীয়া, পৃঃ ১৫৬, মূল্য : ৫'০০ টাকা।

**আচার্য নিম্বার্ক ও তাঁহার মতবাদ :** লেখক : ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, প্রকাশক : ডঃ পার্থদেব ঘোষ, কৃষ্ণকুটির, বি-৬/১৪০ কল্যাণী ৭৪১২৩৫, পৃঃ ৬০, মূল্য : ৬'০০ টাকা।

**শ্রীশ্রীচণ্ডী :** লেখক : মুকুন্দসুন্দর সরকার, বি. এ, বি. এল., প্রকাশক : শ্রীশম্ভুনাথ সরকার, শ্রীকালীকৃষ্ণ সরকার, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পৃঃ ১১১, মূল্য : ১০'০০ টাকা।

**গল্পে শ্রীচৈতন্য :** লেখক : স্বপনবুড়ো। প্রকাশক : শ্রীমৎ অনন্তপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, প্রযত্নে শ্রীসুনীল বরণ ঘোষ, "গোবিন্দ মন্দির", ৬৭/১৩ বিধুভূষণ সেনগুপ্ত রোড, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কোয়ার নং ২, কলিকাতা-৭০০০৩৪, পৃঃ ৯৬, মূল্য : ৫'০০ টাকা মাত্র।



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব

**বেলুড় মঠে** গত ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬, **শ্রীশ্রীমা সারদামণির** ১৩৪তম আবির্ভাব-তিথি সাড়ম্বরে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজনকীর্তন প্রভৃতি হয়। সারাদিন ধরে মঠে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছে। দুপুরে প্রায় ১৪,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্ম-সভায় স্বামী নির্জরানন্দজীর পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

বেলুড় মঠে **স্বামী বিবেকানন্দের** ১২৫তম আবির্ভাব-তিথি গত ২২ জানুআরি ১৯৮৭, এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজনকীর্তনাদির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। দুপুরে প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে মঠ প্রাঙ্গণে স্বামী প্রমেয়ানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

## শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্ম-জয়ন্তী-উৎসব

২০ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬, **কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী-উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

৬ থেকে ৮ এবং ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬, সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী-উৎসব পালিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এছাড়া সিঙ্গাপুর আশ্রমের পরিচালনায় পেনাং কুয়ালালামপুর, এবং সেরাম্বন এই কয়েকটি স্থানেও এই উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীও উপস্থিত ছিলেন।

**হলিউড** কেন্দ্র ও তার শাখাকেন্দ্র **স্যান্টাবারবারাতেও** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০-তম জন্মজয়ন্তী উৎসব বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মের সন্ন্যাসীদের নিয়ে একটি সম্মেলন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের মোট ৪৫ জন সন্ন্যাসী অংশ গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্র-গুলিতেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে:

এলাহাবাদ, বারাসত, ভুবনেশ্বর, বেলঘরিয়া, কাশীপুর, জয়রামবাটী, মাদ্রাজ মিশন আশ্রম, মালদা, মেদিনীপুর, নাগপুর, পাটনা, পুরী মিশন, রাজকোট ও রাঁচি স্যান্যাটোরিয়াম্। তাছাড়া প্রথম পর্যায়ে এ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে—আগরতলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোম এবং উতকামণ্ড কেন্দ্রে।

## জাতীয় যুব দিবস

গত ১২ জানুআরি ১৯৮৭, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে **জাতীয় যুবদিবস** সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে:

আগরতলা, ব্যাঙ্গালোর, বারাসত, বড়িষা, বোম্বাই, বরানগর, কলিকাতা অদ্বৈতাশ্রম, দিল্লী, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কাথি-

পুরম্, মাদ্রাজ মঠ, মাদ্রাজ বিদ্যাপীঠ, ব্যাঙ্গালোর, নরোত্তমনগর, উত্তকামণ্ড, পুরী মিশন, রায়পুর, সারগাছি, শিলচর এবং টাকি। উল্লেখ্য যে উক্ত উৎসবে প্রতিটি আশ্রমেই বহুসংখ্যক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে।

## প্ল্যাটিনাম জুবিলি-উৎসব

গত ২১ জানুআরি ১৯৮৭, **বরানগর** আশ্রমের এক সপ্তাহব্যাপী **প্ল্যাটিনাম জুবিলি-উৎসবের** উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই উৎসব উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এক সুন্দর প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

## ত্রাণ ও পুনর্বাসন

**পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ:** বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে ১৫ জানুআরি পর্যন্ত ১০০০ পরিবারের মধ্যে পশমের কম্বল এবং ৪০৯০টি বিভিন্ন রকমের পুরানো পোষাক বিতরণ করা হয়েছে।

**শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ:** মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আসা ৫৫,৪৩৩ জন শরণার্থীর মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়েছে।

**পুনর্বাসন:** হাওড়া জেলার সাপুইপাড়া অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যে গৃহনির্মাণ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল, তা ১২৯টি বাসগৃহ এবং ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের মধ্য দিয়ে গত ১৮ জানুআরি ১৯৮৭, সমাপ্ত হয়েছে।

**চিকিৎসাত্রাণ:** আগরতলা আশ্রম, ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতায় গত ২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬, এক চক্ষু-শিবির পরিচালনা করে। এই শিবিরে ৪৪ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার এবং ২৭৩ জনের চোখ পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয়েছে।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা এবং মনসাদ্বীপ শাখার সহযোগিতায় চিকিৎসা শিবির খোলা হয়েছিল। গত ১০ থেকে ১৫ জানুআরি ১৯৮৭ পর্যন্ত এই শিবিরে বহির্বিভাগে ১২২৮ জন এবং অন্তর্বিভাগে ৫৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

তাছাড়া মেলার যাত্রী নিবাসে ৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা এবং দুঃস্থদের মধ্যে ২৫টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

## ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক **নয়াদিল্লী** আশ্রমের সাধু নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

## উদ্বোধন

গত ২৪ জানুআরি ১৯৮৭, **মহীশূর** আশ্রমের নবনির্মিত নিবাসের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী এবং গত ২৮ জানুআরি ১৯৮৭, টাকী আশ্রমের বিদ্যালয় ভবনের দ্বিতলের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহসভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

## জাতীয় সম্মানলাভ

**রাঁচির মুরাবাদী কেন্দ্র** ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের 'ইন্দিরা-প্রিয়দর্শিনী বৃক্ষমিত্র' পুরস্কার লাভ করেছে। গত ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৬, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করেন।

**মালদা** রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীরাজরাখাল তরফদার ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার অর্জন করেছেন।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

### জাতীয় যুবদিবস

১২ জানুআরি ১৯৮৭, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। স্বামীজীর উপর বক্তৃতা, গান, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা-মূলক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মোট ৭০ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানান্তে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী শান্তরূপানন্দ। উল্লেখ্য যে প্রত্যেক প্রতিযোগীকেই স্বামীজীর বই ও প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায় ছায়াছবি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে যুবদিবসের সমাপ্তি ঘটে।

### আবির্ভাব

গত ১৭ জানুআরি শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর আবির্ভাব-তিথিতে সন্ধ্যায় তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিকাশানন্দ।

গত ২২ জানুআরি ১৯৮৭, বৃহস্পতিবার, স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম শুভ আবির্ভাব-তিথি বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

### সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা

সন্ধ্যারতির পর, 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

## বিবিধ সংবাদ

### উৎসব

দক্ষিণ শহরতলি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ১৫০তম জন্মোৎসব সমিতি বড়িশা রামকৃষ্ণ মঠ ও স্থানীয় পল্লীবাসীর সক্রিয় সহযোগিতায় গত ১০ থেকে ১২ জানুআরি ১৯৮৭, তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাবের সার্ধশতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে পালন করে। তিনদিনই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। তৃতীয় দিনটি (১২ জানুআরি) যুব-দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছে। সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেছেন যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ, অন্যতম সহ-সম্পাদকদ্বয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

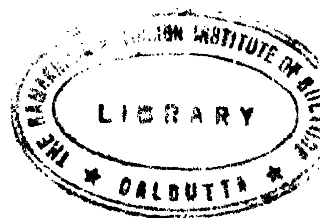
### ২০০০ বছরের পুরনো নগরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার

বেজিঙ: চীনের সুদূর উত্তরের জিয়াঙ প্রদেশে খননকার্যের সময় ২০০০ বছরের পুরনো ১৯টি নগরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান মিলেছে। এই অঞ্চলটিকে বিগত হাজার বছর ধরেই বসতির অযোগ্য জলাভূমি বলে মনে করা হত।

সংবাদসংস্থা সিনহুয়া জানাচ্ছে, ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা হচ্ছে সংখ্যালঘু ইয়ালু সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে বাস করত।

ঐ সংবাদসূত্রে আরও জানা গেছে, একটি নগরের দুটি অংশ বহু রাস্তা দিয়ে যুক্ত ছিল। নগরের বহির্ভাগের চৌহদ্দিতে ছিল ৬ মিটার গভীর এক পরিখা। আর অন্তর্দেশ ৪৭১ মিটার লম্বা দেওয়াল ও ১৭ মিটারের পরিখা দিয়ে ছিল ঘেরা।

# উদ্বোধন : চৈত্র ১৩৯৩




## সূচীপত্র

# উদ্বোধনের নিয়মাবলী

● **লেখক-লেখিকাদের জন্য :** ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার ও গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে রেজেষ্টারি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা ডাকটিকিট সম্বলিত কার্ড / ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

● **গ্রাহকদের জন্য :** মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৫·০০ টাকা, বাংলাদেশে ৪৩·০০ টাকা, ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে সি মেল-এ ৮৮·০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২৩৩·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা। বছরের যে কোন সময়ে বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে মাঘ মাস থেকে।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।

● **আজীবন-গ্রাহকদের জন্য :** এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০.০০ টাকা) ৪০০·০০ (চারশ) টাকা দিলে আজীবন-গ্রাহক (৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। যে কোন মাস থেকে আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পত্রাদি লিখবার সময় গ্রাহক-সংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকানা ও গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানাতে হবে।

কার্যালয়ে নিজে এসে অথবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া, অথবা মনিঅর্ডারযোগে বা ডিমাণ্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট্ "Udbodhan Office" এই নামে করতে হয়।

● **প্রকাশকদের জন্য :** সমালোচনার জন্য দুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন।

● **বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :** কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাবে।

● **কার্যালয়ের সময় :** সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০, রবিবার বন্ধ।

কার্যাধ্যক্ষ
**উদ্বোধন কার্যালয়**
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৩
ফোন : ৫৫-২৪৪৭

**Statement about ownership and other particulars of**

**UDBODHAN**

FORM IV

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Place of Publication : | ... 1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700003. |
| (2) | Periodity of its Publication | ... Monthly |
| (3) | Printer's Name | ... Swami Nirjarananda |
| | Nationality | ... Indian |
| | Address | ... 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003. |
| (4) | Publisher's Name | ... Swami Nirjarananda |
| | Nationality | ... Indian |
| | Address | ... 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003. |
| (5) | Editor's Name | ... Swami Nirjarananda |
| | Nationality | ... Indian |
| | Address | ... 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003. |
| (6) | Name & Address of individuals who own the Newspaper | ... Trustees of the Ramkrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Swami Gambhirananda | ... President | -do- |
| 2. | Swami Bhuteshananda | ... Vice President | -do- |
| 3. | Swami Tapasyananda | ... Vice President | -do- |
| 4. | Swami Hiranmayananda | ... General Secretary | -do- |
| 5. | Swami Gahanananda | ... Asstt. Secretary | -do- |
| 6. | Swami Atmasthananda | ... " " | -do- |
| 7. | Swami Gitananda | ... " " | -do- |
| 8. | Swami Prabhananda | ... " " | -do- |
| 9. | Swami Satyaghanananda | ... Treasurer | -do- |
| 10. | Swami Abhayananda | ... | -do- |
| 11. | Swami Ranganathananda | ... | -do- |
| 12. | Swami Smaranananda | ... | -do- |
| 13. | Swami Vandanananda | ... | -do- |

I, Swami Nirjarananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 1. 3. 1987.

Sd/- Swami Nirjarananda
**Signature of Publisher.**

---

According to Rule 8 of the Registration of Newspaper (Central) Rules 1956

---



৮৯তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। চৈত্র, ১৩৯৩

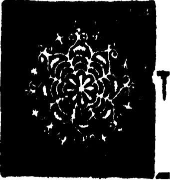
## দিব্য বাণী

কলিযুগে সর্ব্ব-ধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে॥

প্রভু বোলে "ভাইসব! শুন মন্ত্র সার।
রাত্রি কেন মিথ্যা যায় আমা' সবাকার॥
আজ হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন মঙ্গল॥
সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল-গণ-সনে।
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরার্থে সে তোমরা সভার ধনপ্রাণ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিকাণ্ড, ২য় অধ্যায় ও মধ্যকাণ্ড, ৮ম অধ্যায়





# কথাপ্রসঙ্গে

## শ্রীচৈতন্য

(১)

ধর্ম যখন গ্লানিযুক্ত হয়, তাহাকে গ্লানিমুক্ত করিবার জন্য ঈশ্বর নরশরীরে অবতীর্ণ হন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবেরও অবতরণ হইয়াছিল অনুরূপ পটভূমিতে। চৈতন্যপূর্বযুগে বঙ্গদেশের ধর্মের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বিদ্যাভূমি নবদ্বীপ তখন ন্যায়-স্মৃতির কচকচি ও পাণ্ডিত্যের রণভূমিতে পরিণত। ঈশ্বরানুরক্তিই যে বিদ্যা-শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা পণ্ডিতগণ একেবারে বিস্মৃত। প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তের সংখ্যা অতি নগণ্য। সাধারণ লোকের নিকট তাঁহাদের আদর্শ উপ-হাসের বস্তু। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিকট নিম্ন-বর্ণীয়েরা অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয়। মানুষ হিসাবে সমাজে তাহাদের কোন স্থান নাই। সুযোগ বুঝিয়া বিধর্মী শাসকবর্গও তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করিতেছে। এককথায় সমস্ত হিন্দুসমাজ তখন ব্যাধিদুষ্ট। হিন্দুদের এই দুর্যোগের দিনে পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রেমধর্ম প্রদান করিয়া হরিনামে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য ভগবান আবার নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যরূপে। প্রেমধর্মে বৈষম্যের কোন স্থান নাই। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, জাতি-কুলের কোন বিচার নাই। সকলেই সমান। 'মুচি যদি ভক্তি করি ডাকে কৃষ্ণ করে।/ কোটি নমস্কার করি তাঁহার চরণে॥' শ্রীরাম-কৃষ্ণও বলিতেন: "ভক্তের কোন জাত নাই।" প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্ত চণ্ডাল, ভগবদ্‌বিমুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সৎগুণে শ্রেষ্ঠ।

আচণ্ডালে হরিনাম শুনাইয়া দুঃখ-যাতনা-ক্লিষ্ট পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য যাঁহার নর-শরীর ধারণ, তাঁহার শুভ আবির্ভাবও হইয়াছিল হরিধ্বনির মধ্যেই। ঘটনা দুইটির যুগপৎ সংঘটন কম বিস্ময়ের নয়। ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) দোলপূর্ণিমা। সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ। হরিধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত। পুণ্যার্থীর দল হরিধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছে। এই পুণ্যলগ্নে রাত্রির প্রথম প্রহরে এক শুভ মুহূর্তে পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবীর গৃহ আলো করিয়া যে মহামানব এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই আমাদের সকলের প্রিয় 'নদীয়ার চাঁদ' ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন: "পৃথিবীতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন, প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম।...তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। পুণ্যবান, পাপী হিন্দু-মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্যা পতিত—সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন;...তাঁহার সম্প্রদায় দরিদ্র দুর্বল জাতিচ্যুত পতিত—সমাজে পরিত্যক্ত সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়স্থল।" (বাণী ও রচনা, ৫।১৬০-৬১)

অবতার যখন নররূপে আসেন তখন তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সমান সমাবেশ দৃষ্ট হয়। চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রেও তাহাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞান-সূর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তি-চন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তি-

প্রেম দুই-ই ছিল।" (কথামৃত, ৩।৭।৪) আরও বলিতেন: "হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাদ্য চর্বণ করিয়া নিজ শরীর পোষণের জন্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে দুইভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরের মধুর ভাবসহায়ে তিনি লোক-কল্যাণ সাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈত-ভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।" (লীলা-প্রসঙ্গ, সাধকভাব, ১৩শ অধ্যায়) যাহা হউক, অবতারের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সমান সমাবেশ দৃষ্ট হইলেও যে যুগে যে ভাবের বেশি প্রয়োজন, যুগ প্রয়োজনানুযায়ী সেই ভাবটিরই বেশি প্রকাশ তাঁহার মধ্যে দেখা যায়।

কলিযুগের পক্ষে ভক্তিপথ সহজপথ। "উচ্চ-রোলে নামকীর্তন করিলেই জীব-উদ্ধার হইবে। কলির জীব অন্নগত প্রাণ; অল্পায়ু, স্বল্পশক্তি—সেইজন্য ধর্মলাভের এত সহজ পথ তাহাদিগের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৯ম অধ্যায়) ভক্তিপথের সহজলভ্য এই অমিয়ধারাকে শ্রীচৈতন্য মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছেন শুষ্ক হৃদয় ভক্তিবারি দ্বারা সিঞ্চিত করিতে। তাঁহার আবির্ভাবে কতশত ভক্তের হৃদয়-সাগর উদ্বেলিত হইয়াছে! জীবন অমৃতত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে!

## (২)

চৈতন্যদেবের জীবনে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—বজ্রবৎ কাঠিন্য ও অনমনীয়-দৃঢ়তা, অপরপক্ষে কুসুমের কোমলতা—এই দুইটি ভাবই পাশাপাশি বর্তমান ছিল। একদিকে সন্ন্যাসীর সর্ববিধ খুঁটিনাটি নিয়মও তিনি পালন করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে তাঁহার মধ্যে ছিল অপূর্ব বিনয়, দৈন্যভাব ও প্রেমের প্রকাশ।

চৈতন্যদেব কাশীধামে আছেন। সনাতন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছেন। গায়ে ভগিনীপতি প্রদত্ত পশমী কম্বল। সনাতন লক্ষ্য করিলেন শ্রীচৈতন্য কম্বল-খানির উপর বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বিচক্ষণ সনাতনের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাঁহার এই দামী কম্বল ব্যবহার করা প্রভুর মনঃপূত নয়। পরদিনই তিনি উহা এক দরিদ্রের একখানি কাঁথার সঙ্গে বিনিময় করিলেন। তাহা দেখিয়া প্রভু সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ভগবান আচার্যের ইচ্ছা—একদিন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইবেন। প্রভুও স্বীকৃত হইয়াছেন। ভক্তপ্রদত্ত উপাদেয় নানা খাদ্যের মধ্যে মিহি সরু চাউলের ভাতও ছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে যখন জানিতে পারিলেন ছোট হরিদাস ঐ চাউল মাধবীদাসী নামক জনৈকা ভক্তের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছেন, খাওয়া-দাওয়ার পর কুঠিয়ায় আসিয়া আদেশ দিলেন—ছোট হরিদাস যেন আর তাঁহার নিকট না আসেন। ছোট হরিদাস এবং মাধবীদাসী—উভয়েই শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। কিন্তু সন্ন্যাসীর নিয়ম ভঙ্গ করায় হরিদাসকে তিনি আর পুনরায় গ্রহণ করেন নাই

রায় রামানন্দও প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্যতম। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথ উড়িষ্যা রাজসরকারে কাজ করিতেন। রাজসরকারের অর্থ-অপব্যয়ের অপরাধে উড়িষ্যাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। নির্দিষ্ট দিনে তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। রায়দের ভীত-আতঙ্কিত বন্ধুবান্ধব একে একে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর নিকট আকুলকণ্ঠে আবেদন জানাইলেন—'প্রভু রক্ষা করুন।' গোপীনাথের শাস্তির কারণ জানিতে

পারিয়া তিনি বলিলেন : তোমাদের সকলের কি এই ইচ্ছা যে আমি রাজার নিকট অর্থ ভিক্ষা করি ? আমি সন্ন্যাসী, আমি কিছুতেই তাহা করিতে পারিব না। কিন্তু ভক্তেরা
করিতে থাকিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন : গোপীনাথকে রক্ষা করিতে সকলেই যদি এত ব্যগ্র, তাহা হইলে যিনি পরম পরিত্রাতা, তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাও। প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এইকথা শুনিবামাত্র তাঁহারা গোপীনাথের প্রাণদণ্ড রহিত করিবার জন্য রাজার নিকট অনুরোধ করিলেন। শুনিয়া রাজা বলিলেন, আমি তো প্রাণদণ্ডের কথা জানি না। আমার প্রাপ্য অর্থই আমি চাই, প্রাণ লইব কেন ? রাজা গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন।

( ৩ )

আত্মপ্রশংসা সন্ন্যাসীর শ্রবণ করিতে নাই। তাই কেহ কখনও চৈতন্যদেবের প্রশংসা করিলে, যশোকীর্তন গাহিলে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। অনেক সময়ে লোকে তাঁহাকে বলিত : আপনি বর্তমান যুগের ভক্তিমার্গের প্রদর্শক, প্রেমধর্ম ও নামকীর্তনের মহিমা প্রচার করিয়া জগৎবাসীকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। তাহা শ্রবণে বিরক্ত হইয়া অতি বিনয়ের সহিত তিনি বলিতেন : ভক্তিপথের কিছুই আমি জানি না। অদ্বৈতাচার্যের সংস্পর্শে আসিয়া আমি ঐ পথের সন্ধান পাইয়াছি। অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি প্রভৃতিই পরম ভক্ত। তাঁহাদের নিকট এবং মহাপণ্ডিত সার্বভৌম, রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদর ও ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তের নিকট আমি ভক্তিতত্ত্ব ও হরিনাম মাহাত্ম্য শিক্ষা করিয়াছি। কী বিনয়, কী নম্রতা! ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।/অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" ( শিক্ষাষ্টক, শ্লোক ৩ )—তৃণ হইতেও অবনত হইয়া এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নিজ অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং অপরকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্বদা শ্রীহরির কীর্তনে রত থাকিবার জীবন্ত প্রতিমূর্তি !

( ৪ )

সংযম ব্যতীত কোন ভগবদ্ভাব স্থায়ী হয় না, ভাবের গভীরতা আসা তো দূরের কথা। চৈতন্যদেবের সংযমের বাঁধ এত উঁচু ছিল যে "সার্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে গেল, ভিজলো না।" ( কথামৃত, ২।২২।৩ ) মনে রাখিতে হইবে যে সংযমহীন জীবনে ভজনাদির আধিক্যবশতঃ হৃদয়ে কখন কখন উচ্চ ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেও এই ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। উচ্চে উঠিবার পর যখন নামিতে থাকে তখন কত নিচে যে নামিতে থাকে তাহার স্থিরতা থাকে না। খুব কদাচিৎ কাহারও জীবনে ঈশ্বরীয়ভাবের প্রকাশ এত বেশি ঘটে যে, ভাবের বিপুল প্লাবন সর্বপ্রকার প্রাচীর লংঘন করিয়া দেহকে প্লাবিত করে—দেহে অশ্রুপুলকাদি বিকার দেখা দেয়। ইহার চরম অবস্থাই মহাভাব। শ্রীমতী রাধারাণীর এই মহাভাব হইত বলিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলা আছে। চৈতন্যদেবের দেহেও ওই মহাভাবপ্রসূত বিকার প্রকাশের কথা উল্লেখ আছে।

জীবের ভাব পর্যন্ত হয়—'প্রেম' হয় না; 'প্রেম' অবতারাদিরই হইয়া থাকে। চৈতন্যদেবের প্রেম হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন : "তোমরা প্যামপ্যাম কর ; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা ? চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল ;

প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে যমুনা ভাবে। দ্বিতীয় লক্ষণ নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস এর উপর মমতা থাকবেনা, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। ঈশ্বরদর্শন না হলে 'প্রেম' হয় না।" (কথামৃত, ২।৩।৩) চৈতন্যদেবের ভাবানুসরনকালে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই—তাঁহার রাগভক্তির ভিত্তিভূমির কথা। সংযমাগ্নিদগ্ধবিগতমালিন্য শুদ্ধ মনবুদ্ধি সহায়ে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রেমময়ের নিত্যনিবাস নিত্যধামে জীবনতরণীকে বাহিয়া লইয়া যাইতে সঙ্কল্পবান হইয়া একমাত্র দাঁড়টানার দিকেই যেন নিবদ্ধ-দৃষ্টি না হই আমরা, লোঙরটি তুলিবার প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথাও যেন ভাবি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার চরণে সেইরূপ ভক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা জানাই যাহা ভক্তের চিত্তদর্পণকে নির্মল করে, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে ও মুক্তিরূপ শ্বেতপদ্মের উপর জ্যোৎস্না বর্ষণ করে। প্রার্থনা জানাই সেই ভগবদ্‌গুণগানে মতির জন্য যাহা পরাবিদ্যার জীবনস্বরূপা, যাহা শ্রবণমাত্র অন্তরে আনন্দাম্বুধি উদ্বেল হইয়া উঠে যাহা প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করায় ও জীবনে চির শান্তি আনয়ন করে।

# শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

ওঁ

উদ্বোধন

১২।২।২৭ বাং

কল্যাণীয়াসু—

মা, আমার শরীর এখনও সুস্থ হয় নাই। রোজ বিকালে জ্বর হচ্ছে, গতকল্য ১০০.৬ হয়েছিল, সম্প্রতি ইনজেক্সন করা হইয়াছে। একাগ্রমনে ঠাকুরকে ডাকিতে থাক, তিনিই প্রাণে শান্তি দেবেন। সম্প্রতি এখানে আসিবে না, আমার শরীর সুস্থ হইলে আসিবে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমাদের কুশল চাই। ইতি—

আশী:
তোমার মাতাঠাকুরাণী

# স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
হাওড়া ১৯শে শ্রাবণ

মা কমলাবালা,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম, কিন্তু অনেক কারণে এতদিন উত্তর দেওয়া হয় নাই। মহারাজের মহাসমাধির পর হইতেই আমাদের মন অত্যন্তই কাতর হইয়া রহিয়াছে তারপর আবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় আমাদের পরমপ্রিয় ভ্রাতা হরি মহারাজ তুরীয়ানন্দ স্বামী যিনি বহুদিন যাবত বহুমুত্র পীড়ায় ভুগিতেছিলেন এবং ইদানিং ৺কাশীতে বাস করিতেন তিনি গত ২১শে জুলাই বৈদিক মহাবাক্য ও ঔপনিষদিক মন্ত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিতে লীন হইয়াছেন—এইজন্য মন আরও অধিক বিষণ্ণ রহিয়াছে তবে ইঁহারা সকলেই পরম ভক্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ—ইঁহাদের মৃত্যু নাই—ইহা নিশ্চয়। ৺ওঁরা দেহত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য ধামে দিব্য শরীরে বিহার করিতেছেন—ইহা আমরা নিশ্চয় জানি সুতরাং সেজন্য আমাদের শোক হয় না তবে তাঁদের দেহের অবস্থানকালে তাঁদের সংসর্গে বহুলোকের আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়, তাহা আর হওয়া সম্ভব রহিল না এইজন্যই মনে কষ্ট। তবে এঁদের অদর্শন-যন্ত্রণা যে ভক্তেরা বোধ করিবেন তাঁদের মন পাপ ও মলিনতা শূন্য হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরে ভক্তি হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষদের বিরহ জন্য শোকানুভব করিলে জীব ক্ষীণ কল্মষ হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করে এবং শ্রীভগবানে ভক্তি হয়। তুমি এইটী ধারণা করিয়া রাখিবে—ইহাতে তোমার পরমকল্যাণ হইবে।

আর অধিক কি লিখিব, তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। ৺পূজার পর এদিকে আসিবার বাসনা করিয়াছ উত্তম কথা যদি প্রভু সে সময় এখানে রাখেন তবে সাক্ষাৎ হইবে। ইতি

তোমার শুভাকাংক্ষী শিবানন্দ

# শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিতে

## শ্রীপরিমল কান্তি দাস

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে ভক্তদের বলছেন, "তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসেন কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ, কেউ রসদ্দার।"[১]

এই সহজ উপমায় ইঙ্গিত দিলেন যে তিনি অবতার। অবতারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আসেন তাঁর লীলা-পার্ষদরা এবং ক্রমে ক্রমে আরও আসেন অন্তরঙ্গ ভক্তেরা। পার্ষদ ও ভক্তদের জীবন-সমস্যার মাঝে বিভিন্ন লীলা ও উপদেশের মাধ্যমে তিনি দেন পথের নির্দেশ। ব্যষ্টির প্রতি উপদেশ সমষ্টির উদ্দেশ্যে। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে দেখা গেছে যে, তিনি পার্ষদ ও ভক্তদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। কাউকে বলছেন, 'তুমি এখানের', আবার কাউকে বলছেন 'এখনও দেরি আছে'। কেউ 'ঈশ্বরকোটি' এবং কেউ 'জীবকোটি'রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। এই সুনির্দিষ্ট আদেশের মাঝেই গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ ও ভক্তগোষ্ঠী। দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছেন তা এই নিবন্ধে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। যদিও এই সকল চরিত্রের অনেকেরই বিস্তৃত জীবনী জানা যায় না, তবুও প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করেই একটা রূপরেখা টানবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

### (১) শ্রীশম্ভুচরণ মল্লিক

শম্ভুবাবু ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ্দার।[২] একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজমুখেই বলেছেন। ভাবাবস্থায় দর্শন প্রসঙ্গে ভক্তদের বলছেন, "আবার দেখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম সেজবাবু (মথুরবাবু), তারপর শম্ভুমল্লিক, তাকে আগে কখন দেখি নাই। ভাবে দেখলাম, গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেকদিন পরে শম্ভুকে দেখলাম, তখন মনে পড়ল, একেই ভাবাবস্থায় দেখেছি।"[৩]

শম্ভুবাবুর সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম দর্শন কখন কিভাবে হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। তবে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কিছুদূরে আলমবাজারে তার একটি বাগানবাড়ি ছিল যেখানে তিনি প্রায় যেতেন। সেইকালে বিত্তবান শিক্ষিত ব্যক্তিদের ব্রাহ্মসমাজ আকৃষ্ট করেছিল বলেই ইতিপূর্বে ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত ধর্মমতে (তিনি) বিশেষ অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন।[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভের পর প্রথমদিকে শম্ভুবাবুর ধারণা হয়েছিল, একজন অশিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণ ইনি অধ্যাত্মবাদের কি বোঝেন যে লোককে উপদেশ দিচ্ছেন। এইভাব নিয়েই তিনি একদিন ঠাকুরকে সরাসরি বলে বসলেন, "ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং?"[৫] কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সে ভুল ভাঙলো। ঠাকুর যখন তাঁর (শম্ভুবাবুর) বাগানবাড়িতে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।৩১।২

২ ঠাকুরের ভক্ত সকলের মধ্যে কেউ কেউ বলেন পাণিহাটির শ্রীমনিমোহন সেন কিছুদিন ঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতেন। পরে শম্ভুবাবু ঐ সেবাভার গ্রহণ করেন। [ পাদটীকা ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় খণ্ড ( সাধকভাব ) পরিশিষ্ট ]

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।৩১।২

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড ( সাধকভাব ) পরিশিষ্ট

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১৫।২

যেতেন এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন, সেই সময় শম্ভুবাবু ঠাকুরকে একদিন বললেন, "তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস।"[৬]

এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, "ঠাকুরের প্রতি শম্ভুবাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং কয়েক বৎসর কাল তিনি তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর যখন যাহা কিছু অভাব হইত জানিতে পারিলে শম্ভুবাবু তৎসমস্ত পরম আনন্দে পূরণ করিতেন। শ্রীযুক্ত শম্ভু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 'কে কার গুরু? তুমিই আমার গুরু'। শম্ভু কিন্তু তাহাতে নিরস্ত না হইয়া চিরকাল তাঁহাকে ঐরূপ সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে শম্ভুবাবু যে আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসসকল যে পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ সম্বোধনে হৃদয়ঙ্গম হয়। শম্ভুবাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে, তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিতেন।"[৭]

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতসঙ্গলাভের পর থেকেই তার জীবনে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছিল তা তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে বেশ বোঝা যায়। শম্ভুবাবুর বাড়ি ছিল কলকাতার বড় বাজারে।[৮] তিনি যখন আলমবাজারে তার বাগানবাড়িতে আসতেন, স্বাভাবিকভাবেই একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে গাড়িতেই যাতায়াত করতেন।[৯] কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্য তাঁকে পরিবর্তিত করল একজন নতুন মানুষরূপে। অযথা ব্যয় সঙ্কোচ করে তিনি বাগবাজার থেকে হেঁটেই বাগানবাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন।[১০] তাঁর এই আচরণে কেউ বলেছিল, "অত রাস্তা কেন গাড়ী করে আস না, বিপদ হতে পারে।" তখন শম্ভু মুখ লাল করে বলে উঠেছিলেন, "কি, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি আবার বিপদ?"[১১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিই তাঁর জীবনে এনেছিল ঈশ্বরের নিকট এই শরণাগতির ভাব। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শম্ভু মল্লিকের শ্রদ্ধা-ভক্তি ক্রমশঃ এতই প্রবল হল যে, তাঁর সেবা তিনি নিজেই করতেন। অন্যের সেবায় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় সে ভয় তার ছিল।[১২] শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য শম্ভু মল্লিককে দিন দিন আধ্যাত্মিক পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি গুরুজীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও দেবসুলভ আচরণে প্রীত হয়ে কিছু কিছু প্রচার আরম্ভ করলেন। বিলাতী অফিসে উচ্চপদে চাকরিরত সম্মানিত ব্যক্তি হয়েও কিন্তু শম্ভু মল্লিক স্বয়ং অফিস মহলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রচার শুরু করেন।[১৩]

৬ ঐ, ১।১৭।৫

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড ( সাধকভাব ) পরিশিষ্ট

৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ ( ২য়ভাগ ) উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩ ( ৪র্থ সং ) পৃঃ ১৬০

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ( ৯ম সংস্করণ ) পৃঃ ১৯২

১০ শম্ভু মল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আসতো, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।৬।৪

১১ ঐ, ২।৬।৪ ১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ১৯২

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, পৃঃ ১৯৬

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শম্ভুবাবুর টান ও ভালবাসা এতই প্রবল হয়েছিল যে তিনি বাগানে এলে কালীমন্দিরে খবর পাঠাতেন। কোন এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব অসুস্থ থাকায় শম্ভুবাবু নিজেই কালীমন্দিরে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসেন এবং সেবা যত্ন করেন। সেই সময় তাঁর বাড়িতে কিছু ভাল বেদানা ছিল। তিনি খাবার জন্য ঠাকুরকে দেন। পরে কালীমন্দিরে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর সঙ্গে কিছু বেদানা দিয়েও দেন। শম্ভুবাবু লক্ষ্য করেন যে, ঠাকুর কিছুদূর এসে আর যেতে পারছেন না। যেন পথভ্রষ্ট হয়েছেন। একই স্থানে ঘোরাঘুরি করছেন। তিনি তাড়াতাড়ি ঠাকুরের কাছে এসে বেদানাগুলি ফিরিয়ে নিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পথ দেখতে পান। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, দেখ, পাখি আর দরবেশদের সঞ্চয় করতে নেই।[১৪] এই ঘটনায় কিন্তু শম্ভু মল্লিক ভাবেন, মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব? ঠাকুর দেব-পুরুষ, তিনি সত্যবাক্‌পুরুষ—তাঁর উক্তি যথার্থ এবং সত্য।

শম্ভুবাবু ছিলেন ভক্ত ও কর্মযোগী পুরুষ। গুরুজীর পত্নীর অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের স্বল্প পরিসর নহবতে কষ্টের দিনযাপন লক্ষ্য করে কালীমন্দিরের পাশে একখণ্ড জমি ২৫০্ টাকায় মৌরসী করে ভক্ত কাপ্তেনের সহায়তায় ঐ জমিতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একটি কুটীর নির্মাণ করে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ এপ্রিল ঐ জমি ও বাড়ি দানপত্র লিখে দেন।[১৫]

শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে তিনি আধ্যাত্মিক পথের আলোক দেখতে পেয়েছিলেন। নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম সেবাই ঈশ্বরের পথের পাথেয়—ঠাকুরের এই সকল উপদেশ তিনি জীবনে আচরণের মাধ্যমে অনেক জনহিতকর কাজ করবার চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের সায়াহ্নেও তিনি ঠাকুরকে সেই কথা বলতেন, "আর এখন এই আশীর্বাদ কর, যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।"[১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য ও উপদেশ যে শম্ভুমল্লিকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল তা তাঁর আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। শেষ জীবনে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে তিনি হৃদয়কে বলেছিলেন, "হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি।" "ঠাকুর কিন্তু একথার আপত্তি জানিয়ে বলেন—"কি অলক্ষণে কথা কও।" তখন শম্ভু বলেন, "না, বলো, এসব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই।"[১৭]

শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আগত শম্ভুবাবুর স্বল্প জীবনের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে একটা বিত্তবান স্বাধীনচেতা মানুষের জীবন কিভাবে ধীরে ধীরে অল্পদিনের মধ্যে ঈশ্বরানুগত জীবনে পরিবর্তিত হয়ে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা করেছিল।

## (২) শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায় ( কাপ্তেন )

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তিমান কনৌজী ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে স্বপ্নে দর্শন দেন। দেবস্বপ্নে বিশ্বনাথের মন সেই থেকেই চঞ্চল। অবশেষে সম্ভবতঃ ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। স্বপ্নের সেই মহাপুরুষকে দর্শনমাত্রই তিনি ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করেন। কাপ্তেনের প্রথম দর্শন প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজেই বলছেন, "কাপ্তেনও যেদিন আমায় প্রথম দেখলে সেদিন রাত্রে রয়ে গেল।"[১৮]

দেবস্বপ্ন সৌভাগ্যের লক্ষণ—একথা কাপ্তেন পরবর্তিকালে বুঝেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে

১৪ ঐ, পৃঃ ১৯৩
১৫ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, পৃঃ ১৫৭
১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১০।৪
১৭ ঐ, ৪।২০।৭　　১৮ ঐ, ৪।১৫।৩

প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি ছিলেন নেপালরাজের কাঠগোলার একজন কর্মচারী মাত্র। কিন্তু পরবর্তিকালে ঠাকুরের অভয় লাভ করে নেপালের রাজপ্রতিনিধি পদে উন্নীত হন। তার জীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির মূলে শ্রীশ্রীঠাকুর, একথা বিশ্বনাথ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করতেন। সেই কারণে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ও তাঁর সেবায় অতিবাহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের বলছেন," খুব ভক্তি! আমি বরাহনগরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে। ওর বাড়ি লয়ে গিয়ে কত যত্ন। বাতাস করে পা টিপে দেয়, আর নানা তরকারী করে খাওয়ায়। আমি একদিন ওর বাড়িতে পায়খানায় বেহুঁশ হয়ে গেছি। ও তো অত আচারী, পায়খানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক করে বসিয়ে দেয়। অত আচারী ঘৃণা করলো না।"[১৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় একজন দুর্লভ মহামানব প্রসঙ্গে কাপ্তেন সমগ্র বাঙালী জাতিকে নিন্দা করে বলছেন, "বাঙালীরা নির্বোধ। কাছে মাণিক রয়েছে চিনলো না।"[২০]

আবার কোনস্থানে কর্ম প্রসঙ্গে ঠাকুর যখন বলছেন, "কিন্তু কর্ম কি চিরকাল করতে হবে?" কাপ্তেন বলছেন, "আপনার মত আমরা কি পূজা আর কর্ম ত্যাগ করতে পারি?"[২১] এখানে ঠাকুরের প্রতি কাপ্তেনের ভক্তি ও বিনয়ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

কোন সময় কথা-প্রসঙ্গে ঠাকুর যখন কাপ্তেনকে গোপীদের কথা বলতে বললেন, তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গোপীদের অহৈতুকী ভালবাসার কথা বললেন। ভাগবতের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, কোন ঐশ্বর্য নাই, তখনও গোপীরা তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভালবেসেছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি তাদের ঋণ কেমন করে শুধবো? যে গোপীরা আমার প্রতি সব সমর্পণ করেছে, দেহ-মন-চিত্ত। এই সব তত্ত্ব কথায় ঠাকুর আবিষ্ট হলেন।

তাঁর ভাব দেখে কাপ্তেন সবিস্ময়ে বলছেন,—'ধন্য, ধন্য'।

অর্থাৎ ভগবৎ প্রেমে ঠাকুর এতই সম্পৃক্ত যে ঈশ্বরীয় কথামাত্রই তিনি ভাবে বিভোর।

আবার ঠাকুর নানা উপদেশ প্রসঙ্গে ভোগ-বাসনা ও কর্মত্যাগের কথা বলে মাস্তুলে পাখির উপমা দিলে—কাপ্তেন মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠেন, 'আহা, কেমন দৃষ্টান্ত।' একবার নয় একাধিকবার গল্প-প্রসঙ্গে তার একই উক্তি। কেন সে মুগ্ধ, কেন সে বিস্মিত—কারণ এত শক্তত্বের এমন সহজ সরল উপমা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কাপ্তেন সংবাদ যতটুকু জানা যায় তাতে বোঝা যায় ঠাকুরের প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি। স্বপ্নে দেখা দেবপুরুষকে রক্তমাংসের শরীরে দর্শন করে এবং তাঁর অমৃতময় কথা শুনে তিনি ধন্য। তার জন্ম সার্থক। এই-ভাবই প্রকাশ পায় কাপ্তেন চরিত্রে।

### (৩) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহীভক্ত শ্রীদেবেন্দ্র-নাথ মজুমদার একদা ঠাকুরের সেবার জন্য যখন তাঁর শৌচের গাড়ু বহন করেন, ঠাকুর সেই সময় তাঁকে বলেন, "তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয়, তোমার সঙ্গে যে আমার ও ভাব লয় গো।"[২২] ঠাকুরের এই কথার তাৎপর্য দেবেন্দ্র-নাথ বহুদিন পরে বুঝেছিলেন।

১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১৩।৫

২০ ঐ, ৩।১৭।১

২১ ঐ, ৩।১৭।১

২২ মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ—ব্রহ্মচারী প্রাণেশ কুমার, পৃঃ ৫৭

দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও, তার ঈশ্বরভাবাপন্ন মন সর্বদাই ঈশ্বর-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। উপযুক্ত-গুরুর সন্ধানে যখন তিনি ব্যাকুল সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম শুনে তাঁকে দর্শনের জন্য নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে যান। গঙ্গাবক্ষ থেকে তিনি লক্ষ্য করেন লালপাড় কাপড় পরে একজন সৌম্যপুরুষ যেন কার প্রতীক্ষায় গঙ্গা-তীরে ফুলবাগানে দাঁড়িয়ে আছেন। একহাত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় গলা থেকে ঝুলছে। ঘাটে অবতরণ করে তিনি সেই পূর্বদর্শিত পুরুষকে দেখতে পেলেন না। পরে ঠাকুরের ঘরে গেলেন এবং তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন ইনিই সেই ব্যক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম দর্শনের দিন একটি ঘটনায় তিনি বিস্মিত হন। ঈশ্বরীয় আলোচনার পর তিনি দেবেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরেই প্রসাদ গ্রহণ করতে বলেন। ঠাকুর রামলালকে ডেকে বলেন, "দেখ, ইনি খুব ভাল লোক, আজ এখানে খাবেন। ইহাকে বিষ্ণুঘরের প্রসাদ দিস"[২৩] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই আদেশে দেবেন্দ্রনাথ ভাবলেন, আমি যে নিরামিষাশী তা ঠাকুর জানলেন কিরূপে? তবে কি ইনি অন্তর্যামী? ঠাকুরের প্রতি এই আত্মজিজ্ঞাসা পরবর্তিকালে দেবেন্দ্রনাথকে তাঁর প্রতি আরও ভক্তিমান, শ্রদ্ধাবান ও তদ্গতচিত্ত করে তুলেছিল।

যেদিন দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন, সেদিন ফেরেন সামান্য জ্বর নিয়ে। প্রায় চল্লিশ দিন রোগ ভোগের পর নিরাময় হন। এই ঘটনায় তাঁর ধারণা হল, তবে কি সাধু দর্শনে তাঁর এই দুর্ভোগ। এরপর থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণ নামে আতঙ্কগ্রস্ত হতেন। কিন্তু পরবর্তিকালে দেবেন্দ্রনাথের এই ভুল ভাঙ্গে। তিনি এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এই জ্বরেই আমার প্রাণ বিয়োগ ঘটিত, কেবল পরমহংস-দেবকে দর্শন করার ফলে এ যাত্রায় বাঁচিয়া গেলাম।"[২৪]

ঈশ্বরানুরাগী দেবেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে এইটুকু ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে পরমহংসদেব এক অসাধারণ দেব-পুরুষ। এ-জীবনে তাঁর কৃপা লাভ করলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এই সব চিন্তা করে তিনি ঠাকুরকে মনে প্রাণে গুরুপদে বরণ করে গুরুমন্ত্রের অপেক্ষায় রইলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁকে সরাসরি একদিন জিজ্ঞাসা করে জানলেন তাঁর দীক্ষা হয়নি। কিন্তু দেবেন্দ্র-নাথকে দীক্ষার কোন আগ্রহই দেখালেন না। যদিও দেবেন্দ্রনাথ একদিন দক্ষিণেশ্বরে ফুলমালা নিয়ে গিয়ে দীক্ষার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন। পরে তার ধারণা হয় ঠাকুর নিজেই তাঁকে সময় মতো দীক্ষা দেবেন। এইরূপ শরণাগত-ভাব নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করেন। কিছুদিন পরেই তিনি সর্বত্রই ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকেন। তাঁর অন্তরের ইচ্ছা ঠাকুর কিভাবে পূর্ণ করলেন! দেবেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণায় বিগলিত, বাক্যহারা।

দেবেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরের একটি প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিয়ে এই ভাব প্রকাশ করেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র গতি এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কথা-প্রসঙ্গে যেদিন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁগা, তুমি যে এখানে আসছো-যাচ্ছো, তা কি বুঝলে? কি হোল?" দেবেন্দ্র-নাথ একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, "তা মোশাই, এমন কিছু বিশেষ তো বুঝতে পারছিনি, তবে ধর্ম সম্বন্ধে কি ঈশ্বর সম্বন্ধে জানবার জন্য আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না, আর মনটাও তেমন হাক্‌-পাক্‌ করে না।"[২৫]

২৩ ঐ, পৃঃ ৪০ ২৪ ঐ, পৃঃ ৪১ ২৫ ঐ, পৃঃ ৫২

শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য সঙ্গলাভে দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক পথে আরও অগ্রসর হন। ধ্যান, জপ, দর্শন, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি সাত্ত্বিক বিকার-গুলি প্রকাশ পেতো। এই সকল ঘটনা শুনে পরবর্তিকালে ঠাকুর মায়ের কাছে দেবেন্দ্রনাথের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন, "মা, ওকে এত দিস্ না। আহা, ও ছাপোষা লোক, ওর মুখ চাহিয়া অনেকগুলি রহিয়াছে।"[২৬]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে একজন মহাপুরুষ একথা সম্যক্‌রূপে জেনেও, তিনি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী কিনা পরীক্ষা করবার জন্য একদিন গোপনে ঠাকুরের বিছানার তোষকের তলায় একটি মুদ্রা রাখেন। ঠাকুর ঘরে এসে বিছানায় বসে বুঝতে পারেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বলেন, "কি, আমায় বিড়ে দেখ্‌ছ নাকি? তা বেশ, বেশ।"[২৭] এই উক্তিতে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত লজ্জিত হন। ভাবেন, আমি বাতুল, এতবড় মহাপুরুষকে আমি সামান্য পরীক্ষা করে যাচাই করছি!"

শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার কথাও দেবেন্দ্র-নাথ পরবর্তিকালে বলেছেন। একদিন গরম মিহিদানা এনেছেন। আন্‌বার সময় কিছুটা অশুচি হয়েছে। সেজন্য ঠাকুরকে দিতে পারছেন না। ঠাকুরের ঘরে এসে গোপনে মিহিদানার ঠোঙাটি তাকে রেখেছেন। কিন্তু অন্তর্যামী ঠাকুর পরে সেই গরম মিহিদানা খেয়ে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই আচরণে বিগলিত। ভাবেন, হে করুণাময়, তোমার নাম করে আনলুম, তোমায় দিতে ভরসা হল না। দীননাথ তাই আমার প্রাণের ক্ষোভ নিবারণের জন্যই খাচ্ছেন। অলক্ষ্যে দেবেন্দ্রের চোখে জল পড়িল।[২৮]

একটি অদ্ভুত স্বপ্নের কথা তিনি ঠাকুরকে বলেন, স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি স্ত্রীলোক এবং রামকৃষ্ণদেবের পত্নী।[২৯] একথা শুনে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলেন, "বটে, বটে, বড় ভাগ্যের কথা; এ রকম স্বপ্ন দেখা বড় ভাগ্যের কথা।... কি জান, তোমার গোপীভাব কি-না, তাই ও রকমটা স্বপ্নে দেখেছ—।"[৩০] বহুদিন পরে ঠাকুর যে একদিন তাকে বলেছিলেন, "ওগো, তোমার সঙ্গে আমার ওভাব নয়", আজ তা দেবেন্দ্র-নাথ সম্যক্ বুঝতে পারলেন। যদিও ঠাকুর তাঁকে দীক্ষা বা মন্ত্র দেননি, কিন্তু তাঁর জিহ্বায় কিছু লিখে দিয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম পরবর্তিকালে তাঁর রচিত সঙ্গীতের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। 'দেবগীতি'তে তার লিখিত সঙ্গীত সংখ্যা ১১৪। গ্রন্থশেষে চারটি কবিতাও আছে। এর মধ্যে ৪২টি গান শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক। দেবেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা 'শ্রীগুরুস্তবাষ্টক' বিখ্যাত। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর মনের বিভিন্ন ভাব-তরঙ্গ তাঁর লিখিত সঙ্গীতের মধ্যেই প্রকাশিত —এটাই তাঁর মহামানবের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ঠাকুরের আচরণ আমরা কি বুঝি? মানুষের মন-গড়া মাপকাঠি দিয়ে তাঁহাকে মাপিতে যাইয়া আমরা ভুল করি। তাঁহার বাহিরটা মানুষেরই মত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার আচরণ, তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ, তপস্যা, তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি, জ্ঞান এবং প্রেমের লোক-শিক্ষা মানুষে কখনও দেখা যায় না। তিনি চিরদিনই আদর্শ—তাঁহার তুলনা একমাত্র তিনিই।"[৩১]

## (৪) শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত ভবনাথ চট্টো-পাধ্যায়। ঠাকুর ভবনাথকে ঈশ্বরকোটিরূপে

২৬ ঐ, পৃঃ ৬২ ২৭ ঐ, পৃঃ ৭১ ২৮ ঐ, পৃঃ ৯১

২৯ ঐ, পৃঃ ১০৬ ৩০ ঐ, পৃঃ ১০৬-৭ ৩১ ঐ, পৃঃ ৮৬

সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে শ্রীমুখে বলেছেন,—"নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।"[৩২] আরও বলেছেন, "এরা (নরেন্দ্র, নারায়ণ) ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছে।"[৩৩] এছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের মধ্যে ভবনাথকে বার বার প্রশংসা করে উচ্চ আসনে বসিয়েছেন। কথামৃতের বিভিন্ন জায়গায় তার উল্লেখ আছে। এহেন ঠাকুরের একান্ত প্রিয় উচ্চকোটিরূপে চিহ্নিত ভবনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কি ধারণা তা স্বাভাবিকভাবেই ভক্ত-সাধারণ আগ্রহী।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ভবনাথের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—ভক্তি ও ভালবাসা। এ চিত্র বিশেষ করে কথামৃতের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো আছে। ভবনাথের উক্তির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তুতি বিশেষ জানা যায় না। তবে তাঁর আচরণ ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে বোঝা যায় তাঁর অভিপ্রায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভের পূর্বে ঈশ্বরপরায়ণ ভবনাথের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল।[৩৪] পরে আসেন ঠাকুরের সংস্পর্শে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য তাঁকে কিছু গঞ্জনাও শুনতে হয়েছিল। কিন্তু সেকথা তিনি গ্রাহ্য করেননি।[৩৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে অধিকাংশ সময়ে ভবনাথকে দেখা যায় মৌন অথবা স্বল্পবাক্। যেন অনুগত শিষ্য দ্রষ্টা আচার্যের কাছে নীরব শিক্ষার্থী। সমগ্র 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণ-ভবনাথ প্রসঙ্গ প্রায় কুড়িটি পর্যায়ে আছে। তাছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুপস্থিতিতেও উল্লেখ আছে। যেখানে ভবনাথ উপস্থিত সেইসব স্থানে দু-একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি এবং প্রশ্ন শোনা যায়।

যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বলছেন, "তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ হলেও…ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।"[৩৬] ভবনাথ তখন মৌনতা ভেঙ্গে স্বগতই যেন বলে উঠেন,—"বাঃ! কি চমৎকার কথা!"[৩৭] অর্থাৎ তিনি ঠাকুরের সহজ সরল ব্যাখ্যায় মুগ্ধ। ভাবেন এত শক্ত কথার কত সুন্দর অভিব্যক্তি!

সংস্পর্শে ভবনাথ ক্রমশঃ বৈরাগ্যবান হয়ে উঠেন। তাঁর অন্তরে জাগে ত্যাগের স্পৃহা। উদ্দেশ্য অবশ্যই ঈশ্বরলাভ। সেজন্য তাঁর ভাবের বহিঃপ্রকাশ একদিন দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরে। "…সকলে উত্তর-পূর্ব বারান্দায় আছেন। হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দা হইতে ব্রহ্মচারী বেশে আসিয়া উপস্থিত। গায়ে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, মুখে হাসি।"[৩৮] এই দৃশ্য দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবনাথের উদ্দেশ্যে বললেন, "ওর মনের ভাব ঐ কিনা, তাই ঐ সেজেছে।"[৩৯]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবনাথকে একদিন বলেছিলেন, "অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হলো।"[৪০] এটা নিঃশংসয়ে বলা যেতে পারে যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা ছিল নিখাদ। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের একজন জীবনীকার লিখছেন, "ঠাকুরের প্রতি ইঁহার (ভবনাথের) যেরূপ ভালবাসা, তার কণামাত্র পেলে আমরা কৃতার্থ হই।"[৪১]

সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় ভবনাথের মনে বেদনাবোধ ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের

৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৭।৬ ৩৩ ঐ, ১।১৪।১০

৩৪ 'ব্রাহ্মণ তনয় হইলেও আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মজ্ঞানী' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত; শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল (২য় সংস্করণ), পৃঃ ৩৩৫

৩৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ২৯১-৯২

৩৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৩।১ ৩৭ ঐ, ৪।১৩।১ ৩৮ ঐ, ২।১৭।৩,

৩৯ ঐ, ২।১৭।৩, ৪০ ঐ, ৫।১২।৬ ৪১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৩৩৫

প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি ও ভালবাসা তাঁকে সাধন পথে উন্নীত করে। ভবনাথের লেখা, উক্তি বা পত্রের মাধ্যমে বিশেষ কোন শ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি পাওয়া যায় না। তবে তদানীন্তন 'সখা' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক রচনার কথা জানা যায়। তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল।

"...আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি ঠিক চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত এবং তাঁহারই ন্যায় ভাবুক। অনেকে স্বচক্ষে ইঁহার ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছেন। সহজ সহজ কথায় কঠিন ধর্মকথাসকল এমন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে বালক ও মহিলাগণ অবাধে তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার উক্তিসকল ঈশ্বর সাধকদিগের বড় আদরের বস্তু।"

"পরমহংসকে দেখিয়া শ্রীকেশব চন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাহার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেন। কেশব চন্দ্র তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, কখন তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিতেন না।......ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকা ও সেরূপ সাধন করা কেশব চন্দ্র সেন পরমহংস মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্ম সমাজে প্রচার করেন। কেশব চন্দ্র সেন তাঁহার কথা ও উপদেশ সকল 'মিরার', 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়া সাধারণকে তাঁহার বিষয় জ্ঞাত করান। ...এইরূপে তিনি জনসাধারণের (কাছে) পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কখন বিদ্যাভ্যাস করেন নাই বটে, কিন্তু কেশব চন্দ্র সেনের ন্যায় মহাপণ্ডিত ও জ্ঞানী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তিগণও, তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।"

"তিনি গুরুগিরি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার নিকট যাহারা সর্বদা গমনাগমন করিতেন তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহাদিগকে প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন, 'আমি সকলের দাসানুদাস।' স্ত্রীলোক মাত্রকেই তিনি আনন্দময়ী মার ছায়া জানিয়া মাতৃবোধে প্রণাম করিতেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। কত ঘৃণিত পাপীকে তিনি স্নেহভরে আলিঙ্গন দানে পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে সকলে গুরুবোধে ভক্তি করিলেও তিনি কাহাকেও শিষ্যজ্ঞান করিতেন না। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে তিনি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা স্নেহ করেন।... বাস্তবিক তাঁহার ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হইত।...তাঁহার এমনই প্রভাব ছিল যে, তাঁহার কাছে যাইলে লোকের কঠোর মন নরম হইত, ধর্মগ্রন্থ পাঠে বা অন্য প্রচারকদিগের সহস্র উপদেশে যে ফল না পাওয়া যায় তাঁহার কাছে একবার বসিলে তদপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যাইত।

"...তিনি কোন নূতন ধর্মমত প্রচার করেন নাই; যাহার যেরূপ বিশ্বাস তাহাকে তিনি তদনুরূপ সাধনা করিতে বলিতেন এবং তাহাদের পরিত্রাণ হইবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি সত্যবাদীকে কত শ্রদ্ধা করিতেন, নিজে যাহা বলিতেন তাহা নিশ্চয়ই করিতেন।

"অনেকের বিশ্বাস মানুষ পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞানী এবং ধার্মিক হইতে পারে না। পরমহংস চরিত পাঠে সে সন্দেহ দূর হইবে সন্দেহ নাই।"[৪২]

স্বল্পবাক্ ভবনাথ সীমিত কয়েক ছত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি অনুপম চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন যা ভক্ত-মণ্ডলীর কাছে এক অতুলনীয় সম্পদ। নীরব সাধক ভবনাথ সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীকে দিয়ে গেছেন পরমহংসদেবের মহাযোগী মূর্তির একটি আলোক-চিত্র যা এখন ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছে [ক্রমশঃ]

৪২ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস। (৩য় মুদ্রণ ১৩৭৫) পৃঃ ৮১-৮৩

# প্রতাপচন্দ্র হাজরা

## স্বামী চেতনানন্দ

[ মাঘ, ১৩৯৩ সংখ্যার পর ]

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য দুর্লভ। তিনি দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাটবাজার খুলে রেখেছিলেন। যে যেত সেই আনন্দে ভরপুর হয়ে যেত। তিনি শুধু তত্ত্বকথাই শোনাতেন না, ভক্তদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, মজার গল্প-কৌতুক, নাচ-গান, যাত্রা-কথকতা, পালাপার্বণ, বনভোজন—সব কিছুতেই যোগ দিতেন।

কথামৃতের ( ২।১৭।৩ ) বর্ণনা : "গোলকধাম খেলা হইতেছে। ভক্তেরা খেলিতেছেন, হাজরাও খেলিতেছেন। ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাস্টার ও কিশোরীর ঘুঁটি উঠিয়া গেল। ঠাকুর দুইজনকে নমস্কার করিলেন। বলিলেন, 'ধন্য তোমরা দুভাই! ( মাস্টারকে একান্তে ) আর খেলো না।' ঠাকুর খেলা দেখিতেছেন। হাজরার ঘুঁটি একবার নরকে পড়িয়াছিল। ঠাকুর বলিতেছেন, 'হাজরার কি হল?—আবার?'

অর্থাৎ হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়িয়াছে। সকলে হো হো করিয়া হাসিতেছেন।

লাটুর ঘুঁটি সংসারের ঘর থেকে একেবারে সাৎচিৎ-মুক্তি। লাটু ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'নোটোর যে আহ্লাদ—দেখ। ওর উটি না হলে মনে বড় কষ্ট হত। ( ভক্তদের প্রতি একান্তে ) এর একটা মানে আছে। হাজরার বড় অহংকার যে, এতেও আমার জিত হবে। ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না। সকলের কাছেই জয়।'"

হাজরা যদি দেখত ঠাকুর কোন ব্যক্তিকে বিশেষ খাতির-যত্ন করছেন, তবে সে ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে বলেন : "শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছিল—অদ্বৈত বংশ। ইচ্ছা এখানে একরাত্রি দুরাত্রি থাকে। আমি যত্ন করে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা বলে কি 'খাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও।' একথার মানে এই যে, দুধটুধ পাছে চায়, তা হলে হাজরার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বললুম—তবে রে শালা! গোঁসাই বলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর তুই সংসারে কামিনীকাঞ্চন লয়ে নানাকাণ্ড করে—এখন একটু জপ করে এত অহংকার হয়েছে! লজ্জা করে না!" ( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১৫।১ )

একদিন ঠাকুর মজা করে হাজরাকে বললেন ভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল্যায়ন করতে। তিনি হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বলো কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, 'নরেন্দ্রের ষোল আনা; আর আমার একটাকা দুই আনা।' জিজ্ঞাসা করলাম—আমার কত হয়েছে? তা বললে, 'তোমার এখনও লালচে মারছে—তোমার বার আনা।'" ( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১৫।১)।

হাজরা ছিল নরেন্দ্রের ফেরেণ্ড বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হাজরা নরেন্দ্রকে তামাক সেজে খাওয়াত আর দুজনে খুশি মনে উচ্চ দর্শন আলোচনা করত। লাটু মহারাজ স্মৃতিকথাতে ( ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০৭-৮ ) বলেছেন, "হাজরার সাথে লোরেন ভাই-এর ভারী মিল থেতো। হাজরা তাকে তামাক সেজে খাওয়াতো। তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিত। লোরেন ভাই তাকে ঠাট্টা করে বলতো—'তুমি তো একজন ভারী সিদ্ধপুরুষ দেখছি। তোমার মত মালা জপতে খুব কম লোককে দেখি। তোমার মালাটি তো বেশ—বড় বড় দানা, ভারী চক্চকে। তোমার মত সিদ্ধপুরুষ—আর কে

আছে ?' একথা শুনে হাজরার ভারী অহংকার হয়েছিলো। হামাদের সামনে বলতো—'তোরা আমায় কী বুঝবি ? তোদের লোরেন হামায় ঠিক বুঝেছে। উনিও ( শ্রীরামকৃষ্ণ ) বুঝতে পারেননি।'"

সন্দিগ্ধপরায়ণ হাজরা বুদ্ধিমান ছিল। নরেন্দ্র যখন পাশ্চাত্যের অজ্ঞেয়বাদীদের প্রসঙ্গ করতেন হাজরা তা বুঝত। নরেন্দ্র যখনই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন দু-এক ঘণ্টা হাজরার সঙ্গে কাটাতেন এবং হাজরা মনোযোগ দিয়ে নরেন্দ্রের কথা শুনত এবং তাকে প্রশংসা করত। নরেন্দ্রও হাজরার সাজা তামাক খেতেন এবং তার সরল বাক্যালাপ উপভোগ করতেন। পিতৃ-বিয়োগের পর তাঁর বাড়িতে বড়ই অর্থাভাব হয়েছিল। ঐ সময় তিনি প্রায়ই হাজরার কাছে বসে গল্প করতেন। একদিন ঠাকুর বললেন, "তুই কি হাজরার কাছে বসেছিলি ? তুই বিদেশিনী সে বিরহিনী ! হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।" ( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।১৬।২ ) সকলে হাসল। ঠাকুর হাজরার প্রসঙ্গে বললেন, "আমি যখন বলি, 'তুমি কেবল বিচার কর, তাই শুষ্ক।' সে বলে, 'আমি সৌর সুধা পান করি, তাই শুষ্ক।' আমি যখন শুদ্ধা ভক্তির কথা বলি, যখন বলি শুদ্ধ ভক্ত টাকা-কড়ি ঐশ্বর্য কিছু চায় না, তখন সে বলে, 'তাঁর কৃপাবন্যা এলে নদী ত উপচে যাবে, আবার খালডোবাও জলে পূর্ণ হবে। শুদ্ধা ভক্তিও হয়, আবার ষড়ৈশ্বর্যও হয়। টাকাকড়িও হয়।'" ( ঐ )

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে ছোট খাটটিতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন এবং বাবুরাম মহারাজ তাঁকে পাখার বাতাস করছিলেন। স্বামীজী হাজরার সঙ্গে বসে পূর্ব বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে হাজরা স্বামীজীকে বলল, "তোরা ছেলে মানুষ", ওঁর কাছে যাওয়া আসা করিস, আর উনি তোদের সন্দেশটা আমটা খাইয়ে ভুলিয়ে দেন। ওঁকে ধর। চেপে ধরে কিছু আদায় করে নে।" ঠাকুরের কানে এসব কথা পৌছান মাত্র তিনি ধড়মড় করে উঠে উলঙ্গ অবস্থায় এক পাটি চটি ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে সজোরে বললেন, "নরেন, চলে আয় ; ওখান থেকে চলে আয়। ওসব পাটোয়ারী বুদ্ধি শুনিসনি। যারা ভিকিরী তারা 'বাবু, একটা পয়সা দাও, বাবু, একটা পয়সা দাও' বলে কানের পোকা বার করে। বাবুও 'দে একটা পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দে' বলে, একটা পয়সা ফেলে বিদেয় করে দেয়। তোরা যে আপনার লোক, তোদের কি চাইতে হবে। আমার যা কিছু আছে সবই যে তোদের।" ( সান্নিধ্যে, রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, পৃঃ ১৬ )

হাজরা যুবক ভক্তদের মনকে দূষিত করছিল, গৃহীভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তির জাল সৃষ্টি করছিল এবং পরোক্ষে ও অপরোক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারের বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ সব সহ্য করে যেতেন। সে ধনী ভক্তদের কাছে বলে বেড়াতে লাগল, "রাখাল টাখাল যা সব দেখছ ওরা জপতপ করতে পারে না—হো হো করে বেড়ায়।" ( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।১৪।১ ) লাটু মহারাজ স্মৃতিকথাতে ( ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০১-৮ ) বলেছেন, "একদিন হাজরার ইচ্ছে হোলো লোককে উপদেশ দিবে। সেদিন যারা দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলো তাদের সবাইকে জানাতে লাগলো, 'উনি আজ এখানকে নেই—উখানে বসে আর কি হবে ? ইখানে এস—দুটো কথা শোনো।' বাকী কেউ কি তার কাছে বসলো না ! একজন সেদিন বসতে গিয়েছিলো, ঠাকুর তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিলেন। হাজরার কি দুঃখু !··· হাজরা সোঽহং জপ করতো, ভারী তর্ক লাগাতো,

তাইতে উনি হামাদের বলেছিলেন, 'হাজরা ইখানকার মত উল্টে দিতে চায়; তোরা ওর সাথে বেশী মিশিসনি, বাবু! তোদের ভক্তির ঘর, শুকনো জ্ঞানে তোদের কাজ কি?'" পক্ষী-মাতা যেমন তার শাবকদের ডানা মেলে ঝড়-ঝাপ্টা থেকে রক্ষা করে ঠাকুর তেমনি তার সন্তানদের রক্ষা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সত্যানুভূতি লাভ করে তবে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু হাজরা সকলের সামনে ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ করত এবং তর্ক জুড়ে দিত। শ্রীম কথামৃতে ( ২।১৭।১ ) ঠাকুরের মনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন:

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভবনাথের প্রতি )—কি জানিস, যারা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। "...হাজরা কোন রকমে বিশ্বাস করবে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয় তাকে ব্রহ্ম বলে কই; যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু; অভেদ। অগ্নি বললে, দাহিকা শক্তি অমনি বুঝায়; দাহিকা শক্তি বললে, অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো নাই।

"তখন প্রার্থনা করলুম, মা, হাজরা এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। তার পরদিন, সে আবার এসে বললে, হাঁ মানি। তখন বলে যে, বিভু সব জায়গায় আছেন।"

যাহোক ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। দিন দিন হাজরার অহংকার-অভিমান এত বেড়ে গেল যে শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে তা অসহনীয় হয়ে উঠল। সে মন্দিরের ঠাকুর-চাকরদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত, এমন কি তাদের সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করত। ঠাকুরের পরিচিত বলে মন্দিরের কর্মচারীরা হাজরাকে অপমান করতে সাহস পেত না। হাজরা কিভাবে দক্ষিণেশ্বরের মনোরম শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াকে কলুষিত করছিল শ্রীম কথামৃতে ( ২।২৪।৫ ) উল্লেখ করেছেন:

নরেন্দ্র ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—হাজরা এখন ভাল হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই জানিস্ নি, এমন লোক আছে, বগলে ইট, মুখে রাম রাম বলে।

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না, সব জিজ্ঞাসা করলুম, তা সে বলে 'না'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার নিষ্ঠা আছে, একটু জপটপ করে। কিন্তু অমন!—গাড়োয়ানকে ভাড়া দেয় না!

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না, সে বলে ত 'দিয়েছি'—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথা থেকে দেবে?

নরেন্দ্র—রামলাল টামলালের কাছ থেকে দিয়েছে, বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই সব কথা জিজ্ঞাসা কি করেছিস?

"মাকে প্রার্থনা করেছিলাম, মা, হাজরা যদি ছল হয়, এখান থেকে সরিয়ে দাও। ওকে সেই কথা বলেছিলাম। ও কিছু দিন পরে এসে বলে, দেখলে আমি এখনও রয়েছি। ( ঠাকুরের ও সকলের হাস্য )। কিন্তু তার পর চলে গেল।

"হাজরার মা রামলালকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, 'হাজরাকে একবার রামলালের খুড়ো মশায় যেন পাঠিয়ে দেন। আমি কেঁদে কেঁদে চোখে দেখতে পাইনা।' আমি হাজরাকে অনেক করে বললুম, বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এস; তা কোন মতে গেল না। তার মা শেষে কেঁদে কেঁদে মরে গেল।"

নরেন্দ্র—এবারে দেশে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা শালা! দূর দূর!

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মে শ্রীম কথামৃতে (৩।১৫।১) লিখেছেন :

"হাজরার অহংকারের কথা পড়িল। কোনও কারণে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী ত্যাগ করিয়া হাজরার চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

নরেন্দ্র—হাজরা এখন মান্‌ছে, তার অহংকার হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা বিশ্বাস ক'রো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্য ওরূপ কথা বলছে। (ভক্তদিগকে) নরেন্দ্র কেবল বলে, 'হাজরা খুব ভাল লোক।'

নরেন্দ্র—এখনও বলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? এত সব শুনলি।

নরেন্দ্র—দোষ একটু,—কিন্তু গুণ অনেকটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিষ্ঠা আছে বটে।"

গুণগ্রাহী শ্রীরামকৃষ্ণ বিন্দুতে সিন্ধু দেখতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা বলবার নয়, কেবল দেখবার। এ লীলা রঙ্গে ভরা। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে হাজরা ভণ্ডতপস্বীর অভিনয় করেছে। তার অভিনয় সুন্দর ও সার্থক। হাস্য, কৌতুক ও অদ্ভুত রস পরিবেশন করে সকলকে হাসিয়েছে। যাহোক হাজরার অভিনয় যখন শেষ হল, ঠাকুর মাকে বললেন—হাজরাকে সরিয়ে নিতে। সরল ঠাকুরের পেটে কথা থাকত না। হাজরাকে সরিয়ে দেবার প্রার্থনাটি আবার হাজরার কাছে এসে বললেন। হাজরাও তেমনি কয়েকদিন পরে ঠাকুরকে বলল, "দেখলে আমি এখনও রয়েছি।" হাজরার বলবার উদ্দেশ্য যে মা কালী ঠাকুরের প্রার্থনাটি শোনেননি। ঠাকুর হেসেছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই হাজরা দক্ষিণেশ্বরের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতার মেছুয়াবাজারের ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে সাময়িকভাবে উঠলেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত তার যোগাযোগও হৃদ্যতা পূর্ববৎই ছিল। নরেন্দ্রনাথ কৌতুকছলে হাজরাকে "থাউসেণ্ডা (Thousand-আ) বলে ডাকতেন। হাজরার হাজার টাকার দরকার ছিল, সুতরাং তার নামটি সার্থকই হয়েছিল।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানে কল্পতরু হয়ে বহু ভক্তকে 'চৈতন্য হউক' বলে আশীর্বাদ করেন। ঐকালে হাজরা ঠাকুরের শিষ্যদের সঙ্গে কাশীপুরে কয়েকদিনের জন্য বাস করছিল। কিন্তু এমনই তার দুর্ভাগ্য যে ঠাকুর যখন কল্পতরু হন, তখন সে সেখানে অনুপস্থিত ছিল। ফিরে এসে সব শুনে হাজরার মনস্তাপ হয়। সে বন্ধুবর নরেন্দ্রকে ধরে বসল তাকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে আশীর্বাদ পাইয়ে দিতে। দুর্বল, পতিত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত মানুষের প্রতি নরেন্দ্রের জন্মাবধি অনুকম্পা ছিল। তিনি হাজরাকে নিয়ে উপরে ঠাকুরের ঘরে গেলেন। ঠাকুর তখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছিলেন। নরেন্দ্র ঠাকুরকে ধরে হাজরাকে কৃপা করবার জন্য বললেন। অনিচ্ছুক ঠাকুর নরেন্দ্রের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। পুঁথির (পৃঃ ৬০৮) ভাষায় : "উত্তরে কহিলা রায় এবে নাহি হবে। সময় সাপেক্ষ কাজে শেষেতে পাইবে॥" লাটু মহারাজও স্মৃতিকথাতে (২য় সংস্করণ; পৃঃ ১০৭) বলেছেন, "লোরেন ভাইকে ধরে হাজরা তরে গেলো। লোরেনের জেদেই ঠাকুর তাকে কৃপা করেন।"

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুআরি হাজরা সারাদিন উপবাস করেন। হাজরার হাজার দোষ সত্ত্বেও সে ঠাকুরের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করত। সে জোর করে কৃপালাভ করবে এই ভরসায় ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হল। ঠাকুর তার মতলব বুঝে সেবককে ডেকে বলেন, "ওকে যেতে বল এখান থেকে।" হাজরা ঠাকুরের পা দুটি জড়িয়ে ধরে। ঠাকুর অত্যন্ত বিরক্ত বোধ

করেন। তিনি হাজরাকে বলেন, "এসব কি ঢঙ্ করছ? পা ছাড়—লাটুকে ডেকে দাও।" এত বলাতেও হাজরা ঠাকুরের পা ধরে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ—"ছাড়, ছাড় লোকে দেখবে; নানান কথা বলবে।" হাজরা নিরস্ত হয়ে বিদায় নিল। ( উদ্বোধন, ৭৬তম বর্ষ, পৃঃ ৫২৮-২৯ )

এর কিছু কাল পরে হাজরার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথ পিতাকে নিয়ে দেশে যায়। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে হাজরা পারিবারিক জীবনের সঙ্গে খাপখাওয়াতে পারল না। সে একটা বৈঠকখানা ঘরে থাকত। তারপর কয়েকদিন পরে আবার সে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর হাজরার অহংকার আবার ফুলে উঠল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সারদাপ্রসন্ন (ত্রিগুণাতীতানন্দ) তীর্থযাত্রার পথে এক রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। সেখানে হাজরার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

"মাষ্টার ( সহাস্যে )—হাজরা মহাশয়ের এখন কি ভাব?

প্রসন্ন—হাজরা বলে, আমাকে কি ঠাওরাও? ( উভয়ের হাস্য )।

মাষ্টার ( সহাস্যে )—তুমি কি বললে?

প্রসন্ন—আমি চুপ করে রইলাম।

মাষ্টার—তার পর?

প্রসন্ন—আবার বলে, আমার জন্য তামাক এনেছ? (উভয়ের হাস্য)। খাটিয়ে নিতে চায়! (হাস্য)।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২। পরিশিষ্ট।১)

লাটু মহারাজ স্মৃতিকথাতে ( ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০৭ ) "উনার ( ঠাকুরের ) দেহরক্ষার পর তাঁর ( হাজরার ) ধারণা হয়েছিল—সে একজন বড় অবতার, ঠাকুরের চেয়েও বড়।"

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ধুমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপিত করে। হাজরা সেদিন ঠাকুরের উত্তর-পূর্ব বারান্দায় বসে জপ শুরু করে এবং ভক্তদের সঙ্গে দেখা করে।

ক্রমে হাজরার জীবনে রূপান্তর শুরু হল। নিজের অসার অহংকারের সঙ্গে খেলে খেলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভণ্ড যদি নিজের ভণ্ডামি বোঝে তখন সে ভণ্ডামি করতে লজ্জা পায়। মায়ামুগ্ধ মানব নিজের দোষ ও ভণ্ডামি দেখতে পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও কৃপার ফল ফলতে শুরু করল।

হাজরা দেশে ফিরে আবার পারিবারিক জীবন শুরু করল। ঐকালে তার অপর একটি পুত্র হয়—নাম শরৎচন্দ্র। প্রথমে হাজরা ঠাকুরকে একটা সাধারণ সাধুরূপে গণ্য করত; শেষে সে বুঝেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা এবং তাঁর শরণ নিয়েছিল।

হাজরার শেষ জীবন সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল হওয়া সকলের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। জনৈক ভক্ত একবার শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করেন, "হাজরার কি হল?" উত্তরে শ্রীম বলেন, "ঠাকুরের নাম করতে করতে তার শরীর যায়।" ( শ্রীম কথা, ২।১৪৬ ) ১৩০৬ সনের ( ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ ) চৈত্র মাসে দেশের বাড়িতে হাজরার মৃত্যু হয়। ১৩১০ সনের পৌষ মাসে তত্ত্বমঞ্জরী নামক মাসিক পত্রিকায় ( ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ২১৪-১৬ ) হাজরার বিস্তারিত মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়:

যাঁহারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র হাজরা নামক জনৈক সাধকের বিষয় অবগত আছেন। ইনি একজন প্রকৃত জাপক ছিলেন। ইনি বহুকাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট বাস করিয়াও তাঁহাকে সাধু ব্যতীত ভগবানের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। বরং যাঁহারা তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতেন, তাঁহাদের বিদ্রূপ করিতেন। তাই কোনও সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনুনয় করিয়া বলিয়াছেন যে,

আপনি এঁকে কৃপা করুন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহার শেষ সময়ে করিব। কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার অদ্ভুত দেহত্যাগের কথা শুনিয়া সকলেই চমকিত হইয়াছেন! তিন দিবস সামান্ত জ্বর হইয়াছিল। ইহার অন্য কোনও অসুখ ছিল না। গ্রামের জনৈক ডাক্তারও দেখিয়াছিলেন; হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা হাজরা মহাশয় তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "দেখ! তুমি কাল প্রত্যুষে সকলকে বলিয়া আসিবে যে, তাহারা সকলে যেন আমাদের বাড়িতে বেলা ৯টার আগে আহারাদি করিয়া আসে। কাল ৯টার সময় আমি মরিব।" তাঁহার স্ত্রী মনে করিলেন যে, বড়ই জ্বরের জন্য ভয় পাইয়া এইরূপ বলিতেছেন, তিনি ও-কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তৎপরদিন খুব ভোরে উঠিয়া হাজরা মহাশয় তাঁহার স্ত্রীকে উঠাইয়া জোর করিয়া সকলের বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন। কেহ বা হাজরা পাগল হইয়াছে বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, কেহ বা রঙ্গ দেখিতে আসিলেন। বেলাও প্রায় সাড়ে আট ঘটিকা হইল। হাজরা মহাশয় মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছেন। চিরদিনই হাজরা মহাশয় মালা জপ করেন। ইহাই তাঁহার স্বভাব, সকলেই জানে। আজও তাহাই করিতেছেন। বাড়িতে কতকগুলি লোকও আসিয়াছে। হঠাৎ সকলে হাজরা মহাশয়ের মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখিতে পাইলেন, হাজরা মহাশয় ঠিক যেন কোন লোকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন! কিয়ৎক্ষণ পরেই হাজরা মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "আসুন! আসুন! এই যে ঠাকুর এসেছেন। ঠাকুর এতদিন পরে স্মরণ করেছেন?" এই কথা বলিয়াই তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "ওগো, একটা আসন দাও, শীঘ্র দাও, দেখ্‌চো না, পরমহংসদেব এসেছেন"। স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছেন। পুনরায় হাজরা মহাশয় বলিলেন, "শীঘ্র দাও।" স্ত্রী কি করেন, কাজেই সেইখানে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন। হাজরা মহাশয় বলিতেছেন, "ঠাকুর! আপনাকে একটু দয়া করতে হবে। এই আসনের উপর বসুন, যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিকট অনুগ্রহ করিয়া থাকুন।" এই কথা বলিয়াই আবার হাজরা মহাশয় জপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আসুন! আসুন! এই যে, রামদাদা এসেছেন। আমার কি সৌভাগ্য!" আবার স্ত্রীকে বলিলেন, "ওগো আর একখানা আসন দাও, রামদাদার জন্যে।" হাজরা মহাশয় পুনরায় মহাত্মা রামচন্দ্রকেও জোড় হাত করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আপনিও অনুগ্রহ করিয়া মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত আমার নিকট থাকুন। আবার জপ করিতে লাগিলেন। জপ করিতে করিতে তৃতীয়বার বলিয়া উঠিলেন, "আসুন! আসুন! এই যে যোগীন মহারাজ এসেছেন। আহা! কি আনন্দের দিন!" পুনরায় ইঁহাকেও আসন প্রদান করিয়া মৃত্যু সময় পর্যন্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎপরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে করজোড়ে বলিলেন যে, "ঠাকুর! যদি এতই দয়া করেছেন, তবে আর একটু কষ্ট করুন। অনুগ্রহ করিয়া তুলসীতলায় চলুন। আমি তুলসীতলায় দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি।" ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া হাজরা মহাশয় তাঁহার স্ত্রীকে তুলসীতলায় তিনখানি আসন দিতে বলিলেন এবং তথায় তাঁহার শয্যা করিতে বলিলেন। অতঃপর তুলসীতলায় আসিয়া তিনখানি আসনের উপর তিনজনকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং আপনি শয়ন করিলেন; করিয়া মালা লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। মুখে তিনবার বলিলেন, হরি, হরি, হরি। আর হাজরা মহাশয়ের সংজ্ঞা নাই। একি!

সত্য সত্যই যে হাজরা মহাশয় ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, এইরূপ সকলে চিন্তা করিতে করিতে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক হাজরা মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তখন সকলে অবাক্ হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলেরই মুখে এক কথা ধন্য হাজরা মহাশয়! তুমি যথার্থ মহাপুরুষ ছিলে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের এক একটি সাঙ্গোপাঙ্গের অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়া কত মানবের যে মোহ-তিমির বিদূরিত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহারা স্বচক্ষে এই সকল লীলা দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য!

হাজরাকে উপেক্ষা করবার উপায় নেই। আজ থেকে শত বৎসর আগে এই ধূলির ধরণীতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূল শরীরে লীলা করছিলেন, তখন হাজরাও তাঁর লীলার সহায়ক ছিল। অক্ষয় কুমার সেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা'-তে (পৃঃ ৬৩-৬৪) লিখেছেন: "হাজরা রামকৃষ্ণলীলায় একটি বড় মজার জিনিস। ঠাকুর হাজরার সঙ্গে খেলা করে অবিশ্বাসী জীবকে ভূরি ভূরি জ্বলন্ত শিক্ষা দিয়েছেন, আর নিজের ভক্তদের একটা রঙ্গ দেখিয়েছেন। তিনি এটা আর অবিশ্বাস করতে পারলেন না যে, ঠাকুরের কৃপায় মানুষ বিনা চাষে ঘরে বসে ষোল আনা পাকা ফসল পায়। হাজরার সঙ্গে ঠাকুরের খেলাটি শুনলে অতি সহজে বিস্তর রামকৃষ্ণমহিমা দেখা যায়; দেখলে অতি বড় অবিশ্বাসী হৃদয়েও ঠাকুরের পাদপদ্মে অটল বিশ্বাস জন্মে। বেদবাক্য অপেক্ষা গুরু-বাক্যের গুরুত্ব গভীরত্ব ও সদ্যফলদায়িনী শক্তি অধিক। আর একটি বিশেষ কথা—ঠাকুরের শরণাপন্ন হলে যে হেলায় ঈশ্বরলাভ হয়, এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না।"

# একটি অত্যাশ্চর্য বোটানিক্যাল গার্ডেন

শ্রীমতী সতী দত্ত

আজ কিছুদিন হল আমেরিকায় এসেছি। যে সৌন্দর্য এখানে এসে উপভোগ করছি তার কিছুই লিখে বোঝাতে পারছি না। বহু দ্রষ্টব্য-বস্তুর মধ্যে 'Huntington Botanical garden' (হান্টিংটন বোটানিক্যাল গার্ডেন) একটি। সেখানে গিয়ে মনে হয়েছিল যেন নন্দনকাননে এসেছি। ছোটবেলা থেকে 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' বললেই আমাদের শিবপুরের বোটা-নিক্যাল গার্ডেনের কথাই মনে পড়ে যায়। কিন্তু এই বাগানের সাথে শিবপুরের কোন তুলনাই হয় না। এর যে-কোন একটি বিভাগের আয়তন ও বৈচিত্র্য পুরো শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সমান। আর রক্ষণাবেক্ষণের কথা আলোচনা না করাই বোধ হয় ভাল।

সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার ছোট শহর 'সেন্ট-মেরিনাতে' গিয়েছিলাম 'হান্টিংটন বোটানিক্যাল গার্ডেন' দেখতে। হেনরী ই. হান্টিংটন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকায় প্রথম 'রেল-রোড' (Rail-Road) নির্মাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, এবং তার উপার্জিত কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব দিয়ে যান একটি ট্রাষ্টির হাতে, যারা তার অবর্তমানে এই বাগানটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। বর্তমানে এই ট্রাষ্টি খুব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এই বাগানটির পরিচালনা করছেন। গবেষণার দ্বারা বাগানটিকে আরও সুন্দর ও বৃহৎ করার চেষ্টাও চলছে।

বর্তমানে ১৩০ একর জমির উপর বাগানটি গড়ে উঠেছে, কিন্তু এদের অধীনে আছে ২১০ একর জমি। পরবর্তিকালে অবশিষ্ট জমিতে বাগানটি বাড়ানো হবে এবং তার জন্য কাজও চলছে। এত বড় একটি বাগান যে কত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে ও সযত্নে রাখা হয়েছে বাগানে ঢুকলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রহরীরা গাড়ি করে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে শুভেচ্ছাও জানাচ্ছে, অথচ সতর্ক দৃষ্টিও রয়েছে বাগানের প্রতিটি অংশে। তাদের সাজ-পোষাক আমাদের দেশের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের মতো। বেশি ভিড় হলে বাগানের ক্ষতি হতে পারে বা দর্শকদের অসুবিধা হতে পারে, এরকম একটা ধারণা বোধ হয় এদের আছে। তাই ছুটির দিন বা রবিবার স্থানীয় লোকদের আগে থাকতে বুকিং করে আসতে হয়। ছুটির দিনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বাইরের দর্শনার্থীদের। ফলে রবিবার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বুকিং আগে থাকতে করার প্রয়োজন হয়নি।

প্রবেশ পথের একপাশে রয়েছে লাইব্রেরী, ও অপর পাশে রয়েছে আর্ট গ্যালারী। সেখানে যেয়ে পড়াশুনাও করা যায়। এই দুই বাড়ির মাঝখানে রয়েছে ২০০ বছরের পুরনো বৃহৎ ওক গাছ। এই বাগানে প্রায় এক হাজার ওক গাছ আছে।

বাগানে প্রবেশ করেই সবার দৃষ্টি পড়ে বহুদূর বিস্তৃত সবুজ লনের উপর। দেখে মনে হয় পুরু সবুজ গালিচা পাতা আছে বহু অঞ্চল জুড়ে।

এই বাগানে প্রায় ১৪০০ রকমের গাছ আছে এবং ঐগুলি সাজানোও হয়েছে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে। এখানে ১২টি বিভিন্ন ধরনের বাগান বা garden আছে। যেমন গোলাপ বাগিচা, ( Rose-garden ) মরুভূমির উদ্যান, ( Desert-garden ) Herb-garden বা ঔষধি বাগিচা, জাপানী বাগান বা ( Japanese-garden ), অস্ট্রেলিয়ান-বাগিচা বা ( Australian-garden ) ইত্যাদি। প্রত্যেক বাগানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তবে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল 'গোলাপ-বাগিচা', এবং 'মরুভূমির উদ্যান'।

গোলাপ বাগিচায় এক হাজার একশ রকমের গাছ আছে এবং সেখানে ফুটে ছিল শত-সহস্র ফুল। গোলাপের এত শত রঙ আর রূপ আর কোন স্থানে একত্র আছে কিনা আমার জানা নেই। দেখার সময় বারবার মনে হয়েছিল এত স্বল্প সময়ে এ উপভোগ করা যায় না, এর জন্য বহু সময়ের প্রয়োজন। বাগান-কর্তৃপক্ষ মনে করেন গোলাপের ইতিহাস রচনা করতে হলে আমাদের সহস্র বছর আগে ফিরে যেতে হবে। ইতিহাসের পাতা অনুসরণ করে এরা গোলাপ গাছ সাজিয়েছেন; মধ্যযুগ থেকে সাম্প্রতিক-কাল পর্যন্ত এখানকার বহু গোলাপ গাছ দেখলাম বেশ বড়, এবং বিশাল বিশাল বাগান বিলাসের মতো লতিয়ে লতিয়ে বহু উপর পর্যন্ত উঠেছে।

১২ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে এখানকার 'Desert-garden' ( মরুভূমি-উদ্যান ) প্রায় ২৫০০ রকমের মরুভূমির গাছ এবং ক্যাকটাস আছে। এখানকার কর্মাধ্যক্ষরা মনে করেন যে, পৃথিবীর মধ্যে এটাই সব থেকে বড়, মানুষের হাতে সৃষ্ট Desert-garden। বাগানের পরিবেশ এবং গাছের সজীবতা দেখে মনে হয় আমরা মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। ১৩০ একর জমির এক পাশে শত-সহস্র গোলাপ আর একদিকে মরুভূমির ক্যাকটাস এবং তার বহু বিচিত্র ফুল—চরম আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয়।

অপর একটি অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'Shakespear-garden'—অর্থাৎ Shakespear-

এর সময় যেসব ফুল পাওয়া যেত এবং তার নাটকে যেসব ফুলের উল্লেখ আছে, সেইসব ফুল দিয়ে এই বাগান সাজানো হয়েছে। দেখলাম তার অনেক ফুলই আমরা জানি যেমন—পাপিস্, প্যানসিস্, ড্যাফোডিলস্, মেরীগোল্ড ইত্যাদি। এখানে White Rose of york এবং Red Rose of Lancaster আছে যা আমাদের পঞ্চদশ শতাব্দীর গোলাপ যুদ্ধের ( 'গোলাপ যুদ্ধ'—(১৪৫৫-১৪৮৫) ইংলণ্ডে, ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাষ্টার, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপরিবারের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল রাজা ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্বকালে। এই গৃহ-যুদ্ধকেই 'গোলাপের যুদ্ধ' বলা হয়, কারণ এই যুদ্ধে ইয়র্ক পন্থীদের প্রতীক ছিল সাদা গোলাপ এবং ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ানদের প্রতীক ছিল লাল গোলাপ। এই যুদ্ধের অবসান হয় ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, যখন সপ্তম হেনরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন ) কথা মনে করিয়ে দেয়।

আমরা শুনে এসেছি গাছ-পাতা থেকে ওষুধ তৈরি করে মা-ঠাকুরমারা বাড়ির লোকের চিকিৎসা করতেন। বাজারে তখন এসব ওষুধ পাওয়া যেত এবং তা ব্যবহার করে তারা ফলও পেতেন। কিন্তু শহরে বাস করার জন্য ওসব গাছ-পাতা দেখার সৌভাগ্য বা সুযোগ আমাদের কখনও হয়নি। এই Botanical garden-এ 'Herb-garden' নামাঙ্কিত একটি অঞ্চল আছে। ওষুধ, চা, মদ, মশলা, সুগন্ধি প্রভৃতি কোন কোন ঔষধি বা Herb থেকে পাওয়া যায় বা তৈরিও করা হয় তা সুন্দর ভাবে সাজিয়ে লিখে রাখা হয়েছে। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম তার অনেক গাছ পাতাই আমরা চিনি বা জানি; কিন্তু ওভাবে তো কখনও দেখিনি বা দেখার সুযোগ হয়নি। তাই আমরা এত অজ্ঞ রয়ে গেছি।

এখানে আর্জেন্টিনার একটি অদ্ভুত গাছ দেখলাম, যার নাম 'অম্বু' ( Ombu )। এরা এই গাছটি ঔষধি জাতীয় ( Herb like ) গাছ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই গাছের গুঁড়িটা মাটির উপরে ছড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে একটি হাতি বা গণ্ডার জাতীয় পশু মাটির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। এই গুঁড়ির মধ্যে জল জমা থাকে। গাছটি কিন্তু বিশাল। এর ছায়া গরমের দিনে আর্জেন্টিনার লোকেরা ভীষণভাবে পছন্দ করে।

আমাদের সাহিত্যে 'ক্যামেলিয়া'র স্থান বেশ উঁচুতেই। কিন্তু তাদের আমরা সহজে দেখতে পাই না। সাধের ক্যামেলিয়ার দেখা পেলাম এখানে। এখানে প্রায় ১৫০০ রকমের ক্যামেলিয়া গাছ আছে। তাদের ফুলের বাহারে বাগানকে আলো করে রেখেছে।

সারাদিন হেঁটেও এ-বাগান দেখা শেষ হয় না। সাড়ে চারটের সময় বন্ধ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক দর্শনার্থীকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন তাদের ভ্রমণপর্ব সাড়ে চারটের মধ্যেই শেষ করেন। ফলে পাম গাছের সারির পাশ দিয়ে বা অস্ট্রেলিয়ান বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে আসা ছাড়া কিছু আগ্রহ করে দেখার সময় ছিল না। অথচ ওখানে প্রায় একশ রকমের ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। তাছাড়া কত অসংখ্য ধরনের গাছ ও বিভিন্ন রঙের ফুল যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তা লিখে শেষ করা যায় না।

"প্রকৃতিকে ভালবাস এবং তাদের বাঁচিয়ে নিজে বেঁচে থাকো"—এই মনে হল ওদের আদর্শ। এই আদর্শ না থাকলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আবহাওয়ার গাছ নিয়ে ওরা এমন সুন্দর করে বাগান সাজালেন কি করে?—ফেরে আসার পথে এই প্রশ্নই বারবার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। আমাদের সকলের নমস্য হান্টিংটন সাহেবের স্বপ্ন সত্যিই সার্থক হয়েছে।

# স্বামীজীর আমেরিকান নারীভক্ত—
# জোসেফিন ম্যাকলাউড

শ্রীমতী চিত্রা বসু

[ মাঘ, ১৩৯৩ সংখ্যার পর ]

৪ জুলাই ১৯০২ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ। যাবার দুদিন আগে নিবেদিতাকে স্বামীজী জো সম্বন্ধে বলেছিলেন যে সে পবিত্রতার মতোই পবিত্র, এবং প্রেমের মতো প্রেমস্বভাবা। স্বামীজীর নির্বাণলাভের সংবাদবাহী তার পেয়ে আমেরিকায় ম্যাকলাউড হয়ে পড়েন স্তব্ধ ও শোকাহত। নিঃসঙ্গতা তাঁর জীবনকে গ্রাস করে ফেললে', শোকাশ্রুপাতে তাঁর দিন কাটতে লাগল। ইতিমধ্যে নিবেদিতা তাঁকে পত্র মারফৎ পাঠিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে স্বামীজীর শেষ বাণী, 'জো পবিত্র, জো প্রেমস্বভাবা'। নিবেদিতা তাঁর বন্ধু ইয়ুমের জন্য সংগ্রহ করে রেখেছেন তাঁর গুরুর গৈরিকবসনের ছোট্ট একটি টুকরো শেষ স্মৃতিসঞ্চয়নের উদ্দেশ্যে। গুরুর শেষ যাত্রায় দেহ যখন পঞ্চভূতে লীন হতে চলেছে এবং প্রজ্জলিত চিতাপার্শ্বে নিবেদিতা অত্যন্ত শোকাভিভূতা, স্বামী সারদানন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন স্বামীজীর কিছু স্মৃতি তিনি রাখতে চান কিনা। নিবেদিতা সঙ্কোচবশতঃ কিছু বলতে পারলেন না; কিন্তু অন্তরে প্রার্থনা করলেন, ইয়ুম তো গুরুকে শেষযাত্রায় সাক্ষাত করতে পারলেন না, যদি তার জন্য কিছু স্মৃতি সংগ্রহ করে রাখতে পারতেন। এমন সময় তাঁর বস্ত্রের প্রান্তদেশে টান অনুভব করলেন; ফিরে তাকাতেই দেখেন স্বামীজীর গৈরিক বস্ত্রের অর্দ্ধদগ্ধ একটি অংশ তাঁর কোলের উপর এসে পড়েছে। তিনি অভিভূত হয়ে অনুভব করেন যে গুরুর অস্তিত্ব জাজ্বল্যরূপে বর্তমান। নিবেদিতা তাঁর বন্ধু ইয়ুমকে লিখলেন, "সমস্ত পৃথিবী পূজারত, কিন্তু আমি জানি তাঁর স্মৃতির শ্রেষ্ঠ পূজামন্দির তোমার হৃদয়।"[১১] চিঠির সঙ্গে পাঠালেন গুরুর পবিত্রস্মৃতি, অর্দ্ধদগ্ধ কাপড়ের টুকরোটি। নিবেদিতা তাঁর ৪ জুলাই-এর পরের চিঠিগুলিতে বারে বারে শঙ্কিত হয়েছেন সেই 'precious enclosure'[১২]-টি জো-র হাতে পৌঁছেছে কিনা। স্বামীজীর শেষ আশীর্বাদ পৌঁছেছিল তাঁর ভক্ত-বন্ধুর কাছে। ম্যাকলাউড এই বস্ত্রখণ্ডটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয়পাত্রদের মাথায় ছুঁইয়ে দিতেন, এবং সযত্নে তাঁর কাছে সর্বদা রাখতেন। ম্যাকলাউড মৃত্যুর পূর্বে যখন শেষবারের মতো ভারতে আসেন, সেই সময়ের সমুদ্রযাত্রায় জাহাজের ডেকের উপর হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় গৈরিক বসনের টুকরোটি উড়ে সমুদ্র-গর্ভে চলে যায়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের কিছুদিন পূর্বে জো স্বামীজীকে লিখেছিলেন হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল থেকে, "I swim or sink with you—বাঁচি বা মরি আমি আছি আপনার সঙ্গে।" তাই ছিলেন; বিবেকানন্দ দর্শনে নবজন্মলাভের পর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিবেকানন্দ-আলোকে বাস করে গেছেন। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিপূত স্থানগুলি ঘুরে বেড়ালেন তাঁর দেবতার স্মৃতি-স্পর্শলাভের আশায়। স্বামীজীর স্নেহ পরম কৃতজ্ঞতাবোধে

১১ Letters of Nivedita Edited by Sri Sankariprasad Basu, Part I, p. 48

১২ ঐ, p. 494

পরিশোধ করার জন্য নতুন করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকেন্দ্রগুলিকে তিনি আমরণ সাহায্য করে গেছেন। শ্রান্তিহীন ভ্রমণ করেছেন শুধুমাত্র জনমানসে স্বামীজীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারে—যেখানেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কোন সাধুকে পাঠানো হয়েছে, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্ণিয়া, ইংল্যাণ্ড, প্যারিস, বার্লিন বা দক্ষিণ আমেরিকায়, সেখানে ম্যাকলাউড পৌঁছে গেছেন তাঁদের সাহায্যে বা পরামর্শদানে—"ট্যান্টিনের আর একটি নতুন সন্তানরূপে গ্রহণ করতে। কারণ তাঁর ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপেই এরা এসেছেন তাঁর বিশ্বাস।"[২১]

ম্যাকলাউড সবসময় সঙ্গে কিছু অর্থ ও ট্রেনের একটি ফার্স্ট ক্লাশ টিকিট কেটে রাখতেন যাতে যেকোন সময় বিবেকানন্দ-কাজের জন্য বেরিয়ে পড়তে পারেন। বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলি নানাভাষায় অনুবাদ ও প্রচারের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা তিনি করেছেন তার পরিচয় রয়েছে অ্যালবার্টকে লেখা চিঠিগুলিতে। এজন্য অকাতরে তিনি নিজের অর্থ ব্যয় করেছেন। স্বামীজীর রাজযোগ ও দেববাণী তিনিই প্রথম আমেরিকায় প্রকাশ করেন, এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। রোঁমা রোঁলাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁর অধ্যাত্ম পথের দিশারী বিবেকানন্দ ও তাঁর অবতারগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনায়, যাতে পাশ্চাত্যে লোকেরা এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে লাভবান হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পী লাশীককে দিয়ে স্বামীজীর পরিব্রাজকরূপের স্ফটিক-মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন এবং তা ইউরোপের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের, যেমন বার্ণাড শ', লর্ড লিটন, লর্ড ওয়েভেলকে বিতরণ করেছেন। লর্ড ওয়েভেল ম্যাকলাউড দ্বারা প্রেরিত মূর্তিটি লেডি মার্জাসন মারফৎ পেয়েছিলেন।

শেষ জীবনে বারে বারে ম্যাকলাউড স্বামীজীর প্রিয় গঙ্গাতীরে, জগতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত বেলুড় মঠে ছুটে এসেছেন, তাঁর আরাধ্য দেবতার সান্নিধ্য অনুভূতি মানসে ও শান্তিময় বিশ্রামের আশায়। মঠবাসের দিনগুলি অতিবাহিত করতেন অনাড়ম্বরভাবে শাস্ত্র আলোচনায়, কাজে, ধ্যানে ও বিবেকানন্দ-মননে। ভারতীয় জীবনধারায় নিজেকে লিপ্ত রাখতে চাইতেন, সেজন্যে মঠে নিজের ঘরটিতে বৈদ্যুতিক আলো না জ্বেলে প্রদীপ জালিয়ে রাখতে ভালবাসতেন। তিনি নিবেদিতার মতো আনুষ্ঠানিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি, তিনি ছিলেন স্বামীজীর অকৃত্রিম বন্ধু, অনেক দিব্যমুহূর্তের সাক্ষী, তাঁর গুরুকার্যের সাহায্যকারিণী। কী গভীর ভালবাসা তাঁর স্বামীজীর প্রতি! শেষ জীবন পর্যন্ত জো-র বিশ্বাস ছিল "আমাকে মুক্ত করার জন্যই স্বামীজী এসেছিলেন,"[২২] এবং তিনি অনুভব করতেন মহাপুরুষ-সান্নিধ্যে এলে মানুষ যে শক্তি অনুভব করে, তিনিও পেয়েছিলেন সেই আধ্যাত্মিক শক্তি। বিশ্বাস ও শক্তি এই নারীকে ভারতের ও রামকৃষ্ণ মিশনের দয়াবতী বন্ধু করেছে, বৃদ্ধা ম্যাকলাউড বেলুড় মঠে থাকতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর নিজের কথায়, "এখানে আমি মঠের তরুণদের মধ্যে বিবেকানন্দকে জাগ্রত রাখি। মঠের দোতলার কক্ষটি আমার নিজস্ব, সেখানে আমি প্রতি শীতে গিয়া উঠি এবং সম্ভবতঃ জীবন অবসানের পূর্ব পর্যন্ত

২১ একটি অসামান্যা নারী, একটি পরিবার ও স্বামী বিবেকানন্দ, শারদীয়া সংখ্যা (১৩৮৬) যুগান্তর, শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু, পৃঃ ६২

২২ Reminiscences of Vivekananda, p. 244

গিয়া উঠিব।"[২৩] জো মঠের তরুণ-সন্ন্যাসীদের প্রিয় 'ট্যান্টিন'। বৃদ্ধা মঠে বসে এঁদের উদ্দীপ্ত করতেন বিবেকানন্দ প্রেমিক হবার জন্য, বলতেন, "তোরা বিবেকানন্দের ছেলে, তাঁর জয় জয়কার। বিবেকানন্দের জয় হোক!"[২৪] আবার কখনও বলতেন, "এই দীর্ঘ জীবনের বহুল অভিজ্ঞতার পরেও কেন 'বিবেকানন্দ', 'বিবেকানন্দ' বলে পাগল হয়ে ছুটোছুটি করি জানিস্? কারণ আজ পর্যন্ত তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষ চোখে পড়েনি। যেদিন দেখতে পাবো, সেই মুহূর্তে তোদের বিবেকানন্দকে ছেড়ে তাঁকে মানবো, তাঁর হয়ে যাবো; তবে এখনো মিললো না এই যা।"[২৫]

ম্যাকলাউড একটি হার গলায় রাখতেন, তাতে স্বামীজীর ছবি দেওয়া একটি লকেট ঝুলত। একবার বেলুড় মঠে থাকাকালীন হঠাৎ সেটি চুরি যায়। চোর ধরা পড়ল, মঠের এক নতুন ভৃত্য। তাকে পুলিশে দেওয়া ঠিক হল, কিন্তু ম্যাকলাউড বললেন, "ওকে পুলিশে দিও না কারণ ও নিশ্চয়ই স্বামীজীকে ভালবাসে তাই ঐ হারটি নিয়েছে কী গভীর ভালবাসা স্বামীজীর প্রতি!

মঠের তরুণ সন্ন্যাসীরা তাদের বৃদ্ধা ট্যান্টিনের অতি প্রিয়। অ্যালবার্টাকে লেখা চিঠিগুলিতে তাঁদের প্রতি কী গভীর স্নেহই না প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেক নবীন সন্ন্যাসী যাঁরা আমেরিকা বা বিদেশের বেদান্ত কেন্দ্রগুলিতে মঠ-মিশনের প্রচারকার্য করছেন বা ভারতের কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন। শুধুমাত্র প্রশংসা নয়, উৎসাহও দিয়েছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্বামী বিরজানন্দ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষতা থেকে বিদায় নিয়ে একান্তবাসের সঙ্কল্প করেন, তখন ম্যাকলাউড তাঁকে লেখেন—"…মায়াবতীতে অবিশ্রান্ত কর্মচক্রে কী নিষ্ঠার সঙ্গে তুমি কাঁধ পেতে রেখেছ!…তুমি ছয়মাস বা একবৎসরও যদি ছুটি নাও তবুও আমরা পরে দেখতে চাই যে তাঁর একজন অন্তরঙ্গ সন্তান তাঁর প্রিয় হিমালয় কেন্দ্রে তাঁর আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করছেন। …তোমার কাজের ভার আমার দ্বারা যদি কোনও রকমে লাঘব হয়, তাও জানিও।"[২৬]

'ভারতকে ভালবাস'—স্বামীজীর বাণী, তাই জোসেফিন ম্যাকলাউডের হৃদয়ের মণি-কোঠায় রয়েছে বিবেকানন্দ-মন্ত্র 'ভারতবর্ষ'। স্বামীজীর স্বপ্ন তাঁর মাতৃভূমিতে সুশিক্ষার ব্যবস্থা ও তার প্রসার। তাই ম্যাকলাউড রামকৃষ্ণ মিশনের সকল শিক্ষামূলক কাজে এগিয়ে এসেছেন। বেলুড় বিদ্যামন্দির স্থাপনে তাঁরই প্রথম অর্থদান। রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যখন প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে, তখন তিনি দশহাজার টাকা দান করেন। নিবেদিতার পত্রে দেখি স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনা ও তার স্বীকৃতির পেছনে মিসেস্ বুলের মতো, তাঁরও অর্থদান এবং সাহায্য কম নয়। স্বামীজীর মাতৃভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় জো উৎসাহী, তাই নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ যাতে নিরাপদ হয় তার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। বেলুড় মঠের ওপর যখন ব্রিটিশসরকারের রোষ পড়েছিল,

২৩ Reminiscences, p. 243, 244-45

২৪ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনালোকে, স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ৫৮

২৫ ঐ, পৃঃ ৫৯

২৬ অতীতের স্মৃতি, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭২

ম্যাকলাউডই তখন মঠকে বিপদের হাত থেকে বাঁচান,—এর প্রমাণ তদানীন্তন বড়লাটের গোপন ফাইল। (ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের "স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন" প্রবন্ধে প্রকাশিত) ফাইলে বড়লাট লিখেছেন, "মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, যদি বেলুড় মঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহলে আমেরিকায় ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে। এই সময় (বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সরকার আমেরিকার সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন) কোনো-রকমে আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।"[২৭] এই আমেরিকান মহিলাই ম্যাকলাউড। সেই সময় দুজন যুবককে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট বাংলার হাড়োয়াগ্রামে অন্তরীণ করে রাখার আদেশ দেন। তিনি তাঁদের হাতে স্বামীজীর রচনাবলী তুলে দিয়ে বলেন "স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হও, তাঁর আদর্শমতো গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান ছড়িয়ে দাও।"[২৮] বেলুড় মঠের গেষ্ট হাউসে দেশবন্ধু ও লর্ড লিটনের গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত, দরিদ্র ভারতে যাতে কৃষির উন্নতি হয় তার জন্য সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা দরকার। এ জন্য নিজ অর্থব্যয়ে মিশরের নদী-পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ উইলিয়ম উইলকক্সকে এনেছিলেন এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েভেলকে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী করেছিলেন। বিদেশিনী মহিলার কী অপরূপ ভালবাসা ভারতবর্ষের জন্য! স্বামীজীর মাতৃভূমির কল্যাণের কাজে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। ভারতপ্রেম ছিল তাঁর হৃদয়-দেবতার পূজা। বলতেন "I am loving India" তাই বেলুড় মঠে দুপুরবেলা প্রখর রোদে ঝুড়ির ওপর বসে ভারতের দিনমজুরের পরিশ্রম দেখা ছিল তাঁর ভালবাসার কাজ। মঠের সংলগ্ন জমিতে ই-আই রেলের ইয়ার্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত তিনি ভাইসরয় পর্যন্ত দরবার করে বন্ধ করেছিলেন। ভাইসরয়ের কাছে দরবারে কৃতকার্য হয়ে যখন নৌকা করে বেলুড়ে ফিরছিলেন, তখন স্বামী সারদানন্দ মঠের ঘাটে দাঁড়িয়ে ট্যান্টিনকে 'victory' বলে অভিনন্দন জানান। ম্যাকলাউড স্বামীজীর মন্দির দেখিয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন—"এটা কি আমার জয় স্বামীজী? ওখানে ওই যে মর্মর মূর্তি বসানো রয়েছে, এটা তাঁর জয়।" মঠের ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা হবে এজন্য ভাল পোশাক নির্মাণের জন্য ১০,০০০ টাকা দেন এবং পাঞ্জাব থেকে ভাল জাতের গরু আনান। এমনকি নিউজারসী থেকে ষাঁড়ও আনান উৎকৃষ্ট প্রজননের জন্য। মিসেস্ লেগেটের অর্থ ছাড়াও বেলুড় মঠে লেগেট হাউস নির্মাণে মিস ম্যাকলাউডেরও দান আছে।

ম্যাকলাউড তাঁর বোনঝি অ্যালবার্টাকে লেখা চিঠিগুলিতে ভারতের মনীষীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও তাঁদের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর চিঠিতে লিখেছেন "ভারত-মাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান যিনি সত্যকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[২৯]

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে তিনি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গেছেন এবং শ্রীঅরবিন্দের আলিপুর জেলে স্বামীজীর দর্শনের কথা শুনে অভিভূত হয়েছেন। অ্যালবার্টাকে লিখেছেন, "স্বামীজী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, তার

২৭ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন—শ্রীলাভলীমোহন রায় চৌধুরী, পৃঃ ১৩৮

২৮ Letters of Macleod from years 1924-1946—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের নিকট হতে প্রাপ্ত।

২৯ Letters of Macleod from, 1924-46

সাত বছর পরে তিনি অরবিন্দ ঘোষের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন। আমার কাছে এটা গভীর তৃপ্তিকর, কারণ স্বামীজীর এই মহান্ উত্তরাধিকারী বর্তমান আছেন।"[৩০] শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ ডিভাইন' গ্রন্থটি পাঠ করে অ্যালবার্টাকে তা পাঠান পড়ার জন্য।

বিবেকানন্দ-আলোয় প্রস্ফুটিত জোসেফিন ম্যাকলাউড—স্বামীজীর প্রিয় জো বা জয়ার মহান্ চরিত্রটির অপরূপ ছবি ফুটে আছে নিবেদিতার লেখা চিঠিগুলিতে,—যেগুলিতে তিনি কখনও সম্বোধন করেছেন 'আধ্যাত্মিক মা' বলে, বা কখনও 'প্রিয় বন্ধু ইয়ুম' বলে। নিবেদিতার চিঠিতে জানতে পারি শ্রীশ্রীমা ম্যাকলাউড সম্বন্ধে বলেছেন "সে প্রকৃত জ্ঞানী,"[৩১] এবং বিদেশিনী এই নারীকে তিনি গভীর স্নেহ করতেন। নিবেদিতা নানান পত্রে জো সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তিগুলি প্রকাশ করেছেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১ মে নিবেদিতা স্বামীজীর দর্শনে বলরাম মন্দিরে উপস্থিত। সেখানে জো সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন, "সে আমার শুভভাগ্য, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে জো ছিল তাই আমার কাজ ঠিকমত হয়েছে, ভারতে জো নেই তাই কিছুই ঠিকমত হচ্ছে না।"[৩২] নিবেদিতা জানতেন তাঁর মতো জো-রও স্বামীজীর প্রতি কী গভীর ভালবাসা। পেরোগেরিক থেকে নিবেদিতা ইয়ুমকে লিখছেন যে জো-ই সেই দেবী যিনি জন্মেছিলেন "to protect Him—our Divinest Incarnation."

নিবেদিতা বন্ধুর বুদ্ধিমত্তা ও পরিচালনশক্তির অতুলনীয়তার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, এবং তাঁর প্রতি এত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল যে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর ইয়ুমের ইচ্ছা বা মতামত স্বামীজীর মত বলেই মনে করতেন। নিবেদিতার 'Master as I saw Him' প্রকাশিত হবার পর ইয়ুমকে লিখলেন "অতীতে ঝিলাম নদীর তীরে রাত্রিকালে মায়ের মত যেমন তুমি আমায় একাধারে নির্দেশ দিতে ও সহানুভূতি জানাতে, তেমন স্বামীজী সম্বন্ধে এই বই তোমার প্রশংসা চায় এবং সে প্রশংসা মহামূল্যবান, কারণ স্বামীজী তোমার যুক্তিবাদিতার ওপর অত্যন্ত ভরসা ও বিশ্বাস করতেন।"[৩৪] স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর নিবেদিতা প্রিয় জো-কে গভীর কৃতজ্ঞতায় লিখলেন, "তিনি যা তিনি তাই ছিলেন, তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে কিভাবে অহংকে দমন করে সেই মহাগৌরবের আলোকছটা গ্রহণ করতে হয়। তোমার ঋণ অপরিশোধনীয়।"[৩৫] হিমালয়ের পথে গুরুর সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিখ্যাত শিষ্যার মনোবেদনা দূর করা ও গুরু-শিষ্যার পারস্পরিক বোঝাপড়া সহজ করে তোলার ভূমিকা ম্যাকলাউডই নিয়েছিলেন। তাই নিবেদিতার বন্ধু ইয়ুমের প্রতি কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না, এবং নিজের অন্তর্বেদনায় ও শান্তির আশায় এই নারীর কাছেই হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন।

ম্যাকলাউডও একদিন বৃদ্ধা হলেন, তাঁর শ্রান্তিহীন পৃথিবী ভ্রমণ, যা বিবেকানন্দ নামক কাজের আবর্তে ঘুরত, তা একদিন এসে থামল। নিবেদিতার 'Wandering bird' নিভৃত আশ্রয় নিলেন তাঁর দিদির কেনা স্ট্রাচ্‌ফোর্ড অন

৩০ ঐ, 1924-26
৩১ Letters of Nivedita Edited by Sri Sankariprasad Bosu, 2nd Part, p. 646
৩২ ঐ, 1st Part, p. 128
৩৩ Letters of Nivedita, Part I, p. 385
৩৪ ঐ, p. 1042
৩৫ ঐ, p. 745

অ্যাভনে শেক্সপীয়রের মেয়ের বাড়ি হলস্‌ক্রোফট-এ। ঐ বাড়ির একটি ঘর ছিল বৃদ্ধার 'প্রফেট-চেম্বার', সেখানে থাকত তাঁর প্রিয় দেবতা বিবেকানন্দের রিলিফমূর্তি, যা সূর্যালোকের পশ্চাদ্‌পটে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত। নিউইয়র্কের বারবাজান প্লাজা হোটেলের একটি ঘরেও তিনি মাঝে মাঝে বাস করতেন। জীবনের শেষ পর্বে যখন তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলেন তখন ক্যালিফোর্ণিয়ার হলিউড সেণ্টারে গিয়ে বাস করতে শুরু করেন, যাতে সেখানেই তিনি দেহ রাখতে পারেন। কারণ সে তীর্থস্থান অর্ধশতাব্দী-পূর্বে তাঁর প্রফেটের পাদস্পর্শে ধন্য হয়ে রয়েছে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে অ্যালবার্টার কাছে লিখেছিলেন : তাঁর সমাধি স্থানে যদি স্মৃতি-ফলক লাগানো হয়, তাহলে তাতে যেন লেখা হয়, "The readiness is all"[৩৬]; কারণ স্বামীজীকে প্রথম দর্শনের মুহূর্ত মধ্যে তিনি রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং গুরুকার্যে ছিলেন সর্ব-সময়ে প্রস্তুত। স্বামীজীর মধ্যে যে অসীমতা ও সত্যকে তিনি দেখেছিলেন, তাই তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। এই নারীর বিশ্বাস, স্বামীজী তাঁকে মুক্ত সত্তায় উজ্জীবিত করেছিলেন,—যে সৌভাগ্যে তিনি স্বামীজীর ভারতকে দর্শন করেছেন, তার উন্নতিতে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থেকেছেন প্রতিমুহূর্তে।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর একানব্বই বছর বয়সে ম্যাকলাউড স্বামীজীর স্মৃতিপূত হলিউড বেদান্ত সেণ্টারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন ট্যান্টিনের শেষ যাত্রায় তাঁর প্রিয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের স্বামী অশেষানন্দ শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে উপস্থিত ছিলেন। মহীয়সী এই বিদেশিনী নারী তাঁর চির আরাধ্যের পাদপদ্মে অবশেষে মিলিত হলেন। অপরিসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, অনলস পরিশ্রমে সুদীর্ঘ জীবনে বিবেকানন্দ-আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড, স্বামীজীর প্রিয় জো; তাঁর নিজের কথায়ই—"সেই সত্যের মহিমান্বিত আলো কাঁপেনি, বাড়েনি বা কমেনি।"[৩৭]

৩৬ Letters of Macleod, 1924-46

৩৭ অতীতের স্মৃতি, পৃঃ ১৭৩

## বেদনা

### শ্রীমতী বীণাপাণি ভট্টাচার্য

আপনার মাঝে আপনা হারায়ে
মাঝে মাঝে খেলি আমি।
তটিনীর মাঝে ছোট ঢেউ হয়ে
যাই যে সাগরে নামি।
সিন্ধু মাঝারে বিন্দুটি হয়ে
নিজেরে খুঁজে না পাই,
অসীমের সাথে মিশায়ে আমারে
এক হয়ে যেতে চাই।
জোয়ার ভাটার দো-টানায় পড়ে
পুনঃ আমি ফিরে আসি,
বেদনা আমার ধারা হয়ে নামে
নয়নে অশ্রু রাশি।

# জীবন আমার দাও করে দাও

শেখ সদরউদ্দীন

জীবন আমার দাও করে দাও
গোলাপ ধূপের মতো।
বিলাই যেন দুনিয়াতে
সুবাস অবিরত ॥...
ধূপের মতোই জ্বলে জ্বলে
হয় যেন মোর ক্ষয়—
যেন পারি মানুষ নামের
রাখতে পরিচয়।
গর্ব আমার খর্ব কর
শিরকে করে নত।...
আঘাত যদি দেয় মোরে কেউ
তবু যেন ভালবাসি—
অশ্রু ঝরা চোখে যেন
ফোটাই আলোর হাসি
পরের দুঃখ—ব্যথা যেন
বাজে আমার বুকে—
সুখটা যেন লভি আমি
পরের আরাম সুখে।
মানব সেবার কাজে যেন
থাকি সদাই রত ॥
জীবন আমার দাও করে দাও
গোলাপ ধূপের মতো ॥

# সমাধান

শ্রীমতী রমা বসু

আমি চঞ্চল অতি
ধর্মে নাহি মতি
কাহার চরণ করিব সার?
নাহি জানি ধর্ম,
নাহি জানি কর্ম,
জেনেছি নামের মহিমা অপার।
'রাম' আর 'কৃষ্ণ' নাম ও দুটি আখর
যদি জপি দিবানিশি শুধু নিরন্তর—
পাব কি ধৈর্য, পাব কি শান্তি,
দূরে যাবে যত ভুল ও ভ্রান্তি?
হৃদয় মন কি ভরাবে
ঐ নাম শুনে মোরে তরাবে?
যাবে কি ক্লৈব্য যাবে কি ক্লান্তি
পাবো কি গো সেই শীতল শান্তি?
'রামকৃষ্ণ' নাকি 'কৃষ্ণ' কিংবা শুধু 'রাম'
কাহারে ভজিলে পরে, কেহ হবেনাক বাম।
বিষম দ্বন্দ্বে পড়ে ভাবছি অহর্নিশ
কোন্ নাম শ্রেষ্ঠ নাম, কে দেবে আশিস্।
চিত্ত মোর নিরন্তর উদ্বেলিত হয়
প্রকাশিতে নাহি পারে আমার হৃদয়।
কভু ডাকি রাম রাম কভু ডাকি কৃষ্ণ
কভু বলি তুমি আছ হে রামকৃষ্ণ ॥
এই দ্বিধা এই দ্বন্দ্বে হৃদয় দুলিছে
কোন নাম হৃদয় মোর কেবলি জপিছে।
কোন্ নামে চৈতন্য মোর হবে উন্মেষিত
কোন্ নাম হৃদয় মোর জপিছে সতত?
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণরে
কাকে রাখি, কাকে ছাড়ি, কোন্
নাম জপিরে?
যে রাম সেই কৃষ্ণ দুইয়ে মিলে রামকৃষ্ণ
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জপছে ॥

# অসুখের ও চিকিৎসার ভিত্তি

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

অসুখ ( অ-সুখ ) এবং তার ইংরেজী প্রতিশব্দ Disease ( Dis-ease ) বলতে সাধারণভাবে যেকোন শারীরিক বা মানসিক রোগ বুঝায়। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে ও অভিধানগত বর্ণনায়, শরীর বা শরীরাংশের কোন বৈকল্যের ফলে তার কার্যকলাপের যদি এমন পরিবর্তন হয় যাতে শরীরে লক্ষণ ( symptom ) বা বৈকল্যজাত নিদর্শন ( sign ) প্রকাশ পায় তখন তাকে রোগ বা অসুখ বলে।[১]

রোগের মূলে যেতে হলে সুস্থ শরীরের ভিতরের কার্যপ্রণালী বুঝতে হবে। সকলেই জানেন যে শরীরের সব অংশই ( হাত, পা, চোখ, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি ) গঠিত হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহকোষ ( cell ) দ্বারা, যেগুলি খালি চোখে দেখা যায় না এবং যাদের কাজের ধারা দেহাংশ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হয়। অণ্ডকোষের কাজ শুক্রকীট তৈরি করা, মস্তিষ্কের কোষের কাজ চিন্তা করা ও শরীর পরিচালনা করা, জননকোষ ( gamete )-এর কাজ বিপরীত জননকোষের সাথে মিলিত হয়ে নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করা, আবার যকৃতের দেহকোষের কাজ হজমকার্যে সাহায্য করা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে শরীরের বিভিন্ন দেহকোষই কিন্তু শুরুতে এসেছে একটি দেহকোষ হতে যার নাম জাইগোট (Zygote) এবং যা সৃষ্ট হয়েছিল পিতা ও মাতা হতে প্রাপ্ত শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলনের ফলে। শেষোক্ত দুটিই বিশেষধরনের দেহকোষ—জননকোষ। আবার পিতামাতার দেহও ঐরূপভাবে সৃষ্ট হয়েছিল তাঁদের পিতা-মাতার জননকোষের মিলনের ফলে। অতি ক্ষুদ্র জাইগোটের ক্রমান্বয় বিভাজনের ফলে, প্রথমে ভ্রূণ এবং পরে পূর্ণাবয়ব শরীর গড়ে ওঠে, এবং কিছু দেহকোষ জননকোষে রূপান্তরিত হয়। এভাবে বলা যেতে পারে যে সুদূর অতীত যুগ হতে জীবনস্রোতের বাহক হিসাবে বিভাজনের মাধ্যমে নূতন দেহকোষ তৈরি হয়ে চলেছে, এবং সেই কোষস্রোতের অংশমাত্র ধারাবাহিকভাবে 'আমি' অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নামরূপ পেয়ে আসছে।[২] সমস্ত দেহকোষই ভিতরে ও বাহিরে স্নাত হয় জলীয় পদার্থ ( রক্তও এই পর্যায়ে পড়ে ) দ্বারা, যার মধ্যে গলিত অবস্থায় থাকে নানা ধাতব পদার্থ ও দেহকোষের পুষ্টির খাদ্যসমূহ। পিতামাতা হতে আসা দেহকোষ হতে সন্তানের জন্ম হয় বলে তাঁদের অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য, এমন কি রোগপ্রবণতাও এসে যায় সন্তানের মধ্যে।

কোন ব্যক্তির সুস্বাস্থ্য বা নীরোগ থাকা নির্ভর করে তার শরীরাংশগুলির নিয়মমাফিক কাজকর্মের উপর। বলাবাহুল্য, এই কাজকর্মের জন্য চাই দেহকোষের পুষ্টি এবং দেহকোষ হতে নির্গত অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বস্তুর বহিঃ-নিষ্কাশন। শরীরের এক অংশের কাজের সাথে অন্য অংশের কাজ সম্বন্ধযুক্ত, এমন কি একে অন্যকে প্রভাবান্বিতও করতে পারে। শরীরের কোন অংশে ( অর্থাৎ সেই অংশের দেহকোষে ) বৈকল্য হলে শরীর তার প্রতিকারক্ষমতার

১ The New Encyclopaedia Britannica, vol, 17, Encyclopaedia Brit. Inc., Chicago, p. 313, 1985

২ Pathology by W. A. D. Anderson, vol 1, The C. V. Mosby Co. St. Louis, p. 1, 1971

সাহায্যে প্রথমে সেই বৈকল্যকে ঠিক করে নিতে চেষ্টা করে এবং একার্যে সফল হলে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। মনে রাখা দরকার যে রোগের অনেক লক্ষণ—তাপমাত্রা বৃদ্ধি, তরল দাস্ত, প্রদাহ ( inflammation ) প্রভৃতি সবই শরীরের দোষমুক্ত হবার প্রচেষ্টার অঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে চলতে থাকে রোগপ্রতিকারের চেষ্টা, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতার সৃষ্টি। রোগমুক্ত হবার পর নবগঠিত দেহকোষগুলি মৃত দেহকোষের স্থান নেয়। অবশ্য শরীরের কোন কোন অংশের বৈকল্য, একসঙ্গে অন্যান্য বহু অংশের বৈকল্য আনতে পারে: উদরস্থিত প্যানক্রিয়াস ( Pancreas ) গ্রন্থির বৈকল্যে ডায়াবেটিস হয় এবং তা হতে বৃক্কের ( Kidney ) ও চোখের অসুখ হয়, থাইরয়েড ( Thyroid ) গ্রন্থির বৈকল্যে শরীরের বহু অংশে রোগ দেখা দেয়

ভিত্তি বা মূল হিসাবে অসুখকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে:

(ক) জন্মগত—এদের মধ্যে কিছু আছে বংশগত ( hereditary ) যা পিতামাতা বা ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হতে আসে, যেমন হিমোফিলিয়া ( hæmophilia ) নামক রক্তের রোগ, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার, ওষ্ঠে বা তালুতে ছেদ ( cleft lip বা cleft palate ) প্রভৃতি। আবার কিছু রোগ আছে যেগুলি আক্ষরিক অর্থে জন্মগত ( Inborn ), যেমন জন্মের সময় চাপ লেগে শরীরের গঠনবৈকল্য, মাতাপিতা হতে প্রাপ্ত জীবাণুঘটিত রোগ প্রভৃতি ( যেমন সিফিলিস )।

(খ) পুষ্টিজনিত ( Nutritional )—খাদ্যে লৌহের অভাবে রক্তাল্পতা, আয়োডিনের অভাবে গয়টার, ভিটামিনের অভাবে মুখে ঘা, চর্বিজাতীয় খাদ্যের বাহুল্যে রক্তচাপ প্রভৃতি রোগ এই পর্যায়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে ঘর্মের সঙ্গে লবণজাতীয় দ্রব্য বেশি বার হয়ে যাওয়ার ফলে সর্দি-গর্মি হয়।

(গ) জীবাণু ( Bacteria ), জীবপরমাণু বা ভাইরাস ( Virus ), বা পরজীবী ( Parasite ) দ্বারা সংক্রমণজনিত—নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি অসংখ্য রোগ এই পর্যায়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার যে এইসব জীবাণু বা পরজীবী শরীরে প্রবেশ করে থাকে তাদের বেঁচে থাকার ও বংশধারা রক্ষার তাগিদে; কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাদের রোগসৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় মানুষের শরীরে ঢুকা তাদের দিক হতে ক্ষতিকর: যেমন জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস অন্যান্য জন্তুর শরীরে প্রবেশ করার পর সেই জন্তুর ( যেমন কুকুরের ) কামড়ের দ্বারা ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ও বংশধারা রক্ষিত হয়; কিন্তু মানুষের শরীরে ঢুকার পর তাহার বংশলোপ হয় ( 'Dead end of the cycle' ), কারণ জলাতঙ্করোগী অন্য কাউকে কামড়ায় না। অন্যধারে, জাপানীজ এনকেফ্যালাইটিস ( Japanese encephalitis ) এর ভাইরাস যেসব মশার মাধ্যমে ছড়ায়, তারা কেউ মানুষের রক্ত পছন্দ করে না, কিন্তু সামনে অন্য জন্তু জানোয়ার না পেয়ে, অগত্যা তারা মানুষকে কামড়ায় এবং এইভাবে রোগের বিস্তার ঘটে।

(ঘ) কোন গ্রন্থি ( Gland )-র অধিক বা কম গ্রন্থিরস নিঃসরণ: গয়টার, পেপটিক-আলসার প্রভৃতি রোগ এই পর্যায়ে পড়ে।

(ঙ) বার্দ্ধক্য জনিত—আগেই[৩] বলা হয়েছে যে বার্দ্ধক্য কোন রোগ নয়। এই সময় দেহকোষের বিভাজন ক্ষমতা কমে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি, শ্রুতিশক্তি প্রভৃতি হ্রাস পায়। তবে এসব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বলে রোগ পর্যায়ে পড়ে

৩ উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭, পৃঃ ২৫১-২৫৬

না। অবশ্য বার্দ্ধক্যে অনেক প্রকার রোগের প্রবণতা বাড়ে।

(চ) শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা অস্বাভাবিকতা—প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টির যে একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, তার ব্যতিক্রম হয়ে এই সব রোগ হয়। ডেঙ্গু ভাইরাসের আক্রমণে ডেঙ্গুজ্বর হয়, যা ছোটখাট অসুখের পর্যায়ে পড়ে; কিন্তু একটা বিশেষ অবস্থায় এই প্রতিরোধক্ষমতা-সৃষ্টি অস্বাভাবিক হয় এবং তার ফলে মারাত্মক অসুখ ( ডেঙ্গু হেমারেজিক জ্বর বা Dengue Hæmorrhagic fever) হয়ে পড়ে এ্যালার্জিও এই পর্যায়ে পড়ে। শরীরের 'আপন' 'পর' চিনবার ক্ষমতা খুব প্রখর, এবং ভিন্ন ধরনের কোন কিছু, তা পরজীবীই হোক বা অস্বাভাবিক হোক, শরীরের মধ্যে গেলে তা এ্যালার্জির সৃষ্টি করে। এ্যালার্জি নানা মূর্তিতে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, আবার নাটকীয়ভাবে আকস্মিক হয়ে মারাত্মকও হতে পারে।

(ছ) ক্যান্সার ও অন্যান্য টিউমার—জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের দেহকোষগুলির উদ্দেশ্যমূলক নিয়মিত বিভাজন চলছে, পুরাতন জীর্ণ দেহকোষগুলির স্থান পূরণের জন্য। কিন্তু কোন কারণে শরীরাংশে দেহকোষের অনিয়ন্ত্রিত ও অস্বাভাবিক বিভাজনের ফলে ক্যান্সার ও অন্যান্য টিউমার হয়। রক্তে লিউকিমিয়াও এই পর্যায়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে[৪] করা হয়েছে।

(জ) মানসিক রোগ—এতে মনের চিন্তাক্ষমতা, বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির বৈকল্য ঘটে[৫]। মস্তিষ্কের টিউমার, প্রদাহ ( এন্‌কেফালাইটিস্ ) প্রভৃতি অসুখগুলির শারীরিক রোগ ( উপরে ক—চ ) পর্যায়ে পড়ে। আধুনিক সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক রোগের সীমারেখাও বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। অনেক সময় শারীরিক রোগলক্ষণের সঙ্গে মানসিক রোগের কতটা মিশ্রণ হয়েছে, তা নির্ণয় করা চিকিৎসকের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে।

এ ছাড়া আছে শরীরে জান্তব বা রাসায়নিক বিষ ঢুকা, দুর্ঘটনার বলি হওয়া প্রভৃতি। আবার অনেক রোগ আছে যাদের নির্দিষ্ট কারণ বা হেতু এখনও সন্দেহাধীন, যেমন অনেক মানসিক রোগ, গাঁটব্যথা, হৃৎপিণ্ডের কয়েকটি অসুখ প্রভৃতি।

এবার চিকিৎসার ( এ্যালোপ্যাথিক ) কথায় আসা যাক। চিকিৎসা শুরু করার আগে চিকিৎসক চিন্তা করেন, চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কি না; সেই সঙ্গে তিনি সম্ভাব্য ঔষধের উপকার ও ক্ষতির তুলনামূলক বিচারও করেন। সকল ঔষধই শরীরে কিছু না কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারে; এমন কি এও বলা হয় যে 'ঔষধ মাত্রই উপকারী বিষ' ( 'Useful poison' )।[৫] টাইফয়েড রোগে ক্লোরামফেনিকল ঔষধ দিলে কারো কারো খারাপ ধরনের রক্তাল্পতা হতে পারে জেনেও তা দেওয়া হয়, কারণ টাইফয়েড রোগটি আরও বেশি পরিমাণে মারাত্মক। আবার অনেক সময় রোগ দুরারোগ্য জেনেও ঔষধ দেওয়া হয় রোগীর কষ্ট নিবারণের জন্য যেমন করা হয় ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সার রোগে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে একটি আলোচনা চলছে, মুমূর্ষু রোগী মৃত্যুর জন্য ঔষধ চাইলে ( 'Right to die' ) চিকিৎসকের

৪ উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮২, পৃঃ ৪৮৮-৪৯৩

৫ Davidson's Principles and Practice of Medicine, Churchill Livingstone, 23 Ravelston Terrace, Edinburgh, EH 4TL, p. 760, 1977

সেই বিষয়ে সাহায্য করা উচিত কি না।

রোগীর মূল রোগ কি, তা প্রথম পরীক্ষায় ঠিক করা ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু আশু কষ্টনিবারণের জন্য তৎক্ষণাৎ কিছু ঔষধ দিতে হয়। সে ক্ষেত্রে ডাক্তার মনে মনে রোগের ধরন সম্বন্ধে একটা আঁচ করে নেন এবং সেই মতো রোগের তদন্ত শুরু করেন। রোগের কারণ যদি জীবাণু বা পরজীবী হয়, তাদের ধ্বংস করা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন, তবে সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঔষধের সঙ্গে, জীবাণু বা পরজীবীরা যেসব শরীরাংশ ( যেমন যকৃৎ )-কে বিকল করতে পারে, সেই শরীরাংশগুলির অবদানের বদলি দ্রব্যও দিয়ে দেওয়া হয়।

ইংরেজী 'ড্রাগ' ( Drug ) কথাটি ( বাঙ্গালায় যার অর্থ ঔষধ )-র বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা ( World Health Organisation ) সংজ্ঞা করেছে 'যে কোন দ্রব্য যা গ্রহীতার উপকারোদ্দেশ্যে, অসুস্থ অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য বা সুস্থ শরীরের কার্যকলাপের অনুসন্ধান করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাই ড্রাগ'[৬]। ড্রাগ বলতে সাধারণতঃ রাসায়নিক দ্রব্যকেই বুঝায়, তবে বাঙ্গালাভাষায় 'ঔষধ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে, অসুখের চিকিৎসায় ব্যবহৃত যে কোন রাসায়নিক বা জান্তব পদার্থকে ধরা হয়, এমন কি খাদ্যের সারবস্তু রোগীকে বিশেষভাবে পরিবেশিত হলে ( যেমন টনিক হিসাবে দিলে ) তাও ঔষধ পর্যায়ে পড়ে যায়।

বেশিরভাগ ঔষধ ল্যাবরেটরিতে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে বার হয়েছে; দুই একটি আবার কোন রোগের চিকিৎসায় প্রয়োগকালে রোগীর দেহে থাকা অন্য অসুখের উপর ভাল ফল হওয়া দেখে, শেষোক্ত রোগেরও ঔষধ হিসাবে চালু হয়ে গেছে। ল্যাবরেটরিতে ঔষধের কার্যাবলী, প্রয়োগমাত্রা, আনুষঙ্গিক কুফল প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয় জন্তু জানোয়ারের উপর। তার পর দেশের আইনসঙ্গতভাবে কিছু রোগী বা স্বেচ্ছা-সেবকের দেহে প্রয়োগ করে দেখা হয়। সব দিক বিবেচনার পর সেই ঔষধের ব্যাপক ব্যবহারের অনুমতি দেয় সরকারের ড্রাগ কণ্ট্রোলার। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত একটিমাত্র ঔষধের আবিষ্কার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সেটি হল স্যার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত কালাজ্বরের ঔষধ, ইউরিয়াস্টিবামিন ( Ureasti-bamine )।

ঔষধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এবং চিকিৎসকের দিক হতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে রোগ কি ভাবে হয় ( Pathogenesis ) তা জানা; অর্থাৎ কোন্ দেহাংশের দেহকোষের বৈকল্য হয়েছে এবং সে বৈকল্য কি ধরনের তা জানা। তারই উপর নির্ভর করবে ঔষধের ধরন। শরীরে ঢুকা জীবাণুদের ধ্বংস করতে হলে জানতে হবে, তাদের জীবনধারণের জন্য কি অত্যাবশ্যক সামগ্রী এবং কিভাবে সেই সামগ্রী হতে তাদের বঞ্চিত করা যায়। অন্যদিকে চিন্তা করা হয় জীবাণুদের শরীরগঠনের দুর্বলতা কোথায় এবং কি রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সেই দুর্বল অংশকে নষ্ট করা যায়—অবশ্য রোগীর দেহকোষের ক্ষতি না করে। এই সব পথ ধরেই নানা রাসায়নিক

৬ World Health Organisation Technical Report Series No. 341, p. 7, 1966, as quoted in Clinical Pharmacology, Churchill Livingstone, Robert Stevenson House, Edinburgh EH1 3AF.

এবং এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে। ঔষধ আবিষ্কারককে দেখতে হয়, রক্তে কতক্ষণ এবং কি পরিমাণে ঔষধ থাকে এবং রোগস্থানে কি পরিমাণে তা পৌঁছায়। অনেকের জানা আছে যে জীবাণুদের মধ্যে এ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ-ক্ষমতা জন্মানর ফলে নতুন নতুন এ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করার প্রয়োজন হচ্ছে। মানুষ ও জীবাণুর এই যে বাঁচবার সংগ্রাম, এ শুধু ঔষধের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেই মানুষ ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাণীকুলের মধ্যে বাঁচার লড়াই চলছে। অনেকের মতে, জীবনের একটি লক্ষণই হচ্ছে নিজেকে নষ্ট না হতে দেওয়ার প্রয়াস।

সুস্থ শরীরে জীবাণুপ্রতিরোধ ক্ষমতাসৃষ্টির জন্য সেই জীবাণুর বিষ বা জীবাণুকে অ-ক্ষতি-কারক অবস্থাতে রূপান্তরিত করে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। একেই ভ্যাকসিন বা টিকা বলে। ভাইরাসজনিত রোগের চিকিৎসায় ভাল ঔষধ আবিষ্কৃত না হওয়ায় টিকার উপরই আমাদের বেশি নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। মানসিক রোগে, মূলকারণের প্রতিকার না করা গেলেও লক্ষণ-অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত মানসিক উত্তেজক বা আনন্দদায়ক কয়েকটি ঔষধের অন্যায় ব্যবহার (Drug abuse) বর্তমান সভ্য সমাজের, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঔষধের কুফল সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কোন কোন ঔষধ ল্যাবরেটরিতে নিরাপদ প্রমাণিত হয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে চালু হবার পরেও তাদের কুফল প্রমাণিত হয়েছে, এমন কি তাদের ব্যবহার বন্ধ করতে হয়েছে। চালু অনেক ঔষধের কুফল সম্বন্ধে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা চিন্তিত। কোন ঔষধের প্রয়োগে ক্যান্সার হতে পারে কি না, এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দুই এক মাসে বা বৎসরে নাও আসতে পারে। নতুন কোন ঔষধ চালু করবার অনুমতি দেওয়ার এটি একটি বড় সমস্যা। কিছু ঔষধ গর্ভবতী জননীর ক্ষতি না করলেও গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতি করতে পারে। এই সব নানা কারণে, 'ঔষধ-জনিত রোগ' (Iotragenic diseases) চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্রবিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে উন্নতিশীল জাতিগুলির স্বাস্থ্যকর্তারা এবং বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা জোর দিচ্ছেন রোগ-চিকিৎসার চেয়েও রোগপ্রতিরোধের উপর। কিন্তু শেষোক্ত কার্যসাধনে যে জনগণের খাদ্য, শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব প্রচুর, তা প্রমাণ করেছে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলি। সবশেষে বক্তব্য এই যে, রোগের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসার ভিত্তি নিরূপণ,—এ দুটিই বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেজন্য এ দুটিই চিরপরিবর্তনশীল থাকবে।

**তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই হইয়া যাইবে।**
**যদি তুমি নিজেকে দুর্বল ভাবো, তবে দুর্বল হইবে।**
**তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে।**

**—স্বামী বিবেকানন্দ**

# রামহৃদয়ম্

শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল

[ 'রামহৃদয়ম্' এই অনুবাদমূলক রচনাটি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাত্মরামায়ণের অন্তর্গত। মহর্ষি বেদব্যাসরচিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তর খণ্ডের একটি অংশ অধ্যাত্মরামায়ণ। উহার বালখণ্ডের প্রথম সর্গকে 'রামহৃদয়ম্' নামে অভিহিত করা হয়েছে। শিব-পার্বতী সংবাদের মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণই এই সর্গের উপপাদ্য বিষয়। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত স্বরূপ, বিশেষতঃ পূর্ণব্রহ্ম রাম এবং সীতা-বিরহে কাতর রামের মধ্যে অভিন্নতা কোথায়—সীতা ও হনুমানের বাক্যবিনিময়ের সূত্রে ঐ তত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়েছে। এই নিবন্ধে মূল, অন্বয়, বাংলা ভাষায় প্রত্যেকটি শ্লোকের অনুবাদ এবং ভাবার্থ প্রদত্ত হয়েছে। ]

যঃ পৃথিবীভরবারণায় দিবিজৈঃ সংপ্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
নিশ্চক্রং হতরাক্ষসঃ পুনরগাদ্ ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং
কীর্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং
ভজে ॥ ১ ॥

অন্বয়—যঃ দিবিজৈঃ পৃথ্বীভরবারণায় সংপ্রার্থিতঃ (সন্) চিন্ময়ঃ অব্যয়ঃ অপি পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যঃ সঞ্জাতঃ, (তত্র) নিশ্চক্রং হতরাক্ষসঃ জগতাং পাপহরাং স্থিরাং কীর্তিং বিধায় পুনঃ আদ্যং ব্রহ্মত্বম্ অগাৎ, তম্ জানকীশম্ ভজে।

বঙ্গানুবাদ—দেবতাদের অনুরোধ এবং প্রার্থনায় পৃথিবীর পাপরাশির ভার লাঘব করার জন্য চিন্ময় ও অব্যয় হয়েও যিনি মহিমমণ্ডিত সূর্যবংশে 'মায়ামনুষ্য'-রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-হস্তশোভিত সুপ্রসিদ্ধ সুদর্শন চক্র ব্যতিরেকেই রাক্ষসকুল নির্মূল করে জগতে সেই পাপহারিণী শাশ্বত কীর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং পুনরায় স্ব-রূপে অর্থাৎ নির্লিপ্ত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হয়েছিলেন, সেই জানকীনাথ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি।১

ভাবার্থ— শিবপার্বতীসংবাদরূপে অধ্যাত্ম-রামায়ণ বর্ণনার প্রারম্ভে মহর্ষি বেদব্যাস বিঘ্ন-বিনাশের উদ্দেশ্যে ভগবানের স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে বলেছেন—যে চিন্ময় অবিনাশী প্রভু পৃথিবীর ভার হরণ করবার জন্য দেবগণের প্রার্থনা অনুসারে পৃথিবীতে সূর্যবংশে মায়ামানবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, আর যিনি রাক্ষস-গণকে বধ করে জগতে নিজের পাপবিনাশিনী অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করে আবার নিজের সনাতন ব্রহ্মস্বরূপে লীন হয়ে গিয়েছিলেন, সেই জানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্রের আমি উপাসনা করি। শ্রীভগবান স্বয়ং গীতায় বলেছেন—সাধুগণের রক্ষা, দুষ্টগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। তাই রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়ে দেবগণ যখন পৃথিবীর ভার হরণের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জন্মরহিত, অব্যয় হয়েও নিজের মায়াকে আশ্রয় করে এই পৃথিবীতে সূর্যবংশে মানব হয়ে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। এই মায়া হল তাঁর অঘটনঘটনপটীয়সী ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি: এই মায়া সম্পর্কে শ্রুতিতে বলা হয়েছে—"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্—", গীতায় বলা হয়েছে—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" তাই মায়াতীত, চিন্ময়, অব্যয়, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করে সগুণ, সাকার হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর

মনুষ্যভাব মায়াকৃত ; রামতাপনীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা-শরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা" অর্থাৎ জ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল ও নিরাকার ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়েছে ভক্তগণের জন্যই। তাই ভক্তগণের কল্যাণের জন্য সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করে আবার তিনি স্বস্বরূপ অর্থাৎ নিরুপাধিকব্রহ্মত্ব লাভ করেছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্তিম্।
আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি ॥ ২ ॥

অন্বয়—বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু একং হেতুং মায়াশ্রয়ং বিগতমায়ম্ অচিন্ত্যমূর্তিম্ আনন্দ-সান্দ্রম্ অমলং নিজবোধরূপং বিদিততত্ত্বং সীতা-পতিম্ অহং নমামি।

বঙ্গানুবাদ—যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা ও কারণস্বরূপ ; যিনি মায়াকে আশ্রয় করে মহান অথচ মায়াশূন্য, আবার যাঁর আনন্দঘন, অচিন্ত্যমূর্তি উপাধিরহিত ও বোধ বা ব্রহ্মস্বরূপ আমি সেই সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি।২

ভাবার্থ—এই শ্লোকে 'শ্রীরামচন্দ্রই ব্রহ্ম'—এই সিদ্ধান্ত, লক্ষণের সাহায্যে সমর্থন করা হয়েছে। শ্লোকটির সরল অর্থ হল—যিনি বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়াদির একমাত্র কারণ, মায়ার আশ্রয় হয়েও মায়ার অতীত, অচিন্ত্য-স্বরূপ, আনন্দঘন, উপাধিকৃতদোষশূন্য, স্বয়ং-প্রকাশস্বরূপ, সেই তত্ত্ববেত্তা শ্রীসীতাপতিকে আমি নমস্কার করি।

সর্বাগ্রে জগৎকারণত্ব দেখিয়ে ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ বুঝাবার জন্য প্রথম বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে ; বলা হয়েছে—শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের একমাত্র কারণ। নৈয়ায়িকগণ বলেন—ব্রহ্ম জগতের কারণ, যেমন বীজ অঙ্কুরের কারণ। যদিও বীজ মাটির নিচে থাকায় দেখা যায় না, তবু কার্য অঙ্কুর হতে কারণ বীজের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় ; তাই নৈয়ায়িকগণের মতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুমান প্রমাণগম্য। যেহেতু দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হচ্ছে, অতএব দেখা না গেলেও জগৎকারণ ব্রহ্ম আছেন স্বীকার করতে হয়। এই সিদ্ধান্ত অন্বয়মুখী ও ব্যতিরেকী দ্বিবিধ প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেমন কার্য থাকলে কারণ থাকবে—এটি অন্বয়মুখী প্রমাণ ; কার্য—এই দৃশ্যমান জগৎ আমি, আপনি সকলেই আছি বা আছেন, অতএব কারণব্রহ্ম অবশ্যই আছেন। পক্ষান্তরে কারণ না থাকলে কার্যও থাকবে না—এটি ব্যতিরেকী প্রমাণ ; কারণ ব্রহ্ম না থাকলে কার্য—আমি, আপনি সহ এই দৃশ্যমান জগৎ কিছুই থাকবে না, অথচ এটি প্রত্যক্ষবিরোধী, আমি, আপনি সমেত এই দৃশ্যমান জগৎ সবই রয়েছে ; অতএব ব্রহ্ম অবশ্যই আছেন। এগুলি হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। বেদান্তদর্শনে চার রকম প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শাস্ত্র। অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সত্যতা সিদ্ধ হয় শাস্ত্র প্রমাণে। ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বের সমর্থনে শ্রুতিবাক্যে বলা হয়েছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।" (তৈত্তিরীয় ৩।১) অর্থাৎ যাঁর থেকে এই অখিলভূতবর্গের উৎপত্তি হয়, উৎপন্ন হয়ে তাঁরা যাঁর দ্বারা বর্ধিত হয়, বিনাশকালে যাঁতে গমন করে ও বিলীন হয়, তাঁকেই জানতে ইচ্ছা কর ; তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, যেহেতু তিনি মায়ার আশ্রয়। আশ্রিত মায়া জগৎসৃষ্টির উপাদান কারণ হলেও আশ্রয় ব্রহ্ম ছাড়া তার অস্তিত্ব

থাকে না, তাই পরোক্ষভাবে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ। শ্রুতিতে বলা হয়েছে—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" ( শ্বেতাশ্বতর ৪।১০ ) অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলে জানবে। এমন আশঙ্কা হতে পারে যে মিথ্যাভূত জগতের কারণ ব্রহ্মও কি মিথ্যা হয়ে যাবেন? এরূপ আশঙ্কা ঠিক নয়, কারণ ব্রহ্ম মায়ার অতীত; তাই বিশেষণ দেওয়া হয়েছে—'বিগতমায়ম্'। আবরণ-শক্তিরূপা মায়া তাঁকে অভিভূত করতে পারে না। যদিও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, তিনি কিছুই করেন না, আর এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি মিথ্যা, তবু এই জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান-সত্তার ফলে সত্যবৎ প্রতীত হয়। তাই সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্তকারণ আশ্রিতা মায়ার জগৎ-কর্তৃত্ব মায়ার আশ্রয় নিষ্ক্রিয় অকর্তা ব্রহ্মে উপচরিত হয়ে তটস্থলক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎ কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়েছে। দূর হতে কোনও বস্তুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় সেই বস্তুর তটস্থ-লক্ষণ বা বাইরের পরিচয়। আর নিকটে গিয়ে উত্তমরূপে পরীক্ষার পর কোনও বস্তুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় সেই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ বা প্রকৃত পরিচয়। শ্রীরামচন্দ্র হলেন জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহর্তা—এটি হল তাঁর তটস্থ লক্ষণ। এরপর স্বরূপ-লক্ষণ বর্ণনা করে—'অমলম্', 'নিজবোধরূপম্' ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন মহর্ষি বেদব্যাস। তিনি অচিন্ত্যমূর্তি অর্থাৎ নিরাকার বাক্য ও মনের অতীত। শ্রুতিতে বলা হয়েছে—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ: ( তৈত্তিরীয় ২।৪ ) অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে বিষয় করতে অসমর্থ হয়ে বাক্যাদি মনের সঙ্গে ফিরে আসে। পরমব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে স্বরূপলক্ষণের অবতারণা করে উপরের বিশেষণ দুটি প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্রুতিবাক্যে বলা হয়েছে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" ( তৈত্তিরীয় ২।১।৩ ) অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ; যিনি সত্যস্বরূপ, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ, আবার তিনিই অনন্তস্বরূপ। সত্য বলা যায় তাকেই, যা যেরূপে নিশ্চিত হয়, সেইরূপ কখনও পরিত্যাগ করে না। আর জ্ঞান হল—জ্ঞপ্তি বা অনুভবমাত্র, জ্ঞানের কর্তাদি নয়; সর্বশেষে অনন্ত হল—দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। এই তিনটিই ব্রহ্মের বিশেষণ ও তিনটিই পৃথক্‌ভাবে ব্রহ্মে অন্বিত হবে। বিশেষণ বিশেষ্যকে অপর বস্তু হতে পৃথক্ করে দেয়; সত্য শব্দ বিকারী বস্তু হতে পৃথক্ করে ব্রহ্মকে সকলের অধিকারী কারণরূপে নির্দেশ করছে; জ্ঞানশব্দ কর্তৃত্বাদির ও অনন্ত শব্দ সসীমত্বের নিষেধ করছে।

পঠন্তি যে নিত্যমনন্যচেতসঃ
শৃণ্বন্তি চাধ্যাত্মিকসংজ্ঞিতং শুভম্।
রামায়ণং সর্বপুরাণসংমতং নির্ধূতপাপা
হরিমেব যান্তি তে ॥ ৩ ॥

অন্বয়—অনন্যচেতসঃ যে নিত্যং সর্বপুরাণ-সম্মতং আধ্যাত্মিক সংজ্ঞিতং শুভং রামায়ণং পঠন্তি শৃণ্বন্তি চ তে নির্ধূতপাপাঃ ( সন্তঃ ) হরিম্ এব যান্তি।

বঙ্গানুবাদ—যাঁরা অনন্যচিত্ত হয়ে এই শুভ-ফলপ্রদায়ী এবং সর্বপুরাণসম্মত অধ্যাত্মরামায়ণ নিত্য পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে শ্রীহরির সাযুজ্য বা সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন।৩

ভাবার্থ—যাঁরা এই সর্বপুরাণসম্মত পবিত্র অধ্যাত্মরামায়ণ একাগ্রচিত্তে পাঠ করেন এবং শ্রবণ করেন, তাঁরা পাপরহিত হয়ে শ্রীভগবান-কেই লাভ করেন। ॥ ৩ ॥

অধ্যাত্মরামায়ণমেব নিত্যং পঠেদ্যদীচ্ছেদ্-
ভববন্ধমুক্তিম্।

গবাং সহস্রায়ুতকোটিদানাৎ ফলং লভেত্তু:
শৃণুয়াৎস-নিত্যম্ ॥৪॥

অন্বয়—যদি ভববন্ধমুক্তিম্ ইচ্ছেৎ (তর্হি) অধ্যাত্মরামায়ণম্ এব নিত্যং পঠেৎ। যঃ নিত্যম্ শৃণুয়াৎ, স গবাং সহস্রায়ুতকোটিদানাৎ ফলং লভেৎ (লভেত)।

বঙ্গানুবাদ—যদি কারও ভববন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে নিত্য এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ করবেন এবং যিনি নিত্য এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করেন তিনি সহস্র-অযুত কোটি-গো-দানের ফল প্রাপ্ত হন।৪

ভাবার্থ—যদি কেউ সংসারবন্ধন হতে মুক্তি কামনা করে, তবে তার প্রতিদিন অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করা উচিত; যদি কোনও ব্যক্তি নিত্য অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করে, তবে সে অসংখ্য গো-দানের ফল লাভ করে থাকে।৪

পুরারিগিরিসংভূতা শ্রীরামার্ণবসঙ্গতা।
অধ্যাত্মরামগঙ্গেয়ং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥৫॥

অন্বয়—পুরারিগিরিসম্ভূতা শ্রীরামার্ণবসঙ্গতা ইয়ম্ অধ্যাত্মরামগঙ্গা ভুবনত্রয়ং পুনাতি।

বঙ্গানুবাদ—এই অধ্যাত্মরামায়ণরূপা গঙ্গা মহাদেবরূপ পর্বত থেকে উৎপন্না হয়ে এবং শ্রীরামচন্দ্ররূপ সমুদ্রে মিলিতা হয়ে ত্রিভুবনকে পবিত্র করছেন।৫

ভাবার্থ—দেবাদিদেবমহাদেবরূপ পর্বত হতে নিঃসৃতা শ্রীরামচন্দ্ররূপ সমুদ্রে মিলিতা এই অধ্যাত্ম-রামায়ণরূপিনী গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করে থাকে।

এখানে রূপকের মাধ্যমে অধ্যাত্মরামায়ণকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে হিমালয়-নিঃসৃতা পতিতপাবনী গঙ্গাকে সর্বপাপহারিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তেমনই অধ্যাত্মরামায়ণরূপা গঙ্গা সর্বপাপ দূর করে দেয়। গঙ্গা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিলোককে পবিত্র করে থাকে; তেমনই অধ্যাত্মরামায়ণ বক্তা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিলোককে পবিত্র করে। অধ্যাত্মরামায়ণ দেবাদিদেবরূপ হিমাচল হতে উৎপন্ন হয়েছে, আর সংশ্লিষ্ট সকলকে পবিত্র করে নিয়ে যায় শ্রীরামচন্দ্ররূপ মহাসমুদ্রে অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ অথবা শ্রবণ করলে পাঠকের ও শ্রোতার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।৫ [ক্রমশঃ]

"মনুষ্যমধ্যে রাম সর্বাপেক্ষা বীর্যবান্ ছিলেন। রাক্ষস, দৈত্য, দানব, কাহারও এত শক্তি ছিলনা যে, বাহুবলে রামকে পরাস্ত করে।......অবশ্য রাম ঈশ্বরাবতার ছিলেন, নতুবা তিনি এ-সকল দুষ্কর কর্ম কিরূপে সম্পাদন করিলেন? হিন্দুদের মতে রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। ভারতবাসীগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের সপ্তম অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ



# অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

স্বামী শুদ্ধানন্দ

## ইন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ

প্রজাপতি বলিতেন, নিষ্পাপ, অজর, অমর, অশোক, ক্ষুৎপিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন। দেবাসুর উভয়েরই এই বাক্য শুনিয়া আত্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছা হইল। দেবতারা ইন্দ্রকে এবং অসুরেরা বিরোচনকে তাঁহাদের প্রতিনিধি করিয়া আত্মবিদ্যাশিক্ষার্থ প্রজাপতির নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা প্রজাপতির নিকট গিয়া বত্রিশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিলেন। বত্রিশ বর্ষ পরে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারা যখন তাঁহাদের আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছা নিবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই চক্ষে যে পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, তিনিই আত্মা; ইনিই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহারা উভয়ে প্রজাপতি বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, তিনি ছায়াকেই আত্মা বলিতেছেন। এই মনে করিয়া তাঁহারা বলিলেন, জলে যে ছায়া দেখা যায়, তাহাই আত্মা, না, আরসীতে যাহা দেখা যায়, তাহাই আত্মা? প্রজাপতি বলিলেন, তিনি এই সমুদায়েই আছেন। এক সরা জল লইয়া তাহাতে আত্মাকে দেখ। যদি তখনও না জানিতে পার, তবে আমায় বলিও। তাঁহারা তাহা দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন, লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত তাহার অবিকল প্রতিরূপ দেখিতেছি। তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া জলে দেখিতে বলিলেন, তাঁহারাও দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন সজ্জিত হইয়াছি, ঠিক সেইরূপ জলে আপনাদিগকে দেখিতেছি তখন তিনি বলিলেন, ইনিই অমৃত ও অভয়স্বরূপ; ইনিই ব্রহ্ম। তাঁহারা কৃতার্থমন্য হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন, হায়, দেবাসুর উভয়েই আত্মজ্ঞান না পাইয়া চলিয়া গেল। বিরোচন তো অসুরদের নিকট যাইয়াই তাহাদিগকে বলিল, প্রজাপতির উপদেশ, এই দেহই আত্মা। অসুরেরা সেই উপদেশ গ্রহণ করাতে অসুরসম্প্রদায় এখনও দানরহিত, শ্রদ্ধাশূন্য, ভোগনিষ্ঠ ও দৈহিকপরায়ণ।

ইন্দ্রও দেবগণের নিকট ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার বিচার উপস্থিত হইল যে, এই দেহ যখন সুন্দর বসন ভূষণে শোভিত হইলে তাহার ছায়াও তদ্রূপ হয়, সেইরূপ কোন অঙ্গহীন হইলে ইহার ছায়াও তো অঙ্গহীন হইবে—অতএব এই ছায়া কখন আত্মা হইতে পারে না। এই মনে করিয়া গুরুর নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইলে গুরু আরো বত্রিশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া যে পুরুষ স্বপ্নে নানাবিধ অনুভব করেন, তিনিই আত্মা, এই উপদেশ দিলেন। ইহাতে ইন্দ্র প্রথমতঃ তৃপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুনর্বার সন্দিগ্ধ হইয়া গুরুকে নিবেদন করিলেন, স্বপ্নাবস্থায় মন দেহের ধর্ম্মে লিপ্ত নহেন বটে, কিন্তু নানাপ্রকার দুঃখে মনের শোক ও চাঞ্চল্য ঘটে। গুরু তাঁহাকে আরো বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া স্বপ্নশূন্য সুষুপ্তিই আত্মার প্রকৃত অবস্থা বলিয়া উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র তাহাতেও যখন তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন, সুষুপ্ত্যবস্থায় 'আমি' জ্ঞানই যখন থাকে না, তখন উহাকে কি করিয়া অমৃতস্বরূপে আত্মা বলা যায়? তখন প্রজাপতি তাঁহাকে আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া আত্মার স্বরূপতত্ত্ব উপদেশ করিলেন।*

* 'উদ্বোধন'-এর ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

আরে বাপু, যদি ব্রাহ্মণই হইত, তার ব্রাহ্মণত্ব কই? ব্রাহ্মণ হইলে কি মানুষকে ঘৃণা করিতে হয়? না—সমদর্শী হইতে হয়? পণ্ডিত হইলে কি দম্ভে ধরাকে সরা দেখিতে হয়, অথবা "বিদায়" ধন বা মান্য পাইবার জন্য বড়লোকের পদানুসরণ করিতে হয়, না নিরভিমানী, গুণগ্রাহী ও নির্লোভী হইতে হয়? এতে আর কি পরস্পর সদ্ভাব থাকে? না—জাতীয়তা রক্ষা হয়? দেশে যে একেবারেই সদ্‌ব্রাহ্মণ নাই, তা বলিতেছি না; এমন ব্রাহ্মণও দেখিয়াছি যে, তাঁহারা যথার্থ প্রাতঃস্মরণীয় ও প্রকৃত দেশহিতৈষী; তবে, তাঁহাদের সংখ্যা কিছু কম। অবশ্য, জাত্যভিমান ও পাণ্ডিত্যাভিমান সকল দেশেই আছে, কিন্তু আমাদের দেশে একটু বাড়াবাড়ি; এত বেশী যে, শত্রুপক্ষ অনায়াসেই দেশের গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। জাতিভেদ—উত্তম; জাত্যভিমান কিছু নয়। জাতিভেদ থাকে কিছু ক্ষতি নাই; বরং ইহা দেশের শোভাই বৃদ্ধি করে। কিন্তু, জাত্যভিমান থাকিলে দেশের অশেষ অমঙ্গল অনবরত ঘটিতে পারে।

'জাতি' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ আমরা বর্ণ বা বংশ-গত বলিয়া জানি; যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি। 'জাতি', শব্দের আর এক অর্থও আমরা জানি, তাহা আকৃতিগত; যথা, দেবতা, অসুর, মানব, স্ত্রী, পুরুষ, বিহঙ্গম, পশু প্রভৃতি। 'জাতি' শব্দের যে আরও এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থ আছে, তাহা আমরা হয়ত সকলে জানি না, তাহার মাহাত্ম্য আমরা হয়ত সকলে বুঝিতে পারি না; সে অর্থ দেশগত; যথা, ফরাসী, রুশ, ইংরাজ প্রভৃতি। আমরা—ভারত-সন্তান; জাতিতে আমরা সকলেই ভারতবাসী। এই অর্থটী আমাদিগের ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তাহা হইলে স্বজাতির প্রতি একটু টান হইতে পারে, স্বজাতির গৌরব কিসে বৃদ্ধি হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি পড়ে, কিসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হয় তাহার চেষ্টায় সকলের উদ্যত হওয়া সম্ভবপর হয়।

আমরা জানি না যে, ভারত আমাদিগের একটী বৃহৎ বাটী। দেশের যাবতীয় লোক সকলেই আমরা এক পরিবার; ছোট বড় ধনী নির্ধনী সকলেই এক (ভারত-মাতা) মায়ের স্তন্য পান করিয়া আমরা মানুষ, এক অন্নেই প্রতিপালিত। বাড়ির সকলেই আমরা পরস্পর পরমাত্মীয়। একবাড়িতে থাকিয়া ভাই-ভাই বিবাদ বা জ্ঞাতি-বিবাদ করিলে, সে বাড়ি শীঘ্রই উৎসন্ন যায়; এক বাড়িতে থাকিয়া পরস্পর অসদ্ভাব পোষণ করিলে, সে বাড়ির আর ভদ্রত্ব থাকে না।

ভারত-বহির্ভূত অন্যান্য দেশীয়গণ আমাদিগের জ্ঞাতি। জ্ঞাতিগণকে আমাদিগের প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য যে, ভারতের গৌরব কত; তাঁহারা দেখুন যে, ভারত হইতে তাঁহারা কত উপকৃত হইতে পারেন, ভারত তাঁহাদিগের মুখ কত উজ্জ্বল করিতে পারেন। সকলে দেখুন যে, পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে ভারত কত গুণশালী এবং সর্ব্ববিষয়েই কতদূর উন্নত। এ সকল আলঙ্কারিক ভাষা নহে; এ সকল কবি-কল্পনা নহে, এ সকল ঔপন্যাসিক বর্ণনা-কৌশল নহে। এ সকল কথার মধ্যে যাথার্থ্য যথেষ্ট আছে। ভারত যথার্থই সকল যুগে ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিরুপম ছিলেন। আজ কেবল সেই সোনার ভারত এই ক্ষুদ্র চেতা হতভাগ্যদিগের হস্তে পড়িয়া শ্রীভ্রষ্ট ও লুপ্ত-গৌরব-প্রায় দেখাইতেছেন। এখনও আশা আছে; এখনও

অগ্রহায়ণ, ১৩১০ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

(চৈত্র, ১৩৯৩, পৃঃ ২০৫)

ভারতের প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়া বাহির হয় নাই। পতিত ভারত এখনও পুনরুত্থান করিতে পারেন। প্রাচীন যশোরাশি এখনও পুনরুদ্দীপিত হইতে পারে। বেশী আয়াস সাধ্য যে, তাহাও নহে। কেবল মাত্র প্রয়োজন—পরস্পরের সদ্ভাব ও

## সৎ-ইচ্ছা ( Good wishes )।

ইচ্ছা—দুই প্রকার; সৎ ও অসৎ। শুভ ইচ্ছাই সৎ; অশুভ ইচ্ছা অসৎ। নিজের বা পরের—মঙ্গল হউক ভাবিতেও যতক্ষণ, আর, অমঙ্গল ভাবিতেও ততক্ষণ। তবে, জল যেমন নিম্নগামী, মানুষের প্রবৃত্তিও তদ্রূপ স্বতঃই নিম্নদিকে গমনোন্মুখ। সুতরাং, পরের অশুভ কামনা করা, বা নিজে অসৎ-পথে যাওয়া বেশী সম্ভব। এ স্থলে, সৎসঙ্গ সদালোচনা ও সৎবিচার প্রয়োজন; মনকে বুঝান আবশ্যক যাহাতে মন অসৎ-ইচ্ছাকে আসিতে না দেয়। অসৎ-পদার্থ মাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও অশেষ অপকারী; সৎ-পদার্থ—নিত্য, অবিনশ্বর, এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পরন্তু, সদিচ্ছাউদ্ভাবন বিশেষ যে কষ্টসাধ্য তাহা নয়; ইহাতে অর্থব্যয় নাই; কায়-ক্লেশ নাই; কোনও প্রকার স্বার্থ-ব্যাঘাতের লেশ মাত্র সম্ভব নাই। বরং, স্বার্থপরগণের প্রচুর স্বার্থ পরিতৃপ্ত হইতে পারে; অলসগণের শ্রম আরও স্বল্প হইতে পারে; এবং, কৃপণগণের অর্থাগম অধিকতর হইতে পারে। সদ্ভাব বা সদিচ্ছার শক্তি—( force of good will )—জীবন্ত; আমাদিগের ন্যায়, অলস মানুষের ন্যায়, জীবন্তে মৃত নহে। সদিচ্ছার সে সচেতন-শক্তি অগ্নি-অপেক্ষা কার্য্যক্ষম, এবং তপোবলের তুল্য সদা সর্ব্ব-দক্ষ; তড়িত-অপেক্ষা বেগগামী, মনের সম অতি দ্রুত গমনশীল; ব্রহ্মার অপেক্ষাও উদ্ভাবন-শক্তিসম্পন্ন, এবং কবির ন্যায় সুন্দর সৃষ্টি-পটু।—সদিচ্ছার শক্তি এত প্রবল।

মনে করুন আপনি এখানে বসিয়া আছেন; আপনার কোনও আত্মীয় দূরদেশে আছেন। এখান হইতে যদি আপনি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা মনে মনে যথার্থ অন্তরের সহিত করেন, সে ইচ্ছা প্রায়ই পূর্ণ হয়—তাঁহার মঙ্গল হওয়া খুবই সম্ভব। ক্রমশঃ আপনার ইচ্ছাশক্তি যখন প্রবল ও বর্দ্ধিত হইবে, তখন সমগ্র দেশের উপর মঙ্গল-কামনা করিলেও সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। পরের মঙ্গল-কামনা করিলে যে, কেবল পরেরই মঙ্গল হয় তাহা নহে, নিজেরও মঙ্গল হয়।

সদিচ্ছা ( অর্থাৎ শুভ-ইচ্ছা ) অতি যত্নের সহিত, অতি অন্তরের সহিত, অতি সত্যের সহিত, হৃদয়ে উদ্ভাবন করিতে হয়। যিনি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে সদিচ্ছা পোষণ করেন, তাঁর সহস্রদোষ থাকিলেও সে সকল ভস্মীভূত হয় এবং তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হন; অলস হইলেও তিনি অতি কার্য্যক্ষম হইয়া উঠেন; দরিদ্র হইলেও তিনি ধনবান হইতে পারেন; অতি কৃপণ হইলেও আশ্চর্য্য দাতা হইয়া উঠেন, অগণ্য থাকিলেও মহা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, অতি মূর্খ হইলেও তিনি মহা পণ্ডিত হন; এমনকি—বোবা হইলেও বক্তা হন, বা পঙ্গু হইলেও পর্ব্বত লঙ্ঘান।—সদিচ্ছার এত প্রভাব!

প্রকৃত সদিচ্ছা বা শুভ-ইচ্ছাকে ( good wishes ) কাহারও নিকট প্রেরণ করিতে হয় না; গম্যস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয় না; পথ প্রদর্শন করিয়া দিতে হয় না; কার্য্য করিবার কোনও উপদেশ দিয়া দিতে হয় না; তাহাকে পত্র দ্বারা বা লোক-মারফত পাঠাইতে হয় না।

( ৮৭তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২০৬ )

সে স্বয়ং নিঃশব্দে অন্তর হইতে নিঃসৃত হইয়া, অন্তরেই ( অপর কাহারও ভিতর ) প্রবেশ করে; কখনও বহির্দ্দেশে বা অযথা স্থানে অপব্যয়িত হইতে জানে না; নিজের স্থান নিজেই অন্বেষণ করিয়া লয়; কোনও না কোন যোগ্য ক্ষেত্রে—যোগ্য লোকের অন্তরে যাইয়া প্রবিষ্ট হয়; প্রবিষ্ট হইয়াও তথায় যে, নিশ্চেষ্টভাবে থাকে তাহা নহে। পরশ-মণি যেমন নিজ স্পর্শগুণে কদর্য্য লৌহকেও সুন্দর স্বর্ণখণ্ডে পরিণত করে—শুনিয়াছি; তদ্রূপ, সদিচ্ছা, সেই লোকের ভিতর যাইয়া, যদি তথায় কোনও প্রকার পরনিন্দা পরপীড়া স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কিছু দোষ থাকে, সে সকল দূরীকৃত করিয়া, যাবতীয় মনমালিন্য সাফ করিয়া, সেই মনুষ্যের অন্তরে দেবভাবের উদ্রেক করান, এবং অশেষ প্রকার সদুদ্যমে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া, "পরায় সতাং জীবনং"—ইহাই জীবনের পরিচালক-মন্ত্র তাঁহার কর্ণে দিয়া তাঁহাকে প্রকৃত মনুষ্যরূপে পরিণত করাইয়া দেন।

এক প্রকার "আতস বাজী" যেমন উর্দ্ধোদেশে শূন্যমার্গে বেগে গমনপূর্ব্বক ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া অন্ধকারময় অমাবস্যার নিশাতেও নানাপ্রকার আলোকের বিস্তার করে—দেখিয়াছি; কোথাও বা, সদিচ্ছা তদ্রূপ, হৃদয়-শূন্য সমাজে, উদ্যম-শূন্য পাড়ায়, লক্ষ্য-শূন্য আড্ডায় যাইয়া তথাকার যাবতীয় তমোরাশি নাশ করিয়া, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া, পরস্পর পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে যাহাতে সকলের মতি হয়, এইরূপ বিধান বিস্তার করিতে থাকেন।

এক প্রকার কামানের বৃহৎ গোলা যেমন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিজ গর্ভস্থিত বিষাক্ত পদার্থ সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তার পূর্ব্বক শত্রুকুলকে ধ্বংস করে—পুস্তকে পড়িয়াছি; কোথাও বা সদিচ্ছা তদ্রূপ কোষাকারে দূরদেশে যাইয়া নিজ বক্ষ বিদীরণ পূর্ব্বক ধন-ধান্যাদির দ্বারা দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ প্রভৃতি দেশের দুর্ব্বিপাক সমূহকে বিনষ্ট করেন।

এই ত গেল, সদিচ্ছার উদ্ভাবন ও বিক্ষেপণ শক্তি। আকর্ষণ, বশীকরণ, শুদ্ধীকরণ, সিদ্ধীকরণ, প্রভৃতি, সদিচ্ছার আরও অশেষ প্রকার অসাধারণ শক্তি আছে। আমরা কখন কখন সাধু-সন্ন্যাসিগণের ভিতরেও এই সকল শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। কেন? তাঁহারা প্রকৃত সদিচ্ছাবান পুরুষ,—সেই জন্যই; নিজের ও পরের জন্য কেবলই তাঁহারা শুভকামনা করিয়া থাকেন।

সদিচ্ছা বা শুভকামনা কখনই অসৎ বা নিন্দনীয় হইতে পারে না, তা—নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ—নিঃস্বার্থতা। শুভকামনা, নিঃস্বার্থ ব্যতীত, অন্য কোন প্রকারের হওয়া অসম্ভব। নিজের জন্য শুভকামনা করিলে, নিঃস্বার্থতার প্রকাশ কি রূপে হইল? তাহার উত্তর এই:—ইন্দ্রিয় নিচয়ের অযথা চরিতার্থতার নামই স্বার্থপরতা, মিতাচরণ নিজের জন্য হইলেও নিঃস্বার্থ; ( পূর্ব্ব সংখ্যায়ই বলা হইয়াছে "নিজের জন্য করি কেন?—পরের জন্য কিছু করিতে পারিব বলিয়া" ); তদুপরি, যিনি যত পরিমাণে অকিঞ্চিৎ-কর ইন্দ্রিয়-গ্রামের আবশ্যকতা হ্রাস করিতে পারিয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে নিঃস্বার্থ। ইহারও উপর, যিনি বহিরিন্দ্রিয় সমষ্টিরূপ 'নিজেকে' সংযত করিয়া অন্তরস্থ 'নিজের' হিতসাধন করেন, তিনি ত পূর্ণ নিঃস্বার্থ। সকলেই জানেন, 'স্ব' মানে—স্বয়ং, যেমন, 'স্বপ্রকাশ'। 'স্ব' মানে আরও দুই রকম আছে; (১) ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিশিষ্ট দেহাভিমানী বদ্ধ জীব, এবং

( চৈত্র, ১৩৯৩, পৃঃ ২০৭ )

(২) তদতীত পরমাত্মা; 'স্বার্থ' 'নিঃস্বার্থ' প্রভৃতির অন্তর্গত 'স্ব' শব্দের দ্বারা 'ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট বদ্ধ জীবকে' লক্ষ্য করা হয়, এবং 'স্বস্বরূপ' প্রভৃতির 'স্ব'র দ্বারা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হয়, 'স্ব' শব্দের এই দুইটী অর্থের মধ্যে প্রথম অর্থ টী মন্দ ও দ্বিতীয় অর্থ টী ভাল; প্রথম অর্থ টী ইদানীন্তন, দ্বিতীয় অর্থ টী পুরাতন; প্রথমটী শ্লয়াদির প্রিয়, দ্বিতীয়টী নিতান্ত সাংসারিকগণের পক্ষে ব্যবহার্য্য।

সদিচ্ছা এত পবিত্র ও পুণ্যময়, এত সজীব ও শক্তিমান্ যে, তাহাকে কেহ নিজের জন্য উদ্ভাবন করিলেও, সেই সদিচ্ছা নিজে নিজেকে নিদেন গৌণভাবে বা অলক্ষিতভাবেও পরের জন্য পরিণত করিবেই করিবে; পরের জন্য প্রথমে গৌণভাবে থাকিলেও, অবশেষে মুখ্যভাবে পরিণত হয়। প্রথমে বাহ্যিক দেখিতে, সাধুগণ ( গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন ) যেন নিজের জন্যই কেবল সদিচ্ছাপোষণ করেন; নিজের জন্যই কেবল ব্যস্ত, সমস্ত সাধনভজন যেন নিজের জন্যই কেবল করেন; কিন্তু, তাঁহারা যখন সিদ্ধ হন, অথবা সাধনপথে অগ্রসর হন, তখন প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা অবশিষ্ট জীবন সর্ব্বতোভাবেই পরের জন্য অতিবাহিত না করিয়া থাকিতে পারেন না। সাধুগণ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন তাঁহাদিগকে "সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করিলাম" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। সাধুগণ এত সর্ব্বজন প্রিয় হন কেন? সাধুগণের অন্তরে এত আকর্ষণশক্তি, এবং বশীকরণ শুদ্ধীকরণ সিদ্ধীকরণ প্রভৃতি শক্তি প্রবল কেন?—তাঁহাদিগের ভিতর সদিচ্ছা পূর্ণভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান বলিয়া।

'সৎলোক' মানেই—সদিচ্ছাবান্ পুরুষ। যাঁহার অন্তরে সদিচ্ছা বিশেষ প্রবল, যিনি যথার্থ সকলেরই জন্য অনবরত মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, যিনি যথার্থই সকলকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা শূদ্র হউন, দরিদ্রই হউন বা ধনবান হউন, মূর্খই হউন বা পণ্ডিত হউন—তাঁহার নিকট সকলে স্বতঃই আকৃষ্ট হন, তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ হন। তাঁহার নিকট আসিলে সকলেই শান্তি লাভ করেন, বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্তও বশতাপন্ন হয়; তিনি যাহাকে যাহা বলেন সে তাহাই করে; সকলের দৃঢ় বিশ্বাস—তিনি নিশ্চয়ই অতি মঙ্গলের জন্য বলিতেছেন। পরন্তু তাঁহার প্রতি সকলের এতদূর ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে যে তিনি কাহাকেও কিছু করিতে বলিলে সে তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না; এইরূপে তিনি অসৎ লোককেও ক্রমশঃ সৎ করিতে পারেন। আরও, সৎ লোকের নিকট থাকিলে, সৎ ইচ্ছা সম্পন্ন লোকের নিকট বাস করিলে, স্বতঃই অন্তরে সৎ-ইচ্ছা ও সদ্ভাবের উদয় হয়। ক্রমশঃ যেমন সেই সদ্ভাব অন্তরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তিরও বৃদ্ধি হয়। পরে তিনি সেই স্বীয় সদিচ্ছা-বলে অনেক কঠিন কঠিন সৎকার্য্য অল্প আয়াসেই করিতে পারেন। যদি কেহ নিজে নিজে সদিচ্ছা উদ্ভাবন ও পোষণ না করিতে পারেন, তিনি যেন সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করেন।

যে স্থানে এরূপ সৎসঙ্গেরও সম্ভব নাই, যে পাড়ায় কোনও প্রকৃত সৎলোক বা সদিচ্ছাবান্ পুরুষ নাই, সেই পাড়ার "আড্ডা"গুলিতে কিছু পরিবর্ত্তন করা একান্ত কর্তব্য। অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের ইষ্টানিষ্টের মূল হইতেছে—

## আড্ডা।

### ( আড্ডা সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় কিছু বলিব )।

( ৬১তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২০৮

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। **"শঙ্করাচার্য্য।"**—আধুনিক ধরণের একখানি নাটক, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। ভট্টপল্লী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। গৈরিশ ছন্দে লিখিত। ভাষার লালিত্য ও মধুরত্বে গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে। পাঠ করিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইবেন। শঙ্করের অলৌকিক মাতৃভক্তি, পতিপ্রাণা লীলাবতীর অসামান্য গুণাবলী, সরলমতি-মণ্ডনের হৃদয়স্পর্শী শোকোচ্ছ্বাস দৃঢ়মতি-পদ্মপাদের গুরুভক্তি, ধর্ম্মোন্মাদ হস্তামলকের তমোনাশী ও মনোহারী উপদেশমালা প্রভৃতি যথার্থই সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে। বিশেষ, নবীন পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে, শঙ্করের অমৃতোপম মাতৃভক্তি, লীলাবতীর সতীত্ব, স্ত্রীজাতিদুর্ল্লভ-সত্যনিষ্ঠত্ব, এবং কর্ত্তব্যবোধ অতিশয় উপকারী। এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের "অনুগ্রহ পত্র" নামক পৃষ্ঠায় দেখিলাম হেমবাবু বলিতেছেন—"শঙ্করাচার্য্যের নীরস জীবন লইয়া যে এমন সুন্দর কাব্য রচিত হইতে পারে ইহা পূর্ব্বে আমি কখন মনেও করি নাই।" ইহা দেখিয়া মনে করিলাম—মূল গ্রন্থখানি সমালোচনা করিব? না—গ্রন্থের "অনুগ্রহপত্রের" সমালোচনা করিব? হেমবাবু যেমন "পূর্ব্বে কখনও মনে করেন নাই" যে, নীরস শঙ্করাচার্য্যের জীবন অবলম্বন করিয়া এমন সরস কাব্য রচনা হইতে পারে; "আমরাও তদ্রূপ পূর্ব্বে কখন মনেও করি নাই" যে, সরস কবিবর হেমবাবু, সচ্চিদানন্দ সাগরে বিমগ্ন শঙ্করাচার্য্যের জীবনকে নীরস দেখিবেন। বিশেষ, যে শঙ্করাচার্য্যের মাহাত্ম্যে ও কীর্ত্তিকলাপে আজও ভারতবর্ষ মহীয়ান্—আজও কাশীধাম, বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, জগন্নাথ ও রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থান পুণ্যবান, যে শঙ্করাচার্য্যের অলোকসামান্য জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার শক্তিতে হিন্দুধর্ম্মের আজ এত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত—আজ বেদ বেদান্তাদি এত পুনরুজ্জ্বলীকৃত, আজ সন্ন্যাসীগণ এত পূজ্য; সেই শঙ্করাচার্য্য যদি না আসিতেন, তাঁহার জীবন যদি নীরস হইত, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের যে, যাবতীয় রস-কস সমস্তই আজ অস্তমিত হইত। বোধ হয়, হেমবাবু বার্দ্ধক্যবশতঃ ও তজ্জন্য মনশ্চাঞ্চল্যবশতঃ হঠাৎ কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন; ইহা তাঁর স্থির বুদ্ধি প্রসূত নহে।

২। **যোগদর্শনম্**।—ভারতবর্ষের কতিপয় সাধু "নিগমাগম মণ্ডলী" নামক একটী সভা গঠন করিয়াছেন। সংক্ষেপে, সভার মোট উদ্দেশ্য—হিন্দুশাস্ত্র-প্রচার ও দেশের নানাপ্রকার হিতকার্য্য করা। মণ্ডলীর প্রধান স্থান হইতেছে মথুরায়। তথা হইতে "যোগদর্শনম্" নামক পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে সমগ্র পাতঞ্জল দর্শনের মূল দেবনাগরী অক্ষরে এবং হিন্দীভাষায় সেই সূত্রগুলির "নিগমাগম-ভাষ্য" নামক বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাগুলি অতি সুন্দর ও সঙ্গত হইয়াছে।

৩। **লীলামৃত**।—নাটকাকারে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ। ৺রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত। গ্রন্থকার কলিকাতাবাসী অনেক ধর্ম্মাত্মার নিকট সুপরিচিত ছিলেন; তাঁহার পবিত্র জীবনের শেষ কয় বৎসর ধর্ম্মের জন্য এত দূর উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া অনেকে স্তম্ভিত হইতেন। সেই বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ-প্রসূত—"লীলামৃত"। ইহাতে ভগবানের লীলা ভক্তগণের নিকট যে কি

( চৈত্র, ১৩১৩, পৃঃ ২০৯ )

অমৃতময়, তাহা দেখান হইয়াছে। গ্রন্থকার পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর, সম্প্রতি তৎপ্রিয়বন্ধুগণ কর্তৃক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়া "তত্ত্বমঞ্জরী"র উপহারস্বরূপে প্রদত্ত হইতেছে। ("তত্ত্বমঞ্জরী" গ্রন্থকারের প্রচারিত একখানি প্রিয় মাসিক পত্র)।

৪। **গৃহস্থের আদর্শ দেহত্যাগ**।—এই পুস্তকখানিতে কোন ময়মনসিংহ নিবাসী ব্যক্তির মা জীবনে কিরূপ নিষ্ঠাবতী ছিলেন এবং সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলে কিরূপ তাঁহার যোগিসম জ্যেষ্ঠপুত্র ক্রমাগত নাম শ্রবণ করাইয়া, নাম জপ করিতে বলিয়া এবং শাস্ত্রোপদেশ শুনাইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে শাস্ত্র হইতে মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকখানি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত লিখিত। আমাদের দেশে জীবন চরিত লিখিবার প্রথা নাই। কত অদৃশ্য প্রদেশে কত কুসুম যে নীরবে সুগন্ধ বিতরণ করিয়া ঝরিয়া যায়, জনসমাজ তাঁহার খোঁজ রাখে না। এই পুস্তকখানিতে একটী প্রকৃত হিন্দুমহিলার জীবনচরিতের এই সূচনা দেখিয়া আমরা পরম প্রীত। এই রমণী পাশ্চাত্য আলোকের কিছুই পান নাই। কিন্তু যে ধর্ম্ম হিন্দু, মাতৃস্তনপানের সহিত শিক্ষা করে, সেই ধর্ম্মভাবে লালিত পালিত হইয়া কিরূপে উপযুক্ত পুত্রের সহায়তায় সহজে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই ঘটনায় বিশেষ অলৌকিকতা কিছুই না থাকিলেও, আমাদের বিবেচনায় এই সকল জীবন কেবল আমাদের বঙ্গভাষায় নয়, আমাদের রাজভাষায়ও প্রকাশিত করা উচিত। তাহা হইলে হিন্দু রমণীদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের যে কুসংস্কার আছে, তাহা অপনীত হইবে। আমরা এই পুস্তকখানি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকপাঠে সকলেই আধ্যাত্মিক উপকার পাইবেন।

৫। **স্বাস্থ্যসাধন বা আয়ুর্ব্বেদ কুসুমাঞ্জলী**।—ঋষিসম্পাদক কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত। এই গ্রন্থখানি কবিরাজ মহাশয়ের বিজ্ঞাপনপুস্তক হইলেও ইহাতে সহজ সহজ কবিতাছলে কতকগুলি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কোন্ আহার অপর কোন্ আহারে জীর্ণ হয়, তৎসম্বন্ধে কবিতাটি উদ্ধৃত হইল :—

"মুড়ি চালভাজা চিঁড়ে, জীর্ণ পায় নারিকেলে। কলাতে কাঁঠাল জীর্ণ, ওল জীর্ণ কটুতেলে॥ খিচুড়ী সৈন্ধবে জীর্ণ, দুগ্ধ জীর্ণ হয় ঘোলে। বাসী অন্ন পিঠা মাংস পাক পায় কাঁজি জলে॥ মিশ্রি উষ্ণ দুধে আম, সৈন্ধবেতে কলা কাবু। খেজুরের গুড়ে জীর্ণ হয়ে যায় কমলা লেবু॥ ইক্ষু জীর্ণ আদা খেলে, দধি পরিপাক পায়। লুন জল শর্করাতে, মনে রেখো এ সবায়॥

# মায়া।

(২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

অধিকতর সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এরূপ অনেক সুবিস্তৃত সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আজও সম্পূর্ণ নূতন, এবং এরূপ অনেক মতবাদ বিদ্যমান আছে, যাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞান অদ্যাপি মতবাদরূপেও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল আকাশতত্ত্বে অধিরোহণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সমধিক অগ্রসর হইয়া সমষ্টি-মনকেও একটী সূক্ষ্মতর আকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহারও উচ্চে অধিকতর সূক্ষ্ম

আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কিছুই মীমাংসা হইল না। রহস্যের উত্তরদানে এই সকল তত্ত্ব অক্ষম। ব্যর্থ জগতবিষয়ক জ্ঞান যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, এ রহস্যের উত্তরদান করিতে পারিবে না। মনে হয় যেন কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি, কয়েক সহস্র বৎসর আরও অপেক্ষা করা যাউক, ইহার মীমাংসা হইবে। বেদান্তবাদী মনের সসীমতা নিঃসংশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতএব উত্তর করেন, "না, আমাদিগের সীমাবহির্ভূত হইবার শক্তি নাই, আমরা দেশকাল নিমিত্তের বাহিরে যাইতে পারি না।" যেরূপ কেহই স্বকীয় সত্তা হইতে উল্লম্ফন করিতে সক্ষম নহেন, সেইরূপ দেশ ও কালের নিয়ম যে সীমাবন্ধনী স্থাপন করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। দেশকালনিমিত্তসম্বন্ধীয় রহস্যাবধারণপ্রযত্ন বিফল, যে হেতু এরূপ চেষ্টা করিতে গেলেই এই তিনেরই সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা কিরূপে সম্ভবে? জগতের অস্তিত্ববাদ তাহা হইলে কিরূপ ভাব ধারণ করিতেছে? "এই জগতের অস্তিত্ব নাই", "জগৎ মিথ্যা"—ইহার অর্থ কি? ইহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, এই অর্থ। আমার, তোমার ও অপর সকলের মনের সম্বন্ধে ইহার কেবল আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা এই জগৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। যদি আমাদের আর একটী অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাতে আর কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলে, ইহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত। অতএব ইহার সত্তা নাই—সেই অপরিবর্তনীয়, অচল, অনন্ত সত্তা ইহার নাই। কিন্তু ইহাকে অস্তিত্বশূন্য বলা যাইতে পারে না; কারণ ইহার বর্তমানতা রহিয়াছে এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই, আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। ইহা সৎ ও অসতের মিশ্রণ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন স্থূল কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ। জ্ঞানাধিকারে এই বিরুদ্ধ ভাব বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপ মনে হয়, যেন মনুষ্য জিজ্ঞাসু হইলেই সমগ্র জ্ঞান লাভে সক্ষম হইবে; কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর না হইতেই, এরূপ অভেদ্য অন্তরাল দেখিতে পান, যাহা স্থানান্তরিত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তাঁহার সমস্ত কার্য্য বৃত্তসীমাবস্থিত হইয়া ভ্রাম্যমান এবং সেই বৃত্তসীমা তাঁহার পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। তাঁহার অন্তরতম ও প্রিয়তম রহস্য সকল মীমাংসার জন্য তাঁহাকে দিবারাত্র উত্তেজিত ও আহ্বান করিতেছে, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে তিনি অক্ষম, কারণ তাঁহার নিজ বুদ্ধির সীমা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। তথাপি বাসনা তাঁহার অন্তরে সবলে প্রোথিত রহিয়াছে; কিন্তু এই সকল উত্তেজনার দমনই যে কেবল মাত্র মঙ্গলকর, তাহাও আমরা অবগত আছি। আমাদের হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন, প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে আদেশ করিতেছে। অপরদিকে এক অমানুষী শক্তি বলিতেছে যে, নিঃস্বার্থতাই একমাত্র মঙ্গলকর। জন্মাবধি প্রত্যেক বালকই সুখাশাবাদী (Optimist); সে কেবল সুখের স্বপ্নই দর্শন করে। যৌবন সময়ে সে অধিকতর সুখাশাবাদী হয়। মৃত্যু, পরাজয়, বা অপমান বলিয়া কিছু আছে, ইহা কোন যুবকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বৃদ্ধাবস্থা আসিল—জীবন একটী ধ্বংসরাশি হইয়াছে; সুখ স্বপ্ন আকাশে বিলীন হইয়াছে; বৃদ্ধ নিরাশাবাদ অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আমরা প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া আশা শূন্য, অন্তশূন্য, সীমা ও গন্তব্যজ্ঞান পরি-

( চৈত্র. ১৩১৩, পৃ., ২১১ )

শূন্যের ন্যায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধাবিত হইতেছি। ললিতবিস্তরে লিখিত বুদ্ধচরিতের একটী প্রসিদ্ধ সঙ্গীত এ সম্বন্ধে আমার স্মরণ হয়। এইরূপ বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব মানবের পরিত্রাতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন, কিন্তু তিনি রাজবাটীর বিলাসিতায় আত্মবিস্মৃত হওয়াতে, তাঁহার প্রবোধার্থ দেবকন্যাগণ-কর্তৃক একটী সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। সে সঙ্গীতের মর্ম্মার্থ এইরূপ, "আমরা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছি—নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই।" এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না—অবিরতই চলিয়াছে। এখন উপায় কি? যাঁহার অন্নপানের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান, তিনি সুখাশাবাদী হইয়া বলেন, 'ভীতিকর দুঃখের কথা কহিও না। সংসারের দুঃখ ও ক্লেশের কথা শুনাইও না।' 'তাঁহার নিকট গিয়া বল—সকলই মঙ্গল।' তিনি বলেন, 'সত্যই আমি নিরাপদে আছি; এই দেখ, কেমন সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছি, আমার শীতের ভয় নাই! অতএব আমার সম্মুখে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও না।' কিন্তু, অপরদিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মরিতেছে। যাও, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও যে সমস্তই মঙ্গল—ঐ এক জন এ জীবনে ভীষণ ক্লেশ পাইয়াছে, সে ত সুখের, সৌন্দর্য্যের, মঙ্গলের কথা শুনিবে না। সে বলিতেছে, 'সকলকেই ভয় দেখাও, আমি যখন কাঁদিতেছি, অপরে কেন হাসিবে? আমি সকলকেই আমার সহিত ক্রন্দন করাইব; কারণ আমি দুঃখ-প্রপীড়িত, সকলেই দুঃখ-প্রপীড়িত হউক—ইহাই আমার শান্তি।' আমরা এইরূপ সুখাশাবাদ হইতে নিরাশাবাদে যাইতেছি। অতঃপর মৃত্যুরূপ ভয়াবহ ব্যাপার—সমগ্র সংসারই মৃত্যুমুখে যাইতেছে; সকলেই মরিতেছে। আমাদিগের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যকলাপ সমাজসংস্কার, বিলাসিতা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান—মৃত্যুই সকলের এক গতি। ইহাই সর্ব্বস্ব, ইহাই সুনিশ্চিত। নগরাদি হইতেছে ও যাইতেছে, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে—গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া বিভিন্ন গ্রহস্থিত বায়ুপ্রবাহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এইরূপ অনাদি কালই চলিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য ঐশ্বর্য্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্ম্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে,—সকলেই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম মমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেন আমরা এ জীবনের মমতা করি? কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না? ইহা আমরা জানি না। ইহাই মায়া।

জননী সন্তানকে সযত্নে লালন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি রহিয়াছে। বালক বর্দ্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়ত কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপিও পুত্রে আকৃষ্ট। বিচার শক্তি জাগরিত হইলে, তাহাকে স্নেহাবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি জানেন না যে, এ স্নেহ নহে, এক অপরিজ্ঞেয় শক্তি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী অধিকার করিয়াছে। তিনি ইহা দূরীভূত করিতে পারেন না। তিনি যতই চেষ্টা করুন না, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ইহাই মায়া। আমরা সকলেই কল্পিত সুবর্ণ-লোমের অন্বেষণে ধাবিত হইতেছি, সকলেরই মনে হয়, ইহা আমারই প্রাপ্তব্য, কিন্তু তাঁহাদের কয়জন এ সংসারে জীবিত?

( ৮৭তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২১২ )

# উদ্বোধন : বৈশাখ ১৩৯৪

## সূচীপত্র

# উদ্বোধনের নিয়মাবলী

● **লেখক-লেখিকাদের জন্য :** ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প,শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার ও গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে রেজেস্ট্রি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা ডাকটিকিট সম্বলিত কার্ড / ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

● **গ্রাহকদের জন্য :** মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৫.০০ টাকা, বাংলাদেশ ৪৩.০০ টাকা, ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে সি মেল-এ ৮৮.০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২৩৩.০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা। বছরের যে কোন সময়ে বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে মাঘ মাস থেকে।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।

● **আজীবন-গ্রাহকদের জন্য :** এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে ( প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০.০০ টাকা ) ৪০০.০০ ( চারশ ) টাকা দিলে আজীবন-গ্রাহক ( ৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ ) হওয়া যায়। যে কোন মাস থেকে আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পত্রাদি লিখবার সময় **গ্রাহক-সংখ্যা** অবশ্যই উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানাতে হবে।

কার্যালয়ে নিজে এসে অথবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া, অথবা মনিঅর্ডারযোগে বা ডিমাণ্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট্ "Udbodhan Office" এই নামে করতে হয়।

● **প্রকাশকদের জন্য :** সমালোচনার জন্য দুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন।

● **বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :** কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাবে।

● **কার্যালয়ের সময় :** সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০, রবিবার বন্ধ।

কার্যাধ্যক্ষ
**উদ্বোধন কার্যালয়**
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৩
ফোন : ৫৫-২৪৪৭

# একটি আবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত, পূর্বতন রামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রম, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপার্ষদ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজ) জন্মস্থানে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় ভক্তের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য পূজার্চনা ছাড়াও এই মঠে নানাবিধ সেবামূলক কাজ স্বল্পপরিসর পুরাতন দালান বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

মঠ কেন্দ্রটির ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত, ভাবানুরাগী ও অনুগামীরা অধিক সংখ্যায় মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন। ফলে মঠের বর্তমান নির্দ্ধারিত ক্ষুদ্র বাড়িটি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। সেজন্য যথোপযুক্ত স্থান সংকুলানের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের শতবর্ষ পূর্তির স্মারক হিসেবে "রামকৃষ্ণ মঠ শতাব্দী জয়ন্তী ভবন" নামে একটি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ এই পরিকল্পিত ভবনটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন।

এই নতুন নির্মাণ-কার্য ছাড়াও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যাদি অবিলম্বে সম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণে আনুমানিক দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সেজন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী ও সকল ভক্তবৃন্দের কাছে আবেদন জানাচ্ছি,—আবেদন জানাচ্ছি সহৃদয় জনসাধারণ, লোককল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান এবং দানশীল সংস্থাগুলির কাছেও। এই মহৎ প্রকল্পগুলিকে সার্থক রূপায়ণের জন্য তাঁরা যেন সহযোগিতা এবং সাহায্যের উদার হস্ত প্রসারিত করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত-এ প্রদত্ত যে কোন দান ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০ জি. ধারা অনুযায়ী আয়কর মুক্ত। অনুগ্রহ করে চেক্ বা ড্রাফ্ট 'রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত', এই নামে এবং মনিঅর্ডার প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত, জেলা—২৪ পরগণা (উত্তর), পিন-৭৪৩২০১ এই ঠিকানায় পাঠাবেন।

স্বামী পুরুষানন্দ
প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ
বারাসত

২২ জানুআরি ১৯৮৭




৮৯তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৯৪

# দিব্য বাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—ওখানে (অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায়) গিছলো।

মাষ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)—বুদ্ধদেবের কি মত?

নরেন্দ্র—তিনি তপস্যার পর কি পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন নাই। তাই বলে সকলে বলে, নাস্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ইঙ্গিত করিয়া)—নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারেন নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে,—তাই হওয়া,—বোধ স্বরূপ হওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।২৫।১, ৫।১৫।৩



# কথাপ্রসঙ্গে

## বুদ্ধচরিত্র: স্বামীজীর দৃষ্টিতে

আজ হইতে ন্যূনাধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে মানুষের জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ-নির্দেশ দিতে, মানুষকে নির্বাণের পথে অনুপ্রাণিত করিতে যে মহামানব মানবজাতির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন— মনুষ্যধর্মের প্রতিমূর্তি সেই মহামানবই ভগবান শ্রীশ্রীবুদ্ধ। বুদ্ধের ধর্ম মানবতার ধর্ম। যেখানে মানুষ আছে, যেখানে মানুষের মন আছে— সেখানেই আছে বুদ্ধের আবেদন। বুদ্ধ মানুষকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন যথার্থ মানুষ হইতে। মানুষ যথার্থ মানুষ হইবে, কিন্তু কিভাবে? বুদ্ধ তাঁহার তপস্যাপূত সুদীর্ঘজীবন দ্বারা দেখাইয়া গেলেন মানুষ যথার্থ মানুষ হইবে ত্যাগের দ্বারা, মানুষ যথার্থ মানুষ হইবে তপস্যার দ্বারা। দেখাইয়া গেলেন সুনীতির পথেই মানুষের ক্রমোন্নতি। স্বামীজীর ভাষায় "যেখানেই কোন-প্রকার নীতির বিধান দেখিবে, সেখানেই তাঁহার (বুদ্ধের) প্রভাব, তাঁহার আলোক লক্ষ্য করিবে।" (বাণী ও রচনা, ২।১০৮)।

বুদ্ধচরিত্র স্বামীজীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আর তাঁহার এই আকর্ষণ ছিল আশৈশব। কাজেই স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর আবাল্য আকর্ষণের কথা আমরা আগেই বলিয়া আসিয়াছি। এখানে প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। স্কুলে পড়িবার সময় একদিন রাত্রিতে স্বামীজী (তখনকার নরেন্দ্রনাথ) দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। ধ্যানান্তে দেখিতে পাইলেন "ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করে এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী-মূর্তি বাহির হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ, অথচ যেন কোন ভাব নাই। মহাশান্ত সন্ন্যাসী মূর্তি।" (ঐ, ৯।১২-১৩) পরবর্তিকালে এই দর্শন-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন: "বোধ হয়, ভগবান বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।" (ঐ)

স্বামীজীর দৃষ্টিতে "চরিত্র হিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়; তারপর খ্রীষ্ট।" (ঐ, ৪।২২৫) তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এঁর (বুদ্ধের) চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অধিক। আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নির্ভিকতা, সেই গভীর প্রেম। মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম; সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে। কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে, কিন্তু তিনি নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন করে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারাজীবন তিনি কখনও নিজের ভাবনা ভাবেননি। এত বড় মহৎ জীবনের ধারণা আমাদের মতো অজ্ঞ স্বার্থান্ধ, সঙ্কীর্ণচিত্ত মানুষ কি করে করতে পারে?" (ঐ, ৮।৩৩১-৩২) বুদ্ধদেবকে স্বামীজী "আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর"

পর্যন্তও বলিয়াছেন। চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন: "চীন, জাপান ও সিংহল সেই মহান গুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে, কিন্তু ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করে।" (ঐ, ১।৩০) উপরিউক্ত কথাগুলির মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে বুদ্ধের প্রতি তাঁহার কী গভীর শ্রদ্ধা, পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে বুদ্ধকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখিতেন।

স্বামীজী কখনও মনে করিতেন না যে বুদ্ধ কোন নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বা মানব-মুক্তির নূতন কোন পথ-নির্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাঁহার দৃষ্টিতে বুদ্ধ ছিলেন একজন হিন্দু, যেমন খ্রীষ্ট ছিলেন একজন ইহুদী। তাঁহার কথায়ও আছে, "যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন ও শাক্যমুনি হিন্দু ছিলেন তবে প্রভেদ এইটুকু যে, ইহুদীগণ যীশুকে পরিত্যাগ করিলেন।...হিন্দুগণ কিন্তু শাক্যমুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন দিয়া এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।" (ঐ, ১।৩০) আরও কথা "ইহুদীরা যেমন (যীশুর মধ্যে) ওল্ড টেস্টামেন্টের পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই, বৌদ্ধগণও তেমনি (বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই।" (ঐ, ১।৩০-৩১)

যুগ যুগ ধরিয়া বুদ্ধ নিশ্চয়াত্মক প্রজ্ঞা ও অচঞ্চল শান্তির প্রতিমূর্তিরূপে মান্য হইয়া আসিয়াছেন। বুদ্ধ তাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টি-সহায়ে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, সাধারণ মানুষ লোকাচার নিয়াই সন্তুষ্ট, বেদান্তের সার সত্য জানিবার চেষ্টাও তাহাদের নাই। তাই তাঁহাকে একদিকে বেদের আচার-অনুষ্ঠানবাদী গোঁড়া প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে এবং অপরদিকে নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। গীতার যে সারশিক্ষা—কর্ম নিষ্কামভাবে করিলে উহা জ্ঞানের বিরোধী হয় না—ইহাই বুদ্ধদেব শিক্ষা দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন: "তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির বিষয় বলিব, যিনি কর্মযোগের এই শিক্ষাকে কার্যে পরিণত করিয়াছেন।...মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউকনা কেন, সেই সত্যে লইয়া যাইবে।'... বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী—সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া তিনি কাজ করিয়াছেন; মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যাইতেছে—যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনিই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমাবেশ—অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।" (ঐ, ১।১৪৬-৪৭)

বুদ্ধ সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া আছে যে, তাঁহার প্রবর্তিত মত, তাঁহার বাণী ইতিবাচক তো নয়ই, বরং নেতিবাচক। সত্য-সম্বন্ধে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যেহেতু তাঁহার কোন সুস্পষ্ট উক্তি নাই সেই হেতুই সম্ভবতঃ তাঁহাকে এইভাবে দেখানো হইয়াছে। আসলে মানুষের হৃত শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবকে ফিরিয়া পাওয়াই 'নির্বাণ' এবং এই অবস্থা লাভ করাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা। বুদ্ধ ইহা যথাযথ অভ্যাস করিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিয়াছেন বৌদ্ধেরাও "নির্বাণ নামক অবস্থা বিশেষে বিশ্বাসী; উহা এই দ্বৈত জগতের অতীত অবস্থা। বৈদান্তিকেরা যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, ঐ নির্বাণ-অবস্থাও ঠিক তাই; আর বৌদ্ধদের সমুদয় উপদেশের মর্ম এই—সেই নির্দিষ্ট নির্বাণ-অবস্থা পুনরায় লাভ করিতে হইবে।" (ঐ, ২।২০৭) তফাৎ শুধু উপনিষদের ঋষিরা

যেখানে সত্য সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে সাহস করিয়াছেন, বুদ্ধ সেখানে তাহা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বা নীরব রহিয়াছেন। একই সৎ পদার্থ উপনিষদের ঋষিদের নিকট ঈশ্বর বা ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হইয়াছেন, নীতি-প্রিয় বুদ্ধের নিকট তাহা মর্ম-নীতি বা ধর্মরূপে প্রকট হইয়াছে।

এই নিয়ম বা নীতি সম্বন্ধে ধারণা বৈদিক-ধর্মে বা বুদ্ধেরও নিকট কিছু নূতন নয়। আদিকাল হইতে ঋগ্বেদ যে ঋতকে বিশ্বের নৈতিক বিধান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ঋতই উপনিষদে ও মহাভারতে সত্য ও ধর্মরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই হিসাবে বুদ্ধ ছিলেন একজন প্রকৃত বেদান্তবাদী। তাঁহার বাণী উপনিষদ্-ভিত্তিক বেদান্তের বাণী ছাড়া কিছু নয়। তিনি নিজেকে কোন ধর্মের মত-পথের সঙ্গে জড়িত করিতে চান নাই। যখন বেদান্তের জ্ঞান একটা ক্ষুদ্র অভিজাত বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বুদ্ধ সেই জ্ঞানকে উদ্ধার করিয়া জনসাধারণকে তাহা শিক্ষা দিলেন, প্রচার করিলেন লৌকিক ভাষায় জনসাধারণের উপযোগী করিয়া। ইহা স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই তাঁকে বলিতে শুনা যায় "বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন।" (ঐ, ২।১০৪)

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে চার্বাক-মতের "খাও দাও, মজা কর; ঈশ্বর, আত্মা বা স্বর্গ বলিয়া কিছু নাই; ধর্ম কতকগুলি ধূর্ত দুষ্ট পুরোহিতের কল্পনা মাত্র—যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এইরূপ নাস্তিকতা এত বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে উহার এক নাম ছিল 'লোকায়ত দর্শন'। স্বামীজীর কথায় "এই অবস্থায় বুদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহস্র বৎসর পরে আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচণ্ডাল বৌদ্ধ হইতে লাগিল। নানাপ্রকার মানুষ ও জাতি বৌদ্ধ হইল। অনেকের কৃষ্টি অতি হীন হইলেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহারা বেশ সদাচার পরায়ণ হইল। ইহাদের কিন্তু নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল—নানা তন্ত্রমতে ভূত ও দেবতায় বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ঐগুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানাপ্রকার বিষয়ের খিচুড়ি হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার জড়বাদের মেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন হইল।...এমন সময় শঙ্করাচার্য আসিয়া বেদান্তকে পুনরুদ্দীপিত করিলেন।...বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য উহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন।" (ঐ, ২।১০৩) স্বামীজীর মতে এইরূপে অদ্বৈতবাদ দুইবার ভারতবর্ষকে জড়বাদ ও নাস্তিকতাবাদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। স্বামীজীর উপরি-উক্ত কথাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তিনি বুদ্ধদেবকে একজন প্রকৃত বেদান্তবাদী বলিয়াই মনে করিতেন।

সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্যই বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি প্রত্যেক মানুষকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন; তুমি বস্তুতঃ যাহা তাহাই হও। তাঁহার বাণী খুবই সহজ সরল। নির্বাণ লাভ করাই মানুষের চরম পরিপূর্ণতা মানুষ যদি উহা লাভ করিতে চায় তবে তাহার পথ আছে। ত্যাগের দ্বারা, সুনীতির দ্বারা। আত্মম্ভরিতা, নীচ-বাসনা, দেহলিপ্সা এবং ঘৃণ্য অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মানুষের হৃদয়ে প্রেম ও করুণার ভাব জাগ্রত হয়। ইহাই নির্বাণ, ইহাই ক্ষয়, মৃত্যু ও দুঃখের অবসান।

বুদ্ধ চাহিয়াছিলেন, সকল মানুষ উন্নত হউক, সকল মানুষ সুখী হউক, সকল মানুষ সংসারের জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর দুঃখ দেখিয়া উদ্বুদ্ধ হউক বহুজন্ম-দুর্লভ সম্বোধি লাভের জন্য, পরমানন্দ সুধাম্বোধি নির্বাণের জন্য। সর্বদেশের সর্বকালের উপলব্ধি-মান পুরুষের অনুভূতি একই সত্যকে অবলম্বন করিয়া। তাই তাঁহার প্রকাশও একই প্রকার ভাষায়। তাঁহাদের প্রকাশে :

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ।

কেহ যেন কোনও প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত না হয়, কাহাকেও যেন কোন প্রকার পাপ স্পর্শ না করে। যে যেখানে আছে সকলে সুখী হউক, সকলে নীরোগ হউক। সকলে মঙ্গল দর্শন করুক, সত্য উপলব্ধি করুক।

বৈশাখের পুণ্যমাসে স্মরণ করি বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের ঘনীভূত মূর্তি ভগবান তথাগত বুদ্ধকে। আর এই শুভ লগ্নে তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাই: তাঁহাদের যে কল্যাণ-ভাবনা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতের আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়াছে, বর্তমান যুগকেও উহা অনুপ্রাণিত করুক।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
ভুবনেশ্বর
৬.১২.২১

কল্যাণীয়া শ্রীমতী কমলা বালা :—

তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত সকল সংবাদ [ অবগত ] হইয়াছি। শ্রীশ্রীমার দেহরক্ষার পর বহু ভক্ত এবং ভক্তপরিবার সকল মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতেছেন এবং ঐ জন্য মুহ্যমান হইয়া আছেন। ইহা তো হইবারই কথা ও খুবই স্বাভাবিক।

তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ জানিলাম। এই অগ্রায়ণ মাসের মধ্যেই আমার কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা আছে। সেই সময় তুমি তথায় আসিলে দেখা সাক্ষাৎ হইবে।

উপস্থিত শরীর আমার ভাল আছে। এখানকার অন্যান্য সাধুগণ ভাল আছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিও।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ

# স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

Ramkrishna Mission
P. O. BELUR
Dist. HOWRAH
Dated, 10.11.1923

মা কমলা,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার উপর আমার সতত স্নেহাশীর্ব্বাদ আছে। তোমার খুব বিশ্বাস ভক্তি হোক, খুব শুদ্ধাভক্তি হোক্। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ কোন ভয় নাই। তাঁর কৃপা সকল সময় সর্ব্বত্র আছে। তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর চিন্তা করিয়া যাও। এবং সংসার তাঁরই এইটী জানিও। এইটী জেনে সংসারের কাজ-কর্ম্মে তাঁর সেবা করিতেছ এইভাব মনে আনিও। সংসারে নানা ঝঞ্ঝাট গণ্ডগোল থাকিবেই। এরই নাম সংসার। তাঁর নাম করিতে করিতে অশান্তি দূর হয়ে যাবে। অশান্তি দূর হয়ে গেলে তাঁর নাম করিবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে কখনও তাঁর নাম করা হইবে না। ওসব দিকে যত মন দিবে ততই অশান্তি হইবে। সুতরাং সকল সময়ে ভগবানে মন দিতে চেষ্টা করিও। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে তাঁতে মন বসিয়া যাইবে। তাঁর কৃপা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমানন্দ হইবে। অবসর সময়ে কথামৃত প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজির বই পড়িও।

আমার শরীর তেমন মন্দ নয়। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও।

ইতি—

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

# শরণাগতি

## স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন আমাদের জন্য। আমাদেরই কল্যাণের জন্য তিনি সমস্ত জীবন কষ্ট ভোগ করেছেন সকলের কষ্টকে নিজের উপর নিয়ে। তাঁর জীবন বর্ণনাপ্রসঙ্গে জনৈক পাশ্চাত্য মনীষী বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের রোগযন্ত্রণা ভোগ ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের যন্ত্রণার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কেন তাঁর এই যন্ত্রণা তার কারণ ব্যাখ্যা করে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একজায়গায় বলেছেন, অন্যায় করলে তার পরিণামে কষ্টভোগ করতে হয় কিন্তু এই জীবনে এ দেহ তো কোন অন্যায় কাজ করেনি তাহলে এত কষ্ট কেন? যাদের কাছে এ কথা বললেন, তারা তাঁকে বোঝে না, তাই নিজেকেই ব্যাখ্যা করে বলতে হল যে, কত লোক কত অন্যায় অধর্ম করে এখানে যখন আসে তখন তাদের ভোগটা এই দেহে নিতে হয়। সকলের ভোগ দেহে নিয়ে তিনি অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করলেন। তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন একটাই ছিল জীবকে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত করা, তাদের পরিত্রাণ করা। জীবের দুঃখ তাঁকে এতদূর ব্যাকুল করেছিল যে তিনি সমাধি-সুখ পর্যন্ত তুচ্ছ করেছিলেন। কেবল চেয়েছিলেন জীবনের শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দ্বারা যেন জগতের কিছু কল্যাণ হয়। তিনি জানতেন তাঁর দেহটি যন্ত্র, জগন্মাতা সেই যন্ত্র ব্যবহার করছেন জগৎ কল্যাণের জন্য। তাঁর নিজের কোন অহঙ্কার ছিল না, 'আমি' বোধ ছিল না। তিনি কখনও এই দেহটাকেও 'আমি' বলতে পারতেন না, 'এটা', 'এখানকার' —এইরকম বলতেন। এটা লোকদেখানো নয়, তাঁর মনের ভিতরে কখনও এই বোধ আসত না যে আমি করছি। যখন বলতেন, 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' তখন তা অন্তর থেকে উৎসারিত, মুখের কথা নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ এসে আমাদের দেখিয়ে দিলেন কি করে ভগবানকে ডাকতে হয়। এক জায়গায় বলছেন, 'তোরা সব কি প্রার্থনা করিস! ভগবানের জন্য ব্যাকুল না হলে কি কিছু হয়? এইরকম করে তাঁর জন্য কাঁদতে হয়' বলে মাটিতে পড়ে আছাড়-পিছাড় করতে লাগলেন। ভগবানের জন্য কিরকম ব্যাকুল হতে হয় নিজের জীবনে তা দেখিয়ে গেলেন। এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়েই তাঁর প্রথম ভগবৎ অনুভব। অবশ্য আবাল্য তাঁর জীবনে অনেক রকম অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, অনেক অনুভব তিনি করেছেন। এগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁর মানব রূপের দিক দিয়ে যদি বিচার করে দেখি তাহলে দেখব যে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন, এমন ছট্‌ফট্‌ করে কাঁদছেন যে লোক জড় হয়ে যাচ্ছে, তারা ভাবছে মানুষটির বোধ হয় শূল বেদনা হয়েছে। এই যন্ত্রণা ভোগ করলেন কেন? না, অন্তরে কি নিদারুণ বেদনা হলে ভগবানকে পাওয়া যায় তা দেখাতে। আর এই ব্যাকুলতা যে ভগবান লাভের একমাত্র উপায় এটুকুও দেখানর দরকার ছিল। তার আগে তিনি বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান করে সাধনা করেননি। কেবল অন্তরের প্রেরণায় যখন যা মনে হয়েছে তাই করেছেন। তাঁর কোন নির্দেশক ছিলেন না, কোন শাস্ত্রের অনুসরণও তিনি করেননি। কেবল অন্তরের ব্যাকুলতা থেকেই দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে তাঁর যে ঈশ্বর দর্শন হয়েছিল তার বর্ণনা আমরা লীলা-প্রসঙ্গে পাই।

এটুকু বলার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে গেলেন ভগবানকে লাভ করতে হলে বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান বা বিধিবদ্ধ সাধনার যে একান্ত দরকার হয় তা না, প্রয়োজন কেবল তাঁর জন্য ব্যাকুল হওয়া। শিশু মায়ের কোল থেকে বিচ্যুত হলে যেমন অসহায় হয়ে কাঁদে, এই সাধক শিশুটি সেইভাবেই মায়ের জন্য কাঁদতেন এবং সে কান্না এমনই যে জগন্মাতা দূরে থাকতে পারেন না।

সেই জগন্মাতাই বা কে এ রহস্য আমরা বুঝতে পারি না। যিনি একরূপে ভক্ত তিনিই অন্য আর একরূপে ভগবান—একথা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও বলেছেন। ভগবান মানুষের ভিতরে আসবেন, মানুষের মতোই ব্যবহার করবেন, ভগবানলাভ করবার জন্য সাধকের জীবনে যেমন ব্যাকুলতা হয় তেমন দেখাবেন আবার তিনি নিজেই ভগবান স্বয়ং, এটি বিশ্বাস করা কঠিন। তাই ঠাকুর বলতেন, নরলীলায় বিশ্বাস হওয়া বড় কঠিন। সাড়ে তিনহাত মানুষের ভিতরে ভগবান বিরাজিত হয়ে হাসছেন, কাঁদছেন, খেলছেন, খাচ্ছেন, রোগযন্ত্রণা ভোগ করছেন—জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সব তাঁর দেহের উপর দিয়ে হচ্ছে তবু তাঁকে ভগবান বলব কি করে? এ মানুষ ভাবতে পারে না। ভাগবতে আছে কংসের কারাগারে দেবকী-বসুদেবকে সন্তানরূপে দেখা দেবার সময় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবানরূপে দেখা দিলেন—

'তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥' (১০।৩।৯)

—তাঁরা বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে গদাপদ্মধারী শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত গলায় কৌস্তুভমণি পীতবসন নবীন নীরদবর্ণ দেখে আনন্দে অধীর হলেন। পুত্রকে পরমপুরুষ জেনে প্রণত হয়ে করজোড়ে তাঁর স্তব করলেন। ভগবান উত্তরে বললেন, তোমরা পূর্বে অতি কঠোর তপস্যা করেছিলে। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এই মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে আমি বর প্রার্থনা করতে বললাম। তোমরা আমার মতো পুত্র প্রার্থনা করেছিলে। আমি তোমাদের সে বর দিয়েছিলাম। কিন্তু—

'অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ॥'
(১০।৩।৪১)

—হে সতি! এই সংসারে শীল ও উদারতা গুণে আমার সদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখতে না পেয়ে আমিই তোমাদের পুত্র হয়েছিলাম। তাই আমার নাম হয়েছিল পৃশ্নিগর্ভ। আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না তাই আমাকে তিনবার তোমাদের সন্তানরূপে আসতে হয়েছে।

ঠাকুর একটি উপমা দিচ্ছেন, নারদ ভগবানের কাছ থেকে আসছেন। একটি ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, বৈকুণ্ঠে তিনি কি করছেন। বলছেন, সুঁচের ভিতর দিয়ে হাতি প্রবেশ করাচ্ছেন। শুনে একজন বললে, দূর! তুমি সেখানে যাওইনি। এ কি কখনও হয়? আর একজন বলল, ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব। তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব বলে তিনি অসহায় শিশু হয়ে জন্মালেন। কংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য বসুদেব যমুনা পার হয়ে গোকুলে তাঁকে রেখে এলেন। দেবকী বলছেন, তোমার এই রূপ সংবরণ কর কারণ কংস প্রতীক্ষা করে আছে দেখলেই তোমাকে মারবে। ভগবানের মায়ায় মা তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে ভুলে গিয়েছেন। একদিকে বলছেন ভগবান, আর একদিকে বলছেন কংস তোমায় এখনই হত্যা করবে।

মায়ার ভিতর দিয়ে ভগবান যখন ভক্তকে কৃপা করেন তখন সব অসম্ভবকে তাঁর সম্ভব বলে মনে হয়। যা আমাদের কাছে অকল্পনীয় তা তাঁর কাছে স্বাভাবিক। এবম্বিধ যে ভগবান

আমরা ভাবি তাঁকে সাধনা দিয়ে লাভ করে ফেলব, তা যে কত অবাস্তব কল্পনা ভাগবতে সুন্দর ভাবে তা দেখান হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের দুরন্তপনায় প্রতিবেশিনী গোপীরা উত্যক্ত। যশোদার কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তাঁদের বহুরকম অভিযোগ শুনে যশোদা ঠিক করলেন শ্রীকৃষ্ণকে শাস্তি দেবেন, তাঁকে বেঁধে রাখবেন। দড়ি দিয়ে বাঁধতে গিয়ে দেখলেন দড়ি দু-আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। গোয়ালার বাড়ি দাড়র অভাব নেই। তখন অন্য দড়ি তার সঙ্গে যোগ করলেন। তবুও দু-আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। এটা যে অসম্ভব তা মায়ের মনে আসছে না। ছেলেকে বাঁধতে গিয়ে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। দেখে ছেলে ভাবলেন, আর নয়, তিনি বাঁধা পড়লেন। ভাব হচ্ছে, সাধনা যতই করি না কেন ভগবানকে লাভ করবার বা বশ করবার পক্ষে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অনন্তকাল ধরে সাধনা করলেও সেই অনন্তের নাগাল আমরা কখনও পাব না। তাহলে সাধনা করব কেন?

এর উত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, সাধনার অহংকার যাতে চূর্ণ হয় তার জন্যই সাধন। আমরা ভাবি অনেক জপ ধ্যান করব। এতে না হয় আরও এক লক্ষ জপ বাড়িয়ে দেব, ঘণ্টাকয়েক বেশি ধ্যান করব, কিন্তু এই করে করে যখন দেখি সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে তখন সাধনের অহংকার দূর হয়। অহংকার যখন দূর হয় তখনই সেই অসাধ্য বস্তুটি আমাদের হাতে এসে পড়ার প্রকৃত সময়। তিনি ধরা না দিলে যে তাঁকে ধরা যায় না শাস্ত্রও তা বলেছেন। তাহলে কি এসব করার প্রয়োজন নেই? হরি মহারাজ সেই কথাই বলছেন, উড়তে উড়তে যখন পাখীর ডানা ব্যথা হয়ে যায়, আর পারে না তখন এক জায়গায় এসে বসে। তেমনি আমরা সাধনা করে করে যখন হয়রান হয়ে যাই আর পারি না তখন ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করি। সেই শুভক্ষণ যার জীবনে যখন আসবে তখনই তার জীবন সার্থকতায় পূর্ণ হবে।

একবার হরি মহারাজ কিছুদিন ধরে ঠাকুরের কাছে আসছিলেন না। ঠাকুর অহেতুক কৃপা-সিন্ধু। একজনকে বললেন, হরি যে আসছে না, কি হল? সে বললে, বেদান্ত বিচার, তপশ্চর্যা এইসব নিয়ে তাঁর সমস্ত দিন কাটছে, আসবার সময় কোথায়? ঠাকুর তখন কিছু বললেন না। তারপর বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে এসে হরিকে খবর দিলেন। তিনি কাছেই থাকতেন। হরি মহারাজ এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনলেন ঠাকুর গান গাইছেন, যাত্রার গান। লবকুশ রামের অশ্বমেধের ঘোড়াকে ধরে রেখেছেন বলে রামের সৈন্য-সামন্তর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেধেছে। লবকুশ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে হনুমানকে বেঁধে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। মাকে বললেন, দেখ, কতবড় হনুমানকে ধরে এনেছি। হনুমান তখন গান করে উত্তর দিচ্ছেন,

'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে'—

ঠাকুর গানটি বার বার গাইছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল পড়ছে। বুক ভেসে গিয়ে যে সতরঞ্চি পাতা ছিল তাও খানিকটা ভিজে গিয়েছে। এদিকে বেদান্তী হরি মহারাজেরও চোখ দিয়ে জল ঝরছে। তিনি বুঝলেন, তাঁরই শিক্ষার জন্য ঠাকুর এই গানটি গাইছেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে বিরাজিত, তাঁর কাছে না এসে হরি মহারাজ সাধনা করে ভগবান লাভ করবেন, বেদান্তের সত্যকে জীবনে সাক্ষাৎকার করবেন। একটি কথাতেই বুঝিয়ে দিলেন যে, কঠোর তপশ্চর্যায় তাঁকে পাওয়া যায়

না। ভগবান যদি স্বেচ্ছায় কাকেও ধরা দেন তবেই সে তাঁকে পেতে পারে।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'

—যাঁকে তিনি বরণ করেন সেই-ই তাঁকে লাভ করে। ভগবান কাকে বরণ করবেন তা তিনিই জানেন। কার সাধ্য আছে তাঁর যোগ্য হয়ে তাঁর কাছে যাবে? কাজেই তিনি দয়া করে যাকে বরণ করেন, সেই তাঁকে লাভ করে।

এই বস্তুলাভের অসামর্থ্য বুঝবার জন্যই সাধন ভজন। তাই হরি মহারাজের কথা, সাধনের অহংকার দূর করবার জন্য সাধন। ঠাকুরের সন্তানদের প্রত্যেকেই কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন। তার মধ্যে হরি মহারাজের মতো এত দীর্ঘকাল ধরে কঠোর সাধনা কেউ করেননি। সেই হরি মহারাজ বলছেন যে, ঠাকুর আমাকে শিক্ষা দিলেন যে, 'ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে।' এই কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ কত ভাবে যে বলেছেন কথামৃতের পাতায় পাতায় তা দেখা যায়। সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে, তাঁর দাসানুদাস হয়ে যদি কেউ তাঁর চরণে শরণ নেয় তাহলেই তিনি তাকে কৃপা করবেন বা করতে পারেন। কথামৃতের বহু জায়গায় ঠাকুর বলেছেন, নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ। আমি নয় আমি নয়, তুমি, তুমি। আমাদের 'আমি'ই সবসময় এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আমাদের বেঁধে রেখেছে। অমৃতের সমুদ্র সামনে রয়েছে, অথচ আমরা পিপাসায় কাতর। অহংকার যদি দূর হয়—সে-ও তাঁর কৃপায় হবে—তবেই তাঁর কৃপার অনুভূতি হবে। এইজন্য ঠাকুর বার বার বলছেন, শরণাগত শরণাগত। শরণাগত না হলে এই দুর্জয় অভিমান, এই দুরন্ত 'আমি' যাবে না।

ঠাকুর মাস্টার মশাইকে বলছেন, 'আচ্ছা, আমার ভিতরে কি অহং আছে?' মাস্টার-মশাই ভেবে পাচ্ছেন না কি উত্তর দেবেন। বলছেন, আজ্ঞে আপনি লোককল্যাণের জন্য একটু অহং রেখে দিয়েছেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিচ্ছেন, 'না, আমি রাখিনি, তিনি রেখেছেন।' এই যে অহংটুকু এটুকুও 'আমি রাখিনি, তিনি রেখেছেন।' এক জায়গায় বলছেন, এই খোলটার ভিতরে সেই মা ছাড়া আর কিছু নেই। মা অর্থাৎ জগন্মাতা, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালাচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে কি এই খোলটি না তাঁর ভিতরের যে স্বরূপ সেইটি? খোলটাতো আবরণ। যিনি অসীম তিনি আবরণ দ্বারা নিজেকে সম্বৃত করেছেন যাতে সাধারণ লোক তাঁর নাগাল পেতে পারে। তিনি তাঁর অসীমত্বকে নিয়ে আবির্ভূত হলে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাব। অর্জুনকে ভগবান বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জুনের মতো বীরহৃদয়ও সে রূপ দেখে ভয়ে ত্রস্ত। বললেন, আমি সহ্য করতে পারছি না, তুমি তোমার এই রূপ সংবরণ কর। সে রূপের বর্ণনায় আছে—

'দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥'
(গী, ১০।১২)

যদি আকাশে যুগপৎ হাজার হাজার সূর্যের প্রভা সমুদিত হয় তাহলে সে দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হয় কি না হয়। তিনি অতুলনীয়। কাজেই জগতে কোন জিনিস দিয়ে তাঁর উপমা করা যায় না। মানুষকে বোঝাবার জন্য বলছেন, অসংখ্য সূর্য একসঙ্গে উঠলে তার যে প্রখর দীপ্তি ভগবানের প্রভা তেমনি। তা দেখবার সামর্থ্য আমাদের আছে কি?

আমাদের এই ক্ষুদ্র আমি সেই অনন্তের তুলনায় কতটুকু? উপনিষদে বর্ণনা করছেন—'বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ'—একটি চুলের ডগার একশ ভাগের একটি

ভাগ নিয়ে তাকে আবার একশ ভাগ করলে তারও একটি অংশের মতো জীবের পরিমাণ। সেই জীব আবার যখন ভগবানের সঙ্গে মেশে তখন সে অনন্ত হয়ে যায়, তার স্বরূপ হয় অনন্ত। যে অনন্ত স্বরূপ তাকে কি করে এত ক্ষুদ্র করা হল? 'আমি' দিয়ে। যে আমি নিজেকে দেহধারী বলে মনে করি, ভক্ত জ্ঞানী যোগী সাধু অসাধু বলে মনে করি, সেই আমি কি এতটুকু? যিনি অনন্ত তিনি অতটুকু আমি হয়ে সকলের মধ্যে লীলা করছেন। আবরণ দিয়ে তিনি নিজেকে সীমিত করেছেন। জীবরূপে করেছেন, ঈশ্বররূপেও করেছেন। ঈশ্বর অর্থ জগতের নিয়ন্তা, জগৎকে অনুভব করলে তবে তো আমরা ভাবতে পারব যে তিনি তারও পারে। তারও পারে এইজন্য যে, আমাদের মন তাঁকে ধারণা করতে পারে না। তাই তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর স্বরূপ না হলে বোঝা যায় না।

ঠাকুর বলছেন, সমুদ্রকে কি এক ছটাক পাত্রে ধরা যায়? আমাদের ছোট্ট জীবত্বরূপ আধার দিয়ে আমরা ভগবানকে ধারণা করতে চেষ্টা করি—এর চেয়ে বাতুলতা কি হতে পারে? সব চেষ্টা বিফল করে দিয়ে অনন্ত যেমন তেমনই থাকেন, আমরা কেবল আমাদের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারি। তখন আমাদের ক্ষুদ্রতাকে অসহায় শিশুর মতো তাঁর চরণে নিবেদন করে দিই— তিনি যা হয় করুন। এর নাম শরণাগতি।

শরণাগতি তারই নাম যখন আমি আমার উপর ভরসা না রেখে সম্পূর্ণরূপে তাঁর পাদপদ্মে নিজেকে সঁপে দিই। সেখানে অভিমানের লেশমাত্র থাকলে চলবে না। সম্পূর্ণ অভিমানশূন্য হয়ে তাঁর চরণে যদি নিজেকে নিবেদন করে দিতে পারি তাহলে এই বিন্দুই সিন্ধু হবে।

উপনিষদে এ-কথার বর্ণনা আছে—

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥'

( কঠ, ২।১।১৫ )

—হে গৌতম, নির্মল জল যেমন নির্মল জলরাশিতে গিয়ে পড়লে একরসত্ব প্রাপ্ত হয়, তারপরে সে কি হয়? সেই বিন্দু কি নাশ হয়ে যায়? না, সেই বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। তার মানে তেমনি মননশীল ও একত্বদর্শী হয়ে যায়। তার বিন্দুটাই তাকে সমুদ্র থেকে পৃথক করে রাখছিল। দু-এরই তত্ত্ব এক, দু-এর ভিতরেই তিনি আছেন। কিন্তু মাঝখানে পার্থক্য রেখেছেন, ঐ খোল দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন। ঠাকুর বলছেন, বালিশ কোনটা লম্বা কোনটা ছোট বিভিন্ন আকারের হয় কিন্তু ভিতরে সেই এক তুলো।

যাকে আমরা জীব বলে ক্ষুদ্র বলে বলছি, রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন বলছি সেই ব্যক্তিত্বটি কি? তিনিও তো সেই শ্রীভগবান ছাড়া আর কিছু নয়। গীতায় বলছেন,

'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।'

( ১০।৩৯ )

—এই জগতে স্থাবর জঙ্গম এমন কোনও বস্তুই নেই, যা আমি ছাড়া। ভিতরে বাইরে সর্বত্র তিনি ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। ভগবানের অসীমত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ভাগবতে বলছেন—

'অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে' ( ১০।৩।১৭ )

—তুমি আবরণশূন্য সুতরাং তোমার বাহির বা ভিতর নেই। যিনি সর্বব্যাপ্ত তাঁর আবার ভিতর বাহির কি হবে? ভক্তেরা আনন্দ করে বলেন, ভগবান সর্বশক্তিমান হলেও ভক্তকে তাঁর রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দিতে পারেন না। কোথায় দেবেন? যেখানেই দেবেন, সেখানেই তিনি। এই বোধটি হলে আমাদের ক্ষুদ্রত্ব বা আবরণ আর থাকে না, ছোট্ট জীব তখন অনন্ত

হয়ে যায়। 'তদানন্ত্যায় কল্পতে'। আসলে সে অনন্তই ছিল কিন্তু তাঁর লীলার জন্য তিনি তার উপরে একটা আবরণ দিয়েছেন, একটা মুখোশ পরিয়ে দিয়েছেন। যেমন ভাগবতে বর্ণনা আছে—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করবার জন্য গোচারণের সময় তাঁর বাছুরগুলিকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। গোপ বালকেরা দেখেন বাছুর-গুলো নেই। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি খুঁজতে যাই। বললে, না তুমি বস, আমরা খুঁজে আনি। তাঁকে নিরস্ত করে তাঁরা খুঁজতে গেলেন, গিয়ে তাঁরাও ফেরেন না। ভগবান চিন্তিত বাছুরগুলি গেল, তাদের খুঁজতে গিয়ে রাখাল বালকেরাও গেল। উদ্বিগ্ন হলেন, কোথায় গেল? নিজের মায়া স্বীকার করে নিয়ে নিজেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছেন। তারপর দিব্যদৃষ্টিতে দেখে ব্যাপারটা বুঝলেন। অতঃপর নিজেই আবার বাছুর ও রাখাল বালক হয়ে গেলেন, যেমন খেলা চলছিল তেমনি চলল। এরপর ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ নরলোকের একটি বছর কেটে গিয়েছে। ব্রহ্মা একদিন এসে দেখেন যেমন খেলা চলছিল তেমনি চলছে। তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, আমি ওদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিয়েছিলাম। এরা আবার কারা? এগুলো সত্য না, আমি যাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি তারা সত্য? তখন ব্রহ্মার হঠাৎ চোখ খুলে গেল, দেখলেন যে, যিনি এইখানে বসে আছেন তাঁর সহচর যে রাখাল বালকরা তারাও তিনি, বাছুরগুলিও তিনি। দেখে ব্রহ্মা ভয়ে আকুল। বর্ণনা আছে, তিনি হাঁসে চড়ে গিয়েছিলেন, তার উপর থেকে পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে ভগবানকে স্তব করছেন।

ভগবানের এমনই মহিমা যা বর্ণনা করতে গিয়ে ভাগবত ব্রহ্মার ঐ দুরবস্থা দেখালেন। সুতরাং আমাদের আরও কত দুরবস্থা হয় যখন আমরা তাঁর পরিমাপ করতে যাই। অতএব একমাত্র পথ হচ্ছে তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ যাকে বলছে শরণাগতি।*

* কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনে গত ৮.১০.৮৫ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

# আচার্য রামানুজ

## স্বামী পরাশরানন্দ

"ভক্ত কেশব, আমি তোমার নিষ্ঠা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছি। আগের আচার্যদের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও মনোভাব না বুঝে দুর্বুদ্ধির বশে মানুষ আপনাকেই ঈশ্বর মনে করছে এবং যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং আচার্যরূপে আমি অবতীর্ণ না হলে কোনও উপায় নেই। আমিই তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব।"—পুত্রকামনায় পার্থ-সারথি বিষ্ণুমূর্তির সম্মুখে সস্ত্রীক কেশবাচার্য সেদিনই পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ শেষ করেছেন; রাত্রে স্বপ্নে শ্রীপার্থসারথির এই দৈববাণী শুনে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন ও হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলেন নিজের গ্রাম শ্রীপেরেমবুদুরে। মাদ্রাজ শহর থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরের এই গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি। গ্রামের মাঝখানে বিশাল বিষ্ণুমন্দির। এই গ্রামেই বাস করতেন সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত হরিভক্ত ব্রাহ্মণ কেশবাচার্য ও তাঁর স্ত্রী কান্তিমতী। সব আনন্দের মধ্যেও কোন পুত্র না থাকায় তাঁরা একটু উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। শেষে পুত্রের কামনায় পুণ্য মহোদধি নদীর তীরে শ্রীপার্থসারথির সম্মুখে যজ্ঞ করে দেবতার আশীর্বাদ ও নির্দেশ পেলেন।

প্রায় এক বছর পরে ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র

।দের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আচার্য রামানুজ ক দম্পতির গৃহ আলো করে আবির্ভূত হলেন। শিশুর শরীরের নানাবিধ শুভলক্ষণ দেখে শ্রী-ভাগবতে কলিযুগে অনন্তদেবের আবির্ভাবের যে উল্লেখ আছে, এই শিশুই যে সেই লক্ষণাবতার এ-বিষয়ে মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ নিঃসন্দেহ হলেন এবং শিশুর নাম রাখলেন রামানুজ। আট বছর বয়সে বালকের উপনয়নাদি সংস্কার হয়ে গেলে পিতা কেশবাচার্য নিজেই তাঁকে শাস্ত্র পড়াতে শুরু করলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মেধাশক্তি ছিল অসাধারণ,—পাঠকালে যে কোনও জটিল তত্ত্ব বা শাস্ত্রব্যাখ্যা একবার শুনলেই তিনি তার ভেতরের অর্থ বুঝতে পারতেন।

আস্তে আস্তে রামানুজ ষোল বছরে পা দিলেন, —এই বছরটি তাঁর জীবনে ঘটনাবহুল। এই বছরেই পিতার আদেশে তাঁর বিবাহ, পিতার পরলোকগমন আর শ্রীপেরেম্বুদুরের বসতবাটী ছেড়ে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থনগরী কাঞ্চীপুরে চলে আসা ও অদ্বিতীয় অদ্বৈত-পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের কাছে তাঁর শাস্ত্রপাঠ শুরু। সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত, অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী রামানুজ শীঘ্রই যাদবপ্রকাশের প্রিয়শিষ্যে পরিণত হলেন। কিন্তু এই প্রীতির ভাব বেশি দিন স্থায়ী হল না। বস্তুতঃ, যিনি শ্রুতির অপব্যাখ্যা দূর করে মানুষকে শ্রীভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, পুঁথিগত শুষ্ক জ্ঞানের চর্চা, বাক্‌পটুতা ও তর্কযুক্তির বেড়াজাল থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য যে আচার্যের নরদেহধারণ, তথাকথিত উপলব্ধিহীন পণ্ডিতদের মতের সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি মেলা কখনই সম্ভব নয়।

যাদবপ্রকাশের উপনিষদ্‌ব্যাখ্যা চলাকালীন রামানুজের মাঝে মাঝে আপত্তির সুর দেখা যেতে লাগল; যাদব ক্রুদ্ধ, বিরক্ত হয়ে ভৎর্সনা করতে লাগলেন শিষ্যকে,—তার ব্যাখ্যাকে শঙ্করবিরোধী, পরম্পরাহীন বলতে লাগলেন। বিরোধ চরমে উঠল যখন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ও 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চনের' ব্যাখ্যা এল। যাদব ব্যাখ্যা করলেন, "এই জগৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দেখছি, তা মায়ামাত্র।" রামানুজও বিরক্ত হয়ে বললেন, "মহাশয়, আপনি শ্রুতির অপব্যাখ্যা করছেন। শ্রুতির অর্থ তা নয়, ওর অর্থ এই—এই সমস্ত জগৎ ঈশ্বর দ্বারা অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক পদার্থে ঈশ্বর বিরাজমান। ঈশ্বর জগতের আত্মা, তাঁর থেকে পৃথক হয়ে কোন বস্তুই থাকতে পারে না।" রামানুজের ব্যাখ্যা শুনে যাদবপ্রকাশ ক্রোধে জ্বলে উঠে বললেন, "ওহে ধৃষ্ট বালক, তুমি কি আমার শিক্ষক না গুরু, যে আমার ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলে নিন্দে করছ? তুমি যদি আমার ব্যাখ্যা শুনতে না চাও, তবে আস কেন? নিজের ঘরে তুমি টোল খুলে ফেল।"

যাদবপ্রকাশ কিন্তু রামানুজের মেধা, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের উৎকর্ষের পরিচয় পেয়ে মনে মনে খুবই ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, কালে এই বালক হয়তো অদ্বৈতমত খণ্ডন করে দ্বৈতমত স্থাপন করবে। অতএব, সনাতন অদ্বৈত-মত রক্ষার প্রয়োজনে এর প্রাণসংহার করাও কর্তব্য। তিনি গোপনে অন্য শিষ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, মাঘমাসে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে অনন্ত পুণ্য-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সশিষ্য যাদব রামানুজকেও নিয়ে যাবেন এবং মাঝখানে রামানুজকে বধ করে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে সকলে নিষ্কৃতি লাভ করবেন। যদিও অসামান্য ধীশক্তির সাহায্যে বেদান্তের কূট তর্ক-যুক্তি যাদবপ্রকাশ আয়ত্ত করেছিলেন এবং তাঁর অদ্বৈতসিদ্ধান্ত উপস্থাপনার সামনে কোনও পণ্ডিতই দাঁড়াতে পারতেন না, কিন্তু সাধন-

ভজনের অভাবে এই জ্ঞান শুধুমাত্র অহঙ্কার, ক্রোধ ও ঈর্ষামূলক রজো তমোগুণই বাড়িয়েছে, প্রেম, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা জাতীয় সত্ত্বগুণ বাড়ায়নি। গুরুর ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানের প্রস্তাবে সরলহৃদয় রামানুজ সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হলেন। সতীর্থ ও মাসতুতো ভাই গোবিন্দও এই তীর্থযাত্রায় সাথী হলেন। পথিমধ্যে বিন্ধ্যাচলের নিবিড় অরণ্যে যাদবপ্রকাশ অন্য শিষ্যদের সাহায্যে রামানুজকে হত্যার পরিকল্পনা করলেন। রামানুজের সদা কল্যাণাকাঙ্ক্ষী গোবিন্দ সেটি রামানুজকে জানিয়ে দিয়ে দ্রুত অন্যপথে একাকী চলে যাবার অনুরোধ করলেন। পবিত্রহৃদয় রামানুজ ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে বিস্মিত ও হতবাক্ হয়ে গেলেন; অবশেষে একাই সেই হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ বনানী পথে হাঁটা শুরু করলেন। কিন্তু ভক্তের বিপদ দেখে আর্তিহর ভক্তবৎসল নারায়ণ থাকতে পারলেন না। ব্যাধদম্পতির বেশে নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী রামানুজের সামনে আবির্ভূত হয়ে কাঞ্চীনগরীতে তাঁর ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এদিকে যাদবপ্রকাশ রামানুজকে দেখতে না পেয়ে শিষ্যদের খুঁজতে বললেন; কিন্তু সেই ভীষণ অরণ্যে তাঁর কোনও সন্ধান না পেয়ে সকলে সিদ্ধান্ত করলেন যে কোনও হিংস্র জন্তুই তাকে বধ করে ফেলেছে। সশিষ্য যাদব এতে নিষ্ঠুর আনন্দ লাভ করলেন; শুধু গোবিন্দের সামনে একটু মৌখিক দুঃখপ্রকাশ করে সকলে প্রয়াগ-তীর্থের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

রামানুজ কাঞ্চীপুরে ঘরে ফিরে এসে জননী কান্তিমতীকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। কান্তিমতী পুত্রকে বললেন, "এই কাঞ্চীক্ষেত্রে কাঞ্চীপূর্ণ নামে এক হরিভক্ত থাকেন। তিনি কাঞ্চীতীর্থের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমূর্তি বরদরাজের পরিচর্যা ও ধ্যানেই সারাদিন কাটান; তাঁর মন-প্রাণ ভগবানে নিবেদিত। তুমি তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর।" রামানুজ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের কাছে এসে অতি বিনীতভাবে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় নিলেন। প্রেমমূর্তি কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্রবংশে জাত বলে তাঁর গুরু হতে অস্বীকার করলেন; কিন্তু রামানুজের আর্তি ভক্তির আতিশয্য ও ভগবানের নামে সাত্ত্বিক বিকারাদি দেখে শ্রীবরদরাজের সেবাধিকার তাঁকে দান করলেন। মনের মতো কাজ পেয়ে রামানুজ খুবই খুশি হলেন; তাঁর ভেতরের সুপ্ত ভক্তিভাব আস্তে আস্তে শতদলে প্রস্ফুটিত হয়ে অপূর্ব সৌরভে চারদিক আমোদিত করে তুলল। দেবতার উদ্দেশ্যে ফুলতোলা-মালাগাঁথা, দেবতার মন্দির মার্জনাদি করা, শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তন-স্তোত্রপাঠ-ধ্যান—ইত্যাদি সবরকমের কাজের মধ্যে শ্রীভগবানের সাথে মাধুর্যময় লীলায় তিনি মেতে উঠলেন।

ঐ সময়ে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যামুনাচার্য নামে একজন পরম বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসমূহে পারদর্শী এবং সমাগত বিপক্ষদের তর্কে পরাজিত করাতেও পটু ছিলেন। একদিন শাস্ত্রপাঠ শেষ হয়ে গেলে যামুনাচার্য অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। ধ্যানভঙ্গে শিষ্যদের সর্বসুলক্ষণযুক্ত সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী মধুরভাষী সদাচারসম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত এক নবীন যুবকের সন্ধান করতে বললেন। শিষ্যরাও বহুদেশ ভ্রমণ করে অবশেষে কাঞ্চীতে রামানুজের সন্ধান পেলেন। তাঁকে দেখে, আলাপ করে ও ভক্তদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে শিষ্যরা বুঝলেন যে দৈবীবলে বলীয়ান ঐ উন্নতপুরুষ যুবকই গুরুদেবের অভীপ্সিত ব্যক্তি। যামুনাচার্য শিষ্যদের মুখে সব শুনে রামানুজকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। শিষ্য মহাপূর্ণকে তখনি কাঞ্চীনগরীতে প্রেরণ করলেন আর বলে দিলেন তাঁর রচিত 'আলওয়ান্দার' স্তোত্র রামানুজকে শোনাতে। মহাপূর্ণ কাঞ্চীতে এসে ভগবান

বরদরাজকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে তাঁরই উদ্দেশ্যে লেখা আল্‌ওয়ান্দার স্তোত্রের স্তব শুরু করলেন। ঐ স্তবের অপূর্ব ছন্দ, মধুর পদবিন্যাস, ভক্তিপূর্ণ ভাব ও সুললিত স্বরে মন্দিরের পূজারীরা ও ভক্তমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে গেলেন; চারিদিকের সব পশুপাখী নিস্তব্ধ হয়ে একমনে সেই অমৃত-সুধা পান করতে লাগল; সমগ্র স্থানটি এক দিব্য জমাট আধ্যাত্মিক ভাব ও ভগবদ্‌-প্রেমে পরিপূর্ণ পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে উঠল। ভগবান বরদরাজের পূজার জন্য জল নিয়ে আসছিলেন রামানুজ; সমস্ত স্তবকটি[১] শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, ব্যাকুলচিত্তে মহাপূর্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিপ্রবর, এ স্তব কে রচনা করেছেন? তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি নিতান্ত উৎসুক হয়েছি। তাঁর সেবা করতে পেলে আমি নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করব।" মহাপূর্ণ উত্তর দিলেন, "পরমবৈষ্ণব প্রেমিক সন্ন্যাসী যামুনাচার্যই এই স্তোত্রের প্রণেতা; এই ভগবদ্‌ভক্ত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীমদ্‌ নারায়ণের দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠাস্বরূপ এক অপূর্ব জীবন যাপন করছেন।" রামানুজ তৎক্ষণাৎ মহাপূর্ণের সঙ্গে শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

এদিকে মহাপূর্ণকে কাঞ্চীতে পাঠানোর পর থেকেই যামুনাচার্য গুরুতর অসুখে পড়লেন। আগেও মাঝে মাঝে তাঁর শরীর খারাপ হচ্ছিল, —কিন্তু এবার তিনি বুঝলেন যে প্রেমাস্পদের ডাক এসেছে,—তাঁর সঙ্গে নিত্যধামে নিত্যলীলার সময় সমাগত। শিষ্যদের ডেকে ভগবানের নাম-সঙ্কীর্তন করতে বললেন; মৃদু মৃদু বাদ্য ও বংশী-ধ্বনির সঙ্গে সুমধুর সঙ্কীর্তনে সকলেই স্বর্গীয় বিমল আনন্দে মেতে উঠলেন,—পার্থিব লোক পরিণত হল দিব্যলোকে। মুখে উদ্ভাসিত হাসি—নয়নে অশ্রু—শরীরে পুলক ও রোমাঞ্চ—যামুনাচার্য ভাগবতী তনু নিয়ে যাত্রা করলেন অমর্ত্যলোকের উদ্দেশ্যে।

সেই সময়েই শ্রীরঙ্গমে পৌঁছলেন রামানুজ ও মহাপূর্ণ; মহাভাগবত যামুনাচার্যের পরমপদ লাভের সংবাদে দুজনেই খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। শোকাবেগ সামলে নিয়ে কাবেরী নদীর তীরের মহাশ্মশানে এসে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন ভগবানের প্রেমবিলাসের বিগ্রহটিকে। কিছুক্ষণ পর রামানুজ লক্ষ্য করলেন যে মহর্ষির ডানহাতের তিনটি আঙুল বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে; এর কারণ কেউই বলতে পারলেন না। যোগিবর রামানুজ প্রজ্ঞানেত্রে বুঝে ফেললেন এর অর্থ। তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিনটি শ্লোক বললেন। সেগুলির অর্থ হচ্ছে,—আমি বিষ্ণুমতে থেকে অজ্ঞানমোহিত মানুষকে নারায়ণের শরণাগত করে সর্বদা রক্ষা করব। আমি লোকরক্ষার জন্য মঙ্গলময় তত্ত্ব-জ্ঞানদায়ক শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করব। কৃপাময় মুনি পরাশর বিষ্ণুপুরাণ রচনা করে ঈশ্বর-জীব ও জগতের তত্ত্ব জগদ্‌বাসীকে উপহার দিয়েছেন; তাঁর ঋণ শোধ করার জন্য আমি কোনও এক মহাপণ্ডিত বৈষ্ণবকে ঐনামে অভিহিত করব। শ্লোকগুলি বলার সাথে সাথে এক এক করে মহর্ষির তিনটি আঙুলই খুলে সরল হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে সমবেত জনতা মুগ্ধ হয়ে গেল এবং বুঝতে পারল যে রামানুজই যামুনাচার্যের আসনে

১ পঁয়ষট্টি শ্লোকে রচিত 'আল্‌ওয়ান্দার স্তোত্রের' একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হল।

অববোধিতবানিমাং যথা / ময়ি নিত্যাং ভবদীয়তাং স্বয়ম্‌।
কৃপয়ৈবমনন্যভোগ্যতাং / ভগবন্‌ ভক্তি ময়ি প্রযচ্ছ মে॥

—হে ভগবান। তুমি আমার অন্তরে যেমন "আমি চিরকাল তোমারই" এভাব জাগিয়ে দিয়েছ। কৃপা করে তেমনি আমায় সেই ভক্তি দাও যাতে আমি তোমা ছাড়া আর কিছুই ভোগ করতে সমর্থ না হই।

বসার যোগ্য অধিকারী।

ব্যথিতপ্রাণে, রামানুজ কাঞ্চীপুরে ফিরে এলেন। তাঁর স্বাভাবিক হাসি মুখ থেকে বিদায় নিয়েছে,—তিনি এখন অনেক গম্ভীর ও চিন্তাশীল। তদানীন্তন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান পুরুষ যামুনাচার্য রামানুজকে সাক্ষাৎ উপদেশ দিতে না পারলেও তাঁর জীবনের আচারই রামানুজের আদর্শ হল। শ্মশানক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার দ্বারা কার্যতঃ সেদিন থেকেই তিনি বৈষ্ণবমত রক্ষার কাজে দায়বদ্ধ হলেন। কিন্তু বৈষ্ণবমতে দীক্ষা তাঁর তখনও হয় নাই,—বৈষ্ণবপ্রধান কাঞ্চীপূর্ণের কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন করে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করার জন্য। কাঞ্চীপূর্ণ জানালেন যে, স্বয়ং বরদরাজের ইচ্ছা যে রামানুজ যেন মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে। মাদুরার নিকটেই এক বিষ্ণুমন্দিরের পাশে রামানুজ দেখা পেলেন মহাপূর্ণের, দীক্ষার সব ব্যবস্থা সেখানেই হল; মন্দিরের মধ্যে যথাবিধি অগ্নিস্থাপন করে মহাপূর্ণ হোম শুরু করলেন,—পরে উত্তপ্ত শঙ্খ ও চক্র-চিহ্ন রামানুজের বাহুদেশে অঙ্কিত করে দিলেন, কানে শক্তিশালী বৈষ্ণব মন্ত্র অর্পণ করলেন আর ভগবান বিষ্ণুর অর্চণমূর্তি তাঁকে নিত্যপূজার জন্য উপহার দিলেন। এভাবে বৈষ্ণবসমাজের নায়ক-রূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে বললেন, "পূর্বে যামুনাচার্য বৈষ্ণব-জগতের গুরু ছিলেন; তাঁর তিরোধানের পর তুমিই এখন তাঁর স্থান অধিকার করলে। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ-সম্প্রদায়কে (মায়াবাদী শঙ্করাচার্য-মতাবলম্বীদের) সমূলে নাশ করে বৈষ্ণবদের রক্ষা কর।" রামানুজ নীরবে সব শুনলেন। গুরু মহাপূর্ণকে সাদর আমন্ত্রণ করে কাঞ্চী নিয়ে এসে তাঁর কাছ থেকে তামিল ভাষায় লেখা বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ ও পুরাণাদি পড়তে শুরু করলেন। ছ-মাসের মধ্যেই তামিল ভাষায় লেখা পুস্তকাদি পড়া হয়ে গেলে মহাপূর্ণ ফিরে গেলেন শ্রীরঙ্গমে।

এদিকে রামানুজের প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য ও নির্বেদ উপস্থিত হল। যুগ যুগ ধরে যে বাসনা-রাশি মানুষকে ছায়ার মতো জন্ম থেকে জন্মান্তরে অনুসরণ করে চলেছে সেই পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ও যাবতীয় এষণা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে সন্ন্যাসগ্রহণে তিনি উন্মুখ হলেন। সবকিছু ত্যাগ করে শ্রীবরদরাজের চরণে চিরকালের জন্য আশ্রয়গ্রহণ করবেন এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। মন্দিরের পাশেই সরোবরের পাড়ে প্রজ্বলিত হল অগ্নি,—ললাটে ঊর্ধ্বপৌণ্ড্র ও বারটি তিলকচিহ্নে শরীর সুশোভিত করে যখন তিনি কাষায়বস্ত্র ও দণ্ড ধারণ করলেন যতিবরের সেই অপূর্ব ত্যাগ ও ভক্তির সমন্বয়মূর্তি দেখে জগদ্বাসী বিস্মিত হল। প্রভাতের প্রথম অরুণিমা শ্রীমন্দিরের চূড়া স্পর্শ করেই দিকে দিকে এই শুভসংবাদ প্রচার করে দিল, আকাশ-বাতাস সমগ্র প্রকৃতিই যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বরদরাজের ভাবে আবিষ্ট কাঞ্চীপূর্ণ নববেশধারী বৈষ্ণবকে 'যতিরাজ' নামে সম্বোধন করলেন।

যতিরাজ গুরু মহাপূর্ণের মঠে এসে তাঁর কাছ থেকে গীতার্থসংগ্রহ, নারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করলেন, অধ্যয়ন শেষ হলে মহাপূর্ণ প্রিয় শিষ্যকে বৈষ্ণবপণ্ডিত গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে অর্থসহ বৈষ্ণবমন্ত্র জেনে নিতে বললেন। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে তাঁর বিনীত প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে ফিরিয়ে দিলেন; বারবার আঠারো বার ফিরিয়ে দেওয়ার পর ভগ্নমনোরথ হয়ে রামানুজ বিলাপ করতে শুরু করলেন। এই আর্তি দেখে গোষ্ঠীপূর্ণের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল; তিনি বুঝলেন যে যতিরাজ এই মহামন্ত্র পাবার অধিকারী,—একান্তে রামানুজকে ডেকে তিনি শপথ করিয়ে নিলেন যে

এই মহামন্ত্র তিনি আর কাকেও বলবেন না। এরপর সহরস্ত সেই মহামন্ত্র দান করলেন। এই মন্ত্রের এমনই মহিমা যে, যার কানে এই মন্ত্র প্রবেশ করবে, দেহান্তে সেই মুক্তিলাভ করে বৈকুণ্ঠে গমন করবে। মন্ত্রশক্তির বলে যতিবরের শ্রীমুখে এক দিব্যভাবের উদয় হল,— সমস্ত শরীরের লাবণ্য যেন শতগুণে বেড়ে উঠল।

কিন্তু মন্ত্রশোনার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মনোজগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল। দুঃখতাপে জর্জরিত আপামর জনসাধারণের জন্য তাঁর হৃদয়ে এক পরম প্রেম ও করুণার উদয় হল। নগরের সব লোকদের আহ্বান করে তিনি বিষ্ণুমন্দিরের বিশাল চত্বরে অপেক্ষা করতে বলদেন আর নিজে শ্রীমন্দিরের গোপুরমের শীর্ষে উঠে গেলেন। সেখান থেকে তিনি চিৎকার করে সেই অমোঘ মহামন্ত্র উচ্চারণ করে বিশাল জনতাকে তা উচ্চারণ করতে বললেন। সেই অব্যর্থ শক্তিশালী মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথেই সকলের জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি ভস্মীভূত হয়ে গেল, সকলেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হয়ে সেই জায়গাটিকে যেন বৈকুণ্ঠে পরিণত করল। শিষ্যমুখে একথা শুনে গোষ্ঠাপূর্ণ রামানুজকে ডেকে পাঠালেন; তাঁকে অত্যন্ত তিরস্কার করে বললেন, এরকম কাজের জন্য তাঁর নরকে গতি হবে। কিন্তু নিঃশঙ্ক রামানুজ গুরুপদে নিবেদন করলেন যে, নগরবাসীদের সকলের মুক্তির জন্য তিনি নরকে যেতে প্রস্তুত, আর এটি জেনেই তিনি মহামন্ত্র সকলকে বিলিয়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুর অংশে জাত এই মহাপ্রাণের বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে গোষ্ঠাপূর্ণ বিস্মিত হয়ে গেলেন; তাঁকে স্নেহে আলিঙ্গন করে সকলের সামনেই তাকে লক্ষণাবতার বলে ঘোষণা করলেন।

যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসে কুরেশ, দাশরথি প্রভৃতি প্রধান শিষ্যদের শাস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় তাঁর দিনগুলি সুন্দরভাবে অতিবাহিত হতে লাগল। দিনে দিনে রামানুজের অতুল কীর্তি ও মহাপুরুষোচিত কার্যকলাপ সর্বত্র প্রচারিত হতে শুরু হল। ভক্তমণ্ডলী তাঁকে শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর দ্বিতীয় বিগ্রহ বলে মনে করতেন আর সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা তাঁর জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতেন,—এসব দেখেশুনে শ্রীরঙ্গনাথের প্রধান পুরোহিত প্রমাদ গুণলেন। তাঁর লোকমান্যতা, প্রভাব প্রতিপত্তি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে দেখে হৃদয়ে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল। শ্রীরঙ্গনাথের স্নানজলে বিষ মিশিয়ে তিনি রামানুজকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন। বিপত্তারণ ভক্তবৎসল নারায়ণ এককালে পুত্র প্রহ্লাদকে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর হত্যা করার সবরকমের চেষ্টা বিফল করে দিয়ে ভক্তের মহিমাই জগতে প্রচার করেছিলেন। এবারে তিনি ভক্ত রামানুজের উদরের বিষ জীর্ণ করে দিয়ে গীতামুখে তাঁর অমর উক্তি 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' জগতে আরেকবার প্রমাণ করলেন। এতবড় ঘটনায় রামানুজ কিন্তু নির্বিকার; আগের মতোই ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ভক্তিরসালাপ, কীর্তন, নৃত্য সবই চলতে লাগল। প্রধান পুরোহিত এতে খুবই ভীত হয়ে তাঁর কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন এবং শেষে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় নিলেন।

শ্রীরঙ্গমে শিষ্যদের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করতে করতে তাঁর মনে একদিন পূর্বস্মৃতির উদয় হল। যামুনাচার্যের অন্তিম শয়নে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে লোকরক্ষার্থে দ্বৈতমত সমর্থন করে তিনি বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করবেন। কিন্তু এটি লিখতে হলে মহর্ষি বোধায়ন রচিত বৃত্তির সাহায্য নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, এই বোধায়নবৃত্তি একমাত্র কাশ্মীরের শারদাপীঠে রক্ষিত আছে। সেটি আনার জন্য শিষ্য

কুরেশকে নিয়ে তিনি কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে সেখানকার অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ তাঁর শাস্ত্রকুশলতা, বাগ্মিতা, জ্ঞানের গভীরতা ও মহাপুরুষ-সুলভ মুখমণ্ডল দেখে মনে মনে ভীত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন তাঁকে বোধায়নবৃত্তি দেখতে দিলে ইনি মহর্ষি বোধায়ন-অনুমোদিত দ্বৈতবাদ সমর্থনের পক্ষে এমন দর্শনশাস্ত্র রচনা করবেন যে অদ্বৈতবাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পুস্তক দিলেন না। কিন্তু, শারদাদেবী স্বয়ং তাঁকে পুস্তকটি দিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন অবিলম্বে বই নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করার। শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসে তিনি সমবেত শিষ্যদের বললেন, যে-সকল কুতার্কিকগণ 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বাক্যসমূহের অর্থজ্ঞানকেই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলে মনে করেন, মুখ্যতঃ তাঁদের মত খণ্ডন করে ধ্যান, উপাসনা ও ভক্তি দ্বারাই মোক্ষলাভ যে সমগ্র বেদ-বেদান্তের অভিপ্রায়, এটি প্রমাণ করার জন্য তিনি বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা শুরু করবেন। শিষ্য কুরেশকে ভাষ্যের লেখক ঠিক করলেন; কুরেশের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যেখানে ভাষ্যের যুক্তি কুরেশের সমীচীন মনে হবে না তিনি লেখা বন্ধ করবেন; যতিরাজ তখন পুনরায় চিন্তা করে লেখার পরিবর্তন আবশ্যক মনে হলে পরিবর্তন করবেন। শ্রীভাষ্যরচনা শুরু হল। সমগ্র ভাষ্য লেখাকালে কুরেশকে শুধুমাত্র একবার লেখনী বন্ধ করতে হয়েছিল। জীবের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে একসময় যতিরাজ বললেন, "জীব স্বরূপতঃ নিত্য ও জ্ঞাতা।" কুরেশের লেখনী থেমে গেলে আচার্যদেব প্রথমে অপ্রসন্ন হলেও একটু পরেই তাঁর মনে হল, জীব যদি স্বরূপতঃ নিত্য ও জ্ঞাতা হন, তাহলে জীব তো পরতন্ত্র না হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে যাচ্ছেন। তিনি তখন জীবের স্বরূপকে বিষ্ণুশেষত্বসংযুক্ত (ঈশ্বরের অধীন ও অংশবিশেষ) ও জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট বললেন; কুরেশ লেখা শুরু করলেন,. এভাবে শ্রীভাষ্য রচনা সমাপ্ত হল। এর পরেই বেদান্তদীপ, বেদান্ত-সার, বেদান্তসংগ্রহ এবং ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচিত হল।

এ-সকল গ্রন্থরচনা শেষ হলে যতিরাজ নিজের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নাম দিয়ে শিষ্যদের ও বৈষ্ণবদের ইচ্ছায় দিগ্বিজয় করে মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাত্রা শুরু করলেন। অগণিত শিষ্য ও অনুরাগীদের নিয়ে তিনি আসমুদ্রহিমাচল সব বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র, মঠ ও নগরের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কে পরাজিত করে নিজের মতাবলম্বী করেন। বস্তুতঃ, পদ্মনাভ স্বয়ং তাঁর পিতাকে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে যে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন তিনি এভাবে তা কার্যে পরিণত করলেন। পরম প্রেমস্বরূপ ভগবানের ধ্যান-ধারণা এবং তাঁর কৃপা ব্যতীত শুধুমাত্র উপনিষদের মহাবাক্যের অর্থ-চিন্তার দ্বারা জীব কখনও মুক্তিলাভ করতে পারবে না,—বেদ-বেদান্তের ও অধ্যাত্মচিন্তার জন্মস্থান ভারতভূমিতে তিনি এটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। এককথায়, শুষ্ক তর্ক, জ্ঞানচর্চা ও যুক্তির মরুভূমিতে তিনি প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার স্রোতস্বিনী আনয়ন করলেন; তাঁর পরবর্তী কালের সব ভক্তিপথের আচার্য ও প্রচারকগণই তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঋণী।

দীর্ঘায়ু যতিরাজের বয়স একশো কুড়ি বছর হলে তাঁর মনে হল জগতে তাঁর যে জন্য আগমন সবই পূর্ণ হয়ে গেছে। সমগ্র ভারতভূমিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়েছে, আপামর জনসাধারণের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান-ধারণারূপ নবধা ভক্তির প্রচলন হয়েছে, শিষ্যরা এবং শিষ্যের শিষ্যরা বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব দেবার যোগ্য হয়েছে। তিনি লীলা-সংবরণ করতে

অভিলাষী হলেন। প্রধান প্রধান শিষ্যদের ডেকে শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ কয়েকদিন ধরে ব্যাখ্যা করলেন। বৈষ্ণবদের বিনীত প্রার্থনায় তাঁর তিনটি প্রতিমূর্তি যাদবগিরি, শ্রীরঙ্গম ও শ্রীপেরম্বুদুরে তাঁর তিরোধানের পর পূজাদির জন্য তাঁর অনুমোদন নিয়ে প্রতিষ্ঠা হল। মহাসমাধির আগের দিন কুরেশের পুত্র পরাশরকে সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের নেতা নির্বাচন করে সকলকে তাঁর আদেশ অনুসারে চলতে বললেন। ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা দশমী,—শনিবার মধ্যাহ্নকাল। শ্রীরঙ্গম মঠে যতিরাজ গোবিন্দের কোলে মাথা রেখে অনন্তশয়ানে শায়িত; সেই অবস্থায় শিষ্য-ভক্তদের শ্রীভগবানের সেবা-পূজা সম্পর্কে দু-একটি মূল্যবান উপদেশ দিলেন ও নশ্বর দেহের নাশে তাদের শোক করতে নিষেধ করলেন। বৈষ্ণবদের মৃদঙ্গ-করতালের সঙ্গে মধুর নাম-কীর্তন শুনতে শুনতে আচার্য রামানুজ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হলেন।

# ১লা মে ১৮৯৭

### শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

সে কোন্ তারিখ বিশ্বে, সে তারিখ কোন্
  সে কোন্ তারিখ!
আবির্ভূত শ্রীরামকৃষ্ণ-'শ্রীনাম মিশন'।
প্রশ্নময় বিশ্বনেত্র চাহে অনিমিখ্—
  সে কোন্ তারিখ।
গুরু-রূপ-দ্রষ্টা-স্রষ্টা-যে পরিব্রাজক
গুরুমন্ত্র-শিব-জীব-ধারক-সাধক—
রাজ-যোগ জ্ঞান-যোগ সর্ব-যোগ-ধন
ধেয়ানে লভেন নাম শ্রীরামকৃষ্ণের মিশন!
  সরস-সহাস বাণী-মাঝে সমাধিস্থ
  হেরে বিশ্ব মুগ্ধ ভক্ত গুরুময়-চিত।
  বিশ্বের বিস্ময়-বাণী শোনে অগণন,
  স্বদেশের ভক্ত মুগ্ধ বিদেশী সজ্জন।
  নরেন্দ্র-রাখাল-কালী-ভক্ত বলরাম
  বিহারের মূর্খ লাটু নাম রাখ্‌তুরাম।
  ভক্তেরা বিবেকানন্দে অদ্বিতীয় মন,
অষ্টাদশ শতকের সপ্তনবতি সে সন।
মাস বৈশাখ মে তারিখ পহেলা
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তে মিলি
  একাকার লীলা।
জ্ঞানী-গুণী-ভক্ত-দুখী-নরনারী-মূঢ়,
মহালীলাঙ্গনে আজো হতেছেন জড়।
সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ওঁ তৎসৎ
ব্রহ্ম জীব অভেদাত্মা বিশ্ব-স্বপ্নবৎ।
অচিন্ত্য অনন্ত বিশ্বে রূপ ও অরূপ—
জীব-শিব-ব্রহ্ম-লীলা-অবতার রূপ।
সত্য-ত্যাগ-ভক্তি-প্রেম-সেবা-
  নিকেতন,
মিশন শ্রীরামকৃষ্ণ পরম শরণ।
কে রাখিল মহানাম ভাবে বিশ্বজন
মুগ্ধ ভক্ত মূর্খ মূঢ় একাকার মন।

# শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিতে

শ্রীপরিমল কান্তি দাস

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

## (৫) শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত ঈশ্বরানুরাগী মন নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন। পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিন সতীর্থ নাগমশাই-এর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন।[৪৩]

নিরাকারবাদী মন নিয়ে সুরেশবাবু প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে যান সেদিন কোন দেবদেবী-কেই তিনি প্রণাম করেননি। কয়েকদিন সেখানে যাতায়াতের পর নাগমশাই তাঁকে দীক্ষাগ্রহণের কথা জানিয়ে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন। সুরেশবাবু কিন্তু ঠাকুরকে সরাসরি জানিয়েছিলেন, "আমার তো মন্ত্র বা ঈশ্বরীয়রূপে বিশ্বাস নেই।"[৪৪]

এক কথায় ঠাকুর বলেছিলেন, "তবে তোমার এখন দীক্ষার দরকার নেই। পরে, তুমি এর প্রয়োজন বুঝবে। সময়ে তোমার দীক্ষা হবে।"[৪৫]

এই ঘটনার অনেকদিন পর, যখন তিনি সুদূর কোয়েটায় কর্তব্যরত, তখন তাঁর মনে দীক্ষার আগ্রহ জাগে। এই ঘটনার আরও কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপ্রকট হন। কিন্তু কোন একদিন স্বপ্নে তিনি সুরেশচন্দ্রকে দীক্ষা দেন। দেবস্বপ্ন মিথ্যা হয় না। সেজন্য সুরেশচন্দ্রের জীবনে পরিবর্তন এল।—এল ভক্তি ও সাধনার স্পৃহা। সুরেশবাবুর এই পরিবর্তন সম্পর্কে সাধু দুর্গাচরণ নাগমশাই বলেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র সঙ্গগুণে সুরেশবাবুর ভগবল্লাভেচ্ছা ও সাধনানুরাগ উত্তরকালে এত পরিবর্ধিত হইয়া উঠে যে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নিজ পরিবার-বর্গের জন্য কয়েক মাসের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া সংসারের সকল কার্য হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্বক নির্জনে ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাত করিতেন।"[৪৬]

কথামৃতে সুরেশবাবুর সংবাদ বিশেষ কিছুই নেই। তবে তাঁর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তুতি পাওয়া যায়। তাঁর লিখিত ও সংগৃহীত কয়েকটি বই-এর মধ্যে বর্তমানে একটি পুস্তকই পাওয়া যায়—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ'। বাকি বইগুলি দুষ্প্রাপ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে তাঁর জীবনে যে পরিবর্তন আসে তা তাঁর লেখা পুস্তকটিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। ঠাকুরের প্রকটকালেই তিনি ঐ পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণের স্তুতি করে লিখছেন, "...ভবিষ্যতে যাঁহারা ঠাকুরের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারাও দেখিতে পাইবেন যে ১১৫৬ শকাব্দের ১০ ফাল্গুন (সন ১২৪১ সাল ইং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুআরী) শুক্ল পক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে বুধবারে কামারপুকুর গ্রামে খুদিরাম চট্টো-পাধ্যায়ের বাটীর সূতিকাগৃহে যে পুত্রটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ মনুষ্য নন।"[৪৭]

একদা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সুরেশচন্দ্র পরবর্তিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে আচার্য কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে একটি বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন,—"যে কেশব বক্তৃতা করিলে পৃথিবীশুদ্ধ

৪৩ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা ঃ পৃঃ ৩৫৪

৪৪ ঐ, পৃঃ ৩৫৫

৪৫ ঐ, পৃঃ ৩৫৫

৪৬ ঐ, পৃঃ ৩৫৯

৪৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ঃ শ্রীসুরেশ চন্দ্র দত্ত (২৭তম সংস্করণ) ঃ পৃঃ ৩

লোক ছুটিয়া আসিত, নিরক্ষর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের কথা শুনিবার জন্য সেই কেশব দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বিনীতভাবে বসিয়া থাকিতেন।"[৪৮] শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাতে সুরেশবাবু বিস্মিত হয়েই যে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নিরাকারবাদী সুরেশবাবু ক্রমে ক্রমে ভক্তি-পথে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যভাব দেখে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা তাঁর উক্তিতেই প্রকাশ পায়। মা ভবতারিণী ও শ্রীরামকৃষ্ণ যেন মাতা-পুত্র। এই ভাব প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, "তিনি আজীবন বাল্যভাবে কাটাইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে শেষ অবস্থায়ও দেখিয়াছেন, তাঁহারাও তাহার অপূর্ব বাল্যভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন।··· আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, রামকৃষ্ণের সম্মুখে রাজা মহারাজা বা গুণী জ্ঞানী শত শত লোক বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার কোমরের কাপড় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গিয়াছে অথচ সেদিকে তাঁহার আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই।"[৪৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার কথা বলতে গিয়ে সুরেশবাবু লিখছেন, "ঠাকুর জানিতেন যে, এ ঘোর কলিকালে শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজিবে না। তাই তিনি মনস্থ করিলেন যে, প্রত্যেক ধর্ম সাধনা করিয়া জগৎকে দেখাইতে হইবে যে সকল ধর্মের ভিতর দিয়াই সেই এক সত্য-স্বরূপে পৌছান যায়।"[৫০]

সুরেশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে বুঝেছিলেন যে সত্যে আঁট না থাকলে এবং কামকাঞ্চন ত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ করা যাবে না। সেই কারণে তিনি এই আচরণ পালন করবার চেষ্টা করেছিলেন। অন্য এক জায়গায় সুরেশবাবু স্বগতোক্তি করছেন, "রামকৃষ্ণদেব এ জগতের লোক নহেন, অথচ কেন তিনি এ জগতে আসিয়া আমাদের সহিত লীলা করিয়া গেলেন?"[৫১] পরে নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, "দয়া, দয়া, একমাত্র দয়াই ইহার কারণ।"[৫২]

শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্পর্কে তিনি বলছেন,—"অন্যান্য ভাবের ন্যায় অবতার ভাবও ঠাকুরের ভিতর সকল বয়সে দেখা গিয়াছিল। তাঁহার অলৌকিক জন্ম, তাঁহার পিতার স্বপ্ন দর্শন, ছয় মাসের শিশু ষোল বছরের যুবার ন্যায় হইয়া মাতাকে দর্শন দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহার জীবনে অনেকানেক ঘটনা তাঁহার অবতারত্ব স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া দেয়।"[৫৩] সুরেশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণার কথা বলতে গিয়ে তাঁর ভাগবতী মহিমা কীর্তনে বলছেন যে, "ঠাকুর সমাধিস্থ অবস্থায় পরমানন্দ লাভ করেও জীবের কল্যাণের জন্য মনকে নীচে নামিয়ে আনতেন। সেই অত্যুৎকৃষ্ট চিরাভিলষিত অবস্থা তিনি জীবের কল্যাণের জন্য ত্যাগ করিতে চাহিতেন। এই দয়ার বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহা কতদূর নিঃস্বার্থ। আমাদের মত জীবের কি ইহা কখনও সম্ভব? তাঁহার এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার গুণে আমরা সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী।"[৫৪]

## (৬) শ্রীহরমোহন মিত্র

শ্রীহরমোহন মিত্র স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্তের) সতীর্থ। খুব অল্প বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি হরমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। ঠাকুরের করুণার কথা পরবর্তিকালে হরমোহন বাবু কোন ভক্তকে বলেছিলেন, "ঠাকুরের দিব্য

৪৮ ঐ, পৃঃ ৮
৪৯ ঐ, পৃঃ ৯
৫০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : পৃঃ ১২
৫১ ঐ, পৃঃ ১৬
৫২ ঐ, পৃঃ ১৬
৫৩ ঐ, পৃঃ ১৮
৫৪, ঐ, পৃঃ ২০

স্পর্শের ফলে তাহার বহু অনুভূতি ও ভ্রূযুগলের মধ্যে অনেক দেবদেবী দর্শন ঘটিয়াছিল।"৫৫ অনুমান করা হয় প্রথমদিকে যখন তিনি ঠাকুরের কাছে যেতেন, তখনই তাঁর এই সব অনুভূতি হয়েছিল। বিবাহিত জীবনের পরই ঠাকুরের কাছে তাঁর যাতায়াত কমে যায়। কিন্তু আগের মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়েই তিনি ঠাকুরের কাছে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-হরমোহন সংবাদের এক ছোট্ট বর্ণনায় একথা জানা যায়।

"এখন শ্রীরামকৃষ্ণ হরমোহনকে লক্ষ্য করে বলেন, 'এর খুব আধার ছিল।…আলাদা বাড়ী, অনেক যেতে বললুম গেল না।'

হরমোহন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে হাত দিয়ে বলেন, 'আমার এখন কিসে হবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের কথার জের টেনে বলেন, 'তারপর যখন গেল, তখন পিশাচী সব সত্তা হরণ করেছে।…বাপের বাড়ি বউ নিয়ে থাকায় তত দোষ নেই।'

হরমোহন সকাতরে আবার ঠাকুরের পায়ে হাত দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হাত ছাড়িয়ে দেন, নিজে তাঁকে নমস্কার করেন।"

পরবর্তিকালে হরমোহন ঠাকুর ও স্বামীজীর প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাই তাঁকে এই কাজে প্রেরণা দিয়েছিল। একটি ঘটনায় জানা যায়, "আলবার্ট হলে ভগিনী নিবেদিতার ইংরাজীতে 'কালী-দি-মাদার' (কালী মাতা) শীর্ষক-লিখিত ভাষণের পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ওজস্বিনী ভাষায় প্রতিমা পূজার সমালোচনা করিলে উহার প্রতিবাদ কল্পে হরমোহন সুললিত ইংরাজী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্মরণ করাইয়া এমন একটি বক্তৃতা করেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ উহাতে মুগ্ধ হন।"৫৭

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ সম্বলিত যে পুস্তক মুদ্রিত করেন তার প্রকাশক ছিলেন হরমোহনবাবু। গ্রন্থটির ভূমিকায় সুরেশ বাবু হরমোহনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখছেন, "রামকৃষ্ণগত প্রাণ শ্রীহরমোহন মিত্র মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি অমানুষিক ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া-ছিলেন বলিয়াই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, সে কথা আমি স্বীকার না করিয়াও থাকিতে পারিলাম না।"৫৮

উপরোক্ত বক্তব্যে এটা খুবই পরিষ্কার যে হরমোহন নিঃস্বার্থভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ঠাকুর এবং স্বামীজীর প্রচারকে তিনি জীবনের অন্যতম কর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য পরবর্তিকালে দেখা গেছে 'ম্যাক্সমূলার' লিখিত ঠাকুরের জীবনী তিনিই এদেশে প্রথম প্রচার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট বড় সব রকম ছবিও তিনি বিক্রয় করতেন। দরিদ্র হলেও হরমোহনবাবু বিক্রিত অর্থ ঠাকুরের সেবায় খরচ করতেন। হরমোহনবাবুর তনু-মন যে শ্রীরামকৃষ্ণ পদে নিবেদিত ছিল তা বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়

## (৭) শ্রীকালীপদ ঘোষ (দানা কালী)

শ্রীচৈতন্যলীলায় জগাই-মাধাই উদ্ধার এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী। অনুরূপ শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় গিরিশ-কালীপদ প্রসঙ্গ এবং তাঁদের পরিবর্তন ভক্তমণ্ডলীর কাছে এক আকর্ষণীয় সুন্দর ঘটনা। দুর্দান্ত মদ্যপ এবং দুশ্চরিত্র গিরিশ-কালীপদর

৫৫ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা ঃ পৃঃ ৩৭৬
৫৬ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, (১ম সংস্করণ) পৃঃ ৪৯-৫০
৫৭ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, (২য় ভাগ) পৃঃ ৩৭৮
৫৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি পরবর্তিকালে তাঁদের অমর করে রেখেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যত মানুষ, যত ভক্ত, যত আর্ত তাঁর কাছে এসেছেন তাঁরা প্রার্থনা করেছেন আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, কৃপা, মুক্তি ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায় কালীপদ ঘোষের ক্ষেত্রে। তিনি যা নিয়ে দিনরাত থাকতেন 'সুরা ও নারী' তাই তিনি প্রার্থনা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

গিরিশচন্দ্র কালীপদকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে প্রথম আনেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী লাটু মহারাজ বলছেন, "একদিন রাতে গিরিশবাবু দানাকালীকে (শ্রীকালীপদ ঘোষ) দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন।"[৫৯] "পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে তাই ঠাকুর দানাকালীকে বললেন,—'বৌটাকে বার বছর ভুগিয়ে তবে এখানে এলে।' একথা শুনে দানাকালী চমকে গেল, কুছু বললে না। তাই দেখে উনি বললেন, 'তোমার কি চাই বল না গো?' দানাকালী এমন ছ্যাঁচড় যে ওনার সামনে বললে, 'একটু মদ দিতে পারেন?'"[৬০] পরম করুণাময় ঠাকুর ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে বললেন, "তা দিতে পারি। তবে এখানকার মদে বড্ড নেশা হয়, তুমি সইতে পারবে না।…দানাকালী কি ভাবলে, পরে তাকে বলতে শুনলুম, 'সেই মদ আমায় দিন, যা পেলে আমি সারা জীবন নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবো।' একথা বলার পর ঠাকুর তাঁকে ছুঁয়ে দিলেন। তাঁর পরশ পেয়ে দানাকালীর কি কান্না। সবাই মিলে তাঁকে চুপ করাতে পারিনি।"[৬১]

এই ঘটনার পর অন্য একদিন তিনি এক অপূর্ব আকর্ষণে কলকাতা থেকে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ঠাকুরও তাকে পেয়ে কলকাতা যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নৌকায় কলকাতা গমনের পথে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কালীপদর জিহ্বায় কি লিখে দেন। যা পরবর্তিকালে তাঁর রসনায় স্বতই উচ্চারিত হত।

কালীপদর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন একটি উক্তিতে বোঝা যায়।

(ঠাকুর) একজন ভক্তকে জপের কথা বলিতেছেন, "জপ করা কিনা নির্জনে, নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে জপ করতে করতে তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়।…

কালীপদ (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি)—আমাদের এ খুব ঠাকুর। জপ, ধ্যান, তপস্যা করতে হয় না।"[৬২]

ঠাকুরের সহজ কথায় কত শক্ত-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় কালীপদ মুগ্ধ।

কালীপদ ঘোষের গৃহের একটি ঘরে কয়েকটি দেবদেবীর ছবির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি টাঙ্গানো ছিল। ঠাকুরের কোন একজন ভক্ত ঐ ছবিগুলি দর্শন করে কালীপদকে জিজ্ঞাসা করেন, "শ্রীশ্রীমায়ের ছবি কই?" কালীপদ শ্রদ্ধায় সঙ্গে করযোড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিটি দেখিয়ে উত্তর দিলেন, "উনিই আমার মা, আবার উনিই আমার বাবা।"[৬৩] শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি কালীপদ ঘোষের এই উক্তি ও শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন দেখে একথাই স্মরণ হয় যে, তাঁর মনে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর বিশেষ কোন চিন্তা ছিল না। কর্মজীবনের উন্নতির মূলে যে ঠাকুরের আশীর্বাদ ছিল একথা তিনি দৃঢ়ভাবে

৫৯ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা : শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : উদ্বোধন কার্যালয়, কলি : (৩য় সংস্করণ) পৃঃ ১১৫

৬০ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা, পৃঃ ১১৬ ৬১ ঐ, পৃঃ ১১৬

৬২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২৮।১

৬৩ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ (১ম সংস্করণ), উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২৭৬

বিশ্বাস করতেন। সেজন্য দেখা যায়, বিলাতী কোম্পানীতে চাকরি করেও কর্মজীবনে তিনি তাঁর বিভিন্ন শাখা অফিসে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রাখতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম প্রচারের ক্ষেত্রেও কালীপদ সাধ্যমত সহযোগিতা করেছিলেন। এ সম্পর্কে জানা যায়, "ইংরাজী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রভুর আদেশে, নরেন্দ্রনাথ এবং গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে মনোমোহন, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও কালীপদ ঘোষের অর্থ সাহায্যে 'তত্ত্ব-মঞ্জুরী' নাম্নী মাসিক পত্রিকা রামচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল।"[৬৪] ঐ গ্রন্থে আরও জানা যায়, "…শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারকার্য রামচন্দ্রের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের প্রচার কার্যে মনোমোহন, কালীপদ-ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা) এবং নাট্য রসিক অমৃতলাল বসু মহাশয় যথাসাধ্য সহায়তা করিতেন।"[৬৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপ কালীপদ ঘোষ রচনা করেছিলেন কিছু গান যা পরবর্তিকালে যোগড্যান থেকে 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীত' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জানা যায় কোন এক সময় কালীপদ ঘোষ একটি গান রচনা করে মনোমোহন মিত্রকে শুনিয়েছিলেন,—

এবার হরে কৃষ্ণ সার এবার নামই অবতার,
নামেই উদয় হয়েছেন তারকব্রহ্ম সনাতন।

"গানখানি শুনিয়াই মনোমোহন উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠেন—You have hit the right point—তুমি ঠিক বুঝেছো, এবার নামই অবতার। একথা তোমার নয় জানবে, তোমার মুখ দিয়ে ঠাকুর একথা বলিয়েছেন।"[৬৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিলাভের পর দেখা যেত যে, গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ ঠাকুরের ছবির সামনে নীরবে দীর্ঘকাল বসে থাকতেন। তাঁরা যেন পরম করুণাময় ঠাকুরের দর্শনের জন্য মৌন প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

কালীপদ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে এবং ঠাকুরের ত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানদের সাধ্যমত সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন। কার্যোপলক্ষে যখন তিনি বোম্বাই শহরে অবস্থান করতেন তখন তীর্থদর্শনে ঠাকুরের সন্তানরা প্রায় তাঁর গৃহে অতিথি হতেন। তাঁদের সেবা, ঠাকুরেই সেবা এইরূপ মনোভাব নিয়ে কালীপদ তাঁদের সেবা-যত্ন করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সেবক লাটু মহারাজকে কালীপদ ঘোষ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর অসুখের সময় লাটু মহারাজ বলেছিলেন, "দেখো, হামাকে এখন মাসে মাসে টাকা না দিলেও চলবে। হামি সন্ন্যাসী মানুষ। হামাকে তুমি তিলের তেল মাখাবে, দুধ খাওয়াবে। হামার মত সাধু-সন্ন্যাসীর কি এ সব ল্যাস্করী (Luxury) করতে আছে।" এইকথা শুনিয়া দানা কালী বলিয়াছিলেন, "ভাই, ঠাকুরের আশীর্বাদে আমার কিছুরই অভাব নাই। তোমাদের সেবায় দু'চার টাকা লাগে, তা থেকে বঞ্চিত করলে ঠাকুর যে রাগ করবেন।"[৬৭] এই আলোচনায় বোঝা যায় কালীপদ ঘোষের মানসিক পরিবর্তন এবং রামকৃষ্ণগত প্রাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে, এই জন্মে তিনি যে সব কু-কর্ম করেছেন তাতে তাঁর নরকবাস অবধারিত। কিন্তু করুণাময় ঠাকুর যদি তাঁকে কৃপা করেন তবেই

৬৪ ভক্ত মনোমোহন: উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃঃ ১৫২ ৬৫ ঐ, পৃঃ ১৭৮
৬৬ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ২২০
৬৭ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩১৫-৩১৬

মুক্তিলাভ সম্ভব। এতই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঠাকুরের উপর।

একটি ঘটনায় কালীপদ ঘোষের আর্তি ও শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণার কথা জানা যায়,—

"একদিন ঠাকুর দানাকালীকে বললেন,—'তোমার কি ইচ্ছা বল না, শুনি।' দানাকালী কুছু চাইলে না, শুধু বললে,—'শেষের দিন আপুনি আমার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। এই হোলেই যথেষ্ট।'"[৬৮]

প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনে লাটু মহারাজ বলছেন, "দেখো, শেষের দিনে সত্যি তিনি (ঠাকুর) এসেছিলেন। তাঁর হাত ধরে পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেছিলেন। বাবুরাম ভাই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি যাকে যা বলে গেলেন সব ঠিক ফলেছে।"[৬৯]

## (৮) শ্রীনবগোপাল ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত নবগোপাল ঘোষকে ঠাকুরের সান্নিধ্যে প্রথম আনেন কিশোরী মোহন রায় (বিটল বামুন)। প্রথম দর্শনে ঠাকুর তাঁর নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে তাঁকে নিত্য নামকীর্তন করতে বলেন। পরমপুরুষের এই অমূল্য উপদেশ স্মরণ করে নবগোপালবাবু পরিবারের সকলকে নিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য কীর্তন করতেন।

ইতিমধ্যে তিন বছর কেটে গেছে। এই সময় হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁর ডাক আসে। নবগোপালবাবু অবাক হয়ে যান এই কথা ভেবে যে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অবতারকল্প পুরুষ তাঁর মতো একজন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে মনে রেখেছেন। এ তাঁর পরম কৃপা। তিনি যান দক্ষিণেশ্বরে, দেখা করেন পরমপুরুষের সঙ্গে। দীর্ঘ তিন বছর নাম সংকীর্তন নিয়ে ছিলেন শুনে ঠাকুর অত্যন্ত প্রীত হয়ে বলেন, আর বেশি সাধন করতে হবে না। এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) বার তিনেক যাতায়াত করলেই তিনি ভক্তিমার্গের উচ্চ অবস্থা লাভ করবেন।

দ্বিতীয় দর্শনে নবগোপালবাবুর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। এই সাক্ষাতের পর তিনি প্রায় সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। সময় পেলেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুআরি কল্পতরুর দিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর একান্ত ভক্তকে কৃপা করে বলেন, "আচ্ছা, আমার নাম একটু করতে পারবে তো?"

নবগোপালবাবু সানন্দে বলেছিলেন, 'খুব পারবো।'

ঠাকুরের অভয় উক্তি—"তা হলেই হবে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"

এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা লাভ করে তিনি অবশিষ্ট জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ নামে মগ্ন থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নাম তাঁর কাছে মন্ত্রবৎ ছিল। এই কারণে তিনি কলকাতার বাদুড় বাগানের বাড়ি ছেড়ে হাওড়ায় প্রভুর নামাঙ্কিত পল্লী 'রামকৃষ্ণপুরে' বাড়ি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তিকালে ঐ গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পট প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করে গেছেন। ভাগ্যবান নবগোপালবাবুর বাড়িতে পট প্রতিষ্ঠা করেন স্বামীজী স্বয়ং এবং তিনি ঐ গৃহে বসেই বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র রচনা করেন।

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ও তাঁর কৃপায় নবগোপালবাবুর ঐহিক বন্ধন ছিন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে জানা

৬৮ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩২৫
৬৯ ঐ, পৃঃ ৩২৫

যায়, কোন এক সময় তাঁর এক বিবাহিত কন্যার মৃত্যুতে সংসারের সকলেই যখন শোকাভিভূত তখন তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, "সবই তাঁর (ঠাকুরের) ইচ্ছা, এতে দুঃখ করবার কিছু নেই।"[৭০] তাঁর মৃত্যুকালেও তিনি পরিবারের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, "তোমরা দুঃখ করো না। দেহের নাশ আছেই। আমি কর্তা নই, ঠাকুরই কর্তা। আমরা তাঁর সন্তান তিনি তোমাদের দেখবেন। তোমরা শোক ছেড়ে তাঁর নাম কর।"[৭১] অন্তিমকালেও নবগোপাল-বাবুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ শরণাগতি লক্ষ্য করা যায়।

## (৯) শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্ভবতঃ প্রথম দর্শন করেন অধরলাল সেনের বাড়িতে।[৭২] প্রথম দর্শনে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। অন্যান্য ভক্তদের ন্যায় উপেনবাবু ঠাকুরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাইলেও দরিদ্রতাবশতঃ সব সময় সে কাজ সম্ভব হত না। উপেনবাবু দরিদ্র হলেও ঠাকুরের উৎসবে বিভিন্ন স্থানে যেতেন এবং সুযোগ হলেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করতেন।

কঠোর দারিদ্র্যের কশাঘাতে তিনি একদিন ঠাকুরের কাছে অর্থ প্রার্থনা করেন, এবং ঠাকুরও তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।[৭৩] শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মিথ্যা হবার নয়। পরবর্তিকালে উপেনবাবুর আর্থিক সচ্ছলতা আসে। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অবিচলিত ছিল তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকটকালে অর্থের সাহায্যে ঠাকুরের উৎসব করতে পারেননি, পরবর্তিকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও সন্ন্যাসী সন্তানদের প্রভূত সাহায্য করেছেন।

উপেনবাবুর নীরব সেবা সম্পর্কে স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখছেন, "ঠাকুরের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে স্বামীজী প্রমুখ আমরা কয়জন গুরুভাই যখন অনাথ অসহায় অবস্থায় ব্যাকুলচিত্তে বরাহনগর মঠ হইতে কোনদিন কাঁকুড়গাছি পর্য্যন্ত গিয়া, 'ওয়া গুরুজী কী ফতে' শ্রীগুরুর এই জয়ধ্বনি করিতে করিতে ঠাকুরের গৃহীভক্তগণের বাড়ি বাড়ি গিয়া রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্ষুধাতুর অবস্থায় উপেন্দ্রের সেই ছোট দোকানটিতে পৌঁছিতাম, উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক চাঙাড়ী নানা প্রকারের খাবার ও দোনা দোনা পান খাওয়াইয়া আমাদের তাজা করিয়া দিত। বিডন গার্ডেনের ধারে ছ্যাক্‌রা গাড়ীর আড্ডা ছিল। গাড়োয়ানরা বরানগর, কাশীপুর চার পয়সা বলিয়া হাঁকিত। ভাড়া দিয়া উপেন্দ্র আমাদের সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিত। এইরূপে কতদিন যে সে আমাদের খাওয়াইয়া বরানগরের গাড়িতে চাপাইয়া দিত, তাহা বলা যায় না।"[৭৪]

এই প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মশায় লিখছেন,

৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, (২য় ভাগ) পৃঃ ৩৭৪

৭১ ঐ, পৃঃ ৩৭৪

৭২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, (২য় ভাগ), পৃঃ ৩৬৮

৭৩ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের) অত্যন্ত গরীব অবস্থায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন, 'তোর অর্থ হবে।' —আমার জীবন কথা : স্বামী অভেদানন্দ (২য় পুনর্মুদ্রণ) পৃঃ ৮৪

৭৪ স্মৃতিকথা : স্বামী অখণ্ডানন্দ (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ১৭৫

"শ্রীবৃদ্ধির পর যতদিন জীবিত, উপেন ততদিন প্রভু ও তাঁর সন্তানদের সেবা করেছেন।"[৭৫]

পরবর্তিকালে উপেনবাবু তার গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব পালন এবং ভক্ত সেবা করে ঠাকুরের প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। জীবনে সফলতা অর্জন করে উপেনবাবু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন তাঁর উন্নতির মূলে ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা ও আশীর্বাদ।

### (১০) ছোট নরেন

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাঙ্গনে পুরুষ-মহিলা ভক্ত ছাড়াও ছোকরা ভক্তদের যাতায়াত ছিল। বিভিন্ন ছোকরা ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর ছোট নরেন ও পূর্ণকে শুদ্ধাত্মা পুরুষ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। পরমহংসদেব যে তিনজনকে পুরুষের সত্তা বলে ভক্তদের বলতেন ছোট নরেন তাঁদেরই একজন, অন্য দুজন নরেন্দ্র ও পূর্ণ। ছোট নরেনের পুরুষ-ভাব তাই মন লীন হয়ে যায়; ভাবাদি নাই।[৭৬]

ছোট নরেন সম্পর্কে ঠাকুর আরও বলছেন, "খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।"[৭৭] ওর খুব উচ্চ অবস্থা; যদি কামিনীকাঞ্চনে ছোব না ছায় (দংশায়), তাহলে এ একজন মহাযোগী হবে।[৭৮] সমাধিস্থ অবস্থায় যে কজন শুদ্ধাত্মাপুরুষ ঠাকুরকে স্পর্শ করতে পারতেন ছোট নরেন তাদেরই একজন।[৭৯]

বিদ্যালয়ে পাঠরত বালক ছোট নরেনকে মাস্টারমশাই ঠাকুরের সান্নিধ্যে আনেন। ছেলে মানুষ, ঠাকুরকে তার বোঝবার ক্ষমতাই বা কতটুকু। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে তাই আসে। শ্রদ্ধা ও সেবা দিয়েই বন্দনা করেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে।

কথামৃত বা অন্যান্য প্রামাণিক পুস্তকে ছোট নরেন প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, তাঁর জন্য ঠাকুরের কী ব্যাকুলতা! তাঁর সম্পর্কে প্রশস্তি করেছেন ভক্তদের কাছে। ছোট নরেনের সান্নিধ্য যেন দেব-পুরুষের চঞ্চল মনে আনে স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও সমাহিত ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন উক্তি না পাওয়া গেলেও তার সান্নিধ্য ঠাকুরকে যে কত উৎফুল্ল করত কয়েকটি দৃষ্টান্তই তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তির প্রকৃত উদাহরণ।

বালক ভক্তেরা এলেই ঠাকুর আনন্দে বিহ্বল হয়ে যেতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ছোট নরেন এসেছেন। ঠাকুর তাঁর দিকে একদৃষ্টে দেখছেন। দেখতে দেখতে সমাধিস্থ। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মাস্টারমশাই লিখছেন,—"শুধাত্মা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাধিচিত্র দেখিতেছেন।...কিয়ৎপরে সমাধি ভঙ্গ হইল।...ক্রমে বহির্জগতে মন আসিতেছে। ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন।...(ছোট নরেনের প্রতি)—'তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলাম। তোর হবে। আচ্ছা আসিস্ এক একবার—আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস্? জ্ঞান, না ভক্তি?'

ছোট নরেন,—'শুধু ভক্তি'...।"[৮০]

ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন এলেই শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তার সাধ্যমত কিছু কিছু সেবা

৭৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, (২য় সংস্করণ) পৃঃ ৩৫৩

৭৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।২৩।১ ৭৭ ঐ, ১।১৪।১

৭৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৩৩৪

৭৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২৩।৫

৮০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৩।১২।২

করতেন। একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে এসে ঠাকুর মাস্টার মশাইকে বলছেন, "ছোট নরেনের জন্য আর বাবুরামের জন্য এলাম।"[৮১] খবর পাঠানো হল। ছোট নরেন এসেছেন। ঠাকুর মুখ ধুতে যাচ্ছেন। অমনি ছোট নরেন গামছা নিয়ে ঠাকুরকে জল দিতে গেলেন। আবার পশ্চিমের বারান্দার উত্তর কোণে ছোট নরেন ঠাকুরের পা ধুয়ে দিচ্ছেন।[৮২]

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ছোট নরেনের আজীবন ছিল। কর্মজীবনে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নী হন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলরামবাবুর বাড়িতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে ভক্তদের উপস্থিতিতে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ঐ সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ (Secretary) হয়েছিলেন ছোট নরেন—বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র আবার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন মিশন রেজেষ্ট্রী হয় তখনও ছোট নরেন প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তিকালে মিশনের যখনই কোন আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ বা সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করেই তিনি এই সব কাজ করেছেন। বালকাবস্থায় তিনি ঠাকুরকে সম্যক্‌রূপে বুঝতে পারেননি বলেই বোধ হয় পরবর্তিকালে নিঃস্বার্থভাবে রামকৃষ্ণ মিশনকে সেবা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

## উপসংহার

অবতারগণ তাঁদের চিহ্নিত পার্ষদবৃন্দের দ্বারা নরলীলায় সম্যক্‌ভাবে পুষ্টিলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ত্যলীলার অন্যান্য পার্ষদ ছাড়াও উপরি-আলোচিত দশজন গৃহীভক্তেরও এক একটা ভূমিকা ছিল। তাঁদের সুখ-দুঃখের জীবনে করুণাময় ঠাকুর অন্ধকারের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট আলোর পথরেখা দেখিয়েছিলেন। সেই পথ অনুসরণ করেই তাঁরা ইহজীবনে মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণায় চির-কৃতজ্ঞ এবং তাঁর প্রতি একান্ত শরণাগত।

৮১ ঐ, ৩।১৩।১ ৮২ ঐ, ৩।১৩।১

৮৩ History of Ramakrishna Math & Mission : Swami Gambhirananda, 1st Edition (1957), Page 121 এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (১৩৮৩), পৃঃ ৫৭

আমাদেরই মতো দেহবান্‌ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলে নির্দেশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এ-সব বলে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে বল্‌ না, ভাব্‌ না—মহাপুরুষ বল্‌, ব্রহ্মজ্ঞ বল, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মতো এমন পুরুষোত্তম জগতে এর আগে আর কখনও আসেননি। সংসারে ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভ-স্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# সূত্রপিটক ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ডক্টর অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের বাণীগুলির সংকলন তিনটি পিটকে বিভক্ত। এগুলি ত্রিপিটক নামে খ্যাত। সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম—এই তিন পিটকের মধ্যে সূত্র-পিটকে লিপিবদ্ধ হয়েছে বুদ্ধদেবের উপদেশ, ভাষণ ও শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথন। সূত্র-পিটক আবার পাঁচটি নিকায় বিভক্ত যথা—দীর্ঘ, মজ্‌ঝিম্, সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক।

বুদ্ধদেবও যীশু কিংবা আধুনিক যুগের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তাঁর শিষ্যদের কাহিনীর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। অনেক কঠিন তত্ত্ব সহজ ও সুন্দর উপমার মোড়কে সাধারণজনকে উপহার দিয়েছেন।

বুদ্ধদেব চারটি আর্যসত্যের কথা বলেছেন। মানব জীবন দুঃখময়; দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার উপায় আছে, দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন, সংসারে জীবের দুঃখ আছেই। দুঃখের কারণ হল কামকাঞ্চনের প্রতি আসক্তি ও অহংবোধ। মুক্তির উপায় হল এসব ত্যাগ। সংসারী জীবের ভয়ের কারণ নেই, প্রতিটি জীবেরই মুক্ত হবে। সে-কারণে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি চাই। ভরসা দুই অবতারই দিয়েছেন। অবতারের কথা মিথ্যা হয় না।

ইচ্ছা বা বাসনাই হল দুঃখের আদি কারণ। প্রতিটি ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জীবকে জন্ম-গ্রহণ করতে হয় আর সংসারের দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। সে-কারণে বাসনাহীন হতে হবে। মৃত্যুর প্রাক্কালে একটি মাত্র ইচ্ছাই বা বাসনা মানুষ রাখতে পারে, তা হল ব্রহ্মপদ দর্শন। তাঁকে পাওয়া, তাঁর অসীম সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া—এ বাসনা শুদ্ধ বাসনা। এ কখনও কামনার মধ্যে পড়ে না; যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে পড়ে না, হিংচে শাকের মধ্যে পড়ে না।

বুদ্ধদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ দুই মহাপুরুষই সোজা-সুজি বলেছেন—ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান। যে বা যারা তাঁকে জানতে পারেনি তারা অজ্ঞ বা মূর্খ। অজ্ঞ মানুষের অশান্তির মূলে আছে তার অহংকার। বুদ্ধদেব (ধম্মপদ, ১৬) বললেন—

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে।
যে চ তত্থ বিজানন্তি, ততো সম্মন্তি মেধগা॥

—মূর্খেরা জানে না যে তারা চিরকাল এ সংসারে থাকবে না। যাঁরা জানেন তাঁদের সব কলহের শান্তি হয়।

অহং-ভাব থেকে মানুষের ধারণা হয় যে পৃথিবীটা কেবল তারই, আর কারও নয়। অন্য সবাই একদিন এখান থেকে বিদায় নিলেও সে ঠিক পৃথিবীর অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে। এই মিথ্যা বোধ থেকে কত না কলহ, বিবাদ, মারা-মারি, কাটাকাটি! কিন্তু প্রতিদিনের উদাহরণ থেকেও সে বুঝতে চায় না জীবন নশ্বর, আয়ু কত অস্থির। যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির কতকাল আগে বলে গেছেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥

—প্রতিদিনই অসংখ্য প্রাণী মারা যায়। কিন্তু যারা বেঁচে আছে, তারা এগুলি দেখেও মনে করছে, চিরদিন তারা বেঁচে থাকবে—এর চেয়ে আশ্চর্যজনক জিনিস আর কি আছে!

বুদ্ধদেব বলেছেন দুঃখের কারণ আছে। কারণটি কি? কারণ হল 'আমার' বোধ। সেটি কেমন?

পুত্ত'ম্‌থি ধন'ম্‌থি ইতি বালো বিহঞ্‌ঞতি।
অত্তাহি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো
ধনং॥ (ধম্মপদ, ৫।৬২)

—আমার পুত্র, আমার ধন—এই চিন্তা করে অজ্ঞলোক দুঃখ ডেকে আনে। সে নিজেই যখন তার নিজের নয়, তখন পুত্র বা ধন কি করে তার নিজের হবে? এসব না পেলে দুঃখ, পেলেও দুঃখ কম নয়। কিছু পাওয়া মানুষকে অধিকতর পাওয়ার জন্য চঞ্চল করে তোলে। সে তখন মরীচিকার পিছনে ছুটে নিজের বিপদ ডেকে আনে।

বেদান্তদর্শনে একেই মায়া বলা হয়েছে। ঠাকুর বলেছেন, কামিনীকাঞ্চনই মায়া। আত্মীয়ে মমতা, বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী পুত্রের প্রতি ভালবাসা, যা কিছু দেখা, শোনা ও চিন্তা করা যায় তা সবই মায়া।

'আমি' বোধই দুঃখের কারণ। আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। "'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান। 'আমি কর্তা' আর আমার এই 'সব' স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম, এভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। ...এসব অভিমান, 'কাঁচা আমি'—এইটি ত্যাগ কর।" (কথামৃত, ১।৬।২) অহঙ্কারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। অহঙ্কার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হতে হয়। "যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নেই।" (কথামৃত, ২।৩।৩) বাইবেলও (রামানস, ১।২২) সেই কথা বলে—"Professing themselves to be wise they become fools"—ঈশ্বরের চিন্তা বাদ দিয়ে তারা নিজেরা নিজেদের বিজ্ঞ মনে করতে লাগল, ফলে তারা বড়ই অজ্ঞ হয়ে পড়ল।

জ্ঞানের অভাব আছে এই বোধ থাকলেই জ্ঞান লাভ করার আগ্রহ জন্মাবে। কিন্তু প্রকৃত অন্তঃসারশূন্য নিজেকে মহাপণ্ডিত বলে মনে করে। তার পক্ষে কোনদিনই জ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ সে ঈশ্বরকে জানতে পারে না। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ—যারা অবিদ্যা-পরিবেষ্টিত হয়ে নিজেদের প্রজ্ঞাবান ও পণ্ডিতং মন্যমানাঃ—শাস্ত্রকুশল বলে অভিমান-অহঙ্কার করে, তারা ঈশ্বরকে জানতে পারে না। অহঙ্কার তো ত্যাগ করতেই হবে। পার্থিব ভোগ যা কিছু আছে সে-সব ত্যাগ করতে হবে। এ হল সনাতন সত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, প্রভু বুদ্ধ বলেছেন, আবার বর্তমান যুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন।

গীতা কথার অর্থ জান? গীতা গীতা দশবার বলতে গেলে ত্যাগী ত্যাগী হয়ে যায়। গীতার শিক্ষা—হে জীব সব ত্যাগ করে শুধু ভগবান লাভের চেষ্টা কর। ত্যাগেই শান্তি। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।" ত্যাগের মাধ্যমে ভোগের শান্তি। শুনতে আপাত অসম্ভব বা Paradoxical হলেও, ইহা ঘটনা। সংযম বা বিষয়ভোগে সংযত জীবন হল প্রকৃত সুখের চাবিকাঠি। চিত্তকে বিষয়ের বাসনা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ত্যাগ, লোক দেখান হলে চলবে না। সম্পূর্ণ ত্যাগ চাই। ঠাকুর উপমা দিলেন (কথামৃত, ৪।১২।২)—"একজনের পরিবার বল্লে, 'অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হলো না!' যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোল জন স্ত্রী,—এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।"

"সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা, —বল্লে 'ক্ষেপী সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না, একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ করতে পারবো। এই দেখ,—আমি চল্লুম!'" আগে মনে রঙ ধরবে, বৈরাগ্যের রঙ; তার রঙেই মা সন্ন্যাসীর বসনে লাগবে গৈরিক ছোপ। বুদ্ধদেব (ধম্মপদ, ১।৯) বলছেন—

অনিক্কসাবো কাসাবং যো বখং
পরিদহেস্ সতি।
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি॥

কাম আসক্তিতে যার হৃদয় মলিন সে কাষায় বস্ত্র পরবার যোগ্য নয়।

মনটাই সব। মানুষের সুখ-দুঃখের প্রকৃত কারণ হচ্ছে তার মন। মন যদি বশে থাকে, ঠিক পথে চলে তবে চতুর্বর্গ করতলে।

তথাগত ( ধম্মপদ, ১।২ ) বললেন—

মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী।

—প্রসন্ন মনে যিনি কথা বলেন বা কাজ করেন সুখ তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

এবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আসা যাক। ঠাকুর বলেছেন—মনটা স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ, যোগী মনের বশ নয়। কর্তাভজারা মন্ত্র দেবার সময় বলে—এখন মন তোর। অর্থাৎ এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর করছে।

চঞ্চল চিত্তকে সংযত করা কঠিন। 'আমি' বোধ বা অহঙ্কার ত্যাগ করা শক্ত। এই মুহূর্তে 'আমি'কে দূর করা গেল, অচঞ্চল চিত্ত নিয়ে ধ্যানের জন্য প্রস্তুত হল, পর মুহূর্তেই দেখা গেল মন অন্য কোথাও চলে গেছে। শাক্যসিংহ শোনালেন ( ধম্মপদ ২৪।৫ )—

যথাপি মূলে অনুপাদবে দলহে ছিন্নো'পি
রুক্খো পুনরেব রূহতি।
এবম্পি তণ্হানুসয়ে অনূহতে
নির্‌বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং।

—যেরূপ মূল অখণ্ড ও দৃঢ় থাকলে ছিন্ন গাছও আবার গজিয়ে ওঠে সেরূপ তৃষ্ণারূপ আসক্তির মূল ছিন্ন না হলে বরাবর দুঃখের আবির্ভাব ঘটে।

বুদ্ধদেব আরও বললেন ( ধম্মপদ, ২৪।১ ):

মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্ঢতি
মালুবা বিয়,

—প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণা মালুবলতার ন্যায় বৃদ্ধি পায়।

এমতাবস্থায় কি করা যেতে পারে? নিদান হল মূলোৎপাটন। তৃষ্ণা স্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, আর তৃষ্ণালতা সর্বত্র অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। সেই লতাকে জন্মাতে দেখে প্রজ্ঞাবলে তার মূলোৎপাটন কর।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ( কথামৃত, ১।৪।৬ ) —ঐ যে 'আমি' টে, ওটাতেই বড় মুস্কিলের ব্যাপার। শালার 'আমি' কি যাবেই না। এই পোড়ো বাড়ি, অশ্বত্থ গাছ উঠেছে, খুঁড়ে ফেলে দাও, আবার পরদিন দেখে এক ফেকড়ী গজিয়েছে।

জগতে যেমন দুঃখ আছে, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার তেমন উপায়ও আছে। অন্যতম উপায়টি হল, সাধু সঙ্গ।

বুদ্ধদেব ( ধম্মপদ, ৫.৬৫ ) বললেন—

মুহুত্তমপি চে বিঞ্‌ঞু পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি,
খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিব্হা সূপরসং যথা।

—জিহ্বা যেমন মুহূর্তেই সূপরসের স্বাদ বুঝতে পারে তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্পকাল পণ্ডিতের সঙ্গে থাকলেই ধর্ম কি তা উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তার সরকারকে বলছেন— সাধু সঙ্গ সর্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন সেইরূপ করতে হয়। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করলে মনের উন্নতি হয় মন ঈশ্বর-মুখী হয়। অশান্ত বিষয়দগ্ধ মন সাধুসঙ্গে শীতল হয়। শীতলম্ সাধু সঙ্গেযু।

মারজিৎ আবার শোনালেন ( ধম্মপদ, ২৫। ৩৬৭ )—সব্বসো নামরূপস্মিং যস্স নত্থি মমায়িতং, অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্খূ'তি বুচ্চতি॥

—নামরূপময় সকল বস্তুতে যাঁর মমত্ববোধ নেই, এদের অভাবে যিনি শোক করেন না তিনিই ভিক্ষু নামে পরিচিত।

ঠাকুর সাধুর লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। সাধু সঞ্চয় করে না, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে তিনিই সাধু। সাধুর সঙ্গ করলে সাধুর সত্তা লাভ হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। শুনেছ, কুমুরে পোকা চিন্তা করে আরশুলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়। যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে সেরূপ স্বভাব হয়ে যাবে। যে যাকে চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। শিবপূজা করে শিবের সত্তা পায়।

বুদ্ধদেব বলেছেন ( ধম্মপদ, ১।১ )—

মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চ পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা॥

—বস্তুসমূহের গুণরাজি মনেরই আরোপিত, মনেই তাদের অবস্থিতি মন দিয়েই তারা নির্মিত। আমরা যেমন ভাবি, সেইরূপ হই। মানুষকে তার ফল ভোগ করতেই হবে। পাপের ফল নিতেই হবে; এ জন্মে না হোক পর জন্মে, পাপ করলেই তার ফল ভোগ করতেই হবে। ন হি পাপং কতং কম্মং সজ্জুখীরং'ব মুচ্চতি। ( ধম্মপদ, ৫।৭১ ) সদ্য দোহা দুধ যেমন শীঘ্র নষ্ট হয় না, তেমনি কৃত পাপ কর্মের ফল শীঘ্র নিঃশেষ হয় না।

কথামৃতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবু সম্পর্কে এই ধরনের কথাই বলেছেন। মথুরবাবুর দীর্ঘ দিন রোগে ভোগার কারণ, কম বয়সে তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন যা ভাল নয়। পারা খেলে তার ঘা বার হবেই।

বুদ্ধ বলতে বুঝি, অহিংসার দেবতা। হিংসা না করার শিক্ষাই তিনি সারা জীবন প্রচার করেছিলেন। অহিংসাই ধর্ম। সকলের প্রতি বিদ্বেষহীন, মিত্রভাব পোষণ করার কথা তথাগতের কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। এটি চিরন্তন সত্য।

অককোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং
অহাসি মে।
যে চ তং উপনযহন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥

যার মনে বিদ্বেষের ভাব প্রবল তার শান্তি সুদূর পরাহত। 'আমার প্রতি আক্রোশ করল, আমায় মেরে ফেলল, আমাকে অন্যায়ভাবে হারাল, আমারটা ছিনিয়ে নিল' সব সময়ই যাদের এই চিন্তা তাদের মন থেকে বৈরভাব কখনও দূর হয় না। এই চিন্তা যাঁরা মনে স্থান দেন না, তাঁদের বৈরভাব দূর হয়ে যায় মনে শান্তি আসে।

ঠাকুর বলেছেন—ঝগড়া বিবাদের ভেতর থেকো না, কারুর নিন্দা করো না। পরচর্চা পরনিন্দা তাঁর ( ঈশ্বর ) চক্ষে অপবিত্র। বুদ্ধও বলছেন ( ধর্ম্মপদ, ৪।৫০ ):

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,
অত্তনো'ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ।

অপরের কর্কশ কথায় কান দেবার প্রয়োজন নেই। অপরে কি করেছে বা করেনি তাও দেখবার দরকার নেই। নিজের কাজ কি করা হয়েছে আর হয়নি সেটাই দেখা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আমরা এই ধরনের কথাই পড়ি। যখন বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশবে তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে, বিদ্বেষ আর রাখবে না। ঠাকুর প্রতাপ হাজরাকে বলেছেন—"আর কি বলবো তোমায়? তবে এই বলা যে আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকো না। অপরের দোষ দেখো না।"

চতুরতার প্রশংসা করা যায় না। সহজ সরল নিষ্পাপ মনে চতুরতার স্থান নেই। কাক চতুর কিন্তু সে মানুষের অপ্রিয় জীব। বুদ্ধদেব এই প্রসঙ্গে বললেন ( ধম্মপদ, ১৮।২৪৪ ):

সুজীবং অহিরিকেন কাকসূরেন ধ্বংসিনা,
পক্খন্দিনা নগব্‌ভেন মঙ্‌কিলিট্‌ঠেন জীবিতং।

যে খাদ্য সংগ্রহে নির্লজ্জ কাকের ন্যায় ধূর্ত, পরের অনিষ্টে রত—দাম্ভিক, প্রগল্‌ভ এবং পাপ চরিত্র তার পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ সহজ। কিন্তু যিনি শুচিসম্পন্ন, অনাসক্ত, অপ্রগল্‌ভ এবং শুদ্ধ, জীবনকে যিনি আদর্শ জ্ঞান করেন, এরূপ ব্যক্তির জীবন কষ্টে কাটে।

চতুরতার নিন্দা করে ঠাকুর বলেছেন—যদুর বাড়িতে মল্লিক এসেছিল। বড় চতুর আর শঠ, চক্ষু দেখে বুঝতে পাল্লাম! চক্ষুর দিকে তাকিয়ে বল্লাম—চতুর হওয়া ভাল নয়। কাক বড় সেয়ানা, চতুর, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে।

যে দেহের প্রতি এত আকর্ষণ এত মোহ তাহা নিতান্তই মূল্যহীন। পঞ্চভূতের সমন্বয়ে গঠিত এই শরীর থেকে প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেলে আর কোন মূল্যই থাকে না।

অট্‌ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং।
যত্থ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্‌খো চ ওহিতো॥
(ধম্মপদ, ১১।১৫০)

—দেহ যেন অস্থির দ্বারা তৈরি এক নগর যার বাইরের দিকে রক্তমাংসের প্রলেপ। এই নগরের মধ্যে অবস্থান করছে জরা, মৃত্যু, অভিমান আর কাপট্য।

অনুরূপ কথা শুনি ঠাকুরের মুখে।—এই দেখ টাকাতেই বা কি আছে আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে। বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড় মাংস, চর্বি মলমূত্র এই সব আছে।

ঈশ্বর সৎ, সত্য ও শাশ্বত। বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন নররূপী নারায়ণ। দুই মহাপুরুষ দুই যুগে জন্মালেও কাল কোন ব্যবধান রচনা করতে পারেনি। হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ যা বলেছেন তারই প্রতিধ্বনি শুনি অবতারবরিষ্ঠ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে।

# রামহৃদয়ম্

শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

কৈলাসাগ্রে কদাচিদ্রবিশতবিমলে
　　মন্দিরে রত্নপীঠে
সংবিষ্টং ধ্যাননিষ্ঠং ত্রিনয়নমভয়ং
　　সেবিতং সিদ্ধসংঘৈঃ॥
দেবী বামাঙ্কসংস্থা গিরিবরতনয়া
　　পার্বতী ভক্তিনম্রা
প্রাহেদং দেবমীশং সকলমলহরং
　　বাক্যমানন্দকন্দম্॥৬॥

অন্বয়—কদাচিৎ কৈলাসাগ্রে রবিশতবিমলে মন্দিরে রত্নপীঠে সংবিষ্টম্ ধ্যাননিষ্ঠম্ সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ সেবিতম্ অভয়ম্ সকলপাপহরম্ আনন্দকন্দম্ ত্রিনয়নম্ দেবম্ ঈশম্ বামাঙ্কসংস্থা ভক্তিনম্রা গিরিবরতনয়া দেবী পার্বতী ইদম্ বাক্যম্ প্রাহ।

বঙ্গানুবাদ—একদিন কৈলাস পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত শ্রীমন্দিরে, শতসূর্যের মতো প্রভাময় রত্নপীঠে সিদ্ধগণসেবিত অভয়দানকারী ত্রিলোচন মহাদেব ধ্যানে বসেছেন। এমন সময় গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা দেবী পার্বতী তাঁর বাম ঊরুদেশে বসে একান্তই ভক্তিনম্রচিত্তে সর্বপাপহরণকারী এবং দিব্য আনন্দের আধার-স্বরূপ মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন।৬

ভাবার্থ—একদা কৈলাসপর্বতের শিখরে শতসূর্যের সদৃশ প্রভাসম্পন্ন শুভ্রভবনে রত্ন-সিংহাসনে আসীন ধ্যানাবিষ্ট সিদ্ধগণসেবিত অভয় ও সর্বপাপহারক দেবাদিদেব ভগবান ত্রিলোচনকে তাঁর বামক্রোড়ে বিরাজমানা গিরিরাজদুহিতা

দেবী পার্বতী ভক্তিনম্রভাবে এই কথা বলেছিলেন।৬

পার্বত্যুবাচ—

নমোঽস্তু তে দেব জগন্নিবাস সর্বাত্মদৃক্ ত্বং পরমেশ্বরোঽসি।
পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমস্য সনাতনং ত্বং চ সনাতনোঽসি ॥৭॥

অন্বয়—দেব! জগন্নিবাস! তে নমঃ অস্তু, ত্বম্ সর্বাত্মদৃক্ পরমেশ্বরঃ অসি। (অহম্) পুরুষোত্তমস্য সনাতনম্ তত্ত্বম্ (ত্বাম্) পৃচ্ছামি; (যতঃ) ত্বম্ চ সনাতনঃ অসি।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীপার্বতী বললেন: হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্বত্রই নিজেকে দর্শন করেন, আপনিই সেই অনাদি, অনন্ত শাশ্বত পুরুষ,—পরমেশ্বর, তাই আপনার কাছে আমি পুরুষোত্তম ব্রহ্মের সনাতন তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করি।৭

ভাবার্থ—ভগবতী পার্বতী দেবী বললেন—হে দেব, আপনি জগতের আশ্রয়স্থল; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকলের অন্তঃকরণের দ্রষ্টা এবং পরমেশ্বর; আমি আপনার নিকট শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের সনাতন তত্ত্ব জানতে চাই। কারণ আপনিও সনাতন, আপনি সেই সনাতন তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে অবগত আছেন।৭

গোপ্যং যদত্যন্তমনন্যবাচ্যং বদন্তি ভক্তেষু মহানুভাবাঃ॥
তদপ্যহোঽহং তব দেব ভক্তা প্রিয়োঽসি মে ত্বং বদ যত্তু পৃষ্টম্ ॥৮॥

অন্বয়—মহানুভাবাঃ যৎ অত্যন্তম্ গোপ্যম্ অনন্যবাচ্যম্ (তদ্ অপি) ভক্তেষু বদন্তি; হে দেব! অহমপি তব ভক্তা, অহো ত্বম্ মে প্রিয়ঃ অসি; (অতঃ ময়া) তু যৎ পৃষ্টম্ তৎ বদ।

বঙ্গানুবাদ—যা একান্তই গোপনীয়, যা জ্ঞানী ভিন্ন অপরের কাছে বলা উচিত নয় মহানুভবেরা ভক্তদের কাছে তা প্রকাশ করে থাকেন।

হে দেব! তাই আমি যা আপনার কাছে জানতে আগ্রহী আপনি তা আমাকে সবিশেষ বলুন, যেহেতু আমি আপনার ভক্ত এবং আপনিও আমার প্রিয়।৮

ভাবার্থ—যে বিষয় অত্যন্ত গোপনীয়, অন্য কারও নিকট বলা উচিত নয়, সে বিষয়ও মহাত্মা ব্যক্তিরা নিজের ভক্তদের নিকট বর্ণনা করে থাকেন; হে দেব! আমি আপনার ভক্ত আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয়; অতএব আমি যা জিজ্ঞাসা করেছি, কৃপা করে তা আমাকে বলুন।৮

জ্ঞানং সবিজ্ঞানমথানুভক্তিবৈরাগ্যযুক্তং চ মিতং বিভাস্বৎ।
জানাম্যহং যোষিদপি ত্বদুক্তং যথা তথা ব্রূহি তরন্তি যেন ॥৯॥

অন্বয়—যেন (জ্ঞানেন) (জনাঃ) (পুনর্জন্মাদিসংসারম্) তরন্তি, তৎ অনুভক্তিবৈরাগ্যযুক্তম্ মিতম্ বিভাস্বৎ সবিজ্ঞানম্ জ্ঞানম্ তথা ব্রূহি যথা যোষিৎ অপি অহম্ ত্বদুক্তম্ (অনায়াসেন) জানামি।

বঙ্গানুবাদ—হে ভগবন্, যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়, যে জ্ঞান থেকে ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং যে ভক্তির দ্বারা বৈরাগ্য লাভ হয় সেই বিশেষ জ্ঞানের মহিমা আপনি আমাকে কৃপা করে বলুন। যদিও আমি নিতান্তই অবলা তথাপি আমি আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত সেই জ্ঞান অবধারণ করতে পারব বলে মনে করি।৯

ভাবার্থ—যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ জন্মমরণাদিরূপ সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সেই প্রকাশময় ভক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত আত্মজ্ঞান আপনি এমন করে অল্পকথায় সরলভাবে বর্ণনা করুন,

যাতে অল্পবুদ্ধি নারী হয়েও আমি সহজেই আপনার বর্ণিত বিষয় বুঝতে পারি।

দেবী পার্বতী দেবাদিদেব শূলপাণিকে অনুরোধ করেছেন—সেই জ্ঞান হবে বিজ্ঞান সমন্বিত; জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। বলা হয়েছে—"শ্রবণমননজং পরোক্ষং-জ্ঞানম্, যথা ব্রহ্মৈব সর্বং, ব্রহ্মৈবাহমিতি" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ শ্রবণ ও মননের ফলে 'সকলই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম'—এই জাতীয় যে পরোক্ষ ধারণা হয়, তাই হল জ্ঞান। আরও বলা হয়েছে—"নিদিধ্যাসন-পরিপাকজম্ অপরোক্ষ-জ্ঞানং বিজ্ঞানম্"—অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক ধ্যানের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় তাই হল বিজ্ঞান। তাই দেবী পার্বতী বিজ্ঞানসমন্বিত পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। শ্রুতিবাক্যে বলা হয়েছে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫) অর্থাৎ রে মৈত্রেয়ি! আত্মাই অনুভবনীয়, শ্রবণীয়, বিচার্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। শ্রবণের দ্বারা, বিচারের দ্বারা, নিশ্চিত ধ্যানের দ্বারা আত্মার অনুভূতি হলে সবই জানা যায়। শুধু তাই নয়, জ্ঞানের বিশেষণ দেওয়া হয়েছে—'অনুভক্তি-বৈরাগ্যযুক্তম্।' সেই জ্ঞান হবে ভক্তির অনুগামী বৈরাগ্যের দ্বারা যুক্ত। শাণ্ডিল্যসূত্রে বলা হয়েছে—"সা পরানু-রক্তিরীশ্বরে" (শাণ্ডিল্য ১।২), মহর্ষি শাণ্ডিল্য সর্বৈশ্বর্যশালী পরমাত্মাতে লৌকিক ও অলৌকিক বিষয় হতে উৎকৃষ্টতমা অনুরক্তিকে ভক্তি বলে অভিহিত করেছেন। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ভগবানের গুণশ্রবণাদির ফলে সর্বেশ্বর ভগবানের বিষয়ে মানবের দ্রবীভূত চিত্তের তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্নরূপে ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত যে বৃত্তি তাকেই ভক্তি বলেছেন। এই ভক্তির পিছনে আসে বৈরাগ্য; শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে—"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্॥" (ভাগবত ১।৩।৭) অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি উৎপন্ন হলে অনন্যপ্রেমে তাঁর প্রতি চিত্তযুক্ত হয়; তখন অবিলম্বে বৈরাগ্য ও নিষ্কাম জ্ঞানের উদয় হয়। বৈরাগ্যসম্বন্ধে বলা হয়েছে—"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।" (পাতঞ্জল-সূত্র ১।১৫) অর্থাৎ দৃষ্ট অথবা শ্রুত সর্ববিষয়ের আকাঙ্ক্ষা যিনি ত্যাগ করেছেন, তাঁর মধ্যে যে অপূর্বভাব আসে; তাতে সমস্ত বিষয়বাসনাকে তিনি দমন করতে পারেন। এই ভাবকে বৈরাগ্য বা অনাসক্তি বলা হয়। ভক্তির অনুগামী এই বৈরাগ্যযুক্ত বিজ্ঞানসমন্বিত জ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করেছেন দেবী পার্বতী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব শঙ্করের নিকট। তিনি আরও অনুরোধ করেছেন—সেই উপদেশ যেন স্বপ্রভায় সমুজ্জ্বল, অল্পশব্দবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত অথচ সরল হয়; শোনা-মাত্রই যেন মন্দমতি নারী হয়েও তিনি দেবাদি-দেবের বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন।৯

পৃচ্ছামি চান্যচ্চ পরং রহস্যং তদেব চাগ্রে
বদ বারিজাক্ষ।
শ্রীরামচন্দ্রেঽখিললোকসারে ভক্তির্দৃঢ়া
নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধা॥১০॥

অন্বয়—হে বারিজাক্ষ! অহম্ অন্যৎ চ পরম্ রহস্যম্ (ভবন্তম্) পৃচ্ছামি, অগ্রে চ তৎ-এব বদ। অখিল লোকসারে শ্রীরামচন্দ্রে (শুদ্ধা) ভক্তিঃ দৃঢ়া নৌঃ ভবতি (ইতি) প্রসিদ্ধা।

বঙ্গানুবাদ—হে কমললোচন! আমার আর অন্য কোন জিজ্ঞাস্য বিষয় নাই কারণ অন্য কোন বিষয়েই আমার স্পৃহা নাই। যার মাধ্যমে জীবের ভববন্ধন মোচন হয় সেই গোপনীয় এবং রহস্যময় প্রশ্নেরই আমি অবতারণা করছি। আপনি অনুগ্রহ করে আমায় বলুন। পঞ্চভূত

মন, বুদ্ধি অহংকারাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সার পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃঢ়া ভক্তিই একমাত্র ভবসাগর পারের নৌকা বলিয়া খ্যাত।১০

**ভাবার্থ**—হে কমলনয়ন, আমি আরও এক পরম গোপনীয় রহস্যের বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছি, কৃপা করে আপনি সর্বাগ্রে সেই বিষয় বর্ণনা করুন। একথা তো প্রসিদ্ধ যে অখিল-লোকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশুদ্ধা ভক্তি সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার সুদৃঢ় নৌকা।১০

ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায় নান্যত্ততঃ
সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।
তথাপি হৃৎসংশয়বন্ধনং মে বিভেত্তুমর্হস্য-
মলোক্তিভিস্ত্বম্ ॥১১॥

**অন্বয়**—ভবমোক্ষণায় ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা, ততঃ অন্যৎ ন কিঞ্চিৎ সাধনম্ অস্তি। তথাপি ত্বম্ মে হৃৎসংশয়বন্ধনম্ অমলোক্তিভিঃ বিভেত্তুম্ অর্হসি।

**বঙ্গানুবাদ**—ভববন্ধন নাশ করার একমাত্র সাধনা পরাভক্তি লাভ করা এবং এ ছাড়া অন্য সব সাধনাই বৃথা তা আমি জানি। তবুও আমার হৃদয় সংশয়াচ্ছন্ন। আপনি যথোপযুক্ত যুক্তি সহায়ে আমার সেই সংশয়াকুল মনকে দৃঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করুন।১১

**ভাবার্থ**—সংসার বন্ধন হতে মুক্তিলাভের জন্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ উপায়, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট অপর কোনও সাধন নাই। তথাপি আপনি আপনার বিশুদ্ধ উক্তির দ্বারা আমার হৃদয়ের সংশয়গ্রন্থি ছেদন করুন।১১

বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং নিরস্তমায়া-
গুণসপ্রবাহম্।
ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ পরং পদং যান্তি
তথৈব সিদ্ধাঃ ॥১২॥

**অন্বয়**—বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং নিরস্ত-মায়াগুণসপ্রবাহম্। ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—দেবী পার্বতী নিজের সংশয়ের বিষয়ে উল্লেখ করে বল্লেন, 'যাঁর দ্বারা মায়া, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি প্রবাহের পরিসমাপ্তি হয়েছে (বা অন্তর্ধান ঘটেছে) সেই শ্রীরামচন্দ্রকে অনেকে পরব্রহ্ম বলে থাকেন এবং সতত অনন্যচিত্তে তাঁকে পূজা করেন। তাঁরা এইভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হন'।১২

**ভাবার্থ**—প্রমাদরহিতসিদ্ধগণ শ্রীরামচন্দ্রকে পরম, অদ্বিতীয়, সকলের আদিকারণ এবং প্রকৃতির গুণপ্রবাহের অতীত বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাঁরা দিবারাত্র তাঁর আরাধনা করে পরম পদ লাভ করে থাকেন।১২

বদন্তি কেচিৎ পরমোঽপি রামঃ স্বাবিদ্যয়া
সংবৃতমাত্মসংজ্ঞম্
জানাতি নাত্মানমতঃ পরেণ সম্বোধিতো
বেদ পরাত্মতত্ত্বম্ ॥১৩॥

**অন্বয়**—কেচিৎ বদন্তি—পরমঃ অপি রামঃ স্বাবিদ্যয়া সংবৃতম্ আত্মসংজ্ঞম্ আত্মানম্ ন জানাতি, অতঃ পরেণ সম্বোধিতঃ পরাত্মতত্ত্বম্ বেদ (ইতি)।

**বঙ্গানুবাদ**—কেউ বা বলেন—শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম হলেও নিজের মায়ার দ্বারা সম্যক্রূপে আবৃত (অবগুণ্ঠিত বা আড়াল) আছেন। তাই তিনি তাঁর স্বরূপ জানতে পারেন না। প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারাই তিনি পরমাত্ম-তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন।১৩

**ভাবার্থ**—কেউ কেউ এই কথা বলে থাকেন যে শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম হলেও নিজের মায়াতে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত থাকায় তিনি নিজের স্বরূপের বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তাই অন্যের দ্বারা সম্বোধিত হওয়ার পর তিনি নিজেই যে 'পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ'—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় রাবণবধের পর

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন—"তমুবাচ ততো দেবঃ স্বয়ম্ভূরমিতদ্যুতিঃ। প্রগৃহ্য রুচিরং বাহুং স্মারয়ন্ পূর্বদৈহিকম্॥ ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাদ্দেবশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ॥" অর্থাৎ অমিততেজা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রের শোভন বাহু ধারণ করে তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—প্রভো! আপনি স্বয়ং চক্রধারী ভগবান নারায়ণ। আচার্যপাদ শঙ্করও উপদেশ-সাহস্রী-গ্রন্থে এই কথা উল্লেখ করেছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দেখা যায় যে শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম হলেও তাঁকে বশিষ্ঠের নিকট আত্মজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করতে হয়েছিল।১৩

যদি স্ম জানাতি কুতো বিলাপঃ সীতা-
কৃতেঽনেন কৃতঃ পরেণ।
জানাতি নৈবং যদি কেন সেব্যঃ সমো হি
সর্বৈরপি জীবজাতৈঃ॥১৪॥
অত্রোত্তরং কিং বিদিতং ভবদ্ভিস্তদ্ ব্রূত
মে সংশয়ভেদি বাক্যম্॥১৫॥

অন্বয়—যদি স (শ্রীরামচন্দ্রঃ পরাত্মতত্ত্বম্) জানাতি স্ম (তর্হি) সীতাকৃতে অনেন পরেণ কৃতঃ বিলাপঃ কুতঃ? যদি স (স্বস্বরূপম্) ন জানাতি এব তদা সর্বৈঃ জীবজাতৈঃ অপি সমঃ স (শ্রীরামচন্দ্রঃ) কেন সেব্যঃ? অত্র উত্তরম্ কিম্ ভবদ্ভিঃ বিদিতম্? (যদি বিদিতং স্যাৎ) তদ্ মে সংশয়-ভেদি বাক্যম্ ব্রূত। (১৪-১৫)

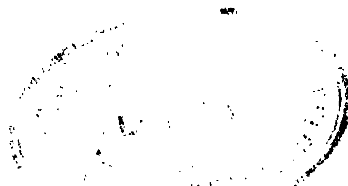
বঙ্গানুবাদ—যদি শ্রীরামচন্দ্র নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত থাকতেন, তাহলে রাবণ সীতা হরণ করায় তিনি সীতার জন্যে অনুতাপ করতেন না। অন্যান্য সব জীব যেমন সমান তিনিও তেমনি নিজেকে একজন সাধারণ জীবমাত্র ভেবে 'সেব্য' বলে ভাবতে পারেননি। আপনি, হে ভগবন্ এই বিষয়ের কি উত্তর জানেন তা আমাকে বলুন ও আমার সংশয় ছেদন করুন।

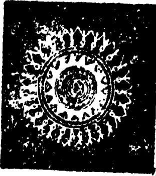
ভাবার্থ—এখন আমার প্রশ্ন হল—যদি তিনি জানতেন যে তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ তাহলে সেই পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র সীতার জন্য এত বিলাপ করেছিলেন কেন? আর যদি মায়ায় আত্মবিস্মৃতির ফলে তাঁর স্বরূপজ্ঞান না থাকে, তবে তো তিনি সাধারণ জীবেরই সমান; তাহলে কে আর তাঁর পূজা করবে? এসব প্রশ্নের উত্তর কি? নিশ্চয়ই উত্তর আপনার জানা আছে, দয়া করে সেই উত্তর দিয়ে আমার সন্দেহ দূর করুন। (১৪-১৫)

[ক্রমশঃ]

অবতারেরও দেহ বন্ধ আছে। শরীর ধারণই মায়া। সীতার জন্য রাম কেঁদেছিলেন। তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে। যেমন ছেলেরা কাণামাছি খেলে। কিন্তু মা ডাক্‌লেই খেলা থামায়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ





# অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

শ্রীগোকুলদাস দে

## বুদ্ধদেবের দৈনিক কার্য-বিবরণী

[ পালি সুমঙ্গল-বিলাসিনী হইতে সংগৃহীত ]

বোধিদ্রুমমূলে ভগবানের অর্থশূন্য সকলের কর্ম্ম এককালে বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি যাহা কিছু করিতেন সে সকলই লোকহিতায় অনুষ্ঠিত হইত এবং তাহাদের কিছু না কিছু উদ্দেশ্য থাকিত। দিবারাত্রের মধ্যে সমস্তক্ষণই প্রায় কোন না কোন কর্ম্ম সাধনে তিনি সচেষ্ট থাকিতেন এবং তাঁহার সেই ক্রিয়াগুলি মোটামুটি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহা যথাক্রমে—পূর্ব্বাহ্ণ ক্রিয়া, অপরাহ্ণ ক্রিয়া, প্রথমযাম ক্রিয়া, মধ্যমযাম ক্রিয়া এবং শেষযাম ক্রিয়া।

এইগুলি তাঁহার পূর্ব্বাহ্ণ ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভগবান অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া মুখধাবনাদি শারীরিক ক্রিয়া সমাধা পূর্ব্বক ভৃত্যদের অনুগ্রহ করিবার জন্য এবং শারীরিক সুস্থতা নিবন্ধন ভিক্ষায় যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুক্তস্থানে অতিবাহিত করিতেন। পরে ভিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে নবকাষায় পরিধান করিয়া কায়বন্ধনে তাহা আবদ্ধ করিতেন এবং অপর একখণ্ড কাষায় বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া, পাত্র হস্তে কখনও একাকী কখনও বা ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া, গ্রাম হউক নগর হউক তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেন। গমন কালে কখন তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় যাইতেন, কখন বা নানা দিব্য বিভূতি ভূষিত হইয়া গমন করিতেন। সেগুলি এই প্রকার,—তিনি যখন পথ অতিক্রম করিতেন তখন পবন মৃদুমন্দ বহিতে বহিতে সম্মুখস্থ পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতে থাকিত; আকাশে মেঘকুল অল্পবৃষ্টির দ্বারা ধূলিকণাসমূহ দূরীভূত করিয়া মস্তকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তৃত থাকিত; একপ্রকার বায়ু উত্থিত হইয়া পুষ্পসকল আহরণ করিয়া পথিমধ্যে সেগুলি বিকিরণ করিত; উচ্চস্থান সকল নিম্নতা প্রাপ্ত হইয়া এবং নিম্ন স্থলগুলি উচ্চ হইয়া সমতল হইয়া যাইত; যখন তিনি ভূমির উপর চরণ রাখিতেন, তখন ধরণী সুখস্পর্শ পদ্মফুলের ন্যায় হইয়া তাহা গ্রহণ করিত; যখন তিনি কোন দেউড়ীমধ্যে দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া দিতেন অমনি তাঁহার দেহ হইতে ছয় বর্ণের রশ্মি নির্গত হইয়া সুবর্ণ পিঞ্জরের আকার ধারণ করিয়া, অথবা সুন্দর চিত্রপটের ন্যায় মনোমুগ্ধকর হইয়া, কিম্বা প্রাসাদশীর্ষ রঞ্জিত করিয়া এদিক ওদিক ধাবমান হইত; আর হস্তী অশ্ব হইতে পক্ষীকুল পর্য্যন্ত, ভূচর, খেচর, সকলে নিজ নিজ স্থানে স্থির থাকিয়া মধুর রবে দিকসকল মুখরিত করিত; আবার ভেরী, বীণা তূর্য্য, এমন কি মানুষের গাত্রসংলগ্ন আভরণসকলও আপনা আপনি বাজিয়া উঠিত। এই সকল চিহ্নদ্বারা সকলে বুঝিতেন, "অদ্য ভগবান ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন।" তাঁহারা উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া গন্ধপুষ্প হস্তে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেন এবং মধ্য পথে ভগবানের সন্নিকটে আসিয়া সেই গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা এবং বন্দনা করিয়া বলিতেন, "ভগবন্, আমাদের দশটী ভিক্ষু, আমাদের বিংশতি, আমাদের শত ভিক্ষু প্রদান করুন।" অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভোজন করাইবার

জন্য দশটী ভিক্ষু, কেহ বিংশতি, কেহ বা শত, যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য সেইরূপ লইয়া যাইতেন। এবং কেহ বা ভগবানেরও পাত্র লইয়া তাঁহার আসন প্রস্তুত করিয়া ভক্তিপূত চিত্তে আহারাদি সজ্জিত করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতেন। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া ভগবান তাঁহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন। তাহাতে কেহ শরণাগমনে (১), কেহ পঞ্চশীলে (২), কেহ স্রোতাপত্তি ফলে (৩), কেহ বা সকৃদাগামী ফলে (৪) ও কেহ বা চরম সীমা অর্হত্বে (৫) প্রতিষ্ঠিত হইতেন। এইরূপে জনমানবকে কৃপা করিয়া ভগবান বিহারে প্রত্যাগমন করিতেন এবং তথায় মণ্ডলমালায় (অর্থাৎ ভিক্ষুগণ যেখানে মণ্ডলাকারে বসিয়া তাঁহার ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন) আসিয়া তাঁহার জন্য রচিত বরবুদ্ধাসনে উপবেশন করিতেন এবং ভিক্ষুগণের আহার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই অবস্থান করিতেন। পরে আহার শেষ হইলে একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে ইহা জানাইলে পর তিনি আসন ত্যাগ করিয়া নিজ নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিতেন। এইরূপে তাঁহার পূর্বাহ্ন ক্রিয়া সমাপ্ত হইত।

ভগবান স্বীয় নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক সেবক-রক্ষিত আসনে উপবেশন করিয়া পদদ্বয় ধৌত করিতেন। তদনন্তর রত্নপর্য্যঙ্কে অবস্থান করিয়া ভিক্ষুসংঘকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন, "হে ভিক্ষুগণ, দৃঢ়পরাক্রমের সহিত নির্বাণলাভ করিতে যত্নবান হও; পৃথিবীতে বুদ্ধের আগমন অতি দুর্ল্লভ, মনুষ্যত্ব লাভও দুর্ল্লভ, বুদ্ধের দর্শনলাভও দুর্লভ এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ প্রব্রজ্যালাভ ও সদ্ধর্ম্মশ্রবণ। তোমরা এইগুলি প্রাপ্ত হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করিও না। অপ্রমত্ত হইয়া নির্ব্বাণের দিকে অগ্রসর হও।" ঐ সময় কেহ কেহ তাঁহাদের নিজ নিজ ধ্যানের বিষয়সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতেন এবং ভগবানও তাঁহাদের প্রকৃতি অনুসারে সেগুলি বলিয়া দিতেন। অনন্তর সকলে তাঁহাকে বন্দনা পূর্ব্বক স্ব স্ব রাত্রবাস কিম্বা দিবাবাসের স্থানে, কেহ বা অরণ্যমধ্যে, কেহ বৃক্ষমূলে কেহ বা কোন পর্ব্বতে গমন করিয়া নিজ নিজ ধ্যানের বিষয় চিন্তা করিতেন। তৎপরে ভগবান সেই কক্ষে তাঁহার ইচ্ছানুসারে শয়ন করিয়া ডাইন দিকে পাশ ফিরিয়া দক্ষিণপদের উপর বাম পদ রাখিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য যোগযুক্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে উঠিয়া ধ্যানে সর্ব্বদিক দর্শন করিতেন। এই সময় বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিত, তখন সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম কিম্বা নগর হইতে মুক্তহস্ত গৃহী উপাসকেরা, যাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন, উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া গন্ধপুষ্পমাল্য প্রভৃতি হস্তে লইয়া মঠে আসিয়া একত্রিত হইতেন। তখন ভগবান সেই সমবেত লোকসভায় দিব্য জ্যোতিতে বিভূষিত হইয়া আগমন করিতেন ও তাঁহার জন্য কল্পিত শ্রেষ্ঠবুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেশ কাল এবং পাত্রানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। যথাসময়ে সেই ধর্ম্মপরিষদ্ ভঙ্গ হইলে আগত ব্যক্তিরা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিতেন। এইরূপে দিবাবসান হইয়া আসিলে তাঁহার অপরাহ্ন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইত।

অনন্তর সন্ধ্যার প্রাক্কালে যদি তাঁহার গাত্রমার্জ্জনাদি করিবার প্রয়োজন হইত, তিনি উঠিয়া স্নানাগারে যাইতেন এবং সেবক কর্ত্তৃক আনীত জলে গাত্রাদি মার্জ্জন করিতেন। ইতিমধ্যে কোন ভৃত্য তাঁহার কক্ষসমীপস্থ ধর্ম্মমন্দিরে বুদ্ধাসন প্রস্তুত করিয়া আসিত। অতঃপর ভগবান রক্তপট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া কায়-বন্ধনে দেহ বেষ্টন করিয়া কাষায়

উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া সেই আসনে আসিয়া উপবেশন করিতেন এবং ক্ষণকাল ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। পরে ভিক্ষুগণ নানাস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভগবানের সেবাকল্পে তথায় উপস্থিত হইতেন; কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, কেহ ধ্যানের বিষয় জানিয়া লইতেন, কেহ বা তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহাদের সকলের মনোরথ পূর্ণ করিতে ভগবানের প্রথম যাম অতিবাহিত হইত অর্থাৎ সন্ধ্যা হইতে রাত্র প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত এইরূপে কাটিয়া যাইত। এখানে একটী কথা বলা প্রয়োজন; ভিক্ষুরা বেলা দ্বিপ্রহরের পর পানীয় ব্যতীত অন্য কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতেন না। ভিক্ষুদিগের এটী অন্যতম ব্রত ছিল।

প্রথম যাম অতীত হইলে ভিক্ষুগণ সকলে ভগবানকে বন্দনা করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিতেন। এই সময় সমস্ত দেবতাকুল অবসর পাইয়া ভগবানের নিকট আসিয়া স্ব স্ব প্রশ্নাদি করিতেন। তাঁহাদের সেইসকল প্রশ্ন সমাধান করিতে করিতে ভগবান মধ্যম যাম অতিবাহিত করিতেন। ইহাই তাঁহার এই সময়ের অর্থাৎ মধ্যরাত্রের কার্য্য ছিল।

শেষ যাম তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রথম ভাগে তিনি, আহারের পর হইতে বসিয়া বসিয়া শরীরের মধ্যে যে আলস্য অনুভব করিতেন তাহা দূরীকরণার্থ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কাটাইতেন; দ্বিতীয় ভাগে তিনি নির্জ্জন কক্ষে শয়ন করিয়া ডাইন দিকে পাশ ফিরিয়া দক্ষিণ পদের উপর বাম পদ রাখিয়া শান্ত অবিকল্পচিত্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেন এবং তৃতীয় ভাগে উঠিয়া বসিয়া যে সকল পুরুষপ্রবর পূর্ব্ব বুদ্ধদিগের নিকট দান, শীল প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের দর্শনার্থ তিনি সমস্ত লোক প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতেন। এইরূপে নিশা অতিবাহিত হইত।*

* 'উদ্বোধন'-এর ১৮ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

"পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয় অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটিবারও নিঃশ্বাস লন নাই। সর্বোপরি, তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন: বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটি অবস্থাবিশেষ। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছি। এস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ



# পুরাতনী

স্বামী অবধূতানন্দ

## আদর্শ জননী

শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে গেছেন পাণ্ডবদের জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা চাইতে। দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে তাও দিতে রাজি নন। হতাশ হয়ে তিনি যখন পাণ্ডবদের নিকট ফিরে যাচ্ছেন তখন পথে প্রথমে কুন্তী-দেবীর নিকটে যাওয়াই উচিত মনে করলেন। সেই অনুসারে কুন্তীদেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন: হে দেবি, দুর্যোধন সন্ধি করতে রাজি নয়। এক্ষণে যদি পাণ্ডবগণের প্রতি আপনার কোন বক্তব্য থাকে, বলুন। কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরের স্বভাব ভাল করেই জানতেন। তিনি জানতেন যে, যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ-ভয়ে সব সহ্য করবে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। তাই কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন: আমার নাম করে যুধিষ্ঠিরকে বলবে, তুমি যদি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না কর, তাহলে তোমার পক্ষে অধর্ম হবে। অতএব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করো না। বেদার্থজ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণদের মতো সবরকম শাস্ত্র-পাঠ করে তোমার বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। তুমি যাকে ধর্ম বলে মনে করছ, তা রাজর্ষিদিগের ধর্ম নয়। যে বুদ্ধিতে তুমি চলেছ, এ বুদ্ধি তোমার হোক—এ আশীর্বাদ তোমার পিতা বা আমি তোমাকে কখনও করিনি। আমি সব-সময়ই তোমাকে বলেছি যে, তুমি যজ্ঞ দান-তপস্যার অনুষ্ঠান যেমন করবে সেই সঙ্গে বীর, বলবান ও তেজস্বী হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকবে। তুমি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মেছ। ক্ষত্রিয়ের ধর্মই তোমার ধর্ম। আর যুধিষ্ঠিরকে বিদুলা-সঞ্জয়ের এই উপাখ্যানটি শোনাবে। এই বলে কুন্তী বিদুলা-সঞ্জয়ের উপাখ্যানটি বর্ণনা করলেন।

বিদুলা সঞ্জয়ের মা। তিনি ক্ষাত্রধর্মে নিষ্ঠাবতী, জিতেন্দ্রিয়া, শাস্ত্রজ্ঞা ও দূরদর্শিনী ছিলেন। একবার সিন্ধুরাজের সাথে সঞ্জয়ের যুদ্ধ বাধে। সিন্ধুরাজ রাজা সঞ্জয়কে পরাজিত করে তার রাজ্য অধিকার করলেন। সঞ্জয় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সব উৎসাহ হারিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে বিষণ্ণচিত্তে শয্যাগ্রহণ করলেন। পুত্রকে অবসন্ন দেখে উৎসাহ দেবার জন্য বিদুলা তাকে বললেন: তুমি আমার গর্ভে জন্মেও বংশের মান রাখতে পারলে না? কাপুরুষ কোথাকার, সিন্ধুরাজ তোমার রাজ্য কেড়ে নিয়ে গেল, আর তুমি নপুংসকের মতো ভয়ে পালিয়ে এসে শয্যাগ্রহণ করেছ? লজ্জা করেনা তোমার? সাহস অবলম্বন কর, উঠে দাঁড়াও। নিজেকে কখনও দুর্বল ভেবো না। উৎসাহী হও। এভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়ে সারা জীবন অপমান ও দুঃখের বোঝা মাথায় বয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি? বাঁচতে হয়তো মানুষের মতো বেঁচে থাক। তুষাগ্নির মতো দীর্ঘকাল ধরে ধূমায়িত হওয়ার চেয়ে ক্ষণকালের জন্য দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠা ঢের ভাল। দীর্ঘকাল কাপুরুষের মতো জীবনযাপন করার চেয়ে স্বল্পকালের জন্যও বীর হওয়া ভাল। বীরের মতো একবার যুদ্ধ করে যদি মরেও যাও,

তাতে আমি খুশি হব। তখন সঞ্জয় বললেন: মাতঃ! যদি আমি তোমার নেত্রপথ হতে অন্তর্হিত হই, তাহলে তোমার আভরণ, ভোগসমুদয়, পৃথিবী বা জীবনে প্রয়োজন কি? উত্তরে বিদুলা বললেন: বৎস! তুমি কষ্ট পাওয়ার ভয়ে ক্লীবের মতো যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ, একেও আমি তোমার মৃত্যু বলে গণ্য করি। আর, আমি রাজকন্যা; হংসী যেমন এক সরোবর থেকে অন্য সরোবরে যায়, আমিও তেমনি এক রাজকুল থেকে রাজবধূ হয়ে অন্য রাজকুলে এসেছি, রাজমাতা হয়েছি। তুমি যদি এখন যুদ্ধ করে হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে না পার, তাহলে আমাকেও দীনহীনার মতো বেঁচে থাকতে হবে। আমার পক্ষে সেটি মরণেরই সমান।

হে পুত্র! তোমার নাম সঞ্জয়, কিন্তু আমি তোমার এই নামের কোন সার্থকতা দেখছিনা। এক্ষণে সেই সার্থকতা সম্পাদন কর। ব্যর্থনামা হয়োনা। যুদ্ধ করতে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? বিজয়ী হবেনা, একথাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? তাছাড়া সিন্ধুরাজ তো আর অমর নন! সঞ্জয় বললেন: মা, তোমার হৃদয় কি লোহা দিয়ে গড়া? তুমি মা হয়ে পরমাতার ন্যায় আমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছ? আমি তোমার একমাত্র পুত্র। আমি যুদ্ধে মরে গেলে রাজ্য ফিরে পেয়েই বা কি সুখে থাকবে তুমি? বিদুলা বললেন: বৎস! মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই ধর্ম এবং অর্থ চিন্তা করা কর্তব্য। তুমি যাতে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করতে পার সেজন্যেই একথা বলছি। তোমার মা হয়ে এখন যদি সদুপদেশ না দিতে পারি, তাহলে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা মনুষ্যের ভালবাসার পর্যায়ে না পড়ে পশুজগতের ভালবাসার সমপর্যায়ে থাকবে। নিজ শাবকের প্রতি গর্দভীর যে স্নেহ, আমার পুত্রস্নেহের মূল্য তাহলে তার চেয়ে বেশি কিছু হবেনা। যে-সব জননীরা পুত্রকে অশিক্ষিত, কুশিক্ষাপ্রাপ্ত বা দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন দেখেও আনন্দে থাকেন, তাদের মানুষ করে তুলতে চাননা, তাঁদের সন্তানের জন্মদান করাই বৃথা। হৃদয়ের দুর্বলতা কাটিয়ে তুমি যদি আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পার, সজ্জনের মতো আচরণ করতে পার, তাহলেই তুমি আমার প্রিয় হবে। যুদ্ধে দুর্জন দমন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সঞ্জয় বললেন: মা, পুত্রকে এরূপ কথা বলা কদাপি তোমার কর্তব্য নয়। পুত্রের প্রতি মায়ের অনুকম্পা বা দয়া থাকা উচিত। বিদুলা বললেন: সাধারণতঃ ছেলেরা মাকে যা বলে, তুমি তাই বলছ। আমি কিন্তু যতক্ষণ না তুমি সিন্ধুরাজের সব সৈন্য নাশ করে বিজয়মুকুট মাথায় পরবে, ততক্ষণ তোমার আদর করব না।

সঞ্জয় স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ছিলেন। মাতার যুক্তিপূর্ণ বাক্যশ্রবণে তার অজ্ঞান ও মানসিক অবসাদ কেটে গিয়েছিল। মায়ের কথামতো যুদ্ধ করে তিনি হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

কুন্তীদেবী বিদুলা-সঞ্জয় উপাখ্যানের মাধ্যমে নিজপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ ও আদর্শের বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তা ভারতের সমস্ত নারীসমাজকে শাশ্বত কাল ধরে অনুপ্রাণিত করবে, আদর্শ মাতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের জন্য।

[ মহাভারত উদ্যোগ পর্বের ২৪-২৭শ অধ্যায় থেকে গৃহীত ]

# পুস্তক সমালোচনা

**আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ**—শিবরামকিংকর যোগত্রয়ানন্দ। প্রাচী পাবলিকেশন্স্, ৩।৪ হেয়ার স্ট্রীট (তেতলা), কলিকাতা-১। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৪-৪০৪, মূল্য ঃ ৩০ টাকা ; তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫-৬০৪, মূল্য ঃ ২৫ টাকা ; চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬১১-৭৭২+৫ ; মূল্য ঃ ৩০ টাকা।

'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ' বা 'সাধকোপহার' গ্রন্থটি লেখক শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ সম্পূর্ণ করতে পারেননি, বহু বৎসর পূর্বে শুধু উপক্রমণিকা-অংশটি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির মূল পরিকল্পনা থেকে ধারণা হয়, একটি বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নের অভিপ্রায় লেখকের ছিল। প্রায় আট শত পৃষ্ঠার পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপক্রমণিকা বা উপোদ্‌ঘাত-অংশটি পড়লে এই ধরনের গ্রন্থ-রচনায় তাঁর যোগ্যতা ও অধিকার সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না।

দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ভাববিকার, কার্যকারণভাবের দ্বৈবিধ্য, কালশক্তির স্বরূপ, আরম্ভ, পরিমাণ ও বিবর্ত — এই শব্দত্রয়ের অর্থ, জগতের স্বরূপ, লয় ও সৃষ্টি, শব্দের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, প্রকৃত ধার্মিকের লক্ষণ, সত্যের স্বরূপ, সাধু-লক্ষণ, চিকিৎসা-লক্ষণ, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার, এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিকভেদে আত্মার সাধনা-লক্ষণ।

তৃতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় সুখ-দুঃখের অনুভূতি, অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত শব্দ, মানবকৃতির স্বরূপ, উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, বুদ্ধিপূর্বক ও অ-বুদ্ধিপূর্বক কর্ম, ইচ্ছার স্বরূপ, চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য, রাশি, সংখ্যা ও মূর্তক্রিয়া, ব্যাপ্তি, ক্রম, যৌগপদ্য, সামানাধিকরণ্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ, বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ, দ্বিবিধ পদার্থ, জাতিশক্তিবাদ ও ব্যক্তিশক্তিবাদ, নাম ও আখ্যাতের ইতরেতরাকাঙ্ক্ষা, এবং দ্রব্য ও গুণের স্বরূপ নির্দেশ।

চতুর্থ বা অন্তিম খণ্ডের আলোচনার বিষয় আলোকের স্বরূপ, বেদের স্থূলরূপ বা বৈখরী অবস্থা, উপবেদ আয়ুর্বেদ, বেদের অঙ্গোপাঙ্গ, জ্যোতিষ, গণিতবিদ্যা, অলৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপ ও কারণ, বস্তুর স্বচ্ছত্বাস্বচ্ছত্ব, জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত, সায়েন্স্ বা বিজ্ঞানের স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ, শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রভেদ, তর্কশাস্ত্রের প্রামাণ্য, এবং অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি-ন্যায়।

লেখকের আলোচনার রীতি তুলনামূলক এবং প্রাচ্যমতের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়েও তিনি পাশ্চাত্যমতের উৎকর্ষ অস্বীকার করেননি এবং দুই দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি এটা দুঃখের বিষয় মনে করেন যে, 'বিদেশীয় পণ্ডিতবৃন্দের চিন্তা স্থূল জড়জগতের বহির্দেশে গমন করিতে পারে না' (পৃঃ ৬৮২)। তাঁর অধ্যয়নের পরিধি বিস্ময়কর এবং তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানে সমভাবে পারদর্শী। বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অসংখ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থাদি থেকে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'বেদের পরমতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমন হয়, তবে এই পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে মাথা নীচু করিবে না।' এমন একটি বহুমূল্য গ্রন্থের দীর্ঘদিন পরে পুনর্মুদ্রণের জন্য প্রকাশক নিশ্চয়ই সারস্বত সমাজের সাধুবাদ অর্জন করবেন, তবে গ্রন্থটির শুদ্ধ ও সুচারু মুদ্রণে তাঁদের আরও মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল।

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

**স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনায় চরিত্রগঠনে পিতামাতার ভূমিকা—** লেখক: স্বামী সচ্চিদানন্দ। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, হাঁবরপুর, নদীয়া। পৃ: ১৬+১০, মূল্য: ২'০০।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দুইটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। প্রথমটিতে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে, মহৎ শিশুর জন্মলাভের জন্য পিতামাতার পবিত্রতার কথা স্বামীজীর চিন্তার মাধ্যমে উপস্থাপিত হইয়াছে।

শিশুর জন্মলাভের পর শিশুকে মানুষ করিবার সময় পিতামাতার সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশের প্রয়োজন। সেই আলোচনা পুস্তিকাটিতে অধিকতর ব্যাখ্যাত হইলে ভাল হইত।

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে এইরূপ পুস্তিকার প্রচারের প্রয়োজন আছে।

—অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

## প্রাপ্তি-স্বীকার

**অপু ও তার শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র:** লেখিকা: শ্রীমতী অনুভূতি বসু, প্রকাশক: ডা: মুরারী মোহন চক্রবর্তী, সভাপতি, পেরেন্টস্ ওন্ ক্লীনিক ফর ডেফ চিলড্রেন, ৮১ এ শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৫, পৃ: ১৫, মূল্য: ৫'০০

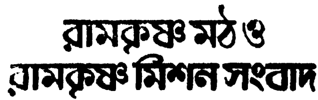
**প্রভাত সূর্য্য:** লেখক ও প্রকাশক: সুনীল কুমার দে, গ্রাম: সুন্দ্রাগ্রাম, পো: হলুদপুকুর, ভায়া জামসেদপুর, জিলা: সিংভূম (বিহার), পৃ: ৩১, মূল্য: ৪'০০.

**ব্রহ্ম ও অবিদ্যা:** লেখক শ্রীমানসকুমার সান্যাল, প্রকাশক: শ্রীনীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষ রায় রোড, কলিকাতা-৫৩, পৃ: ১০৪, মূল্য: ৮'০০.

**শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য বিজয়কৃষ্ণে সাম্য ও সমন্বয়:** লেখক: শ্রীকার্ত্তিক বসাক, প্রকাশক: শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য বিজয়কৃষ্ণ যোগাশ্রম, বৈদিকপাড়া, দণ্ডপাণিতলা, নবদ্বীপ (নদীয়া), পৃ: ৯৬, মূল্য: ৫'০০

**Hinduism A Brief outline of its frame work:** by Swami Mukhyananda, published by: Swami Sakrananda, President, Ramakrishna Math, Trichur, Kerala, India. page: 115, Price: Rs. 20'00.

**Human Personality and the Cosmic Energy-cycle:** by Swami Mukhyananda, Published by Sri S. M. Nandar, Centre for Reshaping our World-view, C/o. Shri S. R. Banerjee, Post Box No. 7844. Calcutta-700012, India. Page: I-XVI+1-56+I-XLIX. Price: cloth Rs. 40'00, Board Rs. 30'00.



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব

**শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী-উৎসব ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি উৎসব**ঃ গত ২৭ ফেব্রুআরি থেকে ২ মার্চ ১৯৮৭, পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১৫০তম জন্ম-জয়ন্তীবর্ষ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব মহাসমারোহে বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে **কনখল** শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ২৭ ফেব্রুআরি এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন মহা-মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী গণেশানন্দজী। নিরঞ্জনী, নির্বানী, জুনা, নির্মল, উদাসী, বৈরাগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই শত সাধু, সমসংখ্যক বিদ্যার্থী ও বহু ভক্তজনগণ শোভাযাত্রায় অংশ-গ্রহণ করেন। ১ মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ লোকেশানন্দজী মহারাজ, নিরঞ্জনী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ গণেশানন্দজী, গবীরদাসী মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ শ্যামসুন্দরজী, বৈরাগী সম্প্রদায়ের মহামণ্ডলেশ্বর মাধবাচার্যজী, উদাসী সম্প্রদায়ের মোহান্ত শ্রীমৎ ব্রহ্মপুরীজী প্রমুখ বিদ্বান সাধুবৃন্দ।

## উদ্বোধন

**লক্ষ্ণৌ** রামকৃষ্ণ মঠের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২ থেকে ৫ ফেব্রুআরি চারদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ২১৮ জন সাধু ব্রহ্মচারী এবং বহু ভক্ত অংশ গ্রহণ করেন। উদ্বোধনের দিন আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ।

## ত্রাণ

**গুজরাট খরাত্রাণ**ঃ রাজকোট কেন্দ্রের মাধ্যমে কচ্ছ জেলার ৪১টি খরাপীড়িত গ্রামে ৪৮৬১ জনের মধ্যে ১০,৩০০ কিলোগ্রাম জোয়ার বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া রাজকোট জেলার রাজকোট ও দেওরা এবং কচ্ছ জেলার ধানেতিতে ১,১০,০০০ কিলোগ্রাম পশুখাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

**মধ্যপ্রদেশ আদিবাসী ত্রাণ**ঃ রায়পুর কেন্দ্রের মাধ্যমে বস্তার জেলার কুতুল, পারাপা, মুরনার এবং অবুজমাড়ের ৫টি অঞ্চলের আদি-বাসীদের মধ্যে ১০৫৫ জন পুরুষ ও ৬৫১ জন স্ত্রী-লোকের পোষাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৬৬টি বিভিন্ন ধরনের কাপড়-চোপড় ১০০টি পশমী কম্বল এবং ১৩৭৪টি পুরাতন পোষাকও তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

**শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ**ঃ মাদ্রাজের ত্যাগ-রাজনগর কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত ৬০,৩৩০ জন শরণার্থীর মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়েছে।

**চিকিৎসা ত্রাণ**ঃ গত ২২ ফেব্রুআরি ১৯৮৭, আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এক চক্ষু-শিবিরের আয়োজন করে। এই শিবিরে ৪১ জন রোগীর চোখের ছানি বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করা হয়।

গত ৩১ জানুআরি, ১৯৮৭ পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ও একটি জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

গত ১৫ মার্চ ১৯৮৭, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবন ও বাণী ব্যাখ্যা করেন স্বামী শান্তরূপানন্দ। ১৯ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

## বিবিধ সংবাদ

### প্রাচীন পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার

সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের এক বৌদ্ধ মন্দির থেকে হাতে তৈরি সমানমাপের প্রাচীন কাগজে টুকরো টুকরো লেখা একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। ১৬ খণ্ডে লেখা এই পাণ্ডুলিপি নাগার্জুনের লেখা প্রজ্ঞাপারমিতার তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ। পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় টুকরো ভূমিকা সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

### পরলোকে

হাওড়া জেলার বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কর্মী স্বামী বিজয়ানন্দ গত ২৩ জানুআরি ১৯৮৭ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রাক্তন সাংবাদিক ও সমাজসেবী ভুবনমোহন গুহ গত ২৪ ফেব্রুআরি ১৯৮৭ তাঁর দক্ষিণ কলিকাতা ভবানীপুরের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি সারা জীবন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন।

তাঁদের পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

### উৎসব

গত ১৫ ফেব্রুআরি ১৯৮৭, ২৪ পরগণা জেলার সাণ্ডেলেরবিল বিবেকানন্দ পাঠচক্রের ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশতবার্ষিকী, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবার্ষিকী, এবং স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২২ জানুআরি ১৯৮৭, বোকারো ইস্পাত নগরীতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ স্বামীজীর ১২৫তম জন্মতিথি-উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষে গত ১৮ জানুআরি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

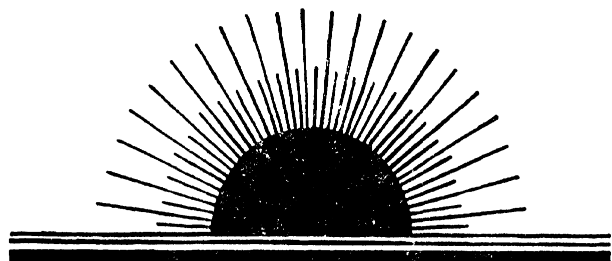
গত ১৫ ফেব্রুআরি ১৯৮৭, ২৪ পরগণা জেলার গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মহাসমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করেছে।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নবব্যারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ গত ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৬ থেকে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পরিষদের রজতজয়ন্তী-উৎসব পালন করে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ পরিষদের 'ব্রহ্মানন্দ ভবনের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উৎসবের উদ্বোধন এবং ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে




পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১৮শ—১৯শ সংখ্যা ● কার্তিক—অগ্রহায়ণ ১৩০৭ ( পৃষ্ঠা ৫৬৪—৫৮২ )

সূচী : 

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই সুবর্ণ-লোম প্রাপ্ত হইতে তাঁহার দুই কোটীর একাংশেরও অধিক সম্ভাবনা নাই। তথাপি প্রত্যেক লোকই ইহার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন; কিন্তু অধিকাংশ কখন কিছুই প্রাপ্ত হন না। ইহাই মায়া। ইহ সংসারে মৃত্যু দিবারাত্র সগর্ব্বে ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আমরা চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, "এই পৃথিবীতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য কি?" রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, "লোকসকল প্রত্যহই চতুর্দ্দিকে মরিতেছে, কিন্তু জীবিতেরা মনে করে, তাহারা কখনই মরিবে না"। ইহাই মায়া। আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, জীবন, প্রত্যেক ঘটনা মধ্যে সর্ব্বত্রই এই বিষম বিরুদ্ধ ভাব রহিয়াছে। সুখ দুঃখের, ও, দুঃখ সুখের অনুগামী হইতেছে। একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়া কোন জাতিগত দোষ সমূহ প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হইলেন; অমনি অপর-দিকে বিশ সহস্র দোষ তৎপ্রতিকারের পূর্ব্বেই উত্থিত হইল। ভগ্নোন্মুখ পুরাতন অট্টালিকার ন্যায় এক স্থানের জীর্ণসংস্কার করিতে, অপর দিক্ ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হয়। ভারতীয় রমণীগণের চির-বৈধব্য জনিত দোষ প্রতিকারার্থ আমাদের সংস্কারকগণ চীৎকার ও প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে অকৃতবিবাহই প্রধান দোষ। একস্থানে অপরিণীতাদের যন্ত্রণা মোচনে সহায়তা করিতে হইবে; অন্যস্থানে বিধবাদিগের কষ্ট অপসারণে যত্নবান্ হইতে হইবে। দেহের পুরাতন বাত ব্যাধির ন্যায় শীরঃস্থান হইতে তাড়িত হইয়া ইহা অঙ্গ আশ্রয় করিতেছে; অঙ্গ হইতে পাদদেশ অধিকার করিতেছে। কেহ কেহ বা অপরাপেক্ষা ধনশালী হইয়াছেন, বিদ্যা, সম্পদ, ও জ্ঞানানুশীলন, কেবল তাঁহাদেরই সম্পত্তি হইয়াছে। জ্ঞান কি মহত্তর ও মনোহর! জ্ঞানানুশীলন কি সুন্দর! ইহা কেবল কতিপয়ের করায়ত্ত! এ চিন্তা ভয়ানক! সংস্কারক আসিলেন এবং সাধারণের মধ্যে এই জ্ঞান বিস্তার করিলেন। জনসাধারণের নিকট অধিক পরিমাণে শারীরিক সুখ আনীত হইল। কিন্তু জ্ঞানানুশীলন যতই অধিক হইতে লাগিল, হয়ত শারীরিক সুখ ততই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এখন কোন্ পথ অবলম্বন করা যাইবে? সুখের জ্ঞান হইতে অসুখের জ্ঞান যে আসিতেছে? আমরা যে যৎসামান্য সুখভোগ করিতেছি, অন্য কোথাও তাহা সেই পরিমাণে অসুখ উৎপাদন করিতেছে। সকল বস্তুরই এই অবস্থা। যুবকেরা হয়ত ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা বহুদিন জীবিত আছেন, অনেক যন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া। দিবারাত্র এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু ইহার সুমীমাংসা অসম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ কি? এ বিষয়ের ন্যায়সঙ্গত কোন প্রশ্নই প্রস্তুত হইতে পারে না; এ জন্য এ প্রশ্নের উত্তরও অসম্ভব। ইহার কারণাবধারণ হইতে পারে না। উত্তর করিবার পূর্ব্বে, ইহার তাৎপর্য্য বোধই হইবে না,—ইহা কি, তাহা জানিতেই পারিব না। আমরা ইহাকে এক মুহূর্ত্তও স্থির রাখিতে পারি না, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের হস্ত-বহির্ভূত হইতেছে। আমরা অন্ধযন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছি। আমাদের নিঃস্বার্থতা, পরোপকারচেষ্টা স্মরণপথে আনিতে পারি, কিন্তু আমরা নির্ব্বন্ধবশতঃই এরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম। আমাকে এইস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আপনাদিগকে বক্তৃতা দানে উপদেশ

চৈত্র, ১৩০৬ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

( বৈশাখ, ১৩১৪, পৃঃ ২৬৯ )

দিতে হইতেছে, এবং আপনারা উপবেশনপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছেন, ইহাই নির্ব্বন্ধ। আপনারা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, হয়ত কেহ ইহা হইতে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছেন; অপরে হয়ত মনে করিবেন, লোকটা অনর্থক বকিয়াছে; আমি বাটী যাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি; ইহাই মায়া।

অতএব, এই সংসারগতির বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথা শ্রবণ করিলে ভীত হয়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগ প্রতিকার হইবে না। শশক যেরূপ কুক্কুর কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া নিম্নে মস্তক গোপন করতঃ আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে, আমরা সুখাশা বা নিরাশাবাদী ( Pessimist ) হইয়া অবিকল সেই শশকের ন্যায় কার্য্য করিতেছি। ইহা রোগমুক্তির ঔষধ নহে। অপর পক্ষে, ইহ জীবনের প্রাচুর্য্য, সুখ ও সচ্ছন্দ ভোগিগণ বিস্তর আপত্তি উত্থাপিত করেন। এ দেশে, ইংলণ্ডে, নিরাশাবাদী হওয়া সুকঠিন। সকলেই আমাকে বলিতেছেন—জগৎকার্য্য কি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে! ইহা কিরূপ উন্নতিশীল! কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় জীবনই তাঁহাদের জগৎ বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—খ্রীষ্ট-ধর্ম্মই পৃথিবী মধ্যে একমাত্র ধর্ম্ম, কারণ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী জাতিমাত্রেই সমৃদ্ধিশালী। এরূপ হেতুবাদ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের ভ্রমই প্রমাণিত হইতেছে। যেহেতু অখ্রীষ্টান জাতিদিগের দুর্ভাগ্যই খৃষ্টান জাতির সৌভাগ্যশালিতার প্রতি কারণ। একের সৌভাগ্যবর্দ্ধন অপরের শোণিতশোষণ অপেক্ষা করে। সমস্ত পৃথিবী খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, অন্ন-স্বরূপ অখ্রীষ্টান জাতির অনস্তিত্ব নিবন্ধন খ্রীষ্টান জাতি স্বতঃই দরিদ্র হইবে। সুতরাং এ যুক্তি আপনাকেই খণ্ডন করিতেছে। উদ্ভিজ্জ পশ্বাদির অন্ন-স্বরূপ, মনুষ্য পশ্বাদির ভোক্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত ব্যাপার—মনুষ্য পরস্পরের, দুর্ব্বল বলবানের, ভক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ইহাই মায়া। এ রহস্যের তুমি কি মীমাংসা কর? আমরা প্রত্যহই অভিনব যুক্তি শ্রবণ করি। কেহ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরূপ সম্ভাবনা অত্যন্ত সন্দেহ-স্থল হইলেও, আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু, এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল হইবার কারণ কি? পৈশাচিক রীতি অবলম্বন ব্যতীত, মঙ্গলের মধ্য দিয়া কি মঙ্গল সাধন হয় না? বর্ত্তমান মানবগণের বংশোদ্ভবেরা সুখী হইবে; কিন্তু তাহাতে আমার কি ফল লাভ হইতেছে, আমি যে এখন এ ভয়ানক যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি? ইহাই মায়া। ইহার মীমাংসা নাই। এরূপ শ্রবণ করা যায়, দোষাংশের ক্রম পরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটী বিশেষত্ব। সংসার হইতে এইরূপ দোষভাগ ক্রমাগত পরিত্যক্ত হইলে, অবশেষে কেবল মঙ্গলই বিদ্যমান থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর। এ সংসারে যাঁহাদের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান আছে, যাঁহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, যাঁহাদিগকে ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের দাম্ভিকতা বর্দ্ধন করিতে পারে। সত্যই ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকর ও শান্তিপ্রদ। সাধারণ লোকপাল যন্ত্রণা ভোগ করুক—তাঁহাদের ক্ষতি কি? তাহারা মারা যায়—সে জন্য তাঁহাদের ভাবিবার কি দরকার? বেশ কথা; কিন্তু এ যুক্তি আদ্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ, ইঁহারা বিনা প্রমাণে অবধারণ করিয়াছেন যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের

পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ, এতদপেক্ষা দোষাবহ নির্দ্ধারণ এই যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবৃদ্ধিশীল, এবং অমঙ্গল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গল ভাগ এইরূপে ক্রমবিকাশ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমে নিঃশেষিত হইবে এবং মঙ্গলই কেবল বিরাজিত থাকিবে—ইহা অতি সহজ উক্তি। কিন্তু অমঙ্গলের পরিমাণ যে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়? ইহা কি ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না? একজন অরণ্যবাসী মানব, যে মনোবৃত্তি পরিচালনায় অনভিজ্ঞ, একখানি পুস্তক পাঠেও অসমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে শ্রবণই করে নাই, অদ্য রাত্রে তাহাকে বিশ খণ্ডে বিভক্ত কর, কল্য সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। শাণিত অস্ত্র তাহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাহির করিয়া আন, তথাপিও সে আরোগ্য হইবে। কিন্তু আমরা অধিক সভ্য হইলেও, পথে যাইতে আঁচড় লাগিলে মরিয়া যাই। শিল্পযন্ত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতিও ক্রমবিকাশ বর্দ্ধন করিতেছে; কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া, লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে। একজনকে ধনশালী করিয়া, সহস্রকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে। সংখ্যাতীত মানবকুলকে ক্রীতদাস করিয়াছে। এই পথেই ইহা চলিয়াছে। পাশব প্রকৃতি মানবের সুখভোগ ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ; তাহার দুঃখ ও সুখ ইন্দ্রিয় মধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে। যদি সে প্রচুর আহার না পায়, কিম্বা শারীরিক অসুস্থতা ঘটে, সে আপনাকে দুর্ভাগা মনে করে। ইন্দ্রিয়ে তাহার সুখ-দুঃখের উত্থান ও পর্য্যবসান হয়। যখন এরূপ ব্যক্তির উন্নতি হইতে থাকে, সুখের সীমারেখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসুখেরও বৃদ্ধি সমপরিমাণে হয়। অরণ্যবাসী মানব ঈর্ষাপরবশ হইতে জানে না, বিচারালয়ে যাইতে জানে না, নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাজকর্ত্তৃক নিন্দিত হইতে জানে না, পৈশাচিকমানবপ্রকৃতিসম্ভূত যে ভীষণ অত্যাচার পরস্পরের হৃদয়ের গুহ্যতম ভাব অন্বেষণে নিযুক্ত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা সে দিবারাত্র পর্য্যবেক্ষিত হইতে জানে না। সে জানে না—ভ্রান্তজ্ঞানসম্পন্ন গর্ব্বিত মানব কিরূপে পশু অপেক্ষাও সহস্রগুণে পৈশাচিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমরা যখনই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে উন্মুক্ত হইতে থাকি, আমাদের সুখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত যন্ত্রণানুভবের শক্তিরও স্ফূর্ত্তি হয়। স্নায়ুমণ্ডল সূক্ষ্মতর হইয়া অধিক যন্ত্রণাসহিষ্ণু হয়। সকল সমাজেই ইহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, মূঢ় সাধারণ মানব, তিরস্কৃত হইলে অধিক দুঃখ অনুভব করে না, কিন্তু প্রহারের আতিশয্য হইলে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। ভদ্রলোক একটী কথার তিরস্কারও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল এত সূক্ষ্ম ভাবগ্রাহী হইয়াছে। তাঁহার সুখানুভূতি সহজ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার দুঃখেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণের ক্রমবিকাশবাদ ইহার দ্বারা অধিক সমর্থিত হয় না। আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই বর্দ্ধিত করি, যন্ত্রণাভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমার বিনীত অভিমত এই, আমাদের সুখী হইবার শক্তি যদ্যপি সমযুক্তান্তর শ্রেঢ়ীর ( যোগখড়ি—Arithmetical progression ) নিয়মে অগ্রসর হয়, অপরদিকে অসুখী হইবার শক্তি সমগুণিতান্তর শ্রেঢ়ীর ( গুণখড়ি—Geometrical progression ) নিয়মে বর্দ্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানবসমাজ সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ নহে। আর উন্নতিশীল আমরা জানিতেছি, যতই উন্নত হইব, আমাদের পরদুঃখকাতরতা ততই বৃদ্ধি হইবে।

( বৈশাখ, ১৩১৪, পৃঃ ২৫৩ )

আমাদের তৃতীয়ভাগ লোক যে আজন্ম উন্মাদগ্রস্ত, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ইহাই মায়া।

অতএব আমরা দেখিতেছি, মায়া সংসাররহস্তের ব্যাখ্যার নিমিত্ত বিশেষ মতবাদ নহে। সংসারের ঘটনা যে ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই বর্ণনামাত্র। বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্ব্বত্রই এই ভয়ানক বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেইখানেই অমঙ্গল রহিয়াছে। যেখানে অমঙ্গল, সেইখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন, মৃত্যু সেইখানেই ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিতে হইবে; যে কাঁদিতেছে, সেও হাসিবে। এ ব্যাপার পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি, যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না, যেখানে আমরা কেবল হাসিব, কাঁদিব না। কিন্তু যখন এই সকল কারণ সমভাবে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে, তখন এরূপ সংঘটনা স্বতঃই অসম্ভব। যেখানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি বিদ্যমান, কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যেখানে সুখোদ্দীপক শক্তি বর্ত্তমান, দুঃখদায়িকা শক্তিও সেইখানে লুক্কায়িত।

অতএব বেদান্তদর্শন সুখাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। ইহা উভয় বাদই প্রচার করিতেছে। ঘটনা সকল যে ভাবে বর্ত্তমান, ইহা তাহাই গ্রহণ করিতেছে, অর্থাৎ, এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ; একটীকে বর্দ্ধিত কর, আর একটীও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরূপ সংস্কারই বিরুদ্ধভাব-যুক্ত। কিন্তু এরূপ মত ব্যক্ত করিয়া ও ঈদৃশ বিশ্লেষণ দ্বারা, বেদান্ত এই একটী মহারহস্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও

# ভগবদ্‌গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

( পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত )

[ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২২ সংখ্যক ভাষ্যের শেষাংশের অনুবাদ এবং ২৩, ২৪ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ২৫ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলানুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদের প্রথমাংশ—বর্তমান সম্পাদক। ]

উদ্বোধন

২য় বর্ষ। ] ১লা অগ্রহায়ণ। ( ১৩০৭ সাল ) [ ১৯শ সংখ্যা

# প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ। ] [ ৩৮১ পৃষ্ঠার পর।

আহার শুদ্ধ হ'লে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হ'লে আত্মসম্বন্ধি অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে আহার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, আর রামানুজাচার্য্যের মতে ভোজ্য দ্রব্য। সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হ'লে ইন্দ্রিয় সকল যথাযথ কার্য্য কি করেই বা করে? কদর্য্য আহারে ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ-শক্তির হ্রাস হয় বা বিপর্য্যয় হয়, এ কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ। অজীর্ণ দোষে এক জিনিসকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোনও বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে, তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যাখাদ্যের বাচবিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব; যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে, আধারটা নিয়েই টানা হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য ভোজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে তিনটী দোষ বাঁচাতে বল্‌ছেন। জাতি দোষ, অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্য দ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাজ, লসুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে, মনে অস্থিরতা আসে; অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। আশ্রয় দোষ, অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলে দুষ্ট বুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সৎ বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্ত দোষ, অর্থাৎ ময়লা কদর্য্য কীট কেশাদি দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতি দোষ এবং নিমিত্ত দোষ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা সকলেই কর্ত্তে পারে, আশ্রয় দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয় দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুৎ-মার্গ, "ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা"। তবে অনেক স্থলেই "উল্‌টা সমজ্‌লি রাম" হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে, একটা কিম্ভূত-কিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এস্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগৎগুরুদের জীবনে পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার করে গেছেন। জাতিদুষ্ট অন্নভোজন সম্বন্ধে, ভারতবর্ষের মত শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নেই। সমস্ত ভূমণ্ডলে, আমাদের দেশের মত পবিত্র দ্রব্য আহার করে, এমন আর কোনও দেশ নাই। নিমিত্ত দোষ সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে; ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়া, এ সব মহা অপবিত্র এবং দেখ্‌তেই পাচ্ছ কিরূপ নিমিত্ত দোষে দুষ্ট ময়লা, আবর্জ্জনা, পচা, পঙ্কড় সব ওতে আছেন,—এর ফল হচ্ছে তাই। এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ, ও ঐ ময়রার বাজারে খাওয়ার ফল, এই যে প্রস্রাবের ব্যায়রামের প্রকোপ, ওও ঐ ময়রার দোকান। ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকের তত অজীর্ণ দোষ, প্রস্রাবের ব্যায়রাম হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি বিষ লড্ডুকের অভাব। এ কথা বিস্তার করে পরে বল্‌ছি।

(বৈশাখ, ১৩৯৪, পৃ. ২৬৫)

এই ত গেল খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের মধ্যে আবার অনেক মতামত প্রাচীনকালে বলেছে এবং আধুনিককালে বলছে। প্রথম প্রাচীনকাল হতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত এক মহা বিবাদ, আমিষ আর নিরামিষ। মাংস ভোজন উপকারক কি অপকারক? তা ছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্যায়, এ এক মহা বিতণ্ডা চিরদিনের। একপক্ষ বলছেন—কোনও কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয়; আর একপক্ষ বলছেন—রাখ তোমার কথা, হত্যা না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতরও মহাগোল। শাস্ত্রে একবার বল্‌ছেন, যজ্ঞস্থলে হত্যা কর—আবার বলছেন, জীবঘাত করো না। হিঁদুরা সিদ্ধান্ত কর্‌ছেন যে, যজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে সুখে মাংস ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থের পক্ষে অনেকগুলি নিয়ম আছে যে, সে সে স্থলে হত্যা না করলে পাপ;—যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশু জন্ম হয়—মনু বল্‌ছেন। অপরদিকে জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানিনি, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক, যে যজ্ঞ করবে, বা নিমন্ত্রণ করে মাংস খাওয়াবে, তাকে সাজা দিচ্ছেন। আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁফরে—তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণের মদ মাংস খাওয়ার কথা রামায়ণ মহাভারতে রয়েছে, সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মান্‌ছেন! বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রও শুনবে না ও মহাপুরুষ বলেছে বল্লেও শোনে না। পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্প-কথা, তা হলে হিঁদুরা নীরোগী হত, আর ইংরেজ আমেরিকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত রোগে লোপ হয়ে যেত এতদিনে। এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বল্‌ছেন যে, কপি খেলে কপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্য বুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বল্‌ছেন, ভাত ডালে যা আছে মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বল্‌ছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বল্‌ছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম কর্ত্তে পারে; অপর পক্ষ বল্‌ছেন, তাহলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হত; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান্ ও প্রধান। মাংসাহারী বল্‌ছে, হিঁদু চিনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দ্দশা দেখ—আর জাপানীরাও ঐ ছিল; মাংসাহার আরম্ভ করে অবধি ওদের ভো'ল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড়লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বল্‌ছেন যে, মাংসাহারে বদ হজম, আর এক পক্ষ বল্‌ছেন, সব ভুল, নিরামিষাশী গুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোঠা-শুদ্ধি রোগ শাক পাতড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তাবলে কি দুনিয়া শুদ্ধকে তাই করতে চাও? ফল কথা চিরকালই মাংসাশী জাতেরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের ধূম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্য্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার

( ৮১তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৬৬ )

ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আর্য্যসমাজি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংস খাওয়া একান্ত আবশ্যক; আর পক্ষ বলছেন একান্ত অন্যায়। এই ত বাদ বিবাদ চলছে। সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার ত বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্মকর্ম্মভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক্, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ধর্ম্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটে খুটে এই সংসারে দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরি চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈ কি। যত দিন মনুষ্যসমাজে এই ভাব থাকবে, "বলবানের জয়," তত দিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোনও রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার কর্ত্তে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্ব্বল পেষা যাবেন। রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বল্লে চলেনা—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে বিবাদ। একপক্ষ বলছেন যে, ভাত, আলু, গম, যব, জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান খাদ্যও কিছুই নয়, ও সব মানুষে বানিয়েছে, ঐ সব খেয়েই যত রোগ। শর্করা-উৎপাদক Starchy খাবার রোগের ঘর। ঘোড়া গরু পর্য্যন্ত ঘরে বসে চাল গম খাওয়ালে রুগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ঘাস শাক পাতাড় প্রভৃতি হরিৎ সবজিতে শর্করা-উৎপাদক পদার্থ বড্ড কম! বনমানুষ জাতি বাদাম ও ঘাস খায়, আলু গম ইত্যাদি খায় না; যদি খায়, ত অপক্ক অবস্থায়, যখন ষ্টার্চ্চ (Starch) অধিক হয় নাই। এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতণ্ডা চলছে। এক পক্ষ বলছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘজীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল, ফলাহারী অনেক দিন পর্য্যন্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড় গোড়ে জঙ্গ ধরতে দেয় না।

এখন সর্ব্ববাদিসম্মত মত হচ্চে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে;—যদি হজমেই সমস্ত শক্তি টুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল?

ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ি। ঘি, তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাঙ্গালা দেশের জন্য এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাহাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙ্গালী কবি লুচি কচুরীর বর্ণনা কচ্ছেন? ও লুচি কচুরী এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালে ভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি "পাকি রসুই" খেয়ে থাকে এমন লোক ত দেখি নাই। মথুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লড্ডুক-প্রিয়, দুচার বৎসরেই চোবের হজমের সর্ব্বনাশ হয়, আর চোবেজী চূরণ খেয়ে খেয়ে মরেন।

গরিবরা খাবার যোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই।

(বৈশাখ, ১৩১৪, পৃঃ ২৬৭)

একদম্ উল্‌টা আছেন বিষ—বিষ—বিষ। পূর্ব্বে লোকে কালে ভদ্রে ঐ পাপগুলো খেত ; এখন সহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা সহরে বাস করে, তাদের নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণ রোগে অপমৃত্যু হবে তার কি বিচিত্র! খিদে পেলেও কচুরী জিলিবি খানায় ফেলে দিয়ে, এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুদ্ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল্ দক্ষিণিদের মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোলমাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও, তবে ও পশ্চিমি নানা প্রকার গরম মশলাগুলো বাদ দিয়ে। মশলাগুলো খাওয়া নয়—ও গুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাইসুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদ ; পারিস-রাজধানীর ঐ স্যুপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাইসুঁটি খুব সিদ্ধ করে, তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তার পর একটা দুদ্‌ছাকনির মত তারের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আসবে। এখন হলুদ, ধনে, জিরেমরিচ, লঙ্কা, যা দেবার দিয়ে সাঁতলে নাও—উত্তম সুস্বাদ সুপাচ্য ডাল হল। যদি একটা পাঁটার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে, ত উপাদেয় হয়।

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধূম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দুচার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদ্ হজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হলো? যেটুকু হজম হবে, সেই টুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদ হজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া, দুটোই বদ হজম। পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন ( Albumen ) দেখা দিয়েছে বলেই হাঁ করে বসোনা। ওসব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনোনা। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁট আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পার ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থ যাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ "ভাল কর্ত্তে পারবো না, মন্দ করবো, কি দিবি তাই বল"। পারত পক্ষে ঔষুধ খেয়ো না। রোগে যদি এক আনা মরে, ঔষুধে মরে ১৫ আনা। পার যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্দের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন হওয়া আর কুড়ের বাদশা হওয়া দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা ত জীবন্ত রোগী, সেটা ত হতভাগা। যেটা লুচির ফুল্‌কো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা ত মরে আছে। যে এক দমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো। সেদে রোগ অকাল মৃত্যু ডেকে আনলে কে কি করবে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি, উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়ো না একদম। খামীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোনও খামীরদার জিনিস্ খাবে না ; এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্ব্বপ্রকার খামীরদার জিনিসের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে কোনও জিনিস মিষ্টি থেকে টকেছে, তার নাম শুক্ত ; তা খেতে নিষেধ,—কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয় —উত্তম জিনিস্। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয়, ত তাকে পুনর্ব্বার খুব আগুনে সেঁকে খেও।

( ৮৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৬৮ )

# উদ্বোধন : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

## সূচীপত্র

# উদ্বোধনের নিয়মাবলী

● **লেখক-লেখিকাদের জন্য :** ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প,শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার ও গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে রেজেস্ট্রি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা ডাকটিকিট সম্বলিত কার্ড / ইনল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

● **গ্রাহকদের জন্য :** মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৫'০০ টাকা, বাংলাদেশ ৪৩'০০ টাকা, ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে সি মেল-এ ৮৮'০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২৩৩'০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২'৫০ টাকা। বছরের যে কোন সময়ে বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে মাঘ মাস থেকে।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।

● **আজীবন-গ্রাহকদের জন্য :** এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০.০০ টাকা) ৪০০'০০ (চারশ) টাকা দিলে আজীবন-গ্রাহক (৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। যে কোন মাস থেকে আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পত্রাদি লিখবার সময় **গ্রাহক-সংখ্যা** অবশ্যই উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানাতে হবে।

কার্যালয়ে নিজে এসে অথবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া, অথবা মনিঅর্ডারযোগে বা ডিমাণ্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট্ "Udbodhan Office" এই নামে করতে হয়।

● **প্রকাশকদের জন্য :** সমালোচনার জন্য দুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন।

● **বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :** কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাবে।

● **কার্যালয়ের সময় :** সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০, রবিবার বন্ধ।

কার্যাধ্যক্ষ
**উদ্বোধন কার্যালয়**
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৩
ফোন : ৫৫-২৪৪৭



৮৯তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪

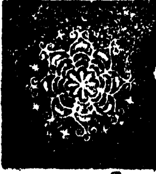
## দিব্য বাণী

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্ ।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥
শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ ॥

ঘোর অন্ধকারময় এই ভবসাগরে পড়িয়া যাহারা অনবরত হাবুডুবু খাইতেছে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্ শান্ত সাধুদের সঙ্গ পরম আশ্রয়, যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে সুদৃঢ় নৌকা।

নূতন পাতা, ফুল ও ফলের সম্ভার রচনা করিয়া বসন্ত-ঋতু যেমন জীবজগতের সুখবর্ধন করে, সাধু-মহাত্মারাও সেইরূপ নিজেরা এই দুস্তর সংসারসাগর পার হইয়া—প্রতিদানের কোনরূপ প্রত্যাশা না রাখিয়া—সংসারসমুদ্রে পড়িয়া যাহারা হাবুডুবু খাইতেছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য সতত যত্নশীল হন।

[ উদ্ধবগীতা, ২৬।৩২, বিবেকচূড়ামণি, ৩৭ ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## সৎসঙ্গ

কথায় বলে "সৎসঙ্গে কাশীবাস।" হিতোপদেশে ( শ্লোক ৪৫ ) আছে :

কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥

পুষ্পের সংসর্গে কীটও সৎলোকের মস্তকে স্থান পায়, মহাপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শিলাখণ্ডও দেবত্ব লাভ করে।

ধর্ম-জীবনে অগ্রসর হইবার জন্য সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন : "সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার। সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।" ( কথামৃত, ২।২।৮ ) শাস্ত্রাদিতেও দেখি সৎসঙ্গের মহিমা বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১০।৪৮।৩১ ) আছে : জলময় স্থান বিশেষই একমাত্র তীর্থ নহে, অথবা মৃত্তিকা বা পাষাণনির্মিত মূর্তিই একমাত্র দেবতা নহেন। দীর্ঘকাল সেবিত হইয়া তাঁহারা মানুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধুগণের দর্শন তৎকালেই শুদ্ধির হেতু হইয়া থাকে। সোজা কথায় দীর্ঘকাল সেবা করিলে তীর্থ ও দেবতা সেবাকারিগণকে পবিত্র করেন, অপর পক্ষে, সাধু মহাপুরুষরা দর্শনমাত্রেই তাঁহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ( মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ ২২ ) সাধুসঙ্গ-প্রসঙ্গে আছে :

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়
লব-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

সৎসঙ্গে সাধকের চিত্তে সার-অসার-বস্তু-বিবেক সতত জাগ্রত হয়। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, কালে তাঁহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন সাধুসঙ্গের ফলে "ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। যেমন বাড়িতে কারুর অসুখ হলে সর্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, কিসে রোগী ভাল হয়। আবার কারো যদি কর্ম যায়, সে ব্যক্তি যেমন অফিসে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল হতে হয় সেরূপ।" ( কথামৃত, ৫।১।২ ) আরও বলিতেন : "সাধুসঙ্গ করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ নিত্যপদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎপথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতী পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙ্গস মারে।" ( কথামৃত, ৫।১।২ ) কাজেই দেখা যাইতেছে, সাধুসঙ্গের ফলে মনে সদসৎ বিচার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। বিচারবুদ্ধি জাগরিত হইলে বিষয়বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। আর বিষয়বাসনা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সাধকের শুদ্ধচিত্তে পরিণামে পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। "গিরিরাজকে পার্বতী বল্লেন, বাবা ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও তা হলে সাধুসঙ্গ কর।" ( কথামৃত, ৪।৭।২ ) সাধুদের মহিমাকীর্তন-প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করের সাধনপঞ্চকে ( শ্লোক—১ ) আছে : "সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়াধীয়তাং"—সাধক সর্বদা সৎসঙ্গ করিবেন ও দৃঢ় ভক্তিসহকারে ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করিবেন। অশুচি জলধারা

যেরূপ গঙ্গায় পতিত হইয়া শুদ্ধরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সৎসঙ্গ, মহাপুরুষদের সঙ্গও সকলেরই কল্যাণবিধান করিয়া থাকে। আরও বলিয়াছেন: "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা" (মোহমুদ্গর-৫)—ক্ষণকালের সাধুসঙ্গও আমাদের নিকট এই দুরতিগম্য ভবসাগর পাড়ি দেওয়ার নৌকাস্বরূপ।

এখন প্রশ্ন হইল প্রকৃত সাধু চিনিবই বা কিরূপে? প্রকৃত সাধুর লক্ষণই বা কি? এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর একটি কথা স্মরণ করিতে বলি। তাঁহার কথায় আছে: "যাঁহাদের দেখিলে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম।/তাঁহাদের জানিবে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥" বলা নিষ্প্রয়োজন বৈষ্ণব বলিতে এখানে প্রকৃত ভক্ত-সাধুর কথাই বলা হইয়াছে। সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উক্তিটি এই: "যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে তিনিই সাধু। যিনি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু—তিনি স্ত্রী-লোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না। সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন,—যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন। ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।" (কথামৃত, ১।৯।২) যাঁহার জীবন সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, যিনি নিজে এই সংসার জলধির পারে গিয়া অহেতুক করুণাবশতঃ অপরকেও পার করিবার জন্য সদা প্রস্তুত তিনিই প্রকৃত সাধু। এইরূপ সাধুর দর্শন ও সঙ্গলাভে হৃদয়ে দিব্যভাবের স্নিগ্ধ পরশ অনুভূত হয়, অপার্থিব আনন্দের সুখস্পর্শে দেহমন হয় পরিতৃপ্ত। এইরূপ সাধুর সঙ্গ "ঘোর অন্ধকারময় এই ভবসাগরে পড়িয়া যাহারা অনবরত হাবুডুবু খাইতেছে তাহাদের পক্ষে পরম আশ্রয়—যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে সুদৃঢ় নৌকা।" (উদ্ধবগীতা, ২৬।৩২) স্বামী তুরীয়ানন্দজী ২৫।১১।১৫ তারিখে (স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ১৮২-৮৮) এক পত্রে লিখিয়াছেন: "সাধুসঙ্গ ছাড়া কিছু আপনার ভাল লাগেনা শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। ইহা যদি অহংকার হয় তাও ভাল; কেন না ইহাকেই তো ভবার্ণবতরণে নৌকা (সাধুসঙ্গই ভবসমুদ্র পার হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ) বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। সকল তপস্যার ফল একদিকে এবং একক্ষণ সাধু-সঙ্গের ফল একদিকে রাখায় সাধুসঙ্গের তুলাদণ্ড সাধুসঙ্গফলের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—শাস্ত্রমুখে ইহা অবগত হইয়াছি।"

সাধুসঙ্গের আর একটি গুণ "সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।" (কথা-মৃত, ৫। পরিশিষ্ট ক।৪) আমাদের ঘড়ি, সংসারের দিকে কতটা যাইতেছে আর ঈশ্বরের দিকেই বা কতটা যাইতেছে—ইহা ঠিক করিবার জন্যই সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গের ফলে সাধারণ লোক, ঘোর নাস্তিক পাষণ্ডও যে মহাপুরুষে পরিণত হইয়াছেন, সাধুসঙ্গের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া রূপ-সনাতন দুই ভাই নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ছিলেন ঘরের মানুষ তাঁহারা বৈরাগীর দীন-হীনবেশে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধুসঙ্গের ফলে নরঘাতক দস্যু রত্নাকরের মহামুনি বাল্মিকীতে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূত সঙ্গলাভের ফলে ঘোর পাষণ্ড জগাই-মাধাইয়ের ঈশ্বর-ভক্তরূপে রূপান্তরের কাহিনী পুরাণ-ইতিহাস পাঠকদের নিকট সুবিদিত।

আবার প্রশ্ন জাগে, এইরূপ সাধু কোথায় পাইব যাঁহার পূত সংস্পর্শে আমাদের জীবনের

রূপান্তর ঘটিতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়।" (কথামৃত, ৫। পরিশিষ্ট কা৪) বলিতেন: "তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয় ত এমন কোন সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন, যাতে সুবিধা হয়ে গেল। কেউ হয় ত বলে দেয়, এমনি এমনি কর তাহলে ঈশ্বরকে পাবে।" (কথামৃত, ৫। পরিশিষ্ট কা৪) সত্যই যদি আমরা সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং নিত্যবস্তু লাভের জন্য আন্তরিক আগ্রহী হই, পথ-নির্দেশ পাওয়ার জন্য মহাপুরুষ-সংশ্রয় আপনা হইতেই জুটিয়া যাইবে।" ঠিক পথ জানে না কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে তাঁকে জানবার ইচ্ছে আছে, এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। "একজন ভারী ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল। পুরীর পথ কোনদিকে সে জানতো না, দক্ষিণদিকে না গিয়ে পশ্চিমদিকে গিছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করত। তারা বলে দিলে, 'এ পথ নয়, ঐ পথে যাও।' ভক্তটি শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে। দেখ, না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয়।" (কথামৃত, ১।১৫।২)

তাছাড়াও যে-সব গ্রন্থে মহাপুরুষদের লীলা-কথা বর্ণিত আছে, যেমন—শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ইত্যাদি—সেইসব পাঠ করিলেও সাধুসঙ্গের ফল হয়। মনকে তাঁহাদের সান্নিধ্যে লইয়া যায়। যে পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ ও হাস্য-কৌতুকাদি করিতেন তাহার নিখুঁত ছবি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে কথামৃতের পাতায় পাতায়, কুশলী শিল্পী 'শ্রীম'র তুলির সুনিপুণ স্পর্শে। তাঁহার অঙ্কিত অগণিত চিত্রের একখানি চিত্র এখানে উপ-স্থাপিত করিতেছি। চিত্রটি এইরূপ: "গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী।... সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত।...দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্ত-পোষে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন। ...মাস্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। তাহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও নাম সঙ্কীর্তন করিতেছেন।" (কথামৃত, ১।১।২) কথামৃত পাঠ করিবার পূর্বে আমরা যদি এই চিত্রটির ধ্যান করিতে এবং কল্পনানেত্রে এই দৃশ্যটিকে দেখিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে পাঠক নিজেও যে একঘর লোকের মধ্যে একজন এবং 'নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন'—এইরূপ মনে হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ভাবের গভীরতা যাঁহার যত বেশি হইবে, কথামৃত পাঠের মাধ্যমে শ্রীরাম-কৃষ্ণের পূত সঙ্গও তিনি তত বেশি অনুভব করিবেন।

সাধু-সন্তদের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যস্থানাদিও ভক্তমনকে সাধুসান্নিধ্যে লইয়া যায়। কথামৃত লেখক 'শ্রীম' (মাস্টারমশাই) দক্ষিণেশ্বরে গেলে "সর্বক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিতেন। তাঁহার দৃষ্টি, আনন, চলনদৃষ্টে মনে হইত তিনি অতীতের সেই রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে—প্রাণের দেবতা শ্রীরাম-কৃষ্ণের সঙ্গেই যেন বেড়াইতেছেন। ঠাকুর যেখানে বসিতেন যেন তাঁহার পাশেই বসিতেছেন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। নাটমন্দিরে একটি স্তম্ভকে আলিঙ্গন করিতেন ঠাকুর একসময় এই স্তম্ভটি আলিঙ্গন করত: বলিয়াছিলেন যে অন্তরঙ্গ ভক্ত হইল যেন এইরূপ

ভিতরের জন্য। যেসব বৃক্ষগুলি ঠাকুর স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহা তিনি আলিঙ্গন করিতেন। কুঠিবাড়ির যে ঘরে ঠাকুর রাসমণি ও মথুরবাবুর জীবদ্দশায় থাকিতেন সেই ঘরটিও দর্শন করিতেন। ঠাকুরঘর, বেলতলা, পঞ্চবটী-আদি স্থানে বসিবার বা চলিবার সময় যেখানে দাঁড়াইতেন সেখানে ভক্তদিগকে খুব সাবধানে থাকিতে হইত। তিনি ঐসকল স্থানে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছেন—ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিত না।...মন্দির হইতে বেলতলা পর্যন্ত রাস্তার বা পুকুরের ঘাটে যে যে স্থানে ঠাকুরের সহিত দাঁড়াইয়া কথাবার্তা হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইতেন এবং দিনক্ষণ উল্লেখ করিয়া কখন কখন ঠাকুরের কথা বলিতেন।" (শ্রীম-কথা, উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৯৩, পৃ: ৯৬) এইভাবে তাঁহার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল শরীরের অদর্শনের পর 'শ্রীম' তাঁহার পূত সান্নিধ্য লাভ করিতেন।

ব্যাকুলতা থাকিলে সাধুসঙ্গ জুটিয়া যায় তাহা অবধারিত সত্য। কিন্তু ঐরূপ ব্যাকুলতা তো সকলের হয় না। আর ঐরূপ ব্যাকুলতা যাহাতে বর্ধিত হয় তাহার জন্যই সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। এই সাধুসঙ্গ লাভ করিতে হইলে বিশেষ দরকার মানসিক প্রস্তুতি ও ব্যক্তিগত উদ্যম। স্বামীজীর জীবনে দেখি তিনি তৎকালীন সমাজে যাঁহারা ধর্মনেতা বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের সাক্ষাতে যাইতেন এবং তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা প্রশ্নাদিও করিতেন। তাঁহার এই ব্যক্তিগত উদ্যম ও অনুসন্ধিৎসু মনই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে আনয়ন করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনেও দেখা যায় সৎসঙ্গ করিবার জন্য তিনি সর্বদা বিশেষ আগ্রহী। যাঁহারা ধর্মপ্রসঙ্গ ও ঈশ্বরীয় কথা বলিতেন তাঁহাদের সঙ্গলাভের জন্য তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় ছুটিয়া যাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে যে-সব সাধু-সন্তেরা আসিতেন তাঁহাদের সঙ্গেও তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিতেন। তীর্থদর্শনে গিয়াও ঠাকুর সাধুসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন। যদিও ঠাকুরের জীবনে এইসব সাধু-সঙ্গের প্রয়োজন ছিল কিনা সেই প্রশ্ন এখানে নহে। তাঁহার সব কাজই লোকশিক্ষার জন্য। আর এই সাধুসঙ্গলাভ করিবার পক্ষে আত্ম-প্রচেষ্টা ও মানসিক প্রস্তুতি যে একান্ত প্রয়োজন —তাহাই যেন নিজ জীবনে আচরণ করিয়া তিনি ভগবানলাভেচ্ছু মানুষকে শিক্ষা দিয়া গেলেন।

তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ করলে তবে সদসৎ বিচার আসে। সাধুসঙ্গ কেমন জান?—যেমন চাল ধোয়ানি জল। যার অত্যন্ত নেশা হয়েছে তাকে যদি চালের জল খাওয়ান যায়, তা হলে তার নেশা কেটে যায়। সেইরূপ এই সংসার-মদে যারা মত্ত হয়েছে, তাদের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

# স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[ শ্রীমতী সুধালতা বসুকে লিখিত ]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
সারগাছী, পোঃ মহুলা, ( মুর্শিদাবাদ )
২.৪.৩৬

পরমকল্যাণীয়াসু,

তোমার ৩০শে মার্চ্চের পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। এখানে আসিয়া আমার শরীর একটু ভালই মোটের উপর আছে। তবে যেমন স্বাভাবিক কখনো একটু ভাল এবং কখনো আবার একটু মন্দ এইরূপই চলিতেছে।

সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিবে শ্রীশ্রীঠাকুর জাজ্বল্যমানভাবে মঠে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি নিজমুখে স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন 'তুই আমাকে মাথায় করে যেখানে নিয়া রাখবি, আমি সেখানেই থাকব।' বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজী নিজমুখে ইহা বলিয়া আত্মারামের কৌটা মাথায় করিয়া আনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে উহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্বামীজী নিজের সম্বন্ধে বলিতেন যে দেহাবসানে তিনি তাঁহার সেই ঘরটিতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিবেন। দাদার কাছেও বার বার অনেক কথা শুনিয়াছি। সুতরাং আমি ওখানে না থাকিলেও সর্ব্বদা এইসব ভাব স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী, দাদা প্রভৃতির সান্নিধ্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে, দেখিবে উহাতে অসীম আনন্দ অনুভব করিবে এবং শান্তিতে ভরপুর হইয়া যাইবে। তুমি দাদার কত স্নেহ লাভ করিয়াছ এবং তাঁহার সেবাধিকার পাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছ। তোমার আর এ সংসারে ভাবিবার কিছুই নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার জীবন শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া দিন ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

লুনার শরীরটা ভাল নয় জানিয়া আমি চিন্তিত ও দুঃখিত। আশা করি সে একয় দিনে ভাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সংবাদ আমাকে পত্র পাইয়াই জানাইও।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদাদি জানিবে। আশা করি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
অখণ্ডানন্দ

পুঃ আমার চোখে ভাল দেখিতে পাইনা তাই স্বহস্তে চিঠি লিখিতে গিয়া অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমার শুভাশীষ জানিবে।

অখণ্ডানন্দ

# রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী

## শ্রীরাজীব গান্ধী

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধজন্মশতবার্ষিকী ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি—এই দুই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব আজ আমরা উদ্‌যাপন করছি। এই ঘটনাদুটি অনেকাংশে ভারতের নবজন্মের প্রতিরূপ। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবনকালে ভারতের নব অভ্যুদয়ের আলোক-শিখা প্রজ্জ্বলিত করেন। তাঁর মহাসমাধি বৎসরে বরাহনগরে* রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা কি এক মহৎ জাতীয় উদ্যোগ যাতে কর্মপ্রেরণা ও আদর্শবাদের সঙ্গে প্রেম ও কর্মের সংযোগ সাধিত হয়েছে,—দরিদ্রনারায়ণসেবার দ্বারা সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মীয় কার্যক্রম সূচিত হয়েছে। ধর্মীয় দর্শনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ মানুষের কর্তব্য ও তার বিশ্বজনীন প্রয়োগের ক্ষেত্র রচনা করেছে। কিন্তু তাতে সমাজের আশু প্রয়োজনের লক্ষ্যাভিমুখী দর্শনও উপস্থাপিত হয়েছে। আর জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সঙ্গে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারীসমাজের সমুন্নতি, প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসাধিত বিপর্যয়ে ক্লিষ্ট মানুষের সেবাকার্য প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ক্ষেত্রে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের সঙ্গে গৃহীভক্তদের সংযোগসেতুও রচনা করেছে। স্বামী বুধানন্দ বলেছেন, মঠ রচনা করেছে এর আধ্যাত্মিক সুস্থিতি আর মিশন মানবিক গতিশীলতা। ভারতের প্রত্যন্ত অংশে প্রসারিত রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল-কলেজ দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। আমি নিজে অরুণাচল প্রদেশের আলং-এ মিশনের এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছি।

পণ্ডিতজী (পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু) তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, বিবেকানন্দ ও অন্যান্যরা আমাদের হৃত আত্মসম্মানকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন এবং অতীত ঐতিহ্যের জন্য গৌরববোধ জাগ্রত করেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যেমন অতীতের জন্য গৌরববোধকে জাগিয়েছেন তেমনি তার মধ্যে অশুভ দিকগুলি—যথা, নারী-উৎপীড়ন, অস্পৃশ্যতা, জাতি ও ধর্মভিত্তিক ভেদাভেদ—চিহ্নিত করে সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। দুঃখের কথা, সকল সম্প্রদায়ের কাছে আধ্যাত্মিক সত্য পরমমূল্য লাভ করেনি এবং তাকে গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতায় বিকৃত করার জন্য আমাদের আজ নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মানুষের সামাজিক ভূমিকা থেকে আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্বকে পৃথকভাবে দেখেছেন, সকল ধর্মমতে সাধনা করেছেন এবং এক সর্বজনীন সত্যে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন: আমি হিন্দু, ইসলাম, খ্রীষ্টান সকল ধর্মমতেই সাধনা করেছি—হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতেও সাধনা করেছি—দেখেছি, বিভিন্ন পথ দিয়ে সকলে সেই এক ঈশ্বরকে সাধনা করছে। এই ধরনের গভীর উপলব্ধিই ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বজনীন উদ্দেশ্যসাধন ও কর্তব্যের মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল। আজ এই উপলব্ধির বিশেষ প্রয়োজন নতুন ভারত গড়ে তুলতে—তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নতুন বিশ্ব গঠন করতে। এক মহৎ সত্যরূপে রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা কর্তব্য—বিশ্বের সকল মানুষের সম্মুখে শান্তি ও প্রগতির জন্য রামকৃষ্ণের শিক্ষাকেই সত্যরূপ উপস্থাপিত করাই একমাত্র পথ।

সহস্র বৎসরের ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যধারায় শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা জাতির আত্মিক

* বস্তুতঃ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায়।—সঃ

বৈশিষ্ট্যে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট কিন্তু সেই শক্তি সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই উন্মাদ ধর্মীয় সংস্কার ও অকিঞ্চিৎকর সংস্কৃতিবোধ এখনও আত্মপ্রকাশ করছে। এরা ধর্মের সারতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ না করে বহির্জগত আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আজ আমাদের এরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। এখনও অনেকে ধর্মকে দেখেন কৃত্রিম ধর্মান্ধতা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তার চেয়ে গভীরতর বস্তু। এই মৌলবাদকে প্রতিরোধ করার অর্থ ধর্মকে অস্বীকার করা নয়—এর দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত সর্বধর্ম সমন্বয়ে নির্দিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করা যার মধ্যে সকল ধর্মকে গ্রহণ এবং উচ্চতর সত্যের স্বীকৃতিই নিহিত। কোন কোন ধর্মীয় মতাদর্শে প্রকাশিত সঙ্কীর্ণ চিত্তবৃত্তির প্রতিরোধের এই উপযুক্ত সময়। আমাদের কর্তব্য, আমাদের সভ্যতার গভীরতর মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমগ্র সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। সেই মূল্যবোধ ভারতের মাটিতে গড়ে উঠেছে সমস্ত ধর্মমতের সমন্বয়ে ও স্বাঙ্গীকরণে। মৌলবাদকে সঙ্কীর্ণতর মৌলবাদ দিয়ে জয় করা যায় না। উদারতর প্রেক্ষায় উচ্চতর সত্যের মাধ্যমেই তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

আধ্যাত্মিকতার যে সূত্রটি আমাদের উত্তরাধিকারের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে, প্রগতি, সমৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের নামে তাকে ছিন্ন করা চলবে না। আমাদের অতীত মূল্যবোধকে রক্ষা করে, আমাদের উত্তরাধিকারের মধ্যে কল্যাণকর দিকগুলি জীবিত রেখে এবং সংস্কৃতিকে অটুট রেখে যদি আমাদের বিকাশ ঘটে, পরবর্তী শতাব্দীতে উত্তরণ ঘটে, তবেই তা হবে যথার্থ মঙ্গলজনক। আধুনিকীকরণের নামে যদি আমরা নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতা বিসর্জন দিই তাহলে তাকে আমাদের প্রগতি বলা যাবে না—আমাদের দেশকে সমুন্নতও বলা যাবে না। যদি সামগ্রিক উন্নতি ঘটাতে হয় তাহলে আমাদের অগ্রগতির মধ্যে নিহিত থাকবে আত্মিক সমুন্নতি, মানব-সাধারণের সমুন্নতি।

এই আধ্যাত্মিকতাই আমাদের সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করেছে। এই আন্তর শক্তিই আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, সমগ্র সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের ঊর্ধ্বে স্বার্থহীনতাকে, ভীতির ঊর্ধ্বে ভীতিশূন্যতাকে এবং জ্ঞানের ঊর্ধ্বে প্রজ্ঞাকে স্থাপন করতে শিক্ষা দিয়েছে। ভারতকে বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তিরূপে গড়ে তুলতে হলে, তাকে দারিদ্র্য থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে হলে, সেখানে প্রাচুর্য চিরবহমান রাখতে হলে এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে, আমাদের গৌরবের কালে, সংগ্রামের কালে, অপকর্ষের কালে যে আধ্যাত্মিকতা আমাদের মধ্যে চিরপ্রবহমান, যা আমাদের শিকড়ের সঙ্গে চিরদিন সংযুক্ত রেখেছে তাকে বিসর্জন দিলে সব প্রয়াসই নিরর্থক হবে। বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ ওঠো, জাগো, ভারতবর্ষ, তোমার আধ্যাত্মিকতা দিয়ে বিশ্বজয় কর। এই বাণী একদিন উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত জাতীয় চেতনা জাগ্রত করেছিল। আজ বিশ শতক থেকে একুশ শতকে পদার্পণের মুহূর্তেও তা সমভাবে প্রয়োজনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ তাঁদের নতুন চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজেদের বিশিষ্ট করেছেন কিন্তু তাঁদের নবতর চিন্তার মধ্যেও তাঁরা অতীতের সঙ্গে সংযোগ-সূত্রটি পরিত্যাগ করেননি—তাঁদের চিন্তার সজীবতায় সেই অতীত উত্তরাধিকার নতুনতর শক্তি লাভ করেছে। উনিশ শতক থেকে বিশ

শতকে উত্তরণের কালে এই মানসিক গতিশীলতা যেমন প্রয়োজন ছিল, আজ একুশ শতকে পৌঁছবার মুহূর্তেও তা ঠিক ততখানিই প্রয়োজন। শতাব্দী ব্যাপী [রামকৃষ্ণ] মিশন জাতি ও জনগণের সেবা করেছেন তার জন্ম আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই—তাঁদের সাধুবাদ দি। আপনারা পশ্চাদ্বর্তী ক্লান্ত মানুষের সম্মুখে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেছেন। সকল জীবের প্রতি প্রেমের মধ্য দিয়ে, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের সেবা করে, সাধনা ও কর্মের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের বিশুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত ধর্মের আদর্শকে স্থাপন করে বিবেকানন্দের সেই বাণীকেই সার্থক করে তুলেছেন, "মানুষ তার অন্তরে প্রচ্ছন্ন দেবস্বরূপকে প্রকাশ করুক—সকলকে বিশ্বের আধ্যাত্মিক একত্বের বিকাশে সচেতন করে তুলুক।"*

* দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সার্ধশতবার্ষিকী ও রামকৃষ্ণ সংঘের শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ১০ ফেব্রুআরি, ১৯৮৭ তারিখে 'Siri Fort Auditorium'-এ প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীর উদ্বোধনী ভাষণ (ইংরেজী) থেকে অনূদিত। অনুবাদক: অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

# তুমিময়

(রামকৃষ্ণকথামৃত অনুসরণে রচিত)

শ্রীরতন কুমার নাথ

সর্ববিদ্যালাভ শেষে
ভ্রমিয়া দূরের দেশে
জ্ঞানগর্বী পুত্র আসে ফিরে
অবশেষে পিতার কুটিরে॥
কে তুমি বাহির দ্বারে?
পিতা হেঁকে কন তারে।
পুত্র বলে—পিতা! আমি, আমি!
কহিলেন পিতা শেষে থামি—
শিক্ষা তব নহে শেষ
ফিরে যাও গুরুদেশ
শিক্ষা শেষে এসো তুমি ফিরে।
নতমুখে পুত্র চলে ধীরে॥

আরো কিছু বর্ষ পরে
পুত্র ফিরে আসে ঘরে;
পিতা কন—কে তুমি বাহিরে?
বিনীত পুত্র কহে ধীরে—
আমির হয়েছে ক্ষয়
এ-জগৎ তুমিময়
বাহিরেও দাঁড়াইয়া তুমি।
আনন্দিত পিতা তার
খুলে দেন গৃহদ্বার
বক্ষ মাঝে পুত্রে নেন চুমি।

# মস্কোতে বিশ্ব-শান্তি সম্মেলন ১৯৮৭

স্বামী গীতানন্দ

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দকে 'আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষ' বলে ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল যে যুদ্ধমুক্ত পৃথিবীতে মানুষ শান্তিতে বাস করতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ৪০ বছর পরেও, এই আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষে এমন একটি দিনও কাটেনি, যখন পৃথিবীর কোন না কোন জায়গায় পররাজ্য আক্রমণ, রক্তপাত, অত্যাচার হয়নি, মানুষ ও জাতির অধিকার পদদলিত হয়নি। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তি-প্রচেষ্টা যেন ক্রমেই কঠিনতর হয়ে উঠছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখতে পাই যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র, নিজেরা আক্রান্ত হতে পারে—এই অছিলায় যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য প্রতি মিনিটে ১৭ লক্ষ ডলার খরচ করে চলেছে। এর ফলে যে বিপুল পরিমাণ পরমাণু-অস্ত্র বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে জমা হয়েছে, তাতে এই পৃথিবীকে ১০ বার নিঃশ্চিহ্ন করা যেতে পারে!

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অগষ্ট হিরোশিমাতে যে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল, তার ধ্বংস-ক্ষমতা এবং মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কাহিনী জগৎকে হতচকিত করে দিয়েছিল। এর পর যে-সব নতুন নতুন পরমাণু-অস্ত্র তৈরি হয়েছে, তার অতি ভয়ঙ্কর শক্তি এবং যদি কখনও সেগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহলে মানুষের যে চরম দুঃখ দুর্গতি হবে, তা কল্পনা করতেও প্রাণ কেঁপে ওঠে। অপর দিকে বিজ্ঞানের প্রযুক্তির সাহায্যে জগতের প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে সুখে শান্তিতে বাস করা সম্ভব। একদিকে সামগ্রিক ধ্বংস, অপরদিকে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির ইঙ্গিত। যে পরমাণু-অস্ত্রের করাল ছায়া পৃথিবীকে শঙ্কিত করে তুলেছে, তাকে অতিক্রম করে জগতে শান্তি ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে, পরমত-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করতে হবে, এবং সকলকে সমান সুযোগ লাভের অধিকার দিতে হবে—এই তো লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে, বিশ্বের চিন্তাশীল লোকেরা বিভিন্ন সভা-সমিতি ও লেখার মধ্য দিয়ে, 'যুদ্ধ নয়, শান্তি'র বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। গত ১৬ এবং ১৭ জানুআরি, (১৯৮৭), কোলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অফ্ কাল্চারে এই রকম একটি শান্তি-সভার আহ্বান করা হয়েছিল। সেখানে দেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে রাশিয়া থেকে আগত কয়েকজন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক যোগ দিয়েছিলেন। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকেরা বিভিন্ন সময়ে সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে আণবিক যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী এবং শান্তিময় জীবনের কথা আলোচনা করেছেন। গত বছর (১৯৮৬) গরমের সময় মস্কোতে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; সেখানে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে যুদ্ধ, শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ—বিশেষ করে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের বিষয় আলোচনা করেন। মিখাইল গরবাচেভ সেই সময় বিজ্ঞানীদের এই শান্তি-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পৃথিবী যখন ক্রমবর্ধমান ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রের আবিষ্কারে মত্ত, যখন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে নক্ষত্র-যুদ্ধের (Star war) কথা ভাবা হচ্ছে, তখন এই বিষয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মতামত

জানার বিশেষ সার্থকতা রয়েছে; কারণ এইসব মারণাস্ত্রের ধ্বংস-ক্ষমতা বিজ্ঞানীরা যেমন জানেন, সেরকম আর কেউ জানবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এইরকম ছোটবড় আলোচনা-সভার মাধ্যমে শান্তি-প্রচেষ্টাকে জোরাল করার চেষ্টা হয়েছে।

এ বছর (১৯৮৭) ১৪ ফেব্রুআরি থেকে ১৬ ফেব্রুআরি পর্যন্ত "মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরমাণু অস্ত্র-মুক্ত পৃথিবী"—এই বিষয়ে মস্কোতে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ সভায় পৃথিবীর ৮৬টি দেশ থেকে প্রায় এক হাজার রাজনীতিবিদ্, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ্, সাংস্কৃতিক-বিশেষজ্ঞ, ধর্মনেতা প্রভৃতিরা যোগ দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে মধু লিমাইয়া, এম, পি, মনুভাই শা (পূর্বতন বাণিজ্য মন্ত্রী), কৃষ্ণ আইয়ার (পূর্বতন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক), অমৃতা প্রীতম্ (জ্ঞান-পীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক), মৃণাল সেন (সিনেমা ডিরেক্টর) প্রভৃতি আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকেও অনেকে এসেছিলেন। যারা যে বিষয়ে কৃতবিদ্য, তারা সেই সেই বিষয়ের জ্ঞানী-গুণীদের সাথে একত্রিত হয়ে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এইসব বিভিন্ন গোষ্ঠী-আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল এক-ই—তাদের নিজের নিজের অধিগত জ্ঞানের মাধ্যমে কিভাবে পৃথিবীকে পরমাণু অস্ত্র-মুক্ত করা সম্ভব হবে, সে বিষয়ের পথনির্দেশ। মস্কোর এই আন্তর্জাতিক শান্তি-সভার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল এই যে, (ক) পরমাণু-অস্ত্র পরীক্ষা নিরোধ, (খ) নিরস্ত্রীকরণ, এবং (গ) মহা-শূন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না করার বিষয়ে জগতের মানুষকে সচেতন করে তোলা, যাতে সকলে নিজের নিজের দেশের সরকারকে এবং পরমাণুশক্তিধর রাষ্ট্রকে শান্তির জন্য প্রভাবিত করতে পারে।

সম্প্রতি রাশিয়ার অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে; মানুষের অধিকার এবং জনমতের উপর গুরুত্ব দেবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এতদিন রুশ দেশ যেন লৌহ-যবনিকার অন্তরালে ছিল। ওখানকার এইসব পরিবর্তন একটা নতুন বিপ্লবের মতোই শোনাবে। তার ফলে বিশ্ব বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী, শাখারোভ, যিনি রাষ্ট্র থেকে ভিন্ন মত পোষণ করার অপরাধে গত সাত বছর ধরে অন্তরীণ ছিলেন, তাকে এবং আরও অনেক ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র রাশিয়ার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থাকে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করার অধিকার দিয়েছে। যুব সমাজের মধ্যে মদ্যপান ও মাদকাসক্তির (drug addiction) আধিক্য রাষ্ট্রনায়কদের ভাবিত করে তুলেছে এবং এইসব বন্ধ করার জন্য চেষ্টাও চলেছে। সর্বোপরি রাশিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে? দেশের রাজস্বের একটা বিরাট অংশই তো অস্ত্র তৈরি এবং প্রতিরক্ষার জন্য খরচ হয়ে যাচ্ছে; আবার খরচ না করেও তো উপায় নেই। আমেরিকা যদি যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করেই চলে, আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েই যায়, তবে রাশিয়ার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। অনুরূপ ভাবে, এই কথাই আমেরিকার পক্ষেও প্রযোজ্য। এই পরি-প্রেক্ষিতে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে রেইকজাভিকে প্রেসিডেন্ট রেগন এবং জেনারেল সেক্রেটারি গরবাচেভ, দুই জনেই নীতিগতভাবে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণে সম্মত হন; কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের

পূর্ব-সর্তগুলো মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। রেইকজাভিকের শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু এই শান্তি-প্রচেষ্টা মানুষের মনে এই আশা এনে দিয়েছে যে একদিন না একদিন পৃথিবীকে আণবিক যুদ্ধমুক্ত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া চেরনোবাইলে যে আণবিক দুর্ঘটনা সম্প্রতি ঘটে গেছে, তা রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মনে এক গভীর দাগ কেটে গেছে। এই রকম দুর্ঘটনা যে কোন আণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রেই হতে পারে। ফলে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নায়কেরা নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে আরও বেশি সচেষ্ট হয়েছেন।

এই পটভূমিকায় পরমাণু-অস্ত্র বিরতি এবং বিশ্ব-শান্তির উদ্দেশ্যে এ বছর (১৯৮৭) ফেব্রুআরি মাসে মস্কোতে যে আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা হয়েছিল, তার ধর্মীয় বিভাগের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য রাশিয়ান অরথোডক্স চার্চের আমন্ত্রণে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী গীতানন্দ এবং ডঃ এস্. এন. রায়। সোভিয়েত রাষ্ট্র, যারা এতদিন ধর্মকে আফিং-এর সাথে তুলনা করেছেন, তারাই এই আন্তর্জাতিক শান্তি-সভার ধর্ম বিভাগের পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন ওখানকার অরথোডক্স চার্চের উপর। এই থেকে মনে হয় যে ধর্ম বিষয়ে তারা আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করেছেন। এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্র ধর্মকে না মানলেও সেখানকার লোকদের ব্যক্তিগতভাবে ধর্মাচারণের কিছুটা স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ছিল; তার ফলে রাশিয়াতে বহু খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা রয়েছেন। ওখানকার রাষ্ট্র ও লোকেরা ঈশ্বর এবং অতীন্দ্রিয় ভাব বর্জিত ন্যায়নীতিতে বিশ্বাসী।

যাইহোক, ধর্মীয় বিভাগের অধিবেশনে ৫৬টি দেশ থেকে ২১৫ জন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি এসেছিলেন; ৫৬টি দেশ থেকে ২১৫ জন বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, হিন্দু, জুইস, মুসলমান এবং শিন্টো ধর্মের প্রতিনিধি এসেছিলেন। অধিবেশনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিদের ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে রাখা হয়েছিল। যে দল যে হোটেলে ছিলেন, সেই হোটেলেরই সভাগৃহে তারা দুই দিন ধরে (১৪ এবং ১৫ ফেব্রুআরি) কিভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে, সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, ধর্মের সাহায্যে পৃথিবীকে পরমাণু অস্ত্র-মুক্ত করে শান্তিতে মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা হতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ধর্ম-বিভাগের প্রতিনিধিদের মেজডুনারোদনয়া (Mezhdunarodnaya) হোটেলে রাখা হয়েছিল; সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছিল কসমস হোটেলে, ইত্যাদি। প্রবন্ধকার ধর্ম-বিভাগে ছিলেন; সুতরাং ঐ বিভাগের কার্য-বিবরণ একটু বিশদভাবে দেওয়া হল।

১৪ ফেব্রুআরি বেলা ১০টার সময় (ভারতীয় সময় তখন বেলা ১২৷টা) হোটেলেরই একটি বড় হলে নীরব প্রার্থনা করে ধর্ম বিভাগের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনের অবশ্য-কর্তব্য হিসেবে—সভাপতি নির্বাচন, সভাপতির ভাষণ, সভার কর্মসূচী নির্ধারণ, তিনদলে বিভক্ত আলোচনার জন্য তিনজন সহ-সভাপতি নির্বাচন, ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এর পর সভার মূল বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধর্মের এক একজন প্রতিনিধি মিনিট পনের করে ভাষণ দেন। হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি-রূপে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ এই সময় ১৭ মিনিট বলেছিলেন। একমাত্র স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ছাড়া আর সবাই তাঁদের লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

যিনি যে ভাষায় কথা বলেছেন, তখনই তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে ear-phone-এর সাহায্যে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ভাষার জন্য কারও কোন অসুবিধা হয়নি। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের ভাষণের সংক্ষিপ্ত সার নিচে দেওয়া হল।

(ক) **Syed Sharifuddin Pirzada, Secretary General of the Organisation of the Islamic Conference, Saudi Arabia** বলেন যে বর্তমান পৃথিবীতে চাপা উত্তেজনা, রাষ্ট্রীয় বিবাদ এবং দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সংঘর্ষকে বাড়তে দিলে, তা ক্রমে শান্তি ও নিরাপদ অবস্থানকে বিঘ্নিত করবে; এর মধ্যে যদি আবার পারমাণবিক-অস্ত্র আমদানি হয়, তবে বিজয়ী ও বিজেতা বলে কেউ থাকবে না; ধ্বংস হবে সর্বব্যাপী এবং পৃথিবী থেকে প্রাণের চিহ্ন একেবারে মুছে যাবে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার সাহায্যে মানুষ একদিকে যেমন সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করতে সক্ষম, অপর দিকে তেমনি শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতিকে অব্যাহত রাখতে সমর্থ। পৃথিবীর সকল মানুষের অবশ্য কর্তব্য হল এই শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির জন্য আত্মনিয়োগ করা। এই শতাব্দীতে দুইটি মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে; তাতে অসংখ্য জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে; যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধে, তবে সে-ই হবে পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ।

পৃথিবীকে পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত করবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে ন্যায়, আইন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের মাধ্যমে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে। পৃথিবীর মানুষের একটা বিরাট অংশ, যারা দরিদ্রসীমার নিচে রয়েছে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির জন্য সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অস্ত্র তৈরির জন্য অর্থব্যয় না করে বিশ্বের মানুষের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য অর্থের সদ্ব্যবহার করুক। পৃথিবীকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার জন্য পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রনায়কেরা আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র পরিহারে ত্বরান্বিত হোক; কারণ তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে, তাদের দেশের লোকের এবং বিশ্বের অস্তিত্ব।

(খ) **Rabbi Arthur Schneier, U. S. A. (President, Appeal of Conscience Foundation)** বলেন যে ভিয়েনাতে ইহুদী বংশে তাঁর জন্ম। যুদ্ধ এবং হিটলারের ইহুদী নিধনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি জোর করে বলেন যে পৃথিবীতে যুদ্ধ আর কোনক্রমেই হতে দেওয়া চলবে না; কারণ যুদ্ধ হলে সর্ব-বিধ্বংসী পরমাণু-অস্ত্রকে অতিক্রম করে আমরা কেউ-ই বেঁচে থাকব না। একদিকে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করা হচ্ছে; অন্যদিকে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন—পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনের মান উন্নয়নকে, যা বর্তমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্বারা সম্ভব, অগ্রাহ্য করার অধিকার কারোর-ই আছে কি? যদি আমাদের একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছুতে হয়, তবে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আপোষে আলোচনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে; নতুন করে বুঝতে হবে যে আমরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তিনি মনে করেন না যে অপর রাষ্ট্রও যুদ্ধাস্ত্র বর্জন করবে—এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, কোন রাষ্ট্রই এককভাবে নিজেদের যুদ্ধাস্ত্র বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসবে; এইরকম অযৌক্তিক প্রস্তাব তিনি তার নিজের সরকারের কাছেও করতে নারাজ। Rabbi বলেন যে আমাদের একে অপরকে বিশ্বাস

করতে শিখতে হবে, এবং এই বিশ্বাস, পরস্পরে সাহায্য ও সহানুভূতির মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে প্রেসিডেণ্ট রেগন এবং জেনারেল সেক্রেটারি গরবাচেভ যুদ্ধ বিরতি এবং বিশ্ব-শান্তির জন্য আবার আলোচনায় বসুন—আলোচনা সফল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেন যে বন্ধুত্ব এবং ন্যায়নীতির উপর বিশ্ব-শান্তি গড়ে উঠুক।

(গ) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বলেন যে, পৃথিবীকে আণবিক শক্তি-মুক্ত করা আর সম্ভব নয়। আগুন দিয়ে যেমন কল্যাণকর এবং ক্ষতিকর—দুই রকম কাজই হতে পারে, সেই রকম আণবিক-শক্তিও জগতের প্রভূত উন্নতি আবার অশেষ ক্ষতি, এমন কি পৃথিবীকেও ধ্বংস করতে সক্ষম। মানুষকেই তো এই শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার না করে জগতের সমৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত করতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে নাশকতামূলক কাজ একেবারে বন্ধ করা সম্ভব নয়। আমেরিকানরা যদি আণবিক-অস্ত্র বানায়, তবে রাশিয়ানরা নির্বাক দ্রষ্টার মতো এক তরফা আণবিক-অস্ত্র তৈরি বন্ধ রাখতে পারে না। তা হলে উপায়? মনে হয় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কেবল মাত্র রাজনীতিবিদদের উপরই ছেড়ে না দিয়ে পৃথিবীর সকল মানুষকে, সম্ভাব্য সামগ্রিক ধ্বংসের বিষয়ে অবহিত করা দরকার। আমরা, যারা ধর্মে বিশ্বাসী, তারা জনমত গঠন করে এই ধ্বংসাত্মক কাজকে অনেকাংশে ব্যাহত করতে পারি; আমাদের অনুগামীদের নিজের জীবনে এবং সমষ্টিগতভাবে হিংসা পরিহার করতে বলতে পারি। কিন্তু আসল বিপত্তি হল এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাই তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে চলেছে; এর ফলে কেউ কেউ আবার তরবারির সাহায্যে তাদের ধর্মমতকে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। আমরা শাস্ত্র এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কথা না শুনে ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করছি। আমাদের প্রত্যেককে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কথা মেনে চলতে হবে এবং মানুষকে ভালবাসতে শিখতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল মাত্র ধর্মীয় মতবাদেই সন্তুষ্ট না থেকে, সেগুলিকে নিজের জীবনে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মের সাধন করে প্রমাণ করলেন যে সব ধর্ম সেই একই সত্যে পৌঁছে দেয়। পথ আলাদা কিন্তু লক্ষ্য এক। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সকল মানুষকে ভালবাসার কথা প্রচার করে চলেছে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আমাদের শিখিয়েছেন যে বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করে সকলের সাথে প্রীতির বন্ধনে মিলিত হতে হবে। সেই হবে জগতের আদর্শ। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ মিটিয়ে সকলকে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী শোনাতে হবে। তার ফলে যে বিরাট সামাজিক পরিবর্তন আসবে, তাতে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গিও পরিবর্তিত হবে এবং ধ্বংসাত্মক আণবিক-অস্ত্র চিরতরে নির্বাসিত হবে।

(ঘ) জাপানের শিন্‌টো ধর্মাবলম্বী Tashio Miyake, রাশিয়ার বিভিন্ন ধর্ম-শাখা, যারা পরমাণু-অস্ত্র থেকে মানবজাতিকে বাঁচাবার জন্য, নিরস্ত্রীকরণের কাজে, এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য, কঠিন পরিশ্রম করেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। World Conference of Religion and Peace-এর একজন প্রতিষ্ঠাতারূপে তোশিও মিয়াকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ-বিরতি এবং শান্তির জন্য আয়োজিত বহু আলোচনা সভায় যোগ

দিয়েছেন। তিনি বলেন যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, শিন্টো প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও এখন তারা বিশ্ব-শান্তির জন্য একযোগে কাজ করে চলেছেন। যদিও আমরা শান্তি চাই, তবুও আত্মকেন্দ্রিক বাসনা এবং স্বার্থ বিজড়িত জাতীয় অহংকারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ চলেইছে। তিনি বলেন যে ধর্মীয় প্রতিনিধিরূপে শান্তি প্রচেষ্টায় আমরা যেন ক্ষমতাহীন; তার কারণ শান্তিকে আমরা ধর্ম-নির্দিষ্ট কাজ বলে মেনে নিইনি। তিনি বিশ্বাস করেন যে মনুষ্যজাতি এক; তাই প্রার্থনা করেন যেন মানুষের মহিমা সকলে অনুভব করতে পারে—তবেই শান্তির জন্য সার্থক প্রচেষ্টা সম্ভব হবে। তোশিও মিয়াকে বলেন যে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার ভয় তখনই দূর হবে, যখন মানুষ সামগ্রিক উন্নতির জন্য পরস্পরকে সাহায্য করবে। তার জন্য দরকার সকলের ধর্মবোধকে জাগান। মানুষকে সহ-অস্তিত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—'তোমার জন্য আমার অস্তিত্ব, আমার জন্য তোমার স্থিতি'—তবেই পৃথিবীতে শান্তি আসবে।

(ঙ) শ্রীলংকার বৌদ্ধ ভিক্ষু Ven Dr. M. Wipulasara ( President, Sri Lanka Buddhist Congress and Vice-President, Asian Buddhist Conference for Peace ) বলেন যে বিভিন্ন রাষ্ট্র যদি অন্তরের সাথে যথার্থই শান্তি চায়, তবেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ধর্মীয় নেতারা পৃথিবীর সকল দেশে, তাদের অনুগামীদের বোঝাতে যত্নশীল হোন্ যে শান্তি প্রতিষ্ঠাই সব থেকে বড় কাজ। আমাদের প্রচারের বহু জিনিস থাকতে পারে, কিন্তু শান্তি প্রচারই হোক্ সর্ব প্রধান।

সবাই জানেন যে বিশ্ব-শান্তির জন্য সোভিয়েত সরকার এককভাবে দেড় বছর যাবৎ তাদের পরমাণু-অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রেখেছেন; আশা ছিল যে অপর রাষ্ট্রও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে শান্তি প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু আমেরিকা ঐ সময়েও তাদের পরমাণু-অস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েই গেছে; এতে শান্তি প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে মানুষ কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছে।

ভিক্ষু বিপুলসারা বলেন যে আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন যে মনেই প্রথম সবকিছুর—ভাল মন্দের উদয় হয়; ভাল কথা এবং পবিত্র মন নিয়ে সৎকাজ করলে মনে সুখ ও শান্তি আসবে। সুতরাং সকল প্রকার খারাপ কাজকে বর্জন করার উপায় হচ্ছে মনকে পবিত্র করা। বোধিপ্রাপ্তগণ মানুষকে পথ দেখিয়ে দেন; কিন্তু মানুষকেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। সুতরাং অপরে এসে আমাদের বাঁচাবে, এই আশা ত্যাগ করে, বিশ্ব-শান্তির জন্য পৃথিবীর সকল মানুষ, সকল সম্প্রদায়, সকল দেশ কাজ করে চলুক। অনন্ত শান্তি ও সমন্বয় লাভের জন্য তিনি ভগবান বুদ্ধের বাণী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, পৃথিবীতে মনুষ্য জীবনই সবচেয়ে মূল্যবান; তাই জীবন নাশ করা ভয়ঙ্কর অপরাধ এবং কেউ তা করবে না। বৌদ্ধদের মধ্যে জাতি এবং উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই; এই ভাবে তারা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বকে জোরদার করেছে। পরিশেষে বিপুলসারা বলেন যে, মনুষ্যজাতিকে সামগ্রিক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে শান্তি-সমস্যার সমাধান শান্তির মধ্য দিয়েই করতে হবে।

(চ) Metropolitan Paulos Mar Gregorias of Delhi and North, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের রেইকজাভিকে পরমাণু-অস্ত্র বর্জনের জন্য অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের কথা বলেন; সেই সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ এবং সম্মেলন থেকে শিক্ষণীয়

বিষয়সমূহ তিনি বিশদভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে শুধু পরমাণু-অস্ত্র বর্জন করলেই হবে না; সঙ্গে সঙ্গে chemical, bacterial এবং electronic অস্ত্রসমূহ, যাদের ধ্বংস ক্ষমতা পরমাণু-অস্ত্র থেকে কম নয়, তাদেরও পরিহার করতে হবে। তিনি মনে করেন, কোন রাষ্ট্রই, রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্য এবং অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের লোভে, যুদ্ধাস্ত্র তৈরি বন্ধ করবে না; বরং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যাতে খণ্ড-যুদ্ধ লেগেই থাকে তার চেষ্টাই করবে। এই পরিস্থিতিতে (i) কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বাসের মনোভাব গড়ে তোলা যাবে, (ii) কিভাবে কায়েমী স্বার্থ ও অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের শক্তিকে অতিক্রম করে নীতিবোধকে জাগান যাবে, এবং (iii) কিভাবে অত্যাচার, শোষণ ও অপরের উপর কর্তৃত্ব করার প্রবণতাকে রোধ করা যাবে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে শান্তি-প্রচেষ্টার জন্য আমাদের সকলকে একযোগে এখন থেকেই সমস্ত রকমের যুদ্ধাস্ত্র সীমিত করণ এবং ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বর্জনের জন্য জনমত তৈরি করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে যুদ্ধ-মুনাফাবাজদের হাত থেকে মুক্ত করে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

এদের ভাষণের পর সভার বিরতি হয়। মধ্যাহ্ন আহারের পর প্রতিনিধিরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ ও বিশ্ব-শান্তির সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উপর আলোচনা করেন:

১। নিরস্ত্রীকরণ প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে আন্তর্জাতিক শান্তি-বর্ষ (১৯৮৬) কেন ব্যর্থ হল?

২। পারমাণবিক যুগে রাজনৈতিক চিন্তার পরিবর্তন ঘটিয়ে কি ধরনের সার্থক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার?

৩। যুদ্ধাস্ত্র তৈরি প্রতিযোগিতা বন্ধের পথে বাধা কি?

৪। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে 'পারমাণবিক-অস্ত্র প্রথমে প্রয়োগ করব না'—এই আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা কি?

৫। পারমাণবিক-অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা কি কোন দেশের নিরপত্তাকে সুনিশ্চিত করে?

৬। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিরস্ত্রীকরণের জন্য একক সিদ্ধান্তের ভূমিকা কি?

৭। শত্রু-ভাবকে নির্জিত করা সম্ভব কি? যদি সম্ভব হয়, তবে তার উপায় কি?

৮। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে পারমাণবিক-অস্ত্র বিহীন বিশ্ব তৈরিতে Strategic Defence Initiative (সুকৌশলী প্রতিরক্ষা-মূলক ব্যবস্থাপনা, যাকে নক্ষত্র-যুদ্ধ বলা হয়) সাহায্য করবে?

৯। পারমাণবিক যুগে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

১০। আণবিক-অস্ত্রশূন্য পৃথিবী গড়ে তোলার সহায়করূপে ধর্মগুলি এখনও সক্রিয় নয় কেন?

১১। যুদ্ধ ও শান্তি প্রসঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষ যে ভূমিকা নিয়েছে, তা নিজ নিজ সরকারকে গ্রহণ করাবার উপায় কি?

১২। ধর্মীয় মানুষেরা নিজের নিজের সরকারকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রভাবিত করতে কি সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিতে পারেন?

১৩। ধর্ম বিশ্বাসীরা শান্তির পরিবেশ তৈরির জন্য যে চেষ্টা করছেন, তাতে কি রকম বাধা আসছে?

১৪। আণবিক-অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী এবং মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ধর্মীয় এবং জাগতিক বিষয়ের লোকেদের যৌথ প্রচেষ্টার সার্থকতা

কিভাবে অনুধাবন করা যাবে? এই যৌথ প্রচেষ্টাকে আরও বেশি কার্যকরী করার উপায় কি?

উপরোক্ত পাঁচজন ধর্ম-প্রবক্তার প্রারম্ভিক ভাষণ এবং এইসব প্রশ্নগুলির উপর আলোচনা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া, ধর্মীয় শাখার অপর সকলেই যুদ্ধ-বিরতি ও বিশ্ব-শান্তির জন্য রাজনৈতিক সমাধানের উপরই বেশি জোর দিয়েছেন।

প্রশ্নগুলির উপর আলোচনা রাত্রি ৭॥ টা পর্যন্ত চলেছিল।

১৫ ফেব্রুআরি সকালে ধর্মীয় বিভাগের প্রতিনিধিদের ১০।১২ মাইল দূরে, ডানিলভ মঠে (Danilov Monastery) নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেও অধিবেশনের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

ধর্মীয় শাখার অধিবেশনগুলিতে যেমন নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হয়েছে, সেই রকম রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি শাখার অধিবেশনগুলিতে ও ১৪ এবং ১৫ ফেব্রুআরি ভিন্ন ভিন্নভাবে যুদ্ধ-বিরতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। এইসব আলোচনাতে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে এবং নিরস্ত্রীকরণের বাধার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি দোষারোপ এবং পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে। বিশ্ব বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী শাখারোভ এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে একে অপরকে বিশ্বাস করতে না পারলে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব নয়, আর তার জন্য মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের উপর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। Strategic Defence Initiative (সুকৌশলী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা), যাকে নক্ষত্র-যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়, তার সম্বন্ধে রাশিয়ানরা অত্যন্ত শঙ্কিত এবং তাঁরা মনে করেন যে সুকৌশলী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা মোটেই প্রতিরক্ষা-মূলক নয়, বরং এক নতুন ধরনের আক্রমনাত্মক কর্মসূচী। এই আলোচনা সভায় যে-সব বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ্ আমেরিকানরা ছিলেন, তাঁরা বলেন যে সুকৌশলী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনাকে শান্তির প্রতিবন্ধক বলে মনে করার কারণ নেই। অর্থনীতিবিদ্ Mr. Galbraith, যিনি আগে দিল্লীতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন, বলেন যে বিশ্বস্ত সূত্রে তিনি জেনেছেন যে সুকৌশলী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা ( নক্ষত্র-যুদ্ধ ) কার্যকরী হবে না। রসিকতা করে তীক্ষ্ণবুদ্ধি গ্যালব্রেথ বলেন যে নক্ষত্র-যুদ্ধ সম্বন্ধে রাশিয়ানদের আশঙ্কা যথার্থই প্রশংসনীয়; কারণ এর দ্বারা আমেরিকা বহু লক্ষ কোটি ডলারের অপব্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারবে।

১৬ ফেব্রুআরি, যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক আলোচনার তৃতীয় দিনে, বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিরা সকলে ক্রেমলিনের রাজপ্রাসাদের হলে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় শাখার প্রতিনিধিরা গত দুই দিন ধরে যে-সব আলোচনা করেছেন, তার সারাংশ এবং তাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। এই সভায় মিখাইল গরবাচেভ সমবেত প্রতিনিধিদের সামনে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে আগে কমিউনিষ্টরা বলতেন যে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের মিল হওয়া সম্ভব নয়—এরা পরস্পর বিরোধী। কিন্তু বর্তমান সময়ে যুদ্ধ এবং শান্তিই হচ্ছে সব থেকে বেশি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। গরবাচেভ যুদ্ধ-শান্তি প্রশ্নে ন্যায়নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি আরও বলেন যে সোভিয়েত রাশিয়া গঠনমূলক জাগতিক উন্নতির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ "আমরা

আরও বেশি সাম্যবাদ চাই; সুতরাং গণতন্ত্রের আরও বেশি প্রয়োগ করতে হবে।" তিনি বলেন যে রাশিয়াকে উন্নত করার চেষ্টায় কারও ক্ষতি হবে না; কিন্তু তার জন্য নতুন ধরনের চিন্তার প্রয়োজন। রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের নীতিবোধ থেকে আলাদা করা চলবে না; বরং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে বিশ্বজনীন ন্যায়নীতির বোধের সাথে একীভূত করতে হবে। তাঁর বলার মধ্যে এইটি প্রতিফলিত হয়েছিল যে তিনি মনে করেন না যে মানুষ স্বভাবতই হিংসাপ্রবণ এবং উগ্র প্রকৃতির; তিনি বিশ্বাস করেন না যে যুদ্ধ হচ্ছে মানুষের স্বভাবের প্রতিফলন এবং পুঁজিবাদের স্বাভাবিক পরিণতিই হচ্ছে 'যুদ্ধ'। তিনি বার বার প্রাচীন প্রচলিত প্রথা থেকে বেরিয়ে আসা এবং গতানুগতিক ভাব ও যুক্তিহীন মতবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। গরবাচেভ অত্যন্ত জোরের সাথে বার বার বলেন যে রাশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতির মধ্যে যে পরিবর্তন ও উদারতার হাওয়া বইতে শুরু করেছে, তাকে আর রোধ করা যাবে না। তিনি বলেন যে, স্ব-নিযুক্ত পৃথিবীর প্রধান বিচারপতির মতো তিনি এ-সকল কথা বলছেন না; বরং নিজের দেশের সম্বন্ধে একজন আত্ম-সমালোচকের ভাব নিয়ে কথা বলছেন।

গরবাচেভের ভাষণ ছিল যেন রাশিয়ার পক্ষে এক নতুন বিপ্লবের সূচক এবং সাহসিকতায় পূর্ণ। এর আগে আর কখনও কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রনায়কের মুখে এমন সব কথা শোনা যায় নাই। তিনি তাঁর নতুন বিশ্বাস এবং নব চেতনার কথাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। গরবাচেভ রাশিয়ার এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন উন্মুখতার সম্বন্ধে কিছুদিন আগে অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেছিলেন, "সমাজ পরিবর্তনের জন্য তৈরি; আমরা যদি এখন পিছিয়ে যাই, তা হলে সমাজ তা মেনে নেবে না। আমাদের এই পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে; যদি আমরা তা না করি, তবে কে করবে? যদি এখন না করি, তবে আর কখন করব?"

এই লক্ষ্যে তিনি কেমন করে, কখন, কতটা পৌঁছুতে পারবেন, তা ভবিষ্যৎ-ই সাক্ষ্য দেবে। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক ডস্টোয়েভস্কির একটি কথা মনে পড়ছে; তিনি তাঁর একটি গল্পে লিখেছেন, "আমি জানি যে এই পৃথিবীতে বাস করবার যোগ্যতা না হারিয়েও মানুষ সুন্দর ও সুখী হতে পারে; আমি বিশ্বাস করি না এবং করবোও না যে অসৎ ভাবই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা।" বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে এই ভাবনায় আস্থা স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন; এই বিশ্বাসই মানুষকে সামগ্রিক ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে।

আজকের দিনে যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তি প্রচেষ্টার জন্য যা সব থেকে বেশি প্রয়োজন, তা হল হৃদয়ের পরিবর্তন—মানুষকে ভালবাসতে শিখতে হবে। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই মানুষ আজ অভুক্ত থাকছে; এর কারণ এই নয় যে পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব ঘটেছে; এর কারণ হল মানুষের হৃদয়ে অপরের প্রতি ভালবাসার অভাব, সহানুভূতির অভাব।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, প্রত্যেকের মধ্যেই দেবত্ব রয়েছে; এই দেবত্বকে জীবনে প্রকাশিত করতে হবে, সকলকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে সেবা করতে হবে। আমরা কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারি না, কারণ ঈশ্বরকে সাহায্য করা যায় না—তাঁকে সেবা করা যায়; তাই ঈশ্বর-বুদ্ধিতে মানুষের সেবা করে ধন্য হতে হবে।

আজ আমরা বিশ্ব-শান্তির কথা ভাবছি; কিন্তু নিজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, দেশের মধ্যে যদি শান্তি না থাকে, তাহলে 'বিশ্ব-শান্তি' একটা কথার কথা হয়ে দাঁড়াবে। যথার্থই যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের উপরই নির্ভর করতে হবে। এই আদর্শে অধিষ্ঠিত হয়ে শ্রীশ্রীমা সারদা বলেছিলেন, "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না; দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।" শ্রীশ্রীমায়ের এই উপদেশের মধ্যেই রয়েছে শান্তি-সমস্যার চিরন্তন সমাধান। শান্তির উপায় হিসেবে বিজ্ঞানী, সমাজসেবী, অর্থনীতিবিদ্ প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের বিশিষ্ট লোকেরা নানা কথা বলেছেন এবং বলবেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের এই অতি সহজ সরল কথাই মনে হয় এই বিষয়ের শেষ কথা; সকল দেশের সকল মানুষকে নিজের পরিবারের, সমাজের, দেশের এবং বিশ্বের শান্তির জন্য যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দেবে। প্রার্থনা করি রাশিয়ার এই যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তি-প্রচেষ্টা পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুক; প্রেম, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সকলে দৃঢ়বদ্ধ হোক্।

# বেদ-মূর্তি বুদ্ধ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

কে বলে তোমারে বুদ্ধ! বেদনিন্দাকারী?
'কর্ম' যেথা 'কাণ্ড'-মাত্র 'জ্ঞান' পরিহরি,
উচ্চারিয়া স্বাহামন্ত্র যজ্ঞাহুতিদানে
দেবগণে তুষ্ট করে মন্ত্র সামগানে,
লভিবারে ধন, পুত্র, আয়ু, বাহুবল,—
অভ্যুদয়-মাত্র যথা প্রার্থনা সফল,—
যেথা পশুঘাত শত ইহ-সুখ লাগি—
সে কর্মে করিলে নিন্দা হে দীপ্ত বৈরাগী!

নিঃশ্রেয়স যেথা শান্তি অবন্ধ নির্বাণ,—
বৈরাগ্যের পথে পেলে তাহারি সন্ধান।
জ্ঞানকাণ্ড বেদ দেয় যাহার নির্দেশ,—
সেই পরাশান্তিমাঝে করিয়া প্রবেশ
নবীন করিলে তুমি বেদেরি সাধনা।
বেদমূর্তি! তাই করি তোমার বন্দনা॥

# মহাকাশের বিস্ময়ঃ ব্ল্যাকহোল

অধ্যাপক শ্রীঅনিল দাস

অনন্তবিস্তৃত রহস্যাচ্ছন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আদিম মানুষ প্রথমে কি ভাবতে শুরু করেছিল তা আমাদের সঠিক জানা নেই সত্যি। কিন্তু শুধুমাত্র কল্পনাতেই নয়, যুক্তির প্রয়োগে আজ আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে কোটি কোটি মানুষ, জীবজন্তু সকলের বাসভূমি মাতৃসম পৃথিবীর উপরে উলটানো বাটি আকৃতির যে আকাশ, তাই সেই আদিম মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল, ভাবতে শিখিয়েছিল। অতীতের সেই শুভক্ষণে মানুষ সবিস্ময়ে দেখেছিল উষার লাল পূব আকাশকে। দেখেছিল অর্কদেবকে রাজকীয় মহিমায় আবির্ভূত হতে, পাহাড়ের কোল হতে, সুনীল সাগরের দিগন্ত থেকে। সারাদিন দীপ্যমান থেকে একসময় সে টুপ করে ডুব দিয়েছিল—গোধূলির পশ্চিমাকাশে, ছায়া-নিবিড় গাছ-গাছালির ফাঁকে। বনে-জঙ্গলে জীবজন্তুদের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে টিকে থাকা সেই আদিম মানুষের দল সবিস্ময়ে আরও লক্ষ্য করেছিল যে নীলাকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যাওয়ার পরই গুরু গুরু শব্দ এবং বিজলীর চমকের সাথে আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে জল। যে জলের স্পর্শে গাছপালার রং হয়ে উঠছে সবুজ; দেহ মন হয়ে উঠছে স্নিগ্ধ, পবিত্র। দিনের শেষে রাত্রির আগমনে নীলাকাশ হয়ে উঠছে কাল। আর সেই কাল আকাশের বুকে ফুটে উঠছে শ্বেতপদ্মের ন্যায় অসংখ্য তারার দল। তারা মিট্‌মিট্‌ করে। হাতছানি দিয়ে ডাকে। কি যেন বলতে চায়! পাশে মাটিতে পাথরের অস্ত্র রেখে গুহার মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে থাকা সেই মানুষেরা আরও অভিভূত হয়ে পড়ে, যখন তারা দেখে চন্দ্রদেবকে ষোলকলায় পরিপূর্ণ হয়ে আবির্ভূত হতে। স্নিগ্ধ আলোর আভায় দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেই আলোয় একে অপরের মুখ দেখতে পায়। রাত গভীর হয়। কোটি কোটি তারার দল রাজকীয় মহিমায় মিছিল করে চলে। এদেরই মধ্যে কেউ কেউ আবার দলছুট হয়ে খসে পড়ে। হাউই বাজির মতো আলোর রেখা টেনে দ্রুত ধাবিত হয় পৃথিবীর দিকে। আদিম মানুষের মনে ভীতির ভাব জাগায় তারা।

প্রাকৃতিক এ-সব ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে স্বভাবতই কতকগুলি প্রশ্ন তাদের মনে উদিত হয়: উপরের যে আকাশ তা কতদূর বিস্তৃত, কত বড় আমাদের এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড? দিনের এবং রাতের আকাশ যারা আলোকিত করে থাকে তারা কারা?

এর পরে বহুবছর কেটে গেছে। বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। তার অবিশ্রান্ত অগ্রগতির ফলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সাথে সাথে আরও অনেক প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের মনকে আলোড়িত করে চলেছে: আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি সত্যি এই গ্রহের বাসিন্দা ছিলেন, নাকি অপর কোন গ্রহ থেকে এসে এখানে বাসা বাঁধেন? কোথায়, কখন এবং কিভাবে পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল? বর্তমানে যে পরিমাণ পদার্থ পুঞ্জীভূত হয়েছে, গোড়াতেও কি তাদের পরিমাণ একই ছিল? নাকি, ক্রমাগত সৃষ্ট হয়ে এর পরিমাণ বেড়ে চলেছে? এ-সব প্রশ্ন এখন আর ছেলেমানুষী কৌতূহল নয়। জ্যোতির্বিদ্‌ এবং বিশ্বতত্ত্ববিদ্‌রা এখন ক্রমাগত এ-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে জনৈক ওলন্দাজ চশমার কাঁচনির্মাতা উত্তল এবং অবতল লেন্সকে একই সঙ্গে কাজে লাগিয়ে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যন্ত্রটির সাহায্যে দূরের জিনিসকে কাছে দেখা সম্ভব হয়েছিল। খবরটি প্রথিত-যশা ইতালীয়ান বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কানে এসে পৌঁছয়। এই ধারণার উপর নির্ভর করে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। প্রথম এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোনও বস্তুকে ৩০ গুণ বর্দ্ধিত আকারে দেখা সম্ভব হয়েছিল। এঁর আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানে নবদিগন্তের সূচনা করে। গ্যালিলিও তাঁর সদ্যজাত সন্তানতুল্য টেলিস্কোপটিকে স্বর্গসম রাতের আকাশের দিকে তুলে ধরতেই বিস্ময়ে জড়ানো এক জগতের দ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এই বিস্ময়-বিহ্বল অবস্থার কথা তিনি সুন্দর বর্ণনা করেছেন তাঁর লেখা 'তারাদের বার্তা' ( Messenger of the Stars ) গ্রন্থে। তিনি একজায়গায় লিখেছেন :

"আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে আমার প্রতি সদয়বশতঃ, কতকগুলি বিস্ময়কর বস্তুকে প্রথম চাক্ষুষের জন্য আমাকে মনোনীত করেছেন। এ-সব বস্তুসকলের অস্তিত্ব আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। আমি দূরবীক্ষণের সহায়তায় অনেক অজানা তারার সন্ধান পেয়েছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে চাঁদ এবং পৃথিবী সদৃশ বস্তু। কিন্তু এ-সকলের মধ্যে বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে বৃহস্পতিগ্রহের চারটি চাঁদের আবিষ্কার। তাদের প্রত্যেককে আমি গতিশীল অবস্থায় দেখতে পেয়েছি...... ।"

গ্যালিলিওই প্রথম বলেন যে ছায়াপথ অসংখ্য তারার সমষ্টি ; গ্রহদের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলোয় তারা আলোকিত হয়। তিনিই প্রথম এ সিদ্ধান্তে আসেন যে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থির নয় ; পরিবর্তনশীল। কারণ তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর দৃশ্যপথে নতুন তারারা আবির্ভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বুধ এবং শুক্রগ্রহ যে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত তা প্রথম তিনিই বলেন। সূর্যও যে অপর এক কক্ষপথে পরিক্রমারত তা-ও প্রথম তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন। এ সব কারণেই গ্যালিলিওকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

গ্যালিলিওর মৃত্যুর পরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বহুল উন্নতি সাধিত হয়েছে। নতুন গ্রহ, তারারা আবিষ্কৃত হওয়া ছাড়াও মহাকাশের আরও অনেক অদৃশ্য বাসিন্দাদের সন্ধান মিলেছে। ঘনীভূত মহাকাশ-রহস্য কিছুটা ফিকে হয়েছে। যদিও অজানা রয়েছে এখনও অনেক কিছু।

গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর চারশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। অভাবিত উন্নততর দূরবীক্ষণের সাহায্যে কোটি কোটি মাইল দূরের অদৃশ্য সব বস্তু আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। ছবি তুলে তাদের অবয়ব সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ছিল। শুধুমাত্র যে-সব মহাজাগতিক বস্তু থেকে দৃশ্য আলো এসে পৌঁছত তাদেরকেই শুধুমাত্র দেখা এবং ছবি তোলা সম্ভব হত। কিন্তু আজ আমরা বিজ্ঞানের দৌলতে জানি যে দৃশ্য আলো ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ প্রতি মুহূর্তে মহাজাগতিক বস্তু থেকে নিঃসরিত হয়ে চলেছে। এইসব বিকিরণের মধ্যে রয়েছে এক্স, গামা, অতি-বেগুণী, অবলোহিত রশ্মি, বেতার তরঙ্গ প্রভৃতি। বিজ্ঞানের ভাষায় এরা সবই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ ( Electromagnetic wave ) একের থেকে অপরের তফাৎ শুধুমাত্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ( wave length )। মহাকাশের তারা এবং তারাসদৃশ

বস্তু ক্রমাগত এ-সব বিকিরণ মহাকাশে পাঠিয়ে চলেছে। বেতারতরঙ্গ যে-সব বস্তু থেকে নিঃসরিত হয়ে চলেছে তাদের অনুধাবনের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে বেতার-দূরবীণ। এর আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপ্লব সাধন করে।

বিংশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার মহাজাগতিক বস্তুদ্বয় কোয়াসার (Quaser) এবং পাল্‌সার (Pulsar)। কোয়াসার এবং পাল্‌সারের পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভিজাত টুপিতে নবতম সংযোজন 'ব্ল্যাকহোল'। বাংলায় যার নামকরণ হয়েছে 'অন্ধকূপ'।

কোয়াসার হচ্ছে তীব্র বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টিকারী তারা আকৃতির এক মহাজাগতিক বস্তু যার পুরানাম 'quasi-steller radio sources'। বিংশ শতকের যাট দশকের প্রথমার্ধের কোনও একসময় বিজ্ঞানীরা বিগত কয়েকদশক ধরে তোলা সব ছবি পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎই কোয়াসারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে কোয়াসার হিসেবে চিহ্নিত এক তারার উজ্জ্বলতা কয়েকমাসের মধ্যেই বহুগুণে পরিবর্ধিত হয়েছে। বিপুল পরিমাণ শক্তির উৎস এই কোয়াসারের রহস্য উন্মোচনের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এদের অস্বাভাবিক দূরত্ব। লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে এরা সব অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের দৃঢ়বিশ্বাস যে অদূর ভবিষ্যতে চাঁদের বুকে যে স্পেস ষ্টেশন তৈরি হবে সেখান থেকে চাঁদের বায়ুমণ্ডলহীন আকাশে শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে কোয়াসারকে তাঁরা পরিষ্কারভাবে চিনতে সক্ষম হবেন।

কোয়াসারের মতনই পাল্‌সার স্পন্দনশীল আর একটি অত্যাশ্চর্য মহাজাগতিক বস্তু। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জোস্‌লিন বেল (Jocelyne Bell) এবং অ্যানথনী হিউইস্‌ (Anthoni Hewish) নামে দুই বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে মহাকাশের নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল থেকে কোনও এক অজ্ঞাত বেতার-উৎস ১ সেকেণ্ড পর পর নিয়মিতভাবে তীক্ষ্ণ ( sharp ) বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে চলেছে। আশ্চর্যজনক নিয়মিতভাবে আসা বেতার-তরঙ্গগুলিকে বিজ্ঞানীরা প্রথমে কৃত্রিম সংকেত বলে ভুল করেন। তাঁরা ভেবে বসেন যে কোন বুদ্ধিমান প্রাণী নিয়মিতভাবে সংকেতগুলি পাঠিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানী গোল্ডের প্রকল্প অনুসারে এই অত্যাশ্চর্য বস্তুগুলি অতিক্রুত ঘূর্ণনশীল নিউট্রন তারা ছাড়া আর কিছুই নয়। গোল্ডের প্রকল্প মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও, পাল্‌সার এখনও রহস্যের অবগুণ্ঠনে ঢাকা রয়ে গেছে।

পাল্‌সারের পর এই প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দু 'ব্ল্যাকহোল' বা অন্ধকূপের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরান যাক। ব্ল্যাক্‌হোলের নাম এখন বিজ্ঞানী-মহলের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এর মূলে রয়েছে পত্র-পত্রিকা ছাড়াও 'ব্ল্যাকহোল' ( Black-hole ) নামে একটি ইংরেজী চলচ্চিত্র। কিন্তু মজার কথা এই যে এখন প র্যন্ত এই 'অন্ধকূপ'-এর বাস রয়ে গেছে পদার্থবিদ্‌ এবং বিশ্বতত্ত্ববিদ্‌দের মনে। তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষাসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানের মাঝামাঝি কোনও এক জায়গায় এখন এর অবস্থান। কারণ, বাস্তবে আমাদের বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এখন পর্যন্ত এর অস্তিত্বের সন্ধান মেলেনি। যে-সব প্রশ্ন এখন বিজ্ঞানীদের তাড়িত করে ফিরছে, তা এই যে তারা এবং গ্রহদের মতোই কি 'অন্ধকূপ' সাধারণভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে ? অথবা, সত্যিই কি তারা অ-সাধারণ কোন বস্তু ?

অন্ধকূপ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীমহলকে

আলোড়িত করলেও এর আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীতে নয়। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা দ্বারা এর সম্যক্ সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং সমগ্র বিজ্ঞানীমহলকে এর প্রতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ মিচেল্ (John Michell) নামে ইংলণ্ডের জনৈক গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্ প্রথম অন্ধকূপের অস্তিত্বের সম্ভাবনার উপরে আলোকপাত করেন। গণনার মাধ্যমে প্রথম তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোন মহাজাগতিক বস্তু যেমন গ্রহ, তারা প্রভৃতির 'মুক্তিবেগ' (escape velocity) তাদের ভর (mass) এবং ঘনত্বের (density) উপর নির্ভরশীল। মুক্তিবেগ হচ্ছে নিম্নতম গতিবেগ যা কোন বস্তু লাভ করলে তা কোনও গ্রহ বা তারার অভিকর্ষজ ক্ষেত্রের (Gravitational field) প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই মুক্তিবেগ আলোর বেগকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সে-ক্ষেত্রে কোন বস্তুকে তারা বা গ্রহের অভিকর্ষ বলের (Gravitational force) প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করতে গেলে আলোর গতিবেগের চাইতেও বেশি গতিবেগ নিয়ে চলতে হবে। তৎকালীন সনাতন পদার্থবিজ্ঞানে কোনও বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগকে ছাড়িয়ে যাওয়া গ্রহণযোগ্য ছিল না।

পৃথিবীর অভিকর্ষজ বলের প্রভাব থেকে কোন বস্তুকে মুক্তি দিতে হলে ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগে তাকে ছুঁড়তে হবে। যদি এমনটি ঘটে যে আমাদের মাতৃসম পৃথিবীর ভর অথবা ঘনত্ব অথবা উভয় রাশির মান ক্রমাগত বাড়তে থাকে তবে মুক্তিবেগের মানও বাড়বে। মিচেল্ জানতেন যে আলোর গতিবেগের মান অত্যন্ত বেশি। বেশি হলেও অবশ্য অসীম নয়। আর তাই বাস্তবে এই গতিবেগকে ছাড়িয়ে যাওয়া অবশ্যই সম্ভব। যদি কোনও গ্রহ বা তারার ক্ষেত্রে এই মুক্তিবেগের মান আলোর গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যায় তবে সেই তারা অথবা গ্রহ থেকে আলোর বহির্গমন সম্ভব হবে না। ফলে, গ্রহ অথবা তারাটি কাল দেখাবে। সেটি রূপান্তরিত হবে একটি অন্ধকূপে।

মিচেলের এই তত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানীরা নিউট্রন তারাদের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রয়োগ করে সফল হয়েছেন। রাতের আকাশের বুকে আমরা যে-সব তারাদের মিটিমিটি করতে দেখি তারা কেহই অমর নয়। জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে তারারা একদিন আলো পাঠান বন্ধ করে দেয়। তখন আমরা বলি যে তারাটির মৃত্যু হয়েছে। বহু তারা এরকম মৃত্যু বরণ করে আমাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে তারা-পৃষ্ঠের তাপ-মাত্রা কমতে থাকে ফলে তা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সঙ্কোচনের ফলে এর আভ্যন্তরীণ চাপ বহুগুণে বেড়ে যায়। চাপের মান অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় পরমাণুর অভ্যন্তরের প্রোটন এবং ইলেক্ট্রন নিকটবর্তী হয়ে নিউট্রনে পরিণত হয়। সমস্ত পরমাণুর ইলেকট্রন এবং প্রোটনের ক্ষেত্রে এরকমটি ঘটে যাওয়ায় তারাটি রূপান্তরিত হয় একটি নিউ-ট্রন তারায়। অত্যধিক চাপের উদ্ভবের ফলে এর ঘনত্বও বেড়ে যায় বহুগুণে। তখন এর মুক্তিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। জ্যোতির্বিদ্‌রা গণনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে কোন কোন অবস্থায় এই গতিবেগ আলোর গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যায়। তখন শুধুমাত্র আলো নয়, কোনকিছুই আর নিউট্রন তারার অভিকর্ষের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। অতি ঘনত্বের এই তারাটি তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পরিণত হয় একটি অন্ধকূপে। মহাজাগতিক কোন বস্তু এই অন্ধকূপের অতি তীব্রতাসম্পন্ন অভিকর্ষজ বলের আওতার মধ্যে গিয়ে পড়লে তারা চিরতরে হারিয়ে যায়। তাদের মুক্তিলাভ আর কোনও দিন সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞানীরা আজ আধুনিক-বিজ্ঞান বিশেষতঃ আলবার্ট আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' ( Relativity theory )-এর আলোকে ব্ল্যাক-হোল-এর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন। আলবার্ট আইনস্টাইন এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন যে, যে-কোন অবস্থা থেকেই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখি না কেন তার ফল হবে সমতুল্য। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম ও নিয়মাবলীর কোন পরিবর্তন হবে না। তাঁর এই বিশ্বাস থেকেই পরবর্তিকালে জন্ম হয় 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ'-এর। এই তত্ত্ব অনুসারে কোনও একটি বস্তু—A অপর একটি বস্তু—B-এর সাপেক্ষে যদি সমবেগে গতিশীল হয় তবে B বস্তুর সাপেক্ষে A বস্তুর ( গতির অভিমুখে ) ভর, স্পেস্ [ দৈর্ঘ্য ]-এর পরিবর্তন সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, B-এর সাপেক্ষে সময়ের প্রবাহের মাত্রার পরিবর্তন ঘটে। অপর পক্ষে দুটি বস্তুর সাপেক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধর্মাবলী এবং প্রকৃতি একই থেকে যায়। ভর, দৈর্ঘ্য এবং সময়ের এই পরিবর্তন শুধুমাত্র বস্তুদ্বয়ের মধ্যেকার আপেক্ষিক গতিবেগের উপর নির্ভরশীল।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সাফল্যের পর আইনস্টাইনের হাতে জন্ম হয় 'ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ' ( General theory of relativity )-এর। এই তত্ত্বে তিনি দেখিয়েছেন যে বস্তু A যদি বস্তু B-এর সাপেক্ষে সমত্বরণে ( Uniform accelaration ) গতিশীল হয় তবে গতির অভিমুখে বস্তু A-এর দৈর্ঘ্যের শুধু পরিবর্তনই হবে না, তা বেঁকে যাবে। ত্বরণের মান যত বাড়বে এই বেঁকে যাওয়াটাও তত বেশি বেড়ে যাবে। যেহেতু স্পেসকে আমরা মাপি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আয়তন মেপে—সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এক্ষেত্রে স্পেস্ এর বিকৃতি ঘটেছে। এই ত্বরণের মান যদি খুব বেশি হয়, তবে স্পেস্ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি—'Space will torn apart' আলবার্ট আইনস্টাইন তার সমতুল্যতা নীতি ( Principle of equivalence )-তে দেখিয়েছেন যে সমত্বরণে গতিশীল বস্তুর সাপেক্ষে যে ঘটনাগুলো ঘটবে কোন বস্তুর অভিকর্ষক্ষেত্রের সাপেক্ষেও একই ঘটনা ঘটবে। অর্থাৎ যেহেতু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র থেকে অতি বৃহৎ বস্তুরই অভিকর্ষক্ষেত্র আছে ফলে প্রতিটি বস্তুর চারপাশে স্পেসের বিকৃতি ঘটবে। অভিকর্ষজ ত্বরণের ( Gravitational accelaration ) মান যত বেশি হবে বিকৃতিও তত বেশি ঘটবে। নিউট্রন তারাদের চতুষ্পার্শ্বে এই বিকৃতি সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছতে পারে। সে অবস্থায় স্পেস দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যাবে। নিউট্রন তারার চারপাশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন নিয়মই আর প্রযোজ্য হবে না। তারাটি তখন পরিণত হবে একটি অন্ধকূপে। যদি দুটি নিউট্রন তারা পরস্পরের নিকটবর্তী হয় তবে তাদের মধ্যেকার স্পেসের এত বেশি বিকৃতি ঘটবে যে এ?টি তারা অপরটি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। জ্যোতির্বিদ্ সোয়াৎ'জ চাইল্ড গণনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে নিউট্রন তারা যদি একটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ লাভ করে তবে তা অন্ধকূপে পরিণত হবে। সঙ্কোচনের ফলে সূর্যের ব্যাসার্ধ যদি ৩½ মাইল হয়, তবে তা অন্ধকূপে পরিণত হবে।

বহু বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে তাঁরা ব্ল্যাক-হোলের সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানের যে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি তাতে ভবিষ্যতে এই দাবি যে সত্যতায় পরিণত হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়!

# রামহৃদয়ম্

শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

শ্রীমহাদেব উবাচ—

ধন্যাসি ভক্তাসি পরাত্মনস্ত্বং যজ্জ্ঞাতুমিচ্ছ

তব রামতত্ত্বম্।

পুরা ন কেনাপ্যভিচোদিতোঽহং বক্তুং

রহস্যং পরমং নিগূঢ়ম্ ॥১৬॥

অন্বয়—শ্রীমহাদেব উবাচ—দেবি, যৎ তব রামতত্ত্বম্ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা ( জাতা ), ( অতঃ ) ত্বম্ ধন্যা অসি, ত্বম্ পরাত্মনঃ ভক্তা অসি। পুরা ( ইদম্ ) পরমম্ নিগূঢ়ম্ রহস্যম্ বক্তুম্ অহম্ ন কেন অপি অভিচোদিতঃ ( আসম্ )।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীমহাদেব বললেন,—পার্বতি তুমি ধন্যা, তুমিই সেই পরমাত্মার একান্ত ভক্ত। যে পরম গোপনীয় রামতত্ত্ব রহস্য তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ তা বলার জন্য কেউ আগে আমাকে উৎসাহিত করেনি।১৬

ভাবার্থ—দেবাদিদেব শঙ্কর পার্বতীকে বললেন,—দেবি, তুমি ধন্যা, কারণ তুমি রামতত্ত্ব জানতে অভিলাষী হয়েছ; তুমি পরমাত্মার পরম ভক্ত। এর আগে এই পরম নিগূঢ় রহস্য রামতত্ত্ব বর্ণনা করতে কেউ আমাকে অনুরোধ করেনি।১৬

ত্বয়াদ্য ভক্ত্যা পরিনোদিতোঽহং বক্ষ্যে

নমস্কৃত্য রঘূত্তমং তে।

রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেরনাদিরানন্দ একঃ

পুরুষোত্তমো হি ॥১৭॥

অন্বয়—অদ্য ত্বয়া ভক্ত্যা পরিনোদিতঃ অহম্ রঘূত্তমম্ নমস্কৃত্য তে বক্ষ্যে। হি রামঃ প্রকৃতেঃ পরাত্মা অনাদিঃ আনন্দঃ একঃ পুরুষোত্তমঃ।

বঙ্গানুবাদ—তোমার ভক্তিতে অনুরুদ্ধ হয়ে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে তাঁর বিষয় কীর্তন করছি, তুমি শোনো। শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতি হতে ভিন্ন পরমাত্মা। তিনি অনাদি, আনন্দময় এবং অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ; আবার তিনিই পুরুষোত্তম।১৭

ভাবার্থ—আজ তুমি ভক্তিসহকারে আমাকে প্রশ্ন করেছ; অতএব আমি শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা করে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। শ্রীরামচন্দ্র নিঃসন্দেহে প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা, অনাদি, আনন্দঘন এবং পুরুষোত্তম। দেবাদিদেব পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—তিনি আনন্দস্বরূপ; শ্রুতিতে বলা হয়েছে—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" ( তৈত্তিরীয় ৩.৬ ) অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ভৃগু আনন্দই ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। আরও বলা হয়েছে—"অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে—" (শ্বেতাশ্বতর ৫।১৩) অর্থাৎ গহনসংসার মধ্যে আদি ও অন্তহীন অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপকে জানলে জীব সকল বন্ধন হতে মুক্ত হয়। অধিকন্তু শ্রুতিতে বলা হয়েছে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্", "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। তাই তিনি পুরুষগণ অর্থাৎ জীবকুল অপেক্ষা উত্তম।১৭

স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা নভো-

বদন্তর্বহিরাস্থিতো যঃ।

সর্বান্তরস্থেঽপি নিগূঢ় আত্মা স্বমায়য়া

সৃষ্টমিদং বিচষ্টে ॥১৮॥

অন্বয়—যঃ স্বমায়য়া ইদম্ কৃৎস্নম্ ( বিশ্বম্ ) সৃষ্ট্বা নভোবৎ অন্তঃ বহিঃ আস্থিতঃ নিগূঢ়ঃ আত্মা সর্বান্তরস্থঃ অপি স্বমায়য়া সৃষ্টম্ ইদম্ ( জগৎ ) বিচষ্টে।

বঙ্গানুবাদ—যিনি নিজেরই মায়ায় সৃষ্ট এই

বিশ্বের সর্বত্র আকাশের মতো অবস্থান করছেন, আবার সবকিছুর অন্তরে-বাইরে থেকেও অতি সূক্ষ্ম আত্মস্বরূপ হয়ে এই বিশ্বকে প্রকটিত করছেন।১৮

**ভাবার্থ**—যিনি নিজের মায়ার দ্বারা এই সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি করে এর ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র আকাশের মতো নির্লিপ্তভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আর আত্মারূপে সকলের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে নিজের মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এই বিশ্বকে পরিচালিত করে থাকেন। ( তিনিই শ্রীরামচন্দ্র )

অনাদি, আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয় পরমাত্মা কিভাবে নরদেহ ধারণ করলেন—এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য এই শ্লোকে মহাদেব বলেছেন—তিনি নিজের মায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন ; এই মায়া হল অঘটন-ঘটনশক্তিরূপা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ; পরমাত্মার আশ্রিতা। কিন্তু ব্রহ্ম হলেন মায়ার অতীত। এই মায়াকেই গীতায় দৈবী গুণময়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"। 'আমি বহু হব' —এই আলোচনা করে পরব্রহ্ম সৃষ্টি করলেন এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের ; সৃষ্টি করে তিনি সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শ্রুতিবাক্যে বলা হয়েছে—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ", (তৈত্তিরীয় ২।৬) সৃষ্টজীবের মধ্যে দ্রষ্টা অন্তর্যামীরূপে ও বাইরে কালরূপে আকাশের মতো নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন তিনি। তিনি সৃষ্ট জীবের অন্তরে দ্রষ্টারূপে অবস্থান করেন অলক্ষিতভাবে। উপনিষদে বলা হয়েছে—"এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।/দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" (কঠঃ ১।৩।১২) অর্থাৎ এই পুরুষ জীবমাত্রেই আবৃত থাকায় আত্মারূপে প্রকাশিত হন না। কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্মবুদ্ধি সহায়ে মেধাবিগণ তাঁকে প্রত্যক্ষ করেন। আবার মায়ার দ্বারাই তিনি এই সৃষ্ট বিশ্ব পরিচালনা করে থাকেন। এই মায়ার বিষয়ে বেদান্তদর্শনে বলা হয়েছে—যা সৎ ও অসৎরূপে অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপে ও যৎকিঞ্চিৎ রূপে উক্ত হয়, তাকেই বলা হয় অজ্ঞান বা মায়া। গাছগুলিকে যেমন সমষ্টি-অভিপ্রায়ে বন ও ব্যষ্টি-অভিপ্রায়ে বৃক্ষসমূহ বলে নির্দেশ করা হয়, তেমনই ব্রহ্মাশ্রিত এবং জীবগত অজ্ঞান ও সমষ্টি-অভিপ্রায়ে এক এবং ব্যষ্টি-অভিপ্রায়ে বহু বলে অভিহিত হয়। সমষ্টি অজ্ঞানের নাম মায়া বা মূলাবিদ্যা, আর ব্যষ্টি অজ্ঞানের অপর নাম তুলা-বিদ্যা। মায়া সৎ নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয়। ব্রহ্ম ও মায়ার পরস্পর অধ্যাসবশতঃ ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফূর্তি মায়াতে এবং মায়ার সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি ব্রহ্মে আরোপিত হয়। এইভাবে ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয়। তিনি আবার মায়ার বিষয়ও হন অর্থাৎ মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে ব্রহ্ম অজ্ঞাত হন। আকাশতত্ত্বের জ্ঞান হলে যেমন তার নীলত্ব বাধিত হয়, তা ভ্রম বলে বুঝা যায়, তেমনই বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব সিদ্ধ হলে মায়াও বাধিত হয়ে থাকে। জীবগত অজ্ঞান জীবভেদে অনেক, সুতরাং একের অজ্ঞান দূর হলেও সকলের বন্ধন নষ্ট হয় না।১৮

জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি যৎসন্নিধৌ
চুম্বকলোহবদ্ধি।
এতন্ন জানন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ স্বাবিদ্যয়া
সংবৃতমানসা যে ॥১৯॥

**অন্বয়**—যৎসন্নিধৌ জগন্তি চুম্বকলৌহবৎ নিত্যম্ হি পরিতঃ ভ্রমন্তি, স্বাবিদ্যয়া যে সংবৃত-মানসাঃ বিমূঢ়চিত্তাঃ ( তে ) এতৎ ন জানন্তি।

**বঙ্গানুবাদ**—চুম্বকের আকর্ষণে যেমন লৌহের পরিচালন ঘটে তেমনি যাঁর অদৃশ্য

আকর্ষণে (বা উপস্থিতিতে) এই দৃশ্যমান জগৎ সর্বতোভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে তাঁকে বিবেকবর্জিত লোকেরা অবিদ্যায় মন আবৃত থাকায় জানতে পারে না।১৯

**ভাবার্থ**—যাঁর নিকট থেকে জড়প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট জগৎ গতিশীল হয়ে থাকে; যেমন চুম্বকের নিকটে অবস্থিত জড় লৌহ গতিশীলতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই চেতন ব্রহ্মের সান্নিধ্যে জড় জগৎ চারদিকে ভ্রমণ করতে থাকে। যাদের অন্তঃকরণ মায়ায় মুগ্ধ সেই নির্বোধ ব্যক্তিরা এটা বুঝতে পারে না; তারা জড় প্রকৃতিকে চেতন ও ক্রিয়াশীল বলে মনে করে। উপনিষদে বলা হয়েছে—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" (শ্বেতাশ্বতর ৬.১৯) অর্থাৎ ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য ও নিরঞ্জন। তাহলে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম কিভাবে এই সৃষ্ট জগৎ পরিচালনা করেন? ব্রহ্মই চৈতন্যস্বরূপ, আর অন্য সব অচেতন; তাদের পক্ষে ক্রিয়াশীল হওয়া সম্ভব নয়। এই আশঙ্কা দূর করবার জন্য চুম্বক ও লৌহের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। লৌহ একটি জড়পদার্থ, তার মধ্যে গতিশীলতা নাই; কিন্তু চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহ গতিশীল হয়ে যায়। তেমনই সত্য এবং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সান্নিধ্যে জড়প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা হয়ে এই প্রপঞ্চের সৃজনাদি কর্ম সম্পন্ন করে; মায়ামুগ্ধ অবোধ ব্যক্তি প্রকৃতির কর্মগুলি ব্রহ্মে আরোপ করে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না। আচার্যপাদ বলেছেন—"অনাপন্নবিকারঃ সন্ অয়স্কান্তবদেব যঃ। বুদ্ধ্যাদীংশ্চালয়েৎ প্রত্যক্ সোঽহম্ ইত্যবধারয়েৎ।" অর্থাৎ অবিকারী হয়েও যিনি কূটস্থ হয়ে চুম্বকের মতো বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচালনা করেন, তাঁকেই 'আমি' অর্থাৎ আত্মা বলে জানবে।১৯

স্বাজ্ঞানমপ্যাত্মনি শুদ্ধবুদ্ধে স্বারোপয়ন্তীহ
নিরস্তমায়ে।
সংসারমেবানুসরন্তি তে বৈ পুত্রাদিসক্তাঃ
পুরুকর্মযুক্তাঃ।
জানন্তি নৈবং হৃদয়ে স্থিতং বৈ চামীকরং
কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ॥২০॥

**অন্বয়**—(যে) শুদ্ধবুদ্ধে নিরস্তমায়ে আত্মনি অপি স্বাজ্ঞানম্ স্বারোপয়ন্তি হি, তে বৈ (জীবাঃ ইহ পুত্রাদিসক্তাঃ পুরুকর্মযুক্তাঃ সংসারম্ এব অনুসরন্তি। যথা অজ্ঞাঃ কণ্ঠগতং চামীকরং ন জানন্তি (তথা তে মূঢ়াঃ) হৃদয়ে স্থিতম্ বৈ (পরমাত্মানম্) ন জানন্তি।

**বঙ্গানুবাদ**—অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের অজ্ঞানতাকে শ্রীরামচন্দ্রে আরোপ করে মায়ামুক্ত শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকেও সেইরকম দেখেন। গৃহ, স্ত্রী, পুত্র এই সকলে আসক্ত থেকে এবং ভূরি যজ্ঞাদি কর্মে নিরত থেকে তাঁরা এই সংসারচক্রে বার বার আবর্তিত হতে থাকে। কণ্ঠস্থিত অলঙ্কার বিষয়ে বিস্মৃত হয়ে হৃদয়স্থিত সর্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে জানতে পারে না।২০

**ভাবার্থ**—যে নির্বোধেরা সেই মায়াতীত শুদ্ধবুদ্ধ পরমাত্মাতেও নিজেদের অজ্ঞানকে আরোপ করে অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকেও নিজেদের মতো অজ্ঞান বলে মনে করে, সর্বদা স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত সেই পামর জীবেরা বহু কর্মে লিপ্ত হয়ে সংসার চক্রেরই অনুসরণ করে থাকে। যেমন মূর্খ ব্যক্তি নিজের কণ্ঠদেশে পরিহিত স্বর্ণালঙ্কারের বিষয়ে অবহিত থাকে না, অন্যত্র তার খোঁজ করে ব্যর্থ মনোরথ হয়, তেমনই মায়ামুগ্ধ অজ্ঞ জীব নিজের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মার অস্তিত্ব বুঝতে পারে না।২০

যথাপ্রকাশো ন তু বিদ্যতে রবৌ
জ্যোতিঃস্বভাবে পরমেশ্বরে তথা।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনে রঘূত্তমেঽবিদ্যা কথং
স্যাৎপরতঃ পরাত্মনি॥২১॥

অন্বয়—যথা জ্যোতিঃ স্বভাবে রবৌ অপ্রকাশঃ ন বিদ্যতে, তথা পরতঃ পরাত্মনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনে পরমেশ্বরে রঘূত্তমে অবিদ্যা কথং স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ—যেমন জ্যোতিষ্মান্ সূর্যে কখনও অপ্রকাশ অন্ধকার থাকতে পারে না তেমনি বিদ্যাস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রে কিভাবে অবিদ্যা থাকবে?২১

ভাবার্থ—তাই তারা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে অজ্ঞানাদির আরোপ করে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে যেমন জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্যে কখনও অন্ধকার থাকতে পারে না, তেমনই প্রকৃত্যাদির অতীত বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরে পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রেও অবিদ্যা থাকতে পারে না। আচার্যপাদ বলেছেন—"অপ্রকাশো যথাদিত্যে নাস্তি জ্যোতিঃ স্বভাবতঃ। নিত্যবোধ-স্বরূপত্বান্নাজ্ঞানং তদ্বদাত্মনি॥" অর্থাৎ জ্যোতিঃ স্বভাবের জন্য সূর্যে যেমন অন্ধকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তেমনই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে অজ্ঞান থাকতে পারে না।২১

যথা হি চাক্ষ্ণা ভ্রমতা গৃহাদিকং বিনষ্টদৃষ্টে-
র্ভ্রমতীব দৃশ্যতে।
তথৈব দেহেন্দ্রিয়কর্তৃরাত্মনঃ কৃতে পরেঽধ্যস্য
জনো বিমুহ্যতি॥২২॥

অন্বয়—যথা বিনষ্টদৃষ্টেঃ ভ্রমতা অক্ষ্ণা চ গৃহাদিকম্ ভ্রমতি ইব দৃশ্যতে, তথা এব দেহেন্দ্রিয়-কর্তুঃ আত্মনঃ কৃতে পরে অধ্যস্য জনঃ বিমুহ্যতি।

বঙ্গানুবাদ—চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন দৃষ্টির ঘূর্ণনে গৃহাদি স্থির বস্তুনিচয়েরও ঘূর্ণন দেখেন [ বা বস্তুনিচয়কেই ঘূর্ণিত হতে দেখেন ] তেমনি দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে আসক্ত জীব পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকেও দেহাভিমানি কর্তা বলে মনে করে।২২

ভাবার্থ—যেমন নিজের চারদিকে ঘুর-পাক খাওয়ার সময় কোনও মানুষের চোখ ঘুরার ফলে ঘরবাড়ি, গাছপালা সবই ঘুরছে বলে মনে হয়, তেমনই মানুষ নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের কৃত কর্মসমূহ আত্মাতে আরোপ করে মোহিত হয়ে পড়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে জীব নিজের অজ্ঞতা-বশতঃ পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের মতো অজ্ঞানী বলে মনে করে; এই উক্তি অসঙ্গত বলে মনে হতে পারে, তাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই আশঙ্কা দূর করা হয়েছে। খেলার সময় বালক নিজের চারদিকে আবর্তন করতে করতে স্থির গাছপালা ও ঘরবাড়িগুলিকেও ঘুরতে দেখে। তেমনই দেহাভিমানী মায়ামুগ্ধ জীব আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদিকৃত কর্মের কর্তা বলে মনে করে, 'আমিই কর্তা'—ভেবে মোহগ্রস্ত হয়। যেমন চক্ষুর ভ্রমণ গৃহাদিতে আরোপিত হয়, তেমনই অন্তঃকরণের অভিমানবশতঃ দেহাদির কর্তৃত্ব আত্মাতে আরোপিত হয়। এইভাবে জীব নিজের অজ্ঞান শ্রীরামচন্দ্রে আরোপ করে সাধারণ দেহাভিমানী মায়ামুগ্ধ জীবের মতো তাঁকে কর্তা বলে মনে করে।২২ [ ক্রমশঃ ]

আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এবং সকলের আত্মস্বরূপ হইলেও যেহেতু আমি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি সেইজন্য আমার পরমস্বরূপ না জানিয়া মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করে।

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

# অভেদ তত্ত্ব

শ্রীমতী রুবি দাশগুপ্ত

নামরূপাত্মক এই জগতের মূল সত্তা ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ আমাদের শাস্ত্রে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। মূলতঃ ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয় এবং সর্বব্যাপী। মায়া বা অজ্ঞান সহায়ে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মই এই নামরূপাত্মক জীব-জগতরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। যে মায়া বা অজ্ঞান নিমিত্ত ব্রহ্ম জীব-জগতরূপে প্রতিভাত হন তা ব্রহ্মেরই শক্তি। এই শক্তির স্বরূপ কি তা বলা কঠিন। অদ্বৈত-বেদান্ত মতে অজ্ঞানকে সদসদ্ বহির্ভূত এক অনির্বচনীয় শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মায়ার জন্যই মানুষ মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করে; এবং সে যে নিজে ব্রহ্ম, এ সত্যটুকু বুঝতে পারে না, ফলে নিজের স্বরূপ সম্পর্কে সহজে জানতেও আগ্রহী হয় না। প্রশ্ন জাগে, ব্রহ্ম এক হয়েও কেন বহু হয়েছেন? উত্তরে বলা যায় তিনি স্ব-ইচ্ছায় লীলার্থে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

মানুষের মূল সত্তা যেহেতু ব্রহ্ম, সেহেতু সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে জানার ইচ্ছা ও প্রয়োজন মানুষের মধ্যে কোন না কোন সময়ে জাগে। কিন্তু মানুষ তার সীমিত মন-বুদ্ধিদ্বারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করতে পারে না। তাই সে তার সীমিত মন-বুদ্ধির অধিগম্য করে ব্রহ্মকে বুঝতে চায়। আর তখনই তাঁকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা এবং সকল উত্তম গুণসমূহের পূর্ণ আধার ঈশ্বররূপে উপাসনা করে। বেদান্তের ভাষায় ইনিই সগুণ ও সাকার ব্রহ্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে বুঝতে না পারে ততক্ষণ সগুণ-সাকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই তার উপাস্য। আর সাধনার প্রথম স্তরে মানুষ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরেরই প্রতি-মূর্তিরূপে নানা দেব-দেবীর কল্পনা সহায়ে ঈশ্বরকে বুঝতে ও জানতে চায়। সুতরাং মানুষ যে-সব দেব-দেবীর কিংবা প্রতীকাদির উপাসনা করে তাঁরাও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে পৃথক নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৯।২৩) বলেছেন, "হে কৌন্তেয়, যাঁরা আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত হয়ে ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁরা অজ্ঞানপূর্বক (অর্থাৎ অন্যান্য দেবতারূপে ভগবানই স্বয়ং অবস্থিত, এই তত্ত্ব না জেনে) আমারই পূজা করেন।"

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনার সময় সাধক তাঁর রুচি অনুযায়ী ঈশ্বর বা ভগবানকে পুরুষ কিংবা প্রকৃতি অর্থাৎ ভগবান্ ও ভগবতীরূপে আরাধনা করে থাকেন। মূলতঃ ঈশ্বরে স্ত্রী-পুরুষ কোন ভেদ নেই। বৈদান্তিকগণ যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, বৈষ্ণবগণ তাঁকেই বিষ্ণু বলেন, আবার তান্ত্রিকগণ তাঁকেই মহামায়ারূপে আরাধনা করেন। তাত্ত্বিক দিক দিয়েও উভয়েই এক। গীতায় (১০।২০) ভগবান্ বলছেন: "আমিই সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্মা এবং আমিই প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান।" তদ্রূপ শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও (৫।৭৭-৭৮) পাই "যিনি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজিতা এবং যিনি সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতসমূহের প্রেরয়িত্রী, সেই বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্মশক্তিরূপা দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। যিনি চিৎশক্তিরূপে সমগ্র জগদ্ব্যাপী অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার।" উপনিষদেও (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৩) আছে: "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি"—তুমি স্ত্রী, আবার তুমিই পুরুষ। অতএব তাত্ত্বিক দিক দিয়েও ভগবান্ ও ভগবতীর অভিন্নতা প্রমাণিত হয়।

কখন কখন সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান ভগবানের শক্তিকে ভগবতীরূপে উপাসনা করা হয়। শাক্তসম্প্রদায়ের মাতৃ-উপাসনা এই শক্তি-উপাসনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এক্ষেত্রেও শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন। কেননা শক্তিকে শক্তিমান থেকে পৃথক করা যায় না; আবার শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের অস্তিত্ব থাকে না। যেমন অগ্নি ও ও তার দাহিকাশক্তি অভিন্ন, তেমনি শক্তি ও শক্তিমান, ভগবতী ও ভগবান্ অভিন্ন। আবার সর্বশক্তিমান ভগবান্ যদি সর্বব্যাপী হন, তবে তাঁর শক্তিও অবশ্যই সর্বব্যাপিনী হবেন। কেননা শক্তি শক্তিমান অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু নন। তাছাড়া সর্বব্যাপী সত্তা তো আর দুটি হতে পারে না। তাই উভয়ের অভেদত্বই সিদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়: "এই আত্মাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ।...যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। ...পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১০।৩)

সর্বশক্তিমান ভগবান্ কখন কখন এই ধরা-ধামে অবতীর্ণ হন মানুষরূপে। তখন তিনি অবতাররূপে গৃহীত হন। ভগবান্ অবতার হয়ে মানুষের মধ্যে আসেন বিশেষ একটি যুগসন্ধি-ক্ষণে। যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, যখন সাধারণ মানুষ যথার্থ ধর্মের পথ হারিয়ে দিশা-হারা হয়ে মনুষ্যত্বের মর্যাদা হারিয়ে অধর্মের নিগড়ে নিষ্পেষিত হতে বাধ্য হয়, তখনই শ্রীভগবান্ তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করবার জন্য এবং জগতে যথার্থ ধর্মসংস্থাপনের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন। গীতায় (৪।৭-৮) ভগবান্ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন: "যখন ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি দেহবান্ হই। সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" ভগবান্ যে শুধু পুরুষদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন তা নয়; প্রয়োজনে তিনি নারী-দেহও ধারণ করে অবতীর্ণ হন। চণ্ডীতে (১।৬৫-৬৬) দেখি, তিনি নিত্যা ও সর্বব্যাপিনী শক্তি। তথাপি তিনি প্রয়োজনে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হন। যখন তিনি দেবগণের কার্য-সিদ্ধির নিমিত্ত আবির্ভূতা হন, স্বরূপতঃ নিত্যা হলেও তিনি তখন উৎপন্না বলে অভিহিতা হন। দেবী নিজেও বলেছেন: যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি আবির্ভূতা হয়ে দেবশত্রু অসুরগণকে বিনাশ করব।" (চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫)

কখন কখন ভগবান্ তাঁর শক্তি পরাপ্রকৃতিকে লীলাসঙ্গিনীরূপে নিয়ে আসেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ভগবান্ তাঁর পরাপ্রকৃতি থেকে ভিন্ন নন। তথাপি লীলার জন্য—তাঁর যুগোপযোগী কার্যসিদ্ধির জন্য ভিন্ন দেহ, অর্থাৎ পুরুষ ও নারীদেহ ধারণ করেন। বর্তমান যুগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্মের ক্ষেত্রে ছিল একটি সঙ্কটময় মুহূর্ত। তখন ভারতীয় জীবনে বৈদেশিক ভাবধারার অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় জাতি তার স্বধর্মে আস্থা হারিয়ে সমস্ত মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছিল। তখনই ভগবান্ অবতীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "কালবশে সদাচার-ভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান......অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া...যখন এই ধর্ম-ভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, তখন আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং...ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদেশিক

স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" (উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্বার্ধের অন্তর্গত 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ধর্মের এই সঙ্কটকালে ভগবান্ মানবজাতির চৈতন্য উৎপাদন করে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে দুই ভিন্ন তনুতে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামণিরূপে অবতীর্ণ হলেন। এই যুগে ত্যাগাদর্শবিমুখ, ভোগসর্বস্ব মানসকে মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ করার একটি বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ভগবান্। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে মাতৃভাবে সাধনা করেছিলেন এবং মর্ত্যলীলার সঙ্গিনী ও স্বীয় পত্নী শ্রীসারদামণিকে জগন্মাতারূপে (স্বরূপতঃ তিনি জগন্মাতা হলেও) পূজা করে লৌকিক দৃষ্টিতে তাঁর মধ্যে মাতৃত্বের জাগরণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা একই তত্ত্ব, কিন্তু ভিন্ন দেহ। ভগবান্ ও ভগবতী যে ভিন্ন নন তা শাস্ত্রতঃ নির্ণীত হলেও তাঁরা যখন দেহধারণ করে মানুষের মধ্যে আসেন তখন সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিন্নত্ব বুঝতে পারে না। এমন কি তাঁদের অবতারত্বে সন্দেহ করে তাঁদের অবজ্ঞা করে। আমরা দেখি শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার পরেও সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অল্প কয়েক জন ব্যতীত ভক্তদের অনেকেই শ্রীশ্রীমা যে স্বয়ং ভগবতী—শ্রীশ্রীঠাকুরেরই আর এক রূপ, তা সহজে বুঝতে সক্ষম হননি। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা যে অভিন্ন তা সহজে বুঝতে হলে, তাঁরা পরস্পরকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন এবং একে অপরের সম্পর্কে কি কি উক্তি করেছেন, তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের অবতারত্ব নিজে ঘোষণা করেছেন, তা ঠাকুরের জীবনী-পাঠক সকলেরই জানা আছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী পণ্ডিত-সভা আহ্বান করে ঠাকুরের অবতারত্ব শাস্ত্রতঃ প্রমাণ করেছিলেন। স্বামীজী ঠাকুরকে অবতারবরিষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন সর্বদেবদেবীস্বরূপ। শ্রীশ্রীমা ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "উনিই মনসা, গঙ্গা, সব।" "ইনিই সব—পুরুষ, প্রকৃতি; এঁকে ভাবলেই সব হবে।" "ঠাকুরের ভিতর সব দেবদেবী আছেন—এমন কি শীতলা, মনসা পর্যন্ত।" (শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৫ম সং, পৃঃ ৫১৯-২০)।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে জগন্মাতার সঙ্গে অভিন্ন ভাবতেন। তাই মা-কালীকে পূজা করার সময় কখন কখন তিনি ভাবে বিভোর হয়ে পূজোপকরণ নিয়ে নিজেকে পূজা করতেন।

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ভক্তগণ যখন কালীপূজার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি দ্বারা ঠাকুরকে মা-কালী জ্ঞানে পূজা করেছিলেন, তিনি তখন তাহাদিগকে ঐরূপ করতে নিষেধ না করে বরং পূজা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে জগজ্জননী কালীরূপেই দেখে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহাসমাধিলাভ করলে সাধারণতঃ পতিবিয়োগে স্ত্রীলোকেরা যেমনভাবে শোক করে থাকে তিনি তা না করে "মা কালী গো, তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো" বলে কেঁদে উঠেছিলেন (ঐ, পৃঃ ৫২১) আবার শ্রীশ্রীমাকেও তিনি স্বয়ং জগজ্জননীরূপেই সর্বদা দেখতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসংবাহনকালে শ্রীশ্রীমা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "'আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?' ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন···। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে

তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।'" (ঐ, পৃ: ৫৬) আরেক দিন শ্রীশ্রীমা "আমি তোমার কে?"—এরূপ প্রশ্ন করায় ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি আমার মা আনন্দময়ী।" (ঐ, পৃ: ৫১৯)।

শ্রীশ্রীমা যে স্বয়ং জগদম্বা এবং পূর্ব পূর্ব যুগেও অবতারের লীলাসঙ্গিনীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা নিজমুখে স্বীকার করেছেন। জনৈক ভক্ত মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "মা, সব অবতারেই কি আপনি এসেছেন?" তখন মা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বাবা"। (ঐ, পৃ: ৫৩০) ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবুদাদার নিকট তিনি যে স্বয়ং কালী এ-কথা স্বীকার করেছিলেন। রাধুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে শ্রীমা একদিন বলেছিলেন, "দেখ, মা, এ শরীর (নিজের শরীর দেখাইয়া) ···ভগবান না হলে কি মানুষ এত সহ্য করতে পারে?···আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে পারবে না, পরে বুঝবে সব।" (ঐ, পৃ: ৫০৪) জনৈক সন্ন্যাসী ভক্ত মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "'মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তবে আপনি কে?' বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া মা উত্তর দিলেন, 'আমি আর কে, আমিও ভগবতী।'" (ঐ, পৃ: ৫০৬) জনৈক ভক্ত অপরের মুখে শুনেছেন মা সাক্ষাৎ কালী, আদ্যা-শক্তি ভগবতী। মার মুখ থেকেই তিনি এ-কথা ঠিক কিনা জানতে চেয়েছিলেন। মা উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, সত্য।" (ঐ, পৃ: ৫০৭)। শ্রীশ্রীমায়ের আরও বহু উক্তি ও ঘটনা আছে যাতে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা স্বরূপতঃ অভিন্ন। তাঁরা উভয়েই শ্রীভগবান্ বা শ্রীশ্রীজগদম্বার যুগ্ম প্রকাশ। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা যে অভিন্ন নিজ নিজ মুখেও তাঁরা উভয়েই তা স্বীকার করেছেন। একদিন গোলাপ মাকে ঠাকুর বলেছিলেন, "এ জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!" (ঐ, পৃ: ১৪০) আবার শ্রীশ্রীমাও বলেছেন, "যেই ঠাকুর সেই আমি" (ঐ, পৃষ্ঠা ৫২৭)।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা যখন অভেদ, তখন পূর্ব পূর্ব যুগের অবতারগণও তাঁদের লীলা-সঙ্গিনীগণের সঙ্গে অভেদ, এতে কোন সন্দেহ নেই। যুগ প্রয়োজনে লীলাসঙ্গিনীদের ভূমিকা সবসময় হয়তো সমান হয় না; হয়তো কখন কখন অবতারের সঙ্গে তাঁদের ভূমিকা প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে অবতারগণের সঙ্গে যে-সম্বন্ধই থাকুক না কেন এবং তাঁদের ভূমিকা যত অল্পই হউক না কেন তাতে তাঁদের অভেদত্বের হানি হয় না। কেননা ভগবান্ তাঁর শক্তিকেই লীলার্থে সঙ্গে নিয়ে অবতীর্ণ হন। আর শক্তি ও শক্তিমান অভেদ।

## ভ্রমসংশোধন

বিগত ১৩৯৩-র চৈত্র সংখ্যায় ১৯৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ৪র্থ ও ৫ম পঙ্ক্তির 'অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স'-র স্থলে 'অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্' এবং ২০২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের শেষ পঙ্ক্তির 'দেহযুক্ত আত্মা' স্থলে 'দেহমুক্ত আত্মা' পড়তে হবে—সঃ

# শতবর্ষের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা

অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন

আজ থেকে প্রায় একশত পঞ্চাশ বছর আগে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরে যে আশ্চর্য মহাজীবনের সূচনা হয়েছিল, অতি বিস্ময়কর বহু সাধনায় সিদ্ধিলাভের অপূর্ব ইতিহাস রচনা করে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অগস্ট কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সে মহামানবের মর্ত্যলীলার অবসান। কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বলরাম-মন্দির প্রভৃতি মহাতীর্থস্থানগুলিতে তাঁর অতুলনীয় মহিমান্বিত লীলার সমাপ্তির পর থেকে আজ একশ বছর অতিক্রান্ত। এই একশ বছরের ব্যবধানে শ্রীরামকৃষ্ণের অপার্থিব মহিমার যে ছবি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তার অনন্ত-সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন হিন্দুধর্মের সাকারোপাসনা পৌত্তলিকতা বলে নিন্দিত ও উপহসিত হয়েছিল সমকালীন একেশ্বরবাদী নিরাকার ঈশ্বরের উপাসকমণ্ডলীর দ্বারা। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দই এই নিন্দায় ছিলেন অগ্রণী। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারি উইলিয়াম হেস্টি, আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রমুখরা। অভিজাত ভারতীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরাজ-নারায়ণ বসুও এই কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন, খুবই উৎসাহের সঙ্গে। এক কথায় বলতে গেলে তৎকালীন বহু স্বদেশী ও বিদেশী মনীষীই তৎপর হয়েছিলেন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করার জন্য।

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পূজারী শ্রীরাম-কৃষ্ণ এই সমালোচকদের নিকট স্বীয় জীবনে উপলব্ধ সত্য দিয়ে এটাই প্রমাণ করলেন যে সাকারোপাসনা পৌত্তলিক নয়; পরন্তু মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ীর উপাসনা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে সাকারোপাসনা যে ভাবে প্রকাশলাভ করল তা বিরুদ্ধ সমালোচনাকে প্রতিহত করল।

সুলভ সমাচার, ধর্মতত্ত্ব ও Indian Mirror পত্রিকায় কেশবচন্দ্র এবং Theistic Review পত্রিকায় শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত মূর্তিপূজার তত্ত্বকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করে সাকারোপাসনাকে গ্রহণ করে নব ধর্মাচার্যরূপে দেখা দিয়েছিলেন। শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর আনুগত্য অটুট রাখলেও মা-কালীর পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরানুভূতিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে না দেখে থাকতে পারেননি।

অদ্বৈত বেদান্তের সাধনার চরমফল সমাধি কি বস্তু তাও সে যুগের ধর্মজীবনে অপরিজ্ঞাত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও তাঁর বাণীর শ্রেষ্ঠতম প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দও এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারায় পরিচালিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতজ্ঞানকে অস্বীকার করে বলেছিলেন যে, ঘটিটাও ঈশ্বর, বাটিটাও ঈশ্বর—এটা সম্ভব নয়। মা-কালীকেও তিনি জগন্মাতা-রূপে স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু শ্রীরাম-কৃষ্ণের পূত সান্নিধ্যে এসে ধীরে ধীরে তিনি কালীকেও চিনলেন এবং নির্বিকল্প সমাধির স্বাদও লাভ করলেন। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

এবং শিবনাথ শাস্ত্রীও সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরে তন্ময় হওয়ার দৃষ্টান্তকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ভারতের যে ধর্ম সর্বপ্রথম বিশ্বধর্মের রূপ গ্রহণ করেছিল সেই বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার বিশ্বব্যাপী বিস্তারের একটি প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধের জীবনকালে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ বিস্তার লাভ করেনি। এজন্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় প্রেরিত গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ নেই। তখনও বৌদ্ধধর্ম জনজীবনে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই যা পাটলিপুত্রে অবস্থিত একজন বিদেশীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। যদিও তৎকালীন ভারতীয় ধর্মজীবন সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের যথেষ্ট কৌতূহল ছিল এবং তিনি কৃষ্ণ ও শিবের উপাসক সম্বন্ধে নানা মন্তব্যও করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকই প্রথম বৌদ্ধধর্মকে একটি সর্বভারতীয় ধর্মে ও পরে একটি বিশ্বধর্মে পরিণতির পথে পরিচালিত করেন। এই ঘটনা বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় দুশত বর্ষ পরের। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁর বাণী ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের দ্বারা প্রচারিত হয়ে একটি অভূতপূর্ব নিদর্শন উপস্থাপিত করেছিল। চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিজয়মাল্যে সম্বর্ধিত স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক ও লণ্ডনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ভাষণ দিয়েছিলেন 'মদীয় আচার্যদেব' (My Master) শীর্ষক সেই বক্তৃতা পাশ্চাত্য জগতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী ও জনসাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ভাবমূর্তির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক 'ম্যাকস্মূলর Life and sayings of Sri Ramakrishna' পুস্তক প্রকাশের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের লোকগুরুরূপে প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করেন।

বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের পর্যায়ে উপনীত হবার পথে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজকীয় সহায়তার উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রচারে রাজকীয় সহায়তার কোন প্রশ্নই ছিল না। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সময় ভারত ছিল ইংরেজ শাসনাধীন। খ্রীষ্টধর্ম যদিও রোমান সাম্রাজ্যের উৎপীড়নকে অতিক্রম করে আপন প্রাণশক্তির বিকাশের এক অদ্ভুত ইতিহাস রচনা করেছিল, কিন্তু ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর রাজনীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে রাজনৈতিক পথে যাত্রা আরম্ভ করে। খ্রীষ্টধর্মের গুরু পোপ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে রাজনীতির পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। আর ইসলামধর্ম ইসলাম সাম্রাজ্যের হাত ধরেই এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা কোন কালেই রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়নি।

ধর্মজীবনে নারীর স্থান সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনব ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সকল জগৎপূজ্য মহাপুরুষদের মধ্যে কেবল তিনিই ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে স্ত্রীগুরু গ্রহণ করেছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকট তন্ত্রসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করে নারীকে যে শ্রদ্ধা তিনি নিবেদন করেছিলেন, তার আর কোন নিদর্শন আছে কি? অনুরূপভাবে আপন পত্নীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে এবং তাঁকে আপনার সাধনার ফল, জপের মালা প্রভৃতি উৎসর্গ করে তিনি যে দাম্পত্য-সম্পর্কের চিত্র লোকসমাজকে উপহার দিলেন

তারও কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। তাঁরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সঙ্ঘজননী-রূপে পরবর্তিকালে অগণিত সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যের মুক্তিপথের কাণ্ডারী হয়েছিলেন। সমাজ পরিত্যক্তা নারীকেও তিনি ঈশ্বরলাভের সাধনায় প্রেরণা দান করেছিলেন।

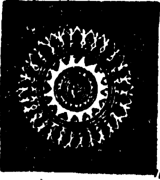
'যত মত তত পথ' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মে ধর্মে বিবাদের সকল কারণের মূলোচ্ছেদ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের ধর্মসাধনা আপন জীবনে অনুশীলন করে তিনি প্রত্যেকটিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাই একক ও অতুলনীয়।

নাগরিক সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষার গর্বে স্ফীত আধুনিক মানুষের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন তাঁর একান্ত গ্রাম্য পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ও ভাষা, এবং জীবনযাপনের প্রতীক রূপে। কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য নেতৃস্থানীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেভাবে প্রায় নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছিলেন তা অবিশ্বাস্যবোধ হলেও একান্ত বাস্তব সত্য। সন্ন্যাসী, গৃহী, পণ্ডিত ও মূর্খ, জ্ঞানী ও ভক্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় মানুষ ও সমাজ পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের—সকলকেই একই-ভাবে আকর্ষণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজীবনের প্রকৃত ও উচ্চতর ভাবলোকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করতে সমর্থ হয়ে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐক্য স্থাপকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মানবসমাজে ঐক্য স্থাপনে শ্রীরামকৃষ্ণের অপর দুটি বাণী—'কারও ভাব নষ্ট করতে নাই' এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে আত্মপ্রকাশের অধিকার দান ও বঞ্চিত, আর্ত মানুষকে সেবার মাধ্যমে সর্বভূতে প্রকাশমান ব্রহ্মের উপলব্ধিকে সম্ভবপর করে সবরকম বিরোধ ও সংঘাত অবসানের পথকে উন্মুক্ত করেছে। প্রতি মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করেই জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। তা না হলে এক ছাঁচের মানুষ প্রাণহীন ঐক্যের আরোপে কলের পুতুলে পরিণত হবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই মানব-সমাজে প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যকে রক্ষা করে মানব-মিলনের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দান করবে।

সেবাধর্ম মানুষের অহমিকাকে দূর করে ভ্রাতৃভাবের প্রসারে তার অন্তরস্থ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার পথ দেখাবে। আর তখনই নিখিলবিশ্বে মানব-ঐক্যের স্বর্ণযুগ প্রবর্তিত হবে।

**ইদানীন্তন কালে ঐ উভয় (পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রাচীন) সভ্যতা একত্র সংযোগ করতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেছেন। একালে একদিকে যেমন লোককে কর্মতৎপর হ'তে হবে, অপরদিকে তাদের তেমনি গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। এরূপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যোন্য-সম্মিশ্রণে জগতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হবে।**

**—স্বামী বিবেকানন্দ**



# অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

স্বামী শুদ্ধানন্দ

## বৈরাগ্য না উন্মত্ততা ?

একজন বি. এ. পাশ করা যুবকের মনে হঠাৎ কোন কারণে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। যুবক বড়মানুষের ছেলে—বাপ লাখপতি জমীদার। কল্‌কেতায় তাঁদের মস্ত বাড়ী ছিল। বাপ মা ভাই ভগিনী সব বর্ত্তমান—শুধু তা নয়, বছর চেরেক হইল বিবাহও হইয়াছে—ঘরে সেই যুবতী স্ত্রী। ছেলে পুলে কিছু হয় নাই। বয়স এখন বছর ২২/২৩ হবে। শরীরে কোন রোগ ছিল না—বেশ সুবলিষ্ঠ; বাড়ীর কারুর সঙ্গে একটু বকাবকি হবার সম্ভাবনাই ছিল না। তবে হঠাৎ এরকম কেন হল? একদিন কাউকে কিছু না বলে কোয়ে কোথা চলে গেছেন। সকলে কেঁদে আকুল। তাঁর বাপ মার ত আজ চারদিন অবধি কিছু খাওয়া দাওয়া নেই। আমরা ত সকলে মহাদুঃখিত—দাদাবাবুর অদর্শনে। দাদাবাবু আমার কখনো একটা চড়া কথা কাউকে বলেন না। মহাবুদ্ধিমান, অতি দয়ালু, নম্র প্রকৃতির লোক। আমি যতদিন এ সংসারে আছি, ততদিনের ভিতর এমন শোকাবহ ঘটনা কখন হয়নি।

বলিয়া রাখি, আমি এ বাড়ীর একজন পুরাতন সরকার; দশ বার বছর যাবৎ আছি, কিন্তু এমন সুখে আর কোথাও চাকরী করি নাই। আমরা সকলে এইরূপ ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছি, এমন সময় কর্ত্তাবাবু তাড়াতাড়ি একদিন এসে আমায় ডেকে বল্লেন, 'রাম, একটা গোপনীয় কথা আছে।' আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। কর্ত্তাবাবুর মুখ যেন একটু প্রফুল্ল। বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন।

আমি মনে করিলাম, বুঝি দাদাবাবুর কোন খবর আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাদাবাবুর কি কোন খবর পাইয়াছেন?' 'হাঁ পাইয়াছিও বটে, আবার পাই নাইও বটে।' আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কর্ত্তাবাবু বলিতে লাগিলেন, 'রাম, শোন, এই বয়সে এমন পুত্ররত্ন হারাইতে বসিয়াছি। যে কোনরূপে হউক, তোমায় তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিতেই হইবে।' কর্ত্তার চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। 'নগেনের হঠাৎ এই লেখাটী পাইয়াছি। তুমি ভাল করিয়া তাহার খাতাপত্র খোঁজ—কিছু লিখিয়া গিয়া থাকিতে পারে।' লেখাটী লইয়া পড়িলাম; পড়িয়া তাঁহার খাতাপত্র খোঁজার স্পৃহা কতকটা হ্রাস হইল। বাবু বলিলেন, 'কি বুঝিতেছ?' বলিলাম, 'ফেরান দায়। দাদাবাবুর বিবেক জন্মিয়াছে। আশ্চর্য্য, আমরা এতদিন কিছু টের পাই নাই।' খাতাপত্র খুঁজিলাম, কিছুই সন্ধান করিতে পারিলাম না। সমুদয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পুরস্কার ঘোষণা করা হইল, কোন ফল হইল না।

* * *

দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ক্রমে একটু একটু করিয়া সকলের শোক কমিল। কিন্তু স্মৃতি গেল না। একদিন এক তেজঃপুঞ্জকায়

সন্ন্যাসী উপস্থিত। দেখিয়া চিনিলাম—সকলে চিনিলেন। শোক আনন্দ একত্রে উথলিল। মুখ প্রশান্ত; সুখে দুঃখে যেন অটল। ভক্তিজ্ঞান যেন মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বৃদ্ধ পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, বলিলেন, 'ভগবানকে জীবনের লক্ষ্য কর, তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আর সব বাজে কাযমাত্র।' আমাদের সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। দু-একটী কথা যাহা কহিলেন, যেন মধুমাখা। বলিলেন, 'সদসৎ বিচার ভুলো না; তাহলে ক্রমশঃ সতের সঙ্গে দেখা হবে, পরমানন্দ লাভ হবে।'

ঘণ্টা কয়েক থাকিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেলেন। সেই অবধি আমার মনে যেন একটা দাগ থাকিয়া গেল। আমি পূর্ব্ব হইতেই দাদাবাবুর লেখা সেই কাগজগুলি কাছে রাখিয়াছিলাম। একটু মন খারাপ হলেই সেগুলি পড়ি—তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া ও তাঁহার বৈরাগ্যোদ্দীপক লেখাগুলি পড়িয়া আমার মনে—আমি সংসারী হইলেও—বেশ এক এক বার চৈতন্য হয়। তাই মনে করিলাম, যদি সেইগুলি পড়িয়া অপর কোন সংসারীর কিছু উপকার হয়, তাই লেখাটী বেশ সুপ্রণালী ক্রমে বিন্যস্ত না হইলেও পাঠকগণকে উপহার দিলাম। বোধ হয়, দাদাবাবু কোন দিন নিজের ভাবে বিভোর হইয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া লিখিতেছিলেন—

ইতি, কোন সরকার।

### "কেন ঘুরিয়া মরি!—

লোকে সচরাচর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই বলিয়া থাকে, আমাদের সংসারের কাযে দিন রাত ব্যস্ত থাকতে হয়, ঈশ্বরচিন্তা করি কখন? যেন তাঁদের কে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছে, সংসারের কায করবে বাবা কর, না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। আচ্ছা, এঁদের কি কখন এক একবার চকিতের মত মনে উদয় হয় না যে, এই-যে সব কাযে ব্যস্ত রয়েছি, এ আমার নিজের দোষে—আমি নিজে কায না কোরে থাকতে পারিনি বোলে। আমাকে যদি কেউ জোর করে সব কায ছাড়িয়ে দিয়ে খালি বলে ঈশ্বরচিন্তা কর, তা হলে আমি হাঁফিয়ে মরি। এ চিন্তা কি কখন তাঁদের উদয় হয় না? শুভ মুহূর্ত্তে অবশ্য সকল প্রাণে ক্ষীণ বা স্পষ্ট স্বরে এই বাণী উচ্চারিত হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষ উহাকে চাপা দিয়ে নানারকম হেত্বাভাস দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়—আর দোষ চাপায়—সমাজের উপর, ঘটনাচক্রের উপর, আবার সর্ব্বোপরি—বিধাতার উপর। কেন ঘুরে মরি? ঘুরিতে সুখ পাই বলিয়া। সংসারের কর্ম্মে কেন এত ব্যস্ত? সংসারের কর্ম্মে সুখ পাই বলিয়া। মোহ বলে একটা জিনিষ আছে—সেইটে আমাদের টেনে টেনে নিয়ে বেড়ায়—একটু রূপ দেখলে একেবারে উন্মত্ত হই—এতটুকু জিহ্বার স্বাদের জন্য, এতটুকু সুগন্ধের জন্য, এতটুকু সুখস্পর্শের জন্য আমরা বিচার ভুলে যাই। স্থিরভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কায করা কথার কথামাত্র; যত ভাবা চিন্তা যায়, তত কায কমে যায়। যা কিছু কায হয়, তাও বড় পবিত্র ভাবে হয়।

এখন কথা হচ্চে এই, স্রোতে গা ভাসান দেওয়া ভাল, না বিচার করে—সদসৎ বিচার করে বুঝে শুঝে চলা ভাল? বিচার যদি না কল্লুম, তা হলে পশু আর আমি ত এক।

মানুষের মনুষ্যত্ব কোন্ খানে? মানুষের বিচারশক্তিতে। মানুষ কায করিতে করিতে এক একবার চকিতের মত পেছন দিকে চেয়ে কি কচ্চি ভাবতে পারে বলে, মানুষের ভিতর চৈতন্যশক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ আছে বলে। তা

না হলে জড়ের সঙ্গে মানুষের সমান ভাব হোতো। মানুষ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারে বলেই জড়ের সঙ্গে তার প্রভেদ। মানুষের ভিতর দেবতা অসুর দুইই আছে। অসুর রূপরসের জন্য উন্মত্ত—দেবতা বলেন, ভাবিয়া কায কর—ভাবো। দেবতা ভাবময়—দেবতা কেবল অসুরের কার্য্যের সমালোচনা করে। দেবতা কেবল বলে—কি কোচ্চো?

মানুষ সর্ব্বদা ভোগে মাতিয়া থাকিতে পারে না। ভোগটা যেন নেশার মত; ত্যাগটা যেন আকাশের মত পবিত্র, স্বচ্ছ, নির্ম্মল। মানুষের মন হাজার অসৎ দিকে যাক্ না কেন, ত্যাগে আকৃষ্ট হবেই। তাই সহস্র কষ্ট সত্তেও ত্যাগের জীবনের, সন্ন্যাসীজীবনের শ্রেষ্ঠতা সকলেই এক বাক্যে ঘোষণা করেছেন। শঙ্করাচার্য্য লিখ্‌চেন 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।' বাস্তবিক, যার অগাধ ঐশ্বর্য্য আছে, বিষয়মদিরা পানে যে অন্ধ, সে নহে, যার এই মদের নেশা ছুটেছে, যার ঘুম ভেঙেছে, যার সব স্বপ্ন বোধ হয়েছে, সেই সুখী। সেই আনন্দময় পুরুষ। আর সকলে আনন্দকে ভেংচাইতেছে মাত্র। পঞ্চাশ পর্দ্দার ভেতর দিয়ে সেই আনন্দের ঝিকিমিকি।

মানুষ মাতিয়া যায়, তাই ঘোরে। একটুখানি রূপ, একটুখানি রস, একটুখানি গন্ধ, একটুখানি শব্দ, একটুখানি স্পর্শ মানুষকে কুহকমন্ত্রে ভুলাইতে সমর্থ। কে এ যাদুকর, যে এই সব দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখে? মন, এ চিন্তা কি কখন করেছ? না করে থাক, কর, থাম; কোথায় সামনের দিকে ছুটেছ, একবার পেছনে চেয়ে দেখ, একবার দেখ, কোথায় চলেছ। এ আলেয়ার আলো—কোথায় তেপান্তর মাঠে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হবে। আপনার তেজ আপনি বোঝ্‌বার চেষ্টা কর—সমুদয় কর্ম্মের রহস্য বুঝ্‌তে পারবে। তোমার যা নিজের আনন্দ আছে, তোমার যা নিজের তেজ আছে, তাই তোমার নিজস্ব। তুমি কেন অপরের ধনে গৃধ্নু হও? তুমি নিজেকে অপূর্ণ মনে করছো—তাই তোমার এত ঘোরাঘুরি, তাই তোমার এত কর্ম্ম। কিন্তু একবার যদি কর্ম্মের রহস্য বুঝতে পার, তা হলে দেখ্‌বে, তুমি সর্ব্বশক্তিমান হয়ে, সর্ব্বজ্ঞানময় হয়ে, ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র জ্ঞানের গরিমা করে বেড়াচ্চ। অভিমান কিসের? সে এত বড় লোক যে, তার তুলনা হয় না, তার কোটি মুদ্রার অভিমান কিসের? যে স্বয়ং সুন্দরের সুন্দর, অতি সুন্দর, যার সৌন্দর্য্যে জগৎ আলো, তার এতটুকু রূপের অভিমান কেন? মন, জান না কি, ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, সেখানে সূর্য্যের জ্যোতি জোনাকির আলো। তাই বলি মন, 'আপনাতে আপনি থেকো, যেয়ো না কো কারু ঘরে, যা চাবি, তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে'। কর্ম্মাভিমানিন্, কত কর্ম্ম করবে? তোমা থেকেই যে সব কর্ম্ম—তোমা থেকেই যে সব। মন, যখন স্থির হয়ে ভাবি, তখন হাসি পায় তোর চেষ্টা দেখে। শাস্ত্রে বলেছেন, তুই অন্ধ। তা ঠিকই বটে। তুই যদি চক্ষুষ্মান্ হতিস্, তা হলে তোর এত দিন লজ্জা উপস্থিত হত। তুই নটীর মত নাচ্চিস্ আর আমাকেও তার সঙ্গে জড়িয়েছিস্—তাইতে আমিও নাচ্চি বোধ হচ্চে, আমি ত তুই নই। তুই নাচ্‌বি নাচ্। আমি জেনে রাখব, বুঝে রাখব, তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুই ত সত্ত্ব, রজঃ, তমের নানা রকম ক্রিয়া দেখাবি। দেখা না, দেখি আর আনন্দ করি।

একটী কবিতায় পড়েছিলুম, 'একের পৃষ্ঠে শূন্য দি যত, শূন্যের মূল্য বাড়ে তত, একে ভুলি, শূন্যগুলি সারজ্ঞান করেছি।' বাস্তবিক আমাদের হয়েছে তাই। আমাকে নিয়েই আমার যত জ্ঞান, যত চেষ্টা, যত কর্ম্ম, যত ঘোরাঘুরি; কিন্তু

দুঃখের বিষয়, এই 'আমি' কে ভুল হয়ে গিয়েছে —এখন 'আমার' লইয়া ব্যস্ত। ভাবোচ্ছ্বাসের কথা বলিতেছি না, কাযের কথা বলিতেছি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 'আমার' কি আছে? তবু এই ভ্রান্তবুদ্ধি যায় না।

একবার আমি কোন লোকের ছাতা নিয়ে এসেছিলাম। সেই ছাতাটী তাকে ফিরিয়ে দিতে গেলাম। গিয়া খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া উঠিব বলিয়া উঠিয়াছি, একটু বাহিরে আসিয়া দেখি, ছাতাটী 'আমার' মনে করিয়া হাতে করিয়া আসিয়াছি। এইরূপ হওয়াতে হাসি আসিল। এই কথার আলোচনা করিতে করিতে ফের রাখিতে গেলাম—ফের উঠিয়া আবার ছাতা লইয়া আসিতে উদ্যত। অল্প খানিক সঙ্গে থাকাতে এত 'আমার' বুদ্ধি! কি ভয়ানক! ভাবিয়া দেখিলে সুখকে সুখ বলিয়া বোধ হইবে না। যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইবে। সুখ প্রলোভনকে বিভীষিকাময়, ভ্রান্তিময়, মায়াময় পিশাচিনী বোধ হইবে। কি ভয়ানক! ইহারি মধ্যে বাস! মোহ যাবে কিসে? ঘোরা-ঘুরি নিবৃত্তি হবে কিসে?

উপায় আছে।

উপায় আছে। যে সংসারের রহস্য বুঝিয়াছে, তাহাকে চিরকাল এই যন্ত্রণায় থাকিতে হইবে না। তাহার পক্ষে আশাবাণী আছে। ওই যে প্রাণের ভিতর—কেমন করে মায়ার পারে যাব, এই ইচ্ছা হয়েছে, ঐ হচ্চে প্রমাণ যে, পারে যেতে পারা যাবে। যে পরিমাণে এই ইচ্ছার, এই শুভ বাসনার বিকাশ, সেই পরিমাণে উহার উপলব্ধি।

সংসারের কপটতাটা আগে ছাড়্‌তে হবে। আমাদের জীবন বড় আইনকানুন সভ্যতা শিষ্টাচারে বেষ্টিত কিন্তু এই সভ্যতা শিষ্টতা, বাহিরে মধুর হাসি, সুখের রাশির ভিতর কি? ভেতরে জ্বলছে তুষানল, যে-গুলিকে নীচ প্রবৃত্তি বলে অথবা যাহাকে নীচ প্রকৃতি বলা যায়,—তারই রাজত্ব। কামনা যার আছে, সে নীচ, ছোট লোক, তা আর বোল্‌তে। মন, একবার ভরসা করে, ভেতরবার এক করে ফেল দেখি। বলুক লোকে পাগল, বলুক লোকে ভ্রান্ত, লোকের তোয়াক্কা কি? লোকে তোকে কি সাহায্য কত্তে পারে? তুই আপনি ভাল থাক্‌লেই জগৎ ভাল, সব ভাল।

সত্য কি, জান্‌লুম না, কেবল ঘুরে মলুম। সময় পেলুম না, সত্য কি জান্‌তে আর সব কাযের সময় পেলুম। হায় হায়, আপনার গালে আপনি চড়াতে ইচ্ছা করে যে। মন, এখনো বোঝ্‌, বিচারবান পুরুষদের সঙ্গ কর। একটু স্থির হয়ে ভাব্‌তে শেখ্‌—কর্ম্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে শেখ্‌।"*

* 'উদ্বোধন'-এর ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

# পুস্তক সমালোচনা

**হরিজন উন্নয়ন**—শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী, শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত ও শ্রীমতী অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, পি ৪০৪।৫ গড়িয়াহাটা রোড, কলিকাতা-৭০০০২৯, পৃঃ ১৪০, মূল্য ঃ ১৫'০০ টাকা।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'হরিজন উন্নয়ন কথা' বইখানি দিল্লীর ভাঙ্গর কলোনীর ভাঙ্গরদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখিত। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাদের যে রকমটি দেখেছিলেন তারই একটি বাস্তব চিত্র তাঁর সুন্দর লেখায় রূপায়িত হয়েছে। ১৯৮৭-তে এসে আজ আমরা সেই সমাজের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখছি না। তাঁর সুখমতিয়া, রামসুখ, রামধারীদের এখনও দেখতে পাই। সংস্কারের শেকড় এত গভীরে যে তাকে উঠিয়ে ফেলা এত বছরেও সম্ভব হয়নি—কোন ধর্মেই তা পারেনি।

যুগ যুগ ধরে মহাপুরুষরা মানুষকে ঘৃণা করা যে কত বড় অন্যায়, কত বড় ভুল, সেটা উপলব্ধি করেছেন এবং জনগণকে সে কথা বলেছেন। কিন্তু কতটুকু ফল হচ্ছে? খ্রীষ্ট, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ—এসব ধর্মে সমাজ বন্ধনে কিছুটা শিথিলতা আছে বলে অচ্ছুৎ অনাদৃতরা অনেকেই তা গ্রহণ করেছে তার দৃষ্টান্তও দিয়েছেন লেখিকা, কিন্তু ধর্মান্তরে ও সমাজের জটিলতা একেবারে যায়নি। সন্তকাওর, সুখমতিয়ারা তার দৃষ্টান্ত।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বড় বড় পরিকল্পনা হচ্ছে—বস্তুতঃ সেগুলো সরকারের উপর তলাতেই নড়াচড়া করে। নেতারা অজ্ঞ, অন্ধ নিচের তলার লোকেদের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এদের দেখিয়ে বিদেশ থেকে অর্থসংগ্রহ করছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অচ্ছুৎদের সামান্য প্রয়োজনও পূর্ণ হচ্ছে না।

লেখিকা রামকৃষ্ণমিশনের মহারাজদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে—কোন কাজই ছোট নয়, সব কাজই ৺ভগবানের কাজ মনে করে করতে হবে। বাদ-বিবাদে শুধু কাজ নষ্ট করে, শক্তি ক্ষয় হয়। অচ্ছুৎ বলে আজ যাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে না তারা সেখানে না গিয়ে নিজেরাই ঠাকুর তৈরি করে পুজো করুক। ৺ভগবান সর্বত্রই আছেন। একটি প্রদীপ থেকে যেমন দেয়ালীর হাজার প্রদীপ জ্বালান হয় তেমন যে দু-চারজন শিক্ষিত হয়েছে তারাই অন্যদের শিক্ষিত করবে। ছুৎ অচ্ছুৎ সব জাতির মধ্যে চিরকালই কিছু না কিছু রয়েছে তবু নিজ নিজ জীবিকা তারা ঠিক করে নিয়েছে এবং পাশাপাশি বাস করছে। ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরেও জীবিকা আছে যে জীবিকা সম্মানিত ও স্বাধীন। মোট কথা আত্মবিশ্বাস ও সৎচেষ্টা থাকা চাই। কত বড় বড় প্রতিষ্ঠান অতি সামান্য অবস্থা থেকে গড়ে উঠেছে নিজেদের সৎ চেষ্টায়। নানক জন্ম নিয়েছিলেন অচ্ছুৎ সমাজে কিন্তু তিনি আজ বিশ্বপূজ্য।

অচ্ছুৎ সুখমতিয়া নিজের চেষ্টায় শিক্ষিতা হয়ে ভদ্রসমাজের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। সেবিকা সুখমতিয়ার জাতবিচার কেউ করছে না কিন্তু তার সমাজ? সেখানে তাকে কিন্তু বিয়ে করতে হল অচ্ছুৎকেই। চন্দনসিংকে ভালবেসেও সন্তকাওরকে অবিবাহিতা থেকে যেতে হল। সমাজসংস্কারের শেকড় অনেক গভীরে।

জ্যোতির্ময়ীদেবীর এই বইখানি আশা করি সমাজের উঁচুতলার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের চেতনা জাগাবে।

—শ্রীমতী মুক্তি কর

**শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ**—ব্রহ্মচারী শিশির-কুমার। প্রকাশক: ডঃ পার্থদেব ঘোষ, কৃষ্ণ কুটির; বি—৬/১৪০, কল্যাণী-৭৪১২৩৫। পৃঃ ৫০+৫৭০, মূল্য ৫৫ টাকা।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সম্পদের মধ্যে 'শ্রীমদ্ভাগবত' অন্যতম। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আবার একাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ থেকে উনত্রিংশ অধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ (কথোপকথন) অনেকে এই গ্রন্থের 'সর্বস্ব' মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহের আশঙ্কায় উদ্ধব যখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যে-কথাবার্তা হয় সেটি এ-অংশের বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপদেশে প্রধানতঃ অনাসক্তি বা বৈরাগ্য এবং সমদর্শিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রেম এবং ভক্তিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। চতুর্দশ অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে তিনি বলেছেন:

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

('হে উদ্ধব, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, আমার প্রতি ভক্তি তদ্রূপ সমস্ত পাপকে বিনাশ করিয়া থাকে।')

আহার, নিদ্রা ইত্যাদি তো পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। মানুষ ও পশুতে পার্থক্য মানুষের ধর্মাচরণে। মানুষের সেই ধর্ম কি সে-বিষয়ে কৃষ্ণ উদ্ধবকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা এমন সার্বজনীন যে তা থেকে সমগ্র মানবজাতি শিক্ষা নিতে পারবে। 'শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ'—গ্রন্থের 'সূচনা'তে শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ যথার্থই লিখেছেন: 'আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সবই বহির্মুখী। অন্তরের ভাবরাশি আমাদের কাছে অজ্ঞেয় হইয়াই আছে এবং থাকিবে।' এই অন্তরের ভাবরাশি সম্বন্ধে এবং মনুষ্যজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে যাতে আমরা অবহিত হতে পারি এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাধকপ্রবর ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার বর্তমান মূল্যবান্ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন।

উদ্ধব যখন কৃষ্ণকে বললেন যে, কৃষ্ণবিহীন জীবনযাপন তাঁর পক্ষে অসহনীয় হবে, তখন কৃষ্ণ তাঁকে লোকালয় ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেন: 'স্বজন-বন্ধুদের স্নেহবন্ধন ও মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আমাতে চিত্ত সমাধানপূর্বক আমার স্মরণ-মননে রত থাকিয়া, নিরাশ্রয় নিরালম্ব হইয়া একাকী পৃথিবীপর্যটন করিও।' তখন উদ্ধব প্রশ্ন করলেন: 'এই দ্বন্দ্বময় জগতে কি করিয়া মনের সাম্যভাব রক্ষা করতঃ শান্তিতে থাকা যাইতে পারে? দুর্জনের প্রতিহিংসা শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়ন সহ্য করা কি করিয়া সম্ভব?…অথচ, আপনি বলিলেন সমদর্শী হইতে।' উদ্ধবের এই প্রশ্ন সর্বমানবের শাশ্বত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের কৃষ্ণ যে-উত্তর দিয়েছেন সেটিই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্তু এবং সে-উত্তর যদি আমরা যথাযথভাবে গ্রহণ করি তবে তা আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর হবে।

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। গীতাতেও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ও তাঁর উপদেশপ্রার্থী: 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' উদ্ধব যেমন, অর্জুনও তেমন, বিশ্বমানবের প্রতিনিধি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রতি মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রামের প্রতিরূপ। ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী গ্রন্থের প্রাক্-কথনে দুটি সংবাদের সুন্দর তুলনামূলক বিচার করেছেন: 'উদ্ধব-সংবাদ একটা সোনার পাহাড়—বিশাল, বিস্ময়কর, ঐশ্বর্য-মণ্ডিত। ভগবদ্গীতা মানস সরোবর, সীমার মধ্যে সৌন্দর্যাধার, মাধুর্যপুষ্টিত। গীতা শ্রীকৃষ্ণের

জীবন-মধ্যাহ্নের ওজস্বী উদাত্তবাণী। উদ্ধব-সংবাদ শ্রীকৃষ্ণের পরিণত পরিপক্ক জীবনের প্রফুল্ল প্রশান্ত প্রাণ-নিঙড়ানো শেষ কথা।'

আলোচ্য সুদর্শন ও সুমুদ্রিত গ্রন্থে বঙ্গাক্ষরে মূল শ্লোক, সটীক অন্বয় ও অনুবাদই শুধু দেওয়া নেই, প্রত্যেকটি শ্লোকের 'অনুধ্যান' বা বিশদ্ ব্যাখ্যাও দেওয়া আছে। ব্যাখ্যাতে ব্রহ্মচারীজীর প্রগাঢ় ভক্তি, সংবেদনশীল হৃদয় ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকাকার স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর ভাষায় বলতে পারি: 'এই ব্যাখ্যার মধ্যে ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের কৃতিত্ব ধরা পড়বে। এই ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি যে একাধারে সাধক ও সুপণ্ডিত তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।' এই একই 'স্বাক্ষর' সমুজ্জ্বল শ্রীশ্রীবাবা-ঠাকুরের সুলিখিত মুখবন্ধে, যেখানে তিনি প্রেমানন্দরসে ভগ্ন উদ্ধব-সংবাদে পর্যায়ক্রমে ধর্মসাধনার চতুর্বিধ স্তর ও অনুভূতির সম্যক্ পরিণতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরিশেষে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করি: 'এই সুমহান্ গ্রন্থ প্রকাশ করে ও প্রচার করে ব্রহ্মচারীজী সংসারতাপী মানুষের কাছে একভাবে যেমন কারুণ্য প্রকাশ করেছেন তেমন অন্যভাবে ইষ্টগুরুরও প্রীতি সাধন করেছেন।'

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

## প্রাপ্তি-স্বীকার

**আশ্চর্য্য ঝঙ্কার**: লেখিকা: শ্রীমতী গীতা হাজরা, সাহিত্য ভারতী, প্রকাশক: শ্রীরঞ্জন কুমার পাল, 'প্রভাত' কার্যালয়. ২'সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯, পৃ: ৬৪, মূল্য ৬'০০

**ছায়া তরু**: সংকলক, সম্পাদক ও প্রকাশক: মনকুমার সেন, আনন্দভবন, ১৮ আনন্দগড়, কলিকাতা ৭০০ ০১৬, পৃ: ৬০, মূল্য ১০'০০

**পতিত পাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমন্বয়-বার্তা**: প্রকাশক: শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য বিজয়কৃষ্ণ যোগাশ্রম, বৈদিক পাড়া, দণ্ডপাণিতলা, নবদ্বীপ (নদীয়া), পৃ: ৭৮, মূল্য ৩'০০

**আধুনিক প্রেক্ষিতে গীতাবাণী ও কৃত্য**: লেখক ও প্রকাশক: শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ১১এ, নৃত্যগোপাল চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০২, পৃ: ৫৪, মূল্য ৫'০০

**প্রসাধন কলা: রূপ চর্চা** (প্রাচীন ভারতবর্ষ): লেখক: ডক্টর সদ্‌গোপাল, প্রকাশক: শ্রীপ্রভাস চন্দ্র কর, ১৮২/২ গোপাল-লাল ঠাকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৫, পৃ: ৭৯, মূল্য ১২'০০

**তত্ত্বসার**: লেখক: রামচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক: অপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক: রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শশধর প্রকাশনী, ১৯এ, কেদার বসু লেন, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৫, মূল্য: কুড়ি টাকা।



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী-উৎসব

গত ১—৮ মার্চ, ১৯৮৭ আটদিন ব্যাপী **বেলুড় মঠে** বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী-উৎসব এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবার্ষিকী-উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ৪ মার্চ দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। ৭ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উপর বক্তব্য রাখেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ।

## নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রসমূহে উক্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে :

আগরতলা (৩য় পর্যায়), এলাহাবাদ (২য় পর্যায়), বাগেরহাট, বাঁকুড়া, চণ্ডিগড়, চিঙ্গেলপত্তু (২য় পর্যায়), গৌহাটি, কালাডি (২য় পর্যায়), কামারপুকুর, কনখল, করিমগঞ্জ (২য় পর্যায়), পোনামপেট, শিলচর, বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম, বারাণসী সেবাশ্রম, বিশাখাপত্তনম্ ও বৃন্দাবন।

গত ২৮ ফেব্রুআরি থেকে ৭ মার্চ, ১৯৮৭ **ঢাকা** রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫২তম জন্মতিথি-উৎসব, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী-উৎসব এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানসূচীর মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ৫ মার্চ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি-উৎসবের ১ম পর্যায়ের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী। ঐ দিন তিনি উক্ত উৎসবের একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করেন। এই কয়েক দিনে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বাংলাদেশস্থ ভারতের হাই কমিশনার শ্রী আই. এস. চাড্ডা, শ্রীলঙ্কার হাই কমিশনার শ্রীতিলক রত্ন এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

**পশ্চিম ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি** (ওয়াশিংটন, সিয়াটল্) গত ৩ জানুআরি, ১৯৮৭ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একশত বর্ষ পূর্তি-উৎসব এবং গত ৭ ও ৮ জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশত-বার্ষিকী-উৎসব পালন করেছে। বিশেষ পূজা, অখণ্ড জপ, বক্তৃতা ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত ইত্যাদি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

**সিঙ্গাপুর কেন্দ্র** গত ১৪ থেকে ২২ ফেব্রুআরি, ১৯৮৭ বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশতবার্ষিকী-উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায় পালন করেছে। মালাক্কা, কোয়ালালামপুর এবং সেরাম্বন প্রভৃতি স্থানেও উক্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে।

**মরিশাস্ কেন্দ্রেও** ভক্তিমূলক সঙ্গীত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর বক্তৃতা এবং মরিশাসের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সমাবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশত-বার্ষিকী-উৎসবের শেষ পর্যায় উদ্‌যাপন করেছে।

## উদ্বোধন

গত ৬ মার্চ, ১৯৮৭ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ **চিঙ্গেলপত্তু** (তামিলনাড়ু) কেন্দ্রের নবনির্মিত হলের উদ্বোধন করেন।

# আবির্ভাব-তিথি ও পূজাদির সূচী

## বাংলা ১৩৯৪ সাল, ইংরেজী ১৯৮৭-৮৮

### তিথি-কৃত্য

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীশঙ্করাচার্য | বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী | ১৯ বৈশাখ | রবিবার | ৩ মে | ১৯৮৭ |
| ২। | শ্রীবুদ্ধদেব | বৈশাখ পূর্ণিমা | ২৯ বৈশাখ | বুধবার | ১৩ মে | „ |
| ৩। | স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ | আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী | ৭ শ্রাবণ | বৃহস্পতিবার | ২৩ জুলাই | „ |
| ৪। | স্বামী নিরঞ্জনানন্দ | শ্রাবণ পূর্ণিমা | ২৪ শ্রাবণ | রবিবার | ৯ অগস্ট | „ |
| ৫। | শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী | শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী | ৩১ শ্রাবণ | রবিবার | ১৬ অগস্ট | „ |
| ৬। | স্বামী অদ্বৈতানন্দ | শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী | ৬ ভাদ্র | রবিবার | ২৩ অগস্ট | „ |
| ৭। | স্বামী অভেদানন্দ | ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী | ৩০ ভাদ্র | বুধবার | ১৬ সেপ্টেম্বর | „ |
| ৮। | স্বামী অখণ্ডানন্দ | ভাদ্র অমাবস্যা | ৬ আশ্বিন | বুধবার | ২৩ সেপ্টেম্বর | „ |
| ৯। | স্বামী সুবোধানন্দ | কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী | ১৬ কার্তিক | সোমবার | ২ নভেম্বর | „ |
| ১০। | স্বামী বিজ্ঞানানন্দ | কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী | ১৮ কার্তিক | বুধবার | ৪ নভেম্বর | „ |
| ১১। | স্বামী প্রেমানন্দ | অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী | ১৩ অগ্রহায়ণ | রবিবার | ২৯ নভেম্বর | „ |
| ১২। | শ্রীশ্রীমা | অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী | ২৬ অগ্রহায়ণ | শনিবার | ১২ ডিসেম্বর | „ |
| ১৩। | স্বামী শিবানন্দ | অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী | ১ পৌষ | বৃহস্পতিবার | ১৭ ডিসেম্বর | „ |
| ১৪। | শ্রীযীশুখৃষ্ট | — | ৮ পৌষ | বৃহস্পতিবার | ২৪ ডিসেম্বর | „ |
| ১৫। | স্বামী সারদানন্দ | পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী | ৯ পৌষ | শুক্রবার | ২৫ ডিসেম্বর | „ |
| ১৬। | স্বামী তুরীয়ানন্দ | পৌষ শুক্লা চতুর্দশী | ১৭ পৌষ | শনিবার | ২ জানুআরি | ১৯৮৮ |
| ১৭। | শ্রীশ্রীস্বামীজী | পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী | ২৬ পৌষ | সোমবার | ১১ জানুআরি | „ |
| ১৮। | স্বামী ব্রহ্মানন্দ | মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া | ৬ মাঘ | বুধবার | ২০ জানুআরি | „ |
| ১৯। | স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ | মাঘ শুক্লা চতুর্থী | ৮ মাঘ | শুক্রবার | ২২ জানুআরি | „ |
| ২০। | স্বামী অদ্ভুতানন্দ | মাঘী পূর্ণিমা | ১৯ মাঘ | মঙ্গলবার | ২ ফেব্রুআরি | „ |
| ২১। | শ্রীশ্রীঠাকুর | ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া | ৬ ফাল্গুন | শুক্রবার | ১৯ ফেব্রুআরি | „ |
| | (শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব) | | ৮ ফাল্গুন | রবিবার | ২১ ফেব্রুআরি | „ |
| ২২। | শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু | দোল পূর্ণিমা | ১৯ ফাল্গুন | বৃহস্পতিবার | ৩ মার্চ | „ |
| ২৩। | স্বামী যোগানন্দ | ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী | ২৩ ফাল্গুন | সোমবার | ৭ মার্চ | „ |
| ২৪। | শ্রীরামচন্দ্র | রাম নবমী | ১২ চৈত্র | শনিবার | ২৬ মার্চ | „ |

### পূজা-কৃত্য

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা | বৈশাখ অমাবস্যা | ১১ জ্যৈষ্ঠ | মঙ্গলবার | ২৬ মে | ১৯৮৭ |
| ২। | স্নানযাত্রা | জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা | ২৭ জ্যৈষ্ঠ | বৃহস্পতিবার | ১১ জুন | „ |
| ৩। | শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা | আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী | ১২ আশ্বিন | মঙ্গলবার | ২৯ সেপ্টেম্বর | „ |
| ৪। | শ্রীশ্রীকালীপূজা | দীপান্বিতা অমাবস্যা | ৪ কার্তিক | বুধবার | ২১ অক্টোবর | „ |
| ৫। | শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা | মাঘ শুক্লা পঞ্চমী | ৯ মাঘ | শনিবার | ২৩ জানুআরি | ১৯৮৮ |
| ৬। | শ্রীশ্রীশিবরাত্রি | মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী | ৩ ফাল্গুন | মঙ্গলবার | ১৬ ফেব্রুআরি | „ |

## ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১৯ মার্চ, ১৯৮৭ **বিশাখাপত্তনম্‌** কেন্দ্রের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিট্যুট্‌ অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস'কে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের বেসরকারি স্নাতকোত্তর পাঠক্রম কলেজসমূহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনাঃ** সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত; স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

## উৎসব

গত ১২—১৫ মার্চ, ১৯৮৭ **বিবেকানন্দ পাঠচক্র** (রামকৃষ্ণ আশ্রম, পাণ্ডু, গৌহাটি) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশতবর্ষ ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করে। এই সঙ্গে উত্তরপূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, পাঠ, প্রভাত ফেরী, যুব-সমাবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসি-বৃন্দ এই উৎসবে যোগদান করেন।

**তেলোয়া** রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের (তেলোভেলোর চটি, হুগলী) ব্যবস্থাপনায় গত ১৫—১৭ মার্চ, '৮৭ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশত-বার্ষিকী-উৎসব ও ঐ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব বিভিন্ন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

গত ২০—২২ মার্চ, ১৯৮৭ **বিধাননগর** (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশতবার্ষিকী-উৎসব এবং সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের প্রতিদিনই বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১-২ মার্চ, '৮৭ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম **বঙ্কিমনগর** (নদীয়া) স্থানীয় গ্রামবাসীর সক্রিয় সহযোগিতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫২তম আবির্ভাব তিথি-উৎসব বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে।

গত ২০ মার্চ, '৮৭ দোলযাত্রার দিন **ভাঙড়** (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘের নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সর্বধর্ম-সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন।

গত ২৪ মার্চ, ১৯৮৭ আসামের **গোয়াল-পাড়া** সহরে নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালন করে। এ-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সুমেধানন্দ।

গত ২২ ফেব্রুআরি থেকে ১২ মার্চ, ১৯৮৭ **রাউরকেলা** শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, রোগীদের মধ্যে ফলমিষ্টি বিতরণ, ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারার উপর প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, নাট্যানুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠান-সূচীর প্রধান অঙ্গ। উৎসবের শেষের দু-দিন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

## পরলোকে

গত ১১ মার্চ, ১৯৮৭ শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজিকা **সুচিন্তাপ্রাণা** (গৌরী) রাত্রি ৫-৪০ মিঃ ৮৫ বছর বয়সে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে দেহরক্ষা করেন। গত দশ বছরেরও বেশি তিনি কাশীর সারদা কুটীরে অবসর জীবন যাপন করছিলেন।

সুচিন্তাপ্রাণা ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ মহারাজের নির্দেশে তিনি মাদ্রাজে নব প্রতিষ্ঠিত শ্রীসারদা মাতৃমন্দিরে যোগদান করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজ) নিকট ব্রহ্মচর্য দীক্ষা এবং ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণাজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মাদ্রাজ শ্রীসারদা মাতৃমন্দির ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্গালোর শ্রীসারদা মাতৃমন্দির, পুরী বিধবা আশ্রম, কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে কর্মীরূপে ছিলেন। ১৯৪০-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পুরী বিধবা আশ্রমের প্রধান পরিচালিকা ছিলেন। নার্সিং ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সকলের প্রতি সহানুভূতির জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস** গত ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করেন। সুরেশচন্দ্রের উদ্যোগে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জীবন-চরিত, উপদেশ ও স্মৃতিকথা সম্বলিত যে-কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত 'সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ,' স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ-কৃত 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ: জীবন ও বাণী' (হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদ সহ), "প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' এবং 'নব নব রূপে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ'। তিনি দীর্ঘকাল নানাভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীবৃন্দাবন নন্দী মহাশয়ের সহধর্মিণী **শ্রীমতী আশারাণী নন্দী** গত ২৪ ফেব্রুআরি, ১৯৮৭ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬১ বছর। শ্রীমতী নন্দী বহু ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উল্লেখ্য যে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পরিচালিত পাক্ষিক পাঠচক্র তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদেরই বাড়িতে প্রথম আরম্ভ হয়।

তাঁদের বিদেহী আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণপদে চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

- অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।
- পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

# উদ্বোধন

## পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা ● অগ্রহায়ণ ১৩০৭ ( পৃষ্ঠা ৪৮২—৫২৭ )

অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জল শুদ্ধির বড়ই ধুম। এখন ঐ যে ফিল্‌টার, ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিল্‌টার জলকে ছেঁকে দেয় মাত্র, কিন্তু রোগের বীজ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, ওলাউঠো, প্লেগের বীজ, তা যেমন তেমনিই থাকে; অধিকন্তু ফিল্‌টারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ান। কলকেতায় যখন প্রথম ফিল্‌টার করা জল হল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠো হয় নাই, তার পর যে কে সেই, অর্থাৎ সে ফিল্‌টার মশাই এখন স্বয়ং ওলাউঠো বৃদ্ধির আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিল্‌টারের মধ্যে দিশি তেকাঠার উপর ঐ যে তিন কল্‌সির ফিল্‌টার। উনিই উত্তম; তবে দু তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদ্‌লে দিতে হবে বা পুড়িয়ে নিতে হবে। আর ঐ যে একটু ফট্‌কিরি দেওয়া গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফট্‌কিরির গুঁড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পূরে একটু ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতি ফিল্‌টার মিল্‌টারের ঘাড়ে চড়ে, কলের জলের মাথায় ঝাঁটা মারে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পারলে নির্ভয় হয় বটে। ফট্‌কিরি থিতোন জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর, ফিল্‌টার মিল্‌টার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই বাষ্পকে জল করে, তারপর আর একটা যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু তার মধ্যে পূরে দেয়, যে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায়। সে জল অতি বিশুদ্ধ; ঘরে ঘরে এখন দেখ্‌ছি তাই। যার আমাদের দেশে দুপয়সা আছে, সে ছেলে পিলে গুলোকে নিত্যি কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলে পিলে গুলো নড়ে-ভোলা পেট-মোটা আসল জানোয়ার হবে না ত কি? এত বড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাই মণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান্ দেশে বাস, দিন রাত কস্‌রত!! আর আমাদের অগ্নি-কুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর ঘরে নড়ে বসতে চাইনি, আর আহার লুচি কচুরি মেঠাই—ঘিয়ে ভাজা, তেলেভাজা!! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশক্রোশ হেঁটে দিত; দুকুড়ি কই মাছ কাঁটাশুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলে গুলো কলকেতায় আসে, চস্‌মা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে; কলকত্তাই হওয়ার এই ফল!! আর সর্ব্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ঔষুধের জোরে সব কর্ত্তে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে, ত অমনি একটু ঔষুধ দাও; পোড়া বদ্দিও বলেনা যে, দূর কর ঔষুধ, যা, দুক্রোশ হেঁটে আসগে যা। নানান্ দেশ দেখ্‌ছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখ্‌ছি। তবে আমাদের ভাত, ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মোচার ঘণ্টোর জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাক্‌তে তোমরা যে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝছো না এই আপ্‌সোস। খাবার নকল কি ইংরেজের কর্ত্তে হবে—সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙ্গালী খাওয়া উপাদেয়, পুষ্টিকর ও সস্তা; খাওয়া পূর্ব্ব-বাঙ্গলায়, ওদের নকল কর যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ; শেষে কলাইয়ের দাল আর মাছের টক্ মাত্র—আধা-সাঁওতালী বীরভূম বাঁকুড়োয়

শ্রাবণ, ১৩১৪ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃঃ ৩১৭)

দাঁড়াবে !! তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্ব্বনেশে ময়দার তালে হাতে মাটি দেওয়া ময়রার দোকান রূপ সর্ব্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছ, ওর মোহিনীতে বীরভূম্, বাঁকুড়ো, ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও চাঁইমাছ, কচ্ছপাদি, জলে ছেড়ে দিয়ে, সইভ্য হচ্ছে !!! নিজেরা ত উচ্ছন্ন গেছ, আবার দেশশুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড সভ্য, সহুরে লোক। ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জ্জনা গুলো খেয়ে উদরাময় হয়ে মর্ মর্ হবে, তবু বলবে না যে এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে—নোনা লেগেছে !! কোনও রকম করে সহুরে হবে !! ( ক্রমশঃ— )

# আড্ডা।

( পূর্ব্ব সংখ্যায় ৩০০ পৃষ্ঠার পর। )

এমন পাড়াই নাই, যে পাড়ায় কোন না কোন রকমের আড্ডা নাই। এক প্রকার ধরিতে গেলে, আড্ডাই আমাদিগের দেশের জাতীয়ত্বের এবং নিজের নিজের মনুষ্যত্বের হ্রাস বৃদ্ধির, মঙ্গল অমঙ্গলের, উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ। হেলায় বৃথা সময় কাটাইয়া মনুষ্যত্বের হানি করিতে আড্ডা যেমন মজবুত, এমন আর কিছুই নহে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, ধনী নির্ধনী, পণ্ডিত মূর্খ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরই একটা না একটা আড্ডা আছে। আড্ডা মানে কোনও নিয়মিত প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, বা মাসিক সভা, ক্লব, বা কোনও প্রকার মিটিং বলিতেছি না। আড্ডা মানে—গল্পের স্থান; আড্ডা মানে অযথা বিরামের স্থান, অযথা খেলার স্থান, অযথা ফুর্ত্তির বা রগড়ের স্থান, যে স্থানে যাইবার জন্য অনেক সময়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়; যে স্থানে যাইবার, বসিবার, কথা কহিবার, বা কোনও প্রকারের, কোন নিয়মাদি বিশেষ কিছু নাই; যে স্থানে প্রত্যহই বা সর্ব্বদাই যাইয়া থাকি; যে স্থানে কয়েকটি অতি ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া, প্রায় আর কেহ আসেন না, যদি বা আসেন, ত অতি অল্পক্ষণের জন্যই। এই সকল স্থানে নানাপ্রকার চর্চ্চা হইয়া থাকে। আড্ডায় যদি একটা কথা উঠিল, তাহা অযথা বা মিথ্যাই হউক, আর যাহাই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সে কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া যাইল। আড্ডায় যদি কেহ একটা 'মতলব' করিলেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সকলে তাহাতে হাঁ দিলেন। আড্ডার কথা বেদবাক্য; আড্ডা হইতে যে কথা শুনিয়া আসিব, সে কথা যদি প্রকৃতই মিথ্যা হয় এবং তাহার বিপক্ষে যদি দশ হাজার সৎলোক সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবুও আড্ডার কথা কোন মতে অবিশ্বাস করিতেছি না।—আড্ডার হাওয়া সাধারণতঃ প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে, তবে দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে এই হাওয়া কিছু কম বা বেশী বহে মাত্র।

আড্ডা নানা প্রকারের আছে। প্রধানতঃ আড্ডাগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) মজলিসী, আজগুবী, বা খোষ গল্পের আড্ডা। আফিম আশী বৃদ্ধ বা মোসাহেব মহাশয়গণই সচরাচর এই সকল আড্ডার প্রধান সভ্য।

(২) খেলার আড্ডা। সতরঞ্চ, পাশা, তাশ প্রভৃতি এই সকল আড্ডায় আদরের দ্রব্য। যুবা ও বৃদ্ধ উভয় দলই এই আড্ডায় সমান আকৃষ্ট হন।

(৩) গান বাজনার আড্ডা। এখানে যুবা বা বৃদ্ধ সকলই প্রায় আনন্দ পাইয়া থাকেন। আজকাল কিন্তু যুবক দলের ভিতরেই এই সকল আড্ডা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, ভাল ভাল কন্সার্ট-পার্টী, থিয়েটার পার্টী, যাত্রার দল প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিতেছি না; কেন না, তথায় অনেক বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। সে সকল—রেগুলার মীটিং, ক্লব বা এসোসিয়েশন্, (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা নিয়মিত সভা) নামে পরিগণিত হইতে পারে।

(৪) স্ফূর্ত্তির আড্ডা। অল্প স্বল্প পাঁচ রকম ইয়ারকী, পরচর্চ্চা, ঠাট্টা, তামাসা, গুড়ুক সেবন, গল্প প্রভৃতি, হরেক রকমে, এই সকল আড্ডায় সময় অতিবাহিত হয়। ইহাতে যুবার ভাগই বেশী।

(৫) নেশার আড্ডা। কোন কোন ভদ্র এবং শিক্ষিত লোককেও দেখিতে পাওয়া যায়—গুলি গাঁজা বা চরশ প্রভৃতি নীচ নেশায় রত। তাঁহারা গোপনে গোপনে ঐ সকল আড্ডায় যাইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসেন; মনে করেন, যেন কেহই টের পাইল না।

(৬) মিশ্রিত আড্ডা। অর্থাৎ, এ সকল আড্ডায় পূর্ব্বোক্ত সকল রকমেরই রস অল্প বিস্তর আছে।

এ সকল ছাড়া আরও অনেক রকমের ভাল মন্দ আড্ডা আছে; তাহাদিগের উল্লেখ অনাবশ্যক, অথবা অযোগ্য।

এই ত গেল পুরুষদিগের আড্ডা। মেয়েদেরও আড্ডা আছে। গঙ্গার ঘাটে ত এক প্রধান আড্ডা; গঙ্গা বা নদী যদি দূর হয়, ত নিদেন দিঘী বা পুষ্করিণী। সহর হইলে আড্ডা দিবার সময় একবার—প্রাতঃকাল; পল্লীগ্রাম হইলে, দুই বেলা—দুপুর বেলা স্নানের সময়ে, আর সন্ধ্যাকালে জল আনিতে যাইবার সময়। সহরে, পুরুষগণ আফিসে বাহির হইয়া যাইলে পর, আর একটী মস্ত আড্ডা দিবার সময়; মফঃস্বলে ত, পুরুষগণ নিদ্রা যাইলেও, একবার পাড়ায় বাহির হইয়া দুইটা কথা কহিয়া আসা যায়। যাহা হউক অনেক কারণে, স্ত্রীলোকদিগের আড্ডা তত ধর্ত্তব্য নয়। এমন অনেক সম্ভ্রান্তা স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা আজও সূর্য্যদেবের দর্শন পর্য্যন্ত কদাচিৎ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ।

পুরুষদিগের আড্ডাসকল হইতে আমরা যথেষ্ট আশা করিতে পারি। এই সকল আড্ডাও দেশের অনেক উপকারে আসিতে পারে। কোনও নূতন বিষয় প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, আড্ডায় যতশীঘ্র ও সহজে প্রবর্ত্তিত হয়, এত আর কোথাও হয় কি না সন্দেহ। কৌশল ক্রমে বা প্রকারান্তরে তথায় যে কোন ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহাই তথাকার সকলের ভিতর অনতিবিলম্বে চলিয়া যায়। অন্যান্য চর্চ্চার সহিত অতি ধীরে ধীরে, অতি অল্প অল্প করিয়া, খেলা ধূলার ছলে, দেশের যথা সম্ভব হিত চর্চ্চা, পাঁচজনের মঙ্গল কামনা, সকলকার প্রতি শুভেচ্ছা, অনায়াসেই আড্ডায় প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। ইহা বৃদ্ধি পাইলেই ক্রমশঃ অনেকের ভিতর সদ্বৃত্তি এবং সদ্গুণের বিকাশ হইবে। বিকাশ হইলে নিজের মঙ্গল, পাড়ার মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, সমগ্র জগতের মঙ্গল হইবে, ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, মাতৃভূমির মুখ উজ্জল হইবে, এবং নিজের মনুষ্যজীবন ধন্য হইবে।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃঃ ৩১১)

আড্ডা গুলিতে একটী সামান্য উপায় অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারেন। সকলেই জানেন, ভিক্ষাদানে হৃদয় পবিত্র হয় ও সদ্বৃত্তির উদয় হয়। আমাদের দেশে আজও ভিক্ষাদান প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই; হাজার গরীব হউন, ভারতে এমন গৃহস্থ খুব কমই আছেন, যিনি, শতকরা নিদেন একজন ভিখারীকেও একমুষ্টি তণ্ডুল প্রদান না করেন। ভারতে এমন খুব কমই পরিবার আছেন, যে পরিবারের মধ্য হইতে কেহ না কেহ, রমণীই হউন বা পুরুষ হউন, বার মাসে তের পার্ব্বণের মধ্যে কোনও না কোন পার্ব্বণে, নিদেন এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করেন। তদ্রূপ, যদি আমরা সকলেই কোন প্রকারে, কষ্টে শ্রেষ্টে, নিদেন এক আধ পয়সা করিয়াও ভিক্ষা স্বরূপ আড্ডাতে জমাইতে পারি, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। ভিক্ষা প্রদান করিলে হৃদয় অতি পবিত্র হয়; এবং সেই হৃদয়ে সদিচ্ছা স্বতঃই ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে; মন প্রফুল্ল হইতে থাকে, মুখশ্রী বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং তাঁহাকে দেখিলে সকলে শান্তি লাভ করেন। সাধুগণ ভিক্ষালব্ধ অন্নকে এত পবিত্র মনে করেন কেন? তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, সদিচ্ছাবান্ পুরুষ ব্যতীত ভিক্ষা প্রদান করিতে কেহ সক্ষম হন না। আমরা সাধারণতঃ অন্ন আহার করিতে করিতে শরীরের কোন স্থানে অন্ন একটী হঠাৎ পড়িয়া গেলে, সেই স্থানটী অপবিত্র জ্ঞানে ধৌত করি; সাধুগণ কিন্তু, গাত্রস্থিত বহির্ব্বাসের একাংশে পাঁচ সাত বাটী হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনেন—গাত্রও ধৌত করেন না, সমগ্র বহির্ব্বাসও ধৌত করেন না, কেবল মাত্র বহির্ব্বাসের সেই অংশটুকু জলে পরিষ্কার করিয়া লয়েন। হয়ত কোন সাধু সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন আহার করিয়া সেই হস্ত মস্তকে মুছিয়া ফেলিলেন। কেন? অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও এক কারণ যে সেই অন্নের ভিতর 'শুভ ইচ্ছা' যেন নারায়ণ স্বরূপে বিরাজমান, সেইজন্য অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সেই অন্নপিষ্ট হস্ত মস্তকে স্পর্শ করান। শুধু যে, ভিক্ষা নিজে পবিত্র; এবং যিনি ভিক্ষা দেন, তিনিই যে কেবল পবিত্র তাহাই নহে; যাঁহাকে ভিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহাকে ত নারায়ণ স্বরূপে জ্ঞান করিতেই হয়, তাহা ছাড়া যেখানে ভিক্ষা দেওয়া হয় সে স্থান পর্য্যন্তও পবিত্র হয়। সেই জন্যই, অন্নসত্র, সদাব্রত, প্রভৃতি স্থান এত দেবালয়তুল্য পবিত্র। আমরাও কেন না আমাদিগের আড্ডাগুলিতে অতি যৎসামান্যও কিছু ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিয়া সে গুলিকে পবিত্র করি, এবং নিজেরাও ধন্য হুই?

অবশ্য, সেই সঞ্চিত ভিক্ষার সৎ ও সংযত ব্যবহার আবশ্যক। প্রধানতঃ, দুইটি উপায়ে ইহা সম্পন্নিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, নিজের পাড়ার আপদ বিপদে বা কোনও প্রকার আবশ্যকে সাহায্য করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, তাহার মধ্য হইতে যৎ কিঞ্চিৎ, দেশের কোনও সাধারণ বড় জাতীয় সভাতে দিতে পারি। এই দুইটী আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রথমটীর পরিণাম একতা; দ্বিতীয়টির—জাতীয়তা। উভয় বৃত্তেরই একই কেন্দ্র; প্রভেদ কেবল একটী ক্ষুদ্রতর, অপরটী বৃহত্তর। উভয়েরই সমান উদ্দেশ্য—শ্রীবৃদ্ধি; প্রথমটীর—পাড়ার, দ্বিতীয়টীর—সমগ্র দেশের। প্রথমটী যেমন—সোপান; দ্বিতীয়টী—ছাদ। সোপান দ্বারা ছাদে উঠুন; আপনার রূপ দেখিয়া, গৌরব দেখিয়া, ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, আপনার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, আপনার শোভা দেখিয়া, জগৎ মুগ্ধ হউন, চন্দ্র তারকা আপনার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করুন। 'আমাদিগের মাতৃভূমি রত্নগর্ভা' নাম সার্থক হউক।

( ৮৬তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ৩২০ )

আড্ডার নাম শুনিলেই যেন সাধারণতঃ লোকের মনে একটা ঘৃণাসূচক ভাব আসে। সে ভাব যেন সকলকার মন হইতে দূরীকৃত হয়। আড্ডা সকল যেন আমাদিগের দেশের নেতৃমণ্ডলি-স্বরূপে পরিণত হয়, যেন পাড়ার আদর্শ-স্থান বলিয়া গণ্য হয়—এই একান্ত প্রার্থনা। যাবতীয় আড্ডাগুলি যদি সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আর দেশের কোনও স্থানে আপদ্ বিপদের ভয় থাকে না। যদি কোনও পাড়ায় কাহারও কোনও আপদ্ বিপদের সম্ভব হয়, ত তৎক্ষণাৎ স্থানীয় আড্ডায় খবর দিলেই যেন তিনি নির্ভয় প্রাপ্ত হন। আড্ডা যেন, দীন দরিদ্র, অনাথ-অনাথাগণের আশ্রয় হয়; আড্ডা যেন বিপন্নগণের একমাত্র শরণ-স্থল হয়; যেন দুষ্টের পরিবর্ত্তন ও শিষ্টের আদর-স্থান হয়; ধনী, নির্ধনী, গুণী ও নির্গুণ, মহৎ ও ক্ষুদ্র, বালক বা বৃদ্ধ, সকলকারই যেন প্রিয় কুটীর হয়। আড্ডা যেন পল্লীর শান্তিনিকেতন হয়। আড্ডা যেন যাবতীয় লোককে একতাবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারেন। দেশের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে পারেন এবং ভারতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়া স্বজাতির জীবন রক্ষা করিতে পারেন। নিজ মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন।

# আসামের কথা।

( বাবু প্রবোধচন্দ্র দে লিখিত। পৃঃ ৫৮৮—৫৯২।—বর্ত্তমান সম্পাদক )

"নিজে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি কর ও যতদূর পার, অপরকে করাও,"—ইহাই মনুষ্যত্ব। আর যা কিছু কর, সমুদ্রের ফেনা মাত্র, তবে যা না ক'রলে স্থির থাকতে পার না, তা ক'রে সেরে ফেলাই ভাল।

# মায়া।

( ৩০৮ পৃষ্ঠার পর )

অমঙ্গল দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা নহে। এই সংসারে এমন একটী বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গল বা সম্পূর্ণ অমঙ্গল বলিয়া অভিধেয় হইতে পারে। একই ঘটনা, যাহা অদ্য শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কল্য অশুভ বোধ হইতে পারে। একই বস্তু, যাহা একজনকে অসুখী করিতেছে, তাহাই আবার অপরে সুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে, তাহা অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির উত্তম ভক্ষ্যান্নও রন্ধন করিতে পারে। যে স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা দুঃখবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, সুখবোধও তাহারই দ্বারা অন্তরে নীত হয়। অমঙ্গল নিবারণ করিতে হইলে, মঙ্গল নিবারণই একমাত্র উপায়; উপায়ান্তর আর নাই; ইহা নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ করিতে হইলে, জীবনও বারণ করিতে হইবে। মৃত্যুহীন জীবন ও অসুখহীন সুখ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন উভয়ের কোনটীই সত্য নহে। কারণ উভয়ই একই বস্তুর বিকাশ, গত কল্য যাহা শুভদায়ক মনে করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা করি না। যখন আমার বিগত জীবন পর্য্যালোচনা করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শ সকল বিলোকন করি, তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হয়। এক সময়ে তেজঃশালী অশ্বযুগল চালনা করাই আমার আদর্শ ছিল। এখন এরূপ ভাবনা হয় না। শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, একবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারিলে আমি সম্পূর্ণ সুখী হই। অপর সময়ে মনে হইত, স্ত্রীপুত্রপরিবৃত ও প্রচুর অর্থসম্পন্ন হইলে সম্পূর্ণ সুখী হইব। এখন এ সকল বালোচিত বুদ্ধিহীনতা

( জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃঃ ৩২১ )

জানিয়া হাস্য করি। বেদান্ত বলেন, যে সকল আদর্শ আমাদিগের দৈহিক ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে ভয় প্রদর্শন করে, সময়ে তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করিব। সকলেই স্ব স্ব দেহ রক্ষণ করিতে ব্যগ্র, কেহই ইহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই দেহ যথেচ্ছ কাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব, আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু সময়ে এ বিষয়ও স্মরণ করিয়া হাস্য করিব। অতএব, যদি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সৎও নয়, অসৎও নয়, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, অসুখও নয়, সুখও নয়, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, এইরূপ বিষমবিরুদ্ধভাবাপন্ন হইল, তবে বেদান্তের আবশ্যকতা কি ? অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মমত সকলেরই বা আবশ্যকতা কি ? বিশেষতঃ, শুভকর্ম্মাদি করিবারই বা প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, কারণ লোকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিবে, যদি শুভকর্ম্ম সম্পাদনে যত্নবান্ হইলে, একই অমঙ্গল বর্ত্তমান থাকে এবং সুখোৎপাদনে যত্নবান্ হইলে, পর্ব্বত সদৃশ অসুখরাশি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ সকলের আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তরে বলা যায়—প্রথমতঃ দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে, কারণ স্বয়ং সুখী হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব জীবনে শীঘ্র বা বিলম্বে হউক ইহার যথার্থতা বুঝিয়া থাকি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকে কিছু সত্বরে, মলিনবুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারেন। মলিনবুদ্ধি লোক উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প যন্ত্রণা পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহা না হইলেও, যদিও আমরা জানি, এ জগৎ কেবল সুখপূর্ণ হইবে, দুঃখ থাকিবে না, এরূপ সময় কখনই আসিবে না, তথাপি আমাদিগকে এই কার্য্যই করিতে হইবে। যদি দুঃখ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তথাপিও আমরা সে সময়ে আমাদের কার্য্য করিব। এই উভয় শক্তি জগৎ জীবন্ত রাখিবে, যতদিন না আমরা স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইব এবং এই মৃৎ-পুত্তলিকা নির্ম্মাণ পরিত্যাগ করিব। সত্যই আমরা চিরকাল মৃৎপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিতেছি। আমাদের এ শিক্ষা লাভ করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল যাইবে। বেদান্ত বলিতেছেন—অনন্তই সান্ত হইয়াছেন। জর্ম্মনদেশে, এই ভিত্তির উপর দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ চেষ্টা এখনও ইংলণ্ডে হইতেছে। কিন্তু এই সকল দার্শনিকদিগের মত বিশ্লেষণ করিলে এই পাওয়া যায় যে, অনন্তস্বরূপ আপনাকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে অনন্ত যথাকালে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব, নিরপেক্ষাবস্থা বিকশিতাবস্থা অপেক্ষা নিম্নতর, কারণ বিকশিতাবস্থায় নিরপেক্ষ-স্বরূপ আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। যতকাল অনন্তস্বরূপ আপনাকে সম্পূর্ণ বহিঃনিক্ষেপ করিতে না পারিতেছেন, আমাদিগকে ততকাল এই অভিব্যক্তির উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে হইবে। ইহা অতি শ্রুতিমধুর এবং অনন্ত, বিকাশ, ব্যক্ত প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সান্ত কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, এক কিরূপে দুই কোটী হইতে পারে, এ সিদ্ধান্তের ন্যায়ানুগত মূলভিত্তি কি, তাহা দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়া এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এ স্থলে সকলই সীমাবস্থিত থাকিবেই। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে, তাহাকেই স্বতঃই সীমাবৃত হইতে হইবে, অতএব সসীমের অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত মিথ্যা। ইহা হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, বেদান্ত বলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা আপনাকে সান্তস্বরূপে

ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এরূপ সময় আসিবে, যখন এই উদ্যোগ অসম্ভব বুঝিয়া ইহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই পশ্চাৎপদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম্মের আরম্ভ। বৈরাগ্যই ধর্ম্মের সূচনা। আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য বিষয়ে কথা কহা অত্যন্ত কঠিন। আমেরিকাতে আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আগমন-পূর্ব্বক বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ইংলণ্ডীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ এইরূপই হয়ত বলিবেন। কিন্তু বৈরাগ্য ও ত্যাগ এ জীবনের কেবল একমাত্র সত্য বস্তু। প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি উপায়ান্তর প্রাপ্ত হইতে পার। অনন্তর কালসমাগমে অন্তরাত্মা জাগরিত হন, এই দীর্ঘ বিষাদময় স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইয়া উঠেন; শিশু খেলা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার জননীর নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হয়। ইহা বুঝিতে পারে, "কামনার উপভোগে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কেবল বর্দ্ধিত হইতে থাকে।" "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন সাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" এইরূপ কি ইন্দ্রিয়বিলাস, কি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাজনিত আনন্দ, কি মানবাত্মা উপভোগ্য সর্ব্ববিধ সুখ, সমস্তই মিথ্যা, সকলই মায়াধীন। সকলই পাশবদ্ধ, আমরা ইহা অতিক্রম করিতে পারি না। ইহার মধ্য দিয়া অনন্ত কাল ধাবিত হইতে পারি, কিন্তু শেষ পাইব না; এবং যখনই সুখকণা পাইবার জন্য চেষ্টা করিব, দুঃখরাশি আমাদের পৃষ্ঠদেশ পীড়িত করিবে। ইহা কি ভয়ানক অবস্থা! যখন আমি ইহা ভাবিতে চেষ্টা করি, আমার নিঃসংশয় অনুভূতি হয়, এই মায়াবাদ, সকলই মায়া—এই বাক্যই ইহার কেবল মাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা। এ সংসারে কি দুঃখরাশিই বর্ত্তমান রহিয়াছে! যদ্যপি আপনারা বিবিধ জাতিদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, একজাতি তাহার দোষভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপরে স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যদ্যপি ইহাকে ক্রমশঃ স্বল্প করিয়া একাংশে নিবদ্ধ করা যায়, অপরাংশে রাশি রাশি অশুভ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার এইরূপই গতি। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কথঞ্চিৎ সতীত্বধর্ম্ম উৎপাদনার্থ, তাঁহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতীকে বাল্যবিবাহ দ্বারা অধোগামী করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না এই যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুজাতীকে সতীত্বধর্ম্মে ভূষিত করিয়াছে। তুমি কি ইচ্ছা কর? যদ্যপি জাতীকে সতীত্বধর্ম্মে সমধিক ভূষিত করিতে চাও, তাহা হইলে এই ভয়ানক বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রী পুরুষকে শরীর সম্বন্ধে অধোগামী করিতে হইবে। অপরদিকে তুমিও কি নিজপক্ষে বিপদশূন্য? কখনই না। কারণ সতীত্বই জাতীয় জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে দেখ নাই যে, জাতীয় মৃত্যুচিহ্ন অসতীত্বের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। যখন ইহা প্রবেশ করে, জাতীয় অবসানও সম্মুখে দেখা যায়। এই সকল দুঃখের মীমাংসা কোথায় পাইব? যদি পিতা মাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করেন, তাহা হইলে এই অনুরাগ-দোষ নিবারিত হয়। ভারতের দুহিতৃগণ ভাবুকতা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকুশলা। তাহাদের জীবনে কল্পনাপ্রিয়তা অধিক স্থান পায় না। অপিচ, যদ্যপি লোকে আপনার স্বামী ও স্ত্রী নির্ব্বাচন করে, তাহাতে অধিক সুখ আনয়ন করে না। ভারতীয় নারীগণ বেশ সুখী। স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরের মধ্যে কলহ প্রায়ই

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃ., ৩২৩)

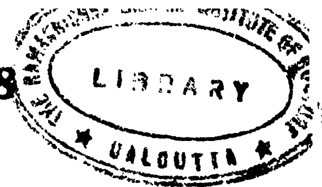
হয় না। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌ প্রদেশে, যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিরাজমান, সুখী পরিবার প্রায় নাই। এরূপ সামান্যসংখ্যক বিদ্যমান থাকিলেও, অসুখী পরিবার ও অসুখকর বিবাহের সংখ্যা এত অধিক, যে বর্ণনাতীত। আমি যে সভায় গমন করিয়াছি, উপস্থিত তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক তাঁহাদের স্বামী ও সন্তানকে বহিঃষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এইরূপই সর্ব্বত্র। ইহা কি প্রকাশ করিতেছে? প্রকাশ করিতেছে যে, এই সকল আদর্শ দ্বারা অধিক সুখ উপার্জ্জিত হয় নাই। আমরা সকলই সুখের জন্য উৎকট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু প্রাপ্ত না হইতেই, অপর দিকে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে।

তবে কি আমরা শুভকর কর্ম্ম করিব না? হাঁ, পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উৎসাহান্বিত হইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান-শিক্ষা আমাদের উদ্ধত বাড়াবাড়ি ও এক-ঘেয়েমি (Fanaticism) দূর করিবে। ইংরাজ আর উত্তেজিত হইয়া হিন্দুকে, "ওঃ পৈশাচিক হিন্দু! নারীগণের প্রতি কি অসৎ ব্যবহার করে", বলিয়া অভিশপ্ত করিবেন না। তিনি বিভিন্ন জাতির প্রথা সকল মান্য করিতে শিক্ষা করিবেন। এক-ঘেয়েমি অল্প হইবে। কার্য্য অধিক হইবে। একঘেয়ে লোকেরা কার্য্য করিতে পারে না। তাহারা শক্তির তৃতীয়াংশ বৃথা ব্যয়িত করে। যাঁহাকে ধীর প্রশান্তচিত্ত 'কাজের লোক' বলিয়া অভিহিত করা যায়, তিনিই কর্ম্ম করেন। নিরর্থকবাক্যপটু এক-ঘেয়ে লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। অতএব, এই সংস্কার হইতে কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ঘটনাচক্র এইরূপ জানিয়া তিতিক্ষা অধিক হইবে। দুঃখ ও অমঙ্গলের দৃশ্য আমাদিগকে সমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না ও ছায়ার পশ্চাদ্ধাবিত করাইবে না। সুতরাং, সংসার-গতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাউক, সকল মনুষ্যই দোষশূন্য হইবে, তারপর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং সেই সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে; উদ্ভিদদিগেরও গতি ঐরূপ। ইহাই কেবল কিন্তু সুনিশ্চিত—এই মহতী নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে; তৃণ ও পত্র খণ্ড সকল স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে এবং ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন প্রত্যেক খণ্ড সেই অনন্ত বারিধি বক্ষে সম্বর্দ্ধিত হইবে। অতএব, এই জীবন সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ, হাস্য ও ক্রন্দনের সহিত যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিত এবং ইহা কেবল সময় সাপেক্ষ যখন তুমি, আমি, জীব, উদ্ভিদ ও সামান্য জীবনকণা পর্য্যন্ত, যে যেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে সকলই সেই অনন্ত জীবন সমুদ্রে—মুক্তি ও ঈশ্বরে আসিয়া পড়িবে।

আমি পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত সুখাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। এ সংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবলই অমঙ্গলময়, এরূপ মত ইহা ব্যক্ত করে না। ইহা বলিতেছে, আমাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়েরই সমান মূল্য। ইহারা এইরূপে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সংসার এরূপ জানিয়া তুমি সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম্ম কর। কি জন্য কর্ম্ম করিব? যদি ঘটনাচক্রই এইরূপ, আমরা কি করিব? অজ্ঞেয়বাদী হই না কেন? বর্ত্তমান অজ্ঞেয়বাদীরাও জানেন, এ রহস্যের মীমাংসা নাই, বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে—এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব সন্তুষ্ট হইয়া সকল উপভোগ কর।

(৮১তমবর্ষ', ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ৩২৪)

# উদ্বোধন : আষাঢ় ১৩৯৪




## সূচীপত্র

# উদ্বোধনের নিয়মাবলী

● **লেখক-লেখিকাদের জন্য :** ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার ও গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে রেজেস্ট্রি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা ডাকটিকিট সম্বলিত কার্ড / ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

● **গ্রাহকদের জন্য :** মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৫·০০ টাকা, বাংলাদেশে ৪৩·০০ টাকা, ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে সি মেল-এ ৮৮·০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২৩৩·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা। বছরের যে কোন সময়ে বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে মাঘ মাস থেকে।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।

● **আজীবন-গ্রাহকদের জন্য :** এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০.০০ টাকা) ৪০০·০০ (চারশ) টাকা দিলে আজীবন-গ্রাহক (৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। যে কোন মাস থেকে আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পত্রাদি লিখবার সময় **গ্রাহক-সংখ্যা** অবশ্যই উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানাতে হবে।

কার্যালয়ে নিজে এসে অথবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া, অথবা মনিঅর্ডারযোগে বা ডিমাণ্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট্ "Udbodhan Office" এই নামে করতে হয়।

● **প্রকাশকদের জন্য :** সমালোচনার জন্য দুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন।

● **বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :** কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাবে।

● **কার্যালয়ের সময় :** সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০, রবিবার বন্ধ।

কার্যাধ্যক্ষ
**উদ্বোধন কার্যালয়**
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৩
ফোন : ৫৫-২৪৪৭



৮৯তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা          আষাঢ়, ১৩৯৪

# দিব্য বাণী

ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।...রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সহজ ভাষায় কতকগুলি বাঙলাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।

শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই অগাধ ঈশ্বরীয় শক্তির আধার স্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদের শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—তাহারাও যাহাতে নিজের চিন্তা নিজে করিতে শিখে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ যথাক্রমে ৪০৫ ও ৩৪২ ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## শিশু-সাহিত্যের একটি অবহেলিত দিক

সাহিত্যের নানারকম বিভাগ আছে। আবার যে-রূপ নানারকম বিভাগ আছে, সে-রূপ আছে তাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও নানা মত। কেউ মনে করেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য সামাজিক হিতসাধন, আবার কেউ মনে করেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া। কাহারও মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দদান, আবার কাহারও মতে রসসৃষ্টিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সম্পর্কে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, সাহিত্য যে মানুষের বুদ্ধিকে মার্জিত, মনকে প্রসারিত ও উন্নত এবং রুচিকে পরিশীলিত করিতে সাহায্য করে—তাহা অনস্বীকার্য। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহাও বলা অসঙ্গত নয় যে, সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া সমাজের কল্যাণ করা সাহিত্যিকদের একটি সামাজিক দায়িত্ব। সেইহেতু সাহিত্যিকদের শুধু সৃষ্টিকার্যে নিরত থাকিলেই চলিবে না; সে সৃষ্টি সমাজের পক্ষে কতদূর কল্যাণকর হইতেছে সেই দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

আরও কথা। মানুষের জন্যই সাহিত্য-চর্চা। সাহিত্য-রস সৃষ্টি করাও মানুষের জন্য। যে রসবোধ মানুষকে বৃহত্তর বস্তুর আস্বাদন করিতে প্রেরণা দেয়, মহাসত্যের দিকে লইয়া যায়, এবং সমাজকে কল্যাণের পথ-নির্দেশ করিয়া দেয়—তাহাই সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, বর্তমান যুগে এই উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন অধিকতর এবং সাহিত্যিকদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য বিষয় শিশু-সাহিত্য অর্থাৎ শিশু-সাহিত্য কি জাতীয় হইলে তাহা দ্বারা শিশুদের প্রকৃত কল্যাণ অধিক হইতে পারে এখানে ইহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে শিশু-সাহিত্য এমন হওয়া উচিত যাহাতে একদিকে যেমন শিশুর বুদ্ধিকে মার্জিত, মনকে প্রসারিত ও উন্নত এবং রুচিকে পরিশীলিত করিতে সাহায্য করিবে, অপরদিকে সাহিত্যের মাধ্যমে শিশু একটি মহত্তর আদর্শ-জীবনের সন্ধান পায় তাহাও দেখিতে হইবে। অর্থাৎ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চ আদর্শে শিশু-হৃদয়কে সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে শিশুদের জন্য সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত।

শৈশবে মনের উপর যে ছাপ পড়ে তাহার দাগ প্রায় সমস্ত জীবনই থাকে। শৈশবকালে শিশু যাহা শুনে পরবর্তিকালে তাহার বিরুদ্ধ-ভাবের কোন কথা শুনিলেও তাহার দাগ কিছুটা ম্লান হইতে পারে, কিন্তু একেবারে মুছিয়া যায় না—এই সত্যটি স্বতঃসিদ্ধ।

কোমল মতি শিশুদের গল্পচ্ছলে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে হিতোপদেশ সঙ্কলক নারায়ণ পণ্ডিতের একটি উক্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উক্তিটি এইরূপ: কাঁচা পাত্রে দাগ দিলে তাহা যেমন মুছিয়া যায় না, সেইরূপ বাল্যকালে যে সংস্কার অর্জিত হয় তাহা দূরীভূত হয় না। আর এই জন্যই আমি গল্পচ্ছলে বালকদের নিকট নীতিশাস্ত্রের কথা বলিব।

( হিতোপদেশ, শ্লোক-৮ )

শৈশবের স্মৃতি মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা বুঝাইবার জন্ম স্বামীজীর বাল্যজীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করিতেছি। শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া সেকালের অন্য দশজন শিশুর মতোই স্বামীজীও রামায়ণের অনেক কথা শুনিয়াছেন। শুনিতে শুনিতে রাম-সীতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। কিন্তু একদিন যখন বাড়ির সহিসের নিকট শুনিলেন যে 'বিয়ে করা খারাপ' এবং সহিস যখন তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা ও যুক্তিতর্ক-সাহায্যে, তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া ছিল, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীজী তাঁহার দীর্ঘদিন পূজিত রাম-সীতার যুগল মূর্তিটি বিসর্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু "শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া তিনি রামায়ণের যে অপূর্ব চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুনিয়াছিলেন," তাহা দাম্পত্যজীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতায় ক্লিষ্ট সহিসের তিক্তবাণীতে অকস্মাৎ ম্লান হইলেও কোন দিনই হৃদয় হইতে মুছিয়া যাইতে পারে নাই, বরং উহা পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শের সংঘর্ষে স্পষ্টতর হইয়াছিল।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১৷৩৪-৩৫)।

শৈশবে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন বা অন্যান্যদের নিকট হইতে শিশুরা যে-সব গল্প শুনে তাহা হইতে তাহাদের মনে কতকগুলি প্রবৃত্তি জাগরিত হয় এবং শিশু-মনের কল্পনায় ঐ ভাবের একটি ছবি হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশবে শিশুরা যে-সব গল্প শুনে তাহার মধ্যে আছে সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর গল্প, রাজপুত্র কিভাবে সুরক্ষিত দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করিয়া ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাইয়া তাহাকে লইয়া গিয়া বিবাহ করিল, ইত্যাদি দুঃসাহসিকতার অনেক রকম গল্প। তাহা ছাড়া শুনে ভূতের বা দুর্ধর্ষ ডাকাতের ও হাল্কা হাসি-তামাসার নানাবিধ গল্প।

তারপর আরও কিছু বড় হওয়ার পর যে-সব গল্প শুনে তাহার মধ্যে আছে: কোন ব্যক্তির হঠাৎ বড়লোক হইয়া যাওয়ার গল্প, সংসার-জীবনের উত্থানপতন সুখ-দুঃখকে ঘিরিয়া নানা কাহিনী। অবশ্য নানা প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করিয়া কিভাবে সংসারে উন্নতি করা যায়, এই-সব গল্পের মাধ্যমে অনেক সময় তাহাও দেখানো হয়। তাহা ছাড়া শুনে বীরত্বব্যঞ্জক নানা গল্প ও লোমহর্ষক গোয়েন্দা-কাহিনী। অর্থাৎ এই-সব গল্পের মাধ্যমে শিশুকে নানাভাবে শিখানো হয় সংসার-জীবনের নানা কথা—যাহা আজীবন তাহার মনে থাকে এবং রীতিমত দাগ কাটে।

কিন্তু এই জীবন ছাড়াও যে আর একটি জীবন—ত্যাগ ও সেবার জীবন, যে জীবনের উদ্দেশ্য আরও মহৎ, আনন্দ আরও উচ্চতর, সে-খবরটা এইসব সাহিত্যের মাধ্যমে শিশুরা জানিতেও পারে না। কেন না, বর্তমান শিশু-সাহিত্যে ইহা বড় একটা পরিবেশিত হয় না। আর পরিবেশিত না হওয়ার প্রধান কারণ শিশু-সাহিত্যিকেরা সমাজের আবহাওয়া ও চাহিদা অনুযায়ীই বিভিন্ন ধরনের গল্প লিখিয়া থাকেন। ফলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিশুরা অজ্ঞই থাকিয়া যায়। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ—একথা শিশুরা আজ আর গল্পের মাধ্যমে শুনিবারও সুযোগ পায় না।

প্রাচীন সাহিত্যে—যেমন রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদিতে একদিকে যেমন আছে অবিশ্রান্ত দৈত্য-দানব যুদ্ধের কাহিনী, রাজা-রানী, সংসার-জীবন সম্বন্ধে অসংখ্য গল্প, তেমন আছে বহু ভোগ-সুখত্যাগী তাপস বা মুনি-ঋষির চরিত্রের বর্ণনা যাঁহাদের জীবন ত্যাগ, সেবা ও নিঃস্বার্থতার প্রতিমূর্তি। সীতার সহিষ্ণুতা, রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-প্রেম, হনুমানের

ভক্তি, ধর্মের সত্যবাদিতা ও শিষ্টাচার, উচ্চতর আদর্শের জন্য বুদ্ধের রাজ্য-সুখে অনীহা আজও উন্নততর জীবনযাপনে আগ্রহী মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তিযুগেও পুরাণ-ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া নানা সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে তুলিয়া ধরা হইয়াছে জাগতিক জীবন এবং জাগতিক জীবনের পারে যে আর একটি মহত্তর জীবন আছে—এই উভয় জীবনেরই পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এই সকল গল্প পড়িলে বা শুনিলে শিশু যখন বড় হয়, তখন এই দুইটি জীবনের মধ্যে তুলনা করিয়া কোন্‌টি তাহার পক্ষে গ্রহণীয় তাহা সে বুঝিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী জীবন বাছিয়া লইতে পারে।

দুঃখের বিষয় বর্তমানে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকগুলিও ধর্মের নানা উপদেশমূলক কাহিনী বা নীতিকাহিনী হইতে বঞ্চিত। ফলে, মানুষের ব্যক্তিগত, প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মের যে শুভ-প্রভাব আছে, শিশুদের তাহা জানিতেও দেওয়া হয় না। আর ইহার অর্থ, যে ধর্মবোধ নীতিবোধ শিশু ও বালকের মনে সঞ্চারিত হইলে ভবিষ্যৎ ব্যক্তি, জাতি ও সমাজ উপকৃত হইত, তাহা স্বেচ্ছায় রোধ করা।

এ-কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, বর্তমান শিশু-সাহিত্যে এই দিক একেবারেই দেখানো হয় না, তাহা নহে। খুব কম সাহিত্যিকই এই দিকটির প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে যাহা দেখানো হয় তাহা নজরে পড়িবার মতো নয়।

আমরা যে-যুগে এবং যে-পরিবেশের মধ্যে বাস করিতেছি সেই যুগে ও সেই পরিবেশে বাল্যে বা যৌবনে সাধু বা ত্যাগী লোকের যাঁহাদের জীবন-মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ খুব কম মানুষেরই হয়। মদালসার* সন্তানেরা সংসার-জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তাহাদের মাতার নিকট হইতে সেই মহৎ জীবনের সন্ধান পাইয়াছিল বলিয়াই আদর্শরূপে তাহারা সেই সেই জীবন বাছিয়া লইতে পারিয়াছিল। শিশুরা যদি এই জীবনের সন্ধানই না পায় তাহা হইলে কোন্ জীবন গ্রহণীয় আর কোন্ জীবন বর্জনীয় তাহা কি করিয়া বুঝিবে? পছন্দমতো কোন জীবন গ্রহণ করিবার প্রশ্নই আসে না। ফলে, তাহারা জাগতিক সুখভোগকে একমাত্র পথ ও উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে এবং তাহাই গ্রহণ করে।

ইহা বলার অর্থ এই নয় যে সব শিশুকেই ভবিষ্যতে ত্যাগের জীবন অবলম্বন করিতে হইবে বা তাহাদিগকে ত্যাগী হইতে বলা হইতেছে। বলার উদ্দেশ্য এই যে, উভয় জীবনের আদর্শ তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারিলে তাহারা ইচ্ছামতো নিজেদের রুচি অনুযায়ী যে-কোন একটি জীবনকে আদর্শ রূপে বাছিয়া লইতে পারিবে।

যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানুযায়ী বলা যায় যে, ভাবী জীবন জিন্ ( gene )-এর উপর অথবা আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রানুযায়ী সংস্কারের উপর নির্ভরশীল, তাহা হইলেও জিন্-এর কিংবা সংস্কারের প্রকাশ ও বিকাশ নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ পরিবেশের উপর। যদি বলা হয় যে মদালসার সন্তানদের জিন্ কিংবা সংস্কারই এমন ছিল যাহা তাহাদিগকে স্ব স্ব পথে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, মদালসা প্রথম হইতেই সন্তানদের এমন শিক্ষা

* মদালসা মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত রাজা ঋতধ্বজের পত্নী ও তত্ত্বদর্শিনী নারী। মদালসা তাঁর পুত্রদিগকে শৈশবকালেই গার্হস্থ্য ধর্ম, রাজধর্ম এবং ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে নানা উপদেশদানে সুশিক্ষিত করেছিলেন।

দিয়াছিলেন যাহাতে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। "একটি সন্তান লাভ করিবার পরই তিনি তাহাকে স্বহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া দোল দিতে দিতে গাহিতে আরম্ভ করিলেন, 'তত্ত্বমসি নিরঞ্জনঃ।'" ( বাণী ও রচনা, ৫।১৩৫ ) এইভাবে শিক্ষার মাধ্যমেই তিনি সেই পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এ-বিষয়ে মা-বাবার দায়িত্ব যথেষ্ট। মদালসা সেই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাহা যথাযথ সম্পাদনও করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালে অনেক মা-বাবারও সেইরূপ শিক্ষা নাই আর পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অনুরূপ। যদিও অনেক মা-বাবাই সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের ছেলে-মেয়েরা যাহাতে উচ্চতর আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং উন্নততর জীবনযাপন করিতে পারে তাহা কামনা করেন, তাহা হইলেও তাহাদের নিকট হইতে মদালসার মতো দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা আশা করা যায় না।

শিশু-সাহিত্যিকরা বিদ্বৎ সমাজের লোক। তাঁহাদের এই বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করি। তাই এই বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—যাহাতে গল্পের মাধ্যমে শিশুদের নিকট তাঁহারা সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক এই উভয় জীবনের ছবিই তুলিয়া ধরেন।

# স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[ কালীসদয় পশ্চিমাকে লিখিত ]

**শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা**

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৬/১২/২২

শ্রীমান কালীসদয়

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। প্রেরিত ২৲ টাকা পাইয়াছি। অর্থের অভাব থাকিলে আমায় পাঠাবার কোন প্রয়োজন নাই (।) প্রভুর ইচ্ছায় আমার বিশেষ কোন অভাব হয় না হইলেও তিনিই সব দেন।

খুব প্রভুর নাম কর, নামে হৃদয় ভরিয়া যাক্ (,) তাহলে আর কোনরূপ অভাব বোধ করিবে না—কি আর্থিক কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক। কেবল ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি প্রীতির অভাবেই পূর্ব্বোক্ত অভাব সকল বোধ হয়। সন্তোষ পরম ধন। তাঁতে প্রীতি হইলে সন্তোষ আপনিই আসে। তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা বালকের ন্যায় আবদার করিলে ও তাঁর সর্ব্বশক্তি অর্পিত পূত পাবন নাম জপ করিতে ২ জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপ ও কুসংস্কার সব দূরীভূত হয়। এই জন্যই প্রভু তাঁর নিরন্ত কুহক ধাম হইতে লীলা বিগ্রহ রূপ ধারণ করিয়া জগতে অবতার হইয়াছেন (।) এই রামকৃষ্ণ নামই এই রামকৃষ্ণ রূপই তাঁর সেই নামরূপাতীত শান্তিময় অবস্থাতে লইয়া যায় এবং জীব শান্তি পায়। হতাশ হইবার কোন কারণ

নাই (।) বিশ্বাসের অভাবেই নৈরাশ্য আসে (।) আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি তোমার শ্রীরামকৃষ্ণে অচল অটল বিশ্বাস হউক হইলেই ভক্তি প্রীতি আপনিই আসিবে (,) বিশ্বাস না আসিয়া থাকিতে পারেনা।

ছেলেদের উৎসবাদিতে উৎসাহ শুনিয়া বড় আশা হয় (,) মহাপুরুষদের মহত্ব যারা কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারে তাহারা ধন্য। ভবিষ্যতে তাহাদের ভিতরেও সেই মহত্ব কিছু ২ বিকাশ হইবে তার সন্দেহ নাই।

ঠাকুর প্রায়ই অনেককে উপদেশ দিতেন "হরিসে লাগা রহো রে ভাই, তেরা বনত ২ বনি যাই" অর্থাৎ ভগবানে লেগে থাকা চাই (।) তাঁর জপ ধ্যান গুণগান পূজা পাঠ তাঁর জীব সেবা ইত্যাদিতে লেগে থাকিলে ক্রমে ২ সবই হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁকে লাভ হয়।

আমার শরীর তত মন্দ নয় (,) তুমি ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। সুরেশ ও ইন্দ্রদয়াল প্রভৃতি ভাল আছে শুনিয়া আনন্দ হইল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও ছেলেদের সকলকে ও সুরেশকে জানাইবে। মঠের এক প্রকার কুশল প্রভুর ইচ্ছায়। শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসবে এবার মঠে বহু লোক প্রসাদ পাইয়াছেন (,) অন্যান্য কোন বারে এত লোক হয় নাই। ইতি

তোমার শুভাকাংক্ষী

শিবানন্দ

# ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা

স্বামী অনুপমানন্দ

### প্রথম দর্শন :

১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বেলুড় মঠে যাতায়াত করি। তারই কোন সময়ে একদিন বৈকালে মঠে গিয়াছি, সেদিন শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে ছিলেন। মঠবাড়ির সম্মুখের লনে একখানি বেঞ্চিতে মহারাজ একাকী একমনে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন। সম্মুখে যাইয়া প্রণাম করিয়া সেই সৌম্যমূর্তির দর্শন করিবার এই প্রথম সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিনা আজ আর তার কিছু স্মরণ নাই।

### দ্বিতীয় দর্শন :

সেদিন মঠে উৎসব ছিল, বোধ হয় স্বামীজীর জন্মোৎসব। উঠানে আন্দুলের কালীকীর্তনের দল কীর্তন করিতেছিল। চারিদিকে ভক্তেরা বসিয়া দাঁড়াইয়া কীর্তন শুনিতেছিলেন। আমরাও তাহাদেরই মধ্যে বসিয়া কীর্তন শুনিতেছিলাম। মঠবাড়ির পশ্চিম দিকের বারান্দায় হেলান দেওয়া বেঞ্চিতে বসিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ, শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ, শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজও বসিয়া কীর্তন শুনিতেছিলেন। কীর্তন খুব জমিয়াছে, বৈকাল হইয়াছে। কীর্তন

সমাপ্ত হইবার পূর্বে কীর্তনের দল দাঁড়াইয়া উঠিয়া 'আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে' গানটি আরম্ভ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহারাজ বেঞ্চি হইতে উঠিয়া অদ্ভুত-ভাবে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া দুই হাত তুলিয়া মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমরা আনন্দে ভরপুর হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দিব্য দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া কীর্তন চলিবার পর সকলেই যে যার আসন গ্রহণ করিলেন। কীর্তন সমাপ্ত হইল। আমরা সেই আনন্দমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কলিকাতা ফিরিলাম। অনেক দিনের কথা এখন আর খুঁটিনাটি স্মরণ নাই।

## মঠে তৃতীয় দর্শন :

একদিন মঠে গিয়াছি। গঙ্গায় হাত-পা ধুইয়া উপরে ঠাকুর প্রণাম করিয়া নিচে আসিয়া শুনিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে আছেন। তাঁহার দর্শন মানসে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, বাঁ দিকে যে ছোট বারান্দা আছে সেইখানে একখানা ইজিচেয়ারে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া সামনের গড়গড়ার নলটি মুখে ঠেকাইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ভাবস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। (এই অবস্থার একটি Photo-ও আছে) মুখে যেন চাপা হাসি। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই আনন্দ-মূর্তি দর্শন করিলাম। নিকটে কেহই ছিলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে আমি প্রণাম করিয়া নিচে নামিয়া আসিলাম। তখনও তাঁহার ভাব ভঙ্গ হয় নাই। এরপর আর তাঁহাকে মঠে দর্শন করিয়াছি কিনা স্মরণ নাই।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে আমি যখন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে থাকিতাম, শ্রীশ্রীমহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে থাকিতেন; কয়েক মাস ধরিয়া নিত্যই তাঁহার দর্শনে যাইতাম। সকালে, কখন বা বৈকালে যাইতাম। তখন সকালে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে ভবানী মহারাজ (স্বামী বরদানন্দ) স্তোত্র পাঠ করিতেন। ত্রিপুরাসুন্দরী, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি স্তোত্র পড়া হইত। শ্রীমহারাজ তাঁহার খাটের উপর পূর্বাস্য হইয়া যোগাসনে বসিতেন এবং আমরা মেঝেতে তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিতাম।

ভবানী মহারাজ দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া পাঠ করিতেন। আমাদের মধ্যে কয়েকজন যুবক ও একজন বৃদ্ধ থাকিতেন। স্তোত্র পাঠ শেষ হইলে সমুখের দেওয়ালে লম্বিত শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি ফটোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, হাত জোড় করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন। ভাবে বিভোর হওয়াতে তাঁহার হাত দুটি কাঁপিতে থাকিত। পরে কোলের উপর হাত দুটি ন্যস্ত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন। ঐ সময়ে আমরাও ঐখানে বসিয়া ধ্যান করিতাম। অন্যস্থানে যখন ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতাম, তখন ধ্যান হইত না। কিন্তু মহারাজের ঘরে মন একাগ্র হইয়া বেশ ধ্যান জমিয়া যাইত। মহারাজের ধ্যান ভঙ্গ হইলে আমরা পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতাম। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রণাম করিতে যাইলে মহারাজ কুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে দূর হইতে প্রণাম করিতে বলিতেন। পাদস্পর্শ করিতে দিতে চাহিতেন না। কখনও তাঁহার চটি জোড়া আগাইয়া দিলে মহারাজ বিরক্ত হইতেন।

ঐ সময়ে মহারাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার পরিচিত হইয়া স্নেহভাজন হইয়াছিলাম। তখন বয়স অল্প, মহারাজের নিকট যাইতে আকর্ষণ বোধ করিতাম। তাঁহার নিকট বসিয়া

থাকিতে বেশ ভাল লাগিত। তাই নিত্যই তখন তাঁর দর্শনে যাইতাম। তিনি তাতে প্রসন্নই হইতেন বলিয়া মনে হইত। কয়েকদিন দুইবেলা যাওয়াতে একদিন বলিলেন—'তুই যে দুবেলাই আসতে আরম্ভ করেছিস্।' উত্তরে বলিলাম, 'আমার ভাল লাগে তাই আসি।' তিনি হাসিতে লাগিলেন। একদিন বৈকালে যাইতেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই বাজার করতে পারিস্?' উত্তরে বলিলাম, 'পারি'। 'তুই শোভাবাজার চিনিস্?' 'হাঁ' বলাতে বলিলেন, 'অমুক জায়গা থেকে এই জিনিসটি কিনে আনতে হবে, পারবি তো?' সানন্দে সম্মতি জানাতেই সূর্য মহারাজের নিকট হইতে পয়সা নিতে বলিলেন। পয়সা লইয়া ঐ জিনিসটি কিনিয়া আনিলাম। মহারাজ দেখিয়া ভারি খুশি। আমিও মহারাজের সামান্য সেবা করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

আমার এক বন্ধুর মহারাজের নিকট দীক্ষা হইয়া গেল। আমারও দীক্ষা লইবার খুব ইচ্ছা। একদিন বৈকালে বলরাম মন্দিরে যাইয়া দেখিলাম মহারাজ ঘরে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মহারাজ ছাদে বেড়াইতেছেন। আমি ছুটিয়া ছাদে গেলাম। দেখিলাম মহারাজ ধীর পদে ভাবস্থ হইয়া পাদচারণ করিতেছেন, কোন দিকে দৃষ্টি নাই। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। পরে আমার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতেই তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই এখানে কি করে এলি? কি চাস্?' আমি প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, 'মহারাজ আমাকে কৃপা করিয়া দীক্ষা দিন।' হাসিয়া বলিলেন, 'দীক্ষার জন্য অত ব্যস্ত হবি না, সময়ে দীক্ষা হয়ে যাবে।' ঐ সময় আমাকে আরও কিছু বলিলেন। ঐভাবে মহারাজকে আর কখনও দেখি নাই। মহারাজের নিকট হইতে আমার দীক্ষা গ্রহণ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রীমহারাজের মাহাত্ম্যের কথা তখন কি আর বুঝি, এখন সেই সব মনে করিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি।

বইয়ে পড়িয়াছিলাম পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপ্রভু দিনের পর দিন মাসের পর মাস জগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং ভাবে প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা পাথরের উপর পড়িয়া পড়িয়া সেখানে একটি গর্ত হইয়া গিয়াছে। সেই গর্তটি দেখিয়াছি। কারও অশ্রুজল পড়িয়া ঐরূপ গর্ত হইতে পারে তখন তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু যখন অম্বিকানন্দ স্বামীজীর নিকট শুনিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ এক সময় নর্মদা তীরে ওঙ্কারনাথে তপস্যা করিতেন, তখন তিনি পাহাড়ের উপর পাথরেতে পাখির পায়ের সব দাগ আছে দেখিয়াছিলেন। অম্বিকানন্দজী জিজ্ঞাসা করেন ঐরূপ দাগ হইবার কারণ কি? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—ঐ পাহাড়ে কোন মহাপুরুষ তপস্যা করিতেন। সেই সময় ঐ পাহাড় কোমল হইয়া গিয়াছিল এবং সেখানে পাখি বিচরণ করায় তাহাদের পায়ের দাগ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। মহাপুরুষদের তপস্যা-প্রভাবে ঐরূপ হইতে পারে তখন বিশ্বাস হইল।

বশী সেন, বৈজ্ঞানিক, ডাঃ জগদীশ বসুর সহকারী। বলরাম মন্দিরে মহারাজের কাছে, তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতাম। তিনি মহারাজের দাড়ি কামাইয়া দিতেন। মহারাজের 'নাপিত'। তাহার সহিত মহারাজ অনেক ফষ্টি-নষ্টি করিতেন। একদিন বশীবাবু মহারাজের তামাক সাজিয়া দিয়াছেন। গড়গড়ায় দুই-এক টান দিয়াই, মহারাজ বলিলেন, 'এইরকম আর এক ছিলিম সেজে দিলেই তোকে সন্ন্যাস দিব।'

যখন মহারাজের ডায়াবেটিস হইয়াছিল, তখন ডাক্তার তাঁহাকে মিষ্টি খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। একজন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ডাক্তার কি আপনাকে মিষ্টি খেতে বারণ করেছে?' 'শুধু কি মিষ্টি, মিষ্টি কথা কইতেও বারণ' বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মহারাজ অত্যন্ত রসিক পুরুষ ছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা বালক-স্বভাব হন। তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত মহারাজের জীবনে দেখা যায়।

কয়েকদিন মহারাজের অসুখ হইয়াছে। সাগু-বার্লি পথ্য। এর মধ্যে একদিন মহারাজের ঘরে মিটসেফে কয়েকটি প্রসাদী সন্দেশ বাবুরাম মহারাজ আনিয়া রাখিয়াছিলেন। মহারাজ যখন পথ্য পাইবেন তখন তাঁহাকে একটি-দুটি দেওয়া যাইবে মনে করিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ চলিয়া যাইবার পর, মহারাজ তাঁহার বিছানা হইতে উঠিয়া ২।৩টি সন্দেশ খাইয়া চুপচাপ বিছানায় শুইয়া রহিলেন। পথ্য পাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ মিটসেফ খুলিয়া দেখেন সন্দেশ অন্তর্ধান করিয়াছে। তখন বাবুরাম মহারাজ বলিলেন—'মহারাজ সন্দেশ কোন্ বিড়ালে খেয়েছে?'

মহারাজের অন্তর্দৃষ্টি ছিল। সকলের ভাব ধরিতে ও বুঝিতে পারিতেন। যে যেমন লোক তাহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার ও কথাবার্তা বলিতেন। একদিন কয়েকজন লোক আসিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজ তাহাদের সহিত নানা বৈষয়িক আলোচনা করিতেছেন। তাহাতে তাঁহার নানা বিষয়ে পরিপক্ব জ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল আপনার সঙ্গে আলোচনায় আমাদের প্রভূত উপকার হইল।

তাঁহার প্রখর দৃষ্টি সকলের প্রতি থাকিত। সকলের চাল চলন, ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন এবং সকলের কথা শুনিতেন, কিন্তু হঠাৎ কোন মত প্রকাশ করিতেন না। যদি কেহ কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধও করিত, (যাহাতে সে শাস্তি পাইবার যোগ্য) অন্য সাধারণ লোকের মতো তিনি তাহাকে তিরস্কার করিতেন না বা শাস্তি দিতেন না। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অপরাধীর মন উচ্চস্তরে তুলিয়া দিতেন এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্যের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। তাহাতেই সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইত। যেমন, মহারাজ বলরাম মন্দিরে আছেন। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও আছেন। একদিন সকালবেলা ব্রঃ ভোঃ আসিয়া মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এত সকালে কোথা থেকে এলে?' উত্তরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'গতকাল কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, রাত্রি হইয়া যাওয়ায় মঠে ফিরিতে পারি নাই। ভূঃ বাবুর বাড়িতে ছিলাম। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—'এর মধ্যেই ভক্ত বাড়িতে রাত্রিবাস?' মহারাজের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'মঠে বেশ ঠাকুরের পূজা করছিল, সে-সব ছেড়ে কলিকাতায় এসে রাত্রিবাস।' ব্রহ্মচারীর দিকে মহারাজ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'ভোঃ, তুই হচ্ছিস্?' ব্রহ্মচারী মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল অনুতপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ—'যা, আর কখনও ওরূপ করিস নে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন কোন অপরিচিত লোক আসিলে ছেলে মানুষের মতো তাহার সহিত দেখা করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, মহারাজও সেইরূপ হইতেন। একদিন বেলুড় মঠে একজন সাহেব তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে খবর দেওয়া হইল। মহারাজ বলিয়া পাঠাইলেন দেখা হইবে না। তাঁহাকে বার বার

অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন না। অগত্যা সাহেব চলিয়া যাইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন। তখন মহারাজ মঠের উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। সাহেবের সঙ্গী ভদ্রলোক তাহাকে বলিলেন,—'ঐ দেখুন—মহারাজ উপরে বারান্দায় বেড়াইতেছেন।' নৌকা হইতে দর্শন করিয়াই তিনি নৌকার উপর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন আজ জন্ম সার্থক হইল। তিনি মহারাজের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের দর্শন পাইয়াছিলেন। পরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'ও আমার কাছে এলে অজ্ঞান হয়ে যেত।'

# স্ব-ইচ্ছে

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

নাগালটা পাবো কি-না—সে কথাটা বড় নয় কেন ?
সবটা নাগালে পেতে স্ব-ইচ্ছের ইন্দ্রজাল যেন—
জাদুকরী ভাষাবন্ধে বন্ধনীও উল্লঙ্ঘন করে,
উল্লসিত অনুভূতি পেতে চায় অনুভব স্তরে।

আমাদের হাতে-নাতে ধরা দেবে অধরার ধন—
ইচ্ছের বাতাসে যদি ফুলেফেঁপে তুলে থাকে মন,
মায়ার অঞ্জন তবু দুচোখে থাকতে পারে সরু—
সূক্ষ্মতায় সুচিকণ ভেঙে দেবে সুবিস্তীর্ণ মরু।

সবুজ ফসলে ক্ষেত ফুল-পাতা-ফলে বোনা বনে,
বুনোট জীবন-জালে জানা-অজানার যত ক্ষণে ;
ক্ষণিক ক্লান্তির ফেরে ফিরেছে মানস পাখি দূরে—
অথচ কাছের পথে চলে যায় কত মধুসুরে
গান আর ছায়াছবি জীবনের জগতের ভরা,
ভাবনায় ভাবনায় তাকে কিছু চিনে নিতে ত্বরা—
হয়-বা হয়-না জানি, তবু জেনে নিতে গিয়ে ক্রমে
শ্রম হয় শ্রমিকের ঘর্মটুকু মর্ম-কোণে জমে।

পার্থিব প্রকাশ দেবে অজানিত বেদনার ক্ষতে
নানা মুনি বলে যাবে নানাবিধ নানান সমতে।

# শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিবেদী

ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর বাণী ও চিন্তাধারা এতই গভীর ও ব্যাপক এবং দৈনন্দিন জীবন ও ধর্মের প্রতিটি বিষয়কেই তা এমনভাবে স্পর্শ করেছে যে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মনীষীরাও তা প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাননি। এই অবস্থায় একটি মাত্র বক্তৃতায় তা তুলে ধরার ইচ্ছা আমার পক্ষে অনধিকার প্রচেষ্টা সন্দেহ নাই।

গান্ধীজী বলেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ধর্ম ও তার সাধনের জীবন; এই জীবন ভগবানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন নিচের কয়েকটি ছত্রে :

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥

('পরমহংস রামকৃষ্ণদেব', উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃঃ ৫৭)

শ্রীঅরবিন্দও মনে করতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগতের সব নেতাদের জীবন ও চিন্তাধারার এক মহাসম্মেলন-ভূমি। তিনি বলেছেন, "...আমাদের মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান এবং আমাদের যে ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা তিনি তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এই মহান জীবন স্বীয় অপূর্ব কীর্তিরাশিতে দ্যুতিমান। আগুনে অনেক ধাতুই পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু নিখাদ সোনা পাওয়া যায় খুবই অল্প। জয় বা পরাজয়, দ্রুত সাফল্য বা দীর্ঘ সংগ্রাম,—ফলাফল যাই হোক, এটি সত্য যে, অনেক ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন যাঁরা বলবেন যে এই ব্যক্তি আমাদের মধ্যে জন্মেছিলেন, বাস করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছেন নিচের কথার সারমর্ম ;—

আহ্বান করেছেন ভগবান বাজিয়ে তাঁর ডঙ্কা,
মানুষের হৃদয়কে টানছেন নিজের দিকে ;
জানি সে ভাব কভু ফিরিবে না ব্যর্থতায়।
চল মন দ্রুতপদে তাঁর বিচার সিংহাসনে
উত্তর দিবার লাগি ;
আনন্দভরা হৃদয়ে চল ত্বরা আজি নিকটে তাঁর।

(কর্মযোগিন—৫ই চৈত্র, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও তাঁর প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। রোম্যাঁ রোলাঁ মনে করতেন যে ত্রিশ কোটি লোকের দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার ঘনীভূত রূপ হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টয়েনবী রোলাঁর কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি মনে করতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী কার্যে পরিণত ভাবশক্তির এক অনন্য রূপ। ঋষিসুলভ কণ্ঠে টয়েনবী বলেছেন, "বর্তমানকালে পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যাবলে জড়ভূমিতে পৃথিবীর ঐক্য সাধিত হয়েছে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য বুদ্ধিমত্তা শুধুমাত্র দূরত্বকেই অপনীত করে নাই, ইহা মানুষকে বিধ্বংসী মারণাস্ত্রেও সজ্জিত করেছে। আর এরই বলে বলীয়ান হয়ে আজকের মানুষ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভালবাসার পরিবর্তে এই মারণাস্ত্রগুলি একে অপরের প্রতি প্রয়োগ করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাসের এই অত্যন্ত বিপজ্জনক মুহূর্তে

থেকে মুক্তিলাভ একমাত্র ভারতীয় উপায়েই সম্ভব। সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীর মধ্যেই সেই মনোভাব ও শক্তি নিহিত আছে যা ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে একই পরিবারভুক্ত করতে সক্ষম হবে। এই পারমাণবিক যুগে আমাদের সর্বাত্মক বিনাশের এটিই একমাত্র বিকল্প।"

( Sri Ramakrishna and His Unique Message by Swami Ghanananda, Ramakrishna Vedanta Centre, London, 1970, Foreword )

আমরা দেখতে পেলাম যে এসব বিখ্যাত মনীষীরাও এই জীবন্মুক্ত যুগাচার্য পুরুষ সম্পর্কে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। এই অবস্থায়, আমার মতে তাঁর যে তিনটি মুখ্য চিন্তাধারা, এর মধ্যেই আমি আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এই তিনটি মুখ্য ভূমিকা হল,—(ক) রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন, (খ) সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী, আর (গ) শিবজ্ঞানে জীবসেবার প্রবর্তন।

## রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন

আজকের এই উৎসবই রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনের প্রতি একটি সশ্রদ্ধ উপহার। এখানকার এই বিরাট কর্মযজ্ঞ মিশনের সুউচ্চ ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণের চিত্রটি তুলে ধরেছে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এখানে একটি সম্মিলিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। মানুষ আর ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান, মন্দির হচ্ছে তার সেতুস্বরূপ। ভগবানের কৃপালাভ করার জন্য প্রাণের আর্তি নিয়ে মানুষ মন্দিরে আসে। ভক্তদের জন্য ভগবান এখানে বিশেষভাবে প্রকাশিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন,—"ওরে, যেখানে অনেক লোকে অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান,ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষেরা এইসব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ-ঢেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমান-ভাবে থাকলেও এইসব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ! যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাত্‌কো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না—যখন ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেই রকম।"

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ১৩৫৮, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১১৮ )

অগণিত ভক্তের ও সাধুমহাত্মার আধ্যাত্মিক স্পন্দনে ও পবিত্র ভাবধারায় পরিপূর্ণ একটি মন্দির যদি মানুষকে ঊর্ধ্বগামী করার সহায়ক হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত এই সঙ্ঘকে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের একটি গতিশীল প্রতীক বলা যেতে পারে। মানুষের অগ্রগতিকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কল্পনানেত্রে এই আন্দোলনের চালচিত্রটি এঁকেছিলেন বেদান্তের শিক্ষকরূপে একদল কর্মী সৃষ্টি করে, আর আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক কার্য প্রবর্তন করে।

এটা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘই এদেশে সর্বপ্রথম সুসংহত একটি ধর্মসঙ্ঘ। শ্রীরাম-কৃষ্ণ তাঁর চিন্তাধারাকে কার্যকরী রূপ দেননি; কিন্তু তিনিই এর বীজ বপন করেছিলেন। কারণ, ভক্তদের নিকটে পাবার জন্য এবং তাঁদের মধ্যে নিজ ধর্মশক্তি সঞ্চার করার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছেন,

"মাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্ম ঐরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করে কি না সন্দেহ; সখা সখার সহিত এবং প্রণয়িযুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্ম কখনও ঐরূপ করে বলিয়া শুনি নাই—ঐ ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল। ঐরূপ হইবার কয়েকদিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল।"

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৫৮, সাধকভাব—পৃঃ ৩৭৩ )

প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মধ্য দিয়ে তিনিই রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনকে একটি কার্যকরী রূপ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনকে তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্ম শ্রীমা তাঁরই কাছে প্রার্থনা করেন, "ঠাকুর···আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে আর তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে, আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এই জন্মই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।"

( শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪২৭-২৮ )

উদ্দেশ্যটা ছিল এই যে ত্যাগী যুবকভক্তেরা যেন এক জায়গায় একটা আড্ডা করে থাকেন যেখানে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষেরা বেদান্তের শিক্ষা ও জীবনে শান্তি দুইই পাবেন। অন্তকথায় বলতে গেলে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ,—ধর্মসংস্থাপন ও জনগণের সেবা। স্বামী বুধানন্দ যেমন বলেছেন, "জগতের নিম্নতম মানুষের কাছে সর্বোত্তম বস্তু পৌছে দেওয়ার জন্ম এই আন্দোলন সকল মানুষকে সবরকম কাজ করার প্রেরণা দিচ্ছে। আর এরই সাথে সাথে ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ, জগতে যার যা প্রয়োজন তাকে তা-ই দেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাকে পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে পৌছে দিচ্ছে।" রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের চিত্রটি এই চরম লক্ষ্যের কথাই বোঝাচ্ছে। "চিত্রস্থ তরঙ্গান্বিত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়।"

( স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১৩৬৯, ৯।১৯০ )

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন, আর্তত্রাণ, উপজাতি ও নারীদের উন্নতি, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং আরও অসংখ্য বিভাগে এই আন্দোলন এদেশে এবং বিদেশে অকল্পনীয় কাজ করে চলেছে যা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে মিশনের লক্ষ্ণৌ শাখার সুন্দর কাজের প্রশংসা করে আমি আপনাদের সকলের প্রাণের কথাই এখানে তুলে ধরছি। আর্ত ও দরিদ্রের সেবার দ্বারা মিশন এখানে শুধু যে সেবাদর্শেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাই নয়, এই বিরাট কর্মযজ্ঞের দ্বারা আমরা এখানকার স্বামীজী ও তাঁর সহকর্মিদের অসাধারণ পরিচালনা-শক্তিরও পরিচয় পাচ্ছি। এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর কার্যে পরিণত রূপ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে স্বয়ং ভগবানই এই সঙ্ঘের উৎস; শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাধারারই বাস্তব রূপ হচ্ছে এই সঙ্ঘ। শান্তি ও আনন্দের বাসভূমি এই ছোট ছোট আশ্রমের মধ্য দিয়েই এই মহান সঙ্ঘ তার আদর্শ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'-কে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করছে।

## সর্বধর্মসমন্বয়

ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় সংবিধানের একটি মৌলিক উপাদান। এই শব্দটির যেরকম বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা হয়েছে, তা আর কোনও শব্দেরই হয় নাই। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ ধারণাকে একটি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। প্রত্যুত যদি আমরা এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করি, তাহলে সর্বধর্মসমন্বয়ের আলোকে আমরা চিন্তা করতে শুরু করব আর বুঝব যে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি সংবিধানে এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপলব্ধি থেকে এই সমন্বয়ের কথাই বলেছেন; তাঁর যুক্তি-তর্ক সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর প্রধান যুক্তিগুলি হচ্ছে এই যে, প্রায় সবকটি ধর্মই নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার মূল্য দেয়, ঈশ্বরকৃপা স্বীকার করে এবং কিছুটা উদারমনোভাবাপন্ন। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ধর্মই একটি চরম সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করে; শুধুমাত্র তার আলাদা আলাদা নাম দেয় আর বিভিন্ন পথ দিয়ে সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করার কথা বলে।

সকল ধর্মের মূল নীতিগুলিতে সাদৃশ্য স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মগুলিকে তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। প্রথমে তিনি বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলি যে-সব সত্যের কথা বলছে সেগুলি উপলব্ধি করেন। এরপর একই উপায়ে অহিন্দু-মতানুযায়ী সাধনা শুরু করেন। একজন সুফি সাধকের নিকট দীক্ষিত হয়ে তিনি ইসলাম ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হন এবং মাত্র তিনদিনে ঐ সাধনার লক্ষ্যে উপনীত হন। পরবর্তিকালে তিনি যীশুখ্রীষ্ট-প্রবর্তিত সাধনপথ নিয়েও পরীক্ষা শুরু করেন এবং অল্প-কালেই সেই সাধনপথের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে ধন্য হন। এসব উপলব্ধির ফলে তিনি বলেন, "আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩,৩।২ )

একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় জগন্মাতাকে বলেন, "মা, সব্বাই বলছে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। খ্রীষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান সকলেই বলে, আমার ধর্ম ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়ি তো ঠিক চলছে না। তোমাকে ঠিক কে বুঝতে পারবে। তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তোমার কৃপা হলে সব পথ দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছান যায়।" ( ঐ, ৫।১।১ )

এজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে কাউকে বুঝতে গেলে তার মনোভাব নিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এই পদ্ধতি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কারণ জগতের ধর্ম-ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হিন্দু, ইসলাম, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন মতানুযায়ী সাধন করে একই লক্ষ্যে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করে ধন্য হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব সাধন ও তার উপলব্ধি সম্পর্কে বলছেন, "মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্যদেবের উপদেশ এই: 'প্রথমে নিজে ধার্মিক হও এবং সত্য উপলব্ধি কর।' আর তিনি সকল দেশের ভ্রাতৃষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবক-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'তোমাদের ত্যাগের সময় আসিয়াছে!' তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর। তিনি চান,

তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর। তিনি চান, তোমরা মুখে কেবল 'ভাইকে ভালবাসি' না বলিয়া, তোমাদের কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কাজে লাগিয়া যাও। যুবকগণের নিকট এখন এই আহ্বান আসিয়াছে, 'কাজ কর, ঝাঁপিয়ে পড়ো, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর।'

"ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে। জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, তাহা দেখিতে পাইবে; বুঝিবে—বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই এবং তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে পারিবে। মদীয় আচার্যদেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মের মূলে যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা। অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবী করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই। কারণ তিনি সত্যসত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৮।৪১০-১১)

একই জিনিসকে বিভিন্ন নাম দেওয়ার কথা শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া এই চমৎকার উপমাটিতে পাওয়া যায়;—"ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি—হিন্দু বলছে জল, খ্রীষ্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি,—কিন্তু বস্তু এক। মত পথ। এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।৪।৪) স্বামীজী দেখান যে সহনশীলতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাব সব ধর্মেই কিছু না কিছু পরিমাণে আছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-জগতে স্বামীজী যে ঐক্যস্থাপন করেছেন, তার তুলনা মেলা ভার।

তিনি বলেছেন (ক) দার্শনিক মতবাদসমূহ, (খ) আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ, (গ) ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার মত, (ঘ) অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-সমূহ, (ঙ) বিভিন্ন ধর্মমত ও তাদের শাখা-প্রশাখা, (চ) বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য এবং (ছ) বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ,—মোটামুটি এই সাতটি ব্যাপারের ভিতরকার বিভেদ দূর করতে পারলে সব ধর্মমত-গুলির মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপন করা যাবে। এই চমৎকার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে জীবনে প্রয়োগ করলে আমাদের আর ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে পরিপূর্ণ 'ঘণ্টাকর্ণে' পরিণত হতে হবে না।

## মানুষের সেবা ঈশ্বরেরই সেবা

'ঈশ্বর সর্বব্যাপী',—এই দার্শনিক তত্ত্ব থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে ভগবানের সেবা করার মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর সেই বিখ্যাত লাইন আমরা স্মরণ করতে পারি,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "এখন দেখছি, তিনিই এক একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধু-রূপে, কখনও ছলরূপে, কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি, সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ।" (ঐ, ২।১৩।২)

প্রত্যেক জীবের মধ্যে একই সচ্চিদানন্দ বর্তমান,—এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার ধারণা আসতে বাধ্য। তাঁর মন্ত্র, 'ঈশ্বরের প্রতিমাজ্ঞানে দরিদ্রের সেবা' গোটা দেশকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। পরবর্তিকালে মহাত্মা গান্ধী এই ভাবটি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। এই ভাবটিই বিস্তার করে স্বামীজী বলেছেন, "এককথায় বেদান্তের আদর্শ হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি তা জানা; আর এর বাণী হচ্ছে এই যে, প্রত্যক্ষ ভগবানরূপী তোমার ভ্রাতাকে তুমি যদি উপাসনা করিতে না পারো, তবে যে ভগবানকে তুমি কখনও দেখ নাই, তাহার উপাসনা তুমি কিভাবে করিবে?" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় সংস্করণ, ২।২৫৭)

"অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ—অপরকে সাহায্য করা, জগতের উপকার করা। কেন আমরা জগতের উপকার করিব? আপাততঃ বোধ হয় যে, আমরা জগৎকে সাহায্য করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমরা নিজেদেরই সাহায্য করিতেছি।...উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া পাঁচটি পয়সা লইয়া গরীবকে বলিও না, 'এই নে বেচারা' বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও—ঐ গরীব লোকটি আছে বলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিতে পারিতেছ। যে গ্রহণ করে, সে ধন্য হয় না, যে দান করে সেই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া ও করুণাশক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ। এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও।" (ঐ, ১ম সং, ১।৯৯—১০০)

অপরের কল্যাণ করার মহতী বাসনা থেকেই সেবার ভাবটি জাগ্রত হয়। আবার আত্মত্যাগের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত না হলে এই সেবাও যথার্থ সেবার রূপ ধারণ করতে পারে না। এদিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের উন্নতিকল্পে স্বামীজী তাঁর লেখনীমুখে ঘোষণা করেছেন, "যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারীসকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-জীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম।" (ঐ, ৭।৩২৪)

এই আলোচনাপ্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি দয়া করার ভাব শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগ করতে বলেছেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর গৃহমধ্যে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণপরিবৃত হয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ করছেন। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের কথা উঠল এবং ঐ মতের সারমর্ম সংক্ষেপে সকলকে বুঝিয়ে তিনি বললেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া 'সর্বজীবে দয়া' (প্রকাশ করিবে)। 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা! (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ১৩৪২, পৃঃ ২২৩-২৪)

উপরের কথা থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেতে পারি যে সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা 'পরমাত্মার আবাসভূমি জীবের' প্রতি দয়া প্রকাশ করতে পারি না, শিবজ্ঞানে তাদের সেবা-মাত্র করতে পারি।

আমি পূর্বেই বলেছিলাম যে একটি মাত্র বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান প্রধান উপদেশগুলিও আপনাদের সামনে ঠিকমতো তুলে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যদি আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের মূল বক্তব্য, 'সর্বধর্মসমন্বয় ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বর্তমানে দেশের পক্ষে যে একান্ত প্রয়োজন, এটুকু বোঝাতে সক্ষম হয়ে থাকি, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। অজ্ঞতা থেকে জাত বহুবিধ সমস্যাই শুধুমাত্র তাতে দূর হবে না, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-প্রবর্তিত মহান আদর্শ আত্মজ্ঞান লাভ করে মানুষ ধন্য হবে।*

* ২ ফেব্রুআরি, ১৯৮৭, লক্ষ্ণৌ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় রাজস্থানের গভর্ণর শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিবেদীর পঠিত ইংরেজী ভাষণ। স্বামী পরাশরানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

# প্রার্থনা

## শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

এস আমরা সমবেত হই
সমবেত হই প্রার্থনা জানাতে—
হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
আমাদের মনুষ্যত্ব দাও, আমাদের মানুষ কর।
কত যুগ যুগ ধরে এই ভারতের মাটিতে
উচ্চারিত হয়েছে এ প্রার্থনা।
পবিত্র করেছে মানুষের মন।
কিন্তু আজ?
আজ যখন ভারতবর্ষের ছবি দেখি
মনে প্রশ্ন জাগে—
আমরা খণ্ডিত হতে হতে অখণ্ডের কথা
ভুলতে বসেছি।
ভুলতে বসেছি আমাদের ইতিহাস,
মানুষে মানুষে হানাহানির শেষ নেই
নিরপরাধ মানুষের রক্তে মাটি লাল।
এই লাল মাটিতে আর ফসল ফলবে না!
চাঁদ তার মায়াজাল সৃষ্টি করবে না।
সূর্যও কি রোজ রোজ উঠে ক্লান্ত হয়ে যাবে।
না।
তবে?
আবার এই পুণ্য ভারতের মাটিতে
উচ্চারিত হবে সেই উদাত্ত বাণী
তোমরা অমৃতের সন্তান।
তোমরাই সন্ধান পেয়েছ সেই সত্যের
যা চিরন্তন।
সাময়িক অন্ধকারে আকাশ আঁধার হয়;
মেঘ কেটে যাবে—আবার সূর্য হাসবে,
বলবে: হে ভারতের সন্তানগণ
তোমরা ভুলে যেও না তোমরা কে?
প্রাচীন বলে তোমাদের মনুষ্যত্ব বলি দিও না।
তোমরা ভুলো না বুদ্ধকে, শঙ্করকে,
শ্রীচৈতন্যকে—
ভুলো না রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে—
যাদের জীবনের সাধনার ধন তোমরা
ভারতের অগণিত জনসাধারণ।
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তোমাদের চৈতন্য হোক।
আজ সমবেত কণ্ঠে এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হোক:
আমাদের চৈতন্য হোক।

# রামহৃদয়ম্

শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

নাহো ন রাত্রিঃ সবিতুর্যথা ভবেৎ প্রকাশ-
রূপাব্যভিচারতঃ ক্বচিৎ।
জ্ঞানং তথাজ্ঞানমিদং দ্বয়ং হরৌ রামে কথং
স্থাস্যতি শুদ্ধচিদ্‌ঘনে ॥২৩॥

**অন্বয়**—প্রকাশরূপাব্যভিচারতঃ যথা সবিতুঃ ক্বচিৎ ন অহঃ ন রাত্রিঃ ( বা ) ভবেৎ, তথা শুদ্ধচিদ্‌ঘনে সতি হরৌ রামে জ্ঞানম্ অজ্ঞানম্ ইদম্ দ্বয়ম্ কথম্ স্যাৎ ?

**বঙ্গানুবাদ**—প্রকাশিত হওয়ার জন্য কোনরকম অভাব না থাকায় সূর্যের মধ্যে যেমন দিবা ও রাত্রির প্রকাশ থাকে না তেমনি শুদ্ধচিদ্‌ঘনমূর্তি শ্রীরামচন্দ্রে জ্ঞান ও অজ্ঞান কিভাবে থাকতে পারে ?

**ভাবার্থ**—সূর্য সর্বদাই প্রকাশরূপ, তাঁর প্রকাশরূপতার কখনও ব্যতিক্রম হয় না; তাই কখনও সূর্যের নিকট দিন অথবা রাত্রির ভেদ নাই। তিনি সর্বদাই সমান প্রকাশমান থাকেন। তেমনই শুদ্ধচেতনঘন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই উভয় প্রকার কি করে থাকতে পারে ?২৩

তস্মাৎপরানন্দময়ে রঘূত্তমে বিজ্ঞানরূপে
হি ন বিদ্যতে তমঃ।
অজ্ঞানসাক্ষিণ্যরবিন্দলোচনে মায়াশ্রয়ত্বান্ন
হি মোহকারণম্ ॥২৪॥

**অন্বয়**—তস্মাৎ অজ্ঞানসাক্ষিণি বিজ্ঞানরূপে পরানন্দময়ে অরবিন্দলোচনে রঘূত্তমে হি তমঃ ন বিদ্যতেঃ মায়াশ্রয়ত্বাৎ হি ন মোহকারণম্ ( ভবতি )।

**বঙ্গানুবাদ**—সেইরূপ রঘুবংশভূষণ বিজ্ঞানস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রে কোনরূপ অজ্ঞানতা নাই, কারণ সেই অরবিন্দলোচন শ্রীরামচন্দ্রই অজ্ঞানের সাক্ষী সর্বব্যাপী পরমাত্মা।

**ভাবার্থ**—অতএব পরমানন্দরূপ বিজ্ঞানঘন অজ্ঞানসাক্ষী কমলনয়ন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে অজ্ঞানের লেশমাত্র নাই; কেন না তিনি মায়ার অধিষ্ঠান, তাই মায়া তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে না।২৪

অত্র তে কথয়িষ্যামি রহস্যমপি দুর্লভম্।
সীতারামমরুৎসূনুসংবাদং মোক্ষসাধনম্ ॥২৫॥

**অন্বয়**—অথ ( অহম্ ) তে সীতারামমরুৎসূনুসংবাদম্ মোক্ষসাধনম্ দুর্লভম্ অপি রহস্যম্ কথয়িষ্যামি।

**বঙ্গানুবাদ**—অতএব অত্যন্ত গোপনীয় ও দুর্লভ সেই মোক্ষের উপায়স্বরূপ এই রামায়ণে সীতা, রাম ও হনুমানের সংবাদ আমি তোমাকে বলব।

**ভাবার্থ**—হে পার্বতি, এবিষয়ে আমি তোমাকে সীতা, রামচন্দ্র ও হনুমানের কথোপকথন বর্ণনা করে শোনাব; সেই সংবাদ মোক্ষের সাধনস্বরূপ অত্যন্ত গোপনীয় ও পরম দুর্লভ।২৫

পুরা রামায়ণে রামো রাবণং দেবকণ্টকম্।
হত্বা রণে রণশ্লাঘী সপুত্রবলবাহনম্ ॥২৬॥
সীতয়া সহ সুগ্রীবলক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।
অযোধ্যামগমদ্রামো হনূমৎপ্রমুখৈর্বৃতঃ ॥২৭॥

**অন্বয়**—পুরা রামায়ণে রণশ্লাঘী রামঃ সপুত্রবলবাহনম্ দেবকণ্টকম্ রাবণম্ হত্বা হনূমৎপ্রমুখৈঃ বৃতঃ সুগ্রীবলক্ষ্মণাভ্যাম্ সমন্বিতঃ সীতয়া সহ অযোধ্যাম্ অগমৎ।২৬-২৭

**বঙ্গানুবাদ**—প্রাচীনকালে ত্রেতাযুগে রণগর্ব-

শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদের শত্রু রাক্ষসরাজ রাবণকে পুত্র, সৈন্য ও তাঁর বাহনগণকে বধ করে হনুমান প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হয়ে সীতা লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সহ অযোধ্যায় শুভাগমন করেছিলেন।

**ভাবার্থ**--পুরাকালে রাম অবতারে মহাবীর শ্রীরামচন্দ্র দেবগণের কণ্টকস্বরূপ লঙ্কাধিপতি রাবণকে সন্তান, সেনা ও বাহনসমেত যুদ্ধে বধ করে সীতা, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সঙ্গে হনুমান-প্রমুখ বানরগণের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে অযোধ্যায় গমন করেছিলেন।২৬-২৭

অভিষিক্তঃ পরিবৃতো বসিষ্ঠাদ্যৈর্মহাত্মভিঃ।
সিংহাসনে সমাসীনঃ কোটিসূর্যসমপ্রভঃ॥২৮॥

**অন্বয়**—(তদনন্তরম্ রাজ্যে) অভিষিক্তঃ বসিষ্ঠাদ্যৈঃ মহাত্মভিঃ পরিবৃতঃ কোটিসূর্যসমপ্রভঃ (শ্রীরামচন্দ্রঃ) সিংহাসনে সমাসীনঃ (আসীৎ)।

**বঙ্গানুবাদ**—অতঃপর রাজ্যে অভিষিক্ত রামচন্দ্র বসিষ্ঠাদি মহাত্মাগণ পরিবৃত হয়ে কোটিসূর্যের মতো প্রভা ধারণপূর্বক সিংহাসনে সমাসীন হলেন।

**ভাবার্থ**—অযোধ্যায় আগমন করে রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠপ্রমুখ-মহাত্মাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কোটিসূর্যের সদৃশ প্রভা ধারণ করে সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন।২৮

দৃষ্ট্বা তদা হনূমন্তং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্।
কৃতকার্যং নিরাকাঙ্ক্ষং জ্ঞানাপেক্ষং
মহামতিম্॥২৯॥

রামঃ সীতামুবাচেদং ব্রূহি তত্ত্বং হনূমতে।
নিষ্কল্মষোঽয়ং জ্ঞানস্যপাত্রং নো নিত্য-
ভক্তিমান্॥৩০॥

**অন্বয়**—তদা রামঃ পুরতঃ স্থিতম্ প্রাঞ্জলিম্ কৃতকার্যম্ নিরাকাঙ্ক্ষম্ জ্ঞানাপেক্ষম্ মহামতিম্ হনূমন্তম্ দৃষ্ট্বা সীতাম্ ইদম্ উবাচ—অয়ম্ (হনূমান্) নিষ্কল্মষঃ, নো নিত্যভক্তিমান্ (অতঃ) জ্ঞানস্য পাত্রম্। হনূমতে তত্ত্বম্ ব্রূহি॥২৯-৩০

**বঙ্গানুবাদ**—তখন রামচন্দ্র তাঁর সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে, বিনীতভাবে বসে থাকা কৃতকার্য, নিরাকাঙ্ক্ষ, জ্ঞানাপেক্ষ মহামতি হনুমানকে দেখে সীতাদেবীকে এই বললেন: দেবি! তুমি হনুমানকে রামতত্ত্ব বিষয়ে বল; কারণ এই হনুমান নিষ্পাপ এবং আমাদের উভয়ের প্রতি অকপট ভক্তিমান বলে জ্ঞান উপদেশের পাত্র।

**ভাবার্থ**—সেই সময়ে সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান প্রিয় সেবক হনুমানকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে এই কথা বলেছিলেন। হনুমান নিজ প্রভু রামচন্দ্রের সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন, বিনিময়ে তাঁর কিছু পাওয়ার বাসনা ছিল না; তিনি কেবল জ্ঞানলাভের অভিলাষী ছিলেন। তাই শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলেছিলেন—দেবি! এই হনুমান আমাদের উভয়ের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান; অতএব নিষ্পাপ ও জ্ঞানলাভের সুযোগ্য পাত্র। সুতরাং তুমি তাকে তত্ত্বের উপদেশ প্রদান কর।২৯-৩০

তথেতি জানকী প্রাহ তত্ত্বং রামস্য নিশ্চিতম্।
হনূমতে প্রপন্নায় সীতা লোকবিমোহিনী॥৩১॥

**অন্বয়**—তথা ইতি (উক্ত্বা) লোকবিমোহিনী জানকী সীতা প্রপন্নায় হনূমতে রামস্য নিশ্চিতম্ তত্ত্বম্ প্রাহ।

**বঙ্গানুবাদ**—তখন মায়ারূপা জনকনন্দিনী সীতাদেবী 'তাই হোক' বলে শরণাগত হনুমানকে রামের যথার্থ তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব বলতে শুরু করলেন।

**ভাবার্থ**—তখন লোকবিমোহিনী জনকতনয়া সীতা 'আপনার যেমন আদেশ, তাই হবে'—এই কথা বলে শরণাগত হনুমানকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।৩১

সীতোবাচ—

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥৩২॥

আনন্দং নির্মলং শান্তং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্ ॥৩৩॥

**অন্বয়**—( ত্বম্ ) রামম্ অদ্বয়ম্ সচ্চিদানন্দম্ সর্বোপাধিবিনির্মুক্তম্ সত্তামাত্রম্ অগোচরম্ আনন্দম্ নির্মলম্ শান্তম্ নির্বিকারম্ নিরঞ্জনম্ সর্বব্যাপিনম্ আত্মানম্ অকল্মষম্ স্বপ্রকাশম্ পরম্ ব্রহ্ম বিদ্ধি ।৩২-৩৩

**বঙ্গানুবাদ**—সীতাদেবী বললেন : বৎস হনুমন ! তুমি জেনো, শ্রীরামচন্দ্র হলেন পরব্রহ্ম, কারণ তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপাধিরহিত নির্গুণ সৎ স্বরূপ। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নির্মল, শান্ত, নির্বিকার ও সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত। আবার তিনি সর্বব্যাপী স্বয়ং জ্যোতিঃ ভূমানন্দস্বরূপ।

**ভাবার্থ**—বৎস হনুমন! তুমি রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম বলে জেনো; তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত উপাধি-রহিত, সত্তামাত্র, মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, আনন্দঘন, নির্মল, শান্ত, নির্বিকার, নিরঞ্জন, সর্বব্যাপক, স্বয়ংপ্রকাশ ও পাপহীন পরমাত্মা।

লোকবিমোহিনী আত্মশক্তি সীতা পরব্রহ্মের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—তিনি অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ; উপনিষদে বলা হয়েছে—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" (ছান্দোগ্য ৬।২।১ ) অর্থাৎ হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপে বিদ্যমান ছিল। আরও বলা হয়েছে—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" ( তৈত্তিরীয় ২।১।৩ ) অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন উপাধি হতে মুক্ত তুরীয় পর-ব্রহ্ম; বলা হয়েছে—তিনি সত্তামাত্র, সব বস্তুতেই বর্তমান আছেন; কিন্তু বাক্য বা মন দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। উপনিষদে বলা হয়েছে—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ( তৈত্তিরীয় ২।৪ ) অর্থাৎ মনের সহিত বাক্যগুলি তাঁকে লাভ করতে অসমর্থ হয়ে ফিরে আসে; তাই তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি আনন্দঘন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুখস্বরূপ; বলা হয়েছে—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।" ( ছান্দোগ্য ৭।২৩।১ ) অর্থাৎ যা ভূমা, তাই সুখ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। তিনি নির্মল অর্থাৎ রজোগুণহীন এবং শান্ত। উপনিষদে বলা হয়েছে—"প্রপঞ্চো-পশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে" ( মাণ্ডুক্য ) অর্থাৎ তিনি জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের বিরামস্থান, অবিক্রিয়, মঙ্গলময় এবং ভেদবিকল্প রহিত, তাঁকেই তুরীয় পরব্রহ্ম মনে করা হয়। তিনি নির্বিকার অর্থাৎ জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ—এই ছয় রকম ভাববিকারশূন্য। বলা হয়েছে—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্ নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" ( কঠ ১।২।১৮ ) অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি কারণান্তর হতে উদ্ভূত হন নাই; এঁর থেকেও কিছু উৎপন্ন হয় নাই। ইনি জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ; দেহ নষ্ট হলেও তাঁর নাশ হয় না। সেই পরব্রহ্ম রামচন্দ্র হলেন সর্বব্যাপক, পরমাত্মা; বলা হয়েছে—"সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরি-বার্পিতম্। আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ ব্রহ্মোপনিষৎ-পরম্।" ( শ্বেতাশ্বতর ১।১৬ ) অর্থাৎ দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নরূপে অবস্থিত আত্মাকে আত্মবিদ্যা ও তপস্যাদ্বারা লভ্য ব্রহ্ম বলে জানবে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁকে দেখবার জন্য চন্দ্র, সূর্য অথবা অগ্নি—কারও সহায়তা দরকার হয় না; তিনি স্বতঃই প্রকাশমান। বলা হয়েছে—"তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

( কঠ ২।২।১৫ ) অর্থাৎ তাঁরই দীপ্তিতে এ সমুদয় নানাভাবে প্রকাশ পায়। সর্বশেষে বিশেষণ দেওয়া হয়েছে—অকল্মষম্ অর্থাৎ নিষ্পাপ বলা হয়েছে—"এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকঃ"—( ছান্দোগ্য ৮।১।৫ ) অর্থাৎ এই আত্মা পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন ও শোকহীন।৩২-৩৩

মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্।
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা ॥৩৪॥

**অন্বয়**—মাম্ সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্ মূল-প্রকৃতিম্ বিদ্ধি; তস্য সন্নিধিমাত্রেণ অহম্ অতন্দ্রিতা ( সতী ) ইদম্ ( বিশ্বম্ ) সৃজামি।৩৪

**বঙ্গানুবাদ**—আমাকে তুমি সৃষ্টি, পালন ও নাশকারিণী মূলা প্রকৃতি এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণ বলে জানবে। তাঁর সান্নিধ্যেই আমি অনলস হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করি।

**ভাবার্থ**—সীতাদেবী আরও বললেন—আমাকে এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার-কার্যের সম্পাদনকারিণী মূল প্রকৃতি বলে জানবে; আমিই নিরলস হয়ে তাঁর সান্নিধ্যমাত্রেই এই বিশ্বের সৃজন করে থাকি।

পূর্ববর্তী দুটি শ্লোকে পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের যে স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তাঁর পক্ষে জগৎকারণ হওয়া সম্ভব নয়; তাহলে কিভাবে জগতের উৎপত্তি হল?—এই প্রশ্ন স্বাভাবিক-ভাবেই উঠতে পারে। তাই সীতাদেবী বলেছেন, আমাকেই মূল প্রকৃতি বলে জানবে। শ্বেতা-শ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে—প্রকৃতিকে মায়া বলে এবং পরমেশ্বরকে মায়াধিশ বলে জানবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছেন—হে মহাবাহো! এটি আমার অনর্থকারিণী বন্ধনাত্মিকা অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; কিন্তু এ-হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পরা বা প্রকৃষ্টা প্রকৃতি আছে বলে জানবে। জগতের অন্তঃপ্রবিষ্টা সেই জীবভূতা প্রকৃতি জগৎপ্রপঞ্চকে স্বকর্ম দ্বারা ধারণ করে আছে; এখানে বিদ্যা-শক্তি-অবচ্ছিন্ন চেতন-পুরুষকেও প্রকৃতি বলা হয়েছে। এই পরা অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি জগতের সৃজনাদি কর্ম করে থাকে; প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, তিনি নিজে কিছু করেন না। তথাপি তিনি মূলপ্রকৃতি বা মায়ার আশ্রয় হওয়ায় মায়ার কার্য তাঁতে উপচার করে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণে তাঁকে জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মায়াই জগতের উপাদান কারণ যেমন মাটি হল ঘটের উপাদান কারণ; আর মায়া ব্রহ্মের আশ্রিত, তাই আশ্রিতের কার্য আশ্রয়ে উপচরিত হয়ে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে জগতের নিমিত্ত কারণ, যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। আশ্রয় না থাকলে আশ্রিতের অস্তিত্বই থাকে না, তাই এই উপচার; আশ্রিত মায়ার কর্তৃত্ব আশ্রয় ব্রহ্মে উপচরিত হয়েছে। লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝান হয়েছে—যেমন চুম্বকের সান্নিধ্যে থাকলে জড় লৌহ গতিশীল হয়, তেমনই ব্রহ্মের সান্নিধ্যে থেকে মূল-প্রকৃতি মায়া জগতের সৃজনাদি কর্ম সম্পন্ন করে থাকে।৩৪

তৎসান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেঽবুধৈঃ।
অযোধ্যানগরে জন্ম রঘুবংশেঽতিনির্মলে ॥৩৫॥
বিশ্বামিত্রসহায়ত্বং মখসংরক্ষণং ততঃ।
অহল্যাশাপশমনং চাপভঙ্গো মহেশিতুঃ ॥৩৬॥
মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাদ্ভার্গবস্য মদক্ষয়ঃ।
অযোধ্যানগরে বাসো ময়া দ্বাদশবার্ষিকঃ ॥৩৭॥
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধবধ এব চ।
মায়ামারীচমরণং মায়াসীতাহৃতিস্তথা ॥৩৮॥
জটায়ুষো মোক্ষলাভঃ কবন্ধস্য তথৈব চ।
শবর্যাঃ পূজনং পশ্চাৎসুগ্রীবেণ সমাগমঃ ॥৩৯॥

বালিনশ্চ বধঃ পশ্চাৎসীতান্বেষণমেব চ।
সেতুবন্ধশ্চ জলধৌ লঙ্কায়াশ্চ নিরোধনম্ ॥৪০॥
রাবণস্য বধো যুদ্ধে সপুত্রস্য দুরাত্মনঃ।
বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেণ ময়া সহ ॥৪১॥
অযোধ্যাগমনং পশ্চাদ্রাজ্যে রামাভিষেচনম্।
এবমাদীনি কর্মাণি ময়ৈবাচরিতান্যপি।
আরোপয়ন্তি রামেঽস্মিন্নির্বিকারেঽখিলাত্মনি ॥৪২॥

**অন্বয়**—তৎ সান্নিধ্যাৎ ময়া সৃষ্টম্ ( ইদম্ জগৎ ) অবুধৈঃ তস্মিন্ ( পরব্রহ্মণি শ্রীরামচন্দ্রে ) আরোপ্যতে অযোধ্যানগরে অতিনির্মলে রঘুবংশে ( শ্রীরামচন্দ্রস্য ) জন্ম, বিশ্বামিত্রসহায়ত্বম, মখসংরক্ষণম্ ততঃ অহল্যাশাপশমনম্, মহেশিতুঃ চাপভঙ্গঃ, মৎপাণিগ্রহণম্, পশ্চাৎ ভার্গবস্য মদক্ষয়ঃ, ময়া ( সহ ) অযোধ্যানগরে দ্বাদশবার্ষিকঃ বাসঃ, দণ্ডকারণ্যগমনম্, বিরাধবধঃ এব চ, মায়ামারীচমরণম্, তথা মায়াসীতাহৃতিঃ চ, জটায়ুষঃ মোক্ষলাভঃ তথা চ কবন্ধস্য বধঃ, শবর্যাঃ পূজনম্, পশ্চাৎ সুগ্রীবেণ সমাগমঃ, বালিনঃ বধঃ চ, পশ্চাৎ সীতান্বেষণম্, জলধৌ সেতুবন্ধঃ চ, লঙ্কায়াঃ নিরোধনম্ চ, যুদ্ধে সপুত্রস্য দুরাত্মনঃ রাবণস্য বধঃ, বিভীষণে রাজ্যদানম্, ময়া সহ পুষ্পকেণ অযোধ্যাগমনম্, পশ্চাৎ রাজ্যে রামাভিষেচনম্, এবম্ আদীনি কর্মাণি অপি ময়া এব আচরিতানি; ( অবুধাঃ ) অখিলাত্মনি নির্বিকারে অস্মিন্ রামে ( তানি ) আরোপয়ন্তি ।৩৫-৪২

**বঙ্গানুবাদ**—মূর্খগণ মনে করে যে রামই জগৎ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আসলে কেবল তাঁর উপস্থিতিতে আমিই জগৎ সৃষ্টি করি। ( এরপর সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা শুরু করলেন )।

তিনি অযোধ্যানগরে অতি পবিত্র রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পূত যজ্ঞাদি কর্মে রাক্ষসদের বাধাদান করেন, অহল্যার শাপমোচন করেন এবং মহেশ্বরের ধনু ভঙ্গ করে আমাকে বিবাহ করেন, পরে আমার সঙ্গে দ্বাদশ বর্ষ অযোধ্যায় বাস করেন।

শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত হয়ে বিরাধ নামে দৈত্যকে, মৃগরূপী মারীচকে এবং সীতাহরণকারী রাবণকে বিনাশ করেন। তিনি জটায়ু ও কবন্ধের মোক্ষলাভ ঘটিয়ে শবরীর সভক্তি পূজা গ্রহণ করেন। আবার তিনি সুগ্রীবের সাথে চুক্তিবদ্ধও হয়েছিলেন। বালীকে নিধন করে সীতার অন্বেষণ করেন এবং সমুদ্রে সেতু বন্ধন করে লঙ্কা বিজয় করেন। দুষ্ট দশাননকে তাঁর পরিবারবর্গসহ নিধন করে লঙ্কাপুরী বিভীষণকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন।

শ্রীরামের পুষ্পক রথে অযোধ্যায় ফিরে আসা এবং রাজা হওয়ার জন্য অভিষেক এই সকল আমারই ( প্রকৃতি ) দ্বারা সাধিত হয়েছিল।

যদিও নিত্য সর্বান্তরাত্মা তাত্ত্বিকেরা শ্রীরামচন্দ্রই এই সকল করেছেন বলে মনে করেন।

**ভাবার্থ**—শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যমাত্র অবস্থান করে আমি যে সৃজনাদি কর্ম সম্পাদন করে থাকি, বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা সেই সব কর্ম, নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রে আরোপ করে থাকে অর্থাৎ তিনি সৃজন করেন, পালন করেন ও সংহার করেন—এই কথা বলে থাকে। অতএব অযোধ্যাপুরীতে অতিশয় পবিত্র রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ, বিশ্বামিত্রের সহায়তাকল্পে মুনিগণের যজ্ঞরক্ষা, অহল্যার শাপমোচন, হরধনুভঙ্গ, আমার পাণিগ্রহণ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, বার বৎসর যাবৎ আমার সঙ্গে অযোধ্যাপুরীতে বাস, পরে দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ-বধ, মায়ামৃগরূপী মারীচকে বধ করা, মায়াসীতার অপহরণ, তারপর জটায়ু ও কবন্ধের মুক্তি, শবরী কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পূজা, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, বালিবধ, সীতার অন্বেষণ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন, লঙ্কাপুরী অবরোধ, পুত্রগণসহ দুষ্ট রাবণের সংহার, বিভীষণকে রাজ্যদান করে পুষ্পকে

আরোহণ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন এবং সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি কর্ম যদিও আমিই করেছি, তবু নির্বোধ ব্যক্তিরা সেইসব কর্ম এই নির্বিকার সর্বাত্মা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে আরোপ করে থাকে।

এই প্রসঙ্গে "মায়াসীতাহৃতিস্তথা"—এই অংশটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কূর্মপুরাণের ৩৪শ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে সীতাদেবী পূর্বেই রাবণের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন। তিনি প্রতিবিধানের জন্ম অগ্নির স্তুতি করেছিলেন, তাই স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন অগ্নিদেব; তিনি রাবণের স্পর্শদোষ হতে সীতাকে রক্ষা করবার জন্ম তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান। আর রাবণবধের কারণস্বরূপা এক মায়াময়ী সীতা সৃষ্টি করে রেখে যান পঞ্চবটীর কুটিরে। কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে—"আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসা নির্দহন্নিব। সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেচ্ছয়া। সীতামাদায় রামেষ্টাং পাবকোঽন্তরধীয়ত॥" আবার রাবণবধের পর সেই মায়াসীতা শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। মায়াময়ী সীতা অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেলে অগ্নিদেব প্রকৃত সীতাদেবীকে রামের নিকট ফিরিয়ে দেন।৩৫-৪৪ [ ক্রমশঃ ]

# বৈষ্ণব সাহিত্যে মানবতাবাদ

## শ্রীমতী নীলিমা লাহিড়ী

পুরাতন বাংলা সাহিত্য ছিল প্রধানতঃ ধর্ম নির্ভর। হাজার বছরের পুরোণো বাংলা-সাহিত্য চর্যাপদ, বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন কথায় পরিপূর্ণ। এ ছাড়া এই সাহিত্যে বাউল, সুফি—এ-সব সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধর্ম সাধনা ও সাধ্যবস্তু লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথার পশ্চাতে রয়েছে গৌড়ীয় তত্ত্বের প্রতিফলন। বৈষ্ণব যুগের পূর্বের শাক্ত-সাহিত্য, শৈব-সাহিত্য, নাথ-সাহিত্য—এই সব কাব্য কবিতার মধ্যেও একই সুরের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। এমন কি অনুবাদ করতে গিয়ে মধ্য যুগের বাঙালী কবিরা সংস্কৃত মহাকাব্যের পুরুষ-প্রধানদের স্বয়ং ভগবানে রূপান্তরিত করেছেন।

কিন্তু এই ধর্ম-চর্চার পেছনে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, আর এই বিশিষ্ট-চেতনার মধ্যেই ছিল সাধকদের মানব বিশ্বাসের বীজ।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছিলেন—"বাংলা দেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা, প্রেমই হল ধর্মের প্রাণ।"[১] বৈষ্ণব কবিদের রচনায় মর্মস্থলে মনুষ্যহৃদয়ের এমন একটা রাগিণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, যার আবেদন সার্বজনীন ও নিত্যকালীন।

একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য অথবা বৈষ্ণব-সাহিত্য সব কিছুর মূলে ধর্মকে তাঁরা লৌকিক কাব্য-কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

বৈষ্ণব কবিতায় যে মানবিক আবেদন লক্ষ্য করা যায়, তা প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। এই প্রেমলীলা মানবিক প্রেমের আধারেই বিধৃত। বিরহ-মিলন কথায় পরিপূর্ণ বৈষ্ণব পদগুলি স্বভাবতই আমাদের মানুষী প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যে দুটি কিশোর-কিশোরীকে কেন্দ্র করে এ-কাব্য রচিত, যাদের অতুলনীয় প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তি পদাবলী সাহিত্যে রসের নির্ঝর বইয়ে

১ মধ্যযুগীয় ভক্ত কবি, ক্ষিতিমোহন সেন

দিয়েছে, তাদের প্রেমের প্রতি সমাজের নেই কোন সমর্থন।

বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্বের দিক বাদ দিলে আমরা দেখি নায়ক কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নন—এই পৃথিবীরই মানুষ, একটি তরুণ কিশোর। অপর দিকে নায়িকা রাধা ও জীবাত্মার প্রতীক নন—তিনি আয়ানের পরিণীতা। কৃষ্ণের পক্ষে রাধা পরকীয়া। তাই তাদের মিলনের পথে সামাজিক অন্তরায়। এই রাধার কারণেই তাদের প্রেম দুর্বার গতি লাভ করেছে।

এখানেই এর রোমান্টিকতা—কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণকে মানবিক প্রেমের আধারে বিধৃত দেখলেও বস্তুতঃ তাঁরা আলাদা নন—এক, দুই দেহ। শক্তি ও শক্তিমান।

রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, সুতরাং রাধাকৃষ্ণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—চুম্বক ও লোহা।

রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি। দুধ ও ধবলতার মধ্যে যেমন কোন ভেদ নেই, তেমনি তাঁরাও অভেদ। নিত্য রাধা ও কৃষ্ণ অগ্নি ও দাহিকা শক্তির ন্যায় অভিন্ন।

গোপী প্রেম শুদ্ধ প্রেম—এর মধ্যে দেহবুদ্ধি নেই রাধা প্রেমময়ী, এই শুদ্ধ প্রেমের আরাধনায় রাখাল বালক কৃষ্ণ, রাধিকাকে যে আকুতি জানাচ্ছে তার পেছনে রয়েছে অরূপ রসের সন্ধান। দেহ যেন দেবালয়ের প্রদীপ। "আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো"[২] বৈষ্ণব কবি তাঁর ধর্মে ও সাধনায় এ কথাটি প্রমাণের নেশায় মেতে উঠেছিলেন।

ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের প্রকাশ—তাই এই প্রকাশ যাত্রাপথের দুধারে বিস্ময়ের ফুল ফোটে এবং তার সৌরভই প্রেমের সৌরভ। শিহরণ আছে বলেই পুলকের অভাব হয় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধাকৃষ্ণ নামেই দেবমণ্ডলীভুক্ত, চরিত্র একান্তই লৌকিক। কবি কৃষ্ণ চরিত্রকে অমার্জিত গ্রাম্য যুবকের জীবন্ত চিত্ররূপে এঁকেছেন। রাধার মধ্যেও যে মাধুর্যের বিকাশ দেখা যায় তাও বিশেষ ভাবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ রাজসভাকেন্দ্রিক। নগর জীবনের সঙ্গে জড়িত। তাদের মধ্যে দেবত্ব নেই। সম্পূর্ণ মানবিক কিন্তু উদ্দেশ্য—মানবিক থেকে দৈবীতে উত্তরণ।

কবির উল্লিখিত পদগুলির মধ্যেই তার বিচিত্র প্রকাশ—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥[৩]

এই কল্পরূপের সৌন্দর্যের মূর্ছনা যেন রাধার দেহরূপের মধ্যে মানবিক চোখ ধাঁধানো রূপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৈষ্ণব কবিরা শুধু আত্মিক কথা নয়, ভোগ, সম্ভোগ ও প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছেন রাধা ও কৃষ্ণকে। কিন্তু লক্ষ্য—ভোগ থেকে ত্যাগে উত্তরণ। যেন ভোগের লোভ দেখিয়ে ত্যাগে প্রতিষ্ঠা করা।

চৈতন্যোত্তর কবিরা লীলাত্মক বৃত্তির অংশ-রূপেই পদরচনা করতেন। যদিও রাধা তাঁদের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি কিন্তু পদরচনায় তাঁরা মানবিক হৃদয়ানুভূতির তরঙ্গ চাঞ্চল্যই ধরে রেখেছিলেন। কারণ তাঁরা যে নিজেরাই মানুষ। তবে লক্ষ্য মানবিক ভাব বর্জন, দৈবীভাব গ্রহণ।

২ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, গীতবিতান ও বিবিধ কবিতা, পৃঃ ৭২
৩ মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৫৮

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, কবিশেখর প্রভৃতি কবিরা তাঁদের ভাব-ভাবনায় মানবিকতাকেই রূপ দিয়েছিলেন। তবু ঐ-সব কাব্যে তত্ত্ব-ভাবনা অধিকতর পুষ্টি লাভ করেছে বলেই তা উচ্চশ্রেণীর কাব্যসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে তাঁরা ব্যক্ত করেছেন—তাঁদের ধ্যানের মাধ্যমে।

ভগবান অসীম, অনন্ত—আমরা অনন্তকে একটা প্রতীকের মধ্য দিয়ে দেখতে ভালবাসি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রতীক, তিনি বৈষ্ণবের সবিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর বা ভগবান।

তাঁর দুটি রূপ—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য। "একদিকে তিনি যেমন প্রতাপঘন—অন্যদিকে তিনি প্রেমঘন।"[৪]

বৈষ্ণব কবিরা মধুর ভাবের সাধক। মধুর ভাবের আত্যন্তিক অভিব্যক্তির মধ্যেই শ্রীরাধার প্রেম নির্মল, উজ্জ্বল শুদ্ধ-প্রেমের পূর্ণতা লাভ করেছে।

ভগবানকে তাঁরা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। কান্তভাবে ভগবানের আরাধনা মধুর ভাবের লক্ষ্য। তাই বৈষ্ণব কবি পরকীয়া-রাগের প্রেক্ষাপটে শ্রীরাধার এক অপূর্ব মূর্তি এঁকেছেন। মানুষের সাজে, মানুষের বেশে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী—নিত্য-শুদ্ধ-কাম-গন্ধহীন শ্রেষ্ঠ প্রেমের সাধিকা। "এই শুদ্ধা ভক্তিরই অপর নাম প্রেম বা রাগানুগা ভক্তি।"[৫] মাধুর্যভাবে ভগবান আমাদের কাছের মানুষ। তিনি যে শুধু নিভৃত দেবালয়ে আপনাকে প্রকাশ করেছেন তা নয়, জীবকে নিয়েই যেন তাঁর শাশ্বত আনন্দ—"পরমাত্মাকে নিয়ে জীবাত্মার অফুরন্ত আনন্দের আস্বাদন।"

ষোড়শ শতাব্দীতেও দেখতে পাই—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়ে উঠেছিল এবং মহাপ্রভুর মতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য, তাঁর ধাম শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে রাধার বিরহ ব্যথা জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছিল। তাঁর উজ্জ্বল দেহকান্তি শ্রীরাধার অনুরূপ ছিল। তাঁর কৃষ্ণ-প্রেমের মধ্যেও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার তন্ময়তা স্মরণ করিয়ে দিত, যেন তিনি স্বয়ং রাধা।

প্রেমে, ভক্তিতে, বিশ্বাসে, হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যে এই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত নবীন সন্ন্যাসী প্রেমের বন্যায় সারা বঙ্গদেশ ভাসিয়েছিলেন। সেই প্রেমসিন্ধু থেকেই পদাবলীরূপ কৌস্তভমণির উদ্ভব হয়েছে।

চৈতন্য-পরবর্তী কবিরা প্রেমের এই জীবন্ত মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে বা কবি-মানসে রেখে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেম-গীতিহার রচনা করেছেন। এই অনুভূতির মধ্যে যে প্রেমের প্রকাশ তা সাধারণ নর-নারীর প্রেম বলে গ্রহণ করা চলে না।

"সৃষ্টির আদিম লগ্ন থেকে জীব আর ঈশ্বরের মধ্যে যে লীলা চলেছে, বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ তারই রূপক আবরণ।"[৬]

তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন, যে-আকুতি অর্পণ করতে হবে দেবতার উদ্দেশ্যে তা সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে, রূপ ও রসের মধ্য দিয়ে তাকে মানবীয় অনুভূতিতে সার্থক করে তুলতে হবে।

বৈষ্ণব কবিরা অক্ষয় ভূমানন্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই বুঝি রাধাকৃষ্ণকে অজানা বৈকুণ্ঠে ঠেলে রেখে স্বস্তি

৪ রচনা বিচিত্রা, শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু, পৃঃ ৫০

৫ ঐ, পৃঃ ৫১

৬ ঐ, পৃঃ ৫৮

পাননি, শ্রদ্ধাভরে নামিয়ে এনেছিলেন আমাদেরই এই মাটির পৃথিবীতে।

ভাগবত প্রেমকে দূর থেকে সম্ভ্রমভাবে পুষ্পের অর্ঘ্য না দিয়ে রোমান্টিক প্রেমরূপে এই মানুষের বুকের মধ্যে চেপে প্রাণভরে অনুভব করেছিলেন। তাঁরা একদিকে প্রেমিক অপর দিকে ভক্ত।

"দেবতারে প্রিয় করি—প্রিয়েরে দেবতা"[৭]—এখানে—"বাঙালী বৈষ্ণব কবির কাব্যে দেবতা আর প্রিয়তম একাকার হয়ে গিয়েছে।"

শিল্পী যেমন তিলে তিলে তাঁর শিল্প-সৃষ্টিকে অনিন্দ্যসুন্দর করে তোলে এবং তার ভেতর রূপ খুঁজে বেড়ায়, এ-ও ঠিক তাই, বুকের মাঝে দেবতার মূর্তি—বাইরে মানব সত্তা—আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তাঁরা এঁকে চলেন মূর্তির পর মূর্তি। নব নব রূপ-বিন্যাসে উছলে ওঠে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থল। আনন্দের মাঝেই বুঝি মিলনের উৎস।

বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্য-লীলার বর্ণনা করেছেন সেখানেও দেখতে পাই শিশু কৃষ্ণের মধ্যে মাতা যশোদা আনন্দের কোন সীমানা খুঁজে পান না। চপল দুরন্ত অবোধ শিশুটিকে ঘিরে যশোমাতার স্নেহামৃত উছলে পড়ছে। এর মাঝেও বাৎসল্য রসের মধ্যে ঐ মানবিক আবেদন ফুটে উঠেছে।

সন্তানের প্রতি এই যে আকুলতা, প্রত্যেক মায়ের মধ্যেই তা চিরন্তন।

"আগম-নিগম-বেদ-সার" যিনি এখানে, তিনিই আবার পিতামাতার বুক জোড়া ধন—স্নেহের দুলাল।

ভক্তি বা প্রেম যেখানে গভীর, আচার-বিচার-পূজা অনুষ্ঠান সব সেখানে তুচ্ছ

ব্রজধামে ব্রজগোপীগণও কৃষ্ণকে পূজা-পাঠ দ্বারা দূরে সরিয়ে রাখেননি। কৃষ্ণকে তাঁরা স্নেহ, প্রেম ও সখ্যতা দিয়েই পরমাত্মীয় করে নিয়েছেন। এই বোধ বৈষ্ণবপদাবলীর বাৎসল্য পদগুলির রূপ-রসে ভরে আছে—সৃষ্টি সার্থক হয়েছে।

বৈষ্ণব কবিদের এই মানবীয় রস-মাধুর্য পরবর্তিকালের শাক্ত পদাবলীকেও প্রভাবিত করেছে। ধরণীর ধূলিমাখা জীবনের প্রতি মমত্ব-বোধ শাক্ত পদাবলীকে মাধুর্য দান করেছে।

সুতরাং বলা যায়, সাহিত্যে মানবতাবোধের প্রকাশ—বিশেষ করে জীবন চরিত গ্রন্থ রচনায় বৈষ্ণব কবিরা মানুষকে অবলম্বন করে তার তথ্য-পূর্ণ জীবন-কাহিনীর অনুসরণ করে যে মানবরস রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার অভিনবত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

চৈতন্য চরিতে তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করা হলেও তাঁর মানবরূপ কোথাও অপ্রকাশিত থাকেনি।

এইভাবে মৌলিক কাব্য-সাধনার বিভিন্ন শাখায়, বাঙালী কবিরা মানবরসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সেখানে দেব মাহাত্ম্য পটভূমিতে পর্যবসিত হয়েছে।

বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ ধরে ধরে চলেছে। "কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গও আঁকিয়াছেন—কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন—তাহাদের আঁকা ছবি যে সত্য, চৈতন্যদেব তাহারই প্রমাণ।"—

এখানেই তাঁদের সার্থকতা।

৭ সপ্তয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য পল্টু

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

জগন্মাতা ভবতারিণী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে।" দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে সকল মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় যখন কাঁসরঘণ্টা বাজত, তখন কুঠির ছাদ হতে শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিতেন, "ওরে ভক্তেরা, তোরা কে কোথায় আছিস, শীঘ্র আয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৪)।

শ্রীরামকৃষ্ণের আকুল আহ্বানে একে একে গৃহী ও যুবা ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে আসতে আরম্ভ করলেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হতে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এলেন অনেক ছোকরা ভক্তেরা—সুবোধ, ছোট নরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র ও হরিপদ। শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ভক্তদের পরিচয় আমাদের অজানা থেকে গেছে। এরূপ একজন ছোকরা ভক্ত পল্টুর ছোট্ট পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে এই প্রবন্ধে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজারের মেট্রোপলিটন ইন্স্টিট্যুটের ছাত্র ছিলেন পল্টু। বাড়ি বাগবাজার অঞ্চলে কম্বুলিয়াটোলাতে—বর্তমানের হেমচন্দ্রকর লেনে! তেজচন্দ্র, নারায়ণ, হরিপদ, বিনোদ, ছোট নরেন প্রমুখ বাগবাজার অঞ্চলে বহু ছেলে, যারা অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বাবুরাম (পরবর্তিকালে স্বামী প্রেমানন্দ) ও সারদাপ্রসন্ন (পরবর্তিকালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) পড়তেন ঐ মেট্রোপলিটনে। প্রধান শিক্ষক ছিলেন 'ছেলেধরা মাস্টার' শ্রীম। শ্রীম-ই এ সকল ঈশ্বরানুরাগী ও শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেদেরকে পৌছে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চরণতলে। তাঁরাও ধন্য হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শনে।

পল্টুর আসল নাম প্রমথ চন্দ্র কর। পিতা হেমচন্দ্র ও মাতা কৃষ্ণভাবিনীর তৃতীয় সন্তান পল্টু। পল্টুর ছিল আরও চার ভাই—অতুলচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র এবং তিন বোন ভবতারিণী, আতরমণি ও ত্রৈলক্যতারিণী। (কম্বুলিয়াটোলার কর-বংশের ইতিবৃত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র কর, পৃঃ ৫৯)। হেমচন্দ্র প্রথমে পুলিশের দারোগা, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ভারতে বিভিন্ন স্থানে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন হেমচন্দ্র। স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। নিজের মেয়েকে বেথুন স্কুলে পাঠিয়ে এ-বিষয়ে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। হেমচন্দ্রও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিলেন। তবে তিনি মানী লোক ছিলেন। এ-প্রসঙ্গে পরে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে বলেছিলেন ভক্ত শ্যামবসুকে, "হেম দক্ষিণেশ্বরে যেতো। দেখা হলেই আমায় বলতো, 'কেমন ভট্টচার্যমশাই! জগতে এক বস্তু আছে;—মান'?" (কথামৃত, ১।১৮।৩)। মা কৃষ্ণভাবিনী ছিলেন কুমারটুলীর বিখ্যাত মিত্র বংশ ভৈরব মিত্রের বাড়ির মেয়ে। পল্টুর জন্ম হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুর জেলার গড়বেতাতে। তখন হেমচন্দ্র ছিলেন ওখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে পল্টু ভর্তি হন এ্যাসেম্ব্লি ইন্স্টিট্যুটে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ)। এখান হতে বি. এ পাশ করেন

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পল্টুর প্রথম উল্লেখ আছে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর তারিখে। (কথামৃত, ১।১৩।১)। ছোট নরেন, বিনোদ, হরিপদ প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। এ-ভাবে পল্টু শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যসঙ্গ লাভ করেন মোট সাতবার। দক্ষিণেশ্বরে ও কলকাতার ভক্তবাড়িতে উপরোক্ত তারিখ ব্যতীত, তাঁদের সাক্ষাতের দিনগুলি হল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ, এপ্রিলের ৬ ও ১২, ৯ ও ২৩ মে এবং ২৩ অক্টোবর। প্রথম দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন পুঁথিকার—"আইল প্রমথচন্দ্র অতি চমৎকার।/বালক বয়েস তাঁর বাপ মাজিস্টর ॥/ গণ্যমান্ত জানা নাম হেমচন্দ্র কর।/ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল বহু প্রভুর উপর ॥" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন (১৩৮৮), পৃঃ ৪০৯)

পল্টুকে খুবই স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কারণ, শ্রীভগবানের বেশি প্রকাশ শুদ্ধাত্মাদের মধ্যে। ভক্তদের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পল্টুর ধ্যান হয় না বলে। বলছেন, "আচ্ছা সব্বাই বলে, বেশ ধ্যান হয়, পল্টুর ধ্যান হয় না কেন?" (কথামৃত,২।২৩।৩১)। একদিন দক্ষিণেশ্বরে রঙ্গরসপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করছেন বালক ভক্তদের সঙ্গে। তিনি তাঁদের অভিনয় দেখাচ্ছেন কীর্তনীর ঢং-এর। কীর্তনী সেজেগুজে গান গাইছে দলের সঙ্গে। সে হাতে রঙিন রুমাল দিয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ঢং করে কাসছে, মধ্যে মধ্যে নথ তুলে থুথু ফেলছে। অভ্যর্থনা করছে যখন আসরে উপস্থিত হচ্ছেন কোন সম্রান্ত ব্যক্তি। আবার কখন কখন হাতের কাপড় সরিয়ে দেখাচ্ছে তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি প্রভৃতি অলংকার। অভিনয় দৃষ্টে সকল ভক্তেরা হেসে লুটোপুটি। পল্টু হেসে দিচ্ছেন গড়াগড়ি। পল্টুর দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন শ্রীমকে, "ছেলেমানুষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে আবার পল্টুকে সাবধান করে দিচ্ছেন তাঁর 'ইংলিসম্যান' বাবাকে না বলার জন্য। কারণ, পাছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি টানের কমতি হয়ে যায় পল্টুর। ঐদিনই ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বলে দিচ্ছেন ভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা। পল্টুর সম্বন্ধে বললেন, "তোরও হবে, তবে একটু দেরীতে হবে।" (কথামৃত, ৩।১২।২)।

পল্টুর বাড়ির লোকেরা পছন্দ করতেন না শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা। কিন্তু বাধা মানতেন না পল্টু। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গ উপভোগ করতেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন বলরাম মন্দিরে। এত কাছে তিনি! তাঁকে দর্শন না করে থাকতে পারলেন না পল্টু। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে। খুব খুশি শ্রীরামকৃষ্ণও। সহাস্যে পল্টুকে জিজ্ঞাসা করছেন, "তুই তোর বাবাকে কি বললি। (মাষ্টারের প্রতি)—ওর বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে আসবার কথায়। (পল্টুর প্রতি)—তুই কি বললি?

পল্টু—বললুম, হাঁ আমি তাঁর কাছে যাই, এ কি অন্যায়? (ঠাকুর ও মাষ্টারের হাস্য)। যদি দরকার হয় আরো বেশী বলব।" (কথামৃত, ৩।১৩।১)

আর একদিন বলরাম মন্দিরে ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশ ঘোষের মধ্যে চলছে বিচার-বিতর্ক। বিষয়—ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন কিনা। পল্টুও উপস্থিত। সকলে শুনছেন মনোযোগ সহকারে। বিতর্কের মধ্যেই প্রসঙ্গ উঠেছে দেবতাদের অমরত্ব নিয়ে। এতে গিরিশের কাছে প্রমাণ চাইলেন নরেন্দ্রনাথ।

সহাস্যে পল্টু নরেন্দ্রনাথকে বললেন, "অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।" হাসতে হাসতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে।" (কথামৃত, ৩।১৫।২)।

শ্রীরামকৃষ্ণের জাগতিক লীলা সাঙ্গ হবার পর পল্টু তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তিনি আজীবন সম্বন্ধ রেখেছিলেন তাঁদের সঙ্গে। পরবর্তিকালে পল্টু আইন জগতে প্রবেশ করে খ্যাতি লাভ করেন। প্রথমে ঘোষ এ্যাণ্ড ঘোষ সলিসিটর কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করার পর পাকাপাকিভাবে আইন ব্যবসা শুরু করেন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল হতে। পরে ঘোষ এ্যাণ্ড ঘোষ কোম্পানীটি পল্টুর হাতে আসে। তখন তিনি পার্টনারশিপ নিয়ে ফার্মের নতুন নাম করেন কর মেটা এ্যাণ্ড কোম্পানী। এই সূত্রে মঠ-মিশনের যখনই কোন আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রয়োজন হয়েছে, পল্টু সানন্দে দিয়েছেন আইনগত সুপরামর্শ স্বামীজী মঠের 'ট্রাস্ট ডীড' রেজিস্ট্রেশন করেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুআরি। এই রেজিস্ট্রেশনে পল্টু শুধু সাক্ষী ছিলেন না, ডীড প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্য।

পল্টু বিয়ে করেন হাওড়া জেলার খোড়পের (আন্দুলের কাছে) গিরিন্দ্র বসু মল্লিকের কন্যা সরযূবালাকে। তাঁদের ছিল এক পুত্র বিজন ও দুই কন্যা—কমলাবালা ও স্বর্ণলতা। কমুলিয়াটোলার পৈত্রিক বাসভবন ত্যাগ করে পল্টু চলে আসেন ইলিসিয়াম রোড ও ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভাড়া বাড়িতে। পরে ৭/১ হেলাম রোডে পল্টু নিজবাড়ি তৈরি করেন। এখানেই তিনি সপরিবারে উঠে আসেন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং আমৃত্যু বসবাস করেন।

পল্টুর একমাত্র পুত্র বিজন যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। বিজন তখন স্কুলের ছাত্র। বয়স উনিশ বছর। পল্টু তাঁর কোন চিকিৎসার ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু দিনের পর দিন বিজন এগিয়ে যাচ্ছিল শেষ পরিণতির দিকে। এতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন পল্টু। ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি পুত্র বিজনসহ সপরিবারে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আলমোড়াতে যান ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। মহাপুরুষ মহারাজ তখন কনখলে। গুরুভাই-এর সপ্রেম আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না মহাপুরুষ মহারাজ। তিনি চলে এলেন আলমোড়াতে পল্টুর কাছে সান্ত্বনা দেবার জন্য। একটি চিঠিতে লিখছেন শিবানন্দজী (১২।৭।১৩), "শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে পল্টুর নাম বোধহয় পড়িয়াছ। তাঁহার একমাত্র পুত্র, বয়স প্রায় ১৯ বৎসর, উত্তম লেখাপড়া করিতেছিল; কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ অত্যন্ত কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় কলিকাতার সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি এখানে বিগত এপ্রিল মাসে তাহাকে এবং বাড়ির অন্যান্য কতকগুলিকে অর্থাৎ স্ত্রী, ভগিনী, ভাগিনেয় প্রভৃতিদের লইয়া আসিয়াছেন। তিনি এখানে একলা, অন্য কোন কাজকর্ম নাই; সর্বদাই দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছিলেন। সেজন্য কনখলে আমায় লেখেন, যেন আমি এখানে আসি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাবার্তা এবং শাস্ত্রাদি আলাপ করিয়া দুর্ভাবনা সকল দূর করা এবং ভক্তি-বিশ্বাস যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা, এই উদ্দেশ্য।" (মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, ১৩৮৭ পৃ: ৬২)। এতে পল্টুর মানসিক অশান্তি আংশিকভাবে দূর হয়েছিল। সে-সময় পল্টুকে সর্বদা প্রার্থনারত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ-মনন করতে দেখা যেত। সেখানে তাঁরা প্রায় আট মাসের মতো ছিলেন। পরে কলকাতায় ফিরে আসেন পল্টু। এভাবে রোগভোগের পর বিজন

পার্থিব মায়াবন্ধন ছিন্ন করে স্বধামে চলে যান ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর পল্টু পুত্রশোকে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তখন হতেই যক্ষারোগ নিবারণ কল্পে তিনি নিজেকে বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে নিয়োজিত করেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতি জনহিতৈষী ব্যক্তিদের সহায়তায় গড়ে তোলেন যাদবপুর টি. বি হাসপাতাল। এজন্য তিনি নিজে প্রচুর অর্থ দান করেন এবং সংগ্রহ করে দেনও অনেক অর্থ। তিনি ছিলেন এই হাসপাতালের আজীবন ট্রাস্টী। কার্শিয়াং-এ রায় বাহাদুর শশীভূষণের সাহায্যে পল্টু প্রতিষ্ঠা করেন 'After Care Home for Tuberculosis Patient' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এখানেও অনেক টাকা দান করেন। পরে এই প্রতিষ্ঠানটি 'S. B. Sanatorium' নামে এক বিরাট হাসপাতালে পরিণত হয়।

পল্টু ছিলেন শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তাঁর দান অনেক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছিলেন সক্রিয় সদস্য। তিনি ছিলেন অতিথি-পরায়ণ, দীনের সেবক, আতুরদের প্রতি হৃদয়বান। স্পষ্টবাদী ছিলেন বলে লোকে তাঁকে ভুল বুঝত। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ডাঃ নীলরতন সরকার, স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী, আই. সি. এস., জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, আই. সি. এস., একাউন্টেণ্ট জেনারেল উপেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি খ্যাতিমান ব্যক্তিরা। দেশবন্ধু যখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও অর্থ দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন তিনি বহুকাল বন্ধুর আতিথ্য স্বীকার করে পল্টুর বাস-ভবনে থেকেছেন।

পল্টুর দিন ফুরিয়ে এল। তিনি নিজ বাড়িতে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। কথামৃত পড়ে শোনান হচ্ছে। স্বামীজীর অন্তিমকালে তাঁর দেহের উপর স্থাপিত শালটি পল্টু সযতনে নিজের কাছে রেখেছিলেন।[১] সেটি স্পর্শ করছেন বারবার। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনতে শুনতে ও স্মরণ করতে করতে পল্টু ইহধাম ত্যাগ করেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ অগস্ট। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকা শোক প্রকাশ করে লিখেছিল, "The Ramakrishna Math & Mission used to count him as one among its sincerest friends and well-wishers. We deeply mourn his loss and offer our sincere condolences to the bereaved family." (প্রবুদ্ধ ভারত নভেম্বর, ১৯৩৭, পৃঃ ৬২০)।

১ এই শালটি পল্টুর দেহান্তের পর তাঁর দৌহিত্ররা কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটিকে প্রদান করেন।

[ প্রফুল্লচন্দ্র কর কর্তৃক সংগৃহীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত (১৯৫৯) 'কম্বুলিয়াটোলার কর বংশের ইতিবৃত্ত' পুস্তক হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রফুল্লচন্দ্র করের লিখিত নোট (তারিখ ১৭।৪।১৯৮১) এবং পল্টুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অতুলচন্দ্র করের পুত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ করের লিখিত পত্র (তারিখ ২৫।৪।১৯৮১ ও ২৮।৫।১৯৮১) হতে পারিবারিক অনেক সংবাদ পাওয়া গেছে।—লেখক। ]

# অজ্ঞান এবং জ্ঞান

## স্বামী বেদান্তানন্দ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে 'অজ্ঞান' এবং 'জ্ঞান' শব্দ দুইটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দ দুইটি কোন্ শ্লোকে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিয়া, অজ্ঞান কাহাকে বলে, জ্ঞানেরই বা স্বরূপ কি—তাহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—এই দুই প্রকার সাধন পর্বের কথা বলিয়াছেন। জগতে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু মানুষ স্বভাবতঃ অন্তর্মুখ, বিচার প্রবণ। তাঁহারা জন্মমরণের রহস্য বুঝিতে, নিজের যথার্থ স্বরূপ জানিতে আগ্রহী। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানযোগ অবলম্বনে ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকার সাধনা গ্রহণীয়। কিন্তু জগতের অধিকাংশ মানুষ বহির্মুখ, সর্বদা নানা কাজে ব্যস্ত থাকা, তাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। এইরূপ ব্যক্তিদের পক্ষে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানরূপ কর্মযোগের সাধনা অবলম্বনীয়।

ঐ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে 'অজ্ঞ' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে, আত্মার স্বরূপ বিচারে যে-সকল ব্যক্তি অসমর্থ, যে-সকল অজ্ঞানীদের কর্মানুষ্ঠানের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি আছে তাহাদিগকে 'আত্মা অকর্তা' এই প্রকার উপদেশ দিবে না। কেননা ঈশ্বরার্থে কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হইলে, অশুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞানের উদ্ভব হইতে পারে না। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি, সকল কর্মনিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া অজ্ঞানী ব্যক্তিগণকে কর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবেন।

ঐ অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক শ্লোকের 'সর্বজ্ঞান বিমূঢ়ান্' এই পদের সর্বজ্ঞান বলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথিত নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান বিষয়ক সিদ্ধান্ত এবং আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিষয়ক উপদেশ—এই দুই প্রকার জ্ঞানের কথা বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকটির তাৎপর্য, যে-সকল বিবেকহীন ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্বক ঈশ্বরের প্রীতিসম্পাদনের উদ্দেশ্যে কর্মানুষ্ঠানবিষয়ক অনুশাসনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং নিষ্কাম কর্ম করে না, অথচ আত্মার স্বরূপ অবগতির ফলে যাহারা কর্মত্যাগে অসমর্থ, তাহাদের জীবনধারণ বৃথা।

ঐ অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোকের 'জ্ঞানবান্' পদের অর্থ, কর্মের দোষ বা গুণ সম্পর্কে জ্ঞান-সম্পন্ন। এই জ্ঞান শাস্ত্র, অন্যের উপদেশ অথবা নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ হইতে পারে। এই শ্লোকের বক্তব্য,—কোন কাজের দোষ বিষয়ে জ্ঞানবান ব্যক্তিও অতীতে কৃত কর্ম বা চিন্তা হইতে উৎপন্ন সংস্কারের বশীভূত হইয়া কাজ করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই সংস্কারের বশে চালিত হয়। 'ইন্দ্রিয় সংযম করিব' মনে করিলেই করা যায় না।

ঐ অধ্যায়ের ৩৯ ও ৪০ শ্লোকে ব্যবহৃত জ্ঞান পদটি দোষ ও গুণ বিষয়ক জ্ঞান বুঝাইতেছে। সেইরূপ, জ্ঞানবান্ পদটি 'সাধারণভাবে জ্ঞান-সম্পন্ন' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কামপ্রবৃত্তি বা ইচ্ছা জ্ঞানীর নিকট চিরশত্রুরূপে প্রকাশ পায়। কেন না, জ্ঞানীব্যক্তি কর্মোপভোগের দোষ ভোগকালে অনুভব করেন। অন্যপক্ষে বিবেকহীন ব্যক্তি ভোগকালে সুখ অনুভব করে। ইন্দ্রিয়সমূহ মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয়; এই সকলের আশ্রয়ে থাকিয়া কাম মানুষকে মোহিত করে।

ঐ অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক শ্লোকে কাম বা ইচ্ছাকে 'জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্' বলা হইয়াছে। প্রবল ভোগেচ্ছা মানুষের শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ জনিত জ্ঞান এবং স্বীয় অনুভবকে অভিভূত করিয়া প্রকাশ পায়। অতএব প্রাথমিক কর্তব্য হইতেছে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে সংযত করিয়া কামকে আশ্রয়চ্যুত করা।

গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত। এই অধ্যায়ের অধিকাংশ শ্লোকে আত্মজ্ঞানের সাধন ও তাহার ফল কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক শ্লোকের তাৎপর্য এইরূপ—যে ব্যক্তির মন হইতে কামনা চলিয়া গিয়াছে, 'এই কর্মে এই ফললাভ হইবে' এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া কোন কাজে প্রবৃত্ত হন না, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং নিজেকে আর কোন কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না। এই জ্ঞানোৎপত্তির ফলে, তিনি দেহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে কর্ম করেন তাহা পাপ-পুণ্য উৎপত্তির কারণ হয় না। এই প্রকার ব্যক্তি যথার্থ পণ্ডিত। তিনি যে কেবল শাস্ত্রের অর্থ জানেন তাহা নয়, শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁহার জীবনে প্রকাশিত হয়।

ঐ অধ্যায়ের ২৩ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে বিষয়াসক্তি রহিত এবং সকল ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিদ্বেষশূন্য ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদনের জন্য যে কাজ করেন তাহা তাঁহার সুখ বা দুঃখ উৎপত্তির কারণ হয় না। তাঁহার চিত্ত সকল সময় জ্ঞানে অবস্থিত থাকায় 'আত্মা কর্ম করেন এবং কর্মের ফল ভোগ করেন'—এই প্রকার মিথ্যা ধারণা চলিয়া যাওয়ার ফলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কৃত কর্মের ফল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ঐ অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞকে উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। বিবিধ দ্রব্য দ্বারা কোনও দেবতার অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে ইহজীবনে সুখ এবং মরণের পর স্বর্গ লাভ হয়। কিন্তু এই সুখভোগ চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার আর ক্ষয় বা বিনাশ নাই। আত্মার স্বরূপ যথাযথ অনুভব করিতে পারিলে মানুষ পরমানন্দের অধিকারী হয়।

ঐ অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে, আত্মজ্ঞান গুরুর উপদেশ হইতে লাভ করিতে হইবে। গুরু কেবল শাস্ত্রজ্ঞ হইলে চলিবে না, যে ব্যক্তির আত্মস্বরূপের যথার্থ অনুভব হইয়াছে কেবল তাঁহার উপদেশের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। প্রণাম, প্রশ্ন এবং সেবা—জ্ঞান-লাভের এই তিন সাধন। যিনি জ্ঞান লাভ করিতে আগ্রহী তাঁহাকে নম্র ও বিনয়ী হইতে হইবে। জ্ঞানী গুরু উদ্ধত ব্যক্তিকে উপদেশ দেন না। শিষ্যের অন্তরে জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি প্রবল থাকা চাই; তিনি মন দিয়া শুনিবেন এবং বিচার করিবেন আর শিষ্যকে সেবাপরায়ণ হইতে হইবে।

ঐ অধ্যায়ের ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে আত্মজ্ঞানকে নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। নদী বা সমুদ্র পার হইতে হইলে যেমন সুদৃঢ় নৌকার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ জীবনে কৃত সমস্ত পাপ কর্মের ফল ভোগ হইতে ত্রাণ পাওয়ার উপায় স্ব-স্বরূপের অনুভূতি। অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিও যদি অনুভব করিতে পারে যে আত্মা নিত্যশুদ্ধ এবং নিষ্ক্রিয়, তাহা হইলে সকল অপকর্মের ফলভোগ হইতে নিস্তার লাভ করে।

ঐ অধ্যায়ের ৩৭ সংখ্যক শ্লোকে আত্মজ্ঞানকে আগুনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠস্তূপকে ভস্মে পরিণত করে, আত্মজ্ঞান লাভের ফলে সেইপ্রকারে সকল কর্মের ফল নষ্ট হইয়া যায়।

ঐ অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে সকল প্রকার সাধনার মধ্যে জ্ঞানযোগ সর্বাপেক্ষা পবিত্রতা সম্পাদক। তবে, ইহার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। দীর্ঘকাল নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ চিত্তে আত্মার যথার্থ স্বরূপের অনুভব হয়। এই কারণে সকলে জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে না।

ঐ অধ্যায়ের ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধকের যোগ্যতা নির্ণীত হইয়াছে। সাধককে গুরুর উপদেশের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে, তিনি আত্মার স্বরূপ বিচার ব্যতীত অন্য চিন্তাকে মনে স্থান দিবেন না, তিনি জিতেন্দ্রিয় হইবেন—তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় বা মন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। এই প্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন সাধক অল্প সময়ের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন, তাঁহার যাবতীয় দুঃখের নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়।

ব্রহ্মানুভবের দ্বিবিধ সাধনার বিষয়ে কর্মযোগ-নিষ্ঠা এবং আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা সম্পর্কে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত দুই নিষ্ঠার শেষ কথা বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের আরাধনা-রূপ কর্মের অনুষ্ঠান এবং কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে যিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন, আত্মজ্ঞান উৎপত্তির ফলে যাঁহার 'আত্মা কোন কর্ম করেন না' এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে, নিজেকে শরীর বলিয়া ভ্রম যাঁহার আর হয় না, যিনি প্রমাদগ্রস্ত হন না, তিনি দেহের স্বাভাবিক আহার নিদ্রাদির দ্বারা অথবা অপরের কল্যাণের জন্য কৃত কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না, অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ করেন না।

অর্জুন কর্মত্যাগের অধিকারী নহেন বলিয়া শ্রীভগবান তাঁহাকে কর্মযোগের উপদেশ দিতেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের ৪২ সংখ্যক শ্লোকে বলিতেছেন, হে অর্জুন, যেহেতু যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য ইহা তুমি বোঝ অথচ দেহের নাশের সঙ্গে আত্মার নাশ হয় কিনা, এ-বিষয়ে তোমার যে সন্দেহ, আত্মস্বরূপ বিচারের দ্বারা তাহা অপসারিত কর এবং ফলকামনা ত্যাগপূর্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

পঞ্চম অধ্যায়ের ১৫ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে, অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। এখানে অজ্ঞান বলিতে, যে ভ্রমবশতঃ সর্বদা পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎকে সর্বদা একরূপ ও সত্য বলিয়া ধারণা হয় সেই ভ্রম। আর, জ্ঞান বলিতে পরমেশ্বর সর্বদা সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান এই প্রকার বোধ। এই শ্লোকটির তাৎপর্য এইরূপ—ঈশ্বর সর্বদা পরিপূর্ণ; তাঁহার কোন প্রয়োজন বা অভাববোধ নাই। তিনি কোন ব্যক্তির দ্বারা কৃত সৎকর্মের অথবা পাপ-কর্মের ফল গ্রহণ করেন না। মানুষ অজ্ঞান-বশতঃ নিজেকে নানা প্রকার কর্মের কর্তা এবং সে-সকল কর্মের ফলে উৎপন্ন ফলের ভোক্তা মনে করিয়া সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। সে আরও মনে করে, ঈশ্বরই তাহাকে দিয়া সৎ ও অসৎ কর্ম করাইতেছেন।

ঐ অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা মোহাভিভূত হন না। জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের ভেদজ্ঞানের উৎপাদক অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সেই জ্ঞান অজ্ঞান দূর করিয়া আত্মার এবং ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে। সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার চলিয়া যায় এবং ফলে জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হয়, বস্তুসমূহকে প্রকাশের জন্য সূর্য পৃথক চেষ্টা করে না।

ঐ অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে

আত্মার স্বরূপের জ্ঞান হওয়ার ফলে যাঁহাদের সকল প্রকার মানসিক মলিনতা নষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা নিজেদিগকে অহংকার হইতে ভিন্ন আত্মাকে জানিয়াছেন তাঁহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; ইহজীবনেই তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের মন ও বুদ্ধি সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় লিপ্ত থাকে; তাঁহারা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু জানেন না, একমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা কালাতিপাত করেন।

ঐ অধ্যায়ের ২৯ সংখ্যক শ্লোকে 'জ্ঞাত্বা' অর্থাৎ 'জানিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হইয়াছে। কেবল ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। 'আমি কর্তা নই, ঈশ্বরই সকল কর্মের কর্তা' এই জ্ঞানের ফলে চিরশান্তি লাভ হয়। এই জ্ঞান লাভ হইলে ঈশ্বরকে আর দূরে আছেন বলিয়া মনে হয় না, তখন অনুভব হয়, মানুষ যে যজ্ঞ তপস্যা করে ঈশ্বর সে সকল গ্রহণ করেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা এবং সকল প্রাণীর একান্ত আপনজন।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম ধ্যানযোগ। এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে চিত্ত সংযমরূপ যোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ৪৬ সংখ্যক শ্লোকে জ্ঞানী অপেক্ষা যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এখানে জ্ঞানী বলিতে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন কিন্তু যাঁহার আত্ম-স্বরূপের অনুভব হয় নাই, এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর এই শ্লোকে যোগী বলিতে, সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া যিনি মনকে আত্মসংস্থ করিতে সমর্থ সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞাতব্য বষয় উহার অনুভবের ফলসহ বলিবেন; যে বিষয় জানা হইলে জীবনের সাফল্যসম্পাদনের জন্য কিছু জানার অবশিষ্ট থাকে না।

ঐ অধ্যায়ের ১৫ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, যে সকল হীনবুদ্ধি মানবের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয় তাহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয় না। এখানে জ্ঞান বলিতে শাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে।

ঐ অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী—এই চারি শ্রেণীর মানবের ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলেই কিছু না কিছু সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; তাহা না করিয়া থাকিলে তাঁহাদের ভজনের ইচ্ছা হইত না। এই শ্লোকের জ্ঞানী পদের অর্থ, যিনি আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ অবগত হইয়াছেন।

ঐ অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে, উক্ত চার শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানী-ভক্ত ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সেই ভক্তের নিকট ঈশ্বর পরম প্রিয়। 'আমি শরীর এবং আমার শরীর' এই প্রকার অজ্ঞান না থাকায় জ্ঞানী-ভক্তের মন কোন ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তাই সকল সময় ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকেন; নিত্য ঈশ্বরের সহিত যুক্ত থাকেন। আর তিনি এক-ভক্তি; তাঁহার নিকট ভক্তি করার উপযোগী কোন দেবতা থাকেন না।

ঐ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলিলেন, উক্ত চার প্রকার ভক্তের সকলে শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন; কেননা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন তাঁহাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তবে সকলের মধ্যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরের সহিত অভেদ ভাব প্রাপ্ত। এই শ্রেণীর ভক্ত সর্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ থাকায় মানবজীবনে লভ্য শ্রেষ্ঠ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

ঐ অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে, বহু জন্মের সাধনার ফলে শেষ জন্মে সাধক জ্ঞানবান হইয়া ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি অনুভব করেন, ঈশ্বর সবকিছু হইয়াছেন ; তিনি নিজেই জীব-জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রকার অনুভবসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা, যাঁহারা সর্বদা সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব করেন, অতি অল্প।

নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'যেহেতু তুমি আমার উপদেশের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ কর না, সেইহেতু তুমি তাহা শুনিবার যোগ্য অধিকারী। এখন তোমাকে অতি গোপনীয় জ্ঞানের বিষয় বিজ্ঞানের সহিত বলিব। যাহা জানার এবং অনুভবের ফলে তুমি জন্ম মরণরূপ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।'

ধর্মবিষয়ক জ্ঞান গুহ্য, উহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। দেহ হইতে ভিন্ন আত্মবিষয়ক জ্ঞান গুহ্যতর। আর, ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে গুহ্যতম। ভগবান সেই জ্ঞানের বিষয় 'সবিজ্ঞান' অর্থাৎ সাধনার উপায়সহ বলিবেন। জ্ঞানকে জানা যায় না। তাই 'জ্ঞাত্বা' পদের অর্থ 'অনুভবের ফলে।'

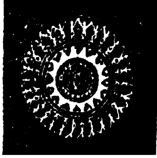
ঐ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। একই ঈশ্বর সর্বত্র সমভাবে বর্তমান, এই প্রকার দৃঢ় ধারণার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানও একপ্রকার যজ্ঞ। এই জ্ঞানযজ্ঞের সাধকগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদল ঈশ্বরের সহিত নিজের অভেদ ভাব উপলব্ধির সাধনা করেন। কেহ কেহ নিজেকে ঈশ্বরের নিত্য দাস মনে করেন ; অথবা, সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি কোন ভাব অবলম্বনে সাধনা করেন। আবার কেহ বা এক ঈশ্বরই নানা দেব-দেবীরূপে বিরাজিত, এই প্রকার ধারণার বশে কোনও এক দেবতারূপে সর্বাত্মক ঈশ্বরের উপাসনা করেন।

গীতায় দশম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে বুদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাব অর্থাৎ মানসিক প্রবৃত্তির সহিত জ্ঞানকে একটা ভাব বলা হইয়াছে। এখানে জ্ঞান বলিতে আত্মবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে জ্ঞানকে দীপের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রদীপ জ্বালিলে যেমন গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার এবং ভয় চলিয়া যায় সেইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির ফলে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বারবার জন্ম-মরণজনিত দুঃখের চিরতরে নিবৃত্তি ঘটে। এই শ্লোকে শ্রীভগবান সংসার দুঃখ তপ্ত মানবকে অভয় প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—যাহারা তাঁহার সহিত সতত যুক্ত থাকিয়া প্রীতির সহিত ভজন করে তিনি তাহাদের নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশিত করেন, সেই জ্ঞানালোক প্রকাশের ফলে তাহাদের সংসার বন্ধন নষ্ট হয়।

ঐ অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, তিনি আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণের অন্তরে জ্ঞানরূপে প্রকাশিত।

দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানকে এবং জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানকে উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। এখানে জ্ঞান বলিতে, যুক্তি ও বিচার সহায়ে শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ যেরূপ বোঝা যায়, সেই প্রকার জ্ঞান। এই জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা বোঝার চেষ্টা না করিয়া কোন প্রকার সাধনার অভ্যাস অবশ্য উৎকৃষ্ট। আর ঐ প্রকার জ্ঞান হইতে ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইয়া থাকা উৎকৃষ্ট।



# অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

স্বামী শুদ্ধানন্দ

## অজামিল ও নামমাহাত্ম্য

জগতে যত ভাব আছে, যত মত আছে, সবই সত্য। ভগবান সত্য স্বরূপ; তাঁহার সৃষ্ট জগতে বাস্তবিক অসত্য কিছুই থাকিতে পারে না। যাহাকে আমরা ইন্দ্রজাল, মিথ্যা বা ভ্রম বলি, তাহাও বাস্তবিক অসত্য নহে; কোন না কোন সত্যের আচ্ছাদিত প্রকাশমাত্র। তবে যে আমাদের দৃষ্টিতে অনেক জিনিষ অসত্য বা সত্যাসত্যমিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহা আমাদেরি দৃষ্টিহীনতার জন্ম। যে দৃষ্টি অবলম্বনে দেখিলে তাহাদের সত্যতা ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা যায়, তাহা আমাদের নাই বলিয়াই আমরা তাহাদের বুঝিতে পারি না। যে প্রথম সেই বিষয় বিশেষে সত্য বুঝিয়াছিল, যে প্রথম সেই বিষয় বিশেষে সত্য দেখিয়াছিল—সেই সে মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাহার ন্যায় দৃষ্টি তোমার আমার নাই বলিয়াই আমরা এখন সেই তত্ত্বে ভ্রম দর্শন করিয়া থাকি। নতুবা আমরা জানি বা নাই জানি, প্রত্যেক অনুভবে সত্য পদার্থই স্পর্শ করিয়া থাকি এবং আমাদের প্রত্যেক ভাব, মত এবং কল্পনাও কোন না কোন সত্যাবলম্বনেই উঠিয়া থাকে। উহাদের প্রত্যেকটিই সেই সেই সত্যের বিকৃত দর্শনমাত্র—এ বিষয়ে ভ্রম নাই।

জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেন, জগৎ ভাবময়—সুতরাং তিনি এখানে সম্পূর্ণ অসৎ বলিয়া কিছুই দেখিতে পান না। কুৎসিৎ পাপাচারীর চেষ্টার ভিতরেও এইরূপে তাঁহারা দৃষ্টিহীনতাপ্রসূত বিকৃতভাবাপন্ন সত্যানুরাগই দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের ন্যায় দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেই সমুদয় বস্তু সহানুভূতির চক্ষে দেখিবার শক্তি হয়। যাঁহাদের এ দৃষ্টির বিকাশ হয় নাই, তাঁহারা জগতের প্রতি ভাব বা মতের ভিতরের সত্য ও সৌন্দর্য্য সম্ভোগে বিশেষ বঞ্চিত, সন্দেহ নাই।

সর্ব্ব দেশের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিয়াই দেখা যায়, তাহার মধ্যে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা আমাদের এখনকার দৃষ্টি ও যুক্তির সঙ্গে কোন মতে মিলাইতে পারা যায় না। আমাদের সঙ্গে মেলে না বলিয়া সেইগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখি না। হয়ত যিনি প্রথমে সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, তিনি উহাকে যে দৃষ্টিতে, যে ভাবে দেখেন, আমরা যদি উহাকে সেই ভাবে দেখিতে পারি, তাহা হইলে উহাতে যুক্তির বিরোধী কিছুই দেখিতে পাইব না! হয়ত দেখিব, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—হৃদয়ের কোন সৌন্দর্য্য দেখান, বুদ্ধির নয়। বুঝিব হয়ত পরবর্ত্তি টীকাকারগণ ক্রমশঃ উহাকে হৃদয়ের রাজ্য হইতে বুদ্ধির রাজ্যে লইয়া যাইবার অসম্ভব চেষ্টা করিয়া অসঙ্গতি দোষে পড়িয়াছেন।

উদাহরণস্বরূপ এখানে পুরাণের অজামিল উপাখ্যান লওয়া যাউক। চলিত কথায় আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, অজামিল পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম লইয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন। ইহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, সাধনভজন কিছুমাত্র না করিয়া মরণের পূর্ব্বে কোন মতে একবার ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেই তাঁহাদের সব কাজ হইবে—ঈশ্বর লাভ হইবে। কিন্তু একবার

ভাগবতখানা খুলিয়া দেখিলে অন্য রূপ দেখিতে পাই। প্রথম দেখিতে পাই, অজামিল ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার রীতিমত শাস্ত্র জ্ঞান ছিল এবং স্বভাবও পূর্ব্বে অতি সুন্দর ছিল। তিনি সদাচারী ও যমাদি নানাগুণসম্পন্ন ছিলেন। সর্ব্বদা ব্রত আচরণ করিতেন এবং মৃদুস্বভাব, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও শুচি ছিলেন। তিনি অহঙ্কার-শূন্য হইয়া সর্ব্বদা গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের সেবা করিতেন। সকল প্রাণীর সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্দ্যভাব ছিল। তিনি অতি সাধু ও পরিমিত-ভাষী ছিলেন, কাহারও প্রতি কখনও হিংসা করিতেন না।

পূর্ব্ব অবস্থায় তাঁহার এত সদ্‌গুণ ছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অজামিল পদের প্রয়াসী হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গুণগণের একটিরও দাবী করিতে পারেন কিনা সন্দেহ! যাউক, অসৎসঙ্গে ইহার পতন হইল। দাসীগর্ভে যে দশপুত্র হইল, তাহার কনিষ্ঠটির নাম রাখা হইল নারায়ণ। এটী ব্রাহ্মণের অতিপ্রিয় ছিল। পুত্রের নাম নারায়ণ রাখাতে বুঝা যাই-তেছে, ব্রাহ্মণ অসৎসঙ্গে পড়িয়া অসৎমার্গাবলম্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ভগবন্নিষ্ঠা একে-বারে ভুলিতে পারেন নাই।

তার পর ইহার মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম স্মরণ। ভাগবতে লিখিত আছে, প্রথমে যমদূত ইহাকে লইতে আসিয়াছিল। তার পর নারায়ণ নাম উচ্চারিত হইবামাত্র বিষ্ণুদূত আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে সন্দেহ এই, অজামিলের হৃদয়ে কি নারায়ণ শব্দ দ্বারা ভগবদ্ভাব কিছুমাত্র উদয় হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, তবে আমরাও ত অনেক সময় নানা কারণে ভগবানের নামাত্মক বিস্তর শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকি, আমাদের কাছেই বা বিষ্ণুদূত আসেন না কেন? ইহাতে বোধ হয়, যদি এই গল্পটি একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা হয়, তবে নিশ্চয় পুত্র-চ্ছলে নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ভাব-যোগে ( Association of ideas ) তাঁহার মনে নারায়ণের ভাবও আসিয়াছিল, আর খুব সম্ভব যে, রোগে বিকারগ্রস্ত তাঁহার নিজের মনেরই দুই প্রকার বৃত্তি সাকার রূপ ধারণ করিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া তর্ক করিয়াছিল। যেমন স্বপ্না-বস্থায় অনেক সময় আমাদের সকলেরই ঘটিয়া থাকে। যমদূত বলিতেছেন, "অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, শাস্তি পাইতেই হইবে।" বিষ্ণুদূত বলিতেছেন, "ভগবদুপাসনায় সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।"

সাধারণের একটী সংস্কার আছে, অজামিল এই অবস্থায় মরিয়া বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক বিষ্ণুলোকে নীত হন। কিন্তু ভাগবত অন্যরূপ বলিতেছেন। তাঁহার বিকার ছুটিয়া চেতনা হইল। কিন্তু যমদূত বিষ্ণুদূতদিগের সেই কথোপকথন কখন ভুলিতে পারিলেন না, উহা তাঁহার প্রাণে লাগিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি আপন পূর্ব্বকৃত অসদাচারের জন্য অতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে, পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম স্মরণ করিয়া আমার এইরূপ সিদ্ধপুরুষগণের দর্শন ও এত সদুপদেশ শ্রবণ হইল। না জানি, প্রকৃতভাবে ভগবানের উপাসনা করিলে কতদূর উন্নতি হয়। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি যাহাতে আবার ঘোর পাপে নিমগ্ন না হই, তজ্জন্য প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযমন করিব। অবিদ্যা ও কামকর্ম্মজনিত এই বন্ধন মোচন করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃদ, শান্ত, দয়াবান্ ও আত্মবান্ হইয়া স্ত্রীরূপিণী নিজমায়াগ্রস্ত আপনার আত্মাকে মুক্ত করিব। এক্ষণে সত্য-বস্তুতে আমার বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়াছে। দেহাদিতে আমি আমার বলিয়া যে অভিমান আছে, তাহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক চিত্তকে ভগবৎ কীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া সেই ভগবানেই স্থাপন করিব।'

এই বলিয়া তিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে

গমন করিলেন। তথায় আসন কল্পনা পূর্ব্বক যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন। তৎপরে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করিয়া জ্ঞানময় পরম ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানে সংযোগ করিলেন।

এই সময়ে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

যাঁহারা একবার মাত্র ভগবানের নাম করিয়াই ভগবানকে পাইতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন অজামিলের ন্যায় সর্ব্বত্যাগ ও যোগ সাধনে প্রস্তুত আছেন ?

এইরূপে ভাগবত লিপিবদ্ধ অজামিলের জীবনেতিহাস চলিত কথার সহিত অনেক বিরোধী হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নামমাহাত্ম্যের উপর যে চলিত বিশ্বাস আছে, তাহাও ভাগবতকারের দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তনের যোগ্য বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু যে যে দৃষ্টি অবলম্বনে শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করে কে ? সুখপ্রিয় মানব কষ্টের দিকে তাকাইতে চাহে না ! আমাদের দেশের পণ্ডিতকুল, যাঁহাদের উপর সাধারণে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সকল জানিয়া শুনিয়াও সাধারণের বিশ্বাস যাহাতে যথার্থ শাস্ত্রদৃষ্টির উপর স্থাপিত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। তাহার উপর গ্রহাচার্য্যগণের ভ্রমসঙ্কুল যুক্তিবিরোধী গণনা এবং কথক মহাশয়দিগের যথার্থ শাস্ত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত মূর্খের মনোরঞ্জনকারী অপরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা, সাধারণের বিশেষতঃ হিন্দু মহিলাদের বিশ্বাসকে যে কি ভীষণ আবর্ত্তে ফেলিয়াছে, তাহা দেখে কে ? এখন সাধারণের শিক্ষার প্রসার ভিন্ন এই আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আর অন্য উপায় দেখি না।

দেখা গেল, ভগবানের নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করায় যুক্তিবিরোধী কিছুই নাই। কিন্তু সাধারণে উহা যে ভাবে দৃষ্টি করে, তাহা ঠিক নহে। অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে আর কত বহু কালাভ্যস্ত হৃদয়ের প্রিয় বিশ্বাসনিচয়, আমরা যে ভাবে সত্য বলিয়া দেখি, সে ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া, অন্য এক ভাবে, অন্য এক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পাঠক কি জানিবামাত্র সেই সেই নূতন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সেগুলির জীবনে অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত আছেন ?*

* 'উদ্বোধন'-এর ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

# এ-ধরাতেই স্বর্গবাস

শ্রীদীপ্তিকুমার শীল

কেদার-বদ্রীতে কামাখ্যা কৈলাসে
যেখানে আছেন যিনি ;
মম অন্তরে হৃদয়-মন্দিরে
সদাই পূজিত তিনি।
নিত্য স্মরণে নিত্য পূজা
অন্তরে তাঁর আরতি,
অশ্রু জলে হয় অভিষেক,
প্রেমেই জানাই প্রণতি।

মনের মাঝে সদাই জপি
তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র ;
আমার 'আমি' তাঁরে সঁপি,
তাঁর নাম মোর মন্ত্র।
রাজার রাজা গুরু মহারাজ
আমি তো তাঁর দাস,
তাঁর-ই মাঝে ভরা এ-মন
এ-ধরাতেই স্বর্গবাস।

# পুস্তক সমালোচনা

**পুণ্যদর্শন শ্রীম** ( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড )—শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। প্রকাশক : শ্রীজয়াগ্নিনাথ সান্যাল, ২৬, চৌরঙ্গী রোড ( সর্বোচ্চতল ), কলিকাতা-৮৭। পৃঃ ১৮+২১০, মূল্য : ছাব্বিশ টাকা।

[ দ্বিতীয় খণ্ড ] প্রকাশক : শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ লাহিড়ী, গঙ্গোত্রী পরিবদ, ২৬, চৌরঙ্গী রোড ( সর্বোচ্চতল ), কলিকাতা-৮৭। পৃঃ ২৪+১৮০, মূল্য : চব্বিশ টাকা।

শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট স্তম্ভ। শ্রীম কথিত ও পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। বিশ্বময় ঠাকুরের প্রচারে এই পুস্তকটির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু দেশী ও বিদেশী বিখ্যাত মনীষী ও ভক্তবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের সপ্রশংস উল্লেখ করে গেছেন। আজও সেরূপ উল্লেখ প্রচুরভাবে হয়ে চলেছে। নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে এমনভাবে ইষ্টের গৌরব আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীম অনন্য। কথামৃতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি শ্রীম ও তাঁর পুস্তক সম্বন্ধে বহুসংখ্যক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করার সৌভাগ্য আগ্রহীজনের মিলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী ও ভক্ত জনগণের ঘরে ঘরে একান্তভাবে পরিচিত শ্রীমর স্বসম্পূর্ণ জীবনীর প্রয়োজন খুবই ছিল। আলোচ্য পুস্তকটি সে প্রয়োজন অনেকটা মিটাতে পেরেছে।

নিজেকে গোপন রাখার জন্য কথামৃতকার শ্রীম যে পাঁচটি চরিত্রকে আশ্রয় করেছিলেন, তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে আলোচ্য পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায়।

শ্রীমর ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখযোগ্য পরিচিতিগুলির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে—"একসময় তিনটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। একটির বেতন নিজ সংসারের খরচের জন্য, আর একটি মঠের গুরু-ভাইদের জন্যে, এবং তৃতীয় বেতন শ্রীশ্রীমার জন্যে।" ( পৃঃ ১৩৬, প্রথম খণ্ড )।

দুইখণ্ডে সমাপ্ত পুস্তকটির কয়েকটি অধ্যায়ের শিরোনামার উল্লেখ করা যাচ্ছে পুস্তকটিতে বৈচিত্র্য সমাবেশের ও বিষয়বস্তুর বিস্তারের নিদর্শন হিসাবে—( প্রথম খণ্ডের ) 'ভারতের বিখ্যাত মানুষ ও শ্রীম', 'ভক্ত শ্রীম', 'আচার্য শ্রীম', 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে শ্রীম', 'দুই মহেন্দ্র' (অর্থাৎ ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা শ্রীম ) এবং ( দ্বিতীয় খণ্ডের ) 'শ্রীরামকৃষ্ণের দুই ইন্দ্র, [অর্থাৎ 'মহেন্দ্র' ( শ্রীম ) ও 'নরেন্দ্র' ( স্বামীজী ) ] 'শ্রীম ও রোমাঁ রোলাঁ', 'পলব্রান্টনের দৃষ্টিতে শ্রীম', 'সাহিত্যিক শ্রীম'। দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৭, ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠায় কথামৃত যে সব বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সে-সব ভাষার উল্লেখ আছে।

( ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ) "একই সঙ্গে এনেছেন তাঁর বাহন গরুড়কে—আজন্ম বিপ্লবী ও সিদ্ধপুরুষ বিবেকানন্দকে" গ্রন্থকারের এই উক্তি ( পৃঃ ২—প্রথম খণ্ড ) সকলের কাছে তৃপ্তিদায়ক হবে বলে মনে হয় না। স্বামীজী ঠাকুরের বাণী দেশ-বিদেশে বহন করে নিয়ে গেছেন এই অর্থে হয়তো গরুড়ের সঙ্গে তুলনা কতকটা সমীচীন হলেও হতে পারে। কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর বাহনতত্ত্ব বিচার করলে বলা চলে যে স্বামীজীর স্থান বাহন গরুড় অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বতর স্তরে। ঠাকুরের নিজের কথা 'নরেন্দ্র আমার মাথার শিরোমণি, সপ্তর্ষি মণ্ডলের একজন', ( পৃঃ ১০৬, প্রথম খণ্ড ) এবং একবার নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুর কর্তৃক তাঁর স্তবোক্তি "নারায়ণ, তুমি আমার জন্য রূপ ধারণ করে এসেছ" ( পৃঃ ১৩৭, দ্বিতীয় খণ্ড ) উপরোক্ত তুলনামূলক উক্তির খণ্ডনে উদ্ধৃত করা গেল।

পুস্তকটির মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন ও বাঁধাই সুশোভন। শ্রীমর সম্পূর্ণ জীবনী হিসাবে পুস্তকটি আকর্ষণীয়।

—শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

**শ্রীরামকৃষ্ণের সংসারচেতনা**—উত্তম সেনগুপ্ত। প্রকাশক: অজয় সরকার, অনুপমা বুক হাউস, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, পৃঃ ১০০, মূল্য; চোদ্দ টাকা।

সংসারসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ যোগীন (পরে স্বামী যোগানন্দ) বাজার থেকে দোকানীর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে একটি কড়া কিনে এনেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কড়াটি ফাটা! এই ঘটনা জানার পরেই সর্বদা ভগবৎভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণের তীব্র ভৎ'সনা—"ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে? দোকানী কি দোকান ফেঁদে ধর্ম করতে বসেছে, যে তুই তার কথায় বিশ্বাস করে কড়াখানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে এলি? আর কখনও ওরূপ করিস না। কোন দ্রব্য কিনতে হলে পাঁচ দোকান ঘুরে তার উচিত মূল্য জানবি, দ্রব্যটি নেবার কালে বিশেষ করে পরীক্ষা করবি। আর যে-সব দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তার ফাউটি পর্যন্ত গ্রহণ না করে চলে আসবি না।"

অনেকের ধারণা, ধার্মিক লোক জাগতিক বিষয়ে উদাসীন থাকেন। ইহলোক-সম্বন্ধীয় উন্মনাভাবই যেন আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতি-জ্ঞাপক। কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখা যায় একদিকে যেমন মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হচ্ছেন, আবার অন্যদিকে লৌকিক শিষ্টাচার, লৌকিক ব্যবহার অর্থাৎ জাগতিক ব্যাপারে খুব সচেতন। একদিকে ভাবাবস্থায় নিজের পরনের কাপড়ের কোন হুঁস নেই, অন্যদিকে যখন ব্যবহারিক জগতে মন আছে তখন কোন বিষয়েই কোনরকম ভুল হচ্ছে না। জগতের সকল ব্যক্তির সঙ্গে লৌকিক সম্বন্ধ ত্যাগ করেও নিজ জননীর প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও কর্তব্যটি কখনও ভোলেননি; পত্নীর সঙ্গে শারীরিক কোনরকম সংস্রব না থাকলেও তাঁর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিলেন। সংসারে কার প্রতি কি কর্তব্য, কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়, কোন্ অবস্থায় কিরকম চলতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ খুবই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর উপদেশের মধ্যে উচ্চতম ত্যাগাদর্শের পাশাপাশি ব্যবহারিক জগতের উপযোগী নির্দেশও আছে। লোকাতীত হয়েও তিনি অ-লৌকিক নন।

আলোচ্য গ্রন্থটি আঠাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সূচীপত্র, ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি নেই। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সংসারচেতনাসূচক বহু ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে লেখা গ্রন্থকারের কিছু চিন্তা এতে সন্নিবদ্ধ আছে। রচনাশৈলীতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রভাব লক্ষণীয়। পড়তে পড়তে বেশ ভালই লাগে। বেশ রূপকথার মতো। এই স্টাইলে লেখা অনেকের কাছে বেশ উপাদেয় ঠেকে, বিশেষ করে ভক্তদের কাছে। কিছু কিছু ঘটনা বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে লেখা। অনেকটা রম্য রচনার ধাঁচে। সাবলীল বাঙলায় লিখেছেন। উৎকট শব্দ-প্রয়োগ কোথাও নেই। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য ও চিন্তার যথেষ্ট উপকরণ জোগায়। এদিক থেকে বইটি পড়লে একটু অভিনব স্বাদের বই-পড়ার আনন্দ পাওয়া যায়।

লেখক খুবই আন্তরিক ও আবেগপ্রবণ। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় তথ্যগত ভুল বড্ড চোখে লাগে। যেমন রাখালকে (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নিয়ে বেড়াতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেতযোনি-দর্শন হয়েছিল কামারহাটিতে গোবিন্দবাবুর বাগানে; সিঁথিতে বেণী পালের বাগানে নয়। (পৃঃ ১০০) গ্রন্থের আর-একটি ত্রুটি হল কোন

কোন ঘটনার মধ্যে হাস্যকর মন্তব্যের অবতারণা। ঠাকুর 'বিজ্ঞানীর অবস্থা' বলতে কি বুঝিয়েছেন লেখক তা ভালভাবে উপলব্ধি না করেই মন্তব্য করেছেন, 'আগে নিষ্ঠার শাসন, পরে জ্ঞানের আসন, তারপরে বিজ্ঞানের সুপরিকল্পিত প্রশাসন'। (পৃঃ ৮) নিঃসন্দেহে এরজন্য গ্রন্থটির মান গাম্ভীর্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

যাই হোক, বিপুল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে এই নব-সংযোজনকে স্বাগত জানাই। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে বাঙলার লেখককুল যে আন্দোলিত হয়েছেন এ-সব বই দেখলে তা বেশ বোঝা যায়।

প্রচ্ছদ ও বাঁধাই খুবই চিত্তাকর্ষক। দামও সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। মুদ্রণ কার্য ভাল হয়েছে। মুদ্রণ-প্রমাদ নেই বললেই চলে। বেশ বড় বড় টাইপ। পড়তে কোন অসুবিধা হয় না।

—স্বামী শান্তরূপানন্দ

**REFLECTIONS ON PSYCHOLOGY AND EDUCATION**—By Adhir Kumar Mukherjee, Published by the author, 1, Surath Bose Lane, P. O. Konnagar, Dist. Hooghly, W. Bengal. Page: 87, Price—Rupees Eight only.

গ্রন্থটি অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ্ অধ্যক্ষ অধীর কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সুলিখিত একুশটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের সংকলন। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক হিসাবে গ্রন্থকার মুখোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের নিকটই খুব মূল্যবান সন্দেহ নাই।

স্বল্প পরিসরের মধ্যে গ্রন্থকার শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা, ক্রীড়া ও সৃজনধর্মী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজশিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষা, শিক্ষায় গ্রন্থাগার, ওয়ার্ধাশিক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। শিক্ষা এবং গণশিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মত এবং প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে দুইটি আলোচনা গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। সংকলিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ হিসাবে ইহার প্রকাশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুবই অভিনন্দনীয় হইবে॥

—ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

(১) **বিশ্বশান্তির সঠিক লাইন সাম্য, ধর্ম, প্রেম,** পৃঃ ২৭, মূল্য: এক টাকা। (২) **প্রকৃতির সাম্যনীতিকেই করতে হবে জীবনের মূল নীতি**; পৃঃ ৪১, মূল্য: দুটাকা। লেখক ও প্রকাশক: শ্রীকার্তিক সেনাপতি (স্বাধীনতা সংগ্রামী) "রাম নারায়ণ ধাম" গ্রাম—বাণেশ্বরপুর, পোঃ—আমুলিয়া, জেলা—হাওড়া, থানা—আমতা।

**YOGA IN THE GITA AND THE GOSPELS OUR COMMON HERITAGE** by Dr. Bhawani Sankar Chowdhury, Published by Nilima Chowdhury for One world Publisher, 54/4B Hazra Road, Calcutta-19, Pages 20. Price-Rs. 5'00.



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব

**শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী-উৎসব ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব :** গত ৫ এপ্রিল, ১৯৮৭ শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি ও ঐ কেন্দ্রের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ। ঐ দিন প্রধান অতিথি ছিলেন আসাম ও মেঘালয়ের রাজ্যপাল বি. এন. সিং। সপ্তাহব্যাপী এই আনন্দ-উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ধর্মসভা, যুব-সম্মেলন, পালা-কীর্তন, গীতি-আলেখ্য, যাত্রাভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

**ইটানগর** কেন্দ্রে (অরুণাচল প্রদেশ) তিনদিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্ম-জয়ন্তী ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সূচনা হয় গত ১৭ এপ্রিল, '৮৭। এই উৎসবেও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

গত ২৭ ফেব্রুআরি থেকে ১ মার্চ, '৮৭ বাংলাদেশের **বাগেরহাট** কেন্দ্রে এই উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। উৎসবের তিন দিনই প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনের সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন কুমিল্লা বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথেরো।

**বেদান্ত সোসাইটি** (উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়া) গত ১ ও ২ নভেম্বর '৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি-উৎসব বক্তৃতা, সঙ্গীত, স্লাইড-শো প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে।

নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতেও উক্ত উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে : আলং (১ম পর্যায়), রাঁচি (মুরাবাদী), বরিশাল (বাংলাদেশ), কাঁথি, হায়দ্রাবাদ, রামহরিপুর, সরিষা এবং ত্রিচুর।

## রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ১ মে, '৮৭ **বাগবাজার** (কলিকাতা) বলরাম মন্দিরে নবতিতম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা দিবস বিশেষ পূজা, হোম, সঙ্গীত, লীলাগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। অপরাহ্নে স্বামী প্রমেয়ানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী রমানন্দজী ও বক্তা ছিলেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন। সভায় উপস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক ও বলরাম মন্দিরের অছি পরিষদের সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী সহ বক্তাগণ সকলেই স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

## উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১২ এপ্রিল, '৮৭ **উলশুর** আশ্রমে (ব্যাঙ্গালোর) প্রস্তাবিত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ।

গত ১৯ এপ্রিল, '৮৭ **সালেম** (তামিলনাড়ু

কেন্দ্রের নবনির্মিত 'মালটি-পারপাস্ হলের' উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ।

## ত্রাণ

**পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রাণ:** উত্তর কলিকাতা বাগমারী বস্তি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৫৪টি পরিবারের মধ্যে ৫৪ সেট্ (প্রতি সেটে ৮ প্রকার বাসনপত্র আছে) এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, ৩৩৭টি বিভিন্ন শ্রেণীর পুরাণো পোশাক, ১২৩ কিলোগ্রাম চাল, ৭৫ কিলোগ্রাম ডাল এবং আলু ও পেঁয়াজ বিতরণ করা হয়েছে।

মালদা জেলার মানিকচক থানার অন্তর্গত শঙ্করতলা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ২৬টি পরিবারের মধ্যে ২৫টি ত্রিপল, ৩০টি করে এ্যালুমিনিয়ামের থালা ও গ্লাস, ৩০টি ধুতি, ৩০টি শাড়ি, ১৬১ কিলোগ্রাম চিঁড়া, ২৪ কিলো: গুড় এবং ৫০ কিলো: লবণ বিতরণ করা হয়েছে।

**উড়িষ্যা অগ্নিত্রাণ:** ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের মাধ্যমে উড়িষ্যার ঢেনক্যানাল জেলার অন্তর্গত ভুবন গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ২৬০০ কিলো: চাল, ১০০ কিলো: চিঁড়া, ২৫ কিলো: গুড়, ১৫০০ প্যাকেট বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ১৩,১৯৫ জন লোকের মধ্যে সপ্তাহকাল ধরে রান্নাকরা খাবারও বিতরণ করা হয়েছে।

**বিহার অগ্নিত্রাণ:** কাটিহার জেলার ফালকা ও মনিহারী ব্লকের তিনটি গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কাটিহার কেন্দ্রের মাধ্যমে ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি।

**গুজরাট খরাত্রাণ:** রাজকোট কেন্দ্রের মাধ্যমে কচ্ছ জেলার রপার তালুকের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১,০৭,৯০০ কিলো: খাদ্যশস্য এবং ১১,৬০৯ মিটার কাপড় পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া কচ্ছ ও রাজকোট জেলার ৯টি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের মধ্যে ১,৬৩,৮৭৭ কিলো: পশুখাদ্যও পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে।

**শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ:** মাদ্রাজ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত মন্দাপম্ ও তিরোচি শরণার্থিশিবিরের ৫৬,৯১০ জন শরণার্থীর মধ্যে দুধ ও ২২ কিলো: মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে।

ভারতের বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী গত ৭ এপ্রিল '৮৭ সিঙ্গাপুর কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

## দেহত্যাগ

**স্বামী সত্যবোধানন্দ** (সোনাবনি) গত ১১ এপ্রিল '৮৭ রাত ৮-২৫ মি: হৃৎপিণ্ডের একাংশে হঠাৎ রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত নানা অসুখে ভুগছিলেন।

স্বামী সত্যবোধানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কনখল আশ্রমে যোগদান করে তিনি যথাসময়ে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, শ্যামলাতাল ও রাজকোট কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন এবং জীবনের শেষদিনও তিনি রাজকোটেই ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, কর্মঠ ও তপস্যা-উচিত গুণাবলীর জন্য তিনি তাঁদের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা :** সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

গত ৩ মে, '৮৭ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ এবং গত ১৩ মে, '৮৭ বুদ্ধ-জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বুদ্ধদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

## বিবিধ সংবাদ

### উৎসব

গত ৪ ও ৫ এপ্রিল, ১৯৮৭ **চন্দননগর** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের সার্ধশতবর্ষপূর্তি-উৎসব সমারোহে পালন করা হয়েছে। ৫ এপ্রিল এক বর্ণাঢ্য শোভা-যাত্রায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেছিলেন। উৎসবের উভয় দিনই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, **বঙ্গরপুর** (আসাম) গত ১২ জানুআরি, '৮৭ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে জাতীয় যুবদিবস পালন করে। আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা-প্রতি-যোগিতা, যুব সম্মেলন, নাটক, ভক্তিগীতি প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

গত ১০—১২ এপ্রিল, '৮৭ **ত্রিপুরা** রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন উদয়পুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শোভাযাত্রা, ধর্মসভা, ভক্ত-সম্মেলন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫২তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে **কাটোয়া** রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রাঙ্গণে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে গত ১৭ এপ্রিল, '৮৭ থেকে তিনদিন ব্যাপী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন বক্তারা তিনদিন ধর্মসভায় যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীস্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণীর উপর আলোচনা করেন।

গত ৫ ও ৬ এপ্রিল, '৮৭ **চণ্ডিতলা** (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে। ৫ এপ্রিল অপরাহ্ণে স্বামী সত্যদেবানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভারও আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ২৭—২৯ মার্চ, '৮৭ **আমলাদহি** (চিত্তরঞ্জন) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালন করে। এই তিনদিন ধর্মসভায় তাঁদের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি কেন্দ্র হলদিয়া, গত ২৪ এপ্রিল '৮৭ তাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ২৫ ও ২৬ এপ্রিল বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা ও অন্যান্য আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছে।

## ভূমিকম্পের পূর্বাভাস হিসাবে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিক্রিয়া

যে কোন ঘটনার কারণ যদি সাধারণ মানুষের বোধগম্য না হয়, তা তখন অলৌকিক বলে গণ্য হয়। আবার সে ঘটনা যদি সমকালীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যাত না হয়, তা-হলে ত কথাই নাই। নিটিনল ( Nitinol ) নামক মিশ্রিত ধাতু দ্বারা এক বিশেষ তাপমাত্রায় একটি কুকুরের মূর্তি তৈরি করে, পরে ঠাণ্ডা করে তাকে পিটিয়ে বিকৃত ও পিণ্ডাকার করার পর আবার যদি তাকে আগেকার তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে সেটি আবার কুকুরের মূর্তি ফিরে পায়। এইরূপ 'ধাতুর অলৌকিক স্মৃতি-শক্তি'র এখনও কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই। অনেক জন্তুর ব্যবহারও আজ পর্যন্ত অ-ব্যাখ্যাত যদিও সেগুলি বাস্তব সত্য। কুকুরের বিভিন্ন ঘ্রাণকে তফাৎ করা এবং সেগুলিকে স্মৃতিতে রাখার কথা অনেকে জানেন। তার এই ক্ষমতা অনেক প্রাণীর চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি।

আসছে এমন ভূকম্পনে প্রাণীজগতের প্রতি-ক্রিয়া জানবার জন্য প্রায় একশতের কাছাকাছি প্রাণীকে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এদের মধ্যে পিঁপড়ে, বাদুড়, কুকুর, হাঁস, মুরগি থেকে সাপ তিমি মাছ পর্যন্ত আছে। এ-বিষয়ে প্রথম গবেষণা হয় ইটালিতে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে তিনলক্ষ কৃষক ও অন্যান্য লোক যারা জন্তু-জানোয়ার নিয়ে থাকে, তাদের অবৈতনিকভাবে এই তথ্যানুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাদের নীতিবাণী ( slogan ) ছিল "প্রস্তুতি না নিয়ে একদিন ভূমিকম্প হওয়ার চেয়ে হাজার দিন ভূমিকম্প না হওয়া ভাল।" ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের হাইচেঙ্গ ভূমিকম্প নাকি জন্তুদের প্রতিক্রিয়া দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছিল। চীনাদের গবেষণার ফল দেখে পাশ্চাত্যের ও জাপানের বৈজ্ঞানিকরা এ ধরনের গবেষণা আরম্ভ করেছেন। আগে যে গবেষণা হাসিঠাট্টার বিষয় হয়েছিল, তা নিয়ে এখন বিভিন্ন দেশে গবেষণা-মূলক রচনা বার হচ্ছে। ভূকম্পন ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন, গ্যাস ও গন্ধ নিষ্ক্রমণ—এগুলি ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত; কিন্তু এগুলি কোন না কোন ভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীজীবনকে প্রভাবান্বিত করে। মাটির নিচে অনেক জায়গায় কোয়ার্জ নামক ধাতুর স্তরে ভূকম্পনের আগেই এক ধরনের ( Peizo ) ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়, যা এই ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে বলা হয়েছে "ভূমিকম্পের আগে যে-সব উত্তেজনা (stimulus)-র সৃষ্টি হয়, তাতে বহু জন্তু মানুষের চেয়ে বেশী সাড়া দেয়।" এটা সহজবোধ্য যে সাপের দেহ মাটির সঙ্গে স্পর্শে থাকার জন্য, এবং জলে কম্পন অব্যাহত অবস্থায় আসার জন্য সাপ ও জলচর জীব সামান্য মাত্র কম্পনও বুঝতে পারবে। চীন, জাপান ও পাশ্চাত্য দেশের গবেষণা হতে ভূমিকম্পের আগে কয়েকটি জন্তুর পরিবর্তিত ব্যবহার দেওয়া হচ্ছে: মাছ জলের উপরিভাগে আসে বা পাড়ে লাফিয়ে পড়ে; শূকররা পরস্পরের লেজ কামড়ায়, মুরগি গাছের উপর চড়ে; ইঁদুররা উত্তেজিত হয়ে ছুটাছুটি করে; পায়রা বাসা হতে উড়ে যায়; কাঁকড়া গর্ত হতে বার হয়ে যায়; ভেড়া ছাগল ডাকতে আরম্ভ করে ইত্যাদি। এই সব অসাধারণ ব্যবহার ভূমিকম্পের এক ঘণ্টা আগে হতে দুই দিন আগে পর্যন্ত পাওয়া গেছে এবং ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ( epicentre ) হতে কুড়ি হতে দুশ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী হলেও বহু জন্তুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। এই

ব্যাপারটি মানবকল্যাণে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা কাজে লাগাতে হবে।

Proceedings of the Indian
National Science Academy—
Biological Sciences, Part B
No. 5, Vol. 52, 1986

## আগামী ৩০ বছরে বিশ্বের বহু শহর সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে?

**প্যারিস,** (এ পি): আগামী ৩০ বছরের মধ্যে বোস্টন থেকে বোম্বাই পর্যন্ত বহু শহরই সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে, কিন্তু সে নিয়ে এখনও কাউকেই তেমন মাথা ঘামাতে দেখা যাচ্ছে না। সম্প্রতি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসংঘের সমুদ্র ও তীরভূমির পরিবেশ সংরক্ষণ দপ্তরের প্রধান স্তেপান কেক্স। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝাতে তিনি বলেন, শুধু বাংলাদেশেই ওই সময়ের মধ্যে চরম সঙ্কটে পড়বেন দেড়কোটি মানুষ। ডুবে যাবার হাত থেকে বাঁচাতে তাদের ইতিমধ্যেই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে। কেক্স আরও বলেন, সমুদ্রের জলতল যেভাবে বাড়ছে তাতে ভেনিস শহরের ভিত এর মধ্যে আস্তে আস্তে বসে যেতে শুরু করেছে। জলের উপরিভাগ এভাবে যদি উঠে আসতে থাকে তবে কিরিবাতি নামে প্রশান্ত মহাসাগরের আর এক দ্বীপরাষ্ট্রও খুব শিগগিরই পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

আচমকা জলতলের বৃদ্ধির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ক্রমাগত দূষণের ফলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এই বাড়তি কার্বন উত্তাপকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই উত্তাপে গলছে পাহাড়চূড়ার জমাট বরফ। উত্তপ্ত জলের অতিরিক্ত যোগান জলস্তরকে ক্রমশ স্ফীত করে চলেছে। বৈজ্ঞানিকদের আশঙ্কা এর ফলে কুমেরুর বরফের চাঁই যদি একবার ভাঙতে শুরু করে তবে অবস্থা আরও তাড়াতাড়ি সঙ্গীণ হয়ে উঠবে। আগামী তিন দশকের মধ্যে সমুদ্রতল মোট দেড় থেকে সাড়ে তিন মিটার উঠে আসবে। তার ফলে ফিজি ইত্যাদি নিচু প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি তাদের উর্বর তীরভূমি হারাবে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সব দেশেই সমুদ্র-তীরবর্তী শহরগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

কেক্স সেইসঙ্গে একথাও বলেন যে, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির ব্যাপারে এখন তেমন কিছুই করবার নেই।

## পরলোকে

গত ২৯ এপ্রিল '৮৭ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **শ্রীমতী প্রকৃতি রানী রায়** তাঁর ভাটপাড়ার বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

শ্রীমতী রায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য দর্শন ও তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লাভ করেন। তাছাড়া স্বামী প্রেমানন্দজী, স্বামী শিবানন্দজী, গৌরী মা প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের স্নেহাশীর্বাদ লাভে তিনি ধন্যা হয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণায় শ্যাম-নগরের গুড়দহে 'শ্রীরামকৃষ্ণ যোগায়ণ জনতীর্থ' নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে।

## ভ্রমসংশোধন

বিগত জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৪) সংখ্যায় ২৭৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ২৩শ পঙ্‌ক্তির 'রাজস্বের' স্থলে 'রাজসের' পড়তে হবে।—সঃ

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।
* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।




২য় বর্ষ, ১৯শ—২০শ সংখ্যা ● অগ্রহায়ণ ১৩০৭ ( পৃষ্ঠা ৫৯৭—৬১৫ )

এস্থলেও অতি অসঙ্গত মহাভ্রম রহিয়াছে। তুমি যে জীবন দ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই জীবন বিষয়ক জ্ঞান কিরূপ? তুমি কি জীবন বলিতে ইন্দ্রিয় বুঝ? ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানে আমরা পশু হইতে সামান্যই ভিন্ন। আমি বিশ্বাস করি, এ স্থানে উপস্থিত কাহারও আত্মা ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ নহে। অতএব আমাদের বর্ত্তমান জীবন ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানাপেক্ষা আরও কিছু অধিক বুঝায়। আমাদের সুখদুঃখানুভাবক মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গস্বরূপ; আর সেই মহাদর্শ ও পূর্ণতার অভিমুখে কঠোর চেষ্টা কি আমাদিগের জীবনের উপাদান নহে? অজ্ঞেয়-বাদীদিগের মতে আমাদের বর্ত্তমান জীবনরক্ষায় যত্নবান্ থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু জীবন বলিলে, আমাদিগের সামান্য সুখ দুঃখের সহিত আমাদিগের জীবনের অস্থিমজ্জাস্বরূপ এই আদর্শ অন্বেষণের, এই পূর্ণতাভিমুখ প্রবল চেষ্টাই বুঝায়। আমাদিগের ইহাই প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং অজ্ঞেয়বাদীর প্রত্যক্ষ সংসার লইতে পারি না। অজ্ঞেয়-বাদী জীবনের শেষোক্ত উপাদান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশিষ্টাংশই সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এই আদর্শ জ্ঞানের অগোচর জানিয়া, ইহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করেন। এই স্বভাব, এই জগৎ, ইহাকেই মায়া বলে। বেদান্তমতে ইহাই প্রকৃতি। কিন্তু কি দেবোপাসনা, প্রতীকোপাসনা, বা দার্শনিক চিন্তা অবলম্বন পূর্ব্বক আচরিত, অথবা কি দেবচরিত, পিশাচচরিত, প্রেতচরিত, সাধুচরিত, ঋষিচরিত, মহাত্মাচরিত বা অবতারচরিতের সাহায্যে অনুষ্ঠিত, অপরিণত বা উন্নত ধর্ম্মমত সকলের একই উদ্দেশ্য। সকল ধর্ম্মই ইহাকে, এই বন্ধনকে অতিক্রম করিতে অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতেছে। এক কথায় সকলেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক মানব জানিয়াছেন, তিনি বন্দী। তিনি যাহা হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা নন। যে সময়ে যে মুহূর্ত্তে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই কালে তিনি ইহা শিক্ষা করিয়াছেন। তখনই তিনি অনুভব করিয়াছেন—তিনি বন্দী। তিনি আরও বুঝিয়াছেন, এই সীমা-শৃঙ্খলিত হইয়া তাঁহার অন্তরে কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহেরও অগম্য স্থানে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছেন। দুর্দ্দান্ত, নৃশংস, আত্মীয়-গৃহসমীপে গুপ্তাবস্থিত, হত্যা ও তীব্র সুরাপ্রিয় মৃত পিতৃ বা অন্য ভূত-যোনিতে শ্রদ্ধাবান্, অতি নিম্নতম ধর্ম্মমত সকলেও আমরা সেই একরূপ স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই। যাঁহারা দেবতার উপাসন প্রিয়, তাঁহারা সেই সকল দেবতাতে আপনাপেক্ষা সমধিক স্বাধীনতা দেখিতে পান। দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও, দেবতারা গৃহ-প্রাচীর মধ্য দিয়া আসিতে পারেন; প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। এই স্বাধীনতা ভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে সগুণ ঈশ্বরাদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর মায়াতীত—ইহাই আদর্শের কেন্দ্রস্বরূপ। আমি যেন সম্মুখে কোন স্বর উত্থিত হইতে শুনিতেছি, যেন অনুভব করিতেছি, ভারতের সেই প্রাচীন আচার্য্যগণ অরণ্যাশ্রমে এই সকল প্রশ্ন বিচার করিতেছেন, বৃদ্ধ ও পবিত্রতম ঋষিশ্রেষ্ঠগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন—কিন্তু একটী বালক সেই সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

( আষাঢ়, ১৩১৪, পৃঃ ৩৭৩ )

[ পুনর্মুদ্রণ

পথ পাইয়াছি, যিনি অন্ধকারের অতীত তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়।"—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥৫॥
২য় অধ্যায়।

*  *  *
*  *  *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥৮॥
৩য় অধ্যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

একই উপনিষদ্ হইতে আমরা এই উক্তিও পাইতেছি। মায়ার কথা ইহাতেই রহিয়াছে। ভয়ঙ্কর কথা! মায়ার মধ্য দিয়া কার্য্য করা অসম্ভব। যিনি বলেন, আমি এই নদীতীরে বসিয়া থাকি, যখন সমস্ত জল সমুদ্রে গিয়া মিশিবে, তখন আমি নদী পার হইব, তাঁহার বাক্য যেমন মিথ্যা, যিনি বলেন যতদিন না পৃথিবী পূর্ণ মঙ্গলময় হয়, ততদিন কার্য্য করিয়া অনন্তর পৃথিবী সম্ভোগ করিব, তাঁহার কথাও তদ্রূপ মিথ্যা। উভয়ের কোনটাই হইবে না। মায়ার মধ্য দিয়া পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধ গমনই পথ। এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা প্রকৃতির সাহায্যকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার প্রতিবাদী হইয়াই জন্মিয়াছি। আমরা বন্ধনের কর্ত্তা হইয়া, আপনাদিগকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই বাটী কোথা হইতে আসিল? প্রকৃতি ইহা প্রদান করে নাই। প্রকৃতি বলিতেছে—'যাও বনে গিয়া বাস কর।' মানব বলিতেছে, 'আমি বাটী নির্ম্মাণ করিব, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিব।' সে তাহাই করিতেছে। মানবজাতির ইতিহাস প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যুদ্ধই প্রদর্শন করে এবং মনুষ্যই অবশেষে বিজয়ী হয়। অন্তর্জগতে আসিয়া দেখ, সেখানেও সেই যুদ্ধ চলিয়াছে; ইহা পাশব মানব ও আধ্যাত্মিক মানবের সংগ্রাম; আলোক ও অন্ধকারে সংগ্রাম। মানব এখানেও বিজেতা। মানব এই স্বাধীনতা পদবী প্রাপ্ত হইতে প্রকৃতির মধ্য দিয়া আপনার গন্তব্য পথ পরিষ্কার করেন। আমরা এতদূর মায়ার বর্ণনাই দেখিয়াছি। এই মায়া অতিক্রম করিয়া বেদান্তবিদ্ পণ্ডিতেরা এমন কিছু জানিয়াছেন, যাহা মায়াধীন নহে এবং যদ্যপি আমরা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারি, আমরাও মায়াপারে যাইব। ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্ম্মেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু বেদান্তমতে ইহা ধর্ম্মের আরম্ভ, পর্য্যবসান নহে। যিনি বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, যিনি মায়াধিষ্ঠিত, মায়া বা প্রকৃতির কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই সগুণ-ঈশ্বর-বিজ্ঞান এই বেদান্তমতের শেষ নহে। এই জ্ঞান ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়াছে, অবশেষে বেদান্ত দেখিয়াছেন, যাঁহাকে বহিঃস্থিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রকৃত অন্তরেই ছিলেন। যিনি আপনাকে বদ্ধভাবাপন্ন মনে করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মুক্তস্বরূপ।

( ৮১তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৭৪ )

# মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

( লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা )

মানুষ এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে এতদূর আসক্ত যে, সে সহজে উহা ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু সে এই বাহ্য জগৎকে যতদূর সত্য ও সার বলিয়া বোধ করুক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন সময় আইসে, যখন তাহাদিগকে অনিচ্ছাসত্বেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়—জগৎ কি সত্য? যে ব্যক্তি তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও সময় পান না, যাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই কোন না কোনরূপ বিষয়-ভোগে নিযুক্ত, মৃত্যু তাঁহারও নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

# ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

( পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত )

[ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২৫ সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যানুবাদের শেষাংশ এবং ২৬ হইতে ৩৩ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলানুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ এবং ৩৪ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলানুবাদ, ভাষ্য এবং ভাষ্যানুবাদের প্রথমাংশ—বর্ত্তমান সম্পাদক ]।

উদ্বোধন

২য় বর্ষ। ] ১৫ই অগ্রহায়ণ। ( ১৩০৭ সাল ) [ ২০শ সংখ্যা

# পরমহংসদেবের উপদেশ

( স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত। )

১। এক রকম বাদ্‌লে পোকা আছে, তারা আলো দেখ্‌লে ছুটে যায়, তারা তাতে প্রাণ দেয়, তবু অন্ধকারে আর যায় না; তেমনি যারা ভগবানের ভক্ত, তারা যেখানে সাধু থাকে ও ঈশ্বরীয় কথা হয়, সেখানে ছুটে যায়, সাধন ভজন ছাড়া সংসারের অসার পদার্থে আর বদ্ধ হয় না।

২। একটী লোক পরমহংসদেবের নিকট এসে বল্লে, "মহাশয়, অনেকদিন সাধন ভজন কর্‌লুম, কিছুই ত বুঝতে সুঝতে পার্‌লুম না, আমাদের সাধন ভজন করা মিছে।" পরমহংসদেব ঈষৎ হাস্য করে বল্লেন, "দেখ যারা খানদানী চাষা, তারা বার বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ দিতে ছাড়ে না। আর যারা ঠিক চাষা নয়, চাষের কাযে বড় লাভ শুনে কারবার কর্‌তে আসে, তারাই এক বৎসর বৃষ্টি না হলেই চাষ ছেড়ে দিয়ে পালায়; তেমনি যারা ঠিক ঠিক

( আষাঢ়, ১৩১৪, পৃঃ ৩৭৫ )

ভক্ত ও বিশ্বাসী, তারা সমস্ত জীবন তাঁর দর্শন না পেলেও তাঁর নাম গুণানুকীর্ত্তন কর্‌তে ছাড়ে না।

৩। যার তৃষ্ণা পায়, সে কি গঙ্গার জল ঘোলা ব'লে তখনি একটা পুকুর কেটে জল পান কর্‌তে যায়; তেমনি যার ধর্ম্মতৃষ্ণা পায় নি, সে এ ধর্ম্ম ঠিক নয়, ও ধর্ম্ম ঠিক নয়, এইরূপ বলে গোলমাল করে বেড়ায়। তৃষ্ণা থাক্‌লে অত বিচার চলে না।

৪। যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ কর্‌তে চায় না, তার হবিষ্যান্ন গোমাংস তুল্য হয়, আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করে, তার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্নের তুল্য হয়।

৫। ভগবান্ সকলকার ভিতর কিরূপে বিরাজ করেন জান? যেমন চিকের ভিতর বড় লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখ্‌তে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখ্‌তে পায় না; ভগবান্ ঠিক সেইরূপে বিরাজ কর্‌ছেন।

৬। সংসারে সুখের লোভে অনেকে ধর্ম্ম কর্ম্ম করে থাকে, একটু দুঃখ কষ্ট পেলে কিম্বা মরবার সময় তারা সব ভুলে যায়; যেমন টিয়া পাখী এম্‌নে সমস্ত দিন রাধাকৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেরালে যখন ধরে, তখন রাধাকৃষ্ণ ভুলে গিয়ে নিজের বোল কঁ্যা কঁ্যা কর্‌তে থাকে।

# পারিস্-প্রদর্শনী।

## প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"সম্পাদক মহাশয়েষু।—

এই মাসের প্রথমাংশে কয়েক দিবস যাবৎ পারিস্ (Paris)-মহাদর্শনীতে "কংগ্রে দ'লিস্তোয়ার-দে রিলিজি অঁ" অর্থাৎ ধর্ম্মেতিহাস নামক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় অধ্যাত্মবিষয়ক এবং মতামতসম্বন্ধী কোনও চর্চ্চার স্থান ছিল না, কেবল মাত্র বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গ সকলের তথ্যতানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এ বিধায়, এ সভায় বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একান্ত অভাব। চিকাগো মহাসভা এক বিরাট্ ব্যাপার ছিল। সুতরাং সে সভায় নানা দেশের ধর্ম্মপ্রচারক মণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় জন কয়েক পণ্ডিত, যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ক চর্চ্চা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন। এবার এখানে ধর্ম্মসভা না হইবার কারণ এই যে, চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়, বিশেষ উৎসাহে, যোগদান করিয়াছিলেন;—মনে করিয়াছিলেন প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার করিবেন, এবং সমগ্র কৃষ্টান জগৎ, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্বমহিমা নির্ব্বিঘ্নে ও সুন্দররূপে কীর্ত্তন করতঃ বিশেষ ফললাভ করিবেন। কিন্তু ফল অন্যরূপ হওয়ায়, কৃষ্টান্-সম্প্রদায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছেন; ক্যাথলিকরা এখন ইহার বিশেষ বিরোধী। ফ্রান্স—

ক্যাথলিক-প্রধান ; অতএব, যদিও কর্ত্তৃপক্ষদের যথেষ্ট বাসনা ছিল, তথাপি সমগ্র ক্যাথলিক-জগতের বিপক্ষতায়, ধর্ম্মসভা করা হইল না।

যে প্রকার, মধ্যে মধ্যে Congress of orientalist অর্থাৎ সংস্কৃত, পালী, আরব্যাদি ভাষাভিজ্ঞ বুধমণ্ডলীর মধ্যে মধ্যে উপবেশন হইয়া থাকে, সেইরূপ, উহার সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রত্নতত্ত্ব যোগ দিয়া, প্যারিসে এ ধর্ম্মেতিহাস সভা আহূত হয়।

জম্বুদ্বীপ হইতে কেবল মাত্র দুই তিন জন জাপানি-পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ।

বৈদিক ধর্ম্ম ও অগ্নি, সূর্য্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড় বস্তুর আরাধনা সমুদ্ভূত, এইটি অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞের মত।

স্বামী বিবেকানন্দ, উক্ত মত খণ্ডন করিবার জন্য, প্যারি-ধর্ম্মেতিহাস সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক প্রবল অসুস্থতা নিবন্ধন প্রবন্ধাদি লেখা ঘটিয়া উঠে নাই ; কোনও মতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন মাত্র। উপস্থিত হইলে ইউরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ; এবং উঁহারা ইতিপূর্ব্বেই স্বামীজীর রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

সে সময় উক্ত সভায় ওপর্ট নামক এক জর্ম্মান্ পণ্ডিত শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শালগ্রামের উৎপত্তি "যোনি" চিহ্ন বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার মতে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন এবং তদ্বৎ শালগ্রাম শিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন। শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম উভয়ই লিঙ্গ-যোনি পূজার অঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত মতদ্বয়ের খণ্ডন করিয়া বলেন যে, শিবলিঙ্গের নরলিঙ্গতা সম্বন্ধে অবিবেক মত প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু শালগ্রাম সম্বন্ধে এ নবীন মত অতি আকস্মিক।

স্বামীজী বলেন যে শিবলিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি অথর্ব্ববেদ সংহিতার প্রসিদ্ধ যূপ স্তম্ভের স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে। এবং উক্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি, ধূম, ভস্ম, শিখা, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ, যে প্রকার মহাদেবের অঙ্গ-কান্তি, পিঙ্গজটা, নীলকণ্ঠ, বৃষবাহনত্বাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপ-স্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় তদ্বৎ যজ্ঞোচ্ছিষ্টেরও ব্রহ্মত্বে মহিমা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

লিঙ্গ-পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করিয়া মহাস্তম্ভের মহিমা ও মহাদেবের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরে হইতে পারে যে, বৌদ্ধাদির প্রাদুর্ভাব কালে বৌদ্ধস্তূপসমাকৃতি দরিদ্রার্পিত ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারক স্তূপও সেই স্তম্ভে অর্পিত হইয়াছে। যে প্রকার, অদ্যাপিও ভারতখণ্ডে কাশ্যাদি তীর্থস্থলে অপারক ব্যক্তি অতিক্ষুদ্র মন্দিরাকৃতি উৎসর্গ করে, সেই প্রকারে বৌদ্ধরাও ধনাভাবে অতিক্ষুদ্র স্তূপাকৃতি বুদ্ধদেবের উদ্দেশে অর্পণ করিত।

( আষাঢ়, ১৩১৪, পৃঃ ৩৭৭ )

বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তূপমধ্যে শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থি-ভস্মাদি রক্ষণ-শিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পূজিত হইয়া, বৌদ্ধ মতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নর্ম্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধ-প্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও নেপাল-প্রসূত শালগ্রামই যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য।*

শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা অতিঅশ্রুতপূর্ব্ব এবং প্রথম হইতেই অপ্রাসঙ্গিক; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি অর্ব্বাচীন এবং উক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময় সংঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোর বৌদ্ধ তন্ত্র সকল এখনও নেপালে ও তিব্বতে খুব প্রচলিত।

অন্য এক বক্তৃতা স্বামীজি ভারতীয় ধর্ম্মমতের ধর্ম্মবিস্তার বিষয়ে দেন। তাহাতে বলা হয় যে, বৌদ্ধাদি সমস্ত ভারতীয় ধর্ম্ম-মতের উৎপত্তি বেদে। সকল মতের বীজ তন্মধ্যে প্রোথিত আছে। সেই বীজকে বিস্তৃত ও উন্মীলিত করিয়া বৌদ্ধাদি মতের সৃষ্টি, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মও ঐ সকলের বিস্তার। সমাজের বিস্তার ও সঙ্কোচের সহিত সে বীজ কোথাও বিস্তৃত, কোথাও সঙ্কুচিত হইয়া বিরাজমান আছে। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন। এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বলেন যে, যে প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাজকুলাদির ইতিহাস ক্রমশঃ প্রত্নতত্ত্বোদ্ঘাটনের সহিত প্রমাণীকৃত হইতেছে, সেই প্রকার ভারতের কিম্বদন্তী সমস্ত সত্য। বৃথা প্রবন্ধ কল্পনা না করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেন উক্ত কিম্বদন্তীর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলর এক পুস্তকে লিখিতেছেন যে, যতই সৌসাদৃশ্য থাকুক না কেন, যতক্ষণ না ইহা প্রমাণিত হইবে যে, কোনও গ্রীক্ সংস্কৃত ভাষা জানিত, ততক্ষণ সপ্রমাণ হইল না যে ভারতবর্ষের সাহায্য প্রাচীন গ্রীস্ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত, ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটী সংজ্ঞা, গ্রীক্ জ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া, এবং গ্রীকরা ভারতপ্রান্তে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, সমগ্র ভারতের উপর, ভারতের সাহিত্যে, জ্যোতিষে, গণিতে, গ্রীক্ সহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতি সাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীক্‌দের বিদ্যার ছায়া!!

* এতৎ সমস্ত পাশ্চাত্য ধরণের শুষ্ক প্রত্নতত্ত্বান্তর্গত এতদ্দেশীয় সুমধুর বিশ্বাসপ্রসূতামৃত নহে। স্বামীজীর যে, অবশ্য, শালগ্রামে নারায়ণ-জ্ঞান নাই, এ মত যেন কেহ বিবেচনা না করেন। প্যারিস-সভা ধর্ম্ম-সভা নহে—উপরে সংবাদদাতাও বলিয়াছেন। তথায় কোনও সম্প্রদায়বিশেষের বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচ্য প্রথানুযায়ী চর্চ্চা করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কোনও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কার্য্যকারণসম্বন্ধবিচার কথঞ্চিৎ করিতে পারা গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও বা আধুনিক বিজ্ঞানমতে, এবং ঐতিহাসিক উপায়ে, প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। স্বীয় বা স্বদেশীয় বিশ্বাসনেত্র মধ্য দিয়া সে কার্য্যকারণ সভাস্থগণকে দেখাইলে, তথায় তাহা গ্রহণীয় হইবার সম্ভব অতি স্বল্পই ছিল। অস্মদ্দেশীয় বিশ্বাস যে বিশ্বতোমুখ, কল্পতরু তুল্য ফলদায়ক, এবং অতি প্রশান্ত গভীর ও প্রশস্ত হৃদয়গম্য, এবং তদ্রূপে বহিষ্কালোচ্য, তাহা পাশ্চাত্যাঞ্চলের অনেকস্থলে আধুনিক বা সাম্প্রদায়িক (তথাকথিত) বুধমণ্ডলীর মধ্যে প্রতীত হইতে এখনও কিছু সময়সাপেক্ষ। এই সম্প্রীতি ইহার সূত্রপাত মাত্র।—সম্পাদক।

(৬১তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৭৮)

এক "ম্লেচ্ছা বৈ যবনাঃ তেষু এষা বিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে......"

এই শ্লোকের উপর কতই না পাশ্চাত্যেরা কল্পনা চালাইয়াছেন। উক্ত শ্লোকে কি প্রকারে প্রমাণীকৃত হইল যে আর্য্যেরা ম্লেচ্ছের নিকট শিখিয়াছেন; ইহাও বলা যাইতে পারে যে, উক্ত শ্লোকে আর্য্যশিষ্য-ম্লেচ্ছদিগকে উৎসাহবান্ করিবার জন্ত বিদ্যার আদর প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, "গৃহে চেৎ মধু বিন্দেত, কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ?" আর্য্যদের প্রত্যেক বিদ্যার বীজ বেদে রহিয়াছে। এবং উক্ত কোনও বিদ্যার বৈদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদই দেখান যাইতে পারে। এ অপ্রাসঙ্গিক যবনাধিপত্যের আবশ্যকতাই নাই।

তৃতীয়তঃ, আর্য্য জ্যোতিষের প্রত্যেক গ্রীক্‌সদৃশ শব্দ সংস্কৃত হইতে সহজেই ব্যুৎপন্ন হয়; উপস্থিত ব্যুৎপত্তি ত্যাগ করিয়া, যাবনিক ব্যুৎপত্তি গ্রহণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের যে কি অধিকার, তাহাও বুঝি না।

ঐ প্রকার কালিদাসাদিকবিপ্রণীত নাটকে যবনিকা শব্দের উল্লেখ দেখিয়া, যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্য নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে আর্য্যনাটক গ্রীক্‌নাটকের সদৃশ কি না? যাঁহারা উভয় ভাষার নাটক রচনা প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঐ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিন্‌কালেও বর্ত্তমানত্ব নাই। সে গ্রীস্ কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক্ যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্য্যনাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্য্যনাটকের আর এক।

আর্য্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীক্ নাটকে আদৌ ত নাই, বরং সেক্সপীয়রপ্রণীত নাটকের সহিত ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে।

অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সেক্সপীয়র সর্ব্ব বিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

শেষ, পণ্ডিত মোক্ষমূলরের আপত্তি তাঁহার নিজের উপরই প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে কোনও হিন্দু কোনও কালে গ্রীক্ ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ও গ্রীক্ প্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

তদ্বৎ আর্য্য-ভাস্কর্য্যে গ্রীক্ প্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মাত্র।

স্বামীজি শ্রীকৃষ্ণারাধনা যে বৌদ্ধাপেক্ষা অতি প্রাচীন তাহাও বলেন, এবং গীতা যদি মহাভারতের সমসাময়িক না হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষাও প্রাচীন, নবীন কোনও মতে নহে। গীতার ভাষা, মহাভারতের ভাষা, এক। গীতায় যে সকল বিশেষণ অধ্যাত্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই বনাদি পর্ব্বে বৈষয়িক সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ঐ সকল শব্দের প্রচুর প্রচার না হইলে, এমন ঘটা অসম্ভব। পুনশ্চ সমস্ত মহাভারতের মত আর গীতার মত একই; এবং গীতা যখন, তৎসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়েরই আলোচনা করিয়াছেন, তখন বৌদ্ধদের উল্লেখমাত্রও কেন করেন নাই?

(আষাঢ়, ১৩১৪, পৃঃ ৫৭৯)

বৌদ্ধপর যে কোনও গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হইতেছে না। কথা, গল্প, ইতিহাস বা কটাক্ষের মধ্যে কোথাও না কোথাও বৌদ্ধমতের বা বুদ্ধের উল্লেখ প্রকাশ্য বা লুক্কায়িত রহিয়াছে,—গীতার মধ্যে কে সে প্রকার দেখাইতে পারেন? পুনশ্চ গীতা ধর্ম্মসমন্বয় গ্রন্থ, সে গ্রন্থে কোনও মতের অনাদর নাই, সে গ্রন্থকারের সাদর বচনে এক বৌদ্ধ মতই বা কেন বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ প্রদর্শনের ভার কাহার উপর?

গীতায় উপেক্ষা কাহাকেও করা হয় নাই। ভয়?—তাহারও একান্ত অভাব। যে ভগবান্ বেদপ্রচারক হইয়াও বৈদিক হঠকারিতার উপর কঠিন ভাষা প্রয়োগেও কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহার বৌদ্ধমতে আবার কি ভয়?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রকার গ্রীক্ ভাষার এক এক গ্রন্থের উপর সমস্ত জীবন দেন, সেই প্রকার এক এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উপর জীবন উৎসর্গ করুন; অনেক আলোক জগতে আসিবে। বিশেষতঃ এ মহাভারত ভারত-ইতিহাসের অমূল্য গ্রন্থ। ইহা অত্যুক্তি নহে যে এ পর্য্যন্ত উক্ত সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতে উত্তমরূপে অধীতই হয় নাই।

বক্তৃতার পর অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন। অনেকেই বলিলেন, স্বামীজি যাহা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের সম্মত এবং স্বামীজিকে আমরা বলি যে সংস্কৃত-প্রত্নতত্ত্বের আর সে দিন নাই। এখন নবীন সংস্কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের মত অধিকাংশই স্বামীজির সদৃশ এবং ভারতের কিম্বদন্তী পুরাণাদিতে যে বাস্তব ইতিহাস রহিয়াছে, তাহাও আমরা বিশ্বাস করি।

অন্তে বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় অন্য সকল বিষয়ে অনুমোদন করিয়া, এক গীতার মহাভারত-সমসাময়িত্বে দ্বৈধমত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু প্রমাণ-প্রয়োগ এইমাত্র করিলেন যে অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে গীতা মহাভারতের অঙ্গ নহে।

অধিবেশনের লিপি পুস্তকে উক্ত বক্তৃতার সারাংশ ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হইবে।"

# শ্রীরামানুজ চরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাপ্রভাব। [ ৬২ পৃষ্ঠার পর

'আমি আপনার ন্যায় মহানুভবের কথঞ্চিৎ ভৃত্যকার্য্য করিতেছি বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আপনার পিতামহ ভগবদ্ভৃত্যগণের অগ্রগণ্য। আপনি সেই মহাকুলীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য আপনাতে আমি আমার প্রভু মহাত্মা নাথমুণির আবির্ভাব দেখিতেছি। আজ আমি ধন্য হইলাম। এই বলিয়া নম্বি নিরস্ত হইলে আল্‌ওয়ান্দার গদ্গদ স্বরে বলিলেন, "হে গুরো! আপনি আমার ওরূপে আর প্রশংসা করিবেন না। আমি প্রান্তবিকই জীবনের অবশিষ্টাংশ আপনার অনুবর্ত্তী হইয়া সংসার প্রলোভনের হস্ত অতিক্রম করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এই সংসাররূপ ভয়ঙ্কর তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্রে আপনার ন্যায় কর্ণধার না থাকিলে আমার দুর্ব্বল তরণী মগ্ন হইয়া যাইবে, ও পরিশেষে আমার বিষয় নক্র কবলিত করিয়া ফেলিবে। অতএব আপনি সদয় হউন।'

# উদ্বোধন : শ্রাবণ ১৩৯৪

## সূচীপত্র

# উদ্বোধনের নিয়মাবলী

● **লেখক-লেখিকাদের জন্য :** ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্ম সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার ও গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে রেজেস্ট্রি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্ম উপযুক্ত ডাকটিকিট বা ডাকটিকিট সম্বলিত কার্ড / ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

● **গ্রাহকদের জন্য :** মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৫'০০ টাকা, বাংলাদেশে ৪৩'০০ টাকা, ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে সি মেল-এ ৮৮'০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২৩৩'০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২'৫০ টাকা। বছরের যে-কোন সময়ে বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে মাঘ মাস থেকে।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।

● **আজীবন-গ্রাহকদের জন্য :** এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে ( প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০.০০ টাকা ) ৪০০'০০ ( চারশ ) টাকা দিলে আজীবন-গ্রাহক ( ৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ ) হওয়া যায়। যে-কোন মাস থেকে আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পত্রাদি লিখবার সময় **গ্রাহক-সংখ্যা** অবশ্যই উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানাতে হবে।

কার্যালয়ে নিজে এসে অথবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া, অথবা মনিঅর্ডারযোগে বা ডিমাণ্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট্ "Udbodhan Office" এই নামে করতে হয়।

● **প্রকাশকদের জন্য :** সমালোচনার জন্ম দুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন।

● **বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :** কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাবে।

● **কার্যালয়ের সময় :** সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০, রবিবার বন্ধ।

কার্যাধ্যক্ষ
**উদ্বোধন কার্যালয়**
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৩
ফোন : ৫৫-২৪৪৭

## উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ]

# স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

| | | | |
|---|---|---|---|
| কর্মযোগ | ৮.০০ | ধর্ম-সমীক্ষা | ৫.০০ |
| ভক্তিযোগ | ৪.৫০ | ধর্মবিজ্ঞান | ৫.৫০ |
| ভক্তি-রহস্য | ৫.০০ | বেদান্তের আলোকে | ৪.৫০ |
| জ্ঞানযোগ | ১৪.০০ | কথোপকথন | ৫.০০ |
| জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে | ১০.০০ | ভারতে বিবেকানন্দ | ২০.০০ |
| রাজযোগ | ১২.০০ | দেববাণী | ১২.০০ |
| সরল রাজযোগ | ১.৮০ | মদীয় আচার্যদেব | ২.৫০ |
| সন্ন্যাসীর গীতি | ০.৮০ | চিকাগো বক্তৃতা | ২.২৫ |
| ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট | ১.০০ | মহাপুরুষপ্রসঙ্গ | ১২.০০ |
| পত্রাবলী। (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ) রেক্সিন-বাঁধাই | ৪০.০০ | ভারতীয় নারী | ৫.০০ |
| পওহারী বাবা | ১.২৫ | ভারতের পুনর্গঠন | ১.৫০ |
| স্বামীজীর আহ্বান | ১.২৫ | শিক্ষা ( অনূদিত ) | ৪.২০ |
| বাণী-সঞ্চয়ন | ১২.০০ | শিক্ষাপ্রসঙ্গ | ৮.০০ |

## স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা

| | | | |
|---|---|---|---|
| পরিব্রাজক | ৪.২৫ | ভাববার কথা | ৪.০০ |
| প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য | ৫.০০ | বর্তমান ভারত | ২.৫০ |

## স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ৩০্ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ৩০০্ টাকা
সাধারণ বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ২০্ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ২০০্ টাকা

## শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

স্বামী সারদানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ( দুই ভাগে )
রেক্সিন-বাঁধাই। ১ম ভাগ ৩৫.০০, ২য় ভাগ ৩০.০০

অক্ষয়কুমার সেন
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি ৪৫.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা ৫.৫০

স্বামী প্রেমঘনানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প ৭.০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ২.৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের রামকৃষ্ণ ( সচিত্র ) ৫.৫০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী .৭৫

স্বামী তেজসানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ৯.০০

# উদ্বোধন

## স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বাংলা মাসিক পত্রিকা।

৮৯তম বর্ষ চলছে।

● মাঘ থেকে বছর আরম্ভ হয়। বছরের যে-কোন সময় গ্রাহক করা হয়। বছরের যে-কোন সময় বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে মাঘ মাস থেকে।

বার্ষিক চাঁদার হার ( সডাক ) :

| | |
|---|---|
| ভারতে | ২৫'০০ টাকা |
| বাংলাদেশে | ৪৩'০০ ,, |
| ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে— | |
| সি-মেলে | ৮৮'০০ ,, |
| এয়ার মেলে | ২৩৩'০০ ,, |

● এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০'০০ টাকা) ৪০০'০০ (চারশ) টাকা দিলে আজীবন-গ্রাহক (৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। যে-কোন মাস থেকেই আজীবন গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রিকার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উদ্বোধনের গ্রাহক হতে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।



৮৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

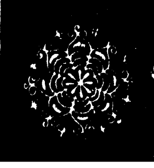
শ্রাবণ, ১৩৯৪

# দিব্য বাণী

বৈদিক সংস্কৃত এত প্রাচীন, সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র এত সুপরিণত যে, একটি শব্দের অর্থ লইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তর্ক চলিতে পারে। কোন পণ্ডিতের যদি খেয়াল হয়, তবে তিনি যে-কোন অর্থহীন উক্তিকেও যুক্তিবলে এবং শাস্ত্র ও ব্যাকরণের নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিয়া তুলিতে পারেন। উপনিষদ্ বুঝিবার পক্ষে এই সকল বাধাবিঘ্ন আছে। বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, অপরদিকে তেমনি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষাতেই আমি শুধু অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টরূপে প্রথমে উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্র বুঝিতে শিখিয়াছি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১২৪ ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

উপনিষদ্ (বৃহঃ, ২।৪।৫) বলিতেছেন: 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ'—আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। এই আত্মদর্শন, আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বর-দর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ইহাই শাস্ত্রের সার কথা। শাস্ত্র আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের চলার পথের প্রকৃত সন্ধান নির্দেশ করে। কোন্ পথ অবলম্বনীয় আর কোন্ পথই বা অনবলম্বনীয় তাহার নির্দেশও শাস্ত্রই দিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি সীমিত। তাই শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ ধারণা করা তাহার পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। সে দেখে ঈশ্বর-দর্শনের উপায় সম্বন্ধে বেদ নানা রকম কথা বলিতেছে, স্মৃতিশাস্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন পথের নির্দেশ দিতেছে। এইসব বিভিন্ন কথা হইতে সঠিক পথটি বাছিয়া লওয়াই যে শুধু দুষ্কর তাহা নহে, অপরপক্ষে এইসব নানা মতের মধ্যে পড়িয়া কোন্‌টি গ্রাহ্য আর কোন্‌টিই বা ত্যাজ্য—এই বিষয়ে সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন: "শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন।" (কথামৃত, ৪।২০।৫)

তাহা হইলে উপায় কি? বালিটুকু বাদ দিয়া চিনিটুকু কি করিয়া লইব? মহাভারতে পাণ্ডবদের বনবাসকালে দ্বৈতবনে যক্ষের বেশে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'কঃ পন্থাঃ'? অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করিবার, তাঁহাকে দর্শন করিবার রাস্তাটি কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন:

> বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
> নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
> ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
> মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

বনপর্ব, ২৬৭।৮৪

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নাই যাঁহার মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। অতএব মহাজ্ঞানী মহাজনেরা যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন তাহাই পথ, আর সেই পথই অবলম্বনীয়। গীতাও (৩।২১) একই কথা বলিতেছেন:

> যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করে। তাঁহারা যাহা প্রামাণিক বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকে তাহাই অনুসরণ করে।

প্রশ্ন জাগে, মহাজন কাঁহারা? যাঁহারা ধর্ম উপলব্ধি করিয়া তাহাকে নিজেদের জীবনে আচরণ করিয়াছেন—যাঁহাদের মন-মুখ এক, তাঁহারাই মহাজন। মহাজনদের জীবন হইতে আমরা যে-শিক্ষা পাই, শাস্ত্র হইতে এত সহজে তাহা পাই না। গীতায় (২।৫৪) দেখি অর্জুন ভগবানের শুধু কথায় তুষ্ট নন। তিনি জানিতে চাহিলেন:

> স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
> স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।

—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কি ভাবে কথা বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিরূপেই বা বিচরণ করেন? কেননা তাঁহাদের জীবনের আলোকে নিজেদের চলার পথ চিনিয়া লওয়া সহজ। সম্মুখে কোন দৃষ্টান্ত না থাকিলে মানুষের পক্ষে শাস্ত্রাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। মহাজনেরা হইলেন সেইরূপ দৃষ্টান্ত—যাঁহাদের জীবনে শাস্ত্র-কথিত সত্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাজনেরা যে উপদেশ প্রদান করেন—মানুষের জন্য যে পথ নির্দেশ করেন তাহা কেবল শাস্ত্রাশ্রিত উপদেশ নয়, তাহা তাঁহাদের সাধনলব্ধ সত্য, যাহা তাঁহারা জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া দেন।

"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" ধর্মের তত্ত্বটি কোথায় আছে? আছে গুহায়, অর্থাৎ হৃদয়-গুহায়। এই তত্ত্ব অতি গহন। শাস্ত্র হৃদয়-গুহায় ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে বলিয়াছেন। মানুষ হৃদয়-গুহার সন্ধান জানে না, তাই এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। হৃদয়-গুহায় ভগবানকে উপলব্ধি করিবার পথনির্দেশও শাস্ত্রে আছে অবশ্যই। কিন্তু যেই পথ অবলম্বন করিয়া মহাজনেরা হৃদয়-গুহায় ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমাদেরও সেই পথ অবলম্বন করিয়াই চলিতে হইবে। কেননা মহাজনেরা নিজেরা আচরণ করিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেন যে ভিতরেই সব, বাহিরে কিছুই নাই। যীশু বলিয়াছেন: স্বর্গরাজ্য আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, বাহিরে নয়। সাধক কমলাকান্ত বলিয়াছেন: "আপনাতে-আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারো ঘরে।/যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন: "তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপরে হাত পা ছুঁড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারী হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের ভিতরে ডুব দিতে হয়।" (কথামৃত, ৫ পরিশিষ্ট ক/৬)। এই সকল মহাপুরুষেরা নিজেরাও দেখাইয়া গিয়াছেন কি করিয়া ডুব দিতে হয়। যীশুর ঈশ্বর-প্রেমে, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বদা মায়ের নামে বিভোর হইয়া থাকা—ডুব দেওয়ার বাস্তব দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "কি করি; পেছনে শোলা বাঁধা আছে। ডুবতে দেয় না।" (ঐ) এই কথা আমাদের সকলের পক্ষেই সত্য। আমরা ঈশ্বরে ডুবিতে পারি না। কেননা ইন্দ্রিয়াসক্তিরূপ শোলা আমাদের ডুবতে দেয় না। ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করিতে পারিলেই শোলা-মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাহার জন্য চাই সতত চেষ্টা অর্থাৎ সাধনা। সর্বদা অন্তর্মুখী হইয়া ঈশ্বরে ডুবে থাকা যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। হয়তো যীশু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের মতো সাধনা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরে ডুব দেওয়ার প্রেরণা আমরা পাইয়া থাকি এবং ক্রমে ক্রমে নিজের অন্তরে তাঁহাকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথটি আমরা পাই।

সকলেই শান্তি ও আনন্দ পাইতে চায়। কিন্তু সংসারাসক্তি ত্যাগ করিতে না পারিলে যথার্থ শান্তি ও আনন্দলাভ করা যায় না। মহাজনেরা সংসারকে অসার বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন: "সংসারে আছে কি? আমড়ার অম্বল; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে আছে কি? আঁটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল হয়।" (কথামৃত, ২।২৫।২)। কাজেই শান্তিলাভ করিতে হইলে সংসারের

অসার বস্তু ছাড়িয়া ভিতরকার সার বস্তুটিকে অর্থাৎ ভগবানকে ধরিতে হইবে। বিবেকের অভাবের জন্য আমরা সার বস্তু ছাড়িয়া অসার বস্তু ধরি, ফলে পথভ্রষ্ট হই। অনেক সময় এই বিবেকবোধ আমাদের মধ্যে একটু-আধটু জাগরিত হইলেও সবসময় এই সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকি না। তাহার ফলে কার্যকালে আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া বসি। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ছুতোর-মেয়েদের দৃষ্টান্ত দিয়া ঈশ্বরে মন রাখিয়া সংসারের কর্ম করিতে নির্দেশ করিয়াছেন। "ও দেশে ছুতোরের মেয়েদের দেখেছি—ঢেঁকি নিয়ে চিঁড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই দেয়—আবার খরিদ্দারের সঙ্গে কথাও কচ্চে;—'তোমার কাছে দু আনা পাওনা আছে—দাম দিয়ে যেও।' কিন্তু তার বার আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে ঢেঁকি পড়ে যায়।" (কথামৃত, ৪।১৯।১) এইরূপে ঈশ্বরকে সার জানিয়া বার আনা মন তাঁহাতে রাখিয়া সংসার-কর্ম করিলেই শান্তি—আনন্দ।

অহংবুদ্ধির লেশমাত্র থাকিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। "মহাজন বলিয়াছেন:

'মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি
তায় সেঁচ না
আপনি যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে
সঙ্গে নেনা।
কালীনামে দেও রে বেড়া মন, ফসলে
তছরুপ হবে না
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছেতে
যম ঘেঁসে না॥

মানব-জমিন, গুরুদত্ত বীজ, বীজরোপণ, ভক্তি-জল-সেচন আর কালীনামের বেড়া দেওন—এইরূপে সাধন করে আপনাকে পর্যন্ত নিবেদন—এই হ'ল সঙ্কেত। শ্রীঠাকুর বলতেন 'রাম-প্রসাদকে সঙ্গে নেনা' এর মানে অহংবুদ্ধি—আমি রামপ্রসাদ অথবা অমুক—এ পর্যন্ত ভুলে যাওয়া। একেবারে তন্ময়ত্ব লাভ করা—এই হল সাধনের পর্যবসান।" (স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৫২-৫৩) কিন্তু অহঙ্কার ত্যাগ করা বড় কঠিন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এই সঙ্গীতের রচয়িতা সাধক রামপ্রসাদ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া যেমন অহঙ্কার ত্যাগ করার কথা বলিয়াছেন, তেমনি নিজের জীবন দ্বারাও তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। রামপ্রসাদের জীবনে দেখা যায় তিনি মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিয়াছেন। নিজের অহংভাব যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অহংভাব এতদূর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে তিনি মুখে পর্যন্ত 'আমি' 'আমার' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। সাধারণ মানুষ অবশ্য এতদূর পারিবে না; সেইজন্য তিনি 'আমি ভগবানের দাস', এই অহঙ্কার লইয়া চলার পথ সাধারণের জন্য নির্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন: "'দাস আমি' অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বরের দাস', আমি তাঁর ভক্ত, এই অভিমান, এতে দোষ নাই; বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়।" (কথামৃত, ১।৪।৭)

মহাজনদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার আর একটি সুফল হইল এই যে, তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত সনাতন ধর্মকে যুগোপযোগী করিয়া আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেন। নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বর-লাভের একটি পথ। নিষ্কাম কর্ম কিরূপে করিতে হয় তার উপায়ও শাস্ত্রে নির্দেশিত আছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'-রূপ নিষ্কাম কর্মের যে পথ নির্দেশ করিলেন আধুনিকযুগে মানবতাবাদে প্রভাবিত মানুষের পক্ষে তাহা

খুবই উপযোগী সাধন-পথ। আর 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'র মাধ্যমে নিষ্কাম কর্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁহারই প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কর্মবহুল জীবনের মধ্যে। এই পথকে স্বামীজী বাস্তবে রূপদান করিয়া আধুনিক মানব-জাতির জন্য ধর্ম-সাধনার এক নূতন যথার্থ দিঙ্‌নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই পথ অনুসরণ করিলে আমাদের যে যথার্থ কল্যাণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সুতরাং মহাজন-উপদিষ্ট ও তাঁহাদের আচরিত পথের অনুসরণ করাই ধর্ম-সাধনার তথা ঈশ্বর লাভের সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায়।

# স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[ ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত ]

১

দার্জিলিঙ
৩ এপ্রিল, ১৮৯৭

প্রিয় মিস্ নোব্‌ল্,

ভারতের নিপীড়িত জনগণের জন্যে তোমার করবার মত গুরুত্বপূর্ণ একটু-খানি কাজ আমি পেয়ে গেছি।

যে ভদ্রলোককে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আমি উদ্যোগী হয়েছি, তিনি 'তিয়া'দের ( Tiya ) হয়ে বলবার জন্যে ইংলণ্ডে গিয়েছেন। এই তিয়ারা হল মালাবার নামক দেশীয় রাজ্যের এক বঞ্চিত সম্প্রদায়। এই ভদ্রলোকের কাছে তুমি জানতে পারবে, কেবলমাত্র নিম্নবর্ণের ব'লে এই হতভাগ্য লোকগুলির উপর কি পরিমাণ অত্যাচার করা হয়ে থাকে।

ভারতসরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হননি—কোনও দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ না করাই তাঁদের নীতি—এই যুক্তিতে। এখন এই লোকগুলির একমাত্র ভরসা হল ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট। ব্রিটিশ জনগণের সমক্ষে বিষয়টি আনতে তোমার শক্তিতে যতদূর পার সাহায্য কর।

তোমাদের চিরসত্যাবদ্ধ,
বিবেকানন্দ

* Prabuddha Bharata Vol LXXXII, August 1977 সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত পত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত পাঁচখানি পত্রের বঙ্গানুবাদ।—সঃ

২[1]

আলমোড়া
২০ জুন, ১৮৯৭

প্রিয় মিস্ নোব্‌ল্,

তোমার সহৃদয় পত্রটির জন্য অজস্র ধন্যবাদ।···
···মিস্ মূলার এখানে আছেন এবং নানারকম পরিকল্পনা করছেন। ফলাফল কি হবে ঈশ্বর জানেন।···

এখানকার যন্ত্রটিকে একটু চালু করে দিয়ে আগামী গ্রীষ্মে আমি লণ্ডনে যাব। দুমাসের মধ্যেই আমি এই পাহাড় থেকে নেমে উত্তর ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে বক্তৃতাসফর করছি। সারা শীতকাল এতেই লেগে যাবে। আমি এখানে একটি সংঘের পত্তন করে ফেলেছি ; বেশ কিছু পরিচয়পুস্তিকা ( prospectus ) প্রস্তুত হওয়ামাত্র তোমায় পাঠিয়ে দেব।

ভাল কথা, আমার বন্ধু খেতড়ির রাজা ও আরও কয়েকজন রাজপুত রাজন্য জুবিলী উপলক্ষে ওখানে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য ছোটখাট একটা অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে আমি স্টার্ডিকে লিখেছিলাম। এইসব ভারতীয়দের সম্বন্ধে কোনও খবর থাকলে আমাকে একটু জানিও, কেমন ? এঁদের অনেকের ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে।

প্রভূত প্রীতি জানিয়ে,

তোমাদের সত্যাবদ্ধ,
বিবেকানন্দ

৩

কলকাতা
৩০ জানুয়ারী ১৮৯৮

প্রিয় মিস্ নোব্‌ল্,

অধ্যাপক ম. গুপ্তের[2] সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে এই চিঠি লিখছি। অবশ্য এর আগেই নৌকায় করে তীরে এসে নামবার সময় এঁর পরিচয় তুমি লাভ করেছ।

ইনি তোমাকে বাংলা শেখাবার জন্যে প্রতিদিন একঘণ্টা বা তার বেশি

১ পূর্বপ্রকাশিত অংশের জন্য 'বাণী ও রচনা' সপ্তম খণ্ড ( ১৩৬৯ ), উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ: ৩৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য।

২ সম্ভবতঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র রচয়িতা।

সময় দিতে অনুগ্রহ করে রাজী হয়েছেন। আমার বলার প্রয়োজন নেই যে ইনি একজন যথার্থ সৎ ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি।

সতত প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ : আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমার আজ খুব খারাপ লেগেছে।

বি

৪

মঠ, বেলুড়
হাওড়া, বঙ্গদেশ
১৬ মার্চ ১৮৯৮

স্নেহের মার্গারেট,

তোমাকে জানান নিষ্প্রয়োজন যে, শেষ বক্তৃতাটিতে তুমি আমার সমস্ত আশা পূরণ করেছ।

আমার বোধ হচ্ছে, তোমার শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি ছাড়া বক্তৃতা-মঞ্চই হচ্ছে সেই বৃহৎ ক্ষেত্র যেখানে তুমি আমাকে প্রভূত সাহায্য করতে পারবে। আমি জেনে খুশি হলাম যে মিস্ মূলার নদীর ধারে একটি জায়গা পেয়ে যাচ্ছেন। তুমিও দার্জিলিঙ যাবে না কি?—কারণ ওখান থেকে একবার ঘুরে এলে তুমি আরও ভালভাবে কাজ করতে পারবে। আগামী ঋতুতে আমি তোমার জন্যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বক্তৃতামালার পরিকল্পনা করছি। পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিয়ে,

সতত তোমাদের
[ স্বামীজীর ছবির ছাপ ]
কলকাতার ছেলে

৫

বেলা ৩টা, রবিবার
[ ১৮৯৯-এর প্রথম দিকে ]

স্নেহের মার্গট,

আমি দুঃখিত, ডাঃ সাহোনীর[*] সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারছিনা—শরীর অসুস্থ। এখনও উপবাস ভঙ্গ করিনি।

তুমি কি আমার ছোট বোনটিকে পড়ান বন্ধ করেছ?

ভালবাসা জানিয়ে,    সতত তোমাদের
বিবেকানন্দ

* ডাঃ মাহোনী সে-সময় জেলা-মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। ১৮৯৯এর প্রথম দিকে যখন নিবেদিতার নেতৃত্বে রামকৃষ্ণমিশন কলকাতার প্লেগের সেবাকার্য চালাচ্ছিল, ইনি তখন ঐ কাজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় দিকটি দেখাশোনা করতেন।

# রামহৃদয়ম্

শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচত্যাকাঙ্ক্ষতে
ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্তিরচলঃ পরিণামহীনো মায়াগুণানমু-
গতো হি তথা বিভাতি ॥৪৩॥

**অন্বয়**—রামঃ ন গচ্ছতি, ন তিষ্ঠতি, ন অনুশোচতি, ন আকাঙ্ক্ষতে, নো ত্যজতি, কিঞ্চিৎ ন করোতি; স আনন্দমূর্তিঃ অচলঃ পরিণামহীনঃ, মায়াগুণান্ অনুগতঃ হি তথা বিভাতি।

**বঙ্গানুবাদ**—শ্রীরামচন্দ্র হাঁটেন না, বসেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না আবার ত্যাগও করেন না; অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোন ক্রিয়াদিই নাই তিনি আনন্দস্বরূপ, পরিণাম-হীন, মায়াগুণান্বিত হয়ে বিরাজ করেন বলে তাঁকে ঐরূপ মনে হয় মাত্র।৪৩

**ভাবার্থ**—এই পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে গমন করেন না, স্থির হয়ে থাকেন না, শোক করেন না, ইচ্ছা করেন না, ত্যাগ করেন না অথবা অন্য কোনও কাজ করেন না। তিনি আনন্দস্বরূপ, অবিচল ও পরিণামহীন; কেবল মায়ার গুণের দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় তাঁকে ঐরকম মনে হয়।৪৩

ততো রামঃ স্বয়ং প্রাহ হনূমন্তমুপস্থিতম্।
শৃণুতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি হ্যাত্মানাত্মপরাত্মনাম্॥৪৪॥

**অন্বয়**—ততঃ রামঃ স্বয়ম্ উপস্থিতম্ হনূমন্তম্ প্রাহ—আত্মানাত্মপরাত্মনাম্ তত্ত্বম্ প্রবক্ষ্যামি, শৃণু।

**বঙ্গানুবাদ**—তারপর স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হনুমানকে বললেন,—আমি তোমাকে আত্মা, অনাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব বলছি, মন দিয়ে শোন।৪৪

**ভাবার্থ**—তারপর স্বয়ং রাম সম্মুখে স্থিত হনুমানকে বললেন: বৎস! আমি তোমাকে আত্মা (ঈশ্বর) অনাত্মা (চিদাভাস জীব) ও পরাত্মা—পরমাত্মা শুদ্ধ চৈতন্য—এই তিন তত্ত্ব বলব তুমি শ্রবণ কর।৪৪

আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো দৃশ্যতে মহান্।
জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি।
প্রতিবিম্বাখ্যমপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ॥৪৫॥

**অন্বয়**—জলাশয়ে আকাশস্য ত্রিবিধঃ মহান্ ভেদঃ দৃশ্যতে; যথা মহাকাশঃ, তদবচ্ছিন্নঃ (জলাশয়াবচ্ছিন্নঃ) আকাশঃ, অপরম্ প্রতি-বিম্বাখ্যম্ এব। হি ত্রিবিধম্ নভঃ দৃশ্যতে।

**বঙ্গানুবাদ**—যেরূপ জলাশয়ে এক আকাশেরই তিন প্রকার ভেদ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, যথা—মহাকাশ, জলাশয়াবচ্ছিন্ন আকাশ ও প্রতিবিম্বাকাশ এইরূপ ত্রিবিধ আকাশ দেখা যায়।৪৫

**ভাবার্থ**—জলাশয়ে আকাশের তিনরকম ভেদ স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়; প্রথম হল মহাকাশ, যে আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। দ্বিতীয় হল জলাশয়াবচ্ছিন্ন আকাশ, আকাশের যে অংশটুকু জলাশয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ পরিমিত হয়ে আছে। তৃতীয় হল জলাশয়ের মধ্যে প্রতিফলিত সীমাবদ্ধ আকাশের প্রতিবিম্ব; সেখানে আকাশের এই তিন রকম ভেদ সুস্পষ্ট-ভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।৪৫

বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণমথাপরম্।
আভাসস্ত্বপরং বিম্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ॥৪৬॥

**অন্বয়**—একম্ পূর্ণ চৈতন্যম্, অথ অপরম্ (দ্বিতীয়ম্) বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নম্ চৈত্যম্, অপরম্

( তৃতীয়ম্ ) তু বিম্বভূতম্ আভাসঃ ( চৈতন্যম্ ); এবম্ চিতিঃ ত্রিধা ( বিভক্তাঃ ভবন্তি )।

**বঙ্গানুবাদ**—তেমনি চৈতন্যও তিন প্রকার। প্রথমতঃ পরিপূর্ণ শুদ্ধ চৈতন্য, দ্বিতীয়তঃ সমষ্টি বুদ্ধি ( মায়া ) দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য ( ঈশ্বর ), তৃতীয়তঃ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আভাস চৈতন্য ( জীব ) ।৪৬

**ভাবার্থ**—আকাশের মতো চৈতন্যেরও তিন রকম ভেদ দেখা যায়; যথা (১) পূর্ণ চৈতন্য, যা সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছে; যাকে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ মন্ত্রে সর্বব্যাপক ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (২) বুদ্ধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যা বুদ্ধিতে ব্যাপ্ত রয়েছে; এই চৈতন্যকেই মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।১ মন্ত্রে দেহরূপ বৃক্ষে সাক্ষীরূপে, ঈশরূপে, সহচর পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। (৩) বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব ( দেহাভিমানী উপহিত চৈতন্য ), যাকে পূর্বোক্ত মুণ্ডক শ্রুতিতে দেহরূপ বৃক্ষের ফল ভক্ষণকারী অপর পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ।৪৬

সাভাসবুদ্ধেঃ কর্তৃত্বমবিচ্ছিন্নেঽবিকারিণি।
সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবত্বং চ
তথা বুধৈঃ ॥৪৭॥

**অন্বয়**—সাভাসবুদ্ধেঃ কর্তৃত্বম্ তথা জীবত্বম্ চ অবুধৈঃ ভ্রান্ত্যা অবিচ্ছিন্নে অবিকারিণি সাক্ষিণি আরোপ্যতে।

**বঙ্গানুবাদ**—নির্বোধগণ ভ্রান্তিবশতঃ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ( সীমাবদ্ধ ) চৈতন্যের কর্তৃত্বাদিগুণ অর্থাৎ জীবভাব অবিচ্ছিন্ন, বিকারহীন এবং সাক্ষীস্বরূপ চৈতন্যে আরোপ করে থাকে ।৪৭

**ভাবার্থ**—এদের মধ্যে কেবল আভাস-চৈতন্যের সহিত বুদ্ধিতেই কর্তৃত্ব থাকে অর্থাৎ চিদাভাসের সহিত বুদ্ধিই সব কাজ করে থাকে। কিন্তু নির্বোধ জনগণ ভুল করে নিরবচ্ছিন্ন নির্বিকার দ্রষ্টা আত্মাতে কর্তৃত্ব এবং জীবত্বের আরোপ করে থাকে অর্থাৎ সেই আত্মাকেই কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা কর্তা অথবা ভোক্তা নন ।৪৭

আভাসস্তু মৃষা বুদ্ধিরবিদ্যাকার্যমুচ্যতে।
অবিচ্ছিন্নং তু তদ্‌ব্রহ্ম বিচ্ছেদস্তু
বিকল্পতঃ ॥৪৮॥

**অন্বয়**—আভাসঃ তু মৃষা, বুদ্ধিঃ অবিদ্যাকার্যম্ উচ্যতে, তদ্‌ব্রহ্ম তু অবিচ্ছিন্নম্, বিচ্ছেদঃ তু বিকল্পতঃ।

**বঙ্গানুবাদ**—আভাস অর্থাৎ জীবভাব মিথ্যা, বুদ্ধি অবিদ্যার কার্য, ব্রহ্ম কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিচ্ছেদ রহিত। সুতরাং ব্রহ্মের বিচ্ছেদ কল্পনামাত্র ।৪৮

**ভাবার্থ**—আমরা যাকে জীব বলি, তাতে আভাসচৈতন্য তো মিথ্যা; কেন না সব আভাসই তো অসত্য। বুদ্ধি হল অবিদ্যার কার্য; আর পরমাত্মা বস্তুতঃ বিচ্ছেদরহিত। অতএব তাঁর বিচ্ছেদ বিকল্পেই স্বীকার করা হয় ।৪৮

অবিচ্ছিন্নস্য পূর্ণেন একত্বং প্রতিপাদ্যতে।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈশ্চ সাভাসস্যাহমস্তথা ॥৪৯॥

**অন্বয়**—তথা সাভাসস্য অবিচ্ছিন্নস্য অহমঃ ( জীবস্য ) তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈঃ চ পূর্ণেন ( ব্রহ্মণ ) সহ একত্বং প্রতিপাদ্যতে।

**বঙ্গানুবাদ**—'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য অবিচ্ছিন্ন চেতনাভাস জীবের সঙ্গে পূর্ণচৈতন্য ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে ।৪৯

**ভাবার্থ**—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারা উপাধি পরিত্যক্ত হলে আভাসচৈতন্যযুক্ত 'আমি'রূপ অবিচ্ছিন্ন চেতন জীবের পূর্ণচেতন ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব প্রতিপাদিত হয়।

এখানে কিভাবে জীবের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় সেই প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধচিত্ত উত্তম অধিকারী হনুমানকে এই শ্লোকটি বলেছেন। প্রতি

শাস্ত্রেরই অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করতে হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অর্থাৎ বেদান্ত শ্রবণের প্রকৃত অধিকারী কে? এর উত্তরে বেদান্তদর্শনে যা বলা হয়েছে, সংক্ষেপে এখানে তাই আলোচনা করা হচ্ছে। যিনি যথাবিধি বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করে বেদার্থ অবগত হয়েছেন সাধারণভাবে, এই জন্মে বা পূর্বজন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম পরিত্যাগ করে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, জাতকর্ম ও যজ্ঞাদি নৈমিত্তিককর্ম, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত এবং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার অনুষ্ঠানের দ্বারা পাপমুক্ত হয়ে শুদ্ধচিত্ত হয়েছেন, যিনি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমাদি সাধনসম্পত্তিযুক্ত এবং মোক্ষাভিলাষী, তিনিই বেদান্ত শ্রবণের অধিকারী। শেষে যে চারটি সাধনের কথা বলা হয়েছে, সেই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হলে পরে বেদান্তশ্রবণের বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে। প্রথম হল—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক; ব্রহ্মই নিত্য, তাছাড়া সবই অনিত্য—এই বিবেচনাকে বলা হয় নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। দ্বিতীয় হল—ইহামুত্রফলভোগবিরাগ; ইহলোকের ভোগসমূহ কর্মফলজনিত, অতএব অনিত্য; তেমনই পরলোকে স্বর্গাদিতে ভোগ্যবিষয়গুলিও অনিত্য—এইরকম বিচার করে যে বৈরাগ্য জন্মে তাই হল দ্বিতীয় সাধন। তৃতীয় সাধন—শমাদিষট্ সম্পত্তি অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। কম কথায় বলা যায় যে, যে ক্রমপর্যায়ে ষষ্ঠ সাধন-সম্পত্তি অর্থাৎ গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস না জন্মিলে বেদান্তশ্রবণের অধিকারী হওয়া যায় না। চতুর্থ সাধন হল—মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভের তীব্র অভিলাষ। এরপর আসে বিষয়ের কথা; জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়ের সঙ্গে উপনিষৎসমূহের বোধ্যবোধকভাবরূপ সম্বন্ধ আছে এর প্রয়োজন হল অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি। গুরুমুখে এই বিদ্যালাভ করতে হয়; এই বিদ্যা উপদেশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তার নাম অধ্যারোপ ও অপবাদ। অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পের আরোপের ন্যায় বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে বলা হয় অধ্যারোপ। এখানে বস্তু অদ্বয় ব্রহ্ম, অবস্তু অজ্ঞানাদিজড়সমূহ। জ্ঞান সহায়ে অজ্ঞান দূর হলে রজ্জুর বিবর্ত সর্প যেমন রজ্জুতে পর্যবসিত হয়ে রজ্জুমাত্ররূপে অবস্থান করে, তেমনিই যে বিচারের দ্বারা জগৎ জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎ ব্রহ্মরূপে অবাধিত হয়ে থাকে, তার নাম অপবাদ।

উপনিষদ্‌সমূহের মূল বক্তব্য হল—আত্মার একত্ব। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আচার্যপাদ শ্রীমৎশঙ্কর দেখিয়েছেন—সকল উপনিষদ্‌ই একবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং নামরূপাত্মক জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। [ ক্রমশঃ ]

# "সম্পদ তব শ্রীপদ..."

শ্রীসমরেশকুমার নিয়োগী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের একটি দৃশ্য :

'শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম ; এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি !

ডাক্তার—তারপর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(হাত জোড় করে) আমি কি করবো ? সেই অবস্থাটা এলে বেহুঁশ হয়ে যাই ! কি করি, কিছুই জানতে পারি না।

ডাক্তার—সাবধান হওয়া উচিত। হাত জোড় করলে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তখন কি আমি কিছু করতে পারি ? —তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর ? যদি ঢং মনে কর তা হলে তোমার Science (সায়েন্স) মায়েন্স সব ছাই পড়েছ।"

(১।১৭।৪)

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষের পা দুটি তার দেহের ভারবাহী অঙ্গমাত্র। তথাপি সেই অতীত কাল থেকে, হিন্দুদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে এই পদযুগল এক বিশেষ মর্যাদায় সমাসীন। পুরাণে আমরা দেখেছি শ্রীনারায়ণ যোগনিদ্রায় শায়িত, মা লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন। সর্বত্যাগী মহাদেব বুক পেতে ধারণ করেছেন মা-কালীর রাঙ্গা চরণ দুখানি। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে যাচ্ছেন, ভাই ভরত তাঁর পদচিহ্ন সম্বলিত পাদুকাদ্বয় মাথায় বহন করে এনে সিংহাসনে স্থাপন করলেন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক হিসাবে। রাজমুকুট বা রাজবেশ পেল না, সে-সম্মান যা পেয়েছিল পদচিহ্ন-অঙ্কিত ঐ কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়। শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে চিরমুক্ত হলেন পাষাণরূপী অহল্যা। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ভক্তসখা সুদামার প্রীতি হেতু নিজহাতে পদসেবা করলেন তিনি। শ্রীমহাপ্রভুকেও দেখা গেছে শ্রীবাসের পা জড়িয়ে কাঁদতে—

"বল প্রভু কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব
দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই।"

এমনি করে পদযুগলের মর্যাদাদান ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের ভাষায়, আমাদের কৃষ্টিতে আমাদের সাহিত্যে। কারও শরীরে পা ঠেকামাত্র আমরা শিউরে উঠি, প্রণাম করি। গুরুজনদের চিঠি লিখতে বসে প্রথমেই লেখনীতে এসে যায় 'শ্রীচরণেষু' 'শ্রীচরণকমলেষু' ইত্যাদি। প্রণম্য কাউকে দেখলে নির্বিবাদে মাথা নুয়ে আসে প্রণম্যের পদতলে। দেবালয়ে প্রবেশমাত্রই দেবমূর্তির পদমূলে সাষ্টাঙ্গ হবারই বিধি। চরণ-ধোয়া জলকেই চরণামৃত বলে ভক্তিভরে গ্রহণ করি। ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ গাইছেন "ও দুটি চরণ-বিনে আমার মন, অন্য কিছু জানে না।" কবিগুরু ভক্তি নিবেদন করছেন "হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে" বা "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।"

কিন্তু এ সবই কি শুধু কবি-কল্পনা। আনুষ্ঠানিক ? অথবা বৈধিক ? আপাততঃ মনে হয় দেহের সর্বোচ্চ অঙ্গকে নুইয়ে দিয়ে প্রণম্যের সর্বনিম্ন প্রত্যঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া অহংবোধ নাশের এক উৎকৃষ্ট পন্থা। আবার অনেকে ভাবতে পারেন বিশ্বব্যাপী বিরাজিত বিরাট ঈশ্বরকে ভক্তের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনবার জন্য ভক্ত-সম্মুখে ঈশ্বরের পদযুগল কল্পনা করা হয়েছে। যেমনটি গুরুর প্রণাম মন্ত্রে আমরা পাই—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং

দর্শিতং যেন……।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অলৌকিকত্ব ছাপিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তাঁর দেবতনুর অংশবিশেষ পদযুগলের বিরাট মূল্যবোধ, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। বর্তমান যুগের সায়েন্স সেখানে নিষ্ক্রিয়। ঠাকুর তাই বললেন, "যদি ঢং মনে কর তবে সায়েন্স মায়েন্স ছাই পড়েছ।" বললেন কাকে? তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারকে। ঠাকুরের এ উক্তিতে আরও বিশেষ লক্ষণীয় তিনি বলছেন, "আমি কি করবো? সে অবস্থাটা এলে বেহুঁস হয়ে যাই। কি করি কিছুই জানতে পারি না।" অর্থাৎ তখন তাঁর দেবতনু শুধুমাত্র ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঈশ্বরের কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে যায়।

অপর একটি দৃশ্যে পাই—

"ভক্তেরা পদসেবা করিতেছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, 'এর (অর্থাৎ পদসেবার) অনেক অর্থ আছে' আবার নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, 'এর ভিতর যদি কিছু থাকে (পদসেবা করলে) অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যাবে।'"… (ঐ, ৫। পরিশিষ্ট।১০) তিনি ছিলেন জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর এ আশ্বাসবাণীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর লীলায় এবং বহু সৌভাগ্যবান ভক্তের জীবন-কাহিনীতে।

গৌরাঙ্গগতপ্রাণা বা নারায়ণশিলা দামোদরের পূজারী গৌরীমাকে ঠাকুর নিজের আশ্রয়ে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর ঐ যাদুদণ্ডস্বরূপ পদযুগলের আকর্ষণে। শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মালিকা থেকে তুলে ধরছি সে কাহিনী:

"টান একদিন অপ্রত্যাশিতরূপে আসিল। সেদিন গৌরী-মা অভিষেকান্তে দামোদরকে সিংহাসনে রাখিতে গিয়া দেখেন সেখানে মানুষের দুইখানি জীবন্ত চরণ, অথচ দেহের অন্য অবয়ব নাই। অভিনিবেশ-সহকারে দেখিয়া বুঝিলেন, নয়নের ভ্রম হয় নাই। দামোদরকে তুলসী দিলেন —তুলসী গিয়া পড়িল ঐ চরণযুগলে। গৌরী-মা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।…শুধু বোধ হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহার হৃদয়কে সুতায় বাঁধিয়া টানিতেছে।…গাড়ী ডাকাইয়া স্বপত্নী ও আর দুই-একজন মহিলা সহ গৌরী-মাকে লইয়া বসু মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।… গৌরী-মা বুঝিলেন, তাঁহার অব্যক্ত বেদনার উৎস কোথায়, আর সবিস্ময়ে দেখিলেন—এই তো সেই পূর্বদৃষ্ট সজীব চরণযুগল।" (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, ৩য় সংস্করণ, ২।৪৯৯)

"পরিত্রাণায় সাধূনাং……" অবতারগণের আগমন। এমনি করে স্বহস্তে বা স্বপাদস্পর্শে অহল্যার মতো অনেক পুণ্যকাম পাষাণমুক্ত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলায় এমনি কয়েকটি ঘটনা:

"আমি আর কি?—তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।

"তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জল্ জল্ ক'রতে ক'রতে কি বেরিয়ে গেল,—পেছু পেছু!

"কয়েক দিন পরে তারক আবার এলো (দক্ষিণেশ্বরে)। তখন সমাধিস্থ হ'য়ে তার বুকে পা দিলে—এর ভিতর যিনি আছেন।" (কথামৃত, ৪।২৩।২)

"তোমার পা'টা যদি ছুঁই, তোমায় ছোঁয়াই হ'লো (হাস্য)। যদি সাগরের কাছে গিয়ে

একটু জল স্পর্শ করো, তা'হলে সাগর স্পর্শ করাই হ'লো। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে তবে কাঠে বেশী।" (ঐ, ১।১৪।২) শ্রীশ্রীঠাকুর কি এখানে তাঁর পাদস্পর্শে অমৃতসাগর স্পর্শের ইঙ্গিত করছেন না?

"এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে। গোপাল সেন বলে একটি ছেলে আসতো—অনেক দিন হ'লো। এর ভিতর যিনি আছেন গোপালের বুকে পা দিলে। সে ভাবে বলতে লাগলো, তোমার এখন দেরী আছে। আমি ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারছিনা,—তারপর 'যাই' বলে বাড়ী চলে গেল। তারপর শুনলাম দেহত্যাগ করেছে।" (ঐ, ৪।২৪।৩) লাটু মহারাজের স্মৃতিকথায় (১৩৬০, পৃঃ ১৫৩) আছে "সেদিন দুপুরে কলকাতা থেকে এক ভক্ত (শ্রীভূপতিচরণ চট্টোপাধ্যায়) দক্ষিণেশ্বরে এলেন। ঠাকুর তখন তেল মাখছেন। এসেই একটা গান লাগিয়ে দিলেন 'হরি কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে! পার করেন দয়াল হরি দুটি রাঙা চরণ-তরী দিয়ে।' গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবেশে তার কাঁধের উপর পা চাপিয়ে বললেন—'এই নাও, এই নাও।'"

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে (১৩৬০, পৃঃ ১৬৯-৭০) পাই "একদিন গিরীশ বাবুর ছেলের কলেরা হয়েছিলো—ডাক্তার-বদ্যির ওষুধ খেয়ে যখন রোগের কুছু কমতি হোলো না, তখন গিরীশ বাবু ঠাকুরের চন্নামেত্য (চরণামৃত) আনতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুর হামাকে দিয়ে মায়ের চন্নামেত্য পাঠিয়ে দিলেন। গিরীশ বাবুর এমন বিশ্বাস ছিলো যে, ছেলের অমন অসুখেও আর ডাক্তার-বদ্যি দেখালেন না। কুছুদিনের মধ্যে গিরীশ বাবুর ছেলে ভালো হোয়ে গেলো, জানো?"

"ঠাকুর একদিন গিরীশ বাবুকে পা-টা টিপে দিতে বললেন। তখন তাঁর উপর গিরীশ বাবুর তত বিশ্বাস হয়নি। পরে যখন তাঁতে গভীর বিশ্বাস এলো, তখন আর পদসেবা করার সুযোগ মিললো না। (তার আগেই ঠাকুর দেহ রেখেছিলেন)। তাই গিরীশ বাবুর মনে ঐ দুঃখু থেকে যায়, শেষে তিনি কি ভেবে কামার-পুকুরে একবার গেলেন। সেখানে ছ-সাত মাস রইলেন। ঠাকুরের ঘরে সন্ধ্যার পর রোজ তিনি বসে থাকতেন—এই আশা করে যে, ঠাকুর তাকে পা টিপতে বলবেন।" (ঐ, পৃঃ ৪৩৬)

বিজয় গোস্বামী এ বিষয়ে খুবই ভাগ্যবান, তাঁর জীবনের একটি দিনের ঘটনা:

"বিজয়—(হাত জোড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বুঝেছি আপনি কে! আর বলতে হবেনা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—(ভাবস্থ) যদি তা হয়ে থাকে তো তাই।

বিজয়—বুঝেছি।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রাপতের ন্যায় বসিয়া আছেন।" (কথামৃত, ১।১৬।৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন: "ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়, উন্মাদে এরূপ হয় কি করব? কিন্তু অবুঝ মানব যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তুচ্ছজ্ঞান কোরে হাঁসের পেট কেটে সোনার ডিম পেতে চায় তখনই হয় বিপদ।

"এই সময় ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোনে গঙ্গাজলের একটি জালা ছিল—এখনও

আছে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল, গঙ্গাজল লইয়া সে স্থান ধুইতে লাগিলেন।" (ঐ, ২।৬।৩)

যে বিজ্ঞানাচার্য মহেন্দ্র সরকারের কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা, তাঁর পরবর্তী জীবনের দু-দিনের ঘটনা তুলে ধরা যাক্। মাষ্টার মশাই-এর বর্ণনায় আছে :

"গান শুনিয়া ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার ভাবাবেশ হইল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন।... ভাবে ডাক্তারকে বলিতেছেন—'তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হলে পা রাখতে পারিনা!'" (ঐ, ৪।৩০।২)

আর একদিন। ডাক্তার—"...আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারিনা? এই দেখ নিচ্ছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ)।

গিরিশ—Angels (দেবগণ) এই মুহূর্তকে ধন্ত ধন্ত করছেন।

ডাক্তার—তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য! আমি যে সকলেরই নিতে পারি।—এই দাও! এই দাও! (সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ)" (ঐ, ১।১৮।৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন পার্থিব শরীরে নেই। স্বামীজী ঠাকুরের আরাত্রিক ভজন রচনা করতে বসেছেন এবং তিন-তিনবার তাঁর পাদ-বন্দনা করছেন। ভক্তদের এই ভব সাগর থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র কর্ণধার হিসাবে গাইছেন "ভক্তার্জন-যুগল-চরণ-তারণ ভব-পার" আবার মায়াময় সংসারের আকর্ষণে যেন আমরা পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ি তাই ত্যাগীশ্বরের কাছে তাঁর পদছায়া কামনা করে বলছেন "ত্যাগীশ্বর হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ॥" শ্রীশ্রীঠাকুরের পদযুগল তথা ধর্মদানের এই অপূর্ব সম্পদ লাভ করলে এই ভয়শঙ্কুল ধরাকে যে সরা জ্ঞান করে চলা যায়, সেই অভয়বাণী আমাদের শুনিয়েছেন স্বামীজী "সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ-বারি যথায়।"

# এক আকার

## শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখার্জি

হরিনাম, কালীনাম,
গুরুনাম এক আকার।
যে-নামে ডাকিনা তাঁরে,
আসেন প্রভু বারে বার।
হরিনাম, কালীনাম,
গুরুনাম একাকার॥
শ্যামরূপে বাজাও বাঁশী
মনগোকুলে এসে বসি
কাটো যে বাসনা রাশি
কালীরূপে নিয়ে অসি,
আর গুরুরূপ ধরে আসি
ভবনদী করো পার।
হরিনাম, কালীনাম
গুরুনাম একাকার॥
তোমার লীলা বুঝি না স্বামি,
হৃদিপদ্মে থেকো তুমি,
অন্তে যেন জপি আমি
তব নাম অনিবার।
হরিনাম, কালীনাম,
গুরুনাম এক আকার॥

# মহাশক্তিপীঠ জয়রামবাটী

শ্রীনির্মলকুমার রায়

জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মভূমি ও লীলাভূমি। শিবস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শক্তিরূপা শ্রীশ্রীমায়ের মহামিলন এই জয়রামবাটীতেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি 'শিব' হন, শ্রীশ্রীমা তবে 'সতী'; সতীদেহের পবিত্র অঙ্গাদি পতনের ফলে নানাস্থানে যেমন শক্তিপীঠের প্রকাশ, মনুষ্যরূপিণী দেবীদেহে স্বয়ং সতীর প্রকাশের ফলে, জয়রামবাটীও তাই 'মহাশক্তিপীঠ'।

'যথাগ্নের্দাহিকা শক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা' যারা মহিমান্বিত এই স্থানটি ভক্তদের কাছে কেবলমাত্র 'শক্তিপীঠ' নয়,—'মহাশক্তিপীঠ', 'মহাপুণ্যপীঠ'। এখানেই দেবীদেহে পরমাশক্তির বিকাশ, আবার এখানেই বিশাল আত্মিক-সত্তায় ভগবান-ভগবতীর মিলন।

কামারপুকুরের ঐতিহ্যের সঙ্গে জয়রামবাটীর ঐতিহ্যের বিশেষ কোন তফাৎ নেই। স্নিগ্ধ পরিবেশের জন্য উভয় স্থানই মনোরম। জয়রামবাটীর বাসিন্দারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত। এখানকার উর্বর জমিতে ধান প্রভৃতি নানা শস্যের উৎপাদন হয়। গ্রামবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবি; এছাড়া অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজেও তারা অভ্যস্ত। এখানকার বেশিরভাগ বাসস্থানই মাটি ও খড়ের কুটির। মাঝে মাঝে ছোট-বড় জলাশয় ছাড়াও, গ্রামের উত্তরপ্রান্তে 'আমোদর নদ' প্রবাহিত। এখানকার কয়েকটি দেবমন্দিরে বারোয়ারি পূজা, উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। তা-ছাড়া, গ্রামে কীর্তন, পাঁচালী, কথকতা, যাত্রাভিনয় প্রভৃতিরও প্রচলন আছে। বর্তমানে শহরের সভ্যতার আলোকে জয়রামবাটী গ্রামটিও পূর্বেকার অবস্থা থেকে কিছুটা উন্নত

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় এই জয়রামবাটী গ্রাম। জয়রামবাটীর উত্তরে দেশড়া ও কোয়ালপাড়া গ্রাম; দক্ষিণে শিবটা ও রামজীবনপুর গ্রাম; পূর্বে তাজপুর, আমুড় ও কামারপুকুর গ্রাম, এবং পশ্চিমে শিহড় ও শিরোমণিপুর গ্রাম। জয়রামবাটী বিষ্ণুপুর-মহকুমার অন্তর্গত।

এই জয়রামবাটী গ্রামেই জগজ্জননী সারদা দেবী, ইংরাজী ২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে (১২৬০ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ, বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথির রাত্রি ৩য় দণ্ডে) আবির্ভূতা হন। পিতা—শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; মাতা—শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী। সারদা দেবী পিতামাতার প্রথম সন্তান। পরে তাঁদের আরেকটি কন্যা এবং পর পর পাঁচটি পুত্র সন্তান হয়। কন্যাটির নাম কাদম্বিনী; কোকন্দ গ্রামের শ্রীরাধারাম চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু অপুত্রক অবস্থায় তিনি অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করেন। পুত্রগণ, যথা—প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়চরণ। এঁদের মধ্যে উমেশচন্দ্র অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেছিলেন এবং অভয়চরণও ডাক্তারী শিক্ষার পরেই দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর কন্যার নাম রাধারানী বা রাধু, যাঁর কাহিনী শ্রীশ্রীমায়ের লীলার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

জয়রামবাটীর উল্লেখযোগ্য লীলাস্থান :

**মাতৃমন্দির** — জয়রামবাটীর শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে মাটির বাড়িতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ভূমিষ্ঠ হন, সেই স্থানটিতেই বর্তমানে 'মাতৃমন্দির'। মুখুজ্যে বংশীয়দের আদি বাস্তভিটায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই আদি বাড়িতেই যেমন শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম, তেমন এই আদি বাড়িতেই শ্রীশ্রীমায়ের মাত্র ৬ বছর বয়সে,

ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, যখন ঠাকুরের বয়স ২৪ বছর। তৎকালীন প্রথানুযায়ী, এই বিবাহে কন্যাপক্ষকে, বরপক্ষ তথা ঠাকুরের মধ্যম জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামেশ্বর তিনশো টাকা পণ দিয়েছিলেন। বিবাহের পূর্বে ঠাকুর নিজেই তাঁর বাড়ির লোকদের এই পাত্রীর সন্ধান দিয়ে বলেছিলেন যে জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্যের মেয়ে কুটো বেঁধে রাখা আছে। অর্থাৎ এই বিবাহ বিধিনির্দিষ্ট। তাই ঠাকুরের অভিপ্রায়েই সারদা-দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

সারদাদেবীর জন্ম সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁর মাতা শ্যামাসুন্দরী নিজ পিতৃগৃহ শিহড় গ্রামের পূর্বপাড়ায় থাকাকালীন একদা সেখানকার এল্লাপুকুর দীঘির পাড়ে একটি সুন্দরী, লালচেলী-পরা শিশুকন্যাকে একটি বেলগাছ থেকে নামতে দেখেন। শিশুকন্যাটি শ্যামাসুন্দরীর গলা জড়িয়ে যখন তাঁকে বলেন, 'আমি তোমার ঘরে এলুম', তখন শ্যামাসুন্দরী অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং সকলে তাঁকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এই ঘটনায় শ্যামাসুন্দরী অনুভব করেন, সেই শিশুকন্যাটিই তাঁর উদরে প্রবেশ করেছে এবং এরপরেই জয়রামবাটীতে পতিগৃহে তাঁর প্রথম সন্তানরূপে সারদাদেবীর আবির্ভাব। এই বাড়িতেই ১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের শেষভাগে নির্ধারিত দিনে ঠাকুর বিবাহ করতে এসেছিলেন এবং শুভলগ্নে সেদিন তাঁদের বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের পরদিনই ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে চলে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের এই বাড়িতে বিবাহের রাত্রির একটি ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

"জ্বালিয়া সাভাশ কাঠি বিবাহের কালে
ঘুরে যবে বরে ঘেরে রমণী সকলে॥
জ্বালাকাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সুতা॥
হরিদ্রা-মাখান সুতা ছিল বাঁধা হাতে।
অপূর্ব প্রভুর খেলা দেখিতে শুনিতে॥
চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিল অবিদ্যা-বন্ধন॥"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, ৮ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৫-৫৬)

ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত এই স্থানটি ও তৎসহ ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড, ঠাকুরের ত্যাগী-সন্তান ও অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের প্রকটকালেই সংগ্রহ করে রাখেন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের তিরোধানের পর, তিন বৎসরের মধ্যেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল (১৩৩০ বঙ্গাব্দের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন) জন্মস্থানের উপর একটি প্রশস্ত মন্দির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মস্থানটিও স্বামী সারদানন্দের প্রচেষ্টায় রক্ষিত হয় এবং জয়রামবাটী ছাড়াও কলকাতার বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী এবং বেলুড় মঠের অঙ্গনে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিমন্দিরও তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত।

জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত এবং প্রায় ৪৫ ফিট উচ্চ। মন্দিরের চারিদিকে বারান্দা,—মন্দিরের চূড়ায় 'মা'-নামাঙ্কিত একটি ধাতুপতাকা। আগে গর্ভমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের একটি তৈলচিত্র ছিল; ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এখানে শ্রীশ্রীমায়ের একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কাল পাথরের বেদীর উপর ঐ মূর্তি স্থাপিত। বেদীর নিচে সিংহাসনে ঠাকুরের প্রতিকৃতি। সংলগ্ন নাটমন্দিরটিও ঐ সময় নির্মিত। মন্দিরের আশেপাশে নবনির্মিত বাড়ি-গুলি সাধুদের বাসস্থান, রান্নাঘর, পুস্তক বিক্রয়-কেন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। মন্দির সংলগ্ন বাগানটি খুবই মনোরম। মন্দিরের অদূরে

ভক্তদের জন্য 'গেষ্টহাউস' আছে। মন্দিরে নিত্য-সেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থার পর, স্বামী সারদানন্দই এই মন্দির ও তার সম্পত্তি বেলুড় মঠের ট্রাস্ট-বোর্ডকে অর্পণ করেছিলেন, তাই এটি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধীন। জয়রাম-বাটীর প্রধান আকর্ষণ এই মাতৃমন্দির, যেখানে অনন্তভাবময়ী শ্রীশ্রীমায়ের বহুজনহিতার্থে আত্ম-প্রকাশ, যিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকট-শক্তিরূপা, শ্রীরামকৃষ্ণস্বরূপাভিন্না অভেদাত্মা, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা। এখানে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি, অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ৺জগদ্ধাত্রী পূজা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির দেবী জগদ্ধাত্রী পূজার একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। স্বপ্নাদিষ্টা হয়ে এই দেবীর প্রথম পূজা শুরু করেন শ্রীশ্রীমায়ের মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী। প্রথম চার বছর শ্যামাসুন্দরীর নামে, দ্বিতীয় চার বছর শ্রীশ্রীমায়ের নামে, এবং তৃতীয় চার বছর শ্রীশ্রীমায়ের খুল্লতাত শ্রীনীলমাধবের নামে পূজার সঙ্কল্প হয়েছিল। এইভাবে বারো বছর পূজার পর শ্রীশ্রীমা আর পূজা করার প্রয়োজন বোধ না করায় এই পূজা বন্ধের অভিপ্রায় মনে মনে পোষণ করেন। কিন্তু দেবী আবার শ্রীশ্রীমাকে এই পূজা করার জন্য স্বপ্নে আদেশ দেন এবং শ্রীশ্রীমাও আবার তা বহাল রাখেন। পরবর্তিকালে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের উদ্যোগে দেবী জগদ্ধাত্রীর নামে প্রায় সাড়ে দশবিঘা জমি কেনা হয় এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কোয়ালপাড়া আশ্রমে দেবীর নামে শ্রীশ্রীমায়ের অর্পণনামা রেজেষ্ট্রী করা হয়। বেলুড়মঠের দুর্গাপূজার মতো, এখানেও আজ অবধি শ্রীশ্রীমায়ের নামেই সঙ্কল্প করা হয়ে থাকে। জগদ্ধাত্রী পূজা হয় তিনদিন,—প্রথমদিন ষোড়শো-পচারে এবং পরের দুদিন সাধারণভাবে। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে পূজায় এখানে পশুবলি হয় না। জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে এখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

**পুণ্যিপুকুর**—মাতৃমন্দিরের কাছেই এই পুষ্করিণী শ্রীশ্রীমায়ের সংসারের সবাই এটি ব্যবহার করতেন। বর্তমানে এটিও মাতৃমন্দিরের সম্পত্তি।

**পুরাতন বাসভবন**—শ্রীশ্রীমায়ের যখন ৯ বছর বয়স, তখন মুখুজ্যেপরিবারে বংশবৃদ্ধির দরুণ শ্রীশ্রীমায়ের পিতা রামচন্দ্র আদি বাড়িটি (শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান) ত্যাগ করে সামান্য দূরে পৃথক একটি খড়ের বাড়ি নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁর ভায়েদের সঙ্গে পরবর্তিকালে দীর্ঘদিন এই বাড়িতে বাস করে-ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীর সময় বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ শ্রীশ্রীমায়ের এই পুরাতন বাসভবনটিও কিনে নেন।

**নতুন বাসভবন**—মাতৃমন্দির থেকে পুরাতন বাড়িতে আসার পথে, পুণ্যিপুকুরের পশ্চিমতীরে স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে একটি নতুন বাসভবন নির্মিত হয়। নতুন বাড়ি নির্মাণ হওয়ার পর থেকে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী এলে এখানেই থাকতেন। এটিও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সম্পত্তি।

**সুন্দরনারায়ণ ধর্মঠাকুরের মন্দির**—পুণ্যিপুকুরের পশ্চিমপাড়ের উত্তরদিকে একটি ছোট চালাঘরে শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃকুলের গৃহদেবতা-রূপে এই ধর্মঠাকুর অধিষ্ঠিত। ধর্মঠাকুরটি কূর্মাকৃতি এবং অতি প্রাচীন। এই ছোট মন্দিরে আরও কয়েকটি অন্যান্য বিগ্রহও আছে। শ্রীশ্রীমায়ের পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঊর্ধ্বতন পঞ্চমপুরুষ খেলারাম মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজার কাছ থেকে এই 'সুন্দরনারায়ণ ধর্মঠাকুর' ও তৎসহ দেবোত্তর জমি পেয়েছিলেন।

**ভানুপিসীর ভিটা**—শ্রীশ্রীমায়ের নতুন

বাসভবনের দক্ষিণে কয়েকখানি বাড়ির পর, বড় রাস্তার তেমাথায় ভানুপিসীর ভিটা। এটি বর্তমানে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এই বাড়িতে কয়েকবার ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল।

ভানুপিসী ছিলেন সদ্গোপবংশীয় ক্ষেত্র বিশ্বাসের বিধবা কন্যা এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাল্যসঙ্গিনী। গ্রাম-সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা তাঁকে 'পিসী' বলে ডাকতেন। প্রায় কুড়ি বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে বরাবরের মতো আশ্রয় নেন। তাঁর একটি মাত্র কন্যার ছোটবেলাতেই মৃত্যু হয়েছিল। ঠাকুর মাঝে মাঝে জয়রামবাটীর শ্বশুরালয়ে গেলেই, পরম ভক্তিমতী ও বৈষ্ণবভাবের সাধিকা ভানুপিসী তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যেতেন এবং ঠাকুরও মাঝে মাঝে ভানুপিসীর এই বাড়িতে এসে গান গেয়ে শোনাতেন। ভানুপিসী নিজেও একজন সুগায়িকা ছিলেন। ঠাকুর তাঁর বাড়িতে এলে, তিনি তাঁর ঘরের দুধ, দই, ঘোল প্রভৃতি ঠাকুরকে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। শ্রীশ্রীমায়ের বাল্যসঙ্গিনী হিসাবে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে নানা রঙ্গ-কৌতুক করলেও, তাঁর মধ্যে অসাধারণ পুরুষের স্বরূপ চিনতে পেরে ভানুপিসী ঠাকুরকে অশেষ ভক্তি করতেন। শেষ বয়সে তিনি নিত্য শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করতেন। এমনকি, ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পরেও এই মহাভাগ্যবতী মহিলা, ঠাকুরকে কয়েকবার প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবদ্দশাতেই ভানুপিসীর দেহত্যাগ হয়। ভানুপিসীর ভিটাটি ঠাকুরের শুভাগমনের স্মৃতি জড়িত।

**যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্মঠাকুরের মন্দির**—জয়রামবাটীর ঘোষপাড়ার পশ্চিমদিকে আটচালার একটি ছোট মন্দির। এই মন্দিরে স্থানীয় ঘোষ বংশীয়দের কুলদেবতা 'যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্মঠাকুর' অধিষ্ঠিত। চারটি খুরোলাগানো চারকোণা একটি আসনকে ধর্মঠাকুররূপে পূজা করা হয়। এই ধর্মঠাকুরকে প্রণাম করে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে অন্যত্র যাত্রা করতেন।

**দীননাথ দত্তের পাঠশালা**—গ্রামের দক্ষিণে বারোয়ারিতলায় ৺শীতলা মন্দিরে গ্রাম্য-শিক্ষক দীননাথ দত্তের একটি পাঠশালা ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতারা এখানে পড়তে আসতেন। বাল্যকালে ভ্রাতাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাও মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। পাঠশালাটি নেই, কিন্তু মন্দিরটি এখনও আছে।

**আমোদর নদ**—জয়রামবাটীর উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে পূর্বমুখে প্রবাহিত এই নদ এঁকে-বেঁকে দক্ষিণ-পূর্বমুখে ঘুরে কামারপুকুরের মুকুন্দপুর গ্রামের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। এই নদের স্থানে স্থানে ছোট-বড় 'দহ' (ঘূর্ণি) আছে। এই দহগুলি গভীর এবং মৎস্যপূর্ণ। মাঝে মাঝে মৎস্যের লোভে এই ঘূর্ণিগুলিতে ছোট ছোট কুমীরেরও আবির্ভাব হয়। বাল্যকালে শ্রীশ্রীমা গঙ্গাজ্ঞানে এই নদে 'গঙ্গাস্নান' করতেন।

**পঞ্চমুণ্ডির আসন**—গ্রামের উত্তরপ্রান্তে আমোদর নদের তীরে একটি খেয়াঘাট আছে। কথিত আছে, শ্রীশ্রীমায়ের পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানে একটি 'পঞ্চমুণ্ডি'র আসনে সাধনা করতেন। খেয়াঘাটের ধারে সেই স্থানটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর, বর্তমানে সেটিকে সযত্নে চিহ্নিত করে রাখা আছে।

**সিংহবাহিনীর মন্দির**—গ্রামের দক্ষিণভাগে গ্রাম্যদেবী ৺সিংহবাহিনীর মন্দির। শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃবংশীয় মুখুজ্যেরাই এই মন্দিরের পুরোহিত। মন্দিরটি আগে ছিল একখানি খড়ের চালাঘরে, পরে পাকা ভিতের উপর টিনের চালাঘরে পরিবর্তিত হয়। অবশেষে, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে এটি সুদৃশ্য পাকা মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

এখানে দেবী ত্রিমূর্তিতে বিরাজিতা; তাঁর পূর্ণাঙ্গ বিগ্রহ নেই। মন্দিরের ভেতর তিনটি

পিতলের ঘটের উপর ত্রিনয়নবিশিষ্ট তিনখানি মুখ বসিয়ে তিনটি বিগ্রহের সৃষ্টি ; মধ্যে সিংহবাহিনী, একপাশে চণ্ডী ও আর-একপাশে মহামায়া। অন্য একটি আসনে মনসাদেবী প্রতিষ্ঠিতা। মা-দুর্গার ধ্যানে সিংহবাহিনীর পূজা হয়। শরৎকালে সিংহবাহিনীর মন্দিরে তিনদিন পূজা, বলিদান প্রভৃতি হয়। দেবীর অন্নভোগ নিষিদ্ধ থাকায়, তাঁকে চিঁড়া, ফলমূলাদি ও মিষ্টি নিবেদন করা হয়।

একদা কঠিন অসুখের সময় শ্রীশ্রীমা এখানে 'হত্যা' দিয়ে দেবীকে জাগ্রতা করেন এবং আরোগ্যলাভও করেন। তারপর থেকেই সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্যের কথা চারিদিকে প্রচার হওয়ায় এখানে ভক্ত সমাগম হতে থাকে। এই দেবীর মহিমা সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর মাধ্যমে জানা যায় যে, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির রাখালকে একবার শাঁখামুটী সাপ দংশন করলে শ্রীশ্রীমায়ের পরামর্শে তাকে সিংহবাহিনীর কাছে নিয়ে গিয়ে স্নানজল খাওয়ানো হয় এবং ক্ষতস্থানে সেখানকার মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এর ফলে সে সত্যই বিষমুক্ত হয়েছিল। আর একবার মাঠের আলপথে যাবার সময় শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেব একটি বিষধর সাপের দংশনে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ায় শ্রীশ্রীমা তার ক্ষতস্থানে সিংহবাহিনীর মাটি প্রলেপ দেওয়ায় সে সংজ্ঞালাভ করে সুস্থ হয়েছিল। দেবীর এমন নানা মহিমার কথা প্রচারিত হওয়ায় আধুনিককালেও অনেক ভক্ত এই 'সিংহবাহিনীর মাটি' ভক্তি সহকারে সংগ্রহ করে নিয়ে যান। বিশ্বাসভরে শ্রীশ্রীমাও এখানকার মাটি কৌটায় পুরে রাখতেন এবং নিত্য তার কিছু অংশ নিজে গ্রহণ করতেন। সিংহবাহিনীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের এত প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে, গ্রামে সিংহবাহিনীর অবস্থানের জন্য তিনি গ্রামের মধ্যে পাল্কীতে চড়তেন না। এই মন্দিরেও শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হয়েছিল।

## আশেপাশে :

**কামারপুকুর**—জয়রামবাটীর প্রায় দেড়ক্রোশ অগ্নিকোণে প্রখ্যাত কামারপুকুর গ্রাম, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি। জয়রামবাটী ও কামারপুকুরের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৩ মাইল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, জয়রামবাটী বাঁকুড়া জেলার মধ্যে, আর কামারপুকুর হুগলী জেলার মধ্যে অবস্থিত।

**ফুলুই-শ্যামবাজার**—জয়রামবাটীর প্রায় আড়াই ক্রোশ নৈর্ঋত কোণে ফুলুই-শ্যামবাজার গ্রাম, সংক্ষেপে শ্যামবাজার বলা হয়। এই গ্রামে ঠাকুর তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামের সঙ্গে শুভাগমন করে একাদিক্রমে সাতদিন অহোরাত্র সংকীর্তন-বিলাসে মগ্ন হয়েছিলেন।

**কোয়ালপাড়া**—জয়রামবাটীর প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে, কোতুলপুরের পথে কোয়ালপাড়া গ্রাম। এখানে শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্রামের জন্য যে আশ্রমটি গড়ে ওঠে, সেইটিই বর্তমানে 'কোয়ালপাড়া আশ্রম' নামে পরিচিত।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় যাবার পথে শ্রীশ্রীমা স্বহস্তে এই আশ্রমে ঠাকুর ও তাঁর নিজের ফটো বসিয়ে বিশেষ পূজার দ্বারা ফটো দুটি সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন। আজও এখানে নিত্য পূজা হয়। এই আশ্রমেরই সন্নিকটে পরে 'জগদম্বা আশ্রম' নামে স্ত্রী-ভক্তদের জন্য একটি আশ্রম করা হয়। শেষোক্ত আশ্রমটি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং স্থানীয় শিক্ষক শ্রীকেদারনাথ দত্তের পুরাতন ভিটার উপর স্থাপিত। দুইটি আশ্রমেই শ্রীশ্রীমা কয়েকবার বাস করেছিলেন। আশ্রম হওয়ার পূর্বেও শ্রীশ্রীমা ভক্ত শ্রীকেদারনাথের অনুরোধে তাঁর এই বাড়িতে এককালীন প্রায় ছ'মাস ছিলেন। শ্রীকেদারনাথ পরে 'স্বামী কেশবানন্দ' নামে সন্ন্যাসী হন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহরক্ষা হয়। কোয়ালপাড়ার সমগ্র আশ্রম ও সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মঠ-

মিশনের কর্তৃত্বাধীনে আছে।

**শিহড়ে শ্রীশ্রীমায়ের মামার বাড়ি**—জয়রামবাটীর একমাইল পশ্চিমে শিহড় গ্রাম। এখানে পূর্বপাড়ায়, তথা মজুমদার পাড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের মাতুলালয় (মাতামহ হরিপ্রসাদ মজুমদারের বাড়ি)। মাতুলালয়ের দক্ষিণদিকে 'এলাপুকুর' নামে একটি দীঘি। এই দীঘির ধারেই শ্রীশ্রীমায়ের মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী একটি ছোট সুন্দরী লালচেলীপরা শিশুকন্যার দর্শন পান,—যিনি একটি বেলগাছ থেকে নেমে তাঁর গলা জড়িয়ে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর আগমনের কথা। এরপরেই জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম হয়। শ্রীশ্রীমায়ের মাতুলবংশ এখন অবলুপ্ত।

**শিহড়ে হৃদয়রামের বাড়ি**—শিহড়গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ঠাকুরের ভাগ্নে, তথা পিসতুতো জ্যেষ্ঠা ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। এই বাড়িতে ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা কয়েকবার এসেছেন। একদা এই বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন ও অবস্থানকালে হেমাঙ্গিনী দেবী তাঁর কনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব দর্শন করে নিজে বড় ভগ্নী হয়েও ফুল-চন্দন দিয়ে তাঁর চরণ পূজা করেছিলেন। এই সময়ে ঠাকুর হেমাঙ্গিনী দেবীর মস্তকে চরণ রেখে ভাবাবেশে তাঁকে কৃপা করেন এবং কাশীতে তাঁর মৃত্যু হবে বলে আশীর্বাদ করেন। পরবর্তিকালে হেমাঙ্গিনী দেবী সত্য সত্যই কাশীতে দেহত্যাগ করেছিলেন।

**শিহড়ে শান্তিনাথ শিবের মন্দির**—শিহড় গ্রামের প্রসিদ্ধ 'শান্তিনাথ শিবের মন্দিরে'ও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। ভাগ্নে হৃদয়রামের বাড়িতে কিছুদিন অবস্থানের সময়, ঠাকুর এখানে এসে মহাভাবে নৃত্য করায় এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণে মহাউল্লাসে লুটোপুটি করায়, তাঁর সুকোমল অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

কথিত আছে, নিকটবর্তী বীরসিংহপুর বা বিষমপুর গ্রামের অনৈক ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক বহু প্রাচীনকালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরটি মাকড়াপাথরে প্রস্তুত। এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। মন্দিরের সামনে প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতায় জগমোহন; জগমোহনের উত্তর-সংলগ্ন অংশে ইঁটের তৈরি ১৫ ফুট উঁচু একটি ভোগ-মণ্ডপ। পূর্বমুখী এই মন্দিরের ভেতরে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ শান্তিনাথ শিব। এখানে শিবরাত্রি ও গাজন খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। মন্দিরের গায়ে খোদাইকরা কিছু অলঙ্করণও আছে। মন্দিরের সামনে বাঁধানো উঠান।

**পথনির্দেশ ও অন্যান্য বৃত্তান্ত**—হাওড়া ষ্টেশন থেকে প্রায় ১২৫ মাইল দূরে বিষ্ণুপুর ষ্টেশন। বিষ্ণুপুর ষ্টেশন থেকে ২৭ মাইল অগ্নিকোণে আমোদর নদের দক্ষিণপার্শ্বে জয়রামবাটী গ্রাম। কলকাতা থেকে সোজাপথে তারকেশ্বর হয়ে প্রায় ৫৩ মাইল। মোটর বা বাসযোগে সব স্থান থেকেই সরাসরি জয়রামবাটী যাওয়া যায়। 'কন্‌ডাক্‌টেড' বা 'প্যাকেজ ট্যুর'-এর বাসেও অনেকে বেড়াতে যান। কলকাতায় ময়দান থেকে 'ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন'-এর সরকারী বাস এবং বেসরকারী বাসও নিজ নিজ বাস গুমটি থেকে জয়রামবাটী বা বাঁকুড়া যাতায়াত করে। সকালের বাসে জয়রামবাটী গিয়ে, বিকালের বাসে আবার কলকাতায় ফিরে আসা যায়। কলকাতা থেকে বাসে জয়রামবাটী যেতে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এ ছাড়া, হাওড়া ষ্টেশন থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে, সেখান থেকে বাসে করে কোতুলপুর, কোয়ালপাড়া ও দেশড়া হয়ে জয়রামবাটী যাওয়া যায়। হাওড়া ষ্টেশন থেকে ট্রেনে তারকেশ্বরে গিয়ে, সেখান থেকেও বাসে জয়রামবাটী যাওয়া যায়।

ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের লীলাস্মৃতি বিজড়িত জয়রামবাটীতে এলে, স্বতঃই অন্তরমধ্যে সেই প্রণাম মন্ত্রটি স্ফুরিত হয়—

'জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥'

# মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরমাণু-অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী

## স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

[ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মস্কোতে ধর্ম, সংস্কৃতি, ভেষজবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতির প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন দল ও স্থানে বিভক্ত, এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; যার বিষয় ছিল—'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরমাণু-অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী।' রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ এই সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। রাশিয়ার আহ্বানে বিভিন্নমতাবলম্বীদের নিয়ে বিরাট ও অপূর্ব এই সভা। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত প্রায় ১০০০ বিশিষ্ট ব্যক্তি। ধর্ম-প্রতিনিধি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দকে পূর্বে বলা হয়নি যে ১৪ ফেব্রুয়ারি 'ধর্ম' বিভাগের উদ্বোধনী সভায় তাঁকে কিছু বলতে হবে। তাই তাঁর কাছে কোন কাগজ বা বক্তৃতা বিষয়ে তাঁর কোন পূর্ব-প্রস্তুতিও ছিল না। যাহোক, উদ্বোধনী সভায় পাঁচ জন ধর্ম প্রতিনিধির মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কিছুদিন হল তাঁর বক্তৃতার প্রতিলিপি রাশিয়া থেকে এসেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওটি ছিল ভুলে ভতি; কেননা এটি হল তাঁর রুশ-অনূদিত ভাষণের পুনরনুবাদ। কাজেই মূল বক্তব্যের স্মৃতি অনুসরণ করেই তাঁকে বর্তমান প্রবন্ধটি লিখতে হয়েছে।—সঃ ]

মাননীয় সভাপতি, ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরমাণু-অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী' সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছে। আপনারা অবগত আছেন পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হচ্ছে হিন্দুধর্ম। খ্রীষ্টপূর্ব দশসহস্রাধিক বর্ষ থেকে সম্প্রসারণশীল হিন্দুধর্মে কখন কখন কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা হিন্দু নামে পরিচিত হলেও, আপনাদের জানা ভাল যে পুরাকালে আমাদের ধর্ম হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত ছিল না; আর্যধর্ম, সনাতনধর্ম বা বৈদিকধর্ম নামে ইহা সমধিক পরিচিত ছিল। মুসলমানেরা যখন আমাদের দেশ অধিকার করল, তখন তারা আমাদের হিন্দু নামে অভিহিত করে এবং সেই থেকে ঐ শব্দটি আমাদের ধর্মে যুক্ত হয়।

একটি পরমাণু-অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী রচনা করতে আমাদের বলা হয়েছে। কিন্তু ইহা অসম্ভব। মানব-কল্যাণেই অগ্নির প্রথম আবিষ্কার। কিন্তু সে-যুগেও এর বিধ্বংসী ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাই বলে আমরা অগ্নিকে একেবারে বর্জন করিনি। বরং যত্নসহ একে আমরা মানব-স্বার্থে ব্যবহার করে থাকি। অনুরূপভাবে, পারমাণবিক প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিকে আয়ত্তাধীনে রেখে, মানবসমাজ ও মানবজীবনের উন্নতি ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে পারি। অপর ক্ষেত্রে এর ধ্বংস-ক্ষমতা এতই ভয়ানক যে সমগ্র মানবজীবন সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তাই প্রশ্ন জাগে,—কি করে পরমাণু-শক্তির বিধ্বংসী ক্ষমতাকে শান্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় এবং নতুন সমাজ ও মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়?

রাজনীতিবিদ্ এবং কূটনীতিবিদের পক্ষে এই কাজ অসম্ভব কারণ তাঁরা চান অপর দেশ বা জাতিকে দাবিয়ে স্বায়ত্তাধীনে রাখার জন্য এই শক্তিকে ব্যবহার করতে। কিন্তু মুস্কিল এইখানে আমেরিকা আণবিক অস্ত্র তৈরি করলে,

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সেখানে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। পাকিস্তান আণবিক অস্ত্র তৈরি করলে, জাতীয় জীবনের সংহতি ও বুনিয়াদ রক্ষার্থে ভারতকেও তা বানাতে হবে। অতএব মুষ্টিমেয় রাজনীতিবিদ্ বা কূটনীতিবিদের পক্ষে পরমাণু-শক্তির বিনাশকারী ব্যবহার রোধ করা সম্ভব নয়।

এই সম্মেলনে আমরা ধর্ম-প্রতিনিধিরূপে সমবেত হয়েছি। জগতে অনুকূল জনমতগঠন আমাদের পক্ষেই সম্ভব। যদি আমরা সকল দেশের জনসাধারণকে পারমাণবিক অস্ত্রের সর্বনাশা শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারি, তবে তা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিরাপত্তা বিষয়ে প্রভাবিত করবে, কারণ প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব আমাদের মতো ধর্মপ্রতিনিধিদেরই মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে ধর্মগুলি নিজেরাই পরস্পর-বিবদমান। রাজনীতি ও কূটনীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে একটি সাধারণ ভূমিতে দাঁড়াতে তারা সক্ষম। মূলতঃ ধর্মসম্প্রদায়গুলি তাদের নেতৃবর্গের অনুশাসন মেনে চলে না।

একবার আমেরিকায় খ্রীষ্টান শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশে ভাষণরত স্বামী বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টানুশাসনানুযায়ী ধর্মজীবন অনুসরণ করেন কিনা। তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ-পূর্বক তিনি বলেছেন—'যীশু বলেছিলেন,—পাখীর বাসা আছে, শেয়ালের গর্ত আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।' তারপর স্বামী বিবেকানন্দ শুধালেন, 'তোমাদের সমাজে খ্রীষ্টধর্মের স্থান কোথায়? যাও, তোমরা খ্রীষ্টের কাছে ফিরে যাও।' প্রত্যেক ধর্মই কি সততা ও নৈতিকতা প্রচার করে থাকে না? কিন্তু ধর্মাবলম্বীগণ কি তাঁদের নৈতিক অনুশাসনগুলি পালন করেন? আমাদের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ এক চিঠিতে লিখছেন—'আমি ঘৃণা করি এই সংসারকে, এই স্বপ্নকে, এই বিকট নিশাস্বপ্নকে, প্রতারণাসহ এই গীর্জাকে, গ্রন্থাবলী ও ইতরতাকে, সুন্দর মুখশ্রী অথচ কপট হৃদয়কে, মুখে ন্যায়পরায়ণ নিরপেক্ষতা অথচ অন্তরে শূন্যগর্ভ, এবং সর্বোপরি শুদ্ধিকৃত ব্যবসাদারীকে।' আমরা কি সবাই এই পবিত্রীকৃত ব্যবসাদারীর অন্তর্ভুক্ত নই? অতএব আমাদের এইসব ত্যাগ করে বিভিন্ন ধর্মনেতৃবর্গের পদাঙ্কানুসরণপূর্বক পবিত্রতা ও কৃচ্ছ্রতা সমন্বিত আদর্শ জীবনযাপন করতে হবে। আমরা যদি তা করি, তবেই আমাদের বাক্যসকল হবে অপ্রতিরোধ্য এবং সকল ধর্মানুসরণকারীদের হৃদয় পরিবর্তনে সক্ষম হবে।

আমাদের সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি পথ দেখিয়ে গেছেন যা জগতের সকল ধর্মগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আবির্ভাব, এই সেদিন আমরা তাঁর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছি। তিনি তো শুধুমাত্র কতগুলি মতবাদ, অনুশাসন বা অনুষ্ঠান প্রচার করেননি। নিজজীবনে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতে, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মমতে, একটির পর একটি সাধন করে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সকল ধর্ম মানুষকে একই জায়গায় নিয়ে যায়। শুধু নিজজীবনে অনুভূতি নয়—তাঁর এই 'যত মত তত পথ' তত্ত্ব তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর মতের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যবর্গকে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ধর্ম পরীক্ষিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিজ্ঞান। বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, আর্নল্ড টয়েনবী বলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ একের পর এক ধর্মসকল সাধন করে প্রত্যেকটিতে সিদ্ধিলাভ করে পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে

এসেছিলেন—সকল ধর্মের উদ্দেশ্যসমূহ একই।' টয়েনবীর মতে ধর্ম-ইতিহাসে ইহা অনুপম নজিরবিহীন।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরে ভারতবর্ষ বেঁচে রয়েছে। গ্রীক, হুন, শক, পাঠান, মুঘল এবং ইংরেজের আক্রমণে তার ইতিহাস সমাচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতের সনাতনধর্ম আজও সজীব। হিন্দু কাউকে ধর্মান্তরিত করেনি। সে স্বাঙ্গীকরণে পটু। এই কারণে হিন্দুধর্ম, তার বিজেতাদেরও পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এবং স্বামী বিবেকানন্দ এর নেতা। আমাদের প্রতিষ্ঠানে ধর্মান্তরণ হয় না, কিন্তু সকল ধর্মকে আমরা গ্রহণ করি, এবং সব ধর্মাবলম্বীগণ আমাদের সঙ্ঘে সন্ন্যাসী বা গৃহী-ভক্তরূপে যোগদান করতে পারে। তাঁদের স্ব-ধর্ম ত্যাগ করতে হয় না। শুধু তাঁদের বুঝতে হবে—শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বাণী, যার ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছেন—স্বামী বিবেকানন্দ। এই ভাব যদি প্রত্যেক ধর্ম গ্রহণ করে তবে ধর্মে ধর্মে আর কোন বিরোধ উপস্থিত হবে না।

এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে: 'প্রত্যেক প্রাণীর অন্তরে চৈতন্য অন্তর্নিহিত, এবং মানুষের সেবাকালে আমরা সেই অন্তর্নিহিত চৈতন্যের সেবাই করে থাকি, জড়বস্তু বা মরণশীল জীবকে নয়।' এভাবে আমরা এক ধরনের সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাই। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ জড়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত সমাজতন্ত্রের মূলভিত্তি হচ্ছে চৈতন্য যা সমগ্র বিশ্বের অধিষ্ঠান, প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পথে এই মানবসেবাই বিরাট পদক্ষেপ। দৈহিক, বৌদ্ধিক, অর্থনৈতিক, বা আধ্যাত্মিক কোন ক্ষেত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ অধিকারবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলতেন যে সত্যিই যদি কেউ মানুষের দিব্যত্বে বিশ্বাসী হয় তবে সে বিশেষ সুবিধা আদায়ের ফন্দি পোষণ করতে পারে না; এমনকি উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষদেরও নিম্নতম মানুষের ভিতর দিব্যত্ব দর্শন করে তার সেবা কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'ভোগ্যবস্তুসকল সমভাবে বণ্টন করা উচিত।' মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদও তো একই বার্তা প্রচার করে থাকে, তবে জগৎ ও মানবের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা—'শ্রেণীসংগ্রাম নয়, একমাত্র মানবসেবার মাধ্যমেই সত্যিকারের শ্রেণী বৈষম্য-হীন সমাজ স্থাপন সম্ভব।' স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবটি অর্জন করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট, যিনি শিখিয়েছিলেন 'জীবে দয়া নয় শিবজ্ঞানে তাঁর সেবা কর্তব্য।' অতএব আমরা —এই রামকৃষ্ণ মিশন,—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই বাণী সমস্ত জগতে প্রচারের চেষ্টা করছি, এবং আমাদের আশা যে পরস্বাপহরণ ও মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পায়ে দলা যে কত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর—এটা মানুষ যেদিন ধরতে পারবে সেদিন আসবে স্বামী বিবেকানন্দ কথিত প্রকৃত সমাজতন্ত্র, যার দর্শন হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষারই ফলশ্রুতি। ধন্যবাদ।*

* অনুবাদ: স্বামী জয়দেবানন্দ

# প্রার্থনা

শ্রীদেবপ্রসাদ বসু

( ১ )

তোমারে বেসেছি ভাল
তোমাতে সঁপেছি প্রাণ,
যা-কিছু পেয়েছি আজ
সকলি তোমার দান।
তোমার আলোয় জ্বাল
জীবনধুনুচি মম,
নতুন জীবন দাও
প্রভাত-রবির সম।
নয়ন মুদিয়া আমি
তোমায় দেখিতে চাই,
তোমার আলোর জ্যোতি
আমার মানসে পাই।
যা-কিছু হারায়ে গেছে,
যা-কিছু পেয়েছি আমি,
সকলি তোমার ইচ্ছা,
তুমি হে জীবন-স্বামী।

( ২ )

যেও না ছাড়িয়া মোরে,
ফেলনা পথের 'পরে,
তোমার করুণা বিনা
রব মা কিসের তরে!
চরণ ধরিতে দিও
যখন ধরিতে যাই
আমাকে চাহে না কেহ,
তোমাকে আমার চাই।
তোমার দয়াল নাম
ভুলিতে দিও না মোরে
তোমার চরণে যেন
রেখো মা করুণা করে।

# সর্বগ্রাসী শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমুক্তিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়

আমাদের ঠাকুর সর্বগ্রাসী, সব করলেন গ্রাস,
ইস্‌লাম খ্রীষ্টান হিন্দু তাঁকে ডাকলে সর্বনাশ।
সাকার আকার নিরাকার যে যেখানে আছে,
সবারে গ্রাসিয়া ঠাকুর নিয়াছেন কাছে।
আপনার মতে আপনি বিভোর, কাউকে
করেননি ক্ষুণ্ণ।
আমার সর্বগ্রাসী ঠাকুর সব মানুষের জন্য।
কত সংস্কৃত শব্দ দিয়ে তোমরা কতই কহ যে?
ঠাকুর বলেন নতুন কথা সরল ভাষায়
সহজে,
'মন মুখ এক করো' অতি নতুন কথা,
সর্বগ্রাসী ঠাকুর আমার নতুন ধর্মের প্রবক্তা।
যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ঘটান সমন্বয়,
'রামকৃষ্ণ যোগ' বলে যা অভিহিত হয়।
শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের তুলনা যে নাই,
মন মুখ এক করে প্রণাম জানাই।

# ধর্মমহাসম্মেলন

## মেরী লুইস্ বার্ক

দশম দিনে সান্ধ্য অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বে শ্রোতারা আকস্মিকভাবে তাদের প্রিয় ব্যক্তিটির কাছ থেকে একটি বিদ্যুৎ-শিহরণ জাগানো আলোচনা শুনতে পেলেন। সেদিনের অধিবেশনে মাত্র দুটি নিবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা ছিল, একটি—'দি রেস্টোরেশন অব্ সীনফুল ম্যান থ্ ক্রাইস্ট' (খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপীজনের পুনর্বাসন) এবং অপরটি 'রিলিজিয়নস্ ইন পিকিং' (পিকিং-এ ধর্মসমূহ)। এই আলোচনার উপসংহারে লেখক ভারিক্কি চালে জানান, চীনারা প্রতি বৎসর তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে কাগজের টাকা আর ধূপ পুড়িয়ে কয়েক শত মিলিয়ন ডলার নষ্ট করে—সে টাকা তারা অনায়াসে খ্রীষ্টধর্মের জন্য সদ্ব্যয় করতে পারে। এই রকম কয়েকটি মন্তব্য সম্বলিত প্রবন্ধটি পাঠের পরই স্বামীজী শ্রোতাদের কাছে কিছু বলতে স্বীকৃত হন। তাঁর ভর্ৎসনার কিছু বিস্ফোরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বারোজের 'ওয়ার্ল্ড পার্লামেণ্ট' গ্রন্থে পরে 'স্বামীজীর রচনাবলী'তে 'রিলিজিয়ন নট দি ক্রাইং নীড অব্ ইণ্ডিয়া' (বাংলায় রচনাবলীতে খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারে) শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুটি খণ্ডাংশকে একত্রিত করলেও পুরো বক্তৃতার এক চতুর্থাংশ হবে না। 'ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড'-এর ১১ অক্টোবর সংখ্যায় কিছু অতিরিক্ত উদ্ধৃতিও প্রকাশিত হয়, তবে 'টিকাগো ইণ্টার-ওসান'-এ ১১ অক্টোবর যেটা ছাপা হয়েছিল, সেটাই মনে হয়, বক্তৃতার সম্পূর্ণ বয়ান। সেটা গৃহীত হয়েছিল সভায় উপস্থিত থেকে। এই আপাত-সন্তোষজনক প্রতিবেদনটি একটি শতাব্দীর তিনচতুর্থাংশ কাল পরে স্বামী যোগেশানন্দ খুঁজে বার করেন এবং অনুগ্রহ করে তাঁর আবিষ্কারটি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।

### স্বামী বিবেকানন্দ

মিঃ হেড্ল্যাণ্ড (Mr. Headland)-এর 'রিলিজিয়নস্ ইন পিকিং' পাঠের পর ডাঃ মোমেরি (Dr. Momerie) ঘোষণা করেন, সেদিন সন্ধ্যার জন্য সূচিভুক্ত অন্যান্য বক্তারা উপস্থিত হতে পারেননি। তখন রাত মাত্র ন'টা এবং প্রেক্ষাগৃহ ও গ্যালারি পরিপূর্ণ। শ্রোতারা মঞ্চের উপর গৈরিক বস্ত্র ও রক্তবর্ণ উষ্ণীষ পরিহিত হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে দেখতে পেয়ে আনন্দে ফেটে পড়লেন।

শ্রোতাদের এই স্বাগত অভিনন্দনে সেই জনপ্রিয় হিন্দু বলেন, সেই সন্ধ্যায় তিনি বক্তৃতা করার জন্যে উপস্থিত হননি। তবে যাই হোক তিনি মিঃ হেডল্যাণ্ডের কতকগুলি মন্তব্যের সমালোচনার জন্য উপস্থিত সুযোগ গ্রহণ করবেন। চীন দেশের দারিদ্র্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মিশনারীরা খাদ্যের বিনিময়ে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রচলিত ধর্ম থেকে খ্রীষ্টধর্মান্তরিত করার চেয়ে শুধু তাদের ক্ষুধানিবৃত্তির প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেই যথার্থ কাজ করবেন। এরপর সেই হিন্দু মঞ্চের উপর কিছুটা পিছিয়ে ক্যাথলিক চার্চের বিশপ কীনের (Keane) সঙ্গে একমুহূর্ত চুপি চুপি কথা বলেন।

তিনি আবার ভাষণ শুরু করে বলেন, বিশপ কীন তাঁকে জানিয়েছেন, আমেরিকানরা সৎ সমালোচনায় কিছু মনে করবে না। তিনি বলেন, চীনদেশের প্রচলিত সব ভয়ঙ্কর ঘটনা এবং সেখানকার ভয়াবহ অবস্থার কথা তিনি শুনলেন,

কিন্তু জানতে পারলেন না সে অবস্থা দূর করার জন্য সেখানে মিশনারীরা কোন ম খুলেছেন কিনা।

আমেরিকার খ্রীষ্টান ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা পৌত্তলিকদের আত্মার ত্রাণের জন্য বিদেশে মিশনারী প্রেরণ এত পছন্দ কর কিন্তু আমার প্রশ্ন, অনাহার থেকে তাদের শরীরটাকে বাঁচাবার জন্য তোমরা কি করেছ বা করছ? (হর্ষধ্বনি) ভারতে ৩০ কোটি নরনারী মাসে গড়ে ৩০ সেন্টের মতো আয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, আমি তাদের বছরের পর বছর বুনো ফুল খেয়ে বেঁচে থাকতে দেখেছি। কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হাজার হাজার লোক অনাহারে মরে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা তাদের প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করে একটি শর্তে—হিন্দুদের পিতৃপুরুষ আচরিত ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টান হতে হবে। এটা কি ন্যায় সঙ্গত? শত শত অনাথ আশ্রম আছে কিন্তু সেখানে হিন্দু বা মুসলমানরা গেলে বিতাড়িত হয়। হিন্দুরাও হাজার হাজার আশ্রম করেছে, সেখানে যে-কোন ধর্মের মানুষই আশ্রয় পেতে পারে। হিন্দুদের অর্থ সাহায্যে হাজার হাজার চার্চ গড়ে উঠেছে কিন্তু এমন একটাও হিন্দুমন্দির নেই যার জন্য কোন খ্রীষ্টান একটা আধলা সাহায্য করেছেন।

আমেরিকার ভ্রাতৃমণ্ডলী ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন ধর্ম নয়। প্রাচ্যে ধর্ম যথেষ্টই আছে। তাদের প্রয়োজন অন্নের—কিন্তু তাদের দেওয়া হচ্ছে প্রস্তরখণ্ড (হর্ষধ্বনি)। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ধর্ম বা দর্শনের কথা বলা তাদের অপমান করা মাত্র। সুতরাং যদি তোমরা 'ভ্রাতৃবোধে'র প্রকৃত তাৎপর্য দেখাতে চাও তাহলে হিন্দু হলেও এবং তাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি করুণার্দ্র হও। যাতে তারা ভালভাবে ভাল দুটি অন্নসংস্থান করতে পারে তার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সেখানে মিশনারী পাঠাও, দর্শনের আবোল তাবোল শিক্ষা দেবার জন্য নয়।" (বিপুল হর্ষধ্বনি)

এরপর সন্ন্যাসী বলেন, সেদিন তাঁর শরীরটা ভাল নেই সুতরাং তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। কিন্তু তাতে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য থেকে বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে দাবি উঠল—'বলুন' 'বলুন'। সুতরাং বিবেকানন্দ বলে চললেন—

"এই মাত্র যে নিবন্ধটি পঠিত হল সেটিতে দরিদ্র ও অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা বলা হয়েছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও সেই কথা বলা যায়। আমি একজন সন্ন্যাসী—আমার পরিচিতি দেওয়া হয়েছে ভিক্ষুকতুল্য বলে। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অহঙ্কার। (হর্ষধ্বনি) এদিক দিয়ে আমি খ্রীষ্টতুল্য বলে গর্বিত। আজ আমার যা জোটে তাই খাই কিন্তু আগামীকালের জন্য চিন্তা করি না। 'পুষ্পক্ষেত্রে লিলিফুলের দিকে তাকিয়ে দেখ—তারা কখনো পরিশ্রম করে না, তকলিও ঘোরায় না।' হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটা আক্ষরিকভাবে সত্য। এখানে, চিকাগোর এই মঞ্চে অনেক ভদ্রলোক উপবিষ্ট আছেন যাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারেন যে গত দ্বাদশবর্ষ ধরে আমি জানি না আমার পরবর্তী আহার কিভাবে জুটবে। প্রভুর জন্য ভিখারি হতে আমার গর্ব। প্রাচ্যে অর্থের জন্য ধর্মপ্রচার বা ধর্মশিক্ষাদান অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বেতনের জন্য ঈশ্বরের নাম নিয়ে শিক্ষাদান এতদূর জঘন্য কাজ যে তার জন্য পুরোহিত জাতিচ্যুত ও ঘৃণ্যই হয়। নিবন্ধটিতে একটি পরামর্শ আছে, সেটি যথার্থ: যদি চীন ও ভারতের পুরোহিতকুলকে একত্রিত করা যায় তাহলে তাঁদের মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি সম্ভাবনা সঞ্চিত রয়েছে তার দ্বারা সমাজের ও মানবমণ্ডলীর পুনরুজ্জীবনে সহায়তা লাভ করা যায়।

আমি ভারতে এর জন্য চেষ্টা করেছি কিন্তু অর্থের অভাবে তা সংগঠিত করতে পারিনি। হয়তো আমি আমেরিকা থেকে সে সাহায্য পেতে পারি।

"তবে আমরা জানি, খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে পৌত্তলিকদের জন্য সাহায্য পাওয়া কত কঠিন। (বিপুল হর্ষধ্বনি) স্বাধীনতার ভূমিক্ষেত্র, মুক্তির ভূমিক্ষেত্র, এবং অবাধ চিন্তার অধিকারের ভূমিক্ষেত্র বলে এই দেশের কথা অনেক শুনেছি। তাই নিরাশ হইনি। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করছি।"

অতঃপর সেই জনপ্রিয় অতিথি বিনয়ের সঙ্গে নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করতে চান কিন্তু শ্রোতারা তারস্বরে বক্তৃতা চালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। সৌজন্য-মূলক অভিব্যক্তিতে ভাস্বর বিবেকানন্দ অতঃপর হিন্দুধর্মে পুনরুজ্জীবন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ভাষণ শেষে ডঃ মোমেরি [একজন ইংলণ্ডীয় প্রতিনিধি] বলেন যে এখন তিনি বুঝতে পারছেন সংবাদপত্রে পার্লামেণ্টকে প্রত্যাশিত স্বর্ণযুগ বলাটা কতখানি যুক্তিযুক্ত। "মানবমণ্ডলীর ইতিহাসে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা এবং তা উদ্ভূত হয়েছে আমেরিকাবাসীর মহৎ অন্তর থেকে। আমেরিকার অধিবাসীদের [সমালোচনায় সপ্রাণ অংশগ্রহণের জন্য] অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমারও আমেরিকান হবার ইচ্ছা হচ্ছে।"

সজ্জন ইংরাজ ভদ্রলোকটিকে এরপর যে বিপুল হর্ষধ্বনিতে অভিনন্দিত করা হয় তা প্রায় সম্বর্ধনাতুল্য। পার্লামেণ্টের প্রাণবন্ত অধিবেশনের অন্যতম একটি অধিবেশন এরপর মুলতুবি হয়।

স্বামীজীর সমালোচনা ক্যাথলিকরা সহানুভূতির সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। বারোজের ইতিহাসে 'ইন্‌ট্রোডাকশন টু পার্লামেণ্ট পেপারস্' (পার্লামেণ্টে পঠিত রচনার ভূমিকা) অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "একাদশ দিবসে বিশপ কীন (Keane) বলেন, 'গতরাত্রে ক্ষুধার্ত হিন্দুদের বিবেক ও বিশ্বাসের বিনিময়ে যে খয়রাতির ছলের নিন্দা করা হয়েছে আমি তা সমর্থন করি। যাঁরা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে প্রচার করেন তাঁদের কাছে এটা গভীর লজ্জা ও নিন্দার কথা। ...মিঃ কীন ডোনেলির (Donneily) ক্যাথলিক দানব্যবস্থার ইতিহাসের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন, যে ভারতে ক্যাথলিকরা অভাবীমানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেই দান করে থাকেন, সেই সঙ্গে কেবলমাত্র ধর্মান্তরিতদের মধ্যে খ্রীষ্টান-খয়রাতী সম্পর্কে বিবেকানন্দের নিন্দাবাদকে হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন। 'প্রায়শ্চিত্ত-করণের খ্রীষ্টীয় পদ্ধতির যে নিন্দাবাদ তিনি করছেন, সেটাও হিন্দুসন্ন্যাসীর অন্তর থেকেই উদ্ভূত।' আমরা এরকম সমালোচনার অর্ধেকও কখনো শুনিনি এবং যদি বিবেকানন্দের এই সমালোচনা আমাদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে খ্রীষ্টের কাজে উন্নততর শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় প্রবুদ্ধ করে তাহলে অন্ততপক্ষে আমি হিন্দু-সন্ন্যাসীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকব।"*[1]

১ জন হেনরি বারোজ (সম্পাদিত) দি ওয়ার্ল্ড'স্ পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়নস্—৩, পৃঃ ১২৮-২৯

* Swami Vivekananda in the West: New Discoveries. Part One (3rd Edition. 1983) গ্রন্থের The Parliament of Religions পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ (পৃঃ ১২৩-২৭) অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। সম্পূর্ণ অনুবাদ 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে গ্রন্থাকারে যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।—সঃ

# প্রাণিজগতের একটি বিস্ময়—তিমি

শ্রীপ্রশান্তকুমার পণ্ডিত

বৃহৎ বৈচিত্র্যময় এই প্রাণীজগতকে কতকগুলি পর্বে ভাগ করা হয়েছে, পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে। এদের মধ্যে সব থেকে উন্নত মানের প্রাণী হল মেরুদণ্ডী পর্বভুক্ত স্তন্যপায়ী যার মধ্যে মানুষ হল প্রধান। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী হচ্ছে তিমি। অন্যান্য স্তন্যপায়ীরা স্থলবাসী কিন্তু তিমি হঠাৎ যে কেন সমুদ্রবাসী হয়ে গেল সে বহু তর্কের ব্যাপার। স্বাভাবিক কারণে জলবাসী তিমির চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন শারীরিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় ব্যাপারগুলি অন্যান্য স্থলবাসী স্তন্যপায়ী প্রাণী অপেক্ষা আলাদা। আর এই আলাদা হওয়ার কারণ জলে বাস করার জন্যে। বলা বাহুল্য, বেঁচে থাকার অদম্য প্রয়াসের জন্যই তাদের সেভাবে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসে তিমিরা কিভাবে জলে বাস করে? কিভাবে চলাফেরা করে? শারীরিক কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? কি খায়? জলের মধ্যে কিভাবে শ্বাসকার্য চালায় ও মস্তিষ্ক কিরকম?—ইত্যাদি।

জলে বাস করার জন্যে তিমিকে আগে মাছ বলে মনে করা হত। পরে ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন রে এর মধ্যে সর্বপ্রথম স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন এবং স্তন্যপায়ী দলভুক্ত করেন। তিমির মতো আর কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী জলপরিবেশে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল তিমিরা স্থলপরিবেশে বাঁচতে পারে না। জলে বাস করার জন্যে এদের যে-সব শারীরিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা হল ছোট্ট গলা, অস্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন পেশীবহুল লেজ এবং টর্পেডোর মতো শরীর।

তিমির সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিনিস যা অন্যান্য জলজপ্রাণী অপেক্ষা আলাদা তা হল প্রচণ্ড শক্তিশালী হাড়বিহীন, শুধু মাত্র পেশী দিয়ে গঠিত সুবৃহৎ লেজ। পাখনাগুলির সজ্জারীতি ও গঠন মাছের থেকে আলাদা। তিমির মাথা আকৃতিতে বিশাল কিন্তু প্রায় ঘাড় বিহীন। সেজন্যে এরা অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মতো ঘাড় ঘোরাতে পারে না। ঘাড় ঘোরানোর মতো প্রয়োজনীয় গঠনই এদের নেই। অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের গলার হাড়ের সংখ্যা সাতটি, কিন্তু তিমির মধ্যে এই হাড়গুলি খুব ছোট্ট এবং একে অপরের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকে। প্লবতার (ভেসে থাকার জন্যে) জন্যে তিমির অস্থির মধ্যে তৈল-গহ্বর থাকে ও অস্থি স্পঞ্জের মতো হয়। তিমির মধ্যে আর দুইটি উল্লেখযোগ্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য হল নাক ও কান। পৃথিবীর এই বৃহত্তম স্তন্যপায়ীর কিন্তু কোন কান নেই, শুধু মাথার দুপাশে দুটি ছোট ছিদ্র এদের কানের কাজ করে। ছিদ্রগুলি এতই ছোট যে কেবলমাত্র একটি পেনসিলই ঢুকতে পারে। অতবড় প্রাণী কিভাবে ঐ সূক্ষ্ম দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে শ্রবণকার্য চালায় তা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। শ্বাসকার্যের জন্য তিমির নাকও অন্যান্য স্তন্যপায়ী অপেক্ষা আলাদা, মাত্র দুটি ছিদ্র যা মাথার উপর অবস্থান করে। এরা মাথা জলের থেকে কয়েক-সেন্টিমিটার উপরে তুলে বায়বীয় অক্সিজেন নেয়। অক্সিজেন নেবার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এদের জলের উপর মুখ তুলতে হয়। জলে বাস করলেও এরা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শ্বাসকার্যের সময় গ্রহণ করতে পারে না।

তিমির ত্বকের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করার মতো। এদের ত্বক চকচকে। পাতলা এবং রোমবিহীন,

স্বেদগ্রন্থি ও সিবেসিয়াসগ্রন্থি যা স্তন্যপায়ীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা তিমির মধ্যে থাকে না। এক ধরনের মোটাপর্দা ( ব্লাবার ) চামড়ার নিচে থাকে। যখন যে উষ্ণ-অঞ্চলের গরম জলে খাদ্যহীন অবস্থায় বাস করে, তখন এটি শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখে, জলপরিবেশে ও খাদ্য-সঞ্চয়ী স্থান হিসাবেও কাজ করে।

আমরা জানি সব তিমির আকৃতি বিশাল; কিন্তু ধারণাটি পুরোপুরি সত্যি নয়। নানা-জাতের তিমি আছে যাদের ওজন ও আকৃতি বিভিন্ন। কয়েক জাতের তিমি আছে যাদের দৈর্ঘ্য ১.২ থেকে ১.৫ মিটার এবং ওজন মাত্র কয়েক কিলোগ্রাম। তবে বড় আকৃতির তিমিই হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম জীব। স্থলভাগে এদের খাদ্যসংকুলান না হওয়ার জন্যেই সম্ভবতঃ এরা জলপরিবেশে মানিয়ে নিয়েছে যেহেতু জলপরিবেশে খাদ্যের পরিমাণ বেশি একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে যে একটি বিশালাকৃতি তিমির ওজন ও দৈর্ঘ্য কত। একটি নীল তিমির ( Blue Whale ) ওজন ১৭০ টন পর্যন্ত হয় ও দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৩৮ মিটার। তিমির ঐ ওজন ২৩০০ জন মানুষের ওজনের সমান। ভাবা যায় কি বিশাল বপু এই তিমির!

তিমির শরীরে প্রচণ্ড শক্তি। তিমি দ্বারা জাহাজ উল্টানোর ঘটনা আমরা অনেকেই শুনেছি। এক-একটি বৃহৎ তিমি ৫০০ অশ্ব শক্তির সমান শক্তি তৈরি করতে সক্ষম। আর আশ্চর্যের ব্যাপার যদিও তিমির আকৃতি বিশাল তবু এদের গতি অন্যান্য বৃহৎ প্রাণী অপেক্ষা অনেক বেশি। এক-এক জাতের তিমির গতিবেগ ঘণ্টায় সাধারণ দ্রুত গতির স্থলযান অপেক্ষাও বেশি হয়। প্রজাতি অনুসারে তিমির গতিবেগ ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়।

এবার আলোচনায় আসা যাক। বৈচিত্র্যে ভরপুর পৃথিবীর এই বৃহত্তম জীবটি কি খায় বা তাদের আহার্যের পরিমাণই বা কত? তিমিরা সাধারণতঃ ছোট ছোট চিংড়ি বা ঐ জাতীয় পোকামাকড় ( যাদের আকৃতি ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটারের বেশি হয় ), যা ক্রিল ( Krill ) নামে পরিচিত—তা খায়। একটি বড় তিমির ( ঝিল্লিমুখো তিমি ) পাকস্থলীতে একসঙ্গে একটন পর্যন্ত ক্রিল ধরতে পারে। রাশিয়ান প্রাণীবিদ্ বি. এ. জেনকোভিক-এর মতানুযায়ী এক-একটি সুবৃহৎ নীল তিমি প্রতিদিন ৪ টন পর্যন্ত প্ল্যাঙ্কটন খেতে পারে। ভাবা যায় কী পর্বতপ্রমাণ আহার্য তিমি প্রতিদিন গ্রহণ করে!

সবজাতের তিমির দাঁত থাকে না। ঝিল্লি-মুখো তিমির মুখের মধ্যে বল বা বেলুনের মতো একটি অংশ থাকে যার ভিতরের অংশ নমনীয় ও সংখ্যায় অনেক শিং জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি রাক্ষদাঁতাল তিমির ( sperm whale ) খাদ্যের আকৃতি ৯০ সেন্টিমিটার থেকে ২ মিটার পর্যন্ত হয়। প্রতিবার খাদ্য গ্রহণে এরা একধরনের প্রায় ১০০টি জীব গ্রহণ করিতে পারে। এদের খাবার ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। যে-সব তিমির দাঁত নেই তারা, পাখিরা যেমন তাদের খাবার ভেঙে ছোট্ট ছোট্ট কণায় পরিণত করার জন্যে বালি বা ছোট ছোট নুড়ি গ্রহণ করে, তেমনি মাছের হাড়, কাঁকড়া ও শামুক জাতীয় শক্ত জিনিস গ্রহণ করে যা খাদ্যকে ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে। একটি বড় জাতের তিমির ক্ষুদ্রান্ত্রের দৈর্ঘ্য ১৬৫ মিটার পর্যন্ত হয়।

তিমি বিভিন্ন জাতের হয়, যেমন নীল তিমি ( Blue whale ), ঝিল্লিমুখো তিমি ( Baleen whale ), ডানা তিমি ( Fin whale ), ঠোঁট ওয়ালা তিমি ( Beaked whale ), দাঁতাল তিমি ( Toothed whale ), রাক্ষুসে তিমি ( Killer

whale ), রাম দাঁতাল তিমি ( Sperm whale ), সেই তিমি ( Sei whale ), দক্ষিণ তিমি ( Right whale )।

এবার আসা যাক এই বৃহত্তম প্রাণীটি কিভাবে বংশ বিস্তার করে সেই আলোচনায়। অনেক তিমি বছরের ছ'মাস সমুদ্রের মেরু-অঞ্চলের ঠাণ্ডা জলে বাস করে এবং তারপর বংশ বিস্তারের জন্যে সমুদ্রের উষ্ণ-অঞ্চলের উষ্ণজলের দিকে আসে। বাচ্চারা উষ্ণজলের মধ্যেই বড় হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্লাবার-আবরণী হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঠাণ্ডা জলের মধ্যে যেতে পারে না। তিমির যৌন আচরণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে যেটুকু জানা গেছে তা হচ্ছে পুরুষ তিমি স্ত্রীতিমির কাছে ও একত্রে বসবাস করে। যৌন মিলন সাধারণতঃ মে-জুন মাসে উষ্ণ-অঞ্চলের উষ্ণজলের মধ্যে সমাধা হয়। বড় নীল তিমি একসঙ্গে একটি বা দুটি বাচ্চা প্রসব করে তবে যমজ বাচ্চা মানুষের মতোই বিরল। প্রায় এগারো মাস গর্ভধারণ করার পর স্ত্রী নীল তিমি প্রায় সাত মিটার লম্বা ও দুই টন ওজনের একটি বাচ্চা প্রসব করে। স্ত্রী নীল তিমি পুরুষ নীল তিমি অপেক্ষা আকারে বড়, অপর পক্ষে স্ত্রী রামদাঁতাল তিমি পুরুষ অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট, প্রায় অর্ধেক। এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। তিমিরা তাদের বাচ্চাদের ছ'মাস থেকে একবছর পর্যন্ত প্রতিপালন করে। এক-একটি বাচ্চা নীল তিমি প্রতিদিন তার মায়ের কাছ থেকে প্রায় একটন মাতৃস্তন্য পান করে। তিমির দুধে প্রোটীন ও ফ্যাটের পরিমাণ অন্যান্য স্থলজ স্তন্যপায়ী অপেক্ষা বেশি, এবং চিনি ও জলের পরিমাণ কম। একটি বাচ্চা নীল তিমি প্রতিদিন দৈর্ঘ্যে তিন থেকে চার সেন্টিমিটার, এবং ওজনে প্রায় একশো কিলোগ্রামের মতো বাড়ে। তিমির মাতৃদুগ্ধ পান করার পদ্ধতিটি বিশেষ ধরনের। অন্যান্য স্তন্যপায়ীরা মাতৃস্তন মুখে ঢুকিয়ে দুধ পান করে, কিন্তু তিমির মুখের আকৃতি বিশেষ ধরনের। তাই সে সেভাবে পারে না। মাতৃস্তনের বোঁটার মাধ্যমে সজোরে দুধ বাইরে আসে এবং বাচ্চারা মাতৃস্তনের কাছে মুখ পেতে রাখে যার ফলে দুধ মুখগহ্বরে প্রবেশ করে। চার থেকে ছ'বছরের নীল তিমিরা যৌন জননে সক্ষম হয়, আবার অনেক তিমির বারো বছর পর্যন্ত সময় লাগে। একটি স্ত্রী নীল তিমি প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বাঁচে ও ঐ সময়ের মধ্যে দশ থেকে পনেরোটি বাচ্চা প্রসব করতে পারে।

তিমির দাম্পত্য প্রেম অতিশয় প্রবল, বিশেষ করে নীল তিমি ও ঝিল্লিমুখো তিমির। এদের পুরুষ এবং স্ত্রী কোন একজন মারা গেলে দ্বিতীয় বার এরা সঙ্গী খোঁজে না। তিমির সংখ্যা বর্তমানে কমে যাওয়ার এটা একটা প্রধান কারণ। এদের স্বামী-স্ত্রীর কোন একটিকে যদি কোন শিকারি মেরে ফেলে তাহলে বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অন্য তিমিটি আসেপাশে ঘোরাঘুরি করে। অক্সিজেন নেবার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মুখ জলের উপরে তোলে, তখন শিকারিদের নজরে পড়ে যায়, যার ফল পৃথিবী থেকে আর একটি তিমির সংখ্যা কমে যাওয়া। এদের বংশ-বৃদ্ধির হারও খুব মন্থর। তার উপর শিকারিদের যথেচ্ছ শিকার। এজন্যে এদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে।

তিমি জলের নিচে একটানা প্রায় এক-ঘন্টারও বেশি থাকতে পারে। তাই এদের ফুসফুসের আকৃতি বড় ও বায়ুধারণ ক্ষমতাও বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শরীরের আকৃতির তুলনায় ফুসফুসের আকৃতি ছোট। আর ফুসফুসই এদের শরীরে একমাত্র অক্সিজেন সঞ্চয় ভাণ্ডার নয়। মোট প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ন'ভাগ অক্সিজেন

ফুসফুসের মধ্যে থাকে। মানুষের মধ্যে থাকে শতকরা চৌত্রিশ ভাগ। প্রত্যেকবার নিঃশ্বাসের সময় এরা ফুসফুসকে প্রায় বায়ুশূন্য করে ফেলে ও প্রশ্বাসের সময় বাইরের অক্সিজেন নিয়ে ফুসফুস ভর্তি করে ফেলে। তাহলে প্রশ্ন আসে বাকি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ভাণ্ডার কোথায়? মোট প্রয়োজনের একচল্লিশ শতাংশ অক্সিজেন পেশীতে ও বাকি অক্সিজেন রক্তের মধ্যে থাকে। মাংস-পেশীতে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন থাকার জন্যে পেশীর রং গাঢ় লাল হয়। তিমির শরীরে রক্তের পরিমাণের অনুপাত অন্যান্য স্তন্যপায়ীর অনুপাতে বেশি। এজন্যে এরা রক্তের মধ্যে প্রচুর অক্সিজেন ধরে রাখতে পারে।

তিমির দর্শনেন্দ্রিয়—চক্ষুর আকার খুব ছোট এবং নিচের দিকে বাঁকানো। জলের মধ্যে তাকানোর জন্যে তিমির চোখের এরকম পরিবর্তন হয়েছে। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তিমি চক্ষুগ্রন্থি থেকে এক ধরনের রস ক্ষরণ করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও তিমির খুব উন্নত মানের নয়, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় বাদুড়ের মতো খুব তীক্ষ্ণ।

এই সুবৃহৎ জীবটি কি কাজে লাগে? কেনই বা শিকারীরা এদের শিকার করে? তিমিকে মানুষ মাংসের জন্যে বহুকাল আগে থেকেই শিকার করে আসছে। মানুষের এই অবৈজ্ঞানিক শিকারের ফলে বহু তিমি প্রজাতি এখন অবলুপ্তির পথে। এজন্যে বিশেষ কয়েকটি তিমি প্রজাতি বর্তমানে শিকার করা নিষিদ্ধ। মাংস ছাড়াও তিমির ব্লাবার (চামড়ার নিচে ফ্যাট সমৃদ্ধ আবরণী) থেকে তেল পাওয়া যায়। দাঁতযুক্ত তিমির দাঁত থেকে আইভরি তৈরি হয়। অন্ত্র থেকে অ্যামবার গ্রিস পাওয়া যায় যা নানান্ ধরনের গন্ধদ্রব্য তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণতঃ মেরুদণ্ডীরা সমুদ্র-জলে বাস করার পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ শরীরে লবণের পরিমাণ সমুদ্র-জল অপেক্ষা কম। ফলে সমুদ্র-জলে ঐসব প্রাণীদের মৃত্যু অবধারিত। তিমির শরীরে মাছের ফুলকার মতো বা অন্যান্য সমুদ্র পাখিদের মতো লবণ রেচনকারী কোন গ্রন্থি নেই এবং নেই মানুষের মতো কোন ঘর্মগ্রন্থি, যার সাহায্যে অতিরিক্ত লবণ বের করে দিতে পারে। তিমির একমাত্র রেচন অঙ্গ হল বৃক্ক, যার জন্যে বৃক্কের আকৃতি বেশ বড়; অন্যান্য স্তন্যপায়ীর অনুপাতে প্রায় দ্বিগুণ। বৃক্কের গঠনও আলাদা ধরনের এবং কয়েকটি খাঁজে বিভক্ত। এজন্যে ভিতরের আয়তন বেশি হয়। তিমির মূত্রে লবণের পরিমাণ স্বাভাবিক ভাবেই বেশি থাকে।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। যেহেতু জলের পরিমাণ বেশি তাই সেখানে খাদ্যের পরিমাণও বেশি। আর সেজন্যেই সম্ভবত এই বিস্ময়সৃষ্টিকারী প্রাণী তিমি জলপরিবেশেই নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। জলপরিবেশে বাঁচার জন্যে এদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও অজস্র বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটেছে—যা অন্যান্য স্থলজ স্তন্যপায়ী অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা।

একদল অবিবেকী শিকারির যথেচ্ছ শিকারের ফলে তিমির সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। পৃথিবীতে কোন একটি প্রজাতির সংখ্যা বেড়ে গেলে বা কমে গেলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যাতে পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যে ভরপুর বিশালাকৃতির জীবটি অবাধে বেঁচে থাকতে পারে ও বংশবিস্তার করতে পারে সেদিকে প্রত্যেকটি জনগণের বিজ্ঞানসম্মত সচেতনতা থাকা দরকার। তা না হলে তিমির এই বৈচিত্র্য ও শারীরিক গঠন কেবল মাত্র পৌরাণিক গল্পে পরিণত হবে, ভবিষ্যতে কোন সজীব অস্তিত্ব থাকবে না।

# গীতার প্রয়োজনীয়তা—যুবমানসে

ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অপূর্ব ধর্মগ্রন্থ। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃতের উত্থান, তেমনি সকলশাস্ত্রমন্থনজাত এই গীতা। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের যা শাশ্বত বাণী—তাই গীতার বাণী। ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মমতের ঐকতান বিশেষতঃ সমন্বয়ের সুর—এই বাণীতে অনুরণিত। ভারতীয় নানা মত ও পথের অপূর্ব পবিত্র সঙ্গমস্থল এই গীতাগ্রন্থ—যা হল শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মূল লক্ষ্য দুঃখ-নাশ। সুখ কে না চায়? কিন্তু কোন্ ধরনের সুখ শাশ্বত সুখের পর্যায়ে পড়ে তার সন্ধানের কাজে নিয়োজিত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যবসায়। পরমার্থের সন্ধান দিচ্ছে ভারতীয় দর্শনের নানা শাখা—নানা তত্ত্ব, যেমন কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ, যোগ ও ভক্তিবাদ। নানাতত্ত্বের ভিত্তিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে অখণ্ড অধ্যাত্মসৌধ গীতাতত্ত্ব। জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি—এগুলির মধ্যে আপাতবিরোধ প্রতীয়মান হলেও মূলে বিরোধ নেই—এই আপাতবিরোধের নিষ্পত্তি—এদের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে গীতায়। গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ।

গীতা নিজেও একটি উপনিষদ্, কারণ উপনিষদের তত্ত্বই গীতায় পর্যালোচিত হয়েছে। গীতার ধ্যানে বলা হয়েছে—উপনিষদাবলী হল গাভীসমূহ, গীতামৃতের দোগ্ধা শ্রীকৃষ্ণ, বৎস হল অর্জুন, দুগ্ধ হল অমৃতময়ী গীতা এবং সুধী অর্থাৎ বিবেকী ব্যক্তি এই দুগ্ধের পানকর্তা। উপনিষদের মতো গীতাও ব্রহ্মতত্ত্ব ঘোষণা করছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"উপনিষদ্ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে।"

**গীতার বৈশিষ্ট্য ও সর্বজনীনতা:** মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ তাঁর গীতা ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলেছেন—

ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥

অর্থাৎ মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহীত, সমগ্র মহাভারতের সারতত্ত্ব গীতায় বর্তমান; সেই হেতু গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী—সকল শাস্ত্রের সার গীতায় নিহিত। ঈশ্বরলাভের পথে গীতা সর্বশ্রেষ্ঠ সহচর, সেই সঙ্গে জীবনের প্রত্যেক কর্মকে অনাসক্তির আগুনে শুদ্ধ করে উপাসনায় পরিণত করার যে অপূর্ব কৌশল গীতা শিক্ষা দেয়, তা মানবের কর্মজীবনের অন্যতম অবলম্বন। গীতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—গীতাকথিত অপূর্ব ধর্মসমন্বয়, কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির এরূপ অপূর্ব সমন্বয় অন্য শাস্ত্রে নেই। জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি—এই যোগচতুষ্টয় এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত, অথচ প্রত্যেকে অন্যনিরপেক্ষ। যোগচতুষ্টয়ের যে-কোন একটিকে অবলম্বন করে মুক্তিলাভ সম্ভব। নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাও মানুষ ইষ্টলাভে সমর্থ, কারণ কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে ও সেই জ্ঞান ঈশ্বরলাভে সহায়ক হয়। অহংভাব ত্যাগ করে বাসনাশূন্য হয়ে ঈশ্বরের জন্য কর্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম। আহার, বিহার, পরোপকার—যে-কোন কর্ম ঈশ্বরের জন্য করছি—এইভাব মনে এনে কর্মে প্রবৃত্ত হলে নিষ্কাম কর্মের ফল পাওয়া যায়।

গীতা বিশ্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। গীতা সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মানুষের ধর্মগ্রন্থ হবার যোগ্য। গীতাশাস্ত্রে কোনও গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতা নেই। এ-বিষয়ে গীতার বাণী

প্রণিধানযোগ্য :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ (৪।১১)

—যে যেভাবে আমার আরাধনা করে, আমি সেইভাবে তাকে কৃপা করি। সকল ধর্মপিপাসু আমার পথেই বিচরণ করে। আরও দেখা যায়, গীতার নবম অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যারা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অন্যদেবতার উপাসনা করে, তারাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করে।" এই সব উক্তি থেকে গীতার সর্বজনীনতা প্রমাণিত হয়। ঈশ্বরের অসংখ্য নাম ও অসংখ্য রূপ, যে যে-নামে বা রূপে উপাসনা করুক না কেন, সেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করে। এই উদারতা গীতা ছাড়া অন্য ধর্মপুস্তকে দুর্লভ। রুচির পার্থক্যহেতু যে-পথেই মানুষ চলুক না কেন, কেবলমাত্র আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকলে সাধকের ইষ্টলাভ সম্ভব। যে-কোন সম্প্রদায়ের মানুষ গীতার নির্দেশ মেনে জীবন পরিচালনা করলে সার্থক হবেন। এখানেই গীতার বিশ্বজনীনতা।

**গীতার সূত্রপাত :** যে পটভূমিকায় গীতা উপদিষ্ট হয়, সেই পটভূমিকাটির আলোচনা করে নিলে বর্তমান সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় উৎপথগ যুবমানসে গীতার প্রয়োজনীয়তার আলোচনা করা সুবিধা হবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে—যা হল গীতাকারের কথায় ধর্মক্ষেত্র, সেখানে অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে তত্ত্বোপদেশ দেন, তা-ই অষ্টাদশ অধ্যায়ে গ্রথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। চরিত্র, নীতি, ধর্মজ্ঞান, শৌর্যবীর্য প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিত পাণ্ডবগণ। এহেন পাণ্ডবগণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ কৌরবগণ কপট পাশাখেলায় তাঁদের পরাজিত করেন। ফলে পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসরের অজ্ঞাতবাস। প্রতিজ্ঞাপালন সম্পন্ন করে ফিরে এসে পাণ্ডবগণ প্রাপ্য রাজ্যের অংশ প্রার্থনা করেন। কিন্তু তা দিতে অসম্মত হন কৌরবগণ। শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধের আয়োজন। কুরুক্ষেত্র সেই মহাযুদ্ধের স্থল। উভয়পক্ষই যুদ্ধার্থ সদলবলে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত। উভয় দলেরই রণহুঙ্কার ও যুদ্ধের দামামাধ্বনি শ্রুত হচ্ছে, সেই সঙ্গে বীরগণের ঘন ঘন শঙ্খনাদ। মহাবীর অর্জুনের রথের সারথি ও পরামর্শদাতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে যুদ্ধার্থিদর্শনে সমুৎসুক অর্জুনের রথ ক্রমশঃ অগ্রসর হয় যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে। তিনি একবার দেখে নিতে চান—কে কে যুদ্ধে সমুপস্থিত, কার কার সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুন দেখলেন তাঁর পিতৃতুল্য আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজন যুদ্ধে সমাগত। অসংখ্য পূজ্য ও প্রিয় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। পুরোভাগে তাঁদের দেখে অর্জুনের চক্ষুস্থির। তাঁর মতো বীরের মাথা ঘুরতে লাগল, শরীরে কম্পন উপস্থিত হল, হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ল। কাতরকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন তিনি—সখে, না, আমি যুদ্ধ করতে পারব না, এমন করে আত্মীয়স্বজন বধ করে রাজ্যসুখ আমার চাই না—"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।" বরং শত্রুহস্তে নিধনই শ্রেয়ঃ—এই বলে তিনি রথের উপর বসে পড়লেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন মহা মুশকিল, সব আয়োজন ব্যর্থ হয়। অর্জুনের মতো বীরের পক্ষে এমন কথা বালসুলভ। তাঁর মতো বীরের এই ক্লীবত্ব, ভীরুতা বিস্ময়জনক ও অযৌক্তিক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে মৃদু তিরস্কার করলেন। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হল না। জ্ঞাতিবধ করতে হবে দেখে তাঁর মোহ উপস্থিত। ভালবাসা মোহ আনে। সেই মোহ অনেক সময় দুর্বলতা এনে মানুষকে কর্তব্য ও সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে। অর্জুনেরও তা-ই হয়েছিল।

তখনই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশ্যে স্বধর্মপালনের জন্য, ঋতপথে চালিত করার জন্য কত তত্ত্বের উপদেশ দিলেন। এই উপদেশবাণীই গীতা। এই হল গীতার সূত্রপাত উপদেশের স্থানকাল-সমন্বিত পরিপ্রেক্ষিত হল—মোহগ্রস্ততা, স্বধর্মত্যাগ বা কর্তব্যচ্যুতি। বিষণ্ণ মানুষ যখন কর্তব্যা-কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম, তখনই তার সদুপদেশের প্রয়োজন হয়। অর্জুনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মোহ দূর হয় এবং তিনি কর্তব্যপালনে ব্রতী হন।

**গীতার প্রয়োজনীয়তা—যুবমানসে:** এখন কথা হল বর্তমানকালে যুবকগণের মানস-সংগঠনে গীতার মতো শাস্ত্রগ্রন্থের প্রয়োজন আছে কিনা? থাকলে, গীতার কোন্ দিক গ্রহণীয়? দিঙ্‌নির্ণয়কল্পে যুবসমাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বা পরিস্থিতির পর্যালোচনা দরকার।

সুস্থসবল দেহ, শৌর্যবীর্য, সৃজনশীলতা ও উদ্যমশীলতার বয়স হল মানুষের যৌবন। যুবসমাজই সংসার ও সমাজের কর্মচক্র চালু রাখে। এরা খেলাধূলা করে—শ্রমসাধ্য কাজে এরাই অগ্রণী; এরাই দেশরক্ষা করে—দেশের জন্য প্রাণ দেয়। যুবকগণ উদ্যমী, সংগ্রামী ও আশাবাদী। এই বয়সের আরও বৈশিষ্ট্য হল—এরা মানবিকতার প্রতি আস্থাশীল, সমুন্নত মূল্যবোধের উপর শ্রদ্ধাশীল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এরাই সমাজ বা রাষ্ট্রের রূপান্তর সাধনে উদ্যোগী। সৃজনশীলতা যুবাদের অন্যতম স্বভাবধর্ম—যার ফলে দেশে দেশে সামাজিক উন্নতি ঘটে। এরাই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

বর্তমান যুবসমাজের চেহারা কিন্তু অন্যরকম। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যুবসম্প্রদায় এক অশান্ত বিস্ফোরক শক্তিতে পরিণত হয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। বিভিন্ন দেশে এই শক্তি ফেটে পড়ছে নানা বিক্ষোভে, নানা ধ্বংসলীলায়—আত্মঘাতী হিংসায়। এ নিয়ে দেশহিতৈষীদের চিন্তার শেষ নেই। নেই কর্মসংস্থান—নেই যুবকদের সামনে ঠিক ঠিক অবলম্বনীয় আদর্শ। সেইসঙ্গে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো রাজনীতি যুবকদের আত্মহননের পথে চালিত করছে। যুবকদের নিয়ে রাজনীতিবিদ্‌গণ যে খেলা খেলছেন, তাতে না আছে পথনির্দেশ, না আছে যুবশক্তির সঠিক ব্যবহার। ফলে যুবসম্প্রদায় উত্তেজিত, নানা প্ররোচনায় উদ্‌ভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যুবকগণের বর্তমান মানসিকতা সামগ্রিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত বহন করে। তারা আজ অপসংস্কৃতির শিকার, নানা বদ্‌নেশায় নেশাগ্রস্ত। ভারতের যুবসমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। যুবাদের মানসিকতা আজ বিভ্রান্ত, শিক্ষা-দীক্ষাহীন, অকল্পনীয় উগ্রতায় পূর্ণ—যা কোনও মূল্যবোধের ধার ধারে না। এই মানসিকতা স্বাদেশিকতার দীক্ষা দেয়নি, দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলেনি। এরা যে নতুন দেশ গড়বে, দুর্গত মানুষের দুর্গতি-মোচন করবে, উন্নত সংস্কৃতির বাহক হবে—এরা তারা নয়। এদের বুদ্ধি আজ বিকৃত, রুচিও কুৎসিত, চারিত্রিক দৃঢ়তা অবলুপ্ত, নৈতিক আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট। এরা মানবিক চেতনার সমুন্নত উত্তরাধিকার যাতে লাভ না করে, সমাজকে নতুনভাবে গঠন করার অনুপ্রেরণা যাতে না পায়, বিকারগ্রস্ত ও চিন্তাভাবনাহীন অবস্থার দাসে পরিণত করার অপচেষ্টা চলছে। শ্রদ্ধাহীনতা, বেপরোয়া মনোভাব, অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতি আকর্ষণ তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গীতার শিক্ষা যুবকগণকে ঠিক পথে চালিত করতে ও মানসিক সুসংগঠনে সহায়ক বললে অত্যুক্তি হবে না। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'গীতাতত্ত্ব' গ্রন্থ

থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তা হল: "আমরা বলতে পারি, গীতা কেবল অর্জুনের জন্য বলা হয়েছিল। তাতে আমাদের কি হবে? আমরা তো আর যুদ্ধে যাচ্ছি না, অথবা মহাবীর অর্জুনের জীবনের সঙ্গে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের জীবনের কোন অংশে সাদৃশ্যও নেই। অতএব মহৎ অধিকারীর উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট শাস্ত্র আমাদের উপকারে কিরূপে লাগবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, অর্জুন আমাদের চাইতে শতগুণে বড় হলেও মানুষ ছিলেন। আমরাও মানুষ। তাঁর জীবনে যেমন মোহ কখন কখন হয়েছিল, আমাদেরও তেমনি মোহ প্রতিপদে হয়, আমাদেরও তাঁর মতো সত্যের জন্য নানা বিঘ্ন-বাধার বিপক্ষে দাঁড়াতে হয়। আমাদেরও তাঁর মতো ভিতরে বাইরে জীবনসংগ্রাম চলছে। তাই আমরাও গীতা পড়লে শিক্ষা পাই, শান্তি পাই, জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান পাই। দেখা গিয়েছে, কত পাপীতাপীর গীতা পাঠ করে অনুতাপের অশ্রু পড়েছে এবং উচ্চদিকে জীবন-প্রবাহ চালিত হয়েছে।" (গীতাতত্ত্ব, পৃঃ ৬-৭) উদ্ধৃতাংশ থেকে দেখা গেল, মানুষের সমস্যাসঙ্কুল জীবনে মোহনিরসনে, ঋতপথ নির্ধারণে, সমুন্নত জীবনপ্রবাহের জন্য গীতাপাঠের প্রয়োজন আছে।

নিষ্কাম কর্মযোগের পথই যুবকগণের অবলম্বনীয় পথ। নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা এরা জীবন সার্থক করতে পারে। যুবাবয়স প্রকৃত অর্থে আদর্শ অনুসরণের বয়স। এই বয়সে পরের কল্যাণে যেমন আত্মবলিদানের প্রবণতা থাকে, অন্যবয়সে তা থাকে না। এই বয়সে দ্বিধাশূন্য চিত্তে পরের কল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করা যায়—দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিপ্লবীদের হাতে হাতে গীতাগ্রন্থটি থাকত; এ-থেকে তাঁরা অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশ পেতেন। বাংলার যুবসম্প্রদায় ঐ সময় যে-ভাবে গীতার আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে স্বাধীনতার জন্য জীবন সঁপেছিলেন, আজও তেমনি কল্যাণমূলক কর্মে যুবসম্প্রদায় নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে। প্রয়োজন—গঠনমূলক কর্মের—সেবামূলক কর্মের পরিকল্পনা। সেইসঙ্গে নিঃস্বার্থ পরিচালনা, আর নিষ্ঠাবান কর্মীতে পরিণত হওয়া। প্রকৃত নিষ্ঠাবান কর্মী হওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন জীবনের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিরেখে কর্ম করা হয়। বর্তমান যুব-সমাজের মধ্যে যে নানারকম বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি দেখা যায় তার কারণ জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তাদের সঠিক জ্ঞানের অভাব। আত্মজ্ঞান বা মুক্তিই ভারতীয় জীবনবোধের চরম লক্ষ্য। কিভাবে সেই লক্ষ্যে বা আদর্শে পৌছানো যায় গীতায় তার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্তব্যের আদর্শ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অর্জুনেরও মোহ উৎপন্ন হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেটি বুঝতে পেরে অর্জুনকে সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে কুসংস্কার ও মনের খেয়ালের কাছে নতি স্বীকার না করে দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হতে বললেন। সেইসঙ্গে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে কর্মের আসল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী তা স্থির করে দিলেন। কিভাবে কর্ম করলে কর্ম নিষ্কাম হয় ও আসল লক্ষ্যে পৌছানো যায়, তা-ও অর্জুনকে বুঝিয়ে দিলেন। সুতরাং বর্তমান যুগের যুবকেরাও যদি গীতা অধ্যয়ন করে, তবে তারাও যথাযথ লক্ষ্যের সন্ধান অবশ্যই পাবে, এবং সে লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রেখে কর্ম করে নিষ্ঠাবান কর্মী হয়ে উঠতে পারবে। অতএব বলা যেতে পারে বিভ্রান্ত যুবকগণের দিগ্‌দর্শন যন্ত্রই হল গীতা। অতএব "গীতা সুগীতা কর্তব্যা"।

# ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি

## স্বামী বিশ্বানন্দ

একবার শ্রীশ্রীমা দেশে গেলে মহারাজ উদ্বোধন কার্যালয়ে ছিলেন। তখন একদিন তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে রামনাম গাওয়া হল। মাত্র জনা ছয় লোক উপস্থিত ছিল। সেদিন আমি বুঝলাম ভাবসমাধি কাকে বলে। মহারাজের ঘন ঘন ভাব হচ্ছিল। তাঁর শরীর কখনও কম্পিত কখনও স্থির হয়ে যাচ্ছিল। ছুটি-একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তিনি এক পরমানন্দ প্রকাশ করছিলেন। সমস্ত স্থানটি যেন আধ্যাত্মিকভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল। আমার মনে হল আমি যেন অন্য কোন লোকে উপনীত হয়েছি। ভজন শেষ হতে বিদায় নেবার পূর্বে প্রেমানন্দ মহারাজের একজন সেবক মহারাজকে প্রণাম করল। সে তার মাথা নত করতেই মহারাজ বলে উঠলেন "বোকা! এখন তুই কোথায় যাবি? এখানে যা ঘটেছে তা ধ্যানের চেয়ে অনেক বেশি।" কথাটির তাৎপর্য সুস্পষ্ট। যেখানে ভগবৎ-চৈতন্য এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে জায়গা ছেড়ে ব্রহ্মচারী কোথায় যাবেন!

মহারাজের উপস্থিতিতে আমরা এ কথা-কয়টির অর্থ সুস্পষ্ট ধরতে পেরেছিলাম: "গুরু নীরবে থেকে শাস্ত্রবাক্য ব্যাখ্যা করেন। আর তাতেই শিষ্যদের সন্দেহভঞ্জন হয়ে যায়।"

# যুগধর্ম: শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

## ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

### এক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (৩।১১।৩) দেখি, স্টার থিয়েটারে 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের অভিনয় দেখার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে বলছেন:

"সেদিন তোমায় যা বললুম ভক্তির মানে কি —না কায়-মনো-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নামগুণ-কীর্তন, এই সব করা।

"কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্বদা তাঁর নাম গুণ কীর্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা-সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল বলে তাঁর ভজনা করে।...

"নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম।

"প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হ'লে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। ঈশ্বর-কোটি না হ'লে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্য-দেবের হয়েছিল।"

কেবল গিরিশকে উপদেশ দেওয়ার সময় নয়, কলিযুগে নারদীয় ভক্তিই যে প্রশস্ত এ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ নানা প্রসঙ্গে বলেছেন—কথামৃতের মূল সুর ত্যাগ বৈরাগ্য আর ভক্তি। কলিতে অন্নগত প্রাণ; চমৎকারা অন্নচিন্তা অতিক্রম করে

শ্রুতিস্মৃতি-অনুসারে কর্মযোগ সাধনের সুযোগ বা সামর্থ্যেরও একান্ত অভাব ; দেহবুদ্ধি পরিহার করে বিচারাশ্রয়ী জ্ঞানপন্থা তো অতি দুরূহ। সুতরাং সাধারণ মানুষের পক্ষে ভক্তিমার্গ-অবলম্বনই শ্রেয়। প্রকৃতি-অনুসারে যাঁদের ভিন্ন পথ, ভক্তি তাঁদেরও সাধনায় প্রাণসঞ্চার করে।

নারদীয় ভক্তি।—নারদীয় ভক্তিসূত্রে (পরা-) ভক্তির সংজ্ঞানির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা চ" (২-৩)। —সেই ভক্তি শ্রীভগবানে পরমপ্রেমরূপা, অধিকন্তু (স্বাদুতা অর্থাৎ অনুভূতির উৎকর্ষের জন্য) অমৃতরূপা। ভক্তিসূত্রে এই ভক্তিলাভের জন্য সাধনও নির্দেশ করা হয়েছে—বিষয়ত্যাগ আর আসক্তিত্যাগ, নিরন্তর ভজন, ভগবদ্‌গুণশ্রবণ-কীর্তন, মহতের কৃপা ও সঙ্গ (৩৫-৩৯)। এর মধ্যে বিষয়ত্যাগ ও আসক্তিত্যাগ ক্রমশঃ সম্ভাব্য, মহাজনকৃপা বা সাধুসঙ্গ প্রায়শঃ দৈবনির্ভর ; ভক্তিপথিক স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়ে কেবল ভগবৎপ্রসঙ্গ-শ্রবণ আর ভজন-কীর্তন করতে পারেন।

শাস্ত্রবিচারের কথা বাদ দিলেও নারদীয় ভক্তি বললে শ্রবণকীর্তনের কথাই আমাদের মনে আসে। বিশেষতঃ দেবর্ষি নারদ সম্পর্কে লোকসিদ্ধ ভাবনা এই যে তিনি ভক্তচূড়ামণি—অহর্নিশি বীণা বাজিয়ে হরিগুণগান করেন। নারদীয় ভক্তি প্রসঙ্গে অথবা ভক্তি-প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উপদেশ শুনে মনে হয় তিনি যেমন অন্তরের দিক দিয়ে স্মরণমননের কথা বলেছেন, তেমনই বাহ্য আচরণে শ্রবণকীর্তনের সুসাধ্য অথচ অমোঘ সাধনপন্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কেবল মুখে উপদেশ দিয়ে নয়, নিজে সংকীর্তনের আনন্দে মেতে ভক্তদের মাতিয়েছেন, তাদের অন্তরে ভক্তিভাব জাগিয়ে তুলেছেন।

## দুই

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁর ভক্তমাত্র-সমাদৃত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই অবতারের উদ্দেশ্য নির্ণয় করেছেন। শ্রীভগবান যেন এই সঙ্কল্প করে শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন :

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম-সংকীর্তন।
চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥

যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন—বিশেষভাবে হরিনাম। সুপ্রসিদ্ধ বৃহন্নারদীয়বচনটি স্মরণীয় :

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিযুগে নিরন্তর হরিনাম ছাড়া আর গতি নেই! কেবল কলিযুগ কেন, যে-কোন যুগেই নামসংকীর্তন ধর্মসাধনার বিশিষ্ট পন্থা। তবে শ্রীচৈতন্য যে-কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে-কালে নাম-সংকীর্তন প্রবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

অবশ্য প্রবর্তন শব্দটির অর্থ আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা চলে না। নাম-সংকীর্তন কোন না কোন আকারে সুদূর অতীত কাল থেকে কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতেই ছিল। শ্রীচৈতন্য নাম-সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হবার আগে থেকেই নবদ্বীপে-শান্তিপুরে (অন্যত্রও) যে নাম-সংকীর্তন হত, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' বা অন্য চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য নাম-সংকীর্তনের ক্ষীণস্রোতা ধারাটিকে বেগবতী তেজস্বিনী করে তুলেছিলেন।

প্রথমে ঐকালের ধর্মনৈতিক পরিমণ্ডলের কথা বলা যেতে পারে। নবদ্বীপে তখন নানা শাস্ত্র—বিশেষভাবে নব্যন্যায়ের চর্চা সুপ্রচুর। শাস্ত্রপাঠী অধ্যাপক বা ছাত্রমণ্ডলীর দাপটে নবদ্বীপ বা বাংলার আরও অনেক সংস্কৃতকেন্দ্র সরগরম। বৌদ্ধিক চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিন্তু কিন্তু

ব্যতিক্রম থাকলেও আচারনিষ্ঠারও অভাব ছিল না। কিন্তু ধর্ম যে হৃদয়ের ধন, জীবনের প্রতিষ্ঠা-ভূমি—এ চেতনা ছিল না। উপযুক্ত সাধক—বিশেষতঃ সাধননেতার অভাবে তন্ত্রাচার বিকৃত হয়ে সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলছিল। বৌদ্ধ সাধনার হারিয়ে-যাওয়া আদর্শ নানা শাখা-উপশাখায় নতুন নামে অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। বৈষ্ণব-ভক্তরা প্রায় হতমান হয়ে কোন রকমে টেঁকে টুঁকে ছিলেন। তবু তাঁরাই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রকাশের—জাতির জীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত আধার।

উচ্চকোটির সাধক বিশিষ্ট সব সম্প্রদায়েই ছিলেন, কিন্তু লোকসাধারণের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ছিল না। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে সাধ্য অন্তর্মুখ সাধনপদ্ধতি সর্বজনের উপযোগীও ছিল না। নাম-সংকীর্তন—বিশেষ করে সমবেতভাবে নাম-সংকীর্তন সর্বজনের ভাবনা ও সাধনাকে একান্বিত করে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে। সমবেত নাম-সংকীর্তনে ভাবোদ্দীপক শক্তি অবশ্যই আছে, তার চেয়ে বেশি আছে মাধুর্যময় আবেদন এবং তীব্র আনন্দস্বাদ। শ্রীচৈতন্য সাধনার এই সাধারণী ভূমিকায় তাঁর অনুগামী-দের তথা সেকালের ভক্তিপ্রাণ বাঙালীকে উজ্জীবিত করেছিল।

## তিন

সে-যুগের রাষ্ট্রনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়েও 'যুগধর্ম' নাম-সংকীর্তনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন গৃহস্থ-জীবনে বিশ্বম্ভর শর্মা—নবদ্বীপের সুপরিচিত জনপ্রিয় নিমাই পণ্ডিত, তখন গৌড়েশ্বর আলা-উদ্দীন হোসেন শাহ ( রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ )। যুদ্ধকালে উড়িষ্যার দেবদেউল-ধ্বংস বা কোন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা বাদ দিলে তিনি সাধারণভাবে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও মুসলমান রাজকর্মচারীদের অনেকেই হিন্দুদের প্রীতির চোখে দেখত না, তাদের ধর্মা-চরণে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বাধা সৃষ্টি করত। নবদ্বীপের কাজী বিরল দৃষ্টান্ত ছিলেন না। নাম-সংকীর্তনের মতো 'অহিংস' ধর্মপন্থা যে কিছু কিছু অপশাসকদের প্রয়াস কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারে কাজীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শ্রীগৌরাঙ্গের নেতৃত্বে নগরসংকীর্তন আর তার ফলাফল থেকে তা অনুভব করা যায়। উত্তেজনার কারণ থাকলে ঐ প্রতিরোধ যে কত গভীর সংক্ষোভে পরিণত হবে আর তার প্রতিক্রিয়াও যে সুদূরপ্রসারী হবে, তা অনুধাবন করে আঞ্চলিক শাসক বা রাজপুরুষরা সংযত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আরও একটি কথা। শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগ বা পরোক্ষ প্রশ্রয় পেয়ে ধর্মান্ধ মুসল-মানরা অনেকেই হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করেছে। কিন্তু এইভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বরং সমাজে উপেক্ষিত অবহেলিত ( উৎপীড়িতও ) তথাকথিত 'নীচ জাতি'র একটা বড় অংশ দলে দলে মুসলমান হওয়ায় হিন্দুসমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। ইসলামী সমাজে যে সাম্যভাবনা আছে তাতে সাধারণ মুসলমানও সমাজে সমান মানবিক মর্যাদার অধিকারী। অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা মুসলমান হয়েছে। এ-ছাড়া শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম গ্রহণে বাস্তব কিছু কিছু সুবিধাভোগের প্রলোভন তো ছিলই। শ্রীচৈতন্য নাম-সংকীর্তনে সংবদ্ধ করে যে ভক্ত-সমাজ গড়ে তোলেন তাতে জাতপাতের ভেদ ছিল না। 'ভক্ত বৈষ্ণব' গোষ্ঠীভুক্ত যে-কোন মানুষের এই পরিচয়। সমাজে এতদিন যারা অবহেলিত ছিল তারা বৈষ্ণব-ভক্তসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে পেয়েছে,

বৃহত্তর হিন্দুসমাজে স্বাঙ্গীভূত হয়ে শক্তিসঞ্চার করেছে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত 'যুগধর্ম' এইভাবেও হিন্দুসমাজকে ধারণ করেছে, শক্তিশালীও করে তুলেছে।

## চার

শ্রীরামকৃষ্ণও নাম-সংকীর্তনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। এই নিবন্ধের শুরুতে তাঁর যে কথামৃতাংশ চয়ন করা হয়েছে সেটিতে তা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। ভক্তসঙ্গে নাম-সংকীর্তনে (কেবল হরিনাম নয়, মাতৃনামও) তিনি নিজে মেতেছেন, সকলকে মাতিয়েছেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে তার অজস্র নিদর্শন আছে। নাম-সংকীর্তনের প্রভাব যে কত তীব্র আর গভীর হতে পারে প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা এই দুই গ্রন্থ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিতে নারদীয় ভক্তির কথা বললেও এবং নাম-সংকীর্তনের অমোঘ প্রভাব নিজ আচরণে প্রতিপাদন করলেও 'যুগধর্ম' সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশের সন্ধান অন্যত্র করতে হবে। 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ' নবম অধ্যায়ে দেখি, দক্ষিণেশ্বরে সমবেত ভক্তদের কাছে বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন' —এই আদর্শটি বিশ্লেষণ করেছেন। লীলাপ্রসঙ্গের বর্ণনার কিছু অংশ :

"যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া 'সর্বজীবে দয়া' (প্রকাশ করিবে)। 'সর্বজীবে দয়া' বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৫৮, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২২৩-২৪)

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'ই শ্রীরামকৃষ্ণ-আদিষ্ট যুগধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানেরা জীবনাচরণে এই যুগধর্মই প্রবর্তন, পালন আর প্রচার করেছেন। জীবে শিবজ্ঞান অবশ্যই অনেক দূরের কথা। কিন্তু লোক কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা ধর্মসাধনার বিশিষ্ট পন্থা। এ চেতনায় একদিকে যেমন নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধকের চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়, অন্যদিকে তেমনই সামাজিক সর্বোদয়েরও নিদান। নাম সংকীর্তন, বৈষ্ণবপূজন অর্থাৎ সাধুসজ্জনের সশ্রদ্ধ সেবা অবশ্যই বিশিষ্ট সাধনাঙ্গ, কিন্তু যুগধর্ম —জীবসেবা।

'জীব' শব্দটি অবশ্য লক্ষণার্থে 'মানব'-বাচক। জীবসেবার তাৎপর্য মানবসেবা—মানবকল্যাণ সাধন। হৃদয়ে যথার্থ ভক্তিভাব না থাকলে নাম-সংকীর্তন জড় অভ্যাসে পরিণত হয়ে সাময়িকভাবে কিছুটা মাদকবৎ উন্মাদনার সৃষ্টি করতে পারে। কল্যাণব্রতসাধনও অবশ্য ব্রতীকে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তৃত্বলোভীতে পরিণত করতে পারে; কিন্তু জড় তামসিক অবসাদের চেয়ে রাজসিক উদ্যম বহুগুণে শ্রেয়, চরিষ্ণুতাই জীবন।

# মহাশ্বেতা মায়াবতী

স্বামী জিতাত্মানন্দ

প্রথম উষার স্বল্প আলোকে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম নীরবে, স্তব্ধবিস্ময়ে মায়াবতীর নতুন রূপ দেখছিলাম। অবর্ণনীয় রূপ আজ মহাশ্বেতা মায়াবতীর। সকাল হতে তখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকী। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ফুটে উঠল শ্বেতবসনা মায়াবতীর নিথর নিঃস্পন্দ ধ্যানমগ্না রূপ। গত সন্ধ্যায় ছিল শিলাবৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, কনকনে শীত সারারাত বৃষ্টি হল। মাঝরাত থেকে ছাদজুড়ে শিলাবৃষ্টির ঐকতান শুনেছিলাম।

আজ সকালে সব স্তব্ধ, জীবনের সামান্যতম স্পন্দনও নেই। প্রকৃতি নিথর। পাইন, ওক, সাইপ্রাস, দেওদার, আর রোডোডেনড্রনের বনে যেন হঠাৎ নেমে এসেছে এক বিরাট স্তব্ধতা, ধ্যানের আবেশ, পাখীর ডাক নেই। মায়াবতীর চিরপরিচিত ওকগাছের ডালে নৃত্যরত কাল পাখীর দল আজ উধাও। পাইনগাছে আসেনি আজ দীর্ঘপুচ্ছ নীলপাখীর দল, দূরের সাইপ্রাসের ঘনকাল ডালপালার মধ্যে ক্রন্দনরত ব্রেন-ফিভার পাখীর ডাক আজ শোনা যাচ্ছে না। উত্তর হিমালয় থেকে আসা উষ্ণ-দক্ষিণের যাত্রী যাযাবর পাখীর কলরবের আজ কোন চিহ্ন নেই।

মায়াবতী আজ ধ্যানমগ্না, শুভ্রাবেশ পরিহিতা। পাড়ে লাল রঙটিরও চিহ্ন নেই। মায়াবতীর চিরপরিচিত বাগান আজ হিমশ্মশান। আশ্রমবাড়ি, প্রবুদ্ধভারতের বাড়ি সবই আজ নতুন, অপরিচিত মনে হচ্ছে। ছাদে, কার্ণিশে, উপরে, নিচে, রাস্তায়, বনে, পথে, গহ্বরে চাপচাপ বরফের স্তূপ, চাল থেকে ঝুলছে লম্বমান বরফখণ্ড। সব আজ একাকার—সবই শ্বেত, বাগান পথ সব এক মনে হচ্ছে, সবই শুভ্রবরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে কেবল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পুষ্পহীন প্রাণহীন গোলাপের রিক্ত কাঁটাসার ডালপালা। ভোরের আকাশে নেই নীল রঙ। স্তব্ধ স্থির ঘনায়মান সাদাকাল মেঘে ঢাকা।

চিরপরিচিত ধরমগড় পাহাড় আর গভীর অরণ্য আজ দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল শ্বেতবস্ত্রে আবৃত। গাছ বলে কিছু নেই। গগনস্পর্শী পাইনের উপর আজ শ্বেতাবগুণ্ঠন। কেবল নিচে ঘনকৃষ্ণ বিশাল কাণ্ড। মনে হচ্ছিল কোনও যুগে এখানে সবুজ অরণ্য ছিল। আজ পৃথিবীতে নেমে এসেছে heat-death বা অপমৃত্যু—যে সার্বিক মৃত্যু আসার কথা আজ থেকে তের কোটি বছর পরে, সেই সর্বগ্রাসী মহাশ্মশানের একটু আভাস আজ দিয়ে গেলেন শিবঠাকুর। মায়াবতীর বিশাল হিমভূমি থেকে আসছিল এক অপ্রাকৃত আলো, যা সূর্যেরও নয়, চন্দ্রেরও নয়, একটা রহস্যঘন শ্বেতআভা বরফের বুকে ফুটে উঠেছিল। শিব স্বয়ংপ্রভ। শিব—'চিরশ্মশানচারী, অনাদি সমাধিধারী, স্তব্ধভয়ে গগনে তারি আরতি করে তপন', সর্বগ্রাসী স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছিলাম প্রকৃতির শিবরূপ, মা আজ শ্মশানবাসিনী। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতি আজ একীভূতা, ব্রহ্মলীন। ব্রহ্ম ও শক্তির একীভূত রূপের আভাস চোখে পড়ল, শুনেছিলাম মা কৈলাসে শিবের সঙ্গে থাকেন, কেবল দুর্গাপুজোর সময় চারদিনের জন্য আমাদের পৃথিবীতে নেমে আসেন। আজ হিমশুভ্র সকালে দেখলাম মায়ের কৈলাসবাসিনী রূপ, শিবের অভিন্নরূপা মা।

এই হিমালয়ের অন্যপ্রান্তের কাশ্মীরবাসীরা বিশ্বাস করেন শীতের আগমনে প্রকৃতি শিবের সঙ্গে একীভূতা হয়ে যান। আবার বসন্তের

আগমনে মাতৃরূপে প্রকাশিতা হন। নতুন জীবন দান করেন মা জগৎ রক্ষার জন্য। পত্র-পুষ্পের বিরাট সম্ভারের মধ্যে মা আনেন নবজন্ম। তারপর প্রায় ছ'মাস মা জগৎপালনের কাজ করেন, মাঠে মাঠে ধান হয়। অন্নের সম্ভার এনে দেন মা বিশ্বচরাচরের সকল সন্তানসন্ততিদের জন্য। আবার শরতের শেষে হেমন্তের প্রারম্ভে সব কাজ শেষ করে গেরুয়া বস্ত্রে সজ্জিতা হন শিবলোকে প্রস্থানের জন্য। ম্যাগ্নিফিসেণ্ট চেনারের (এক প্রকার পাহাড়ী গাছ) গৈরিক রঙে সারা কাশ্মীর উপত্যকা ছেয়ে যায়। শীতের আগমনে এই গৈরিকসৌন্দর্যও শেষ হয়ে যায়। গেরুয়ার তপস্যা উত্তরণ করে মা শিবের সঙ্গে লীন হয়ে মহাশ্বেতার রূপ ধারণ করেন। সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা ঢাকা পড়ে সাদা বরফের এক সর্বব্যাপী আস্তরণে।

মায়ের এই রূপ চিরতপস্বিনী ব্রহ্মচারিণী উমার রূপ—আধ্যাত্মিক নবজন্মের প্রতীক। ঈশ্বরসান্নিধ্যে দৈবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার রূপ। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে—লাল রঙ রজোগুণের, কালো তমোগুণের আর সাদা সত্ত্বগুণের প্রতীক। মায়াবতীতে দাঁড়িয়ে দেখলাম মায়ের শুদ্ধসত্ত্বরূপ। মহাশ্বেতা মায়ের বস্ত্র আজ সর্ববাসনার নির্বাণের, সর্বকর্মসন্ন্যাসের রূপ। শেষ হোমাগ্নির ভস্মাবশেষ, শিবের বিভূতি আজ মায়ের আভরণ।

মায়াবতীতে দাঁড়িয়ে আজ সকালে আমরা দেখছিলাম জগজ্জননীর এই নতুন রূপ। গতকালও দেখেছি দূরে দিগন্তবিস্তৃত তুষার-শৃঙ্গরাজি যা দেখে আচার্য শঙ্কর লিখেছিলেন :

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং
হস্তে কপালং সিতং
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতঞ্চবৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে
গঙ্গা ফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রশ্চসিতো
মূর্দ্ধনি…

হে শিব, তোমার দেহ শ্বেত, তোমার করুণার হাসি শ্বেত, হস্তের নরমুণ্ডও শ্বেত, তোমার কুঠার শ্বেত, তোমার বাহন বৃষ শ্বেত। তোমার কর্ণের কুণ্ডলযুগল শ্বেত, তোমার মাথার জটাস্বরূপ গঙ্গার স্রোতরাশি শ্বেত, আর তোমার মস্তকোপরি চন্দ্রও শ্বেত…

আজ সেই সর্বশুভ্র শিব এসে গেছেন মায়াবতীর প্রাঙ্গণে, ঢেকে ফেলেছেন মা প্রকৃতিকে তাঁর নিজের শুভ্রবেশে। শিবস্বরূপ বিবেকানন্দ যেদিন প্রথম পদার্পণ করেছিলেন সেদিনও মায়াবতী ছিল তুষারশুভ্র, শিবরূপা। বিবেকানন্দের বাইরে ভিতরে সেদিন এসেছিল শিবচেতনার আনন্দ—চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং। আর সেই শিবস্বরূপের আনন্দে সেদিন ভরিয়ে দিয়েছিলেন মায়াবতীকে বীরেশ্বর শিব, সেদিনও মায়াবতী ছিল তুষারশুভ্র, ধ্যানমগ্না, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মায়াবতী হয়ে উঠেছিল চিদানন্দরূপিণী, চৈতন্যরূপিণী, আত্মস্বরূপিণী। শিবস্বরূপিণী, মায়ের আত্মানন্দের রূপ ফুটে উঠেছিল সেদিনও এই হিমশ্মশান মায়াবতীর বুকে।

মায়ের এই রূপ কে দেখেছে? কে জানে? মাতৃভক্ত শঙ্কর লিখেছিলেন—তথা তে সৌন্দর্যং পরমশিব দৃঙ্‌মাত্র বিষয়ঃ—মা তোমার প্রকৃত সৌন্দর্য কেবলমাত্র পরমযোগী মহাশিবের ধ্যানগোচর। মায়াবতীতে আজ মায়ের সেই রূপের আভাস চোখে পড়ল, রামপ্রসাদ বলেছিলেন :

'মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম অন্য কেবা জানে তেমন।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, বাড়ির গিন্নী সব কাজ শেষ হয়ে গেলে নাইতে চলে যায়, হাজার ডাকলেও ফেরে না। মায়াবতীতে আজ উমার সর্বস্বত্যাগিনীর, সংসারত্যাগিনীর, সর্বকর্মত্যাগিনীর, কেবল শুদ্ধ চৈতন্যময়ীর রূপ।

স্তব্ধবিস্ময়ে সকলেই দাঁড়িয়েছিলাম পবিত্র উষাকালে। মায়াবতী আজ গভীর আত্মস্বরূপের

আনন্দে বিভোর। মা ঠাকুরঘরে গিয়েছেন, সেখানে ধ্যানে ডুবে গিয়েছেন। ছোট ছেলে দেখছে। মায়ের এই রূপ সে কোনদিন দেখেনি। আজ যেন মা প্রকৃতি তাঁর শিশুকে বলছেন—'Be still! and know that you are God', স্তব্ধ হও, শান্ত হও। এই মুহূর্তেই তুমি অনুভব করবে তুমিই শিব, তুমি সেই একক সর্বব্যাপী সত্তা। উপনিষদের বাণী মনে পড়ল—সেই আত্মাকে জানো যা তোমার অন্তরে, বাহিরে, পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, ভূলোকে, দ্যুলোকে, যা তোমার মন প্রাণ সব কিছুর মধ্যেই ওতপ্রোত-ভাবে অনুস্যূত। সেই আত্মাকেই জান। অন্য সব বাক্য পরিত্যাগ কর। অমৃতের এই একমাত্র সেতু। ঋষিবালক শ্বেতকেতুকে উপনিষদে বলা হয়েছে—'শ্বেতকেতু তুমিই সেই, তুমিই সেই।' আবার উপনিষদ্ বলছেন—'মৌনং ব্রহ্মেতি—মৌনই সেই ব্রহ্মের রূপ।'

পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক স্ফটিকের মতো মায়াবতীর এই হিমদেহের উপর চলতে ভয় হচ্ছিল। হিম মাথায় তুলে নিয়ে আমরা ধ্যানমগ্না প্রকৃতিকে, পার্বতীপরমেশ্বরের একীভূত রূপকে প্রণাম করলাম।

# স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্ম

শ্রীসুশীলকুমার রুদ্র

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, সে জাগরণকে কেউ কেউ ইটালীয় রেনেসাঁসের মতো পূর্ণ জাগরণ বলে স্বীকার না করলেও জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে একটি বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য,—এসবের ক্ষেত্রে যেমন নব নব রূপান্তর সাধিত হয়েছিল, পাশাপাশি ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও মধ্যযুগীয় কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভাবনাকে দূরে সরিয়ে রেখে সনাতন অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন ধর্মভাবনাও উদ্ভাসিত হয়েছিল। আর দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার শান্ত সমাহিত পরিবেশে ভাব-নিমগ্ন প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সেই নবীনধর্মের প্রবর্তক। পরে সমগ্র বিশ্বে গুরুর সেই ধর্মা-দর্শকে বিতরণ করলেন তাঁরই উত্তর-সাধক বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বল্পায়ু জীবনের (১৮৬৩-১৯০২) মূল্যবান সময়-সীমার মধ্যে সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় পাশ্চাত্যে সনাতন হিন্দু-ধর্ম তথা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার কর্মে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। সে-সময় হিন্দুধর্মের যথার্থ স্বরূপ পাশ্চাত্যবাসীর মনে জাগিয়ে তুলতেও সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি তাঁদের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, আধুনিক যুগে সর্বজনীন ধর্মের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে এবং সবধর্মের মধ্যেই এই সর্বজনীন ভাব নিহিত আছে; ধর্মগুলির মূল অংশের দিকে তাকালেই আমরা তা দেখতে পাব। আমাদের সকলকেই ধর্মের এই মূল অংশের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হতে হবে। তিনি বলেছিলেন, বেদান্ত অবলম্বন করেই সর্ব-ধর্মের অন্তর্নিহিত মূলগত ঐক্য জগৎ অনুভব করতে পারবে এবং ধর্মের এই সর্বজনীনতারূপ অনবদ্য ভিত্তির উপর সারা পৃথিবী মিলিত হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

স্বামীজী ধর্ম সম্বন্ধে এক অতি উচ্চাঙ্গের দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় রেখে গিয়েছেন আধুনিক যুগের

বিদ্বৎসমাজের কাছে। স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্মের স্বরূপ বুঝতে গেলে ধর্ম প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন জায়গায় যা বলেছেন সেসব উক্তিগুলিকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তার পূর্বে 'সার্বজনীন' ও 'সর্বজনীন'—এই শব্দ দুটির তাৎপর্যও আমাদের জানতে হবে। কারণ প্রবন্ধের শিরোণামে 'সার্বজনীন' শব্দটি রয়েছে। 'সার্বজনীন' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' এবং 'সর্বজনীন' শব্দটি সাধারণ বা সর্বজন—অর্থে প্রযুক্ত। অবশ্য সার্বজনীন ধর্ম বলতে সকল ধর্মের মূল বা শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে যেমন বোঝানো যেতে পারে, সেই সঙ্গে ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশগুলি যাকে স্বামীজী সকল দেশের সকল ধর্মের মধ্যেই লক্ষ্য করেছেন তা যে সর্বজনীন তাও নির্দেশ করা যেতে পারে। সুতরাং ধর্মের ক্ষেত্রে সার্বজনীন ও সর্বজনীন উভয় শব্দই গভীরভাবে অন্বিষ্ট।

ধর্ম কি? স্বামীজী বলেছেন, মানুষের অন্তরে পূর্ব হতেই নিহিত দেবত্বের বিকাশের নামই ধর্ম। "মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটি মহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা অনবরত বিকশিত হইতে চাহিতেছে। এই বিকাশের নামই ধর্ম।"[১] তাঁর মতে, সার্বজনীন ধর্ম হচ্ছে, মানুষের অভ্যন্তর হতে উদ্ভূত একটা উন্নতি যা মানুষকে ক্রমোন্নত করতে করতে এগিয়ে নিয়ে ক্রম-বিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছে দেয়, যেখানে পৌঁছে মানুষ পূর্ণত্ব সম্বন্ধে সব কল্পনার ও পরিপূর্ণ মুক্তির রূপ নিজেরই অন্তরে প্রত্যক্ষ করে। তাই প্রকৃত ধর্ম মানুষের উপলব্ধিতে, আচার-অনুষ্ঠানে নয়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই ধর্মকে তিনি "মানবজীবনের অতি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব" বলে অভিহিত করেছেন।

স্বামীজী ধর্মকে মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক স্বভাব বলেই শুধু অভিহিত করেননি, তিনি ধর্মকে মানবজীবনের একটি সর্বজনীন বিষয় হিসেবেও ধরেছেন। বলেছেন, "আমার বিশ্বাস—ধর্ম মানুষের এমনই মজ্জাগত যে, যতক্ষণ মানুষ দেহ ও মন ত্যাগ না করে, চিন্তা ও প্রাণের গতি নিরুদ্ধ না করে, ততক্ষণ ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিবে না।"[২]

মানবজীবনে ধর্মের ভূমিকা স্বামীজীর মতে কি? আমরা আসলে যা, আমাদের ব্রহ্মভাব—যা আমাদের স্বরূপ, সেটি উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করাই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের এই 'আমি' বোধকে ক্রমে দেহ-মন-বুদ্ধি থেকে সরিয়ে এনে নিজের আসল রূপ—শুদ্ধচেতনা, যা পরমানন্দময়, যা অবিনাশী, তা উপলব্ধি করাই ধর্ম। স্বামীজী এই কথাটি বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন: 'প্রত্যক্ষই ধর্ম', 'উপলব্ধিই ধর্ম', 'আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধই ধর্ম', 'আত্মারাম হওয়াই ধর্ম' প্রভৃতি। আমাদের স্বরূপই 'পরমাত্মা', আমরা যখন এই স্বরূপ ভুলে নিজেদের মন-বুদ্ধির সঙ্গে জড়াই—হাসি-কাঁদি, চিন্তা করি, বিচার করি—তখনই আমরা জীবাত্মা। কিন্তু যখন আমরা নিজের আনন্দে নিজে বিভোর হই, আনন্দের জন্য বাইরের স্থূলবস্তুর উপর নির্ভর করি না; আমি আনন্দস্বরূপ—এই উপলব্ধি হলেই মানুষ আত্মারাম হয়। আসলে যা সত্য—তা প্রত্যক্ষ করাই হচ্ছে ধর্ম। স্বামীজী ধর্মের এই প্রত্যক্ষতা সম্পর্কে বহুবার বলেছেন:

"'প্রত্যক্ষই ধর্ম—শাস্ত্রাদি পাঠ ধর্ম নয়। বুদ্ধিতে সায় দেওয়া ধর্ম নয়।' 'ধর্ম মতবাদ বিশেষ নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়।' এমন কি, সাধারণতঃ যাকে আমরা ধর্ম বলি—জপ, ধ্যান,

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।১৮

২ ঐ, ৩।২৪০

মন্দির, মসজিদ বা গির্জায় যাওয়া, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, মনঃসংযম, নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি—এসবের কোনটিই ধর্ম নয়। এসব ধর্মলাভের,...সহায়ক মাত্র, 'ধর্মের গৌণ অংশ'। স্বামীজী বলেছেন: যতক্ষণ না কারও সত্য উপলব্ধ হচ্ছে, প্রত্যক্ষ হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে 'ধার্মিক' বলা চলে না, বলা যায়, সে 'ধার্মিক হবার চেষ্টা করছে' মাত্র।"[৩]

আমরা সাধারণতঃ এইসব অনুষ্ঠানগুলিকেই ধর্ম বলে ভাবি, কিন্তু তা নয়। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে অনুভূতির ব্যাপার। স্বামীজী নিঃসঙ্কোচে বলেছেন: "যতদিন না ধর্ম অনুভূত হইতেছে, ধর্মের কথা বলা বৃথা।" "তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলকধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না।...যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই।"[৪]

স্বামীজী সার্বজনীন ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন: "ইন্দ্রিয়ের, এমন কি মনেরও সমুদয় সুখ অনিত্য; কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না।...সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না ক'রে যত ভিতরের উপর নির্ভর ক'রব—যতই আমরা 'অন্তঃসুখ, অন্তরারাম' হবো, আমরা ততই আধ্যাত্মিক হবো।"[৫]

স্বামীজী ধর্মের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করেছেন। যে অর্থে ধার্মিক হওয়া বলতে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বা জ্ঞান লাভ করাকে বুঝিয়েছেন; এ অর্থে ধর্ম ও মোক্ষ সমার্থক। সাধারণতঃ আমরা ধর্মকে যে অর্থে ব্যবহার করি তা উভয়ার্থক। কোন বাঞ্ছিত ফল—ইহলোক ও পরলোক কোন বাঞ্ছিত বস্তুলাভ বা অভ্যুদয়ের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকেও ধর্ম বলি, আবার ইহপর লোকাতীত ভগবান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত প্রচেষ্টাকেও ধর্ম বলি। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য এই ধরনের: আমাদের চরম লক্ষ্য মোক্ষ-লাভ বা জ্ঞানলাভ বা ভগবানলাভ হলেও মীমাংসকদের অর্থে ব্যবহৃত ধর্ম চতুর্বর্গের ধর্ম, যা ক্রিয়ামূলক, যা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় আনে, তা অধিকাংশ অধিকারীর পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন। ক্রিয়ামূলক বলেই তা প্রয়োজন, কারণ তা তামসিকতা বা জড়ত্বকে কাটিয়ে দিতে পারে। আর এই কর্মের সঙ্গে ভগবচ্চিন্তা বা আত্মচিন্তাকে যে-কোনভাবে জড়িয়ে রাখলে তার ফল রাজসিকতাকে দমিয়ে ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় ঘটিয়ে মানুষকে মোক্ষ-লাভের যথার্থ অধিকারী করে তোলে। কর্ম-সহায়ে তামসিকতাকে কাটিয়ে ঈশ্বরচিন্তা সহায়ে রাজসিকতার দোষ কাটিয়ে যেতে হবে। এজন্যই " 'ধর্মের' চেয়ে 'মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।"[৬] স্বামীজী মানুষের ভিতরের 'অহং'টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাজ করতে বলেছেন, ভক্তি বা জ্ঞান অবলম্বনে কাজ করতে বলেছেন, যা কর্মযোগ। যা গীতার 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম', 'মামনুস্মর যুধ্য চ' প্রভৃতি ভক্তিভাবাশ্রিত বাণীর অনুসরণ করে, অথবা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে" (৩।২৭), সব কিছু করেও "নৈব কিঞ্চিত করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" (৫।৮)—এই জ্ঞান অবলম্বন করে কর্ম করারই নির্দেশ দিয়েছেন।

৩ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৭৫

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫।১৭৯

৫ ঐ, ৪।২১১ ৬ ঐ, ৬।১৫৩

বক্ষ্যমাণ আলোচনায় লক্ষণীয়, স্বামীজী কথনোই ধর্মকে জগৎ-বহির্ভূত বলে নির্দেশ দেননি। বলেছেন,…"ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্রপিণ্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা —এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে।"[৭] তাঁর মতে, যথার্থ ধর্মে, সর্বজনীন ধর্মে এ দুটোই থাকা চাই। কারণ সাধারণ মানুষকে স্থূল অবলম্বন করেই সূক্ষ্মকে ধারণা করতে হয়, তাছাড়া উপায় নেই। স্বামীজীর এই কর্মাশ্রয়ী ধর্মের আদর্শ তাই সর্বজনীন এবং সর্বদেশের সর্ববিধ অধিকারীরই উপযোগী। ভগিনী নিবেদিতা গুরুর এই ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। বলেছেন : এ ধর্ম "জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের সীমারেখাটি মুছে দিয়েছে এবং আমাদের শিখিয়েছে গৃহস্থালি, অফিস, বিদ্যায়তন, খেতখামার, কল-কারখানা—সবকিছুতে মন্দিরের, সাধুর আশ্রমের পরিবেশ নিয়ে আসতে। এ আদর্শ, যাকে 'মোক্ষ' ও 'ধর্মের' সমন্বয় বা 'মোক্ষাভিলাষী ধর্ম'ই বলব মানবজাতির প্রগতির একমাত্র পথও।"[৮] বর্তমান মানবজাতির কাছে স্বামীজীর নির্দেশিত এ পথ চরম সত্য।

সার্বজনীন ধর্মের পথে যেতে হলে ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করে নিতে হবে। স্বামীজী বলেছেন, ত্যাগ ছাড়া কিছু হবে না। ত্যাগেই, বৈরাগ্যেই ধর্মের সূত্রপাত। এবং সেইসঙ্গে একাগ্রতা। সকল মানুষকেই সংসার ত্যাগ করতে হবে—এমন কোন কথা ধর্মের মধ্যে নেই ; কিন্তু ভোগত্যাগ, ভোগেচ্ছাত্যাগ—এ সকলের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এরই নাম সংযম। সংযম ছাড়া মন অন্তর্মুখী হয় না। একাগ্রতা আসে না। তাই ধর্মলাভের জন্য স্বামীজী বারবার নানাভাবে সংযম ও একাগ্রতা অভ্যাসের উপর জোর দিয়েছেন।

স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্ম একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধর্মকে বিশ্লেষণ করায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। তাঁর কথায়, "জ্ঞানের একমাত্র উৎস অভিজ্ঞতা। জগতে ধর্মই একমাত্র বিজ্ঞান যাহাতে নিশ্চয়তা নাই, কেন-না অভিজ্ঞতামূলক শাস্ত্রহিসাবে ইহা শিখানো হয় না। এইরূপ উচিত নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন কিছু লোক সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের রহস্যবাদী (mystic) বলা হইয়া থাকে, এবং প্রতি ধর্মেই এই রহস্যবাদিগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন এবং একই সত্য প্রচার করেন। ইহাই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান।"[৯] আধুনিক যুগে ধর্ম কিভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমতা রেখে জীবনে পরিপূর্ণতা আনবে, তা সর্বজনীন হয়ে উঠবে সেকথাও স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণীতে :

"বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা ; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এখন চাই এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের এই হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হউক।

৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১।৩২৬
৮ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৬৩
৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।২৪১

খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে।"[১০]

স্বামীজীর মতে, উপরোক্ত পথই মানুষকে প্রকৃত ধর্মের পথে যেতে সাহায্য করবে। আর এই ধর্মই হবে সর্বকালের, সর্বাবস্থার উপযোগী। একেই সার্বজনীন ধর্ম বলা যেতে পারে। মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বামীজী যেমন বলেছেন, তেমনি জীবনের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি ধর্মকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। বলেছেন: "মানব-জীবনের উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক উন্নতির নিয়মগুলিকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করা। খ্রীষ্টানরা এ-বিষয়ে হিন্দুদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। হিন্দুরাও খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে মূল্যবান অবদান রহিয়াছে।"[১১]

স্বামীজীর এই সর্বজনীন ধর্মে জাগতিক লাভালাভের কথা গৌণ, আত্মিক উদ্বোধনই মুখ্য—'awakening of the spirit within us'। আমরা কর্ম করে যাব কর্মের জন্যই, পুরস্কারের জন্য নয়; ঈশ্বরকে ভালবাসব অন্তরের তাগিদে। আর এইভাবেই মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করবে।

বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ ঋষির দৃষ্টি নিয়েই ধর্মের এই সর্বজনীন দিকটাকে সদাসর্বদা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, জগতের ধর্মগুলি পরস্পর বিরোধী নয়, সেগুলি একই চিরন্তন ধর্মের বিভিন্ন দিক। একই চিরন্তন ধর্মকে অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা হয়েছে। সব ধর্মেরই মূল ভাবগুলির উপর থেকে বিশেষ নাম, প্রথা ও প্রভাবের আভরণগুলি খুলে ফেললে দেখা যায় তাদের ভিতর পার্থক্য আর নাই, একই চিরন্তন ধর্মের ভাব সেগুলি। স্বামীজী তাঁর মানসনেত্রে দৃষ্ট সর্বজনীন ধর্মের এই স্বরূপটি আধুনিক বিক্ষুব্ধ মানুষের দৃষ্টিপথে তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সর্বজনীন ধর্মের মহিমোজ্জ্বল রূপ ধারণায় আনতে পারলে সমস্ত ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও অপরাপর ধর্মমতগুলিকে অসীম উদারতার চোখে দেখতে পারবে। স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির এই উদারতা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি জানতেন, কিভাবে ধর্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত মূল ভাব ও আদর্শগুলিকে জগতে ছড়িয়ে দিয়ে সর্বজনীন ধর্মের প্রতি সমগ্র মানবজাতির দৃষ্টিভঙ্গিকে নবারুণরঞ্জিত করা যেতে পারে। তিনি এই সর্বজনীনধর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন:

"সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নরনারীর দেব-স্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।"[১২] জগৎকে সর্বজনীন ধর্মের এমন এক মহিমময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন তিনি যা "কোন বিশেষ স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রতিপাদ্য ভগবানের মতই যা অনন্ত; যারা সূর্য কৃষ্ণের উপাসক ও খ্রীষ্টের উপাসক, সাধু ও পাপী, সকলের ওপরেই সমভাবে কৃপাকিরণ বর্ষণ

১০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ২।১০৪

১১ ঐ, ৩।২৮৯

১২ ঐ, ১।২৫৭

করবে; যা ব্রাহ্মণদের ধর্মও নয়, বৌদ্ধদের ধর্মও নয়, খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্মও নয়; কিন্তু যা এসবের সমষ্টি-স্বরূপ।"

মানুষকে সর্বজনীন ধর্মে বিশ্বাস করানোর জন্য তিনি শিষ্যদের ভাবানুপ্রাণিত হয়ে বলেছেন: "অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলিয়া মানি এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাসনায় যোগদান করি।...আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রীষ্টানদিগের গীর্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাঁহার ধর্মের শরণ লইব,...শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম আসিতে পারে তাহাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব।"[১৩]

এইভাবে স্বামীজী যুক্তিগ্রাহ্য কথায় ধর্মের মূল তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বজনীন ধর্মের মহান রূপ অতি স্পষ্টভাবে চিত্রিত করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন সাধনায় উপলব্ধ ও তাঁর নিজ উপলব্ধিতে পুনরায় প্রত্যক্ষ করা বৈদিক ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার করেছেন।

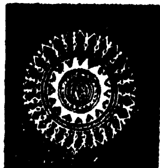
১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৩।১১১-১২

# প্রণমি হে যুগাবতার

শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহান পথিক তুমি—
প্রণাম তোমায় শ্রীরামকৃষ্ণ, ও পাদপদ্ম চুমি!
তুমি যে হয়েছ যুগের আধার,
পরম-হংস, হে যুগাবতার,
'বিবেক' বিবেক-জন্ম দিয়েছ
ওগো সুমহান পিতা—
মাটির বুকেতে জন্ম নিয়েছ
তুমি যে বিশ্বত্রাতা!

অবিশ্বাসীর ধোঁয়ায় দেখেছি তুমি স্ফুলিঙ্গ-বাণী—
মাটির গন্ধে মাটির ভাষায় তত্ত্ব বোঝালে তুমি!
কথামৃতের অমৃত লাগি,
বিশ্ব বিবেক উঠেছে যে জাগি,
দিকে দিকে বাজে তোমার শঙ্খ
তোমার নিনাদ ঘোষে—
আবার দেখাও তোমার বিভাস
অরূপে-স্বরূপে এসে।



# অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

## ধ্রুবতারা

ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ, এরূপ মতভেদ বোধ হয় আর কোনও বিষয়ে নয়। ঈশ্বর আছেন কি না, তিনি সাকার বা নিরাকার এবং কোন্ সাকার মূর্ত্তি তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি, অজ্ঞানতা বশতঃ ইহা লইয়া বাদানুবাদ নিয়তই চলিতেছে। ম্যাক্সমূলার বলেন যে, প্রধানতঃ আট প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। অধিক থাকুক বা না থাকুক, দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে নানাপ্রকার সম্প্রদায় ও প্রতি সম্প্রদায় যেন বিরোধী ধর্ম্মাবলম্বী। প্রতি সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায়ের জন্য নরক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মেও এইরূপ বিরোধ, আবার এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির উপাসনা লইয়া পরস্পরে এইরূপই বিরোধ। কিরূপে ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস এই সকল বিরোধ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা যিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোন কথা কিছু শুনিয়াছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু সে বিষয় উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নয়। পরমহংসদেব সকল প্রকার উপাসনার কথাই বলিয়াছেন, তাঁহার মতে মনুষ্য-মাত্রেই স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে উপাসনা করিয়া থাকে এবং অকপটচিত্তে যেরূপই উপাসনা করে, সেই উপাসনাই প্রশস্ত। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিতেন ও সে কথা আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইব।

ঈশ্বর লাভের উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশিত করেন। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর কি সহজে পাওয়া যায়? একজন বড়লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে কত লোকের উমেদারী, কত প্রকার পরিশ্রম, কত লোকের কত প্রকার স্তবস্তুতি করিতে হয়। এই সকল উমেদারী ও পরিশ্রমের ফলে সেই বড়লোকের দেখা পাইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু এরূপ কষ্ট ব্যতীত যে দেখা পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর নির্গুণ, শত উপাসনা করো, কিছুতেই কিছু হইবে না। আপনাকে নির্গুণ অবস্থায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করো, বহু সাধনার পর সেই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কেহ মনে করেন, তাঁহার উপাসনার প্রথাসকল রহিয়াছে, সেই প্রথা অনুসারে কার্য্য করে, পুষ্প নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া অর্চ্চনা করো, শুদ্ধরূপে মন্ত্রসকল উচ্চারণ করো, এই সকল কার্য্য করিতে করিতে যদি ত্রুটি না হয়, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলেও পড়িতে পারে। কেহ বা বলেন, ও সকল বাহ্য পূজায় কি ঈশ্বরের তৃপ্তি হয়? ও সকল বাহ্য পূজা নিম্ন অধিকারীর নিমিত্ত। তাঁহার নাম করো, ধ্যান করো, কীর্ত্তন করো, ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে থাকিবে। কেহ বলেন, অতি শুদ্ধাচারে থাকিতে হইবে, প্রত্যহ স্নান করিয়া শুচি হও, সকাল বিকাল সন্ধ্যাহ্নিক করো, হবিষ্যান্ন আহার করো, আগে দেহশুদ্ধি করো, তারপর সে কথা। কেহবা বলেন, প্রাণায়াম করিয়া আগে মন স্থির করো, নেতি ধৌতি করিয়া দেহ শুদ্ধ করো, উপাসনার কথা পরে। কেহ তাঁহাদের কথায়

আপত্তি করিয়া বলেন যে, সংসারে থাকিয়া নানা সাংসারিক কার্য্য করিয়া ওসকল কার্য্য কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে যোগপন্থী বলেন—"সত্যই তো তাহা হইবার নয়, অতএব সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করো।" সে কথার প্রত্যুত্তরে তাহার প্রতিবাদী বলেন, "কেন, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কি হয় না? এই বাদ-প্রতিবাদের অন্তর্ভূ'ত একটী কথা আছে, হওয়া কাহার নাম, এ কথা তাহাদের উপলব্ধি হয় নাই। 'নিয়তই ঈশ্বরে মনোনিবেশ' তাহার নাম যদি হওয়া হয়, সংসারে যে, সে পক্ষে পদে পদে বিঘ্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহাই হউক, এই তো বাদানুবাদ। ঈশ্বরের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, ইহা স্থির করিতে না পারাতেই এই সকল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর বহুদূরে, এইরূপ ধারণাই এই বাদানুবাদের মূল। কিন্তু যে ভাগ্যবান্ গুরুকৃপায় বুঝিয়াছেন যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি দূরে নাই, আমার অন্তরের অন্তরে আছেন, অসহায় বাল্যকালে যে মাতৃস্নেহ পাইয়াছি, সে ঈশ্বরেরই স্নেহ; সাকার মাতৃমূর্ত্তি হইতে আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; তাঁহারই কৃপায় চলিতেছি, বলিতেছি, তাঁহার কৃপায় ডুবিয়া আছি, তিনি কোলে লইতে চান, আমরাই দূরে যাইতেছি; আমার কি মঙ্গল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্থির করিতে পারিতেছি না, তিনি নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতেছেন, এরূপ ভাগ্যবানের পূজাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি যখন পুষ্প চন্দন লইয়া পূজা করিতে বসেন, তিনি কি হয় না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন না। ফুলগুলি সুন্দর, আমার মার পাদপদ্মে দিব না? এই ভাবিয়া পূজা করিতে বসেন। সুন্দর সুমিষ্ট ফল, সুস্বাদু আহার্য্য, সেই সকল দ্রব্য তিনি স্বয়ং বড় ভালবাসেন; তিনি তাঁহার মাকে আনিয়া দেন। তাঁহার মনে নিশ্চিতই ধারণা, তিনি শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করুন বা না করুন, মা তাঁহার ফলমূল আদি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মার গুণানুকীর্ত্তন করেন, কেন না তাঁর প্রাণ টলিয়া ওঠে, না করিলে মহা অশান্তি জন্মে। তাঁহার নিকট অপরাধ নাই, পাপ নাই, তিনি অপার স্নেহময়ী মায়ের সন্তান। তিনি নিজেকে যত ভালবাসেন, তার শতগুণে মা তাঁহাকে ভালবাসেন। এ মার কেন দেখা পাইতেছি না বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হন।

এইরূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অবস্থা অতি প্রার্থনীয়। গুরুর কৃপায় এই প্রার্থনীয় অবস্থায় যাঁহার দৃষ্টি পড়ে, এই প্রার্থনীয় অবস্থা যিনি চান, তাঁহারও কঠোর পন্থা নয়। সেই অবস্থা পাইবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাই একমাত্র পন্থা। হয়তো তিনি ভাবেন, আমার মন অতি দুর্ব্বল, এইরূপ প্রার্থনা করিতেও পারি না। এই দুর্ব্বলের নিমিত্ত কৃপাময় রামকৃষ্ণদেব কি সহজ উপায়ই করিয়াছেন! তোমার এই মনের দুর্ব্বলতা অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট জানাও, যতটুকু পারো জানাও, তিনি বিন্দুকে সিন্ধু করিয়া তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তুমি দুর্ব্বল তিনি জানেন, তুমি একবার শরণাগত হইলে, তিনি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিবেন না, তিনি শরণাগত দীনের পরিত্রাণপরায়ণ। এই রামকৃষ্ণের মহাবাক্য, কেহ এরূপ দীন নয়, কেহ এরূপ সাংসারিক হীন অবস্থাগত নয় যে, দিনান্তে একবার এইরূপ তাঁহার মনের অবস্থা ঈশ্বরকে জানাইতে না পারে।

হয়তো শাস্ত্রাভিমানী বলিবেন, একবার প্রার্থনা করিলেই যদি হইত, তাহা হইলে কেহ কি প্রার্থনা করে না? করে কি না করে তাহা আমরা বিচার করিতে বসি নাই, কিন্তু আমাদের কথা এই যে, যিনি রোগ, শোক, মৃত্যুসঙ্কুল সংসারে আপনার অসহায় অবস্থা, আপনার হীনতা,

আপনার দুর্বলতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি এই মহাবাক্য তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা করিবেন সন্দেহ নাই। এবং সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারসমুদ্রে নির্ভয়ে তাঁহার জীবনতরণী সঞ্চালন করিতে পারিবেন। সন্দেহের ঝটিকা উদয় হইলে, অন্ধকারে দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিলে, সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য করিলেই সেই ধ্রুবতারা দেখিতে পাইবেন; দেখিতে পাইবেন, সেই উজ্জ্বল তারকার অলক্ষিত প্রভাবে ভীষণ তরঙ্গ মাঝে তাঁহার ক্ষুদ্র তরণীখানি অটুট রাখিয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঝটিকা শান্ত হইয়া যাইবে, আবার নির্বিঘ্নে চলিবেন। যদি কেহ আমাদের ন্যায় হীন, আমাদের ন্যায় দুর্বলচিত্ত থাকেন, তাঁহার চরণে আমার সবিনয় নিবেদন, একবার এই মহাবাক্য হৃদয়ে স্থান দেন, এই মহাবাক্যের প্রভাব দিন দিন উপলব্ধি করিবেন। নিরাশ হৃদয়ে আশা আসিয়া বসিবে, বলবান আশা কোনরূপ সংসার তাড়নায় তাহা টলিবে না। যাহা বলিতেছি যদি না উপলব্ধি করিতাম, এরূপ দৃঢ়বাক্যে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম। একবার সেই ধ্রুবতারার প্রতি যাঁহার দৃষ্টি পড়িবে, তিনিও ক্রমে এইরূপ দৃঢ়বাক্যে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের অতুল প্রভাব প্রকাশ করিবেন ও হৃদয় উচ্ছ্বাসে "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া করতালি দিবেন।*

* 'উদ্বোধন'-এর ৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

# পুস্তক সমালোচনা

**ভজন সুধা**—স্বামী মধুসূদনানন্দ। ১৩৯৩ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪। পৃষ্ঠা: প্রথম খণ্ড ৬১, দ্বিতীয় খণ্ড ৫৫। মূল্য: দশ টাকা।

'ভূমিকা'য় সঙ্কলিত গানগুলির রচয়িতা 'ভজনানন্দ সন্ন্যাসী'র উল্লেখমাত্র করে বিনয়েন্দু চক্রবর্তী ( ইন্দ্রসেন ) ভজনগুলির পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভক্তিমার্গের পথে নিঃসর্ত আত্ম-নিবেদনের সোপানে ছড়িয়ে আছে দুঃখকষ্টে জর্জরিত, রোগশোকে মুহ্যমান, আশা আকাঙ্ক্ষার অপ্রাপ্তিতে ভেঙ্গে পড়া সংসারীদের জন্যে শান্তির বার্তা।"—মন্তব্যটি অবশ্যই মূল্যবান্, তবে গৃহীর পক্ষে সন্ন্যাসি-বিরচিত গ্রন্থের ভূমিকা লেখা সাধারণতঃ ঔচিত্যের বিচারে সঙ্গত নয়। মনে হয়, রচয়িতা সন্ন্যাসী আত্মপ্রকাশে বিমুখ হওয়ায় শ্রীচক্রবর্তী তাঁর অনুমোদনক্রমে 'ভূমিকা'য় তাঁরই কিছু কিছু বক্তব্য সন্নিবেশ করেছেন।

'ভজন সুধা'য় মোট একশ তিনটি ভজনের মধ্যে উনপঞ্চাশটি বাংলায়, বাকি চুয়ান্নটি হিন্দীতে লেখা। দুই ভাষাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, শ্রীসারদা সঙ্গীত আর বিবেকানন্দ সঙ্গীত আছে। সাধারণ ভাবের ভজন সঙ্গীত ছাড়াও বেশ কয়েকটি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত আছে। এ-ছাড়া মাতৃ-সঙ্গীত, শ্রীদুর্গা সঙ্গীত, শ্রীশিব সঙ্গীত, শ্রীহরি সঙ্গীত, শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গীত ও শ্রীরাধা সঙ্গীতও আছে।

গানগুলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যেমন ভাষাগত তেমনই ভাবগত সরলতা ও সহজ আবেদন। প্রেমিক সাধকের প্রাণের আবেগ গানগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সহজ বিশ্বাসের প্রেরণায় গানগুলি রচনা করেছেন, সাধনশাস্ত্রানুগত বা দার্শনিক তত্ত্ব সন্নিবেশ করে গানগুলিকে ভারাক্রান্ত করেননি।

অল্প কিছু অশুদ্ধি থাকলেও মুদ্রণাদি প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদচিত্রটি অপটু হস্তের ( সঙ্গীত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ) রচনা।

**Sri Ramakrishna : The Spiritual Glow**—Kamalapada Hati, Published by P. K. Pramanik, Orient Book Company, C 29-31 College Street Market, Calcutta-7. Pages ix+160, Price : Indian Rs. 20, Foreign $2.

হলিউড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ মুখবন্ধে (১০.৯.১৯৮৫) সংক্ষেপে গ্রন্থটির পরিচয় দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুশীলনের সঙ্গে বেদান্তচর্চার গভীর সংযোগের কথা বলেছেন। লেখকও বেদান্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তবে বেদান্তের তত্ত্বের পরিচয় দিতে বেশি উদ্যোগী হননি। 'যত মত তত পথ'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই সুপ্রসিদ্ধ বাণীকে বৈদান্তিক তত্ত্ব বলে নির্দেশ করার (পৃঃ ১৩) মতো দু-একটি কথা আছে মাত্র।

লেখক একালের আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস-রূপে কামারপুকুর-জয়রামবাটী-কাশীপুরের উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১), কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধন-লীলাপীঠ দক্ষিণেশ্বরের উল্লেখ করেননি।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম দশ অধ্যক্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। কিছু কিছু তথ্যগত ত্রুটি আছে। লেখক বলেছেন যে স্বামী শিবানন্দ অধ্যক্ষ হওয়ার কয়েক মাস আগে শ্রীশ্রীমায়ের লীলাবসান হয়। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের লীলাসংবরণের তারিখ ২১ জুলাই ১৯২০, স্বামী শিবানন্দের অধ্যক্ষ-রূপে বৃত হওয়ার তারিখ ২ মে ১৯২২। পরপর যাঁরা দেহত্যাগ করায় স্বামী শিবানন্দের উপর মঠ পরিচালনার ব্যাপারে চাপ পড়ে তাঁদের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী সুবোধা-নন্দের নাম করা হয়েছে। স্বামী প্রেমানন্দের তিরোধান হয় স্বামী শিবানন্দ অধ্যক্ষ হওয়ার বছর চারেক আগে (৩০.৭.১৯১৮), স্বামী সুবোধানন্দের তিরোধানের তারিখ ২ ডিসেম্বর ১৯৩২। স্বামী শিবানন্দের তিরোধানের তারিখ ১৯৩৪-এর ২ ফেব্রুআরি বলা হয়েছে। এটি সম্ভবতঃ মুদ্রণ প্রমাদ—২০ ফেব্রুআরি হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাশ্চাত্যদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা ও বেদান্তের প্রচার সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিচ্ছেদ দুটির জন্যই গ্রন্থটি পঠনীয়।

গ্রন্থটির মুদ্রণাদি পরিপাটি, ভাল কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচ্ছদটিও সুন্দর।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

**মা সারদা**—স্বামী অমৃতত্বানন্দ ; প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ। পৃঃ ৫৪+৬, মূল্য : পাঁচ টাকা।

শ্রীশ্রীমা সারদামণির জীবনী ও তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক বই বের হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। এইসব বই বিভিন্ন আয়তনের ও বিভিন্ন মূল্যের হওয়ার ফলে নানা স্তরের পাঠকের সন্তুষ্টি বিধান করা সম্ভব হচ্ছে। এই সব বইয়ের কোনটিতে জীবনী, কোনটিতে তাঁর বাণী, আবার কোনটিতে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত গৃহী ও ত্যাগী সন্তানদের কেহ কেহ এখনও জীবিত; সেজন্য নতুন নতুন তথ্য প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সকল লেখকেরই লক্ষ্য রাখা দরকার যে নতুন কিছু দেবার তাগিদে যেন প্রকৃত তথ্য হতে বিচ্যুতি না হয়। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থ হতে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে তথ্যগুলি সবই নির্ভেজাল। স্বামী অমৃতত্বানন্দ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে শ্রীশ্রীমার জীবনী, বাণী ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক হতে মূল্যবান অংশগুলি চয়ন করে নিপুণভাবে সংযোজন করে, গল্পের মতো সহজভাবে

পরিবেশন করেছেন। বইটির অল্প মূল্য ছাড়া এটি একটি বড় বিশেষত্ব। তবে বইয়ের দুই-এক জায়গায় লেখকের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেনি, যেমন: 'একসঙ্গে ধর্মাচরণের সহধর্মিত্বের বাহ্যিক লক্ষণ পেরিয়ে গিয়ে এক ধর্মবিশিষ্ট আত্মার দুইটি দেহে করুণাবতরণ ঘটল এবারের লীলায়' (পৃঃ ২৮-২৯); 'এখানের প্রাত্যহিক সংসারের সর্ববিধ মোহনতা' (পৃঃ ৩৭)। হয়তো সংক্ষিপ্ত করার প্রচেষ্টার ফলেই এরকম হয়েছে। আবার অনেক জায়গায় ছোট বাক্যে সমগ্র ভাবটি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ জননী' অধ্যায়টি সত্যই মনোমুগ্ধকর। এই অল্পদামী পুস্তিকার বহুল প্রচারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ 'মা সারদা'কে চিনুক—এই আমাদের প্রার্থনা ও বোধ হয় লেখকেরও কামনা।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার

**(স্বামী অভেদানন্দ) মহারাজের কথা** প্রথম ভাগ—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ। পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯২। প্রকাশক: ছবি কুণ্ডু ও সন্ধ্যা কুণ্ডু, ডি ১১, স্কুল রোড, সোদপুর, ২৪ পরগনা। পৃঃ ৮+১৪৩, মূল্য: ১৫ টাকা।

পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। এরূপ একটি পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের খুবই প্রয়োজন ছিল; তাই এত বৎসর পরে হলেও এই পুনর্মুদ্রণ আনন্দের বিষয়।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে লিখিত তখনকার প্রকাশকের 'পূর্বাভাস' থেকে জানা যায়—পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল বেদান্তপ্রচারের পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। সেখানে ধারাবাহিক ভাবে গীতা, বেদান্ত, রাজযোগ এবং তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'Spiritual Unfoldment' অবলম্বনে ক্লাস-লেকচার দিতে থাকেন। সে সময়ে 'সমিতি' অস্থায়ীভাবে সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এ ভাড়াটিয়া বাড়িতে ছিল।

পুস্তকটির 'অবতরণিকা'য় লেখক মহারাজের বিদেশে অবস্থিতিকালীন কার্যাবলীর ও প্রচারের ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বিবরণ লিখেছেন। সেখানকার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত ও পরিবেশের পশ্চাৎপটে তুলনামূলক মূল্যায়ন এই বিবরণটিকে উপভোগ্য করেছে।

মহারাজ জ্ঞানতপস্বী হয়েও বলে গেছেন "জ্ঞান আর ভক্তি এক"। (পৃঃ ২৮)। তিনি কি সহজ ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় উপদেশ দিয়ে গেছেন সবাইকে! মহারাজ মুক্তমনের অধিকারী ছিলেন, কোনরূপ সঙ্কীর্ণ সংস্কারের প্রভাব তাঁর উপদেশের মধ্যে মেলে না। সাধারণ লোককে চলতি জীবনে কেমন করে মোটামুটিভাবে সংসার-ধর্ম বজায় রেখে আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে যেতে হবে তার নির্দেশ তাঁর উপদেশের মাধ্যমে দিয়ে গেছেন। ত্যাগী সন্তানদেরও উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে কথাপ্রসঙ্গে নিজের পরিব্রাজক ও সাধনজীবনে যে-সব কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছিলেন তারও উল্লেখ করেছেন একাধিকবার। 'মহারাজের কথা'র মধ্যে উভয়-শ্রেণীর জন্য কত রকমের উপদেশ ও নির্দেশ ছড়ানো আছে, তার কয়েকটিমাত্র উদ্ধৃতি না দিয়ে সমগ্র পুস্তকটি পাঠ করার সুযোগ নিতে সবাইকে বলাই সমীচীন মনে করি।

এই ধরনের পুস্তক পাঠানুরাগীগণ নিঃসন্দেহে 'মহারাজের কথা'র ২য় ভাগ প্রকাশের আগ্রহ-পূর্ণ প্রতীক্ষায় থাকবেন।

আলোচ্য পুস্তকটির মুদ্রণ ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

—শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব

**শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব :** গত ১৮—২০ এপ্রিল, ১৯৮৭ তিনদিন ব্যাপী **সরিষা** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী উৎসব বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ, সঙ্গীত, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৯ এপ্রিল অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন বেলুড় মঠের স্বামী হীরানন্দজী।

গত ১০—১৩ মে, '৮৭ **বোস্টন** বেদান্ত সোসাইটি এবং **প্রভিডেন্স** বেদান্ত সোসাইটি (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছে। আলোচনা-সভা, বক্তৃতা, স্লাইড্ সো প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। উভয় আশ্রমেই প্রচুর ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের সমাগম হয়েছিল।

গত ২৭ এপ্রিল, '৮৭ মাদ্রাজ মঠ তার দাতব্য চিকিৎসালয়ের হীরকজয়ন্তী-উৎসব পালন করেছে।

## উদ্বোধন

গত ২৫ মে, '৮৭ **বারাণসী** সেবাশ্রমের নবনির্মিত সাধুনিবাসের (বৃদ্ধ সাধুদের বাসের জন্য) উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ।

গত ২৭ মে, '৮৭ **নরোত্তমনগর** কেন্দ্রের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্গত নবনির্মিত ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীআর. ডি. প্রধান।

## ত্রাণ

**উড়িষ্যা অগ্নিত্রাণ :** বোলাঙ্গির জেলার নারায়ণপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য আরম্ভ হয়েছে।

**গুজরাট খরাত্রাণ :** কচ্ছ ও রাজকোট জেলার রপার এবং পদ্ধরি তালুকের খরাক্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩,৭০০ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য এবং ১৫০০ মিটার পোশাকের কাপড় বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া রাজকোট জেলায় ১,১২,১২৩ কিলোগ্রাম পশুখাদ্য পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে এবং ১১,৬০০ কিলো: শুকনো পশুখাদ্য ভরতুকি মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে। এতদ্ভিন্ন রাজকোট সহরের তিনটি কেন্দ্রে গবাদি পশুর জন্য জল বিতরণ করা হচ্ছে।

**শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ :** মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর কেন্দ্র শ্রীলঙ্কা থেকে আগত মন্দাপম্ ও তিরোচি শরণার্থিশিবিরের শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের তথ্য ও বেতার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা গত ২৬ মে, '৮৭ মরিশাস কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

## দেহত্যাগ

**স্বামী কামাখ্যানন্দ** (রাজেন্দ্র) গত ১৬ মে, '৮৭ রাত্রি ৯.৪০ মি. সময়ে ৮৭ বছর বয়সে আমাদের করিমগঞ্জ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর শ্বাসযন্ত্র গুরুতরভাবে জীবাণু-আক্রান্ত হয়েছিল। গত ডিসেম্বর (১৯৮৬) মাস থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছিল। এরপর তিনি একমাসেরও অধিককাল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন।

স্বামী কামাখ্যানন্দ ছিলেন ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্যের (পরবর্তিকালে স্বামী প্রেমেশানন্দ) মন্ত্রশিষ্য। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি করিমগঞ্জ কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং যথা সময়ে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সমগ্র জীবন সিলেট ও করিমগঞ্জ কেন্দ্রে অতিবাহিত করেন। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, কঠোর কর্মদক্ষতা, সরল ও হাসি-খুশি স্বভাবের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

আমরা তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

## বিবিধ সংবাদ

### উৎসব

গত ২৩—২৫ মে, ১৯৮৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতি তীর্থ, **বালুরঘাট** (পশ্চিমদিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব এবং উক্ত সঙ্ঘের ১২শ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী-উৎসব বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছে।

গত ১১—১৭ মে, '৮৭ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি **ডিব্রুগড়** (অসম) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী-উৎসব এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে। বিশেষ পূজা, হোম, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা, ভক্তসম্মেলন প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন দিনে আয়োজিত সভায় স্বামী সুমেধানন্দ ও স্বামী সুখাত্মানন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, **রাণিয়া-কুলটুকারী** (২৪ পরগনা) গত ২৯ মার্চ, '৮৭ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫২তম জন্মোৎসব বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করেছে। ঐদিন অপরাহ্নে স্বামী শিবনাথানন্দের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভারও আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ২৫—২৬ এপ্রিল, '৮৭ **দিনহাটা** শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কুচবিহার) শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫২তম জন্মতিথি-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করেছে। বিশেষ পূজা, পাঠ ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন ছিল।

উত্তর ২৪ পরগনার **অশোকনগর** অঞ্চলের শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী ভক্তবৃন্দ 'অশোকনগর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। গত ১ মে, '৮৭ অক্ষয় তৃতীয়াতে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানে উৎসব পালিত হয়েছে।

গত ৩০ ও ৩১ মে, '৮৭ **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম** (কাসুন্দিয়া, হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালন করেছে। এই

উপলক্ষে উভয় দিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

## মানুষ পরিবেশ ও রেডিয়েশন

আজকাল পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কারখানা (Nuclear Plant) হতে ফেলে দেওয়া দ্রব্যসমূহ থেকে প্রাপ্ত অথবা সেইসব কারখানায় দুর্ঘটনাজাত রেডিয়েশন (Radiation—তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি)-এর বলি হওয়া সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা হয়। এ-ছাড়া পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের আতঙ্ক তো আছেই। এই রেডিয়েশন ব্যাপারটি কি এবং কি হতে কতটা ঝুঁকির পরিমাণ, তা জানলে মিথ্যা গুজবের শিকার হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মানুষ ও সকল প্রাণীই জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাকৃতিক রেডিয়েশন পেয়ে থাকে। আমাদের জল, বায়ু সবের মধ্যেই সামান্য পরিমাণে রেডিয়েশন থাকে এবং শরীরে এই রেডিয়েশনের প্রবেশ কেউই প্রতিরোধ করতে পারে না।

কতকগুলি মৌলিক পদার্থ বা element (যেমন রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম)-এর এ্যাটম বা পরমাণু হতে তড়িৎশক্তি বিশিষ্ট এ্যাল্ফা, বিটা (alpha, beta) এবং তড়িৎশক্তি নিরপেক্ষ নিউট্রন বিচ্ছুরিত হয়; এছাড়া আসে তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তিবিশিষ্ট এক্স-রে এবং গামা রশ্মি। এ্যালফা রেডিয়েশন ত্বকের কেবল উপরাংশকে ভেদ করতে পারে এবং কাগজ দিয়েও এর গতিপথ রোধ করতে পারা যায়। বিটা রেডিয়েশনকে প্রতিরোধ করতে হলে কয়েক মিলিমিটার এ্যালুমিনিয়াম লাগে, কিন্তু গামা রেডিয়েশন রোধ করার জন্য লাগে মোটা সীসা বা কংক্রীট বা জল। এক্স-রের প্রবেশ করার ক্ষমতা গামা রশ্মির চেয়ে কম। নিউট্রনকে প্রতিরোধ করতে পারে কংক্রীট, মোম বা জল।

### প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত রেডিয়েশন

এই প্রাপ্তি জাগতিক বা বহির্জাগতিক (অর্থাৎ পৃথিবীর বাইরে হতে আসা) হতে পারে। জাগতিক রেডিয়েশন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের কঠিন অংশ হতে আসে অথবা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। বাড়ির ভিতরের রেডিয়েশন বাড়ির বাহিরের রেডিয়েশন অপেক্ষা বেশি, আবার বাড়ি কি দিয়ে তৈরি, তার উপরেও এর পরিমাণ নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বাড়ি স্ফটিক পাথরে নির্মিত হলে রেডিয়েশনের পরিমাণ খুব বেশি হয়। বহির্জাগতিক রেডিয়েশনকে কস্মিক রশ্মি বলে। সমুদ্রতল হতে যত উপরে যাওয়া যায় ততই এর তীব্রতা বাড়ে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত ২০০টি কেন্দ্র হতে মাপ নিয়ে জানা গেছে যে, বৎসরে একজন গড়পড়তা ৬৯০ ($\pm$২০০) $\mu$, এস. ভি. (SV অর্থে সিভার্ট বা Scivert যা রেডিয়েশন মাপার একক; $\mu$ = দশলক্ষের এক ভাগ)। খাবার ইত্যাদির মাধ্যমে বহির্জাগতিক রেডিয়েশনও মানুষ পায় গড়পড়তা বৎসরে ২০০০ $\mu$ এস. ভি।

### রেডিয়েশনের অন্যান্য হেতু

এই পর্যায়ে আসে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত এক্স-রে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানায় কাজ করার জন্য এবং এইসব কারখানা হতে ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হতে পাওয়া। ইউনাইটেড কিংডমের (UK) একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সেখানে প্রাকৃতিক কারণে রেডিয়েশন আসে শতকরা ৮০ ভাগ এবং কৃত্রিম উপায়গুলি

হতে পায় শতকরা ১৩ ভাগ। শেষোক্ত ১৩ ভাগে আছে—চিকিৎসা ব্যাপারে ১১.৫ ভাগ, জীবিকানির্বাহের কার্যস্থান হতে ০.৪ ভাগ, পারমাণবিক কারখানা হতে নিঃসৃত পদার্থ হতে ০.১ ভাগ এবং অন্যান্য ১.০ ভাগ। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সামান্য হলেও পারমাণবিক কারখানা হতে রেডিয়েশন পাওয়ার ঝুঁকি কিছুটা আছে। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজেই বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। এই ঝুঁকির তারতম্য বিচারে দেখা গেছে যে—

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জেট প্লেনে একবার ভ্রমণে ৮.৫ μ. এস. ভি, সুপার-সোনিক জেট ভ্রমণে ১৬ μ. এস. ভি. এবং একবার বুকের এক্স-রে করলে ২০০ μ. এস. ভি. রেডিয়েশন শরীরে লাগে।

দেখা যাচ্ছে যে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কারখানা হতে রেডিয়েশন পাওয়ার পরিমাণ খুবই কম, কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রে, কৃষিকার্যে বাণিজ্যে এবং শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই কারখানাগুলির অবদান অসামান্য।

| কারণ | | বৎসরে মৃত্যুর সম্ভাবনা |
|---|---|---|
| দৈনিক ২০টি সিগারেট ধূমপান | | ২০০ তে ১ |
| ৪০ বৎসর বয়স্ক লোকের স্বাভাবিক কারণে | | ৫০০ তে ১ |
| রাস্তায় অপঘাত | | ৫০০ তে ১ |
| বাড়িতে " | | ১০০০ তে ১ |
| কর্মস্থলে " | | ১০,০০০ তে ১ |
| বিমান দুর্ঘটনায় | | ১০০,০০০ তে ১ |
| পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কারখানা হতে পাওয়া | | ১০০,০০০ তে ১ |
| ১০০টি " | দুর্ঘটনাজাত | ৫০০০,০০০,০০০ তে ১ |

[ ভারত সরকারের এ্যাটমিক এনার্জি বিভাগ, বম্বে হতে প্রকাশিত Nuclear India, Vol. 24, Nos. 7-8/1986 প্রকাশিত Radiation, Man & Environment প্রবন্ধ অবলম্বনে। ]

## বুদ্ধের অস্থি উদ্ধার

পিকিং ৩০ মে ( ইউ এন আই )—গৌতম বুদ্ধের চারটি আঙুলের হাড় উদ্ধার করেছেন চীনা পুরাতত্ত্ববিদ্গণ চীনে বুদ্ধের শরীরের অংশ এই প্রথম খুঁজে পাওয়া গেল।

গৌতম বুদ্ধের অন্ত্যেষ্টির পর ভস্ম থেকে এই হাড় যোগাড় করেছেন চীনা বিশেষজ্ঞরা। এক-মাস পর তাঁরা এই কৃতিত্বের কথা জানান।

পিকিং থেকে ১,৪৪০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে উত্তর শানজি প্রদেশের বাউজি শহরের কাছে কামেন মন্দিরের ভূগর্ভে অবস্থিত এক প্রাসাদ থেকে এই দেহাস্থি উদ্ধার করা হয়।

## পরলোকে

বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় নিবাসী, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের ( মহাপুরুষ মহারাজ ) মন্ত্রশিষ্য **ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ২৫ এপ্রিল, '৮৭ রাত্রি ৯ ঘটিকায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। প্রয়াত বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

গত ১৫ মে, '৮৭ পাটনায় বিশিষ্টা সমাজসেবিকা শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **গীতা দাশগুপ্তা** পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

তাঁদের আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণপদে চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

# উদ্বোধন : ভাদ্র ১৩৯৪




## সূচীপত্র

# উদ্বোধনের নিয়মাবলী

● **লেখক-লেখিকাদের জন্য :** ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে বই থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার ও গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে রেজেস্ট্রি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা ডাকটিকিট সম্বলিত কার্ড / ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

● **গ্রাহকদের জন্য :** মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৫·০০ টাকা, বাংলাদেশ ৪৩·০০ টাকা, ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে সি মেল-এ ৮৮·০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২৩৩·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা। বছরের যে-কোন সময়ে বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হবে মাঘ মাস থেকে।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।

● **আজীবন-গ্রাহকদের জন্য :** এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০.০০ টাকা) ৪০০·০০ (চারশ) টাকা দিলে আজীবন-গ্রাহক (৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। যে-কোন মাস থেকে আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে জানালে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পত্রাদি লিখবার সময় **গ্রাহক-সংখ্যা** অবশ্যই উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানাতে হবে।

কার্যালয়ে নিজে এসে অথবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া, অথবা মনিঅর্ডারযোগে বা ডিমাণ্ড ড্রাফট্‌ মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট্‌ "Udbodhan Office" এই নামে করতে হয়।

● **প্রকাশকদের জন্য :** সমালোচনার জন্য দুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন।

● **বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :** কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাবে।

● **কার্যালয়ের সময় :** সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০, রবিবার বন্ধ।

কার্যাধ্যক্ষ
**উদ্বোধন কার্যালয়**
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৩
ফোন : ৫৫-২৪৪৭



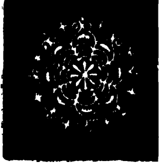

৮৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৯৪

# দিব্য বাণী

আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে, সেগুলির বেশীর ভাগই দূরীভূত হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ নরনারীদের মধ্যে যদি কোন প্রেরণা অধিকতর শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা আত্মবিশ্বাস।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২২৯ ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥
(গীতা, ৪।৩৯)

—যাঁহারা শ্রদ্ধালু, গুরুসেবারত ও জিতেন্দ্রিয় তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অচিরেই শান্তি প্রাপ্ত হন। অপরপক্ষে:

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥
(ঐ, ৪।৪০)

—অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকও নাই পরলোকও নাই এবং সুখও সুদূর পরাহত। এক কথায় শ্রদ্ধাহীন সংশয়াকুল ব্যক্তি কোনরূপ জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না।

শ্রদ্ধাহীনতাই মনে সংশয় আসার কারণ। শ্রদ্ধা না থাকিলে, জ্ঞানলাভ করাই সম্ভব কিনা, লাভ করিয়াই বা কি হইবে—ইত্যাদি সংশয় মনে জাগ্রত হয়। আর এই সংশয়জনিত অনীহা হইতেই লোকে জ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানলাভ না করিতে পারিলে যেমন শাশ্বত শান্তিলাভ হয় না, তেমনি জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে ঐহিক সুখও ভোগ করা যায় না। সুতরাং কি জাগতিক জ্ঞান, কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান—যে-কোন জ্ঞানই হউক না কেন তাহা লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, যে শ্রদ্ধা মনুষ্যজীবনের বিশেষ একটি সম্পদ, যাহা যে-কোন বিদ্যা আয়ত্ত করিবার মূলমন্ত্র, সেই শ্রদ্ধা কি বস্তু তাহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। তাই স্বামীজী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন: "যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে 'শ্রদ্ধা'র লোপ।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭।৩২৭) তিনি আরও বলিয়াছিলেন: "এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই তো দেশটা উৎসন্নে গিয়েছে।…দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে।…তা হলেই দেশের যত কিছু Problems (সমস্যাগুলি) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই Solved (মীমাংসিত) হয়ে যাবে।" (ঐ, ৯।৪১৯)

এখন শ্রদ্ধা বলিতে কি বুঝায় তাহার একটু আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'শ্রদ্ধা' শব্দের আভিধানিক অর্থ: ভক্তি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল শব্দের যে-কোন একটির দ্বারা কখন কখন শ্রদ্ধা শব্দকে বুঝাইলেও একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এইগুলির যে-কোন একটির দ্বারা শ্রদ্ধা শব্দের সম্যক্ অর্থ পরিস্ফুট হয় না। শ্রদ্ধা শব্দটির অর্থ আরও গভীর। জ্ঞানলাভে শ্রদ্ধা অপরিহার্য। কিন্তু কোন বিষয়ে ভক্তি অথবা বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ যাহা বিশ্বাস করা হয় তাহা পালনে ক্রমাগত চেষ্টা, এবং 'আত্মপ্রত্যয়' অর্থাৎ 'আমি ইহা করিতে সক্ষম'—এইরূপ দৃঢ় মনোভাব পোষণ করার অভাব-হেতু, ভক্তি-বিশ্বাসকে ধরিয়া রাখা যায় না।

পক্ষান্তরে নিষ্ঠা কিংবা আত্মপ্রত্যয়হীন ব্যক্তিরও যে-বিষয়ে ভক্তি ও বিশ্বাস নাই সে-বিষয়ে তাহার জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তিই জাগে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'শ্রদ্ধা' শব্দটির মধ্যে ভক্তি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং আত্মপ্রত্যয়—এই চারিপ্রকার ভাবই রহিয়াছে। অর্থাৎ এই চারিটি ভাবের সমন্বয়ে মনের যে বৃত্তি তাহাকেই শ্রদ্ধা বলা যাইতে পারে।

এখন দেখা যাউক ভক্তি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় অর্থাৎ এক কথায় শ্রদ্ধা জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে কতদূর অপরিহার্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।২৩) আছে: "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। / তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"—যাঁহাদের দেবে অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রতি পরাভক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই উপনিষদুক্ত বিষয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান স্বানুভব যোগ্য হয়। ভগবানের প্রতি গভীর ভালবাসাকেই ভক্তি বলে। ধ্যেয় বস্তুর প্রতি যদি প্রীতি উৎপন্ন না হয়, যদি ভালবাসা না থাকে, তাহা হইলে ধ্যান করিব কাহার? মনের ধর্মই হইল এই যে, সে যে-বিষয় ভালবাসে তাহার উপরই ইহা নিবিষ্ট হয়। ভালবাসা না থাকিলে শত প্রযত্নেও তাহাতে মন নিবিষ্ট করা কঠিন। ভালবাসা হইল শ্রদ্ধার মূল। "...শ্রদ্ধার মূল ভালবাসা। যাহাকে আমরা ভালবাসি না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি না।" (বাণী ও রচনা, ৪।৬৩) এই জন্যই শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু মানুষকে বারংবার ইষ্টকে ভালবাসিতে এবং কিভাবে ইষ্টেতে ভক্তি-ভালবাসা জন্মায় তাহার উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধার আর একটি অর্থ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস জ্ঞানলাভের একটি প্রধান সোপান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল, বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।...... বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে প'ড়ল। তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।" (কথামৃত, ১।১।৭) শ্রীম একবার জয়রামবাটীতে আসিয়াছেন। ভাবিলেন, এই পুণ্যক্ষেত্রে যত বেশি ধ্যান-জপ করিবেন তত বেশি লাভবান হইবেন। তাই একদিন খুব ধ্যান-জপ করিলেন। ঐ দিন জপ-ধ্যানান্তে যখন তিনি শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন, তখন শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন: "মায়ের কাছে এসেছ, এত ধ্যান-জপের কী দরকার? আমিই যে তোমাদের জন্য সব করেছি। এখন খাও দাও, নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ কর।" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫১৫-১৬) মায়ের এই কথাগুলি একদিকে যেমন গুরুর প্রতি শিষ্যের বিশ্বাসোৎপাদনের একটি জলন্ত নিদর্শন, অপরদিকে তেমনি উহাতে রহিয়াছে গুরুর প্রতি শিষ্যের অপরিসীম শ্রদ্ধা।

শাস্ত্র এবং গুরুতে বিশ্বাস না থাকিলে পরা-অপরা—কোন বিদ্যাই মানুষ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। জ্ঞানলাভ বলিতে বুঝায় যাহা জানা নাই সে সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হওয়া। যে-বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে প্রথমেই যদি তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা হয় তাহা হইলে সেই বস্তু সম্পর্কে জানার প্রশ্নই উঠে না। আবার যাঁহার উপদেশে শিক্ষার্থী বা শিষ্য জ্ঞানলাভ করে তাঁহার উপর যদি আস্থা না থাকে তাঁহার উপদেশে যদি বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে তাঁহার উপদিষ্ট শিক্ষায় কোন ফল হয় না। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে প্রথমে বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। এমনকি ভৌত-

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্বে বৈজ্ঞানিকদেরও বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিশ্বাসের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। "গুরুশাস্ত্রবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা"—গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসই হইল শ্রদ্ধা (বেদান্তসার)। স্বামীজীও বলিয়াছেন: "ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অনুরূপ আগ্রহকেই বলে 'শ্রদ্ধা'।" (বাণী ও রচনা, ২।৩৮৫)

নিষ্ঠা না থাকিলে কোন কাজেই সফলতা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যেমন প্রয়োজন নিষ্ঠা সহকারে জপ-ধ্যান প্রার্থনাদির অভ্যাস, জাগতিক অভ্যুদয়ের জন্যও চাই সেইরূপ নিষ্ঠা। নিষ্ঠার অভাবে আমরা আরব্ধ কর্ম শেষ না করিয়াই ছাড়িয়া দেই। ফলে কাজে সফলতা লাভ করিতে পারি না। নিষ্ঠারূপ শ্রদ্ধার অনুশীলনই আমাদিগকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে সক্ষম। সাধন-নিষ্ঠার কথা আমাদের শাস্ত্রাদিতে বারংবার বলা হইয়াছে। নিষ্ঠাকে বুঝাইতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ খানদানি চাষার উদাহরণ দিয়াছেন। "খানদানি চাষা ফসল হ'ক আর না হ'ক, আবার চাষ করবেই।" (কথামৃত, ৩।১০।২) যাঁহারা জ্ঞান-লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরও খানদানি চাষার মতো নিষ্ঠা সহকারে যত্ন করিতে হইবে। দুই-একবার অসাফল্য আসিলেও লাগিয়া থাকিতে হইবে। "সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজ, এইরূপ সঙ্কল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে।" (বাণী ও রচনা, ১।২৭২)

আত্মপ্রত্যয় শ্রদ্ধার অন্যতম অর্থ। কঠোপ-নিষদে (১।১।৫) পাই, বাজশ্রবা-তনয় নচিকেতার কথা। তাহার মনে এই আত্ম-বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, অনেকের মধ্যেই আমি প্রথম, আবার অনেকের মধ্যেই আমি মধ্যম; কিন্তু একেবারে অধম আমি কখনও নহি। তাহার এই যে 'একেবারে অধম আমি কখনও নহি'—এই বিশ্বাস, এই আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহাকে যমের নিকট গিয়া পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল। যাঁহার নিজের উপর বিশ্বাস আছে, বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য হউক না কেন, তাহা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিতে সে সক্ষম হয়। "যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত: যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে: যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক।" (বাণী ও রচনা, ২।২৩০)

আত্মপ্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাসের অনুশীলন মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্যতম উপায়। মনে এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে, "আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে।" (কথামৃত, ১।২।৬) 'আমি রাজাধিরাজের ছেলে,' আমার দ্বারা কোন গর্হিত কাজ বা নিন্দিত কর্ম করা সম্ভব নয়। এই ভাবের অনুশীলনে মনে আত্মশ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। তখন তাহার স্বভাবই এমন হইয়া যায় যে, তাহার দ্বারা কোন গর্হিত বা নিন্দিত কর্ম করা সম্ভব হয় না। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য আত্মবিশ্বাসের উপর স্বামীজী অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বলিয়াছেন: "যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতায় এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহার সবগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না।" (বাণী ও

রচনা, ৫।৭৭) এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি চিঠির কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। লিখিয়াছেন: "ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? কূর্মতারক-চর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।"—আমাদের কি জান না? আমরা তারকা চর্বণ করিতে পারি, ত্রিভুবন বলপূর্বক উৎপাটন করিতে পারি, আমরা রামকৃষ্ণের দাস। (ঐ, ৬।৪৮৯) এই গরিমা, এই অহঙ্কার আসে আত্মপ্রত্যয় তথা আত্মশ্রদ্ধা হইতে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আমরা তাঁর বলে বলীয়ান, আমাদের পা কখনও বেচালে পড়িতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে কি ঐহিক জ্ঞান, কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে-কোন জ্ঞান বা বিদ্যালাভ করিতে যাই না কেন শ্রদ্ধা হইল প্রধান উপায়। আচার্য শঙ্করও শ্রদ্ধা বলিতে বুঝাইয়াছেন: "যৎপূর্বকঃ সর্ব-পুরুষার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ" (মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।১।৭, শঙ্কর ভাষ্য)—যাহা দ্বারা সর্বপ্রকার পুরুষার্থ (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে সেই চিত্তপ্রসাদকর আস্তিক্য-বুদ্ধি। কাজেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ও সাফল্য লাভের জন্য শ্রদ্ধার অনুশীলন করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য।

# স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[ ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত ]

১

C/o ডাঃ লোগান,
৭৭০ ওক্ স্ট্রীট,
সানফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া,
১৭ মে [১৯০০]

স্নেহের মার্গট,

আমি দুঃখিত—এখনও কয়েকদিন শিকাগো যেতে পারছি না। ডাক্তার (ডাঃ লোগান) বলছেন, পুরোপুরি চাঙা না হওয়া পর্যন্ত আমার ভ্রমণ করা চলবে না। তিনি আমাকে সবল করে তুলতে কৃতসঙ্কল্প। আমার পেটের অবস্থা খুবই ভাল এবং স্নায়ুও চমৎকার। ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে। আর কদিন গেলেই সুস্থ হয়ে উঠব। তোমার চিঠি ও তার সঙ্গে পাঠানো জিনিসটি পেয়েছি।

তুমি যদি শীঘ্র নিউইয়র্ক রওনা হও, তাহলে আমার চিঠিপত্র তোমার সঙ্গে নিয়ে যেও। আর যদি আমি যাবার আগেই নিউইয়র্ক ত্যাগ করে যাও, তাহলে চিঠিপত্র একটা খামে ভরে তুরীয়ানন্দের জিম্মা করে দিয়ে যেও ও তাঁকে বলো যেন ঐগুলি আমার জন্যে রেখে দেন এবং ঐগুলি বা ভারত থেকে আসা আমার চিঠিপত্র কোনও কারণেই না খোলেন। তুরীয়ানন্দ এ-দায়িত্ব নেবেন। আর দেখো যেন আমার জামাকাপড় ও বইপত্র নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সোসাইটি'র আস্তানায় থাকে।

* Prabuddha Bharata Vol. LXXXII, August 1977 সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত পত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত তিনখানা পত্রের বঙ্গানুবাদ।—সঃ

আমি শীঘ্রই তোমাকে মিসেস হান্টিংটনের[১] কাছে একটি পরিচয়পত্র লিখে দেব। এ ব্যাপারটা গোপন থাকে যেন।

স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে,

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ : যেহেতু আমাকে টিকিটের জন্যে শিকাগোতে থামতেই হবে, কাজেই যদি ইতিমধ্যে মিসেস হেল পূর্বদেশে চলে যান, সেক্ষেত্রে আমাকে দু-একদিনের মতো আতিথ্য দেবার ব্যাপারে তুমি কাউকে কি একটু বলে রাখবে?

বি

২

১১০ ওক স্ট্রীট
সানফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া,
১৮ মে ১৯০০

স্নেহের মার্গট,

এই সঙ্গে মিসেস হান্টিংটনকে লেখা পরিচয়পত্রটি পাবে। ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর একটি কলমের খোঁচায় তোমার বিদ্যালয়টিকে অস্তিত্ব দিতে পারেন। মা যেন তাঁকে দিয়ে ঐরূপই করান।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমাকে সোজাসুজিই নিউইয়র্কে চলে যেতে হবে, কারণ ততদিনে হেল পরিবারের সকলেই স্থানান্তরে যাবেন। এখনও অন্ততঃ দু-সপ্তাহ আমি যাত্রা করতে পারব না। ছেলেদের আমার ভালবাসা দিও।

স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে,

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ : আমি তোমার ও তার সঙ্গে 'ইয়ুম'[২] এর চিঠি পেয়েছি। বি

৩

৬, প্লাস দে
জেতাৎস্ য়ুনিস্, প্যারিস্
২৩ অগস্ট ১৯০০

স্নেহের নিবেদিতা,

মঠের হস্তলিখিত বিবরণী এই মাত্র এসে পৌঁছল। বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। আমি এতে এত খুশি হয়েছি।

আমি এর হাজার বা তারও বেশি অনুলিপি ছাপিয়ে নেব। এগুলি ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতে বিতরণ করা হবে। আমি কেবল এর শেষে অত্যাবশ্যক একটি অনুচ্ছেদ জুড়ে দেব।

এতে কত খরচ পড়বে বলে তোমার মনে হয়? তোমাকে ও মিসেস বুলকে ভালবাসা জানিয়ে,

বিবেকানন্দ

১ মিসেস কলিস পোর্টার হান্টিংটন। মিঃ হান্টিংটন ছিলেন 'সেন্ট্রাল পেসিফিক রেলরোড'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তৎকালীন আমেরিকার প্রথম সারির বিত্তবান ব্যক্তিদের একজন।

২ 'ইয়ুম'—মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড-এর ডাকনাম।

# শ্রীরামকৃষ্ণ

## স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণিত হয়েছেন 'ভগবানের বাবা'[১] বলে। এটি আমার কথা নয়, এটি স্বামী বিবেকানন্দের মুখনিঃসৃত বাণী। স্বামীজী আরও বলেছেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect (সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে পূর্ণবিকশিত চরিত্র)।"[২] শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হচ্ছে একটি সুমহান সন্ধানী আলোকবর্তিকা এবং কেবলমাত্র এই মহাজীবনের মাধ্যমেই আপনি আপনার ধর্মকে যথার্থভাবে বুঝতে পারবেন—সে ধর্ম খ্রীষ্ট, ইসলাম, তথাকথিত হিন্দু অথবা অন্য যে-কোন ধর্মই হোক না কেন। তারপর তিনি একটি বাংলা প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলছেন, "'যার সঙ্গে ঘর করিনি, সেই বড় ঘরনী'—এ যে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ করেও তাঁদের চেয়ে ঢের বড় ব'লে বোধ হয়।"[৩] স্বামীজী বলেছেন, "তাঁহার ছিল এক অদ্ভুত জীবন, এক অত্যাশ্চর্য সাধনা, যাহা অজ্ঞাতসারে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজেও তাহা জানিতেন না।···কিন্তু তিনি এক মহৎ জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন এবং আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি।"[৪] সুতরাং আপনারা যদি কথামৃত ও অন্যান্য বইগুলির কথা চিন্তা করেন তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে বিবেকানন্দ-বাণীর আলোকে বুঝতে হবে। তবেই ঠিক ঠিক বোঝা যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বে একটি কাগজে লিখেছিলেন, "নরেন শিক্ষে দিবে যখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে।"[৫] অর্থাৎ নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে।

এ-কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বহস্তে এটি লিখেছেন, আর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় বেদান্ত সিংহ গর্জন করেছেন। সেই বেদান্তবাণী আজও বিস্তৃত হচ্ছে এবং তা হতেই থাকবে।

কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখা উচিত যে, যখনই কোন নতুন ধ্যান-ধারণা নতুন ভাব প্রচারিত হয়েছে তখনই তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। উদাহরণস্বরূপ ঠাকুরের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ ধরা যাক। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা পুরুষদের সামনে কথা বলেছেন, আর সে-কারণেই তাঁর শ্রীমুখে ঐ বিশেষ শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। তাই দেখি যখন তিনি মহিলা-ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন, তখন 'পুরুষ-কাঞ্চন ত্যাগ' কথাটি ব্যবহার করছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি তিনি ঐ কথা দুটি আসলে 'কাম-কাঞ্চন' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর অসংখ্য উপদেশের এটি একটি দৃষ্টান্তমাত্র।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত—যা তিনি নিজ জীবনে প্রমাণিত করেছিলেন, সেটি হচ্ছে—সমস্ত ধর্মই সত্য, সকল ধর্মই মানুষকে এক লক্ষ্যে, ঈশ্বর-উপলব্ধির লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে। এটি কেবল তাঁর মত মাত্র নয়, পরন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ সত্য। তিনি হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব, তন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা-মত সহ একে একে সব মত এবং হিন্দু-বহির্ভূত

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭।৪৪

২ ঐ    ৩ ঐ, ৭।৪৪    ৪ ঐ, ১০।২৯২

৫ উদ্বোধন, ফাল্গুন ১৩৮১, পৃঃ ৬৯

খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মও সাধন করেছিলেন এবং বলেছেন যে সেগুলি মানুষকে একই লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী তাঁর 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতায় যা বলেছিলেন, এটিই হচ্ছে তার মূল বিষয়। স্বামীজী আমেরিকাবাসীর সামনে সুদৃঢ় পদক্ষেপে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন: "প্রত্যেক সম্প্রদায় যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ঠিক সেই ভাবে তাঁহার আরাধনা করি। আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রীষ্টানদিগের গির্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব। বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাঁহার ধর্মের শরণ লইব, এবং অরণ্যে গমন করিয়া সেই সব হিন্দুর পার্শ্বে ধ্যানে মগ্ন হইব, যাঁহারা সকলে হৃদয়-কন্দর-উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট। শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে যে সকল ধর্ম আসিতে পারে তাহাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব।"[৬] কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজ জীবনে এটি প্রমাণ করেছেন আর তাই তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পেরেছেন যে সব পথই (ধর্মীয় পথ) এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্বের একজন অন্যতম ঐতিহাসিক, আরনল্ড টয়েনবি (যিনি কয়েক বছর পূর্বে প্রয়াত হয়েছেন) বলেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ একে একে সকল ধর্ম-পথে সাধনা করে সারসত্য জেনেছেন, এবং ঘোষণা করেছেন যে সব ধর্মই সত্য। টয়েনবির মতে বিশ্বের ধর্মেতিহাসে এটি একটি অতুলনীয় ঘটনা।

আর আমরাই কিনা ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে বিবাদ করছি। কোন্ ধর্ম আপনাদের বিবাদ করতে শিখিয়েছে? তাবৎ ধর্মই সকলকে সৎ হতে এবং আপন-আপন প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে ও ভালবাসতে শিখিয়েছে। ইসলাম কথার মানে কি?—না শান্তি। খ্রীষ্টধর্মের মূল কথা কি? যীশু বলছেন, "যদি কেউ তোমার একগালে চড় মারে, তুমি অন্য গালটি বাড়িয়ে দাও।" আমরা কি যীশুর কথা শুনেছি? আমরা কি হিন্দুধর্মের প্রবক্তাদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছি? মুসলমানরা কি তাঁদের পয়গম্বরের কথা যথাযথ মানেন?

এখন স্বতঃই এ প্রশ্ন আসে যে, তাহলে খ্রীষ্টান, হিন্দু ও মুসলমানগণ করছেন কি? আমরাই বা কি করছি? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের এক জায়গায় বলেছেন, আপনারা সকলে খ্রীষ্টান। আপনাদের যীশু কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "পাখিদের বাসা আছে, পশুদেরও গর্ত আছে, কিন্তু মানব-পুত্রের (যীশুর) এমন একটি জায়গা ছিল না—যেখানে তিনি মাথা রেখে বিশ্রাম করেন।"[৭]

তিনি আরও বলেছিলেন, "তোমাদের ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে। কি দুর্দৈব!"[৮] নির্দেশ দিয়েছিলেন, "ফিরে চল খ্রীষ্টের কাছে। ফিরে চল তাঁর কাছে—যাঁর মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও ছিল না।"[৯]

তেমনিভাবে আমি বলতে পারি আপনারা—হিন্দুরা, কি করছেন? আপনারা কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের অনুবর্তন করছেন মাত্র, কিন্তু ভগবদ্-উপলব্ধির চেষ্টা করছেন না। আপনারা কি হিন্দু? তেমনি যদি একজন মুসলমান বলে যে হত্যা তাদের অবশ্য কর্তব্য, তবে সে সত্যকার মুসলমান নয়। কারণ যারা সর্বদা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত থাকে তারা কখনই ধার্মিক হতে পারে না। আর সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের

৬ বাণী ও রচনা, ৩।১১১-১২
৭ ঐ, ৫।৪১৮ ৮ ঐ ৯ ঐ

অবতীর্ণ হওয়া। স্বামীজী বলেছেন, "যুদ্ধ বা মতানৈক্য ছেড়ে সবকিছুকেই গ্রহণ করতে হবে। অন্যধর্মকে শুধু সহ্য নয় স্বীকার করতে হবে, তবেই যুদ্ধকে এড়ানো যাবে।" সেই সাহস, সেই বীর্য আপনাদের আছে কি?

সম্প্রতি আমরা অ-হিন্দু বলে সমালোচিত হচ্ছি এবং খবরের কাগজগুলিতে তা ফলাও করে প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা তো কখনও আমাদের অ-হিন্দু বলিনি! আমরা যা বলেছি, তা হচ্ছে—এই 'হিন্দু' শব্দটি মুসলমান রাজত্বের সময় জনপ্রিয় হয়েছে এবং সেই সময় থেকে এটি আমাদের ধর্মকে নির্দেশ করছে। তৎপূর্বে আমরা আমাদের 'আর্য' বলতাম এবং আর্যধর্ম অনুসরণ করতাম। আর্যধর্ম—অর্থাৎ বৈদিকধর্ম বা বেদান্তধর্ম। এছাড়াও অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা অন্যদের থেকে পৃথক—পৃথক হিন্দুদের থেকে, পৃথক মুসলমানদের থেকে, পৃথক খ্রীষ্টানদের থেকে। কারণ আমরা সমস্ত ধর্মকেই সত্য বলে স্বীকার করি, যা অন্য কোন ধর্মই করে না। আমাদের সঙ্ঘে বহু সন্ন্যাসী এবং ততোধিক গৃহীভক্ত রয়েছেন যাঁরা নির্দ্বিধায় নিজেদের হিন্দু বলেন (এবং এতে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নেই) কিন্তু তাঁরা এও বলেন—"আমরা হিন্দু, কিন্তু আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উদার উপদেশাবলীর অনুসরণকারী।"

তদুপরি আমেরিকা, ইউরোপ ও অন্যান্য নানা জায়গায় আমাদের সঙ্ঘভুক্ত অনেক খ্রীষ্টান রয়েছেন। খ্রীষ্টান ভক্তেরা নিজেদের 'হিন্দু' বলেন না, তাঁরা বলেন—"আমরাও শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করি এবং বেদান্তে বিশ্বাস করি।" তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস নিয়ে থাকুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই। ভগিনী নিবেদিতা এক জায়গায় লিখেছেন, "আমি খ্রীশ্চান কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত।" তাঁরা খ্রীষ্টান ধর্মে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণে ভক্তি-বিশ্বাস রাখুন তাতে কোন বাধা নেই। হিন্দুরা তাঁদের কুলদেবতায় বিশ্বাস রাখুন এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমানরাও তাঁদের স্ব স্ব ধর্মে আস্থা রাখুন। তবে আমরা এই তিনটির কোনটিই নই। আমাদের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে—যা তথাকথিত হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টানগণ কেউই গ্রহণ করবেন না। আর সে কারণেই আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। যখন সমস্ত জগৎ সেই প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের সঙ্গে এক হবে—যা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যোদয়ে দেখেছি, যার প্রথম রশ্মিজাল ছিল স্বর্ণময়, যার থেকে ক্রমে আলোক-বৃত্ত উদিত হবে এবং ধীরে ধীরে সে সূর্য যখন মধ্যাহ্নাকাশে আসবে—তখনই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে যথার্থ ভাবে বুঝতে পারব। আবার তাঁকে বুঝবার জন্যে আমাদের বিবেকানন্দের শরণ নিতে হবে, অর্থাৎ তাঁর বাণী-সমূহের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' বইটিতে বলেছেন, "আমার এইরূপ মনে হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"[১০]

কাজেই আমি কোনরকম বদ্ধমূল সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে শুধুমাত্র যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করে আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি যে, আপনারা খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান যাই হোন না কেন, আমরা আপনাদের অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে বলছি না, আমরা ধর্মান্তরণে বিশ্বাসই করি না। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা স্বামী বিবেকানন্দকে পড়ুন, কারণ তাই প্রকৃত-পক্ষে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, কেননা "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

১০ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৮৯

সুতরাং আপনাদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব বুঝতে হবে, যদিও তা সময়সাপেক্ষ। প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক বস্তুকে একটি বিশেষ রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আর সেই রূপান্তরণকালে বাষ্প ও বুদ্বুদসমূহ দেখা যাবে, যেমন আপনি যখন কোন রাসায়নিক দ্রব্য ধাতু গলাবার পাত্রমধ্যে রাখেন এবং যেটি বুনসেন বার্ণারের উপর স্থাপিত করেন। ক্রমশঃ সব থিতিয়ে যাবার পর দেখেন পড়ে রয়েছে কেবল স্বচ্ছ স্ফটিকসমূহ। এখন আমরাও যেরূপ পরিবর্তনশীল স্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি, অতএব উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। কারণ স্বামীজী বলেছেন, "আমাদের মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"[১১]

অতএব মাতৃভূমির জন্য উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই।*

১১ বাণী ও রচনা, ৫।৩৮

* ৫ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখে শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণের অনুবাদ।—সঃ

# গিরিশচন্দ্রের রাজরোষে নিষিদ্ধ নাটক

শ্রীশিশির কর

ইংরেজ আমলে অসংখ্য বইপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর প্রায় সবই হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। পলাশীর যুদ্ধকেন্দ্রিক বহু বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই যুদ্ধ (১৭৫৭, ২২—২৩ জুন) এমন কিছু বড় যুদ্ধ নয়। কিন্তু সুদূরপ্রসারী এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। কারণ এই যুদ্ধ জয় থেকেই ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত। এই সুপরিচিত যুদ্ধের বিবরণে পাই, একদিকে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মীরজাফর বা বণিক জগৎ শেঠ ইত্যাদির বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন, মোহনলালের আত্মোৎসর্গ, সেইসঙ্গে ইংরেজের অজস্র নীতিগর্হিত আচরণ। বেইমানী, অবিশ্বাস, লোভ, উৎকোচ, হানাহানি, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরা এই দিনগুলিকে ভিত্তি করে বহু নাটক, উপন্যাস, উপাখ্যান, নিবন্ধ, কবিতা লেখা হয়েছে। এর অধিকাংশই পড়েছে সরকারের কোপে। এইসব লেখায় দেশকে স্বাধীন করার অনুপ্রেরণা আছে, আর আছে ইংরেজের হীনতার বিবরণ। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ,' চণ্ডীচরণ সেনের 'মহারাজ নন্দকুমার', গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা,' 'মীরকাসিম,' সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'জালিয়াৎ ক্লাইভ,' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নন্দকুমার,' 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত,' অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা,' 'ফিরিঙ্গি বণিক,' 'মীরকাসিম', 'জগৎ শেঠ,' প্রভৃতি এই যুগের পটভূমিতে লেখা।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ,' 'চন্দ্রশেখর,' 'দেবী চৌধুরাণী'ও ইংরেজ আমলের গোড়ার যুগের পটভূমিতে লেখা। তাঁর আঁকা ইংরেজ চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যদিও ইংরেজের অনেক প্রশংসা আছে তাঁর একাধিক

উপন্যাসে, কিন্তু একটিও উজ্জ্বল ইংরেজ চরিত্র নেই কোথাও। চন্দ্রশেখরের লরেন্স ফস্টর তো একটা লম্পট। এই যুগের ইংরেজদের সম্পর্কে চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমের মন্তব্য :

"...এই সময় যে সকল ইংরেজ বাংলায় বাস করিতেন তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম, এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্যে অধর্ম্ম আছে, অতএব অকর্ত্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্যসংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী ও স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা যায় নাই।

"লরেন্স ফস্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সম্বরণ করিলেন না—বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্ম শব্দ লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সাধ্যাসাধ্য বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, 'Now or Never'!" ( চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, পৃঃ ৩৫৫ )

এই যুগের পটভূমিতে লেখা গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি তৎকালীন জনচিত্তে দুর্বার প্রভাব সৃষ্টি করে। তাঁর নাটকগুলিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বর্ণনা আছে। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন। ইতিহাসের মর্যাদা রেখে তিনি অনেকস্থানে ইংরেজের প্রশংসাও করেছেন। তবু তাঁর রচনায় ইংরেজের অপরাধ এতই গুরুতার যে তাকে ঢাকবার জন্য সরকার নাটকগুলির কণ্ঠরোধ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুআরি গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি নাটক নিষিদ্ধ হয় : সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম ও ছত্রপতি শিবাজী, ১ ফেব্রুআরির গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে তা বলা হয়েছে :

Whereas it appears to the Lieutenant Governor that publications mentioned below contain words of nature described in Sec. 4, Sub-section ( 1 ), of the Indian Press Act, 1910 ( 1 of 1910 ), inasmuch as they have a tendency to bring into hatred and contempt His Majesty or the Government established by law in British India, or any class or section of His Mejesty's subjects, or to excite disaffection towards His Majesty on the said Government :

Now, therefore, in exercise by section 12, Sub-section ( 1 ) of the said Act, the Lieutenant Governor hereby declare the said publications to be forfeited to His Majesty,

( ১ ) ছত্রপতি শিবাজী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
( ২ ) মীরকাসিম　　"
( ৩ ) সিরাজদ্দৌলা　　"

গিরিশচন্দ্র ১৮৪৪, ২৮ ফেব্রুআরি কলকাতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। এন্ট্রান্স পাশ করতে না পেরে তিনি স্কুলের পড়া বন্ধ করে দেন। প্রবল অধ্যয়নস্পৃহা থাকায় তিনি পড়াশোনা ছাড়েননি। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা-দল গড়ে তিনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় করেন। তারপর তিনি বাগবাজারে একটি রঙ্গমঞ্চও স্থাপন করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেন। মৌলিক রচনার আগে তিনি বঙ্কিম-চন্দ্রের 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশনন্দিনী', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য', প্রভৃতির নাট্যরূপ দেন। তাঁর লেখা নাটক 'আগমনী' ১৮৭৭

খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়। এর তিন বছর পর তিনি সওদাগরী অফিসের চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি অভিনয়ে যোগ দেন। স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি থিয়েটারে তিনি পরিচালক, অধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে আসীন ছিলেন। আমৃত্যু মিনার্ভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ৮০টির বেশি নাটক রচনা করেন। সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দক্ষযজ্ঞ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, জনা, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, কালাপাহাড়, গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতিতে তাঁর প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর ম্যাকবেথের অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা হয় সে-যুগে। তিনি বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য গিরিশচন্দ্র ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুআরি পরলোকগমন করেন।

দেশাত্মবোধ বিকাশে গিরিশচন্দ্রের অবদান প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক ও ঐতিহাসিক হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেছেন যে, জাতীয় জাগরণের এই যুগে (১৯০০—১৯০৭) গিরিশের অবদান কোন নেতার চেয়ে কম নয়।

জনমত গঠনে গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর প্রভাবিত নাট্যশালার ভূমিকা প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য: "লোকমত গঠন ও লোকশিক্ষার জন্য ইংরাজের অনুকরণে এদেশে দেশীয় সংবাদপত্র যে কাজ করিয়াছে, গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা তদপেক্ষা যে কত অধিক কাজ করিয়াছে, তাহা নাট্যশালার ইতিহাসজ্ঞ সুধীমাত্রেই জানেন ও স্বীকার করিবেন। বাংলার এই দেশাত্মবোধ, এই যে জাতীয় জাগরণ, এই যে শত শত বৎসরের মোহাপসারণের চেষ্টা ইহাতে অপাঙ্‌ক্তেয় বাংলার নাট্যশালার কতখানি দাবি আছে, বাঙালীর প্রথম সাধারণ নাট্যশালার নাম নির্বাচনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার প্রথম নাট্যশালার নাম ন্যাশনাল থিয়েটর। ন্যাশনাল কংগ্রেস—ন্যাশনাল থিয়েটরের পরে সৃষ্ট। হেম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত বিলাপ', 'ভারতমাতা' এই ন্যাশনাল থিয়েটরের মঞ্চ হইতে গিরিশচন্দ্রের দ্বারা শিক্ষিত অভিনেতৃ-মুখে উচ্চারিত হইয়া দর্শকহৃদয়ে যে সুপ্ত দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিল—কে বলিতে পারে তাহারই ফলে সেই দর্শকবৃন্দের উত্তরপুরুষগণ আজ বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী হইয়াছেন কিনা? যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দ, জীবানন্দ প্রভৃতি সন্তান-সম্প্রদায় উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া থাকিত,—যদি গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহারা দর্শকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ না করিত তাহা হইলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র এত সহজে, এত অনায়াসে আজ কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যন্ত আলোড়িত করিতে পারিত কিনা কে বলিবে?

এইরূপে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে বাঙালী জাতিকে, তাহার প্রাণের তারে যে সুর অনাহত ছিল, সে সুরে সুর তুলিয়া তাহাকে জাগাইয়াছে, মাতাইয়াছে, আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাই যেমন বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, তেমনি নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র—দুই যুগাবতার।" (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শংকরীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত, পৃঃ ২৬)

গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর। এর আগে 'বলিদান' নাটকটি গিরিশচন্দ্র সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। তারপর তিনি ঐতিহাসিক নাটক 'রাণাপ্রতাপ' লেখায় হাত দেন। ইতিমধ্যে ডি. এল. রায়ের 'রাণাপ্রতাপ'-এর

রিহার্স্যাল শুরু হয় স্টারে। তখন তিনি 'রাণাপ্রতাপ' অসম্পূর্ণ রেখেই 'সিরাজদ্দৌলা' লেখা শুরু করেন। এ-সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

"গিরিশচন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন, তিনি ওই নাটক লিখিবার উদ্দেশ্যে তথা এবং অন্যস্থান হইতে তৎসাময়িক ইতিহাস আনাইয়া সিরাজ চরিত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়নের পর 'সিরাজদ্দৌলা' লেখা আরম্ভ হইল।" ( গিরিশচন্দ্র, অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬৭ )

'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম'—এই দুই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্র 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় দর্শনে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে পত্র লেখেন। তাঁকে বলেন : "...মোটের উপর আপনি যে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস লিখিয়া সুখী হইতে পারি নাই,...লিখিতে লিখিতে শুধু অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি, নাটক পড়িয়াও সুখী হইতে পারিলাম না। পড়িতে পড়িতে শুধু অশ্রু বিসর্জন করিলাম। ভগবতী ভারতী আপনার লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বর্ষণ করুন।"

সিরাজদ্দৌলা পাঠ করিবার পর 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর কবি নবীনচন্দ্রও অভিনন্দন জানিয়ে গিরিশচন্দ্রকে পত্র লিখেছিলেন। ( ১৯০৬, ২৫ ফেব্রুআরি )

'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলিতে লেখেন (১৯০৬, ২৩ জুন ) :

"Babu Girish Chandra Ghose's new historical drama, 'Mirkasem', which was put on the boards of 'Minerva' Theatre for the first time on Saturday last, had been a phenomenal success, both from the historical and literary point of view.

......Both the above dramas not only fetched fabulous sums of money, but contributed considerably to the growth of the national movements of Bengal. They changed the mentality of the people who for the first time saw before our eyes, 'what history of Bengal is and how uptil now we had simply committed to memory incorrect things that have been put to our mouths as to parrots.' "

লোকমান্য তিলকও সিরাজদ্দৌলার অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। খাপরাদেকে সঙ্গে নিয়ে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মিনার্ভায় যান ঐ নাটক দেখতে। এবং দু-জনেই মুগ্ধ হন সিরাজদ্দৌলা দেখে।

দেশাত্মবোধ জাগরণে সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিমের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : "স্বদেশীর সময় সভা-সমিতিতে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কতকটা যন্ত্রচালিতের মত। সকলে করিতেছে, গড্ডলিকা প্রবাহে আমিও করিতাম। বোধহয় শীঘ্রই ইহার অর্থ ভুলিয়া যাইতাম, যেমন অনেকে গিয়াছে। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চ তা হইতে দেয় নাই।...সেইবার সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিমের অভিনয় দেখিয়া প্রকৃত জাতীয়তার সন্ধান পাইলাম। বুঝিলাম মিথ্যা ইতিহাসে আমাদের চিত্ত কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে, আমরা মনে করি ইংরেজের ন্যায় এত উপকারী আমাদের আর কেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে 'স্বদেশী' ও 'জাতীয়তা' ঠিক

বুঝিতে পারিলাম, সেই অবধি এই চল্লিশ বৎসর সেই শিক্ষারই প্রভাব সমভাবে চলিয়াছে। জাতীয় হৃদয় লইয়া যে দেশবন্ধুর আহ্বানে তাহার পতাকাতলে সমাসীন হইয়াছিলাম··· সবেরই মূলে গিরিশচন্দ্রের এই অমূল্য নাটক দুইখানি ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ।" ( ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, হেমেন্দ্রলাল দাসগুপ্ত, পৃঃ ১৯০ )

'সিরাজদ্দৌলা'র বিপুল সাফল্যের পর গিরিশচন্দ্র 'মীরকাসিম' ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৩১৩, ২ আষাঢ় 'মীরকাসিম' মিনার্ভা থিয়েটরে প্রথম অভিনীত হয়। 'সিরাজদ্দৌলা'র মতো 'মীরকাসিমে'র অভিনয়ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

'মীরকাসিম' নাটক সাত মাস ধরে প্রত্যেক শনিবার মিনার্ভায় অভিনীত হয়েছিল। দর্শকের ভীড়ে মীরকাসিম ছাড়িয়ে যায় সিরাজদ্দৌলাকেও। নবাব সিরাজদ্দৌলা ও নবাব মীরকাসিমের পতন ও অভ্যুদয় চিত্রিত হয়েছে এই দুই নাটকে। সরকার মীরকাসিমের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করেন ১৯১১, ১৮ জানুআরি। সমকালীন পত্রপত্রিকায় মীরকাসিমের ভূয়সী প্রশংসা আছে।

'মীরকাসিম' সম্পর্কে 'বসুমতী' ১৩১৩, ৩০ আষাঢ় লেখেন: "গিরিশবাবু তাঁহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্ত সাধারণ লিপিকুশলতার সহায়তায় এই নাটকখানিকে তাঁহার স্বকীয় কার্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। এই স্তম্ভের বনিয়াদ হইতে চূড়া পর্যন্ত স্বদেশপ্রেমের পাকা সোনায় গঠিত।"

এ-সম্পর্কে বিশিষ্ট নাট্য সমালোচকের মন্তব্য: "Serajudaula went on drawing each night crowds to its fullest capacity till 'Mirkasem' another powerful drama of Girish Chandra was put on the board on the Minerva on the 16th June, 1906. The drama was also quite suitable for the time and was appreciated by the public." ( The Indian Stage, Vol. IV, Dasgupta, p. 46 ).

গিরিশচন্দ্রের আর একটি নিষিদ্ধ নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী' মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয় ১৩১৪ সালের ৩২ শ্রাবণ। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত তালিম দিয়ে তিনি কোহিনূরে যোগদান করেন। মিনার্ভার পরবর্তী অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। 'ছত্রপতি শিবাজী' একই সঙ্গে মিনার্ভা ও কোহিনূরে অভিনীত হতে থাকে। এতে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয় নাট্যজগতে। কোহিনূরে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় গিরিশের অভিনয় অতুলনীয় হয়। এ-সম্পর্কে 'বঙ্গবাণী' লেখেন:

"তাহারই তুলনা তিনি এ মহীমণ্ডলে।"

সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলিতে এ-সম্পর্কে লেখা হয়: "Chhatrapati is one of the best and most powerful dramas ever produced on Indian stage."

বসুমতীতে লেখা হয় ( ১৩১৪, ৪ আশ্বিন ): "তাঁহার উর্বর কল্পনার লীলা কোথাও ইতিহাসের সত্যকে ব্যর্থ বা ক্ষুণ্ণ করে নাই। ক্ষুদ্র লেখক অতিরঞ্জনের প্রলোভনে শিবাজীর প্রকৃত মূর্তি বিকৃত করিয়া ফেলিত। গিরিশচন্দ্র তাহা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। শিবাজীর কনিষ্ঠা মহিষী পুতলীবাঈ ও স্বদেশভক্ত ব্রাহ্মণ যুবক গঙ্গাজী গিরিশবাবুর নতুন সৃষ্টি। ইহারা শিবাজী চরিত্রের দুইটি বিভিন্ন বিশেষত্ব—যেন শিবাজীর অন্তর হইতে মনুষ্য মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোথাও তাঁহাকে কর্তব্যপথে পরিচালিত করিতেছে। কোথাও মৌন ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্তী

হইয়াছে। শিবাজীর অভিনয় দেখিতে দেখিতে মনে হয় যে, শিবাজী দেশ-বিশেষে, যুগ-বিশেষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ধরাতলে যখন অত্যাচার প্রবল হয়, সতীলক্ষ্মীগণ পাষণ্ড হস্তে নিগৃহীতা হন, তখনই সেই দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা একজন শিবাজীকে রাষ্ট্রপতিরূপে প্রেরণ করেন, এইজন্যই শিবশক্তিসম্ভূত অংশ। গিরিশ-বাবু শিবাজী জননী জিজিবাঈকে যে-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, এই হতভাগ্য জাতির মাতৃত্বের বরণীয় আদর্শ সেইরূপ মহনীয় হওয়া কর্তব্য। গিরিশবাবু তাঁহার পরিণত বয়সের সংযত কল্পনার সকল শক্তি, সকল জ্যোতি ঢালিয়া এই প্রাতঃস্মরণীয় মহারাষ্ট্র দেশনায়কের উজ্জ্বল চিরপূজ্য বরণীয় মহনীয় দেবমূর্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। নাটক কোনরূপেই ইহা অপেক্ষা ইতিহাসের অধিক অনুবর্তী হইত না।"

'ছত্রপতি শিবাজী'র বিপুল জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন 'স্টেটসম্যান'ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বরের সংখ্যায়।

প্রখ্যাত মারাঠী পণ্ডিত ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর সম্পাদিত 'হিতবাদী'তে লেখেন: "মহারাষ্ট্রীয়েরা ছত্রপতি শিবাজীকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শিবাজী চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণ এবং তাঁহার সহচর ও কর্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সঙ্গে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। জাতীয় অভ্যুদয়ের পক্ষে ঐ সকল গুণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হয়, গিরিশবাবু অতি সুসময়েই এই নাটকের প্রচার করিয়াছেন, বাঙালীর জাতীয় ভাব বর্ধন বিষয়ে এই নাটক বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।"

গিরিশচন্দ্রের এই তিনটি ঐতিহাসিক নাটকই রাজরোষে পড়েছিল। তিনটি নাটকেরই অভিনয় ও প্রচার নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি হয়। এই নাটকগুলি সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের কিছু কিছু নজির সরকারী ফাইল থেকে পাওয়া যায়। সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে লেখা হয়:

"This is a historical drama by Girish Chandra Ghose. It narrates the events which culminated in the overthrow of Nawab Siraj-ud-Dowlah, the last independent Nawab of Bengal."

'মীরকাসিম' সম্পর্কে মন্তব্য:

"This is historical drama by Girish Chandra Ghose. It depicts the tumultuous period that followed on the occasion of Mirkasim to the throne of Bengal and the strenuous fight which he had with the East India Company to protect indigenous industry."

এবং 'ছত্রপতি শিবাজী': is a historical play delineating the life and character of Sivaji, the great founder of Marhatta kingdom of the Deccan the author is Girish Chandra Ghose.

গোয়েন্দা বিভাগের (সি. আই. ডি) রাজনৈতিক শাখা দেশাত্মবোধক বাংলা নাটকগুলি সম্পর্কে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর মন্তব্য করেন। সেটি বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ফাইলে (ফাইল নং ৪৭।১২) আছে। [ Fl. No. 47/12, 1912, Home ( Pol. ) Conf. Beng. Govt. ]

ছত্রপতি শিবাজী: 'The play portraying the life of Sivaji in glowing colour, and containing objectionable allusions

to the condition of India at present time. Proscribed under sec. 4(1), Press Act and 3, Dramatic Performance Act. ( Notification Nos. 79N and 80N of the 18th January, 1911 ). Legal Remembrancer also considers perfor-mences liable under section 124A and 153 IPC. )"

মীরকাসিম: "The historical drama calculated to harmonise relations between Hindus and Muhammadans and excites hatred towards the British nation. Some of passages disloyal.

Proscribed under sec. 5(1) Press Act, and Dramatic Performance Act ( Notification Nos. 79N and 80N, dated the 18th June, 1911 ). Legal Remembrancer also considers perfor-mence liable under Sec. 124A and 153A. I.P.C.

সিরাজদ্দৌলা: Forfeited under the India Press Act, 1910. Performance has been prohibited under the drama-tic performance Act XIX of 1876.

এই তিনটি নাটকই "held objectionable Vide Government letter No. 559P dated the 25th January, 1911 in which the Government further directed that if an attempt is made to stage the play resort should be held to section 3 of the Act, 19 of 1876." [ Fl. No. 318 of 1910, Home ( Pol. ) Beng. Govt. ]

এই তিনটি নাটকেরই প্রকাশক ও মুদ্রক হলেন যথাক্রমে অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমন্ত রায়চৌধুরী। কলকাতার ৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে তিনটি নাটকই ছাপা।

গিরিশচন্দ্রের এই নাটকগুলির অভিনয়ের উপরেই শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি; এর মুদ্রণ ও প্রকাশনাও নিষিদ্ধ হয়। ভারতীয় প্রেস আইনের (১৯১০) ৪ ধারার ১ উপধারা অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

গিরিশচন্দ্রের এই বাজেয়াপ্ত নাটকগুলি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ অগস্ট আবেদন জানান। বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সচিবকে লেখা এক পত্রে তিনি ঐ আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বরের এক পত্রে তাঁকে জানানো হয় যে, সরকার এইসব নাটক থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে চান না। সংশ্লিষ্ট পত্রটির অনুবাদ নিয়ে দেওয়া হল। সম্ভবত এই পত্রটি এর আগে কোথাও বের হয়নি। সরকারী ফাইল থেকে [ Fl. No. 7 p-p, Proceedings 13 September, 1930, Home ( Pol. ), Govt. of Beng. ] এটি পাওয়া গিয়েছে।

বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ সমীপে,

মহাশয়, আপনার সহৃদয় বিবেচনার জন্য এই তথ্যগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমিই 'গিরিশ প্রতিভা'র লেখক। প্রয়াত কবি গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও লেখা নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃত। আমার ইংরেজী গ্রন্থ 'এ হিস্ট্রি অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অব্ দি বেঙ্গল স্টেজ'ও ছাপানোর জন্য তৈরি।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের বহুসংখ্যক নাটক আজও অনন্য বলে স্বীকৃত এবং বাংলা সাহিত্যে এগুলির স্থান উচ্চাসনে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তিনটি অতুলনীয় নাটকের লেখক : সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম ও ছত্রপতি শিবাজী। বাংলা সরকার কর্তৃক পরে এগুলি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রদত্ত হয়।

কিছুকাল পর প্রয়াত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরও তিনটি নাটক—দুর্গাদাস, মেবারপতন ও সম্ভবত রানা প্রতাপ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়, এবং শীঘ্রই আবার ঐগুলি অভিনয়ের অনুমতি দেওয়া হয়।

জীবনীকার হিসাবে আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ঐসব বাজেয়াপ্ত নাটক পড়ার এবং ঐ নাটকগুলি সম্পর্কে মন্তব্য আমার লেখা গিরিশ-জীবনীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি সরকারের অনুমতি চেয়েছিলাম। এবং যখন আমি ঐসব মন্তব্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করি, তখন সরকার আমাকে পুরোটাই ছাপাতে অনুমতি দেন। গিরিশচন্দ্রের বাজেয়াপ্ত নাটকগুলি সম্পর্কে আমার এই ভাষ্য 'গিরিশ-প্রতিভা'র একটি জনপ্রিয় পরিচ্ছেদ হয়েছে। এমনকি বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ এর প্রশংসাও করেছেন। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঐ নাটকগুলি সম্পর্কে সরকারের কোন বিরূপ মনোভাব নেই।

এই তিনটি অতুলনীয় নাটকের অভিনয়ের সুযোগ থেকে নাট্যজগৎ বঞ্চিত। বরং আমি নিশ্চিত যে, সরকারের বিবেচনামতো কিছু অংশ সংশোধন, পরিবর্তন এবং এমনকি বর্জন করে যদি এই তিনটি নাটককে মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে জনসাধারণের উত্তেজিত হবার কোনই আশঙ্কা নেই।

শিবাজীর জীবন-কাহিনী নিয়ে রচিত 'গৈরিক পতাকা' নাটকটি এখন মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হচ্ছে। ঐ একই বিষয় নিয়ে লেখা গিরিশের 'ছত্রপতি' নাটকটির ভাষা 'গৈরিক পতাকা'র চেয়ে কঠোরতর নয় এবং এর বাক্যগুলি সম্পর্কেও কোন রকম আপত্তি থাকতে পারে না।

বাংলার প্রখ্যাত মঞ্চ-অভিনেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) নাট্যকার গিরিশ-চন্দ্রের একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী এবং তিনি এ-ব্যাপারে তাঁর হয়ে প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন (যার উল্লেখ আছে অ্যানেক্সারে)। এ-সম্পর্কে সমস্ত চিঠিপত্র আমাকে লেখা যেতে পারে।

যদি ব্যবস্থামতো কোন অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করার দরকার হয়, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে পারি এবং সবকিছু বোঝাপড়ায় উপনীত হতেও পারি।

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করছি যে, মহানুভব-তার সঙ্গে ঐসব নাটক থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করবেন এবং এগুলি মঞ্চস্থ করার অনুমতিও দেবেন।

আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত
**হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত**

তাং ৫ অগস্ট, ১৯৩০　　৩১, হালদারপাড়া রোড,
কালিঘাট, কলিকাতা

দেশাত্মবোধের প্রেরণা জোগাতে গিরিশ-চন্দ্রের লেখনী ও অভিনয় কী বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল, সমসাময়িক নানা মন্তব্যে তা সুস্পষ্ট। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চে' হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "'ভারত ত্যাগ' কথায় সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট। কিন্তু চল্লিশ বছর পূর্বে গিরিশের লেখনীতেই সেই বাণী প্রথম প্রচারিত হয়। জাতীয়তা আগের নাটকে থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রথম বিদেশীর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে গিরিশই প্রথম শিক্ষা দেয়। আর সেই

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাপারে সম্বলিত ইতিহাসমূলক নাটক সেই যুগে একমাত্র গিরিশের লেখনী হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল।" (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৮৯)

সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম ও ছত্রপতি শিবাজী—এই তিনটি নাটকের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচারে গিরিশচন্দ্র অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সেজন্য ইংরেজ সরকার বেসামাল হয়ে এইসবের প্রচার বন্ধ করে দেন। এগুলিতে তেমন তীব্র ইংরেজ-বিরোধিতা ছিল না, ছিল কেবল দেশাত্মবোধের প্রেরণা।

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', ও 'মীরকাসিম' দুটি বাজেয়াপ্ত নাটকই একই যুগের পটভূমিতে লেখা—ভারতের এক যুগসন্ধির ইতিহাস হল এই পটভূমি। এ-দেশে ইংরেজ অধিকার শুরুর ইতিহাস। "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড-রূপে"—ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর কায়েম হল ইংরেজ শাসন। দেশাত্মবোধের আবেগে জাতীয়তাবাদী বাঙালিদের মনে হয়েছিল সিরাজ একজন সামান্য নবাব মাত্র নন, বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম যোদ্ধা। পলাশীর যুদ্ধ দুর্বিনীত তরুণ নবাবকে গদিচ্যুত করার জন্য ক্ষমতাশালী আমীর ওমরাহদের সশস্ত্র বিদ্রোহ নয়—বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সমাধিক্ষেত্র, বাংলার স্বাধীনতারও। আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূতিকাগার, সিরাজের পরাজয়, বাঙালী তথা ভারতেরই পরাজয়। সিরাজ, মীরমদন, মোহনলালের রক্তে ভারতে বিদেশী শাসনের শুরু।

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম'—এই দুটি ঐতিহাসিক নাটকেরই লক্ষ্য ফিরিঙ্গীদের কবল থেকে বাংলাকে রক্ষা। তাই তাঁরা, 'a force symbolised in a man'. ব্যক্তি সিরাজ বা ব্যক্তি মীরকাসিম এখানে বিশেষ থেকে নির্বিশেষ। ফিরিঙ্গী বিদ্বেষী সিরাজ ও মীরকাসিম এখানে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। এই দুটিই রাজনৈতিক ষড়-যন্ত্রমূলক ও দেশপ্রেমের নাটক।

দুটি নাটকই যথার্থ রিয়ালিস্টিক নয়, অনেকটা রোমান্টিক। সিরাজ ও মীরকাসিম উভয়েই ট্রাজেডি নায়কের বংশ-মর্যাদা, নীতি, ক্রিয়া-তৎপরতা, দায়িত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী। তাই দুজনের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য, 'force symbolised in a man'. তবে সিরাজের ক্ষেত্রে একথা যত সত্য, মীরকাসিমের ক্ষেত্রে তত নয়। দুটি নাটকই রসোত্তীর্ণ। তবে প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির রস-গাঢ়তার অভাব ও শিল্প-কর্মের দৈন্যও এই দুটি নাটকে আছে। 'সিরাজদ্দৌলা' সম্পর্কে একজন নাট্য সমালোচক বলেছেন: '...বিষয়বস্তুর সঙ্গে জাতির গভীর আবেগের সম্পর্ক; জাতির ঐকান্তিক আবেগের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'বস্তু'র উপস্থাপনা এবং সক্ষম উপস্থাপনা, ভাবের ও রসের গাম্ভীর্য, সমস্ত মিলিয়া নাটকখানাকে এমন একটি অর্থ-গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে যাহা অতি-নাটকীয়তার কলঙ্ক-রেখাকে আপনার মধ্যে পোষণ করিয়া লইয়া, ট্রাজেডির ভাবদ্যোতিকেই বিচ্ছুরিত করিয়াছে।'

(নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাট্য বিচার, ৩য় খণ্ড, অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১০)।

গিরিশচন্দ্রের রাজরোষে-পড়া আর একটি ঐতিহাসিক নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী' সম্পর্কে একই কথা বলা হয়। সে-যুগের এইসব ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে একই কথা বলা যায় যে, কোন নাটকেই ঐতিহাসিক বাস্তবতা পুরো-পুরি রক্ষিত হয়নি। ঐসব ঐতিহাসিক ঘটনা সংশ্লিষ্ট নরনারীর জীবনের স্বরূপ। ঐ জীবন রসেরই চাহিদা মিটেছে ঐসব নাটকে। ঐসব নাটকে কোন ঐতিহাসিক বাস্তবতা পুরোপুরি ছিল না। তেমনি রোমান্টিক ভাবের বাহুল্যও শিল্পগুণের হানি ঘটিয়েছে।

# রামহৃদয়ম্

**শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল**

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ।
তদাবিদ্যা স্বকার্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৫০॥

**অন্বয়**—যদা মহাবাক্যেন চ আত্মনোঃ ঐক্য-জ্ঞানম্ উৎপন্নম্, তদা অবিদ্যা স্বকার্যৈঃ চ ( সহ ) নশ্যতি এব ; ( অস্মিন্ ) সংশয়ঃ ন ( অস্তি )।

**বঙ্গানুবাদ**—যখন 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন অবিদ্যা তার কার্য এই জগৎপ্রপঞ্চসহ অদৃশ্য হয়ে যায়, এতে কোন সংশয় নেই।৫০

**ভাবার্থ**—যখন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট শ্রুত 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে সাধকের চিত্তে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ববিষয়ে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তখন অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারবন্ধনের কারণভূতা মায়া নিজের কার্য প্রপঞ্চের সহিত নষ্ট হয়ে যায়, এতে কোনও সন্দেহ নাই

আচার্যপাদ বলেছেন—"সোঽয়মিত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাৎ তদিদং তয়োঃ। ত্যাগেন ভাগয়োরেকঃ আশ্রয়ো লক্ষ্যতে তথা ॥ মায়া-বিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ। অখণ্ড-সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ কিভাবে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন হবে—সেই প্রসঙ্গেই আচার্যপাদ উপরের শ্লোক দুটি বলেছেন। কোনও বাক্যের অর্থ বুঝতে হলে তার প্রতি-পদের অর্থের প্রতীতি প্রয়োজন ; শব্দের অর্থ-বোধ হয় তিন প্রকার—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের দ্বারা যে অর্থবোধ হয়, তাকে বলা হয় বাচ্যার্থ। বাচ্যার্থের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ প্রতীত না হলে লক্ষ্যার্থের সাহায্য নিতে হয় ; আমাদের 'তত্ত্বমসি'—মহা-বাক্যের অর্থগ্রহণ প্রয়োজন, এখানে বাচ্যার্থের দ্বারা তাৎপর্য গ্রহণ সম্ভব নয় ; তাই লক্ষ্যার্থের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। লক্ষণাশক্তির দ্বারাই শব্দের লক্ষ্যার্থের প্রতীতি হয়। এই লক্ষণা তিন প্রকার, (১) জহল্লক্ষণা (২) অজহল্লক্ষণা এবং (৩) জহদজহল্লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা। যেখানে শব্দ নিজের অর্থ পরিত্যাগ করে তৎসম্বন্ধীয় অন্য কোনও অর্থ বুঝায় সেখানে জহল্লক্ষণা এবং যেখানে শব্দ নিজের অর্থ ত্যাগ না করে তার আশ্রয়কে বুঝায় সেখানে হয় অজহল্লক্ষণা। যেখানে বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করতে বাক্যের অবয়বীভূতসমূহের অর্থের কতকাংশ গ্রহণ ও কতকাংশ পরিত্যাগ করতে হয়, সেখানে হয় জহদজহল্লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণে প্রযুক্ত হবে এই তৃতীয়লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্যপাদ বলেছেন; 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ',—বাক্যটি ; এই বাক্যে পূর্বে ভিন্নস্থানে দৃষ্ট দেবদত্তের সঙ্গে—বর্তমান স্থানে প্রত্যক্ষদৃষ্ট দেবদত্তের অভেদ-জ্ঞাপনই তাৎপর্য। কিন্তু পূর্বে দৃষ্ট দেবদত্ত ছিল শিশু, এখন তার পূর্ণ যৌবন, সুতরাং উভয়ের আকৃতি, শরীরের পরিমাণ, গুরুত্ব, গুম্ফ, শ্মশ্রু প্রভৃতির অসদ্ভাব-সদ্ভাব, বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় বিভিন্ন। তবু ঐ বাক্যের তাৎপর্য অবধারণের জন্য ঐসব বিভিন্নতা ত্যাগ করে যে-সব বিষয়ে উভয়ের মিল আছে যেমন বংশ, পিতৃমাতৃপরিচয়, প্রভৃতি গ্রহণ করতে হবে ; এই হল জহদ-জহল্লক্ষণা বা ভাগলক্ষণার উদাহরণ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণে ভাগলক্ষণার সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। এই

বাক্যটি 'তৎ-ত্বম্-অসি'—এই তিন পদের মিলনে উৎপন্ন; তাদের মধ্যে তৎ—পরোক্ষ ব্রহ্মের বাচক, ব্রহ্ম—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, চিদ্‌ঘন; ত্বম্—প্রত্যক্ষ শিষ্যের ( জীবের ) বাচক, জীব—অল্পজ্ঞ, অত্যল্প শক্তিমান, চিৎকণ; ব্রহ্মের উপাধি হল সমষ্টি অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া বা মূলাবিদ্যা, আর জীবের উপাধি হল ব্যষ্টি অজ্ঞান বা তুলাবিদ্যা। 'অসি' এই ক্রিয়াপদটি হল 'তৎ' এবং 'ত্বম্' পদের সমানাধিকরণ-বাচী, উভয়ের অভেদ প্রতিপাদনে এর তাৎপর্য, সেই অভেদ বা ঐক্য 'তৎ' এবং 'ত্বম্' পদ দুটির মুখ্যার্থ পরিত্যাগে বা অপরিত্যাগে সাধিত হয় না; তাই ভাগলক্ষণার দ্বারা এই বাক্যে পরোক্ষত্ব-প্রত্যক্ষত্ব, সর্বজ্ঞত্ব-অল্পজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা-অল্পশক্তিমত্তা প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী ভাব পরিত্যাগ করে চৈতন্যাংশে উভয়ের ঐক্য সাধিত হয়। ব্রহ্মই হলেন মায়ার আশ্রয়; ব্রহ্ম ও মায়ার পরস্পর অধ্যাসবশতঃ দ্বৈতভাবের উৎপত্তি। আকাশতত্ত্বের জ্ঞান হলে যেমন আকাশে আরোপিত নীলত্ব বাধিত হয় এবং তা ভ্রম বলে বুঝা যায়, তেমনই বেদান্ত বাক্যরূপ প্রমাণ সহায়ে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে মায়াও বাধিত হয়ে থাকে। নারদীয়ে বলা হয়েছে—"তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থজ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্।" অর্থাৎ জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায়। শ্রুতিবাক্যেও বলা হয়েছে—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" অর্থাৎ পরমার্থলাভের জ্ঞান-ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।৫০

এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং
জন্মশতৈরপি ॥৫১॥

**অন্বয়**—মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় উপপদ্যতে। মদ্ভক্তিবিমুখানাম্ শাস্ত্রগর্তেষু হি মুহ্যতাম্ ( জনানাম্ ) তেষাম্ জন্মশতৈঃ অপি ন জ্ঞানম্ ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ।

**বঙ্গানুবাদ**—আমার ভক্ত এইরূপ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে আমার সাযুজ্য লাভ করে, আর যারা আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ নয় তারা শাস্ত্র-বিহিত নানারকম কাজে মুগ্ধ হয়। তাদের শত জন্মেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না এবং মোক্ষও হয় না।৫১

**ভাবার্থ**—আমার ভক্তগণ উপরে বর্ণিত এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে আমার স্বরূপপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে থাকে; পক্ষান্তরে যারা আমার উপর ভক্তি ত্যাগ করে কেবল শাস্ত্ররূপ গর্তে পড়ে দিশাহারা হয়ে ঘোরাফেরা করে থাকে, তাদের শত জন্মেও প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না, অথবা মোক্ষ-প্রাপ্তিও হয় না। এখানে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞান-মার্গের সাধনাতেও ভক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয় বর্ণনা করেছেন। আচার্য শঙ্কর পরম অদ্বৈতবাদী হয়েও তাঁর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে ভক্তিকে মোক্ষ-সাধনের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী বলে বর্ণনা করেছেন।৫১

ইদং রহস্যং হৃদয়ং মমাত্মনো ময়ৈব সাক্ষাৎ-
কথিতং তবানঘ।
মদ্ভক্তিহীনায় শঠায় ন ত্বয়া দাতব্য-
মৈন্দ্রাদপি রাজ্যতোঽধিকম্ ॥৫২॥

**অন্বয়**—হে অনঘ! ইদম্ রহস্যম্ মম আত্মনঃ (রামচন্দ্রস্য) হৃদয়ম্ সাক্ষাৎ ময়া এব তব কথিতম্; ( যদি ) ঐন্দ্রাৎ রাজ্যতঃ অপি অধিকম্ ত্বয়া ( লভ্যম্ ) ( তথাপি ) ( ত্বয়া ইদম্ ) মদ্ভক্তিহীনায় শঠায় ন দাতব্যম্।

**বঙ্গানুবাদ**—হে নিষ্পাপ! এই রহস্যময় তত্ত্ব, পরমাত্মাস্বরূপ আমার ( রামের ) হৃদয়; আমি নিজে তোমাকে তা বললাম। ইন্দ্রপালিত রাজ্য হতে অধিক কোন কাম্যবস্তু পেলেও আমার প্রতি ভক্তিহীন কপট ব্যক্তিকে এ-তত্ত্ব বলবে না।৫২

**ভাবার্থ**—হে নিষ্পাপ পবন তনয়, এই পরম

গোপনীয় তত্ত্ব, আত্মস্বরূপ আমার (শ্রীরামচন্দ্রের) হৃদয়, আর স্বয়ং আমিই তোমার নিকট এই রহস্য বর্ণনা করলাম; যদি তুমি ইন্দ্রলোকের আধিপত্য হতেও অধিক মূল্যবান কোনও সম্পদ পাও, তবু তুমি ভক্তিহীন কোনও দুষ্ট ব্যক্তির নিকট এই রহস্য প্রকাশ করো না।৫২

শ্রীমহাদেব উবাচ—

এতত্তেঽভিহিতং দেবি শ্রীরামহৃদয়ং ময়া।
অতিগুহ্যতমং হৃদ্যং পবিত্রং পাপশোধনম্ ॥৫৩॥

**অন্বয়**—শ্রীমহাদেবঃ উবাচ—দেবি! ময়া এতৎ অতিগুহ্যতমম্ পবিত্রম্ হৃদ্যম্ পাপশোধনম্ শ্রীরামহৃদয়ম্ তে অভিহিতম্।

**বঙ্গানুবাদ**—শ্রীমহাদেব বললেন: হে দেবি! আমি তোমাকে অতিশয় গুহ্যতম রমণীয় পবিত্র ও পাপক্ষয়কারী এই শ্রীরামহৃদয় বর্ণনা করলাম।৫৩

**ভাবার্থ**—দেবাদিদেব শ্রীমহাদেব পার্বতীকে বললেন—দেবি, আমি তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় হৃদয়হারক, পরম পবিত্র ও পাপনাশক এই শ্রীরাম-হৃদয় বর্ণনা করে শোনালাম।৫৩

সাক্ষাদ্রামেণ কথিতং সর্ববেদান্তসংগ্রহম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স মুক্তো
নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৪॥

**অন্বয়**—যঃ সাক্ষাৎ রামেণ কথিতম্ সর্ব-বেদান্তসংগ্রহম্ (ইদম্ শ্রীরামহৃদয়ম্) ভক্ত্যা সততম্ পঠেৎ, স মুক্তঃ (ভবতি), অত্র সংশয়ঃ ন (অস্তি)।

**বঙ্গানুবাদ**—সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীরাম বেদান্তের সারবস্তুর বর্ণনা করেছেন। যিনি ভক্তি সহকারে সতত এইটি পাঠ করবেন তিনি যে মুক্তিলাভে সমর্থ হবেনই এতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।৫৪

**ভাবার্থ**—সকল বেদান্তের সারসংগ্রহ এই শ্রীরামহৃদয় স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র বর্ণনা করেছেন। যিনি সর্বদা ভক্তিসহকারে এই রামহৃদয় পাঠ করেন, তিনি অবশ্যই মুক্ত হয়ে যান; এতে কোনও সন্দেহ নাই।৫৪

ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি বহুজন্মার্জিতান্যপি।
নশ্যন্ত্যেব ন সন্দেহো রামস্য বচনং যথা ॥৫৫॥

**অন্বয়**—(অস্য পঠনমাত্রেণ এব) বহু-জন্মার্জিতানি অপি ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি নশ্যন্তি এব, (অত্র) সন্দেহঃ ন (অস্তি), যথা রামস্য বচনম্ (শ্রূয়তে)।

**বঙ্গানুবাদ**—শ্রীরামচন্দ্রের বচন এই যে, ইহা (রামহৃদয়) পাঠ করলে বহু জন্ম ধরে অর্জিত ব্রহ্মহত্যাদি পাপও বিনষ্ট হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই।৫৫

**ভাবার্থ**—শ্রীরামহৃদয় পাঠ করা মাত্র অনেক জন্মের সঞ্চিত ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ নিঃসন্দেহে নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশই এই রকম।৫৫

যোঽতিভ্রষ্টোঽতিপাপী পরধনপরদারেষু
নিত্যোদ্যতো বা।
স্তেয়ী ব্রহ্মঘ্নমাতাপিতৃবধনিরতো
যোগিবৃন্দাপকারী
যঃ সংপূজ্যাভিরামং পঠতি চ হৃদয়ং
রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা
যোগীন্দ্রৈরপ্যলভ্যং পদমিহ লভতে সর্বদেবৈঃ
স পূজ্যম্ ॥৫৬॥

**অন্বয়**—যঃ অতিভ্রষ্টঃ অতিপাপী পরধনপর-দারেষু বা নিত্যোদ্যতঃ স্তেয়ী ব্রহ্মঘ্নমাতাপিতৃবধ-নিরতঃ যোগিবৃন্দাপকারী, যঃ অভিরামম্ সংপূজ্য ভক্ত্যা রামচন্দ্রস্য হৃদয়ম্ পঠতি, ইহ সর্বদেবৈঃ পূজ্যম্ যোগীন্দ্রৈঃ অপি অলভ্যম্ পদম্ স লভতে।

**বঙ্গানুবাদ**—যে অত্যন্ত ভ্রষ্ট, অতিশয় পাপী, পরধন ও পরনারীর অপহরণে প্রবৃত্ত, তস্কর, ব্রহ্ম-হত্যাকারী, মাতা ও পিতাকে হত্যা করতে উদ্যত, যোগিগণের অহিতকারী—সেই ব্যক্তিও

যদি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করে ভক্তিসহকারে এই শ্রীরামহৃদয় পাঠ করে, তাহলে সে সমস্ত দেবগণের পূজ্য যোগিশ্রেষ্ঠগণের পক্ষেও দুর্লভ পরমপদ লাভ করে থাকে।৫৬

ভাবার্থ—যে ব্যক্তি জাতিভ্রষ্ট, অতি পাপী পরধনাপহারী, পরস্ত্রী হরণকারী, চৌর্যকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, পিতৃঘাতক, মাতৃঘাতক এবং যোগিগণের অপকারী সেই ব্যক্তিও যদি অতিরাম শ্রীরামহৃদয় ভক্তিসহকারে অর্চনা করে পাঠ করে তাহলে এই জগতেই যোগিশ্রেষ্ঠগণেরও দুর্লভ পদ তার লাভ হবে এবং সমস্ত দেবগণের সে পূজনীয় হবে।৫৬

# মধ্যপ্রাচ্যের পথে পথে কয়েকটা দিন

শ্রীমতি মুক্তি কর

আমার স্বামী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ( U. N. O. ) কাজ করতেন বলে এবং আমাদের উভয়েরই ভ্রমণতৃষ্ণা খুব প্রবল বলে পৃথিবীর বহুদেশ দেখবার ও জানবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। একমাত্র মধ্যপ্রাচ্যেই আমাদের দীর্ঘ দশ বৎসর কেটেছে—প্রথমে কুয়াইতে, পরে বাগদাদে। সেই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের আশপাশের বহুদেশ ঘুরে দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। আমরা তখন কুয়াইতে থাকি। ইদ্ উপলক্ষে কয়েকটা দিনের ছুটি পাওয়া গেল। ঠিক হল এই সুযোগে জেরুজালেম সহরটা দেখে আসব। যাওয়া আসার পথেও আর কয়েকটা জায়গা দেখা হয়ে যাবে।

আমাদের ছাড়পত্র ( Passport ) U. N. O.-র ছিল বলে সর্বত্র গতিবিধির কোন বাধা ছিল না। তল্পি-তল্পা গুছিয়ে নিয়ে খুব ভোরে যাত্রা করলাম। ইরাকের চেক্‌পোষ্ট বস্‌রা পার হয়ে বাগদাদে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—সেই রাতটা বাগদাদের হোটেলে কাটল।

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই রওয়ানা হলাম। প্রায় ১০০ মাইল যাবার পর ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে জর্ডনের দিকে এগিয়ে চল্লাম। এবার আরম্ভ হল মরুভূমি। চারদিকে শুধু বালি আর উপলখণ্ড—গাছপালা একটিও নেই। শুনেছি বহুদিন আগে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে জায়গাটা এই রূপ ধরেছে। রাস্তার পাশে পাশে চলেছে তেলের পাইপ লাইন, যদিও আরব ইস্রাইলের যুদ্ধের জন্য সেটা আর ব্যবহার হচ্ছিল না।

রাস্তা ভাল নয় বলে গাড়ি খুব বেগে চালান যাচ্ছিল না। সন্ধ্যার সময় জর্ডনের সীমানার কাছে 'রুৎবা' বলে একটা জায়গায় এসে পৌছলাম। সেখানে ছোট্ট একটা হোটেলে সে রাতটা কাটাতে হল।

পরদিন যথারীতি জর্ডনের সীমানা অতিক্রম করে আমরা জর্ডনের জারাস ( Jarash ) নগরের দিকে এগিয়ে চললাম। রাস্তা থেকে দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। তবে তাতে গাছপালা নেই বললেই হয়। তবু মরুভূমিরও যেন একটা আলাদা রূপ আছে, সেটা অনুভব করেছি। দুপুরের একটু পরেই আমরা জারাস পৌছে গেলাম।

জারাস রোমানদের সময়ে একটি বৃহৎ সহর ছিল। তারই ধ্বংসাবশেষগুলো দেখার মতো। পৃথিবীতে যত রোমান কীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে এটি বোধহয় বৃহত্তম।

পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য স্তম্ভ, মন্দির, উন্মুক্ত নাট্যশালা ইত্যাদির ধ্বংসস্তূপ মাইলের পর মাইল জুড়ে পড়ে আছে। ভাবতে অবাক লাগে—একদিন এখানে কতই না জাঁকজমক ছিল! দিনের আলো থাকতে এই ভগ্নস্তূপগুলো দেখে নিয়ে সন্ধ্যায় কোথাও আশ্রয় নেব ভাবলাম। পাহাড়ের উপর থেকে দূরে গড়ে ওঠা নতুন জারাস সহর দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম গায়ে গায়ে লাগান ছোট ছোট বাড়ি দিয়ে সাজান ছোট্ট সহর।

সব জায়গাটা ঘুরে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা নিচে নেমে নতুন জারাসে হোটেল বা পান্থনিবাস খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও জায়গা নেই। মহা বিপদ; ভাবছি কী করা যায়। এমনি সময়ে আমাদের এ-অবস্থা দেখে একজন আরব ভদ্রলোক আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িটা ছোট্ট, জায়গা খুবই কম। মনে হল আর্থিক দিক দিয়েও স্বচ্ছল নয়। মেয়েরা পর্দানশীন, কিন্তু আমাদের মতো অচেনা বিদেশীদের নিজের বাড়িতে নিয়ে আশ্রয় দিলেন। মেয়েরা সেবাযত্ন করলেন। আরবদের আতিথ্য আমি আরও দেখেছি—সত্যি এর তুলনা হয় না। সে-বাড়িতে একটি মেয়ের নাম ছিল 'হিন্দী', বড় মিষ্টি দেখতে। ওদের ধারণা ভারতের সব মেয়েই সুন্দরী—তাই সুন্দরী মেয়ে হলেই নাম রাখে 'হিন্দী'। সকাল হলে এই মুসলমান পরিবারটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার রওয়ানা হলাম।

এবার জর্ডনের রাজধানী আম্মানের (Amman) দিকে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ী রাস্তা শেষ করে আবার সমতল রাস্তায় এলাম। ভাবলাম দুপুরের মধ্যেই আম্মান পৌঁছে যাব কারণ আম্মান বেশি দূরে নয়। কিন্তু বাদ সাধলেন বিধাতা। রাস্তা থেকে একটা পাথরের টুকরো অন্য একটা ট্রাকের চাকার চাপে ছিটকে এসে আমাদের গাড়ির সামনের কাচটিকে ভেঙে চুরমার করে দিল। গত রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে বাইরের হাওয়া বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। আমাদের অবস্থা কাহিল করে দিচ্ছিল। এ সময়ে ঠাণ্ডা হবার কথা নয় বলে আমরা গরম জামা-কাপড়ও সঙ্গে আনিনি। যা হোক, আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে আম্মান পৌঁছতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা ভাল হোটেলে জায়গা পেয়ে গেলাম। স্নান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবার পর পথের ক্লান্তি অনেকটা দূর হল।

আম্মান সহর পাহাড়ের গায়ে লম্বালম্বিভাবে গড়ে উঠেছে। গাড়ির কাচ লাগাতে হবে বলে আমরা একদিন এখানে থেকে গেলাম। এই ফাঁকে সহরটিকেও ভাল করে দেখা হয়ে গেল। এখানকার রাজপ্রাসাদ, পার্লামেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা বহু কলকারখানার দু-একটি দেখলাম। একটি দূরপাল্লার রাজপথ ( highway ) সহরটিকে লোহিত সাগরের উপরে আকাবা ( Aquaba ) বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করেছে, তাই আমদানী রপ্তানীরও এখানে সুবিধে। আমাদের হোটেলের কাছেই রোমানদের তৈরি একটা অ্যাম্পি-থিয়েটারের ভগ্নাবশেষ ছিল। সেটা হেঁটে গিয়েই দেখে এলাম। সেখানে যাবার পথে কয়েকজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করে মনে হল এরা ভারতীয়দের বেশি পছন্দ করে না। এদের ধারণা ভারতীয় মানেই সব হিন্দু। আর পাকিস্তানী মানেই সব মুসলমান। ওদের আল্লাহ্ ও পাকিস্তানীদের আল্লাহ্ এক, তাই ওরাই তাদের বন্ধু।

পরদিন সকাল থেকে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। 'আকাবা বন্দর' ও গোলাপীসহর 'পেট্রা' এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু

সময়ে কুলোবে না বলে এবারকার মতো লোভ সংবরণ করে ভবিষ্যতের জন্ম তুলে রাখলাম। আমাদের গাড়ি সোজা জেরুজালেমের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে আঁকা-বাঁকা রাস্তা, দূরে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝরনা আর দেখলাম পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গুহা।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা জেরুজালেমে পৌঁছে গেলাম। প্রথমে বাজারের কাছে একটা হোটেলে মালপত্র রেখে হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অন্য সব পুরনো সহরের মতোই জেরুজালেমও দুটি অংশে বিভক্ত। নতুন ও পুরনো। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আরব-ইস্রাইলের যুদ্ধে জেরুজালেমের নতুন সহরের দিকটা বেশির ভাগই ইস্রাইলীরা অধিকার করে নিয়েছে। সীমানা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। আমরা এপাশে দাঁড়িয়ে দূরে অপরদিককার অংশটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম। নতুন সহরের অল্প অংশই জেরুজালেমের দিকে ছিল।

জেরুজালেম মধ্যপ্রাচ্যের বোধহয় সবচাইতে প্রসিদ্ধ সহর। হাজার হাজার বৎসরের এই ঐতিহাসিক সহরটি বহুদিন থেকে দ্বন্দ্ব-বিবাদ ও যুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে এসেছে। পৃথিবীতে যে-কটি অতি প্রাচীন সহর আছে,—জেরুজালেম তার অন্যতম। বহু ঝড় ঝাপ্টার মধ্যেও এর মৃত্যু ঘটেনি—আজও সে বেঁচে আছে।

জেরুজালেম পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মের অতি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান—এই তিন সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই সহরটিকে তাঁদের একটি প্রধান তীর্থস্থান বলে মনে করেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের পক্ষে এটি সর্বপ্রধান তীর্থ এবং মুসলমানদের পক্ষে প্রথমে মক্কা-মদিনা, তারপরেই জেরুজালেম।

যদিও যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান এখান থেকে মাইল দশেক দক্ষিণে বেথ্‌লেহেমে, তাঁর জীবনের প্রধান কর্মস্থল জেরুজালেম এবং এইখানেই তাঁকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস তিনি তাঁর সমাধি থেকে নবজীবন নিয়ে এইখানেই উত্থিত হন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এটি তাঁদের একটি মহাতীর্থ। যীশুর মৃত্যুর এবং কবরের জায়গায় যে গীর্জা হয়েছে সেখানে এসে তাঁরা পুণ্য অর্জন করেন।

জেরুজালেম সহর পাহাড়ের উপরে নির্মিত। এই সহর নিয়ে যুদ্ধ-বিবাদ অতি প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। বহুবার বহু শক্তি এই সহরের উপর অধিকার স্থাপন করেছে—ইহুদী, মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, স্পেনীয়, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি। এক সময় এই সহরের বেশির ভাগটাই ইস্রাইলীদের অধিকারে থাকলেও, প্রাচীর ঘেরা পুরনো সহরটি ছিল আরব তথা জর্ডনের অধীনে। তীর্থস্থানগুলো সবই পুরনো সহরের মধ্যে। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের পর সমস্ত সহরটাই ইস্রাইলীরা অধিকার করে নিয়েছে।

পুরনো সহরটি সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ওখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। প্রাচীরের চারদিকে চারটি সিংহদ্বার। বহিঃশত্রুর হাত থেকে সহরকে রক্ষা করার জন্য তখনকার দিনে এইরূপ সুদৃঢ় প্রাচীর ও সিংহদ্বার করা হত। এখানে দ্বারগুলোর নামকরণ আছে, যেমন ডামাস্কাস, জাফা, ষ্টিফেন ইত্যাদি। আমরা ডামাস্কাস দ্বার দিয়ে সহরে প্রবেশ করলাম। ভেতরের রাস্তাগুলো পাথরের তৈরি, সরু সরু গলি দিয়ে বাজার, গীর্জা, মসজিদ ইত্যাদিতে যেতে হয়। পাহাড়ী জায়গা বলে কোন কোন রাস্তায় সিঁড়ি করা আছে।

পুরনো সহর দেখতে গিয়ে আমাদের দেশের কাশী বা বারাণসীর কথা মনে হচ্ছিল। রাস্তা ও দোকানপাটগুলো দেখতে অনেকটা তেমনি।

হাজার হাজার বৎসর ধরে কত লোক এই পথ দিয়ে হেঁটেছে—পায়ে পায়ে পাথরগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে তার কত ইতিহাস লুকানো রয়েছে এই পাথরের বুকে।

আমরা তিনরাত্রি এখানে ছিলাম। তাই ধীরে-সুস্থে সবকিছু দেখা সম্ভব হল। প্রথমদিন পুরনো সহরের বাজার-হাট দেখলাম। সিংহ-দ্বারের কপাটগুলো দেখার মতো, বিশেষ করে এর বিরাটত্ব। দরজার পাশ থেকেই দুধারে দোকান, তবে সুপরিকল্পিত নয়। ফলের দোকানের পাশেই মুদির দোকান, তার পাশে চুলকাটার, এমনি ধারা। রাস্তার পাশে ছোট-খাট সামগ্রী নিয়ে বোরখা পরে অনেক মেয়েরা বসেছে বিক্রি করতে। কিছুদূর গিয়ে সদর রাস্তাটি দুভাগে বিভক্ত হয়েছে।—একটি গেছে দাউদের দুর্গের দিকে, অন্যটি হারেমের দিকে। মাঝখানে একটি চত্বর। আর আছে Via Dolorosa অর্থাৎ ব্যথার পথ—যেখান দিয়ে যীশু তাঁর মৃত্যুর আগে (তখনকার নিয়ম অনুসারে) তাঁর কাঠের ক্রুশটি বহন করে বধ্যস্থলে নিয়ে আসেন। এই ভারি ক্রুশটি বইতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল তাই তিনি রাস্তায় মাঝে মাঝে থেমে বিশ্রাম করেছিলেন। সেই প্রত্যেকটি বিশ্রাম-স্থান এই রাস্তার উপর চিহ্নিত করা আছে। এই রাস্তাটি লম্বায় এক মাইল হবে। আমরা সবটা রাস্তা ঘুরে দেখে এলাম। Via Dolorosa যেখানে শেষ হয়েছে সে জায়গার নাম—কালভারি। এখানে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় এবং মৃত্যুর পর তাঁকে কবর দেওয়া হয়। পরে অবশ্য তিনি কবর থেকে উঠে আসেন, অন্ততঃ খ্রীষ্টানদের তাই বিশ্বাস। যীশুখ্রীষ্টের নামে এই স্থানে পবিত্র সমাধি মন্দির রচিত হয় যাকে বলে 'Basilica of the Holy Sepulchre'. এই গীর্জাটি বেশ বড় এবং সমৃদ্ধ। আমরা সেই গীর্জাটি দেখে পরে ফেরার পথে আরও একটি গীর্জা দেখলাম। সেখানকার মেরীমাতার মূর্তিটি খুবই সুন্দর।

পরদিন ভোরে প্রাতরাশ খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম Dome of the Rock দেখতে। এটি সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপরে তৈরি করা হয়েছে, অনেক দূর থেকে এর চূড়া দেখা যায়। মুসলমানদের এটি তীর্থস্থান। এটি একটি পাথরের উপর তৈরি। এদের বিশ্বাস এখান থেকে হজরত মহম্মদ স্বর্গে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। এই পাথরটিকে আরবীতে বলে—'তক্ত্ রাব্বেল আল্মীন্' অর্থাৎ জগৎপতির সিংহাসন। তিনি এই প্রস্তর-আসনে বসে মানব-জীবনের শেষদিনের পুরস্কার বা দণ্ড দেন। এইসব হল ধর্মীয় বিশ্বাস। আবার ইহুদীদের বিশ্বাস ওদের প্রথম নেতা ইব্রাহিম ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণার্থে তাঁর প্রাণ-প্রতীম পুত্র ইশাককে এখানে বলি দিতে উদ্যত হন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ইশাকের জায়গায় একটি মেষ এসে যায় তখন তিনি তাকেই বলি দেন। এই Dome of the Rock তৈরি করেন খালিফ্ আবদুল মালিক ইবন্ শবওয়াল।

Dome of the Rock-এর পাশেই একটি মসজিদ। আছে, যার নাম 'আল্ আক্সা মসজিদ্' এটি 710 A.D.-তে সুলেমান খলিফ্ ওয়ালিদ্ ইহুদী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর তৈরি করেন।

সেখান থেকে নেমে Dome of the Rock ও আল্ আক্সা মসজিদের নিচে wailing wall দেখতে গেলাম। দাউদের পুত্র সোলেমান নানা দেশ থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি করেন, কিন্তু রোমান সম্রাট (অবশ্য তখনও তিনি সম্রাট হননি পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন) টাইটাস এসে সবকিছু ধূলিসাৎ

করে দেন। মন্দিরের এই দেয়ালটি সেই ধ্বংসলীলা থেকে কোনমতে বেঁচে যায়—সেটা এখনও নিদর্শন-স্বরূপ রয়েছে। ইহুদীরা সেই দেয়ালটির কাছে গিয়ে শোক প্রকাশ ও প্রার্থনা করে—সেইজন্যই এই দেয়ালটির নাম wailing wall.

রোমানদের এই অমানুষিক অত্যাচারের পরে ইহুদীরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ভারতেও বহু ইহুদী এসে বসবাস করেছে। নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লেও ইহুদীরা জেরুজালেমকেই তাদের ঈশ্বর-নির্দেশিত দেশ বলে জানে। তাই যতদিন তা উদ্ধার করতে পারেনি ততদিন তার চেষ্টাও থামায়নি।

যাই হোক, আমরা প্রাচীর ঘেরা পুরনো জেরুজালেমের বাইরে নতুন জেরুজালেমও ঘুরে দেখলাম। সেখানে আধুনিক ধরনের কিছু বাড়ি উঠেছে, বিদ্যালয়, কলেজ, কলকারখানা আছে। হাঁটতে হাঁটতে বেশ খিদে পেয়েছিল তাই একটা খোলা দোকানে বসে পেট ভরে খেলাম। আরব দেশে 'কেনাফা' বলে একটা মিষ্টি আছে, জেরুজালেমের কেনাফার মতো এত ভাল কেনাফা আমি আর কোথাও খাইনি, দোকানী বেশ আমুদে লোক। আমাদের খুব আদর যত্ন করে খাওয়াল—মনে হচ্ছিল যেন কতদিনের চেনা।

এবার আমাদের ফেরার পালা। হোটেল ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে দাউদের দুর্গ ও হারেম দেখে বেথ্‌লেহেমের দিকে এগিয়ে চল্লাম। দূরত্ব মাত্র ১০ মাইল। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই বেথ্‌লেহেম্ পৌঁছে গেলাম। যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থানটি ছাড়া সেখানে আর বিশেষ কিছু দেখবার নেই। জন্মস্থানের উপর একটি গীর্জা তৈরি হয়েছে—তাকে বলে Church of Nativity. সেখানে ঢোকার দরজাটি খুব নিচু, মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। ভেতরে কিছু মূর্তি বানিয়ে খড় বিছিয়ে আস্তাবলের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে—যাত্রীদের দেখাবার জন্যই হয়তো।

বেথ্‌লেহেম্ থেকে আমরা চল্লাম Dead Sea দেখতে। আমাদের আবার জেরুজালেমের পাশ দিয়েই পূবদিকে যেতে হল। এই Dead Sea সমুদ্রতল থেকে ১,২৯৬ ফুট নিচে। জর্ডন নদীর জল এই সাগরে এসে মিশেছে। যদিও এটাকে বলা হয় সমুদ্র, কাছ থেকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা বিরাট হ্রদ। এতে কোন তরঙ্গ নেই। জল এত ভারি ও লবণাক্ত যে, কোন মাছ বা প্রাণী এতে বেঁচে থাকতে পারে না—এই জন্যই এর নাম মৃত-সমুদ্র ( Dead Sea )। মানুষ সাঁতার না জানলেও এতে ভেসে থাকতে পারে। দেখলামও কয়েকজন বিদেশী চিত হয়ে জলে ভাসছেন। শুনেছি কেউ কেউ ব্যাধি সারাবার জন্যও এরূপ করেন। আমার স্বামী জলটা হাত দিয়ে তুলে দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁর একটা পা পিছলে জলে পড়ে যায়। জলটা এত পিছল ও ভারি এবং লবণাক্ত যে সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্টের ও জুতোর রং নষ্ট হয়ে গেল। তাছাড়া জুতোর চামড়াটা শক্ত হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও পরে সেই জুতো বা প্যাণ্টকে ব্যবহার যোগ্য করা গেল না।

Dead Sea-র চারপাশে শুধু মরুভূমি। শুনেছি এই মরুভূমির আশপাশের পাহাড়ের গুহায় অনেক পুরনো গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে যা থেকে কিছু কিছু পুরনো ইতিহাস উদ্ধার করা হচ্ছে।

এবার চল্লাম জেরিকো ( Jericho ) সহর দেখতে। এই সহরটি Dead Sea থেকে ৬ মাইল উত্তরে। সমুদ্রতল থেকে ৮২৫ ফুট নিচে। বাইবেলের নতুন ও পুরনো টেষ্টামেণ্টে এই সহরটির নাম উল্লেখ আছে। জেরিকো পৃথিবীর

সর্বপ্রাচীন সহরগুলোর অন্যতম। মাটির তলায় যে-সব নিদর্শন বেরিয়েছে তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিকরা বহু বৎসর ধরে এখানকার খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রস্তর যুগের পরে মানুষ যখন স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে তখনকার নিদর্শনও এখানে পাওয়া গেছে। নগর প্রাচীরগুলো তার সাক্ষ্য। আমরা ঘুরে ঘুরে সেই খনন কার্যের স্থানগুলো দেখলাম। এত হাজার বৎসর আগের বাড়িগুলো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। প্রাচীরগুলো দেখেও মনে হয় নগরের ভিতর ২।৩ হাজার লোক সঙ্ঘবদ্ধভাবে একত্রে বাস করতে পারত। মাটির পাত্র, রূপোর গহনা, হাড়ের ও পাথরের গহনা তো আছেই তাছাড়া মানুষের মাথার প্রতিকৃতিও অনেক পাওয়া গিয়েছে।

জেরিকো কখনই জনবসতিশূন্য হয়নি৷ এখনকার বাড়িগুলোও বেশ সুন্দর। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বাগান আছে। এটাকে Winter City বলা হয়। সমুদ্র থেকে এতটা নিচে বলে শীতের সময়ও এখানে গরম থাকে। তাই মনে হয় এর আবহাওয়ার জন্যই লোকেরা এখানে থাকতে ভালবাসে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আরব-ইস্রাইল যুদ্ধের পরে বহু উদ্বাস্তু এখানে এসে স্থায়ীভাবে বাস করছে। ফল ও ফুলে ভরা সহরটিকে দেখতে খুব ভাল লাগল।

ছুটি ফুরিয়ে গেল তাই ফিরে যেতে হল কর্মস্থল কুয়াইতে। মধ্যপ্রাচ্যের এই কয়টি দেশের ছবি আঁকা রইল আমার স্মৃতির খাতায়।

# নাগরাজ

## ডক্টর মানগোবিন্দ মণ্ডল

"আস্তিকস্য মুনির্মাতঃ ভগিনী বাসুকী তথা…" বেশ দূর থেকেই জন্মেঞ্জয় ওঝার মন্ত্রপাঠ শুনতে পেয়ে সারা পাড়ার লোক গোপালের বাড়িতে ভিড় করতে লাগল। ভিড় যত বাড়ে ওঝার মন্ত্রের দাপটও ততগুণ বাড়তে থাকে। ভিড়ের ভিতর কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে—'গোপালকে কিসে কেটেছে ?' 'সাক্ষাৎ যম, মায়ের বড়পুত্র, রাজগোখরো গো, তবে ভয়ের কিছু নেই আমি যখন এসে পড়েছি' জন্মেঞ্জয় ওঝা বলতে লাগল, 'ময়ূরভঞ্জের গুরুর কৃপায় এরা আমার কাছে নস্যি।'

এদিকে গোপালের অসহ্য যন্ত্রণা, মুখে ফেনা, ঢলে পড়া অবস্থা দেখে কেউ কেউ বলল, 'ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হত।' 'হাসপাতালে নিয়ে কি হবে গো! ওরা তো সব সাপেরই কামড়ে এক রকমের বিষের ওষুধ দেয়। ওদের কি আর আমাদের মতো মায়ের সব বাহনের জন্য আলাদা আলাদা মন্ত্র আছে ?' ওঝার এই কথা শুনে সন্দিগ্ধমনারা চুপ করে ওঝার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল।

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে গোপালের খিঁচুনি আরম্ভ হয়ে গেল এবং পর পর কয়েকটি খিঁচুনির পর গোপাল একেবারে সারাজীবনের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ওঝা বেগতিক দেখে বলতে লাগল 'হায় হায় এর যে আর আয়ুবল নাই গো, স্বয়ং 'কাল' একে নিয়েছে গো…!'

এই ভাবে সারা ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১০ হাজার গোপাল অকালে ঝরে পড়ছে এই সব মূর্খ ওঝাদের চালিয়াতিতে। হাজার হাজার বৎসর আমরা সাপ নিয়ে বাস করছি তবুও সাপের সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা, অন্ধ সংস্কার এতই প্রবল যে রাতে আমরা সাপকে সাপ না

বলে 'লতা' বলি, সাপ কামড়ালে সেই সাপকে কখনও মারি না—পাছে সাপের বিষ না নামে এই সংস্কারে।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩১০০০ রকম সাপ আছে। তার মধ্যে বিষধর হচ্ছে মাত্র ২৮০ রকমের। এর মধ্যে ভারতে বিষধর আছে ৬৮ রকমের— যার ৩০ রকম থাকে সমুদ্রে।[১]

কয়েকটি নির্বিষ অথচ উপকারী সাপকে প্রায়ই আমাদের ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এরা ইঁদুরকুল ধ্বংস করে মানুষের প্রভূত উপকার করে—যেমন ঢ্যামনা, চিতিবোড়া, হেলে, ঢোঁড়া প্রভৃতি। গোধিকা সাপের প্রজাতিতে না পড়লেও ওকে গোসাপ বলেই জেনে এসেছি। কিছু অর্থলোভী সাপের চামড়ার ব্যবসায়ী এই উপকারী সর্পকুলকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে ইঁদুরকুলকে আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করছে। আমাদের ফসলের সিকি ভাগ নষ্ট হচ্ছে শুধু এই ইঁদুরের জন্য।

বিষধর সাপকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়। (১) কোবরা বা ফনাযুক্ত, (২) ভাই-পার বা ফনাহীন, (৩) ক্যারাট বা কালাচ, (৪) সামুদ্রিক।

বিষধর সাপের মধ্যে কতকগুলি উগ্র বিষধর এবং বাকীরা ক্ষীণ বিষধর। লাউডগা সাপ ক্ষীণ বিষধর—এর কামড়ে কোন মানুষ মরে না—যদিও এর সম্বন্ধে আমাদের ভীতি খুব বেশি। অনেকে বলে এই সাপ নাকি চোখ খুবলে নেয়। সমস্ত বাজে কথা। তবে মুরগি বা ছোট বাচ্চা মারা যেতে পারে। মেটেলি সাপ ক্ষীণ বিষ ধরে, কিন্তু ওর বিষ দাঁত পিছন দিকে থাকার জন্য কামড় দিয়ে বিষ ঢালতে পারে না। ময়াল বা অজগরের কোন বিষ নাই—ওরা পেঁচিয়ে ধরে চিতা বাঘকে পর্যন্ত গিলতে পারে।

বিষধর সাপের উপরের মাড়িতে দুটি বড় বিষ দাঁত থাকে যার পিছনে বিষথলি লাগানো থাকে। যখন কামড় দেয় তখন বিষথলি থেকে বিষ, ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের ওষুধ জোরে ঠেলার মতো সেকেণ্ডের মধ্যে প্রাণীর দেহে চালান করে দেয়। চন্দ্রবোড়ার বিষ দাঁত দুটি এত বড় হয় যে দাঁত দুটি মুখের মধ্যে ভাঁজ করে রাখতে হয়, —ছোবলের সময় দাঁত দুটি নিমেষে সোজা হয়ে যায়।

সাপের বিষ মানুষের শরীরে দুভাবে কাজ করে ; (i) নার্ভ দিয়ে ( নিউরোটক্সিক এফেক্ট ), যেমন কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড়, কালাচ, শাঁখামুটে প্রভৃতির বিষ এবং (ii) রক্তের মধ্য দিয়ে ( হেমাটোটক্সিক এফেক্ট ), যথা চন্দ্রবোড়া, ফুরসা প্রভৃতির বিষ। এদের বিষ ধীরে ধীরে রক্তের মধ্য দিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা শরীরে পচন ধরিয়ে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

একটি পূর্ণ বয়স্ক কেউটে বা গোখরোর থলিতে বিষ থাকে ৩১৭ মিলিগ্রাম। একবার ছোবল মারলে ২১১ মিলিগ্রাম বিষ ঢেলে দেয়—তার মধ্যে মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম বিষ শরীরে গেলে যে-কোন স্বাস্থ্যবান লোক মারা যাবে। তাই একটি বাচ্চা কেউটে ( যার থলিতে বিষ কম থাকে ) কামড়ালেও যে-কোন লোক মারা যেতে পারে। একটি শঙ্খচূড় বিষ ধরে ৬৫০ মিলিগ্রাম। তাই ওর কামড়ে হাতি পর্যন্ত মারা যায়। একটি চন্দ্রবোড়া ১০৮ মিলিগ্রাম বিষ তার থলিতে রাখে। একবার কামড়ে ৭২ মিলিগ্রাম বিষ ঢেলে দেয়, এর মধ্যে ৪২ মিলিগ্রাম বিষ শরীরে গেলে যেকোন তাগড়াই জোয়ানও মারা যায়। একটি ক্যারাট বা কালাচ বা শাঁখামুটি বিষ ঢালে ৫ মিলিগ্রাম মাত্র। এর

১ মাদ্রাজ স্নেক পার্কের কিউরেটরের নিকট থেকে ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

মধ্যে ১ মিলিগ্রাম শরীরে গেলে দশাসই ব্যক্তির দফারফা হয়ে যাবে

আমেরিকায় 'র‍্যাট্‌ল স্নেক' বলে এক জাতের তীব্র বিষধর সাপ আছে, যারা তাদের নাসিকার ছিদ্রের পার্শ্বে দুটি ছোট ছিদ্র থেকে 'ইনফ্রা রে' পাঠিয়ে অন্ধকারে চোখ বুজে বা ঘুমাতে ঘুমাতেও মানুষ বা যে-কোন উষ্ণশোণিত জীবের গায়ে অব্যর্থভাবে ছোবল দিতে পারে।

সাপের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রবোড়া ও ফুরসা বাচ্চা দেয়; বাকী সবাই ডিম পাড়ে।

কোন সাপই শুনতে পায় না। তারা বুকে মাটির স্পন্দন খুব সহজে উপলব্ধি করতে পারে। সাপুড়েরা বাঁশি বাজিয়ে মা-মনসার গান করে সাপের যে খেলা দেখায় তার বিন্দুবিসর্গও কিন্তু সাপ শুনতে পায় না। শুধুমাত্র হাত নাড়া বা পেটমোটা বাঁশির নড়াচড়া দেখে সেও দুলতে থাকে এবং ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। অনেকে অন্ধকারে রাস্তায় হাততালি দিয়ে যায় যাতে সাপ পালায়। তা কিন্তু ভুল ধারণা। বরং মাটিতে দুপ্‌ দুপ্‌ করে পা ফেললে সাপ ভয়ে পালায়।

বিষধর সাপ যখন কোন ধূলো-রাস্তার উপর দিয়ে যায় তখন একটি আঁকা বাঁকা রেখা সৃষ্টি করে যায়। একমাত্র বিষধর শঙ্খচূড় ছাড়া সমস্ত নির্বিষ সাপ—বিশেষ করে ঢ্যামনা—প্রচণ্ড জোরে ছুটতে পারে এবং রাস্তার উপর একটি সরল-রেখার দাগ ফেলে যায়। শঙ্খচূড় সাপ কেউটে ও গোখরো ধরে 'লাঞ্চ' করে বলে, শিকার ধরতেও একটি ছুটন্ত ঘোড়ার গতিতে সরল-রেখায় ছুটতে পারে।

### মন্ত্রশক্তি না বুজরুকি?

সাপের কামড় সাধারণতঃ ঘটে সন্ধ্যার সময় কেননা ঐ সময় সাপেরা খাদ্যের সন্ধানে বেরোয় আর লোকে কাজ থেকে বাড়ি ফেরে। শতকরা ৯০ ভাগ সাপের কামড় হচ্ছে নির্বিষ সাপের দ্বারা। বিছা, ইঁদুর, জিয়লমাছে মারলেও লোকে অন্ধকারে বা জলে সাপে কেটেছে বলে ভয়ে আধমরা হয়ে যায়। ওঝারা এইসব রোগীদের সুস্থ করে দিয়ে মন্ত্রশক্তির জোর দেখায় অথচ এদের সামান্য আশ্বাস দিয়ে মনের ভুল ধারণা কাটিয়ে দিলেই এরা ভাল হয়ে যায়। আর যখন সত্যিকারের বিষধর সাপ কাটে তখন ওরা 'কাল' বা 'যক্ষ' নিয়েছে বলে নিজেদের মন্ত্রশক্তির অসারতা ঢাকা দেয়।

সাপুড়েরা সাপ ধরে কেবলমাত্র সাহস ও কৌশলের দ্বারা, কোন মন্ত্র বা মোহিনী বিদ্যা দিয়ে নয়। অনেক সাপুড়ে দিনের বেলা সাপের গর্ত দেখে চিহ্ন দিয়ে আসে, (সাপের গর্ত সাপের যাতায়াতে বেশ মসৃণ হয় এবং সাদা সাদা গুঁড়া সাপের মল পড়ে থাকতে দেখা যায়) অন্ধকার থাকতে সাপ যখন সারারাত শিকার ধরে তার বাসার দিকে ফিরে ঠিক সেই সময় সাপুড়ে তাকে ধরে নিয়ে আসে। সাপ ধরে সাপের বিষ-দাঁত দুটি সাঁড়াশি দিয়ে উপড়ে নিয়ে খেলা দেখাতে নিয়ে যায়। বিষদাঁত না ভেঙে কোন সাপুড়ে খেলা দেখাতে নিয়ে যায় না। যদি কখন গোঁয়ার্তুমি করে খেলা দেখায় তখন সাধারণতঃ ঐ সাপের কামড়েই ওরা জীবন শেষ করে। বিষদাঁত ভাঙার ৬ মাসের মধ্যে পাশের দুটি দাঁত বড় হয়ে বিষদাঁতের কাজ করতে আরম্ভ করে। এই ব্যাপারটা সাপুড়েরা অনেক সময় খেয়াল করে না বা জানে না। তাই খেলা দেখানোর সময় অনেক সাপুড়ে সাপকে (বিষধর) কোলে নিতে বলে। কিন্তু ভুলেও নেওয়া উচিত নয় কারণ যদি নতুন দাঁত গজিয়ে থাকে তাহলে তার দ্বারা সে ছোবল দিতে পারে।

২ বিষ সম্বন্ধে তথ্যগুলি অবনী সরকার লিখিত 'সাপ' পুস্তক থেকে প্রাপ্ত।

অনেক সাপুড়ে সাপের মাথা থেকে 'মণি' বের করে সবার সামনে বিক্রি করে। ওটি পুরোপুরি হাত সাফাইয়ের ব্যাপার। অনেক সময় ওরা পোষা সাপ লোকের বাস্তুতে ছেড়ে দিয়ে এসে বলে 'বাবু আপনার বাস্তুতে বহুৎ পুরনো নাগ আছে' তারপর সবার সামনে একটু তেল নখে নিয়ে সেটা দেখতে দেখতে তার ছাড়া সাপ ধরে নিয়ে আসে এবং বলতে আরম্ভ করে 'বাবু এ খাঁটি নাগরাজ, এর মাথায় সাত-রাজার ধন এক মাণিক আছে।' এই বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সাপের মাথা চিরে একটু রক্ত বের করে দিয়ে মণি তুলে আনে। সেই মণি গৃহস্থ ও উপস্থিত লোকদের দাঁও বুঝে একজোড়া কাপড় ও ১০১ টাকা থেকে আরম্ভ করে ২/১ টাকার বিনিময়ে দিয়ে যায়। ওটি আর কিছু নয়—মাছের রঙ করা চোখ বা বাজারের নকল পাথর—হাতের কারসাজিতে সাপের মাথা থেকে যেন তুলে আনে, কোন সাপেরই মাথায় মণি থাকে না।

সাপুড়েরা একজাতের শিকড় দেখায়—যা দেখলে যে সাপ ফোঁস ফোঁস করছে, সে নিমেষে নেতিয়ে পড়ে। সাপুড়ে তখন বলে 'এ হচ্ছে মণিরাজ গাছের শিকড়—যা সাপে নেউলে যুদ্ধ হলে নেউল এনে গায়ে লাগায় এবং এ-শিকড় একমাত্র ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে পাওয়া যায়।' এই কথায় এবং কাজ দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে উচ্চ দামে ঐ শিকড় কিনে নিয়ে গিয়ে মাদুলি করে পরে। ঐ শিকড় কিন্তু আর কিছু নয় বটগাছের ঝুরি মাত্র। ওটাই কেটে কেটে বিক্রি করে। সাপকে যখন পোষ মানায় তখন সাপুড়েরা তার মাথায় গরম লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ধীরে ধীরে একটি ছোট ঘা করে দেয়—ওতে কোন ডাণ্ডা বা শিকড় লাগলে সাপ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় এবং লুকোবার চেষ্টা করে। সাপের এই ভীতি মূলধন করে শিকড়ের শক্তি দেখায় সাপুড়েরা।

অনেকের ধারণা ঢ্যামনা, ঢোঁড়া বা চিতি-বোড়া কামড়ালে গোবর ছুঁতে নেই, ওতে নাকি ওরা বিষ রেখে দিয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এইসব নির্বিষ সাপ কামড়ালে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাতে গোবর বা নোংরা লাগলে টিটেনাস হতে পারে। সেইজন্যই এই সাবধান বাণী।

সাপ অত্যন্ত ভীতু জীব। কোন রকম আঘাত বা শত্রুতার আভাস না পেলে সাধারণতঃ ওরা ছোবল দেয় না। আর সাপে ছোবল দিলে ভয়ে অস্থির না হয়ে যদি সম্ভব হয় সঙ্গে সঙ্গে সাপটিকে মেরে ধরে আনা উচিত। এতে ডাক্তারদের চিকিৎসার সুবিধা হয়। ছোবলের পর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে—কামড়ের ঠিক উপরে বাঁধন দিতে হবে। তারপর হাতে কামড়ালে কনুই-এর ঠিক উপরে এবং পায়ে হলে হাঁটুর ঠিক উপরে আর একটি করে শক্ত বাঁধন দিতে হবে। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে বাঁধন দিতে হবে। তবে রাবার টিউব বা কাপড়ের চওড়া পাড় হলে ভাল হয়। একটি সরু লাঠি ঢুকিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধন দিতে হবে—যাতে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকে। বাঁধন দেওয়ার পর রোগীকে বসিয়ে বা শুইয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। কোনক্রমে রোগীকে হাঁটানো উচিত নয়। রোগীকে সব সময় প্রচুর সাহস দিতে হবে। বর্তমান লেখকের দীর্ঘ ১৫ বৎসরের সাপে কাটা চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে শুধুমাত্র সাহস ও ভরসা পেলেই বিষধর সাপের কামড়ের রোগীরাও অনেক মানসিক বল ফিরে পায় যাতে তাদের চিকিৎসা করা খুব সুবিধা হয়।

একটি কথা সবার জানা উচিত। বিষধর সাপের কামড়ের একমাত্র চিকিৎসা 'অ্যান্টি পলি ভেনাম সিরাম' দিয়ে হয়—এ-ছাড়া পৃথিবীতে এখনও অন্য কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। এই চিকিৎসা হাসপাতালে বা অন্য কোন অভিজ্ঞ ট্রেনিং প্রাপ্ত ডাক্তারের কাছে করা উচিত। এমন দেখা গেছে আনাড়ি ডাক্তারের হাতে সিরাম রিঅ্যাকশনে রোগী মারা গেছে সাপে কাটার চিকিৎসা করাতে গিয়ে।

# মাধুর্য ভগবত্তা সার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ জানা

কাশীধামে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে শুনিয়েছিলেন :

মাধুর্য্য ভগবত্তা সার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২১ পরিঃ)

তিনটি শব্দ 'মাধুর্য' 'ভগবত্তা' 'সার'—এই তিনটি কথার মধ্যে অনন্ত কথা লুক্কায়িত আছে। ঐ অনন্ত কথা মহর্ষি ব্যাসদেব লিখে শেষ করতে পারেননি। সেই অনন্তের কথাই জীবের একমাত্র আশা-ভরসা। শ্রীহরির চরিতকথা কীর্তনই ভবসমুদ্র উত্তরণের ভেলাস্বরূপ। ইহা মহর্ষি ব্যাসদেবকে উদ্দেশ্য করে দেবর্ষি নারদের উক্তি (ভাগবত, ১।৬।৩৫)।

ভগবান স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম। সেই অদ্বয়জ্ঞান বা তত্ত্ববস্তুই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিনটি সংজ্ঞায় কথিত। বলা বাহুল্য যাঁরা নির্বিশেষ জ্ঞান দ্বারা অদ্বয়তত্ত্বকে অনুসন্ধান করেন, তাঁদের নিকট নির্বিশেষ ব্রহ্মই অনুভূত হন। অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে বিচরণকারীর হৃদয়ে পরমাত্মা উদিত হন, আর যাঁরা শুদ্ধাভক্তির দ্বারা পরম তত্ত্বের সাধক তাঁরা শ্রীভগবানকেই লাভ করেন।

ভগবান অর্থাৎ যাঁর ভগবত্তা আছে। 'ভগ' শব্দ ঐশ্বর্যবাচক। যিনি ঐশ্বর্যবান অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য-শালী তিনিই ভগবান। ভক্ত ভগবানের মাহাত্ম্য তখনই বুঝতে পারে যখন তিনি লীলার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ভগবান যে লীলা করতে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হন তা ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে উল্লেখ করেছেন—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' (২।১।৩৩) লোকের ন্যায় কেবল লীলা। এই লীলা খেলা মাত্র। লীলার অর্থই খেলা। ভগবান স্বীয় মায়া শক্তিদ্বারা নিজেকে আবৃত করে জগৎ প্রপঞ্চে মানুষের ন্যায় লীলা করেন। এই মায়া শক্তি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত ঘোষণা করেছেন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান (১।৩।২৮) শ্রীকৃষ্ণ লীলা পুরুষোত্তম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন :

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চঃ, মধ্যলীলা, ২১ পরিঃ)

ভগবানের যত প্রকার লীলা আছে তার মধ্যে নরলীলা সর্বোত্তম। এই নরলীলায় ভগবানের ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়। ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যের মধ্যে যেখানে মাধুর্যের প্রকাশ সর্বাধিক সেই লীলাই অধিক মনোহর।

অখিল রসামৃতসিন্ধু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মনোহর লীলাই ব্রজলীলা। ব্রজভূমিতে মাধুর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ। ব্রজলীলায় এই মাধুর্যের এই বিকাশকে তিনভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে—প্রেম মাধুর্য, বেণু মাধুর্য এবং রূপ মাধুর্য।

**প্রেমমাধুর্য :** শ্রীভগবান ভক্তির বশ। ভক্তজনপ্রিয়, ভক্তাধীন। কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে অর্জুনের নিকট তিনি ব্যক্ত করেছেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" (গীতা, ৯।৩১) শুধু ইহাই নহে—তিনি ভক্তের যোগক্ষেমও বহন করেন। 'যোগক্ষেম' যোগঃ—অপ্রাপ্তস্য প্রাপণং ক্ষেমং লব্ধস্য পরিরক্ষণম্ অর্থাৎ

অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি, প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ।

কিন্তু ব্রজভূমিতে তিনি প্রাকৃত বালকের ন্যায় নানা খেলায় মত্ত। ব্রজ বালকগণ তাঁর স্কন্ধে উঠেছেন (ভাঃ, ১০।১৮।২৪) পরাজিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করতে লাগলেন। সর্বভূতান্তর্ভূতাত্মার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়েছে ব্রজ বালকগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে। যিনি সর্বাশ্রয়, সর্বভয় নিবারক তিনি মাতার যষ্টির হেলনে ভীত ত্রস্ত হয়ে নিরাশ্রয়ের মতো ছুটেছেন। এ দৃশ্য ব্রজ ভূমি ব্যতীত অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। এখানে ঐশ্বর্য সঙ্কুচিত; মাধুর্যের অরুণালোকে লীলাময়ের অপূর্ব লীলা অনবদ্য।

মধুর রসের মহিমা সর্বাতিশায়ী। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি:

মধুর-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্য চঃ, মধ্যলীলা, ১৯ পরিঃ)

অতএব মধুর রসে অন্যান্য রসেরও অস্তিত্ব বিদ্যমান। গোপী প্রেম বারিধির অপার তরঙ্গে শ্রীশ্যামসুন্দর মুগ্ধ, দিশেহারা। তাই তিনি বলেন:

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
রাধিকার প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥
(ঐ, আদিলীলা, ৪ পরিঃ)

শ্রীরাধারাণীর প্রেমার্ণবে মুগ্ধ মাধব "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলে আভীর কন্যার পদপ্রান্তে পতিত হয়েছেন। গোপীপ্রেমের অপার মহিমায় শ্রীব্রজেশ্বর এতই মুগ্ধ যে তিনি বলেন:

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
(ঐ, আদিলীলা, ৪ পরিঃ)

এ প্রেম মাধুর্য অনন্ত আকাশের ন্যায় সীমাহীন, শুধু সীমাহীন নহে প্রতিক্ষণে নব নবায়মান।

**বেণুমাধুর্য:** শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা বেণুই পান করে। গোপীগণ এই বেণুধ্বনি শ্রবণে বেণুমাহাত্ম্য পরস্পরের মধ্যে বর্ণনা করেন। কোন কোন গোপী অন্য গোপীকে বলছেন হে গোপীগণ! এই বেণু কি অনির্বচনীয় পুণ্য করেছে যেহেতু গোপীকাগণের উপভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা স্বাধীনভাবে নিঃশেষে পান করছে। আর এই মাতৃতুল্য নদীসমূহ বিকশিত কমলচ্ছলে যেন পুলকিত হচ্ছে এবং যে বংশ হতে উদ্ভূত সেই পিতৃতুল্য বৃক্ষগণ মধুধারা বর্ষণচ্ছলে কুলবৃদ্ধগণের ন্যায় আনন্দাশ্রু মোচন করছে। বংশে ভগবৎসেবক সন্তান জন্মালে যেমন কুলবৃদ্ধগণের চক্ষে আনন্দাশ্রু নির্গত হয়, তদ্রূপ যে বংশে এই বেণুর উৎপত্তি সেই বৃক্ষগণের আজ তাই আনন্দ, পুলক ও অশ্রুমোচন। (ভাগবত, ১০।২১।৯)

শ্রীগোবিন্দের মোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণে ময়ূরগণ প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্যরত। আর শ্রীবৃন্দাবনের হরিণী সেও ধন্যা। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন বংশীধ্বনি শ্রবণে একা হরিণী নয় কৃষ্ণসার হরিণসহ প্রেমযুক্ত মধুর দৃষ্টিপাত দ্বারা সম্মানপ্রদর্শন করছে। (ঐ, ১০।২১।১০-১১) এই সম্মানপ্রদর্শনই পূজা। সবৎস গাভীগণ প্রেমাশ্রুলোচনে ঊর্ধ্বকর্ণ হয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরের মুখবিনির্গত বেণু সুধা পান করে। বিহঙ্গকুল মুরলীর মধুর আলাপন শ্রবণে নিমীলিত চক্ষে বৃক্ষশাখায় নীরব নিস্পন্দ। ফল-পুষ্প ভারে প্রণতঃ শাখা তরুলতা প্রেম-পুলকিতাঙ্গ হয়ে পুষ্পফল হতে মধুধারা বর্ষণ করছে। বেগবতী যমুনার বারিসমূহ স্তিমিত হয়ে আবর্ত সৃষ্টি করে।

আকাশে মেঘরাশি স্থির, বৃক্ষলতা পুলকিত গোবর্ধন দ্রবীভূত। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেন—এ-মুরলী ধ্বনি 'সর্বভূত মনোহরম্'।

শারদোৎফুল্ল চন্দ্রাবতী রজনী শ্রীমোহন মুরলীয়া বংশীবট হেলনে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়িয়ে মুরলীতে বিশ্ববিমোহন আলাপে মত্ত। (ঐ, ১০।২৯.৩)। এই মধুর আলাপ শ্রবণে ব্রজ-গোপিণীদের প্রেমার্ণবে বান এল; তাঁরা প্রেমের অপার তরঙ্গে ভেসে গেলেন। সকলেই দিশে-হারা। যে যেমন অবস্থায় ছিলেন, যে যেমন কর্মরত ছিলেন সেই অবস্থায় সেই কর্ম ফেলে দিয়ে তাঁরা ছুটলেন। দ্রুত গমনে তাঁদের কর্ণের কুণ্ডলসমূহ দোদুল্যমান। (ঐ, ১০।৩১।৪) বেণুমাধুর্যের মহীয়সী শক্তিতে ব্রজললনাদের বেদ-ধর্ম ও লোকধর্মাদি সবই ভেসে গিয়েছে। মথুরা হতে উদ্ধবকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণকালে শ্রীভগবান নিজেই গোপীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—এই গোপী-দের মন আমাতেই অর্পিত; আমিই তাদের প্রাণ। আমার নিমিত্ত তারা পতি-পুত্রাদি দৈহিক সুখ-সাধন পরিত্যাগ করেছে; প্রিয়তম আত্মা আমাকেই তারা মনের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। যে-সকল লোক আমাকে পাবার জন্য ঐহিক ও পারলৌকিক সুখজনক প্রবৃত্তিধর্ম পরিত্যাগ করে আমি তাদেরকে সুখী করাই। বলা বাহুল্য যে, 'সকল লোক' বলতে ব্রজগোপীগণকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেছেন—'প্রেম্না প্রিয়াধিক্যম্'। বেণুমাধুর্যের মহত্ত্ব বর্ণনায় লঘু ভাগবতামৃত (৮১২-১৩) বলেন—নিখিল লোকে যত রকম শব্দমাধুরী আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এক পরমাণুতে নিমজ্জিত হয়। অর্থাৎ এই বংশীধ্বনির এক কণিকার মাধুর্য নিখিলের শব্দ-মাধুর্যসমষ্টির অধিক। এই মোহন মুরলী যখন ধ্বনিত হতে থাকে তখন স্থাবর জঙ্গম সমস্তই সান্দ্র পরমানন্দে নিমগ্ন হয় এবং তাদের ধর্মবিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ সান্দ্র পরমানন্দে সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে স্থাবর জঙ্গমের ন্যায় পুলকিত ও কম্পিত হয় এবং জঙ্গম স্থাবরের ন্যায় নিশ্চল হয়ে পড়ে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলেছেন:

নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দবিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্য চঃ, মধ্যলীলা, ২১ পরিঃ)

দেহের অনির্বচনীয় রূপকেই মাধুর্য বলে। লঘুভাগবত বর্ণনা করেছেন:

অসমানোর্ধ্বমাধুর্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ।
জঙ্গমস্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ॥
(কৃষ্ণামৃত—৮১৮)

গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য তরঙ্গামৃত বারিধি সদৃশ এবং তাঁর রূপ স্থাবর-জঙ্গমেরও উল্লাসদায়ক।

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥

* * *

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাঁহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা গোপীদের মন॥
(শ্রীশ্রীচৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ২১ পরিঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—তিনি সৌন্দর্য-মাধুর্য-বীর্য-জ্ঞানবৈরাগ্য প্রভৃতির যতদূর সম্ভব সমগ্রভাবে একত্র সমাবেশে যে দেহ সৃষ্টি হয় সেই দেহধারীই হলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই কথাটি বোধগম্যের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর কতকগুলি বিশেষণ দিয়েছেন যাহা সাধারণ বা অসাধারণ মানবে প্রযোজ্য নহে। মোহন মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় সুন্দর বস্তুর আধারস্বরূপ। তাঁর মোহন মূর্তি জগতের সমস্ত লাবণ্য ম্লান করেছিল। পীতবসনধারী বনমালী সাক্ষাৎ মদনমোহন। ত্রিলোকের শোভাসকলের একমাত্র আধার স্বরূপ। ত্রিলোকমধ্যে পরম

রমণীয় চক্ষুষ্মান্‌গণের নয়নানন্দকারী। তিনি 'রূপলাবণ্যসারম্' (ভাঃ, ১০।৪৪।১৪) শ্রীশুকদেব গোস্বামী এস্থলে রূপ লাবণ্যের বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন 'অসমোর্দ্ধ'মনন্যসিদ্ধম্'।—এই রূপ-লাবণ্য অপ্রাকৃত ও নিত্য নবায়মান। শ্রীমদ্ভাগবত-কার বলেছেন, তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর মূর্তিতে নর-লোকে আনন্দ বিতরণ করেছিলেন। আরও বলছেন—মকর কুণ্ডলে পরিশোভিত কর্ণদ্বয়দ্বারা দীপ্তিমান গণ্ডদ্বয় যাঁর সৌন্দর্য বর্ধিত করেছে, বিলাসময় হাস্য যাঁতে বিরাজিত এবং যাহা নিত্য উৎসবময়, সেই বদন নেত্রদ্বারা পান করে নারী ও নরগণ আনন্দিত হয়েও তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখে বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন :

লাবণ্য-কেলি সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥
যার পুণ্য-পুঞ্জ ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে ?
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণালোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্য চৈঃ, মধ্যলীলা, ২১ পরিঃ)

লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বর্ণনা করেছেন :

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥
(ঐ, মধ্যলীলা, ২১ পরিঃ)

বল্লভাচার্যের বর্ণনা :

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ মাধুর্যের চিত্তচমৎকারীত্ব অনির্বাচ্য। উভয় কবি মধুর মধুর সবই মধুর বলে বক্তব্য শেষ করেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেছেন :

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য-সিন্ধু, সুখ সুমধুর-ইন্দু,
অতি মধুরস্মিত সুকিরণে।
(শ্রীশ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য, ২১ পরিঃ)

নরলীলাই তাঁর সর্বোত্তম লীলা, এই লীলার রূপমাধুর্য :

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্ ॥
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ ॥
(ভাগবত, ১০।২১।৫)

মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ রচিত মুকুট, শ্রেষ্ঠ নটের ন্যায় বিগ্রহ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প সুবর্ণসদৃশ পীতবসন ও গলে বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করে অধর সুধায় বেণুর ছিদ্র পূরণ করতে করতে গোপগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে স্বীয় পদাঙ্কিত রমণীয় বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন।

মাধুর্যই ভগবত্তার অপরিহার্য সারবস্তু। এই মাধুর্যাস্বাদন প্রেমাদ্রচিত্ত ভক্ত ভাবুকের পক্ষেই সম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন :

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥
(শ্রীশ্রীচৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ৮ পরিঃ)

# 'তোমরা ভাল হ'লেই ছেলেরা ভাল হবে'

স্বামী মেধসানন্দ

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট। একদিন এক ভক্ত তাঁর বালক পুত্রকে সঙ্গে করে মহারাজের কাছে এসেছেন। ছেলেকে প্রণাম করিয়ে ভক্তটি মহারাজকে নিবেদন করলেন, "'মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যাতে এর কল্যাণ হয়, আর ছেলেটি যেন ভালো হয়'। পূজনীয় মহারাজ উত্তর দিলেন— 'আগে তোমরা নিজেরা যাতে ভাল হতে পার তাই কর। তোমরা ভাল হ'লেই ছেলেরা ভাল হবে।'"[১] মহারাজের এই সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উত্তর গভীরভাবে প্রণিধানের যোগ্য, বিশেষতঃ তাঁদের—যাঁরা মানুষ গড়ার কারিগর। কারণ তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। প্রধানতঃ, এই উক্তির আলোকে মানুষ গড়ার শিক্ষায় পিতা-মাতার ভূমিকা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

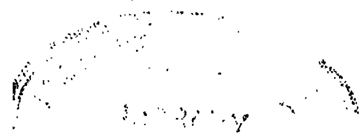
আদর্শ পিতা-মাতার উদাহরণ আমাদের শাস্ত্রাদিতে অনেক আছে। যেমন মহাভারতে আছে একজন আদর্শ মাতা রাণী বিদুলার কথা। দুর্বল ও আদর্শভ্রষ্ট সন্তান সঞ্জয়কে ঠিকপথে পরিচালিত করতে গিয়ে মাতা বিদুলা তাকে বলেছিলেন—"বৎস!…তোমার মা হয়ে এখন যদি সদুপদেশ না দিতে পারি, তাহলে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা মনুষ্যের ভালবাসার পর্যায়ে না পড়ে পশুজগতের ভালবাসার সমপর্যায়ে থাকবে। নিজ শাবকের প্রতি গর্দভীর যে স্নেহ, আমার পুত্রস্নেহের মূল্য তাহলে তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না। যে-সব জননীরা পুত্রকে অশিক্ষিত, কুশিক্ষাপ্রাপ্ত বা দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন দেখেও আনন্দে থাকেন, তাদের মানুষ করে তুলতে চান না, তাঁদের সন্তানের জন্মদান করাই বৃথা। হৃদয়ের দুর্বলতা কাটিয়ে তুমি যদি আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পার, সজ্জনের মতো আচরণ করতে পার, তাহলেই তুমি আমার প্রিয় হবে।"[২] আদর্শ জননীর আর এক উদাহরণ ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারী যিনি স্নেহময়ী জননী হয়েও বিপথগামী অত্যাচারী পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করবার জন্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার অনুরোধ করে বলেছিলেন:

"অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র; স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।"[৩]

সৎ ও পবিত্র পিতা-মাতাই আশা করতে পারেন তাঁদের সন্তান সৎ ও পবিত্র হবে। আদর্শনিষ্ঠ সন্তান লাভের জন্য তাঁদের নিজেদের প্রথমে আদর্শনিষ্ঠ হওয়ার তপস্যা করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দকে সন্তানরূপে পেতে মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীকে কতই না তপস্যা করতে হয়েছিল! ভারতীয় নারী সন্তানের নিকট কেন পূজিতা এ-প্রসঙ্গে স্বামীজী একবার বলেছিলেন, "আমাকে পৃথিবীতে আনবার জন্য তিনি তপস্বিনী হইয়াছিলেন। আমি জন্মাইব বলিয়া তিনি বৎসরের পর বৎসর তাঁহার শরীর-মন, আহার-পরিচ্ছদ, চিন্তা-কল্পনা পবিত্র রাখিয়াছিলেন।"[৪]

মহান পিতা-মাতার ঘরে মহান সন্তান

১ শিবানন্দ-বাণী ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১১৮
২ উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৯৪, পৃঃ ২৫৪
৩ গান্ধারীর আবেদন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা ১৩৫৬ সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৫
৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫।৪০৪



জন্মগ্রহণ করেন—যেমন বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর ঘরে। এমনকি স্বয়ং ভগবান উচ্চ আধারসম্পন্ন পিতা-মাতার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। যেমন, রামচন্দ্র দশরথ-কৌশল্যার, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীর এবং এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণির ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন।

মহান সন্তানলাভের জন্য প্রথমে যা প্রয়োজন তা হল পিতা-মাতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা। তাঁদের আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়, ভগবানের কাছে যে, তাঁদের পুত্র মহান হবে ও কন্যা মহীয়সী হবে। তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষা-প্রার্থনা ও আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপন সন্তানের চরিত্র-গঠনের ও তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান প্রেরণা ও চালিকা-শক্তি। সন্তানপালনের জন্য পিতা-মাতার যে ধৈর্য, ত্যাগ, সংযম ও সেবাবুদ্ধি দরকার তার জন্য তাঁদের প্রস্তুতি প্রয়োজন। সর্বোপরি প্রয়োজন সন্তানের উপর তাঁদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি।

সন্তানকে কি ভাবে গড়ে তোলা উচিত হিন্দু শাস্ত্রে তার বহু ইঙ্গিত আছে। যেমন চাণক্য-শ্লোকে বলা হয়েছে:

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।"[৫]

—জন্ম থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুত্রকে আদর ও যত্নের সহিত পালন করবে। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুত্রকে প্রয়োজনে শাসন করবে। কিন্তু ষোল বৎসর অতিক্রান্ত হলে তখন পিতা পুত্রের সহিত মিত্রসম ব্যবহার করবেন।

এই ধরনের শ্লোক থেকে সন্তানপালন বিষয়ে শাস্ত্রকারদের ভূয়োদর্শিতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর শিশুর বোধশক্তি জাগ্রত হতে কেটে যায়। তারপরের দশ-বারো বছর জীবনগঠনের দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়। এই সময়ে ছেলে যা শেখে পরবর্তী তিরিশ-চল্লিশ বছরেও তা সে শিখে উঠতে পারে না। অর্থাৎ এই সময়ে সন্তানের গ্রহণ-ক্ষমতা থাকে সর্বাধিক এবং তখনকার শিক্ষা সারাজীবন তার মনের চেতন ও অবচেতন স্তরে ক্রিয়া করতে থাকে। উপরন্তু ছেলেমেয়ের মনটি থাকে এই সময় নরম। যেমন, নরম মাটিকে যেমন-ইচ্ছা আকার দেওয়া যায় তেমন এই নরম মনকে যেমন-ইচ্ছা গড়ে তোলা যায়। এই গড়ে তোলার কাজ পিতা-মাতা তথা পরিবারের দ্বারা শুরু করা দরকার এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সহযোগিতায় তা আরও পরিণত ও পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন। নচেৎ কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা যে মূল্যবোধ বা ধ্যান-ধারণা নিয়ে ভর্তি হয় তার পরিবর্তন করা দুরূহ হয়।

সন্তানের মধ্যে বড় হওয়ার, মহৎ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা পিতা-মাতার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। বড় হওয়ার শক্তিও যে তার মধ্যে আছে সে-বিষয়েও অবহিত করার বিশেষ প্রয়োজন। নানাভাবে তাই সন্তানের আত্মশ্রদ্ধা তথা আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে হয়। তাকে উদ্দীপিত করতে হয় আদর্শবাদিতা ও মূল্যবোধে। তাকে বলতে হয়, 'তোমাকে বড় হতে হবে এবং বড় হওয়ার শক্তি তোমার মধ্যে আছে।' শোনাতে হয়, 'জন্মেছিস তো একটা দাগ রেখে যা'। চারিত্র্যশক্তির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে 'ছেলে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে-চরিত্রে বড় হোক' এবং 'ছেলে আর কিছু না হোক সে একজন ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার বা বড় চাকুরে হোক' এই দুই কামনা এবং তার পরিণতির অনেক তফাত। ফলতঃ, পিতা-মাতার প্ররোচনায় যে-সন্তান যত ক্যারিয়ার-

৫ চাণক্য শ্লোক, পণ্ডিত রামপদ ভট্টাচার্য সংকলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, পৃঃ ১৫

সর্বস্ব হয়ে পড়ে মনুষ্যত্বের সাধনায় সে তত পিছিয়ে পড়ে এবং অনেকক্ষেত্রে এর পরিণতি সেই সন্তানের হাতেই পিতা-মাতার অবহেলা ও অবমাননা!

আত্মশ্রদ্ধার সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধার কথা বলতে হবে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন শুরু হয় পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন দিয়ে। শ্রদ্ধা কেবলমাত্র মানস-পর্যায়ে থাকলে চলে না—তার উপযুক্ত বহিঃপ্রকাশও থাকা প্রয়োজন। কোন শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বা দূরে কোথাও যাওয়ার আগে বা ফিরে এসে ছেলেমেয়ের বাবা-মাকে প্রণাম করা উচিত। 'আমি ছেলেকে আমাকেই প্রণাম করতে বলব'—এ বৃথা সংকোচ অবিধেয়। অনুরূপভাবে শিক্ষক মহাশয় এবং অন্য গুরুজনদের প্রণাম করে এবং তাঁদের সঙ্গে সংযত আচরণ করে ছেলেমেয়েরা যাতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে তা দেখতে হবে। বাড়ির ভৃত্যাদির প্রতি আচরণ কিরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ও আন্তরিক হওয়া উচিত তাও সন্তানকে শেখানো দরকার। প্রখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনী 'সত্তরবছরে' লিখেছেন যে, তিনি বাল্যকালে তাঁদের বয়স্ক গৃহভৃত্যের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তার নাম ধরে ডাকায় তাঁর বাবা তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

এরপরে আসে নিয়মানুবর্তিতা। নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা যেমন একদিকে সন্তানকে বুঝিয়ে বলা দরকার তেমনি ভোরে ঘুম থেকে উঠে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত সে যাতে নিয়মিত জীবনযাপন করে সে বিষয়ে অভিভাবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'। তবে শুধু ধর্মচর্চা কেন সর্বপ্রকার সৎ চর্চাতেই শারীরিক স্বাস্থ্য চাই—"চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু;/সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।"[৬]

অতএব স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সন্তানকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং তাকে নিয়মিত শরীর-চর্চার কথা বলতে হবে।

ছেলেমেয়ের মনে জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং তার মধ্যে বিদ্যাচর্চার নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তাদের জানাতে হবে-

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥"[৭]
—রাজা আর বিদ্বানে কভু তুলনা নাহি হয়।
স্বদেশে রাজার সম্মান বিদ্বান সর্বত্র পূজ্য হয়॥

এই শ্লোকের প্রসঙ্গে ছেলেমেয়েকে শোনাতে হবে বুনো রামনাথ ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো পণ্ডিতদের কাহিনী। বুনো রামনাথ ছিলেন নবদ্বীপের প্রখ্যাত পণ্ডিত অথচ অতীব দরিদ্র। এত দরিদ্র যে তাঁর স্ত্রীর হাতে শাঁখা জুটতো না বলে এয়োস্ত্রীর চিহ্ন হিসেবে তিনি হাতে লালসুতো পরতেন। এ নিয়ে নবদ্বীপের রাণী একদিন পরিহাস করলে উত্তরে রামনাথের স্ত্রী রাণীকে সগর্বে বলেছিলেন, 'আমার হাতে লালসুতো আছে তাই নবদ্বীপের মানও আছে।' জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও ছিলেন খ্যাতনামা বাঙালী পণ্ডিত। তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে স্বয়ং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যখন অসময়ে নদী পার করার জন্য এক মাঝিকে বারবার অনুরোধ করছিলেন তখন মাঝি তাঁকে হাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি কি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যে তোমাকে এই অসময়ে পার করে দেব!' বলাবাহুল্য সেই নিরক্ষর মাঝি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম

৬ একবার ফিরাও মোরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা ১৩৫৬ সংস্করণ, পৃঃ ২১৮

৭ চাণক্য শ্লোক, পৃঃ ১৪

শুনেছিল কিন্তু তাঁকে চিনত না। এ সমস্ত কাহিনী ও নিউটন বা আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিকদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বালক-মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে।

ছেলেমেয়েদের সত্যানুরাগের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তাদের সত্য কথা বলতে যেমন উৎসাহিত করা প্রয়োজন তেমনি সত্যানুরাগের নানা কাহিনী যেমন, রামচন্দ্রের পিতৃসত্যপালন, হরিশ্চন্দ্রের সত্যানুরাগ, মহারাজ বলির প্রতিজ্ঞা-রক্ষা তাদের শোনানো দরকার। কখনও অপরাধ করে সন্তান যদি সত্য স্বীকার করে তার শাস্তি লঘু হওয়া বা একেবারে মকুব হওয়া উচিত। বয়স্ক মানুষের অসত্য আচরণ শিশুর মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। যেমন শিশুকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য হয়তো বলা হল 'তোকে খেলনা কিনে দেব' কিন্তু দেওয়া হল না, বা বলা হল 'ওখানে যাসনে, জুজু আছে' যদিও জানা আছে সেখানে সেসব কিছু নেই! এই ধরনের আচরণ থেকে অভিভাবকদের প্রতিনিবৃত্ত হওয়া দরকার।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাবলম্বিতা ও সহিষ্ণুতার ভাব আনতে হবে। তাদের সবকিছু মা বা অন্য কেউ করে দেবেন এ অবস্থা কখনও কাম্য হতে পারে না। কারণ ছেলেমেয়েকে তা পরনির্ভরশীল করে ফেলে যা তার গঠনের পক্ষে পরিপন্থী।

সকলের প্রতি বিশেষতঃ গরীবদের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির ভাব সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত করতে হয়। বাড়িতে দীন-দুঃখী এলে তার হাত দিয়ে সাহায্য দেওয়া বা তাকে দিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেওয়া—এ সমস্ত অভ্যাসের একটা গভীর প্রভাব তার চরিত্রের উপর পড়ে।

ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্নতা, সুরুচি, সর্বোপরি সংযম ও পবিত্রতার কথা বিশেষভাবে বারবার বলা প্রয়োজন। পবিত্রতা ও সংযম যে আদর্শ ও উন্নত-জীবনের মূলভিত্তি তা তাদের মানসপটে চিরমুদ্রিত করে দিতে হবে। সর্বোপরি তাদের প্রার্থনাপরায়ণ হতে শেখাতে হবে। সে-প্রার্থনা তার নিজের, আত্মীয়-স্বজনের, দেশের ও বিদেশের সকল মানুষের জন্য এমনকি মনুষ্যেতর পশুপক্ষীর জন্যও। সে-প্রার্থনা দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক সকল স্তরের উন্নতির জন্য। কত অপূর্ব প্রার্থনা আছে যার আবৃত্তিমাত্র মনকে উন্নীত ও উদার করে। যথা—'অসতো মা সদ্গময়/তমসো মা জ্যোতির্গময়/মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়/আবীরাবীর্ম এধি।/রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'—আমাকে অসৎ থেকে সতে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার যা দক্ষিণমুখ তা দিয়ে তুমি আমায় সর্বদা রক্ষা কর।

এই সমস্ত প্রার্থনা ও তার মনন ছেলেমেয়েদের সারাজীবন অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের জীবনতরণীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

যৌথপরিবারে শিশুকে শেখানোর দায়িত্ব বৃদ্ধরা গ্রহণ করেন। যেমন অনেক বিখ্যাত মনীষীর আত্মজীবনীতে দেখতে পাওয়া যায় তাঁরা শৈশবে ও বাল্যকালে তাঁদের পিতামহ বা পিতামহীর কাছে অনেক শ্লোক, স্তব-স্তোত্র ও পৌরাণিক উপাখ্যান শুনেছেন ও মুখস্থ করেছেন—যা তাঁদের পরবর্তী জীবনকে ঐশ্বর্যবান করেছে ও নিয়মিত করেছে। আধুনিক যুগের ছোট পরিবারে শেখানোর দায়িত্ব বাবা-মায়ের। আবার বাবার কর্মব্যস্ততার দরুণ সে ভারটা প্রধানতঃ এসে পড়ে মায়ের উপর। কিন্তু মা-ও যদি কর্মব্যস্ত থাকেন এবং তাঁকে প্রায় উদয়াস্ত

বাইরে কাটাতে হয় তাহলে সন্তান পালনের ভার কে নেবে ? ভাবতে হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষার ব্যাপারে কেবলমাত্র মৌখিকভাবে না বলে অডিও-ভিস্যুয়াল এইড স-এরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে-ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ছেলে-মেয়েদের গড়ে তোলার ব্যাপারে টি. ভি এবং সিনেমারও অন্যাধিক ভূমিকা আছে। কিন্তু নির্বিচারে সিনেমা, টি. ভি দেখা অল্পবয়স্কদের পক্ষে কত ক্ষতিকারক তা আমেরিকার মতো 'পারমিসিভ্' সমাজেও প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। ফলে সেখানে কোন কোন বিদ্যালয় থেকে অভিভাবকদের কাছে সার্কুলার গেছে যে, অভিভাবকেরা যেন ছেলেমেয়েদের বেশি টি. ভি না দেখতে দেন। এটা যদিও ঠিক যে, টি. ভি-র ভালমন্দ দুটি দিক আছে, তথাপি ইহাও সত্য যে, 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ'—হাঁস যেমন জলমেশান দুধ থেকে দুধটুকু গ্রহণ করে তেমনি সিনেমা বা টি. ভি-র প্রোগ্রাম থেকে কেবল সারভাগটুকু গ্রহণ করা বয়স্ক মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয় না—অল্পবয়সীদের কা কথা। তাই নির্বাচিত অনুষ্ঠান ছাড়া অন্যসময় ছেলেমেয়েদের সিনেমা, টি. ভি দেখতে দেওয়া অবিধেয়

পত্র-পত্রিকা এবং গল্পের বইও শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় মাধ্যম। কিন্তু এগুলিও সাবধানতার সঙ্গে নির্বাচিত করে ছেলেমেয়েদের পড়তে দেওয়া উচিত এবং ছেলেমেয়েরা পাঠ্যবই ছাড়া অন্য কি ধরনের বই পড়ছে সে বিষয়ে অভিভাবকদের তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। মহাপুরুষদের জীবনী, অমর চিত্রকথার মতো সচিত্র পুস্তক-পাঠ ছেলেমেয়েদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের পক্ষে গভীরভাবে সহায়ক। তাই কেবলমাত্র সায়েন্স ফিক্শন বা গোয়েন্দা কাহিনী পড়া যথেষ্ট নয়। তাদের মধ্যে আদর্শবাদিতার বীজ বপনের এবং আদর্শনিষ্ঠা বিষয়ে জীবন্ত উদাহরণের জন্য রামায়ণ-মহাভারতের মতো পুস্তকপাঠ একটি সর্বোত্তম উপায়। ছেলেমেয়েদের বোধশক্তি ও চৈতন্যের গভীরতা আনয়নের জন্য তাদের কেবলমাত্র 'টেনিদা', 'ঘনাদা'র মতো চরিত্রের সাহচর্যে ফেলে না রেখে রামায়ণের 'লবকুশ', মহাভারতের 'অভিমন্যু', পুরাণের 'ধ্রুব' ও 'প্রহ্লাদ', অতিথির 'তারাপদ' শ্রীকান্তের 'ইন্দ্রনাথ', পথের পাঁচালির 'অপু', এবং অলিভার টুইস্ট ও রবিনসন ক্রুশোর 'অলিভার' ও 'রবিনসনের' মতো ক্লাসিকধর্মী চরিত্রের সঙ্গে মিশতে দিতে হবে।

সন্তানকে মানুষ করতে গেলে স্নেহ ও শাসন দুয়েরই প্রয়োজন। কিন্তু তার কখন কোনটি দরকার এবং কি পরিমাণে দরকার সে ব্যাপারে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার দ্বারা ইতি-কর্তব্য স্থির না করলে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়। আদরের বাড়াবাড়িতেও ছেলেমেয়ে যেমন মানুষ হয় না, তেমনি শাসনের বাড়া-বাড়িতেও সন্তান ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষ হয়, বা আরও উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল হয়। এছাড়া অল্প বয়স থেকে ছেলেমেয়েকে মাত্রাধিক স্বাধীনতা দিলেও অনেক সময় তা অবাঞ্ছিত ফল প্রসব করে। ফলে তাদের পরবর্তী জীবন ভুল পথে চালিত হলেও বাবা-মা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে কখনও কখনও তাঁদের আরও চরম মূল্য দিতে হয়।

ছেলেমেয়েকে মাত্রাধিক শাসন, লঘু-পাপে গুরুদণ্ড তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কারক। শারীরিক নির্যাতনের বাড়াবাড়ি সন্তানের মনে কখন কখন কী তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার একটি বাস্তব উদাহরণ আছে 'মহাস্থবির

জাতক' নামক একটি গ্রন্থে। আত্মজীবনীমূলক এই গ্রন্থটির লেখক প্রয়াত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির)। কাহিনীর নায়কের পিতার নাম মহাদেব শর্মা। মহাদেব শর্মা অত্যন্ত আদর্শবাদী মানুষ। আবার খুব বদরাগী। মহাদেব চান তাঁর ছেলেরা রামমোহন-বিবেকানন্দের মতো আদর্শমানুষ হোক। ছেলেদের দিকে প্রখর তাঁর দৃষ্টি এবং কঠোর তাঁর শাসন। ছেলেদের ভুল হলে, অনেক সময় অকারণেও, তাদের কপালে জোটে বলশালী মহাদেবের হাতে প্রচণ্ড মার। প্রহারে প্রহারে জর্জরিত ও অতিষ্ঠ হয়ে মহাদেবের মেজ ছেলে একদিন ঠিক করল যে, তাকে ব্যায়াম শিখে গায়ে জোর বাড়াতে হবে—যাতে তার বাবা তাকে মারতে এলে চুপচাপ না থেকে সেও বাবাকে প্রতিরোধ করতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যে সত্যিই সে আখড়ায় যেতে শুরু করলো।[৮] অতএব আদরের বা শাসনের আধিক্য কোনটাই কাম্য নয় এবং এ-দুটির সুষম প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। ছেলেমেয়েকে সংশোধন করার পদ্ধতি কি হবে তা স্থান-কাল এবং পাত্রের মানসিক গঠন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। যেমন কখন তাদের মনে মৃদু চাপ সৃষ্টি করে বা তাকে লজ্জা দিয়ে কাজ হাসিল হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় ঘটনাচক্রে একদিন মা ভুবনেশ্বরী দেবীকে কিছু কটু কথা বলেছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত তা জানতে পেরে পুত্রকে কিছু না বলে পুত্রের বসার ঘরের দরজার উপর বড় বড় করে লিখে দিলেন 'নরেনবাবু আজ তাঁর মাকে এই সব বলেছেন।' নরেন্দ্রের বন্ধুরা নরেন্দ্রের ঘরে যতবার যাতায়াত করছিল ততবার সেই লেখা তাদের নজরে পড়ছিল। তীব্র সংবেদনশীল নরেন্দ্রনাথকে এই ঘটনা এত গভীরভাবে লজ্জিত ও হতমান করেছিল যে তা তাঁর পক্ষে একটি সারাজীবনের শিক্ষা হয়েছিল।[৯] অনেক সময় ছেলেমেয়েকে ভালভাবে বোঝালে বা তার বিবেকের কাছে আবেদন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ছেলেমেয়েদের গুণের স্বীকৃতি দিলে ও সমাদর করলে তাদের তা গভীরভাবে উৎসাহিত করে এবং সে নবোদ্যমে স্বীয় জীবনগঠনে প্রস্তুত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন ছোট তখন স্বরচিত কয়েকটি গান একদিন পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শুনিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ খুশি হয়ে বালক রবিকে বলেছিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটি পাঁচশ টাকার চেক্ উপহার দিয়েছিলেন।[১০] পিতার এই উৎসাহদান বালকের মনে যে গভীর প্রেরণার সঞ্চার করেছিল তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পরেও এই ঘটনার সশ্রদ্ধ ও সপ্রেম উল্লেখ করেছেন।

ছেলেমেয়েরা যখন বাড়ি ছেড়ে বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে তখন তারা দুটি প্রভাবের সম্মুখীন হয়। একটি হল তাদের শিক্ষকদের প্রভাব, আর একটি হল তাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রভাব। এই মিলিত প্রভাব তাদের বিকাশের পক্ষে কতখানি সহায়ক হচ্ছে সে বিষয়ে বাবা-মায়ের লক্ষ্য রাখা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা দরকার।

৮ মহাস্থবির জাতক (১ম পর্ব), পৃঃ ১৮৭

৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৩

১০ জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী (১৭শ খণ্ড), পৃঃ ৩১৭

যে বিষয়টির উপর বাবা-মাকে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিতে হয় তা হল তাঁদের নিজেদের আত্মসংযম—প্রবন্ধের ভূমিকাতেই যার ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হয় সন্তানকে তাঁদের দেওয়া শিক্ষার পরিপন্থী কোন আচরণ যেন তাঁরা নিজেরা না করেন, বা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত-শিক্ষার পরিপন্থী সন্তানের কোন আচরণ যেন তাঁরা সমর্থন না করেন। ছেলেমেয়েকে বাবা শেখালেন,—পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবে। কিন্তু তারা যদি দেখে তাদের পিতামহ বা পিতামহীর প্রতি তাদের পিতা বা মাতার আচরণ মোটেই সশ্রদ্ধ নয় বরং তাঁরা অবহেলা ও অনাদরের পাত্র তাহলে তারা তাদের বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবে কি করে? অনুরূপ-ভাবে মা-বাবা যদি প্রতিদিন সকালে দেরিতে শয্যাত্যাগ করেন তাহলে তাঁদের ছেলেমেয়ের ভোরে ওঠার অভ্যাস কি তৈরি হওয়া সম্ভব? 'কথামৃতের' কবিরাজের গল্পটি এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এক কবিরাজ অজীর্ণ রোগে ভুগছে এমন একটি ছেলেকে দেখেশুনে ওষুধপত্রাদি দিয়ে তাকে আর একদিন আসতে বললেন। পরদিন ছেলেটি এলে কবিরাজ একথা ওকথার পর তাকে বললেন, 'ওহে তুমি গুড় খেয়ো না। তোমার পক্ষে গুড় খাওয়া খারাপ।' ছেলেটি চলে যাওয়ার পর কবিরাজের বন্ধু যিনি দুদিনই উপস্থিত ছিলেন কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক হে! ছেলেটি কত দূরে থাকে! প্রথম দিনেই তাকে বললেই হত, গুড় খেয়ো না। তা না করে এই কথাটা বলার জন্য তাকে অতদূর থেকে নিয়ে এলে!' তখন কবিরাজ বললেন, 'তুমি বোঝো না। সেদিন এই ঘরে অনেক গুড়ের কলসী ছিল। তখন যদি ছেলেটিকে বলতাম, গুড় খেয়ো না, সে ভাবত কবিরাজের ঘরে যখন গুড় আছে তখন গুড় জিনিসটা নিশ্চয় অত খারাপ নয়। আজ আমি ঘর থেকে সব গুড় সরিয়ে দিয়েছি। আজ আমার উপদেশ তার দৃঢ় ধারণা হবে।'[১১]

পরিশেষে একটি মৌলিক বিষয় উত্থাপন করে বর্তমান আলোচনার ইতি টানা হবে। বিষয়টি হল পিতা-মাতার সন্তানের প্রতি ভালবাসার যথার্থ স্বরূপ ও ভিত্তি কি হওয়া উচিত, সেই ভালবাসার যথার্থ উদ্দেশ্যই বা কি? মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়—সে তার অস্তিত্বকে প্রসারিত করতে চায় দেশে-দেশান্তরে, যুগে-যুগান্তরে। সে নিজে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। তাই সন্তানের মাধ্যমে তার সে ভূমা-ইচ্ছার কিছুটা পূরণ হয়। সন্তান কথাটির মূল অর্থ তাই বিস্তার। সন্তান পালনের বৈষয়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সন্তান পিতা-মাতাকে তাঁদের বৃদ্ধবয়সে দেখবে, তাঁদের খাওয়া-পরা ও সেবা-শুশ্রূষার ভার নেবে। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ এবং তদ্দ্বারা শাশ্বত শান্তি ও আনন্দলাভ। তাই আদর্শ পিতা-মাতা নিজে যেমন মুক্তিলাভের প্রয়াস পাবেন সন্তানকে তেমনি মুক্তির সন্ধান দেবেন—রাণী মদালসা যেমন তাঁর সন্তানদের দোল দিতে দিতে শেখাতেন, শুদ্ধ অসি, বুদ্ধ অসি, নিরঞ্জন অসি, সংসারমায়াপরিবর্জিতোঽসি—তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরঞ্জন, সংসারমায়া-বর্জিত আত্মা। সন্তানকে মুক্তির সন্ধান দেওয়ার আর একটি উদাহরণ—জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে থেকে সন্ন্যাস পেয়ে মনসা নামে একজন যুবক-ভক্ত আনন্দ করতে করতে যখন গান করছিলেন তা শুনতে শুনতে মামীদের মধ্যে একজন (মাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, 'ঠাকুরঝি ঐ ছেলেটিকে সাধু ক'রে দিলেন।' মায়ের এক ভাইঝি মাকু

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২৬।২

তাতে সায় দিয়ে বললেন, 'তাই বটে, পিসীমার যেমন কাজ! অমন ভাল ভাল ছেলেদের সাধু ক'রে দিচ্ছেন। বাপ মা কত কষ্ট ক'রে মানুষ ক'রে মুখ চেয়ে আছে। তাদের কত আশা! সে সব চুরমার হয়ে গেল। এখন উনি হয় হৃষীকেশে গিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাবেন, না হয় রোগীর সেবায় মলমূত্র ঘাঁটবেন! যে যা করা—সেও তো একটা সংসারধর্ম। ( পিসিমা ) তুমি যদি সবাইকে এরকম সাধু করে দাও মহামায়া তোমার উপর চটে যাবেন।...' মা তখন উত্তরে বললেন, 'মারু, ওরা সব দেবশিশু, সংসারে ফুলের মতো পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের কি আছে বল দেখি? সংসারে যে কি সুখ তা তো দেখছিস। স্বামীসুখও দেখলি।...পবিত্র ভাবটা যে কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না?...'[১২] বাস্তবিক যে-সমস্ত পিতা-মাতা সন্তানের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়প্রকার কল্যাণ চান তাঁরা সন্তানকে কেবলমাত্র ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিনটি পুরুষার্থের কথা বলেন না, চরম পুরুষার্থ 'মোক্ষের' কথাও বলেন।

সন্তান পালনে যেমন একটা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য দরকার তেমনি সন্তানের প্রতি ভালবাসার একটা আধ্যাত্মিক ভিত্তিও দরকার। সেই আধ্যাত্মিক ভিত্তির মূল কথা বৈরাগ্য—'বিষয়ে বিরাগ এবং ঈশ্বরের অনুরাগ।'—এই সংসার, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন সব অনিত্য—ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য; ঈশ্বরই সন্তানাদি দিয়েছেন—তিনিই সন্তানরূপে আমাদের সেবা নিচ্ছেন; তাদের লালন-পালন করার জন্য আমাদের মধ্যে স্নেহ ও সামর্থ্য তিনিই দিয়েছেন। এই বোধে প্রতিষ্ঠিত পিতা-মাতা সন্তানকে যথার্থভাবে লালন-পালন করতে পারেন। বস্তুতঃ বৈরাগ্য-বর্জিত স্নেহ-ভালবাসা কেবলমাত্র মোহের সৃষ্টি করে এবং তা উভয়কেই বদ্ধ করে। এরূপ ভালবাসার ফলে সঞ্জাত হয় প্রথমতঃ, তীব্র আসক্তি, দ্বিতীয়তঃ, তীব্র অধিকার বোধ। তীব্র আসক্তি তথা স্নেহান্ধতার ফলে পিতা-মাতা সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। এই স্নেহান্ধতাকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,/রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি॥'[১৩] মুগ্ধ কথাটি এসেছে মোহ থেকে এবং মোহের অর্থ চিত্তের অন্ধতা। আর সন্তানের উপর তীব্র অধিকার বোধ থেকেই অনেক সময় পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সংঘর্ষ শুরু হয়—শুরু হয় যখন সন্তানের ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হতে আরম্ভ করে এবং তা চরমরূপ পরিগ্রহ করে পুত্রের বিবাহের পর পুত্রের উপর অধিকার নিয়ে মাতার এবং বধূর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক নয় যে, সন্তান-পালনের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য এবং লালনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকার একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে অভিভাবকদের সাগ্রহ সচেতনতা তাঁদের সন্তানদের পক্ষে এবং তাঁদের পক্ষেও যথার্থ শুভঙ্কর হয়ে উঠবে—নচেৎ প্রভূত ক্ষতি এবং 'মহতী বিনষ্টিঃ'।

১২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা ( ২য় ভাগ ), পৃঃ ২২৪-২৫
১৩ বঙ্গমাতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা ১৩৫৬ সংস্করণ, পৃঃ ২৮০

# পাব বলে

**শ্রীকৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী**

তোমার ভাবের প্রতাপ দেখি
জগতের মাঝে,
তুলেছি তোমায়, বুঝেছি এসে
জীবনের সাঁঝে।
রূপের মাঝে অরূপ তুমি—
সাকার নিরাকার,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আছ
মাঝে সবাকার।
সীমার মাঝে অসীম তুমি—
শক্তিরূপিণী মায়া,
মরণরূপে জগতে তুমি
জীবনরূপী কায়া।

করুণা তোমার প্রকাশিছে আজি
বিশ্ব সংসারে,
পাপীরে তুমি করেছ ক্ষমা
ভ্রম শোধিবারে।
জীবন শেষে ইচ্ছা জাগিছে
তোমায় পাইবার,
দিশাহারা আজ, হারিয়েছি পথ
কাছে যাইবার।
কবিতার মাঝে পাবার আশায়
কলম ধরেছি,
দূরে থেকে তবু আজ
হারিয়ে পেয়েছি।

# এই পাখি ওই পাখি

**স্বামী আত্মপ্রভানন্দ**

এই পাখি
বকুলের দোলানো শাখায়,
মেলে দেয় ছোট দুই পাখা,
উড়ে ফেরে, হেথা হোথা,
এ ডাল ও ডাল হয়ে, মাটি ছুঁয়ে
ফিরে আসে
আনচান আবছায় পিউ পিউ গান গায়।
ওই পাখি আগডালে উদাসীন,
বসে আছে অমুখন নিরালায়॥

* * *

এই পাখি জাল বোনে স্বপনের,
সুর তোলে জীবনের মরণের ;
সে-সুর বেদনা হয়ে ছেয়ে থাকে মনের
আকাশ।
সে-গান ভিজিয়ে দেয় শুকনো বাতাস।

কোন দিন জোছনা পরশে—
ক্ষণিকের গ্লানি ভুলে শিস দেয়
মনের হরষে,
খুশির জোয়ারে ভাসে, দেয় ডাক।
ওই পাখি দেখে আর শোনে
আর নির্ভয়ে বসে থাকে নির্বাক॥

* * *

এই পাখি পৃথিবীর মায়াতে,
আশা নিয়ে বাসা বাঁধে,
বসে থাকে ছায়াতে।
হাসি আর কান্নার রশি ধরে দোল খায়,
দোল খায় সারাদিন।
ওই পাখি উজ্জ্বল মহিমায়,
চেতনার অনুভব গরিমায়
অনিন্দ্য অপরূপ চিরদিন॥

# মনুষ্যত্বলাভের সাধনা ও মুক্তি

শ্রীমতী অণিমা সেনগুপ্ত

বৈদিক ঋষি বর্ণিত মুক্তির সাধনাকে মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তিরই এক মহৎ প্রয়াস বলে আমরা বর্ণনা করতে পারি। মানুষের জীবনকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করে মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করাই হল বৈদিক মুক্তি-সাধনার বিশেষ লক্ষ্য। কারণ, পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অধিকার লাভ করে। পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করলেই সাধক ব্রহ্মজ্যোতির আলোকে নিজেকে চিন্ময়রূপে উপলব্ধি করার সামর্থ্য অর্জন করেন। এই মানুষ হবার সাধনায় (বৈদিক মতে) প্রাথমিক প্রয়োজনই হল অন্তরে নীতিবোধকে জাগ্রত করা। নীতিবোধই মানুষের অমূল্য-সম্পদ, যা তাকে মানুষের সম্মান প্রদান করেছে এবং অন্যান্য জীব হতে পৃথক করে সংসারে তার শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত করেছে। নৈতিকতার সচেতন অনুশীলন যেখানে নাই, সেখানে মানব-জীবনের কোন মহিমাই প্রকাশ পায় না। নীতিধর্মই মনুষ্যসমাজের দৃঢ় ভিত্তি। মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত মানব-জীবনই কেবল মনুষ্যসমাজে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বহন করে আনতে পারে। মানব-কল্যাণের জন্য জৈবপ্রবৃত্তিকে সমাজজীবনে সংযত করা প্রয়োজন। এজন্য আহুতি দিতে হবে সমস্ত সংকীর্ণ ও অকল্যাণকর জৈব ভাবনারাশিকে। তবেই মনুষ্য-জীবনের পরিপূর্ণতা প্রকাশের পথ পরিষ্কার হবে।

মনুষ্যত্বলাভের এই সাধনার মূল লক্ষ্য হল জ্ঞান ও প্রেমের তপস্যা যারা মনকে সমস্তরকম সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা ও বিচ্ছিন্নতায় বাধা হতে মুক্ত করা এবং সত্যকে যথার্থরূপে আপন অন্তরে গ্রহণ করা। সত্যকে আপন চরিত্রে সুদৃঢ় করে প্রতিষ্ঠা করার শক্তি যিনি অর্জন করেছেন, তিনিই বিশ্বনিখিলের সঙ্গে জ্ঞানে ও প্রেমে একত্ব অনুভব করে বিরাট হয়েছেন। তাঁর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হতে উৎসারিত শুদ্ধজ্ঞান এবং নির্মল উদার প্রেম তখন সকলের কল্যাণের জন্যই প্রবাহিত হয়। শুদ্ধ ও নির্মল আদর্শে বিশ্বাসী, নির্ভীক, জ্ঞানী ও মানবিক হৃদয়বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ মহান ব্যক্তি কেবল জীবনকেই উন্নত করেন না, তিনি সকল মানুষের জীবনে, সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিজের কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করে জগতের কল্যাণযজ্ঞে নিজেকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন।

নীতিধর্ম অনুশীলন দ্বারাই কেবল মানুষ তার সাংসারিক জীবনকে সংসারের বিবিধ ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ জীবনরূপে গড়ে তুলতে পারে এবং এই শুচিশুভ্র সংসারজীবনই একদিন মহামুক্তির ভাস্বর আলোকে ঝলমল করে ওঠে। মুক্তি কেবল সন্ন্যাস-জীবনেরই লক্ষ্য নয়। মনুষ্যত্বের বিশালতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমস্তরকম সঙ্কীর্ণতা ও মলিনতা হতে নিজেকে মুক্ত করে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে বৃহৎ হওয়া সাংসারিক মানুষের জন্যও একান্ত আবশ্যক। মানুষ যতক্ষণ তার হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্মপ্রেরণাকে সঙ্কীর্ণ মলিনতায় আবৃত করে রাখে, তার নীতিবোধকে উদ্বোধিত করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেবার বাস্তবিক অধিকার ও গৌরব থাকে না। স্বার্থপর মানুষই বন্ধনের কবলে থাকে; কারণ স্বার্থকেন্দ্রিক দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলে এরা এদের জ্ঞান, প্রেম ও কর্মকে বিশ্বজগতে মুক্ত করে দিতে পারে না। এই বন্ধনের উর্ধ্বে ওঠার জন্যই প্রত্যেকটি মানুষকে প্রয়াস করতে হবে। সেজন্য বন্ধন হতে মুক্তিই

মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে বৈদিক দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। সংসার বৈদিক দৃষ্টিতে তুচ্ছ নয়; সংসারি-জীবনও তুচ্ছ নয়, যদি তাকে ঠিক ভাবে গড়ে তোলা যায়, যদি সংসার-যাত্রাকে এক শুভ আকর্ষণে বেঁধে রাখা যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারী মানুষকে জনক রাজার উপদেশ দিয়ে বলতেন:

"জনক রাজা মহাতেজা
তার বা কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে,
খেয়েছিল দুধের বাটি।"
(কথামৃত, ১।২।৬, ৫।৮।২)

সংসারী ভক্তদের তিনি বলতেন: "সত্যি বলছি তোমরা সংসার করছো, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে রাখো।" (ঐ, ১।২।৫)

বৈদিক মনীষীগণ সংসারকে তুচ্ছ করেননি, নস্যাৎ করেননি। অখণ্ড চৈতন্যসত্তা বিশ্বাতীত এবং বিশ্বানুগ। এই সত্তা বিশ্বের অতীত আবার বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। একদিকে তিনি নেতি নেতি; অন্য দিকে তিনি ইতি ইতি। তিনি কেবল নীরূপ নন, বিশ্বরূপও। উপনিষদ্ বলছেন:

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্।" (ঈশোপনিষদ্-১) তিনিই যে বিশ্বরূপেও বিরাজ করছেন। বিশ্ব-সংসার হতে তবে মানুষ কেমন করে পালাবে? তাই আবার বলছেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" (ঐ) আত্মানুভূতির পরিপোষক ভাবনা দ্বারাই জগতকে উপভোগ্য করে তুলতে হবে।

মানুষ সংসারধর্ম পালন করবে, কিন্তু সংসারধর্ম পালন করার জন্য মানুষকে মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণের অধিকারী হতে হবে এবং সকল জৈবসংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য সাধনা করতে হবে। অনাসক্ত হৃদয়, শুদ্ধ দৃষ্টি এবং নির্মল মন নিয়ে সংসারে প্রবেশের সাধনাই হল বৈদিক দৃষ্টিতে মানুষের চিরন্তন জীবন-সাধনা। সকল মানুষের কল্যাণ-সাধনের মধ্য দিয়ে নিজের কল্যাণসাধনের চেষ্টাই মানুষের স্বধর্ম। সমস্ত জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে এই মনুষ্যধর্ম পালন করতে হবে এবং ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হবে; শুদ্ধ করতে হবে।

মানুষের ধর্মই হল তার অন্তর্জীবনকে এবং বাইরের জীবনকে এক সুসামঞ্জস্য সূত্রে আবদ্ধ করে পরম আনন্দের সঙ্গে পরম শ্রেয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। বৈদিক মুক্তি-সাধনায় ধর্মের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। মানব-জীবনের সকল দিকই ধর্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত। অতএব সংসারী মানুষের নৈতিক জীবন ও সামাজিক জীবন ধর্মের সূত্রে গাঁথা। সংসারী মানুষকেও তার গৃহস্থ-জীবনটি এক দায়িত্বপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করতে হবে। এলোমেলো দায়িত্বহীন জীবন শেষ পর্যন্ত অবসাদ ও অর্থহীনতায় পরিসমাপ্ত হয়। সেজন্য বৈদিক ঋষিগণ মানুষের দৈনন্দিন সংসার-জীবনকেও সংযম ও শৃঙ্খলা দ্বারা আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষীও জীবন-ধারণ করে, কিন্তু মনন করে না। সেইজন্য তাদের জীবন মনুষ্যজীবন অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু মানুষ মনন দ্বারাই অন্য সব প্রাণীকে অতিক্রম করে। তার এই মননশীল জীবনেই মনুষ্যত্বের প্রস্ফুরণ হয়। সুতরাং মনুষ্যত্বের সাধনাই মুক্তির সাধনা, কারণ পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি অথবা ঈশ্বরসংলগ্নতার আর বিলম্ব থাকে না। সেইজন্যই বৈদিক দর্শনে উপদেশ করা হয়েছে যে প্রতিটি মানুষ যেন মুক্তিকে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে লক্ষ্য মুখে অগ্রসর হয়।

মনুষ্যত্বের সাধনাই নানাপ্রকার বিভেদবুদ্ধি ও অহঙ্কার হতে মুক্তিলাভের সাধনা, যে-সাধনার ফলে নিজের চেতনাকে সর্বজনের অন্তরে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। সমস্ত বিশ্ব ও বিশ্ববিধাতার সঙ্গে মানুষের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তার জ্ঞান যথার্থভাবে প্রাপ্ত হলেই হৃদয়ের সকল সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে যায় এবং হৃদয় হয় বিশাল ও নির্মল। মানুষের ব্যক্তিত্ব তখন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মহিমায় রস-সিক্ত হয়ে অপরূপ মাধুর্যে প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি যদিও মানুষের জীবনের ব্যবহারিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত, তথাপি এ-সকলেরও একমাত্র উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব প্রাপ্তিতে সর্বপ্রকারে মানুষের সহায়ক হওয়া। অর্থাৎ মানব-মুক্তির সাধনা মানব-জীবনের বিভিন্ন স্তরে মানব-জীবনের উষা হতে অস্ত পর্যন্ত চলবে। এ-সাধনা হল পরম জ্যোতিকে দর্শন করার সাধনা, পরম সত্যকে আবিষ্কার করার সাধনা, পরম প্রেয়কে হৃদয়ে উপলব্ধি করার সাধনা। এ-সাধনা সহজ নয়। এ-সাধনা মানসিক বল সাপেক্ষ। মুক্তির এই নিরলস সাধনার কথা উল্লেখ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "বাসনা, অজ্ঞান ও ভেদদৃষ্টি—এই তিনটিই বন্ধন। জীবনে অনাসক্তি, জ্ঞান ও সমদর্শিতা—এই তিনটিই মুক্তি। মুক্তিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ্য।" (বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭।১৩০) যে-সাধক সাধনা দ্বারা নিজের আত্মার সমুজ্জ্বল মহিমা ও সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁরই সকল মোহপাশ ছিন্ন হয়েছে এবং মুক্তি হয়েছে তাঁরই জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক সম্পদ।

# ক্রীড়নক

শ্রীসুকুমার নাগ

অসীম বিশ্বে যা-কিছু মহৎ
সুন্দর মহা-মহীয়ান।
সৃষ্টিকর্তা বিধাতা পুরুষ
সেখানেই করেন অধিষ্ঠান
যা-কিছু সত্য, তাই জানি শিব
বিপুল এ বিশ্বমাঝে।
সে-পথ ত্যজিয়া জীবন পথের
পরিক্রমা নাহি সাজে॥

আত্মশুদ্ধি বিবেকবুদ্ধি
জাগ্রত হলে জীবনে।
পরমানন্দে কাটিবে জীবন
স্বর্গ নামিবে ভুবনে॥
কর্মযোগের বর্ম আঁটিয়া
ধর্ম হইলে নিয়ামক।
মানব-জীবন সার্থক হবে
হবো না রিপুর ক্রীড়নক॥

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে কবিত্ব

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পাঁচটি খণ্ডে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ রচনা করেছেন। লীলাপ্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিসঞ্জাত শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকাহিনী। সমগ্র গ্রন্থখানি তৎকালে সুপ্রচলিত সাধু ভাষায় লিপিবদ্ধ। গভীর ভাবপূর্ণ লীলাকাহিনী অধিকাংশ স্থলেই গুরুগম্ভীর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি এই গদ্য রচনাটির মধ্যে অনেকস্থলে রচয়িতার কবিত্ব প্রকাশিত রয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর বর্ণনা কবিতার মতো সুখস্পর্শ সঞ্জীবনীশক্তি অর্জন করেছে। সাধু গদ্যেও যে ভাব কবিত্বপূর্ণ প্রবহমানতা অর্জন করতে পারে তা যেমন বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি লীলা-প্রসঙ্গের বিভিন্ন অংশেও লক্ষ্য করে পাঠক মুগ্ধ হবেন। উপন্যাসের পরিবেশ ও বিষয়বস্তু সহজেই কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার সহায় হয়ে ওঠে, কিন্তু লীলা-প্রসঙ্গের মতো জীবনদর্শনবর্ণনাকারী গ্রন্থে সে সুযোগ কম। তথাপি পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ স্বাভাবিক ভাবেই অনেক স্থলে কবিত্বের সৃষ্টি করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

"অবতার পুরুষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি" বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "তাঁহারা বলেন, সনাতন সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম যখন কালপ্রভাবে গ্লানিযুক্ত হয়, যখন মায়া-প্রসূত অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহকাল এবং পার্থিব ভোগসুখলাভকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞানপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে এবং আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয়, নিত্য পদার্থ সকলকে কোন এক ভ্রমান্ধ যুগের স্বপ্নরাজ্যের কবিকল্পনা বলিয়া ধারণা করিয়া বসে—যখন ছলে-বলে-কৌশলে পার্থিব সর্ব্বপ্রকার সম্পদ ও ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিয়াও সে প্রাণের অভাব দূর করিতে না পারিয়া অশান্তির অন্ধ-তমসাবৃত অকূল প্রবাহে নিপতিত হয় এবং যন্ত্রণায় হাহাকার করিতে থাকে—তখনই শ্রীভগবান স্বকীয় মহিমায় সনাতন ধর্ম্মকে রাহুগ্রাসমুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলেন এবং দুর্ব্বল মানবের প্রতি কৃপায় বিগ্রহবান হইয়া তাহার বক তাহাকে পুনরায় ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত করেন।"[১]

সুদীর্ঘ এই পূর্ণ বাক্যটিতে বক্তার ভাব তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে এবং সেই তরঙ্গের মধ্যে চন্দ্রিমার ঔজ্জ্বল্য সঞ্চারিত করেছে সুসমঞ্জস শব্দ-প্রয়োগে সৃষ্ট অনুপ্রাস ধ্বনি—বিশেষভাবে যখন আমরা পড়ি, 'অজ্ঞানের অনির্বচনীয় প্রভাবে' এবং 'অশান্তির অন্ধ তমসাবৃত অকূল প্রবাহে' এই দুটি বাক্যাংশ। দ্বিতীয় বাক্যাংশটিতে কবি-সন্ন্যাসীর গভীর কল্পনা ভাবকে প্রবাহিত করেছে গভীর দ্যোতনায়।

কথামৃতে যেমন মাঝে মাঝে পরিবেশকে মানসনয়নে প্রত্যক্ষবৎ করে তুলতে আবেগপূর্ণ ও কবিত্বময় বর্ণনা দেখতে পাই, লীলাপ্রসঙ্গেও তেমনি। লীলাপ্রসঙ্গের চতুর্থখণ্ডে গ্রন্থকার "অঘোরমণির অলৌকিক বালগোপাল মূর্তি দর্শনের অবস্থা" বর্ণনা করতে গিয়ে বসন্তের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটি অতি সংক্ষিপ্ত হলেও তার কবিত্বপূর্ণ উপস্থাপনা পাঠকমনকে স্পর্শ করে। বর্ণনাটি এরকম :

"১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ—শীত ঋতু অপগত হইয়া কুসুমাকর সরস বসন্ত আসিয়া উপস্থিত। পত্র-

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, একাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৯-১০

পুষ্প-গীতিপূর্ণ বসুন্ধরা এক অপূর্ব্ব উন্মত্ততায় জাগরিতা। ঐ উন্মত্ততার ইতরবিশেষ নাই—আছে কিন্তু জীবের প্রবৃত্তির। যাহার যেরূপ সু বা কু প্রবৃত্তি ও সংস্কার, তাহার নিকট উহা সেই ভাবে প্রকাশিত। সাধু সদ্বিষয়ে নব-জাগরণে জাগরিত, অসাধু অন্যরূপে—ইহাই প্রভেদ।"[২]

গোপালের মার অন্তিম মুহূর্ত ও শেষকৃত্যের বর্ণনা করতে গিয়েও প্রবন্ধকার কবিমনের পরিচয় রেখেছেন। গোপালের মায়ের পবিত্র সাধিকা-জীবনটি পাঠকের মনকে সর্বক্ষণের জন্যই মমত্বের আকর্ষণে জড়িয়ে রাখে। তাঁর সহজ ভক্তপ্রাণের ভালবাসার কথা আমাদের অন্তরকে ভরিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। তারপর যখন তাঁকে হারিয়ে ফেলার কথায় আসি আমরা তখন স্বভাবতঃই হৃদয় অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে। লেখকও সম্ভবতঃ তাঁর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হৃদয়েও আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের মতোই বেদনার দোলা অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর লেখনীতে বর্ণনাটি ভাবের বিহ্বলতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে অনেকটা। তিনি বর্ণনা করেছেন :

"১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই অথবা সন ১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উদীয়মান সূর্য্যের রক্তিমাভায় যখন পূর্ব্বগগন রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে এবং নীলাম্বর তলে দুই-চারিটি ক্ষীণপ্রভ তারকা ক্ষীণজ্যোতিঃ চক্ষুর ন্যায় পৃথিবী-পানে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, যখন শৈলসুতা ভাগীরথী জোয়ারে পূর্ণা হইয়া ধবল তরঙ্গে দুই কূল প্লাবিত করিয়া মৃদু মধুর নাদে প্রবাহিতা, সেই সময়ে গোপালের মার শরীর সেই তরঙ্গে অর্দ্ধনিমজ্জিতাবস্থায় স্থাপিত করা হইল এবং তাঁহার পূত প্রাণপক্ষ শ্রীভগবানের অভয় পদে মিলিত হইল ও তিনি অভয়ধাম প্রাপ্ত হইলেন।"[৩]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন এ-ধরায়, পরম করুণায়, মানুষকে বিভেদবুদ্ধি থেকে সমন্বয়ের সুস্থ চিন্তায় উন্নত করতে, মানুষকে সংসারার্ণবের ভীম ভবানলের দাহ থেকে মুক্ত করে চির-শান্তিতে অধিষ্ঠিত হবার পথ দেখাতে। লীলা-প্রসঙ্গকার তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে সে-কথা বলতে গিয়ে তাঁর হৃদয়কে ভাবান্দোলনে দুলিয়েছেন, ব্যক্তিগত সেই সত্য উপলব্ধির কথা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত করতে গিয়ে তিনি কবিত্বের ব্যঞ্জনায় তাঁর বক্তব্যকে রঞ্জিত ব্যঞ্জিত করেছেন। বর্ণনাটি এরকম :

"ফুল ফুটিল। দেশদেশান্তরের মধুপকুল মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে আসিল। রবিকরস্পর্শে নিজ হৃদয় সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া ফুল্লকমল তাহাদের পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করিতে কৃপণতা করিল না। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-সংস্পর্শমাত্রহীন ভারতপ্রচলিত কুসংস্কারখ্যাত ধর্ম্মভাবে গঠিত জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্ম্মমধু আজ জগৎকে দান করিলেন, তাহার অমৃত-আস্বাদ জগৎ পূর্ব্বে আর কখনও কি পাইয়াছে? ...পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বায়ুসঞ্চরণের ন্যায় সভ্য হইতে সভ্যান্তরে সঞ্চরণ করিয়া মনুষ্যজীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপরিবর্ত্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে গমন করিতেছে এবং একদিন না একদিন সেই অনন্ত অপার অবাঙ্মনসোগোচর সত্যের নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া পূর্ণকাম হইবে—এ অভয়বাণী মনুষ্যলোকে পূর্ব্বে আর কখনও কি উচ্চারিত হইয়াছে?"[৪]

"মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাহ্মোৎসব"

২ ঐ, ৪র্থ খণ্ড, দশম সংস্করণ, পৃঃ ২৬৯
৩ ঐ, পৃঃ ৩১০
৪ ঐ, পৃঃ ৩০০-৩১

বিষয়ক অধ্যায়টির প্রারম্ভেই হেমন্তকালের শেষ ভাগের একটি বর্ণনা আছে। স্বামী সারদানন্দ যে কবিহৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় ঐ সংক্ষিপ্ত অথচ সরস বর্ণনাটুকুতে বিধৃত রয়েছে। কবিসন্ন্যাসীর মানসদৃষ্টি ধরিত্রীকে জননীর মূর্তিতে সাজিয়েছে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের বেশ মনে আছে সেটা হেমন্তকাল; গ্রীষ্মসন্তপ্তা প্রকৃতি তখন বর্ষার স্নানসুখে পরিতৃপ্তা হইয়া শারদীয় অঙ্গরাগ ধারণপূর্ব্বক শীতের উন্মেষ অনুভব করিতেছিল এবং স্নিগ্ধ শীতল নিজাঙ্গে সযত্নে বসন টানিয়া দিতেছিল। হেমন্তেরও তিন ভাগ তখন অতীতপ্রায়।"[৫]

অবসিতপ্রায় হেমন্তের এমনি দিনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযুক্ত মণিমল্লিকের বৈঠকখানায় কীর্তনানন্দে বিভোর। 'ঠাকুরের অপূর্ব নৃত্যে'র বর্ণনা দিতে গিয়ে লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন:

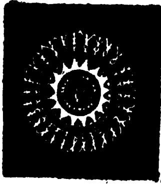
"অপূর্ব্ব দৃশ্য! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা ঐরূপে পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিতেছেন এবং ঐরূপে যখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াসগমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতিঃ ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্য্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি, বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই; আছে কেবল আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য্য ও উদ্দমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি! নির্ম্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখন ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর—ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গসংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন।"[৬]

দীর্ঘ হলেও লীলাপ্রসঙ্গের এই উদ্ধৃতিটির উল্লেখ করা হল। কারণ এই বর্ণনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাববিগ্রহের যে স্বর্গীয় ছবি পরিবেশিত দেখতে পাই তার অঙ্কনপ্রতিভার পশ্চাতে রয়েছে ক্রান্তদর্শীর ধ্যানদৃষ্টি এবং শক্তিশালী স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি।

৫ ঐ, ৫ম খণ্ড, দশম সংস্করণ, পৃঃ ২৭
৬ ঐ, পৃঃ ৩১

## ভ্রমসংশোধন

গত আষাঢ় ( ১৩৯৪ ) সংখ্যায় ৩৪১ পৃষ্ঠার পাদটীকার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'রাজস্থানের' স্থলে 'গুজরাটের' পড়তে হবে।—সঃ



# অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

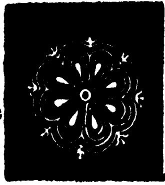
অজ্ঞ

## জাগরণ

একটি পথিক পথশ্রমে কাতর হইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন গোধূলির আলো অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। অবিলম্বে সন্ধ্যারাণী আঁধার অঞ্চলে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। নিস্তব্ধ রজনী। সকলের নয়নান্তরালে কালো কালো মেঘ আসিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল। দামিনী চমকিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণ ও ভীষণ ঝঞ্ঝা পাত আরম্ভ হইল। কিন্তু পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। ক্রমে নিশা শেষে উষার আলোক পথিকের চোখে, মুখে আসিয়া পড়িল। শিশু রবি মায়ের কোল ছাড়িয়া গগনাঙ্গনে খেলিতে আসিল, কিন্তু পথিক জাগিল না। নির্ঝরিণী মৃদুস্বরে বলিল, "পথিক জাগ"। পক্ষিগণ কলরব করিয়া ডাকিল, "পথিক জাগ"। ফুলগুলি পথিকের অঙ্গে ঝরিয়া বলিল, "বন্ধু জাগ", কিন্তু পথিক জাগিল না, ক্রমে বেলা বাড়িল। রবি কিরণ অগ্নিবাণের ন্যায় পথিককে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বসুন্ধরা উত্তপ্তা হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিল। বায়ু অনল-শ্বাসে তাহার সর্বাঙ্গ ঝলসিয়া দিল, কিন্তু পথিক জাগিল না। সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিল। পাখিগণ কুলায় আসিয়া ব্যথিত কণ্ঠে আবার বলিল "পান্থ জাগ"। চাঁদ আকাশ হইতে ডাকিল, "সখা জাগ"। নক্ষত্রবালা নীরব ভাষায় বলিল, "ভাই জাগ", পথিক তবুও জাগিল না।

জননী পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। পুত্র আসিল না। তিনি উদ্বিগ্ন অন্তরে, আকুল নয়নে পথপানে চাহিলেন—পুত্রকে দেখিলেন না। নিবিড় অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া আসিল। জননী আর থাকিতে পারিলেন না। পাগলিনীর মত তিনি পথে পথে ছুটিলেন। বহুদূর আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার নয়ন-মণি ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। পুত্রের মাথায় হাত দিয়া জননী কাঁদিয়া ডাকিলেন, "বাবা জাগ"! সেই করুণ-কোমল-কর স্পর্শে পথিকের নিদ্রাচ্ছন্ন নয়ন দুটি ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল। পুত্র অবাক্ হইয়া দেখিল—সে কেমন করিয়া কখন্ মায়ের কোলে আসিয়া পড়িয়াছে।*

* 'উদ্বোধন' ২৭ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।



# পুরাতনী

ব্রহ্মচারী সনৎকুমার

## অমর উপাখ্যান

সীতার সন্ধানে মহাবীর হনুমান লঙ্কাপুরীতে এসে প্রথমে রাক্ষসদের হাতে বন্দী হলেন। পরে নানাভাবে উৎপীড়নের পর লেজে আগুন লাগিয়ে যখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল, তখন লঙ্কাপুরীতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে আর সীতার সন্ধান নিশ্চিতভাবে জেনে নিয়ে তিনি কিষ্কিন্ধায় রামের কাছে ফিরে গেলেন।

এদিকে সামান্য এক দূতের এমন বিস্ময়কর কাণ্ড দেখে লঙ্কাধিপতি পড়লেন মহা দুশ্চিন্তায়। কারণ, তিনি জানতেন সীতাহরণের সংবাদ উৎপীড়িত এই দূতের মাধ্যমে রাঘবের কাছে পৌঁছিলেই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবেন। আর তিনি লঙ্কা আক্রমণ করলে কার সাধ্য তাঁর গতি রোধ করে!

রাবণের এই চরম হতাশা লক্ষ্য করে সহোদর কুম্ভকর্ণ ক্রোধে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন: "আমি আগেই জানতাম যে, এই অন্যায় ও পাপ কর্মের ফল কী ভয়ানক হতে পারে। আপনার এই দুষ্কর্মের জন্য রামচন্দ্র যদি অনেক আগেই আপনাকে বধ করতেন তাহলেও সেটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা হত সন্দেহ নেই। তবে আপনি যখন এখনও জীবিত এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আগ্রহী, আমি অবশ্য আপনাকেই জয়ী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

কুম্ভকর্ণের কথায় রাবণ রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে অন্যান্যদেরও মতামত চাইলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ, বজ্রহনু, নিকুম্ভ, দুর্মুখ প্রমুখ মহাবীরগণ সকলেই দশাননকে উৎসাহিত করে জানালেন, যদিও তাঁরা জানেন যে, এই যুদ্ধ নিঃসন্দেহে অন্যায়-যুদ্ধ এবং ধর্মবিরুদ্ধ তথাপি তাঁরা প্রত্যেকেই রাবণের হয়ে মরণপণ করে যুদ্ধ করবেন। আর যুদ্ধে রাবণের জয়লাভ যে নিশ্চিতভাবে ঘটবেই সোৎসাহে তাঁরা সকলেই এই আশ্বাসও রাবণকে দিলেন। বলা বাহুল্য, ভাবী জয়ের স্বপ্ন রাবণকে কিছুটা সাহসী করে তুলল। মনে মনে এখনই যেন তিনি বিজয়গর্বে গর্বিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। পরে তিনি আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণের মতামত জানতে চাইলেন।

অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, বিবেচক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিভীষণ ধীরভাবে বললেন: "রাম যখন রাক্ষস-দের কোনভাবেই অপমান করেননি তখন নিরপরাধ সীতাকে হরণ করা এবং তাঁকে উত্ত্যক্ত করা কোনভাবেই উচিত হয়নি বলেই আমি মনে করি।"

ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে রাবণ বললেন: "তা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু এই চরম বিপদের মুহূর্তে এসব চিন্তা করার অবসর কোথায়? তুমি এখন কিভাবে আমাকে সাহায্য করে রাজ্য আর রাক্ষসকুল রক্ষা করবে তাই বল।" বিভীষণ আবার বললেন: "রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লঙ্কাপুরীর শ্রেষ্ঠ বীরেরা কেউই যথেষ্ট নয়। সুতরাং এই যুদ্ধের ফলে যে অনিবার্যভাবে অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে তা আমি এখনই অনুমান করতে পারি।"

এবার রাবণ রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে বিভীষণকে

বললেন: "কাপুরুষ! তাহলে তুমি যুদ্ধ করতে ভয় পাও? তুমি কি জান না, ইন্দ্রজিৎ, নিকুম্ভ ও কুম্ভকর্ণাদি মহাবীরেরা অসংখ্য রাক্ষসসেনা নিয়ে অচিরেই রামের বানর সেনাদের ধ্বংস করবে? আর আমিই স্বয়ং এই যুদ্ধে উপস্থিত থেকে রাঘবের মুণ্ডচ্ছেদন করে সমূলে শত্রুনাশ করব? ভীরু! পরাজয়ের কথা তুমি কি করে ভাবতে পার?"

বিভীষণ বিনম্রভাবে বললেন: "আপনি আমার জ্যেষ্ঠ এবং পূজনীয়, আপনাকে বিব্রত করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়, তা আমি জানি। তাছাড়া আপনাকে উপদেশ দেওয়াও আমার পক্ষে নিতান্তই ধৃষ্টতা। তবুও এই বিপদের প্রাক্কালে যা বলছি যদি অনুগ্রহ করে শোনেন তাতে আপনার মঙ্গলই হবে। হে অগ্রজ! বৃথা ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই বলছি যে, এই মুহূর্তে লঙ্কাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় সীতাকে রামের হাতে প্রত্যর্পণ করা। কারণ মহাবলশালী রাম দেবতুল্য পুরুষ এবং মহা ধার্মিক। আপনি তাঁর স্ত্রীকে হরণ করে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছেন আবার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অন্যায়ভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যারা আপনাকে এই যুদ্ধে সহায়তা করতে চলেছে তারাও ধর্মভ্রষ্ট হয়ে আপনার অন্ধ অনুসরণ করছে মাত্র। আপনার তোষামোদকারী ঐ পারিষদবর্গ অচিরেই বুঝতে পারবে কী ভয়ানক পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে তারা নিজেদের এবং রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ত্রিলোকে আপনি যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করুন না কেন, রামের হাত থেকে আপনার পরিত্রাণ নেই। তাঁর হাতে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। লঙ্কাপুরী তো দূরের কথা রাক্ষসকুল সবংশে ধ্বংস হওয়ার অশুভ সংকেত আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমি আবার বলছি এই ভীষণ অধর্ম-যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে হলে এখনই সীতাকে রামের হাতে প্রত্যর্পণ করে সমূহ বিপদ দূর করুন। ধর্মাশ্রয়ী হয়ে রাজ্য, বংশ এবং নিজেকে রক্ষা করুন।"

রক্তচক্ষু রাবণ এবার সিংহাসন ছেড়ে সক্রোধে উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন: "পাষণ্ড! তুচ্ছ ধর্মভয়ে ভীত হয়ে আমি কিনা কাপুরুষের মতো সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেব? সহোদর হয়েও একথা ভাবতে তোমার এতটুকু কুণ্ঠা বোধ হল না? জাতির স্বভাব আমার ভাল করেই জানা আছে। বুঝেছি, আসলে আমার বৈভব, লোকখ্যাতি আর শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় তোমার সহ্য হচ্ছে না। অন্তরে ঈর্ষার আগুন প্রজ্জ্বলিত বলেই তুমি বৃথা যুক্তিজাল বিস্তার করে আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলছ। প্রতারক! আমি জানি বরং শত্রুর অথবা বিষধর সাপের সঙ্গে বাস করাও শ্রেয়, তবু মিত্রনামধারী অথচ শত্রুপক্ষ সমর্থনকারীর সাথে বাস করা কখনও উচিত নয়। রাক্ষসবংশ-সম্ভূত হয়েও রাজধর্ম পালনে সহায়তা না করার ফন্দি করে তুমিই ধর্মভ্রষ্ট—আমি নই। বংশের কুলাঙ্গার, তুমি মহা অধার্মিক! শেষবারের মতো সুযোগ দিলাম, এখনও ভেবে দেখ সামনে শত্রু, পিছনে রাজ্য এবং আত্মীয় পরিজন। এই চরম বিপদের দিনে কাপুরুষের মতো পিছিয়ে যাবে অথবা রাজধর্ম পালন করতে প্রয়োজন হলে মৃত্যুকেও বরণ করে জীবন ধন্য করবে।"

বিভীষণ ক্রুদ্ধ রাবণের সামনে নতজানু হয়ে করজোড়ে বললেন: "মহারাজ, আমি জানি, ভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত ব্যক্তি কখনও হিতবাক্য শোনে না। সীতাহরণ-পাপে লিপ্ত হয়েছেন কেবলমাত্র আপনার দুর্বিনীত চরিত্রের পাশব প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার কামনাতেই। আর সেই অন্যায় কামনার চরিতার্থতার জন্যই এই যুদ্ধ করতে

আপনি আগ্রহী। সুতরাং রাজধর্ম পালনের কর্তব্যবোধে এই যুদ্ধ নয়। আপনার ব্যক্তিগত এবং কুৎসিৎ আকাঙ্ক্ষা সার্থক করার কূটকৌশল মাত্র। আমার বিবেচনায় জীবন যদি দিতেই হয় তাহলে ন্যায়, সত্য ও ধর্মের জন্য দেওয়াই ভাল। ধর্মের জন্য প্রয়োজনে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করাই শ্রেয়। আপনি লঙ্কাপুরী ও নিজেকে রক্ষা করুন আমি যাচ্ছি।"

এই বলে বিভীষণ স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ত্যাগ করে লঙ্কা থেকে রামের কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন।

রামায়ণে বর্ণিত বিভীষণের এই মহত্ত্বের কথা যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে প্রেরণা যুগিয়েছে। প্রতিকূলতায় ও সঙ্কটের মুহূর্তেই চরিত্রের দৃঢ়তা ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার চরম পরীক্ষা দেওয়ার সময়। অত্যন্ত সৎসাহসের পরিচয় দিয়ে বিভীষণ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ধার্মিক বিভীষণ নিজের আদর্শে যা সত্য বলে বুঝেছেন, তার জন্য রাজৈশ্বর্য, এমনকি স্ত্রী, পুত্র, পরিজনকেও ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হননি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা যায় কোন কিছুরই জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।" বিভীষণের চরিত্র তার মহৎ দৃষ্টান্ত।

[ মহর্ষি বাল্মিকী প্রণীত রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষোড়শ সর্গ অবলম্বনে। ]

# পুস্তক সমালোচনা

**শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ হতে তিনটি প্রকাশন ঃ**

(১) রামকৃষ্ণ অমিয় কথা ( ২য় সংস্করণ ) —সংকলক শ্রীপ্রণব কুমার সিংহ, পৃঃ ১১৬+৮, মূল্য ২০'০০

বইটিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পাঁচখণ্ডের উপদেশগুলি চয়ন করে 'অহংকার' 'ব্যাকুলতা' প্রভৃতি ১৭টি শিরোনামায় সাজান হয়েছে। যে-সব বাণী ঐ শিরোনামগুলিতে ফেলা যায়নি, তাদের 'বিবিধ' পর্যায়ে দেওয়া হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য, ক্ষুদ্রাকার একটি গ্রন্থের মাধ্যমে বাণী-গুলিকে প্রধানতঃ বাংলাদেশের জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য যে সাধিত হয়েছে, তা বুঝা যায় প্রথম সংস্করণের ৩৪০০ কপি চার বৎসরে নিঃশেষিত হওয়ায়। তবে কথামৃতের অনেক বাণীতে একাধিক ভাবের যোগ থাকায়, কোন একটি বিশেষ শিরোনামায় সেগুলিকে সীমিত করার বেশ অসুবিধা; এর ফলে পাঠকের পক্ষে সেটিকে খুঁজে বার করা মুস্কিল হয়। এখানেও সে অসুবিধা অনেক জায়গায় দেখা গেছে। যেমন—পৃঃ ৬৭তে 'নির্জনতা—ধ্যান, সাধনা'তে 'ভক্তি' সম্বন্ধে যা আছে, তা 'ভক্তিযোগ' শিরোনামায়, এবং 'বিবিধ' শিরোনামায় 'ব্যাকুলতা' সম্বন্ধে বাণীটি 'ব্যাকুলতা' শিরোনামায় যেতে পারত। কথামৃতের ৪।১৫।২ তে পূর্ণ জ্ঞানী সম্বন্ধে যে বাণী আছে, তা 'জ্ঞান-যোগ' এবং 'বিবিধ' শিরোনামায় পেলাম না। কিন্তু এইসব সামান্য সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও সঙ্কলকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, কারণ সাধারণ পাঠক এক শিরোনামায় শ্রেণীবদ্ধ বাণী পাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে বলে মনে করি।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণায়ণ— শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শতবার্ষিকী স্মরণিকা ১৮৮৬—১৯৮৭; পৃঃ ৬০+ চারটি পূর্ণপৃষ্ঠা আলোকচিত্র, মূল্য দেওয়া নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১৫০ বর্ষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ১০০ বর্ষকে ( ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের গৈরিকবস্ত্র বিতরণকে

সংঘ সৃষ্টির শুরু হিসাবে ধরে ) স্মরণ করবার জন্ত এই স্মরণিকা। সংঘ প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর অবদান এবং তাঁদের বাণীর উদ্ধৃতি ছাড়া এতে আছে তিনটি জ্ঞানগর্ভ রচনা। সুন্দর প্রচ্ছদপট ও রচনাগুলির বিষয়বস্তু স্মরণিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই এতে বিজ্ঞাপন আছে অনেক।

(৩) **শ্রীরামকৃষ্ণায়ণ**—হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯২০—৮৪ ; পৃঃ ১৫১+২৮+চারটি পূর্ণপৃষ্ঠা আলোকচিত্র, মূল্য ৫০·০০

গ্রন্থটির গোড়ার দিকে আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি, শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ, স্বামীজীর বাণী এবং মঠ মিশনের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের আশীর্বাণী। কিন্তু বইটির বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও পরিবেশন। বইটি ভাগ করা হয়েছে নয়টি শিরোনামায় : (ক) শ্রীরামকৃষ্ণায়ণ (খ) পার্ষদদের প্রত্যক্ষ অনুভবের আলোকে (গ) মহাপুরুষদের ধ্যানালোকে ; মহাপুরুষ অর্থে স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ প্রভৃতি (ঘ) মনীষীদের মননালোকে ; মনীষী অর্থে কেশবচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি। (ঙ) বিদেশী মনীষীদের প্রজ্ঞালোকে ; এঁদের মধ্যে আছেন ম্যাক্সমূলার, রোঁমা রোঁলা প্রভৃতি (চ) বিভিন্ন মতাবলম্বীদের দৃষ্টির আলোকে ; এঁদের মধ্যে আছেন ধর্মপাল মহাথের, ফাদার সিলিংস প্রভৃতি (ছ) আধুনিক সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতজনের বিচারালোকে ; ওঁদের মধ্যে আছেন এস. এ. মাণ্ডদ, কাজী নজরুল ইসলাম, বিনোবা ভাবে, ডক্টর ই. পি. চেলিশেভ প্রভৃতি। (জ) কালপ্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণ, যার মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে বিভিন্ন সংঘ ও আশ্রম গঠনের ধারাবাহিক ইতিহাস। (ঝ) দিনাজপুর আশ্রমের ইতিহাস, যাতে দেওয়া আছে ফটোসহ আশ্রমের বিভিন্ন কার্য-বিবরণী।

সব মিলে স্মরণিকাটি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজী সম্বন্ধে এত বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে একত্র পরিবেশন করার জন্ত দিনাজপুর আশ্রম ধন্তবাদার্হ।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার

**মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র**—শ্রীঅর্চনা পত্রী। প্রকাশক : শ্রীসত্যানন্দ সেবায়তন, ১ ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। পৃঃ ২০০, মূল্য : ২০·০০।

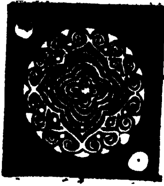
মহাভারতের ছয়টি পুরুষ চরিত্র ( শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন ও বিদুর ) এবং তিনটি নারী চরিত্র ( গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদী ) পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনাগুলি সাবলীল হইয়াছে। প্রতিটি চরিত্র আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে পাঠক মহাভারতের মূল চরিত্রগুলি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লাভ করিবেন।

পুস্তকে কর্ণচরিত্র কেন বাদ দেওয়া হইল, তাহা বুঝা গেল না। অনেক মনীষীর চিন্তায় কর্ণচরিত্রকে একটি বিশেষ স্নেহ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ পাঠকও কর্ণকে একটু মমতার সহিত স্মরণ করে। তাঁহার জীবনে বেশ কয়েকটি মূল্যবান দিক আছে।

আলোচিত চরিত্রগুলি ভারতীয়দের মানসভূমি বহুদিন ধরিয়াই আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে। এইসব চরিত্রের কয়েকটি সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষী চিন্তাবিদদের মন্তব্যও আলোচনাতে সন্নিবেশিত করিলে, পুস্তকের মূল্য বর্ধিত হইত।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মনোরম। ছাত্রছাত্রীকে উপহারের জন্ত ইহা একটি উপযুক্ত পুস্তক। সেইদিক দিয়া মূল্য একটু কম ধার্য হইলে ভাল হইত।

—অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব

গত ২৩ মে, ১৯৮৭ **পালাই** কেন্দ্র ( ত্রিচুর, কেরালা ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করেছে। কেন্দ্রের সংসদীয় মন্ত্রী শ্রী এম. এম. জ্যাকব এবং কেরলের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কে. চন্দ্রশেখরণ এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

## উদ্বোধন

গত ৯ জুলাই, '৮৭ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতিলাল ভোরা রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার অবুজমার আদিবাসী সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং নারায়ণপুরে একটি ন্যায্যমূল্যের বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

## নতুন শাখাকেন্দ্র

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, **মাদুরাই** (তামিল নাড়ু) তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসহ নতুন একটি শাখাকেন্দ্ররূপে রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আশ্রমটির নতুন নাম হয়েছে 'রামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই'।

## ছাত্রকৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বিদ্যালয়ের এগারজন ছাত্র ১৯৮৬-র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি. পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এদের মধ্যে ছয়জন রসায়নবিদ্যায় ১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম স্থান; পরিসংখ্যানবিদ্যায় ( Statistics ) চারজন ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্থান এবং পদার্থবিদ্যায় একজন ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

কানপুর বিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র উত্তরপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত এ-বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৩য়, ১৪শ ও ১৫শ স্থান লাভ করেছে।

## ত্রাণ

**গুজরাট খরাত্রাণ:** রাজকোট কেন্দ্রের মাধ্যমে গুজরাটের রাজকোট, কচ্ছ, সুরেন্দ্রনগর, পঞ্চমহল ও জামনগর জেলার নয়টি তালুকের খরাপীড়িত মানুষের মধ্যে ভুট্টা, গম, পোশাকের কাপড়, ধুতি, শাড়ি, শিশুদের পোশাক এবং জল পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে। পশুদের জন্যও পশুখাদ্য এবং জল বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া মধ্যবিত্ত কৃষকদের মধ্যে শুকনো পশুখাদ্য ভরতুকি মূল্যে বিক্রয় হয়েছে।

**মহারাষ্ট্র খরাত্রাণ:** পুণা আশ্রম গত ১২ মে, '৮৭ থেকে ৮ জুন পর্যন্ত পুণা জেলার মুশলী তালুকের ৪টি গ্রামের ৪০০০ মানুষের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ করেছে।

**উড়িষ্যা অগ্নিত্রাণ:** ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের মাধ্যমে বোলাঙ্গির জেলার নারায়ণপুর গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৮৩টি পরিবারের মধ্যে শাড়ি অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

**শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ:** মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর কেন্দ্রের মাধ্যমে মন্দাপম ও তিরুচি শরণার্থিশিবিরের শরণার্থীদের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়েছে।

## দেহত্যাগ

গত ২৯ জুন, '৮৭ **স্বামী বলরামানন্দ** ( শ্রীকণ্ঠ ) মরিশাসের সন্নিকট রিইউনিয়ন

আইল্যাণ্ড হসপিটালে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। গত ২৪ মে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে অচৈতন্য অবস্থায় ঐ হাসপাতালে ভর্তি হন। সুচিকিৎসার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী বলরামানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাগপুর কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং যথাসময়ে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি কলিকাতা অদ্বৈতাশ্রমের কর্মী এবং ১৯৭৭-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন। তারপর তিনি মরিশাস কেন্দ্রের প্রধান হন। সুলেখক, সুবক্তা ও সুপণ্ডিত হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ব্যবহারে তিনি ছিলেন ভদ্র ও অমায়িক। তাঁর দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন সম্ভাবনাময় সেবককে হারাল।

আমরা তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

## বিবিধ সংবাদ

### উৎসব

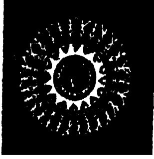
গত ৭ জুন, ১৯৮৭ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার **বারাসাত** শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা-সঙ্ঘ সাড়ম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, ধর্মসভা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

**ডুমডুমা** (আসাম) গত ১৯—২১ জুন, '৮৭ তিনদিন ব্যাপী স্থানীয় ভক্তবৃন্দ মাড়োয়ারী পঞ্চায়েত ধর্মশালায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী উৎসব বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও মনোজ্ঞ কর্মসূচীর মাধ্যমে পালন করেছে। উৎসবের তিনদিনই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ১৭ ও ১৮ এপ্রিল, '৮৭ **কল্যাচক** (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে উক্ত উৎসব পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৮ এপ্রিল কাঁথি রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মকামানন্দজীর পৌরোহিত্যে এক যুবসম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৯ মে, '৮৭ লিলুয়ার **চকপাড়া** (হাওড়া) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীমা সারদা দেবীর আবির্ভাব-উৎসব বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেছে। অপরাহ্নে স্বামী ধ্যানেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল **ঢাকুরিয়া** শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫২তম আবির্ভাব-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে।



# সূচীপত্র ॥ আশ্বিন ১৩৯৪





## কবিতা




৮৯তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৯৪

# দিব্য বাণী

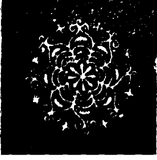
নমোঽস্তু তে মহাবিদ্যে অজিতে তেজগামিনি।
সাংখ্যযোগোদ্ভবে বীরে বরদে দেবপূজিতে॥
ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানামব্যক্তব্যক্তরূপিণী।
কালরাত্রী মহারাত্রী কালক্ষয়করী ধ্রুবা॥
সৃষ্টিরক্ষণসংহারং ত্বমেব পরিকুর্ব্বসি।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্বং পদং পরমং স্মৃতম্॥
অর্চ্চয়সে স্তূয়সে চৈব দৈবতৈর্মৎপুরোগমৈঃ।

হে অজিতে! তুমি নিজ তেজ দ্বারা সর্বত্র গমন করে থাক। হে বীরে! হে বরদে, দেবপূজিতে! তুমি জ্ঞানযোগ হতে প্রকাশিত হয়ে থাক। অতএব তোমাকে নমস্কার করি।

হে মহাভাগে! তুমি সকল জীবগণের আশ্রয়, তোমার রূপ অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত। তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, কালক্ষয়করী ও নিত্যা।

হে দেবি! তুমিই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার (প্রলয়) করে থাক। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যা কিছু সবই তুমি এবং সকলে তোমাকেই পরমপদ বলে নির্দেশ করেন। আমিও সকল দেবগণের সঙ্গে তোমাকে স্তুতি ও অর্চনা করছি।

[ দেবীপুরাণ, ১২৭।৬৬-৬৭ ও ৭৬-৭৭ ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## মাতৃ অভিষেক

আবার আশ্বিন আসিয়াছে। 'ঘাসের বুকেতে শিশির নীর', দিনের নীল আকাশে শুভ্র মেঘের সারি, রাত্রির স্বচ্ছ গগনে নক্ষত্রপুঞ্জের সমাবেশ, শেফালির সৌরভে সুবাসিত আকাশ-বাতাস—জানাইয়া দিতেছে মায়ের শুভাগমনের আর দেরি নাই; ইঙ্গিত দিতেছে তাঁহাকে যথাযথ বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে। "মা আসবেন,—কত শত লোকে কত আনন্দ অনুভব করছেন; মাকে দেখবো,—কত লোক কত কর্ম ফেলে ঝেলে দেশ দেশান্তর হতে চলে আসছেন। মাকে প্রাণ ভ'রে পূজা ক'রব।—কত লোক কত প্রকারের দ্রব্যাদি দূর দূর দেশ হতে সংগ্রহ করে আনছেন।" (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা) বর্ষাস্নাত-সিক্তা ধরণীও যেন আজ স্নিগ্ধ-শান্ত-শ্যামলা রূপ ধারণ করিয়া অপূর্ব রাগে রঞ্জিতা হইয়া বিবিধ দ্রব্য-সম্ভারে সুসজ্জিত বরণডালা হস্তে প্রস্তুত হইয়া আছেন—মাকে বরণ করিবেন বলিয়া।

জগজ্জননী আমাদের দীন কুটিরে তিন দিন বিরাজ করিবেন—প্রধানতঃ কন্যারূপে। পিতৃ-গৃহে কন্যা আসিলে মায়ের যেমন আনন্দ হয়, বিশ্বজননীর প্রতিমায় বাংলার মায়েরা মা দুর্গাকে সেইভাবেই বরণ করেন। এখানে বলা অপ্রা-সঙ্গিক হইবে না যে, মা দুর্গাকে এইভাবে বরণ করিয়া পূজা করিবার রীতি বাঙালীর একেবারে নিজস্ব।

শরৎকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর এই পূজা বঙ্গদেশে সর্বত্রই মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই শারদীয়া দুর্গাপূজাকে বাঙালীর জাতীয় উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে বাঙালীর জাতীয় উৎসবরূপে পরিগণিত হইলেও এই পূজা কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নয়; আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের সর্বত্রই কোন না কোন ভাবে এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জগন্মাতা দুর্গাদেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে 'অম্বা' ও 'অম্বিকা' নামে, গুজরাটে 'হিঙ্গুলা' ও 'রুদ্রাণী' নামে, কান্যকুব্জে 'কল্যাণী' নামে, মিথিলায় 'উমা' নামে এবং কুমারিকা প্রদেশে 'কন্যাকুমারী' নামে পূজিত হইয়া থাকেন। এইরূপে হিমাচল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং দ্বারকাপুরী ও বেলুচিস্তানের হিঙলাজ হইতে পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বস্থানে শারদীয়া পূজা অথবা নবরাত্র নামে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-প্রণীত শ্রীদুর্গা পুস্তকে স্বামী অভেদানন্দ লিখিত অবতরণিকা। পৃঃ তেত্রিশ)

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে বাঙালীর জাতীয় উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না—একথা আমরা আগেই বলিয়া আসিয়াছি। জাতীয় উৎসব বলিবার কারণ এই যে, এই উৎসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মনির্বিশেষে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। জাতীয় উৎসব হিসাবে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হইল প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করা। ধনী-দরিদ্র, শত্রু-মিত্র, এমন-কি ধর্মে ধর্মে ভেদা-ভেদ ভুলিয়া সকলকে আপন করিয়া পাওয়ার

একটা আকৃতি প্রকাশ পায় এই উৎসবে। বাঙালী যেন এই সময় সকল বিশ্বমানবকে আপন করিয়া লয়, জয় করিয়া লয় সকল ক্ষুদ্রতা-নীচতা স্বার্থের হানাহানিকে। এই ভাবের চরম প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই বিজয়ার দিনে। সকল আসুরিক প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া বিজয় ঘোষণার মধ্য দিয়া মানুষ অহিংসা, প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি দৈবী-সম্পদ লাভ করে।

হিন্দুদের পূজা-পার্বণ-উৎসবাদি সর্ববিধ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য—এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মনকে অন্তর্মুখী, প্রকৃত আনন্দাভিমুখী করানো। একথা যদিও অনস্বীকার্য যে, নিয়মিত ধ্যান-ধারণাদি অভ্যাসের দ্বারা যাঁহারা তাঁহাদের মনকে অন্তর্মুখী করিতে, প্রকৃত আনন্দাভিমুখী করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য এইসব উৎসবানুষ্ঠানের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য, বিশেষ করিয়া যাঁহারা ধ্যান-ধারণাদি সহায়ে মনকে অন্তর্মুখী করিয়া প্রকৃত অনাবিল আনন্দের স্বাদ কখনও পান নাই বা পাইবার চেষ্টাও করেন না, তাঁহাদের জন্য এইসব উৎসবানুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'-এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরিয়া মনে অনাবিল আনন্দের ছাপ পড়িতে পড়িতে জীবনের কোন শুভ মুহূর্তে কাহারও অন্তরের দ্বার একবারের মতো ক্ষণকালের জন্যও যদি উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহাই সেই ব্যক্তির জীবনকে পরিবর্তিত করিয়া প্রকৃত আনন্দাভিমুখী করাইবার পক্ষে যথেষ্ট। আর এখানেই এই সব উৎসবানুষ্ঠানের সার্থকতা। যেভাবেই হউক, প্রকৃত আনন্দানুভূতির ছাপ মনে একবার পড়িতে পারিলে তাহার স্মৃতি আজীবন স্থায়ী হয় এবং জীবনকেও তাহা সেইভাবে প্রভাবিত করে। অনেকের জীবনেই ইহা একটি উপলব্ধ সত্য।

এইবার আমরা আবার দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। বর্তমান ও প্রাচীনকালের এই উৎসবের মধ্যে অনেক পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রাচীনকালে এই উৎসব মানুষের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে প্রতিবৎসর একটি নূতন পরিবেশ ও প্রাণশক্তির সঞ্চার করিত, যাহার রেশ চলিত সমস্ত বৎসর ধরিয়া। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সেকালে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি সাধারণের মনোরঞ্জনের সব ব্যবস্থাই থাকিত। কিন্তু ঐ সবকিছুই থাকিত মাতৃ-কেন্দ্রিক। তাই ঐগুলি মায়ের চিন্তাকে, মায়ের পূজার ভাবকে অপ্রধান না করিয়া করিত মায়ের চিন্তার অনুসারী। বাড়িতে কোন শ্রদ্ধার্হ, অথচ অতি প্রিয় পরমাত্মীয়ের আগমন হইলে যে ভাব নিয়া তাঁহার সেবা-যত্ন, আদর-অভ্যর্থনা করা হয় দেবীর আবাহন-পূজায়ও সেই ভাবেরই প্রাধান্য থাকিত বেশি। আবার তাহার সহিত এই ভাবও সংযুক্ত থাকিত যে, আমাদের এই অতি প্রিয়জনটিই হইলেন সেই সর্ববিধ মঙ্গলদায়িনী জগদীশ্বরী—যাঁহার ইচ্ছাতেই জগতের সবকিছু ঘটে, বাস্তবরূপে পরিগণিত হয়। তিনিই সেই সর্বশক্তিময়ী জননী—যিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রাণসত্তাকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন। যাঁহার কল্যাণস্পর্শে আমরা উন্মুখ হইতে পারিয়াছি সত্যের সন্ধানে। তিনিই সেই মা যিনি তাঁহার পীযুষধারায় সঞ্জীবিত করিয়াছেন আমাদের অন্তরাত্মার চৈতন্যসত্তাকে। তাই ভক্ত-সাধক এই মাকে পূজা করিত শুধু পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য নয়, তাঁহার জীবনকে সংহত, সমৃদ্ধ অথচ সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রেরণা ও শক্তিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে। সে জানিত তাহার এই প্রিয়জনটি 'ভোগ-স্বর্গাপবর্গদা' —সাংসারিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মৃত্যুর পরে স্বর্গসুখ, আবার ইহকাল ও পরকাল—এই দুইয়ের অতীত যে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মুক্তি তিনটিই সে তাঁহার কৃপায় লাভ করিতে পারে।

এই শারদীয়া পূজা আজও আমরা করিতেছি—পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি করিয়াই করিতেছি। সহরের পাড়ায় পাড়ায় পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে-গঞ্জে পূজার সংখ্যা আগের চেয়ে তো কম নয়ই বরং অনেক বেশি। তাছাড়া আছে পারিবারিক পূজা। তাহার সংখ্যাও নগণ্য নয়। পূজায় উৎসাহ ও জাঁকজমকেরও কোন অভাব নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই পূজায় প্রাচীন দিনের সেই প্রতীক্ষা, সেই হৃদয়াবেগ, সেই ভক্তি-বিশ্বাস, সেই আনন্দ-তৃপ্তি, আমোদ-আহ্লাদ নাই। সবই আছে অথচ ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। তাই পূজায় মন অধিকতর সত্যাভিমুখী হওয়া তো দূরের কথা, বিপরীতটাই যেন হইতেছে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে—কেন এমন হয়?

উত্তরে বলিতে হয়, উৎসব আমরা করিতেছি ঠিকই, কিন্তু যে মা-কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের উৎসব, সে মা-ই আমাদের চিন্তার কেন্দ্র-বিন্দুতে নাই। মা-কে উৎসবের আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়া মায়ের পূজাকে, তাঁহার চিন্তাকে আমরা গৌণ করিয়া ফেলিতেছি। তাই এই পূজা আমাদের নিকট রসহীন অপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। আর সেইজন্যই বোধ হয় উহাকে সরস করিতে, পূর্ণ করিতে শরণাপন্ন হই আধুনিক হাল্কা পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাহ্যিক বহুতর বিলাস-ভূষণের। প্রতিমা গঠনেও নজর দেই ঠিকই, কিন্তু তাহাতে জগজ্জননীর ভাব কতখানি ফুটাইয়া তুলিতে পারিলাম, মূর্তি ধ্যানানুগ হইয়াছে কিনা, মায়ের মূর্তি দেখিয়া লোকের মনে জগজ্জননীর ভাব কতটা আসিল—সেই দিকে লক্ষ্য নাই। আসল লক্ষ্য হইল প্রতিমা-অবলম্বনে 'আর্ট' কতখানি ফুটাইতে পারিলাম তাহার দিকে। এ যেন মায়ের প্রতিমাকে অবলম্বন করিয়া 'আর্ট'-এর প্রতিযোগিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার,—প্রথম পূজারীর ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি।" (কথামৃত, ২।২২।৩) এই তিনটিরই আমাদের অভাব।

তারপর পূজা আরম্ভ হইবার বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই শুরু হয় চাঁদা আদায় করিবার নামে লোকের উপর নানা জুলুমবাজী যাহা সাধারণ মানুষকে শঙ্কিত করিয়া তোলে। তাহা ছাড়া বারোয়ারী পূজার উদ্যোক্তাদের একদলের সঙ্গে অন্যদলের রেষারেষি হইতে উদ্ভূত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করিয়া সহর ও সহরতলীর বাসিন্দাদের ঐ সময় দিন কাটাইতে হয় এক অজানা আশঙ্কা ও আতঙ্কের মধ্য দিয়া। এইসব আশঙ্কা-আতঙ্ক ক্রমে গ্রামাঞ্চলেও সংক্রামিত হইতেছে।

পূজার অন্যান্য অনুষ্ঠানের বেলাতেও একই কথা। সকাল হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত মণ্ডপে মাইক বাজিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তাহাতে মাতৃসঙ্গীত খুব কমই পরিবেশিত হয়। তাহার পরিবর্তে পরিবেশিত হয় আধুনিক সিনেমার বিভিন্ন ধরনের হাল্কা গান। তবে ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে। পারিবারিক পূজায় তো বটেই, বহু সার্বজনীন পূজাতেও প্রতিমা শাস্ত্রানুমোদিতভাবেই নির্মিত হয়, পূজাও যথারীতি নিখুঁতভাবে করিবার যথেষ্ট চেষ্টাও কর্মকর্তারা করেন। তবুও ইহা অনস্বীকার্য যে অধিকাংশ সার্বজনীন পূজাতেই পূজার যথাযথ পরিবেশ রক্ষিত হয় না এবং রক্ষা করিবার প্রতি দৃষ্টিও দেওয়া হয় না।

আজকাল বহু সার্বজনীন পূজা-কমিটির উদ্যোগে পূজা উপলক্ষে ত্রাণ-কার্যের জন্য কাপড়-চোপড়, ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিতরণের জন্য ঐগুলি সরকারের বা কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। কোন

কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কমিটি নিজেই ঐগুলি দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়াও পূজার সময় গরীব-দুঃখীকে সাধ্যমতো খাওয়ানোর ব্যবস্থাও অনেক পূজা-কমিটি করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় উদ্যম সর্বথা প্রশংসনীয়।

সার্বজনীন পূজায় রাজনৈতিক দলবিশেষের কোন নেতাকে, মন্ত্রীকে বা গণ্যমান্য ব্যক্তিকে পূজা-কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক করা আজকাল একটা 'ফ্যাশন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ইহার নিন্দা করিতেছি না। বরং সমর্থনই করি; কারণ এই জাতীয় ব্যক্তিদের নিকট আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজেদের আচার-আচরণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা বর্তমান পূজা-প্রতিকূল পরিবেশকে বদলাইয়া পূজানুকূল পরিবেশকে ফিরাইয়া আনিতে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে পূজার বিশুদ্ধভাব রক্ষা করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, মণ্ডপে পূজার বিশুদ্ধভাব রক্ষা করা পূজার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁহাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব। কাজেই এইসব পৃষ্ঠপোষকদের এবং পূজার প্রগতিপন্থী আধুনিক উদ্যোক্তাদের নিকট আমাদের নিবেদন: আগে যেমন একদিকে ছিল পূজা এবং পূজার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্য দশ রকমের আমোদ-আহ্লাদ, সেইরূপ অপরদিকে ছিল পূজার পরিবেশের বিশুদ্ধতা ও গাম্ভীর্যতা; এখনও তাহাই করিতে হইবে—অর্থাৎ পূজায় আগের সেই পরিবেশকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তবেই পরিশ্রম সার্থক হইবে। পূজার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে।

আজ যেন চতুর্দিকে ক্ষয়ের বিভীষিকা। এই ক্ষয়কে জয় করিতে হইলে জগজ্জননীর নামে তাঁহার সকল সন্তানকে এক হইতে হইবে। মায়ের নামে সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে বহুমত, বহুনীতির ব্যবধান দূর করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘবদ্ধতায় সকলকে একপ্রাণ হইয়া কল্যাণের পথ অনুসরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, সর্বশক্তিময়ী আমাদের জননীকে স্মরণ করিয়া আমরা বীর্যবান হইব, শ্রদ্ধাবান, চরিত্রবান হইব। হীন স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়া আমরা আত্মত্যাগী হইব। তবেই মায়ের যোগ্য সন্তান বলিয়া সগর্বে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা আমরা লাভ করিব।

আসন্ন মহাপূজার প্রাক্‌লগ্নে সর্বশক্তিময়ী আমাদের জননীকে চণ্ডীর ভাষায় প্রার্থনা জানাই:

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥

(চণ্ডী, ৪।৪)

ভগবান সহস্রবদন বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যাঁহার অনুপম প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করিতে অক্ষম, সেই চণ্ডিকা সমগ্র বিশ্ব-পরিপালনের নিমিত্ত এবং আমাদের অশুভভীতি বিনাশের জন্য ইচ্ছা করুন। অশেষ কৃপাপূর্বক তিনি আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ, পাপ, তাপ, শোক দূর করুন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন আমরা আমাদের দীপ্ত গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হই।

# স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[ ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত ]

১[১]

আলমোড়া

৪ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস্ নোব্‌ল্,

...একদিকে স্টার্ডি নীরব রয়েছে। তার পুস্তিকাগুলির থেকে বোঝা যাচ্ছে সে ব্যাপারটার থেকে প্রায় হাতগুটিয়ে ফেলেছে, আর অভেদানন্দ মাঝে মধ্যে কেবল নৈরাশ্যজনক কাতরোক্তি পাঠাচ্ছে। অন্যদিকে তোমার প্রাণশক্তি ও সূর্যালোকে ভরপুর চিঠিগুলি আমার মনে শক্তি ও আশা বহন করে আনে এবং ঈশ্বর জানেন এখন আমার মন বিষণ্ণভাবে তাদেরই পথ চেয়ে আছে।...

ভারতবর্ষে বক্তৃতা ও শিক্ষা দিয়ে কোনও লাভ হবেনা। আমাদের যা দরকার তা হল গতিসঞ্চালক ধর্ম। এই জিনিসটা দেখিয়ে দিতেই আমি কৃতসঙ্কল্প, 'ইন্‌সা-আল্লাহ্‌' (ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে)—মুসলমানেরা যেমন বলে থাকেন, কিংবা বৈদান্তিকরূপে আমার যেমন বলা উচিত, যদি আমাদের মনুষ্যদেহধারী ঈশ্বরেরা ঐরূপ ইচ্ছা করেন, বিশেষ করে ইংলণ্ডের ঐসব শ্বেতাঙ্গ ঈশ্বরেরা—কারণ ঠিক এখনই সহানুভূতি ও ধন এই দুই রূপে শক্তি তাঁদেরই করায়ত্ত। তাছাড়া, আমার স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য পাবার আশা যৎসামান্য। 'জেলিফিশ্‌'-এর মতো পদার্থে গঠিত এই ভারতবর্ষীয় অক্টোপাসের কার্যকরী হয়ে উঠতে এখনও বহু বৎসর লেগে যাবে। এরা আমার ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখাচ্ছে তাই দিয়ে যেন বিভ্রান্ত হ'য়োনা। এসব ফেনোচ্ছ্বাসমাত্র। যখন সত্যিসত্যিই দাম দেবার সময় আসবে, তখন এদের বেশির ভাগেরই আর টিকি দেখা যাবেনা।...

প্রভূত ভালবাসা জানিয়ে,

তোমাদের চিরসত্যাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ: মিসেস জনসনের কি খবর? আমি চলে আসার আগে তিনি যে আমাকে চিঠি লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—আজ অবধি এক

* Prabuddha Bharata Vol. LXXXII, August 1977 সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত পত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত দুখানা পত্রের বঙ্গানুবাদ।—সঃ

১ পূর্বপ্রকাশিত অংশের জন্য 'বাণী ও রচনা' সপ্তম খণ্ড (১৩৬৯), উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৩৮০-৮১ দ্রষ্টব্য।

২ লেডি ইসাবেল মার্গেসন —এঁরই বাড়িতে স্বামীজীর সহিত নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

অক্ষরও ত পেলামনা। এর পরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে তাঁকে আমার চিরন্তন ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা দিও, লেডি ইসাবেল[২] ও 'সিসেম'[৩] বন্ধুদের সবাইকেও দিও।

বি

২

মঠ, বেলুড়,
হাওড়া জেলা, বঙ্গদেশ
৪ এপ্রিল ১৯০১

স্নেহের মার্গট,

এইমাত্র মিঃ আর দত্তের[৪] কাছ থেকে একটি চিঠি এল। তার মধ্যে তিনি তোমার ও ইংলণ্ডে তোমার কাজের সবিশেষ প্রশংসা করে আমাকে অনুরোধ করেছেন যাতে আমি চাই যে তুমি আরও বেশিদিন ইংলণ্ডে থাক।

মিঃ দত্ত তোমার সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে যে সব খবর পাঠিয়েছেন তাতে যে আমি উল্লসিত হয়ে উঠেছি এ বুঝতে বিশেষ কল্পনাশক্তির আবশ্যক নেই।

অবশ্যই তোমার যতদিন মনে হবে ভালভাবে কাজ করতে পারছ ততদিন তুমি থাক। ইয়ুম তোমার প্রসঙ্গে মা ঠাকরুণের[৫] সঙ্গে কথা বলেছিল এবং তিনি তোমার চলে আসা চান এইরকম জানিয়েছিলেন। স্বভাবতঃই, এ হল শুধু তাঁর ভালবাসা ও তোমাকে দেখবার জন্যে আগ্রহের প্রকাশ—এই মাত্র। তবে বেচারী ইয়ুম এই একবারই অতিরিক্ত গাম্ভীর্যসহকারে কিছু নিয়েছিল, যার ফল হচ্ছে এত সব চিঠি। যাই হ'ক, এমনটা যে ঘটেছে এতে আমি খুশি, কারণ এর দরুন মিঃ দত্তের মতো একজনের কাছ থেকে, যাঁর ক্ষেত্রে আত্মীয়সুলভ অন্ধপ্রীতির অনুযোগ খাটবেনা, তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে এত কিছু জানতে পারলাম।

আমি ইতিমধ্যেই মিসেস বুল্‌কে এ ব্যাপারে লিখেছি। অবশেষে আমি এখন ঢাকায়[৬] এসেছি, এখানে কয়েকটা বক্তৃতাও দিয়েছি। আগামীকাল চন্দ্রনাথ যাত্রা করব, এই চন্দ্রনাথ হল বাংলার শেষ পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত চট্টগ্রামের নিকটবর্তী। আমার সঙ্গে আছেন আমার মা, মাতৃস্থানীয়া এক আত্মীয়া (aunt), সম্পর্কিত এক বোন (cousin), সম্পর্কিত এক ভাইয়ের (cousin) বিধবা পত্নী এবং ন'জন ছেলে। এঁরা সবাই তোমাকে ভালবাসা জানাচ্ছেন।

এইমাত্র মিসেস বুলের কয়েকছত্র এক চিঠি ও মিঃ স্টার্ডিরও একটি চিঠি পেলাম। যেহেতু এখন কয়েকদিন আমার পক্ষে চিঠি লেখা সম্ভব হবে না, তাই

৩ 'সিসেম ক্লাব' নামক মহিলা সমিতির সদস্যদের। নিবেদিতা এই সমিতির একজন সভ্য ছিলেন।

৪ শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস। ইনি অবসর নেবার পর যখন ইংলণ্ডে বাস করছিলেন তখন ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হন।

৫ শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী।

৬ এই চিঠিটি পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণকালে যখন স্বামীজী ঢাকায় যান তখন লেখা হয়েছিল।

তোমাকে বলছি যে মিসেস বুল্‌কে তাঁর চিঠির জন্যে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিও এবং তাঁকে একটু বলো যে আমি এইমাত্র ডেট্রয়েটের মিস্ গ্রীনস্টাইডেলের[৭] কাছ থেকে একটি দীর্ঘ পত্র পেয়েছি। তাতে সে মিসেস বুলের একটি সুন্দর চিঠির উল্লেখ করেছে। স্টার্ডি লংম্যান্স্‌কে দিয়ে 'রাজযোগ'-এর পরবর্তী আর কোনও সংস্করণ প্রকাশ করানোর বিষয়ে লিখেছে। ঐ সম্বন্ধে বিবেচনা যা করবার তা আমি মিসেস বুলের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি এ ব্যাপারে স্টার্ডির সঙ্গে কথা বলে যা ভাল বোঝেন তা করবেন।

তুমি স্টার্ডিকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানিয়ে একটু বলে দিও যে আমার পথচলতি অবস্থার জন্যে তার চিঠির উত্তর দিতে সময় লাগবে এবং ইতিমধ্যে বিষয়টার দেখাশোনা মিসেস বুল্ করবেন।

চিরন্তন ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিয়ে,

বিবেকানন্দ

৭ মিস ক্রীস্টীন গ্রীন্‌স্টাইডেল, স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যা। ইনি পরবর্তিকালে ভারতে এসে ভগিনী ক্রীস্টীন নামে পরিচিত হন ও ভগিনী নিবেদিতার কাজে সহযোগিতা করেন।

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রচার

## স্বামী গম্ভীরানন্দ

আমরা আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে এখানে সমবেত হয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরে দেড়-শত বছর অতিবাহিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপনের পরেও একশত বছর কেটে গেল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে একশ-দেড়শ বছর এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয়। বুদ্ধের প্রভাব প্রায় আড়াই-সহস্র বছর ধরে চলেছে এই পৃথিবীতে। যীশু-খ্রীষ্ট দু'হাজার বছর পরে আজও তাঁর প্রভাব বিস্তার করছেন। মহম্মদও দেড়হাজার বছর পরে আজও চারদিকে সুপরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব চলবে কতসহস্র বছর ধরে তার ধারণাও আমরা করতে পারি না। সে সমস্ত দীর্ঘ সময়ের তুলনায় একশত দেড়শত বৎসর খুবই স্বল্প। তথাপি এই স্বল্প সময়ের ভেতরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব যেরূপে চারদিকে প্রসারিত হয়েছে, দেখে-শুনে অবাক্ হতে হয়। কত শত-সহস্র শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মন্দির ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। কত সমাজ স্থাপিত হয়েছে। কত সেবা-সমিতি হয়েছে। কত আলোচনাচক্র এখানে—এদেশে, ওদেশে হয়েছে তার সংখ্যা কে রাখে? কে জানতে পারে অজ্ঞাতভাবে কিরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে? তার একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত আমরা পাই আমাদেরই একজন সাধুর মুখে। তিনি গিয়েছিলেন মস্কোতে মাস কয়েক আগে। সেখানে রাশিয়ানরা, অপরিচিত তারা, এসে তাঁকে জানিয়ে গেল, "আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত।" কেউ কেউ এমনও বললে, "আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছি।" সেখানে

তো শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচার করতে আমরা কেউ যাইনি। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পর্যন্ত দুর্লভ। তথাপি সে-স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ এমনিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন যা আমাদের কল্পনাতীত। এই ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব যা দেখে অবাক হতে হয়। তাঁর সম্বন্ধে বিদেশীরা কত জীবনী ও সমালোচনা-গ্রন্থ লিখেছেন এবং পাশ্চাত্য জগতে কোন কোন মনীষী এমন কথাও বলেছেন যে, মানবজাতির ভাবী সুসমন্বিত বিকাশের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও জানতেন যে, এমনটি হবেই হবে। মা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে তিনি এসেছিলেন নরেনকে সঙ্গে করে, অখণ্ডের ঘর থেকে। আরও কত ঘটনা মনে পড়ে। তিনি যখন ক্ষুদ্র বালক-গদাধর, তখন চিনুশাঁখারী তাঁকে মাল্যচন্দন দিয়ে ভূষিত করে বলেছিল, "গদাই, একসময়ে তোমাকে সকলে অবতার বলে মানবে, কিন্তু তখনও মনে রেখো চিনুশাঁখারী তোমাকে প্রথম অবতার বলে স্বীকার করেছিল।" তারও অনেক পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রচার করেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। সকলে মানতে চায় না; সুতরাং তিনি পণ্ডিত সমাজকে ডেকেছিলেন। ভৈরবীর যুক্তি-তর্ক শুনে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত লক্ষণাদি দেখে, তাঁরই সম্মুখে তাঁরা—পণ্ডিত সমাজ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, ইনি সত্যিই অবতার। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তখনও ভক্ত সমাগম আরম্ভ হয়নি। সংসারীদের সঙ্গে সংসারের কথা বলে বলে মনে হচ্ছিল তাঁর ঠোঁট জ্বলে যাচ্ছে। তারপর মা কালী তাঁকে দেখিয়ে দিলেন, ভক্তরা সব আসবে, তাদের সঙ্গে তিনি সৎকথা বলতে পারবেন এবং আনন্দ পাবেন।

তারপরে, শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ফটো শ্রীশ্রীমা পুজো করতেন নিজের ঘরে। দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এ উচ্চ সমাধি অবস্থার ছবি, কালে এ ছবি ঘরে ঘরে পূজিত হবে। এমনিভাবে আরও কত দেখতে পাই। তিনি যখন রোগশয্যায় শায়িত, কাশীপুরে তখন শ্রীমাকে বলেছিলেন: "দেখগো, আমি এমন এক জায়গায় গিয়েছিলাম, যেখানে দেখলুম সব সাদা সাদা মুখ।" সাদা সাদা মুখ কি, তার অর্থ মা তখন বুঝতে পারেননি। পরে বুঝতে পেরেছিলেন, যখন ভগিনী নিবেদিতা, ওলি বুল প্রভৃতি আসতে শুরু করেছিলেন। ঐ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের মন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ সমস্ত বিশ্ব যে তাঁরই।

আরও পরে আমরা দেখতে পাই যে তিনি সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য কত প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি যখন দেখছেন যে, ভক্তদের আসতে দেরি হচ্ছে তখন 'কুঠি'র ছাদে উঠে ডাকছেন, "ওরে তোরা সব আয়। তোদের না দেখে আর সংসারীদের সঙ্গে কথা বলে বলে আমার মন যে বড়ই তিক্ত বিরক্ত হয়ে আছে।" তাঁর আহ্বানে প্রথমে এলেন ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা যাঁরা তাঁকে একজন সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষ বলে স্বীকার করলেন। কিন্তু সেই পর্যন্তই তো শ্রীরামকৃষ্ণের আসার অর্থ ছিল না। সুতরাং তারপর এলেন রামচন্দ্র দত্ত, মনমোহন মিত্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যাঁরা তাঁকে অবতার বলে স্বীকার করলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁকে দেখতে চাইলেন প্রাচীনের আলোকে। এঁর মধ্যে নতুন ভাবধারা আছে যার দ্বারা জগৎ পরিপ্লাবিত হবে এবং নতুনভাবে গড়ে উঠবে মানবসমাজ—সেটা তাঁরা তখনও বুঝতে পারেননি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান পরিপূর্তিলাভ করল না। অতএব তার পরে তাঁর সঙ্গে মিললেন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুবকরা যাদের

মন ছিল উদার এবং শরীর-মনে ছিল যথেষ্ট শক্তি, নতুনভাব গ্রহণ করে তাকে রূপ প্রদান করার মতন। সেই প্রকারেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ভাব প্রচার করে চলেছিলেন। যদিও তিনি মা-কালীর নিকট ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যে, তাঁর আগমনকে অবলম্বন করে পৃথিবী জাগবেই জাগবে, এবং যেমন নাকি বলেছিলেন মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী, "শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এসেছিলেন অবতার হয়ে তখন তিনি জগতের ব্রহ্মকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দিয়েই এসেছিলেন।" সুতরাং সেটা যে আপন গতিতে, আপন শক্তিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সেটা শ্রীরামকৃষ্ণের জানাই ছিল।

তথাপি তিনি নিজে কাজ থেকে বিরত হননি। যেমন নাকি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন গীতায় (৩।২২) অর্জুনকে :

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

—হে অর্জুন, আমার এমন কোন কাজ নেই তিন লোকে যা নাকি করণীয়। এমন কিছু নেই যা নাকি আমি পাইনি বা যা আমাকে পেতে হবে। তথাপি আমি কাজে লেগে আছি। কেন? না, 'উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।' (ঐ, ৩।২৪)—আমি যদি কর্ম না করি জগৎ উৎসন্নে যাবে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ, সব জেনে-শুনেও কাজে লেগেছিলেন। কি জন্য? আমাদের শিখিয়ে দেবার জন্য। আমাদের অবকাশ দেবার জন্য যাতে এই মহৎ কাজটিতে নিজেকে উৎসর্গ করে আমরা কৃতার্থ হতে পারি, আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হতে পারে।

রামচন্দ্র সেতু নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে তো কাঠবিড়ালীর দুটো বালি ফেলে দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি কাঠবিড়ালী নিজেরই আগ্রহে ছুটি-ছুটি করে বালি সেখানে ফেলেছিল। তার দ্বারা সেতুবন্ধনের কোন উপকার না হলেও, কাঠবিড়ালী তার দ্বারা কৃতার্থ হয়েছিল। সেই কৃতার্থতার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন আমাদের চোখের সামনে, যাতে আমরাও এমনিভাবে কাজ করে নিজেরা চরিতার্থ হতে পারি, আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি।

কি করেছিলেন তিনি? প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই যে তিনি নিজে ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নানাভাবে প্রচার করছেন। দুঃখ করে বলছেন, "নিত্যানন্দ যেমনভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হরিনাম প্রচার করেছিলেন, তেমনিভাবে করতে আমারও ইচ্ছে হয়। কিন্তু মা শরীরটাকে এমনি করে রেখেছেন যে আমি গাড়ি ছাড়া চলতে পারি না।" তথাপি তিনি যেতেন বহু বাড়িতে। গিয়ে সেখানে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাদের কীর্তনাদিতে যোগ দিতেন। তাদের মনে ভাব জাগিয়ে দিতেন। তখনকার ব্রাহ্ম-সমাজে নিয়মমাফিক গান-বাজনার মধ্য দিয়ে পুস্তক ও শ্রুতিপাঠ ইত্যাদি তাঁরা করে যেতেন বটে, কিন্তু তার ভেতরে যেন একটা জীবন্তভাব ছিল না; একটা অনুপ্রেরণা, উদ্দীপনা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের ভিতর জাগিয়ে দিলেন সেই উদ্দীপনা। তাদের ভিতর জাগিয়ে দিলেন প্রেরণা। 'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।' তেমনিভাবে যে ডুব্ দিতে হয়, শুধু উপর উপর ভাসলে চলে না, সেই ভাব শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের ভিতর সঞ্জীবিত করেছিলেন। এরকম বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন দেখে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকারী হাজরা মশাই তাঁকে বললেন, "আপনি পরমহংস, এক জায়গায় বসে থাকবেন, অত ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন?" শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবই এমন ছিল যে কখন কখন যখন এরকম উল্টোপাল্টা কথা তাঁর সামনে উপস্থিত হত তখনই তিনি মন্দিরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ঝাউ

তলার দিকে চলে যেতেন। সেদিনও তাই হল। ঝাউতলার দিকে চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, "তোমার কথা শুনবো না। আমার যদি দরকার হয় তবে জলসাগু খেয়েও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভগবানের নাম শোনাবো।" তাই তিনি করেছিলেনও শেষপর্যন্ত। রোগশয্যায় পড়েও তিনি ভক্তদের নিকট ভগবানের নামই করেছিলেন।

তারপরে, তিনি শ্রীমাকে বলেছিলেন, "দেখগো, আমার পরে তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে।" মা বলেছিলেন, "আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করে এসব করতে পারি?" বললেন, "তুমি পারবে, তোমাকে করতে হবে।" আর তিনি জগন্মাতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী, যাতে অপরেরা তাঁর ভাব গ্রহণ করে প্রচার করে তার জন্য নানাজনকে উৎসাহিত করতেন। যেমন কেদারবাবু, যেমন রামচন্দ্র দত্ত মশাই, যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি বলতেন, "এরা যদি শিখিয়ে-টিকিয়ে ভক্তদের নিয়ে আসে তাহলে আমাকে অত কথা বলতে হয় না। দু-চার কথা বললেই তাদের জ্ঞান হয়ে যায়।" সুতরাং তিনি চাইতেন যে অপরেরাও তাঁর হয়ে নানারকম প্রচার করুক, তাঁর ভাবের প্রচারের জন্য তারা কাজে লাগুক। এভাবেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দকেও গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন—কিভাবে সব ভাইদের একসঙ্গে ধরে রাখতে হবে, কি করে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কি করে মঠ পরিচালনা করতে হবে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) পরে একসময় প্রমদাদাস মিত্র মশাইকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন যে ঠাকুর তাঁকে এই কাজ করার ভার দিয়ে গেছেন। একথাটা তাঁর সম্মুখে স্বীকৃত। এটা আমাদের একটা কল্পনা-প্রসূত জিনিস নয়। ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে তিনি দর্শন দিয়ে, এ-বিষয়ে অর্থব্যয়ের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। কাশীপুরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজী এবং অন্যান্য আরও দশজনকে গেরুয়া বস্ত্র দিয়েছিলেন এবং তাদের দিয়ে ভিক্ষা করিয়েছিলেন। এই সঙ্ঘ স্থাপন শ্রীরামকৃষ্ণই করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য ভক্তগণকে অবলম্বন করে।

তিনি বিভিন্ন ভক্তকে দীক্ষা দিয়েছিলেন বলে নানা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। লীলাপ্রসঙ্গের মতে তিনি বৈকুণ্ঠনাথ, তেজচন্দ্র, নিরঞ্জন প্রভৃতিকে আণবী বা মান্ত্রী দীক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-লেখক অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন যে, তিনিও কল্পতরু দিবসে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন। স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে রামমন্ত্র পেয়েছিলেন এটা সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। এছাড়া, শাক্তী দীক্ষা বা গুরু হতে শিষ্যে শক্তি সঞ্চারের অনেক ঘটনা জানতে পারা যায়। কাশীপুরে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় সমস্ত শক্তি নরেন্দ্রনাথকে প্রদান করে ফকির হয়েছিলেন বলে অশ্রুত্যাগ করেছিলেন। কল্পতরুদিবসে অনেককে স্পর্শ করে তাদের মধ্যে ভগবদ্ভাব উদ্দীপিত করেছিলেন। তাছাড়া দক্ষিণেশ্বরাদি স্থানে কত বাচাল ব্যক্তিকে স্পর্শমাত্রের দ্বারা তর্কে পরাজিত করেছিলেন। আর শাম্ভবী দীক্ষা বা গুরু এবং শিষ্যের উভয়ের অজ্ঞাতসারে গুরুশক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়ে তার জ্ঞানোন্মেষ করার কত দৃষ্টান্তই না আছে! তাঁর দর্শন, স্পর্শন, বাক্য-শ্রবণ ইত্যাদির দ্বারা কত আগন্তুকই না প্রভাবিত হয়েছেন।

তাঁর ভাবপ্রচারের নানা উপায় তিনি নিজে দেখিয়ে গেছেন, করে গেছেন। আমরা সেই পথে যাতে পরিচালিত হতে পারি তিনি তার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, কেমনা আমাদের ক্ষমতা

সসীম। আমরা কি করতে পারি? আমাদের নিজেদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। ঠাকুর যদি করিয়ে নেন তবে তার প্রভাবে আমাদের দ্বারা কিছু করা সম্ভব হবে। এই প্রার্থনা করে আজকে আমি শেষ করছি যে ঠাকুর আমাদের সৎ বুদ্ধি দিন, তিনি আমাদের সৎপথে পরিচালিত করুন যাতে তাঁর অর্পিত দায়িত্ব বহন করতে পারি। তাঁর ভাবপ্রচারধারার ভেতর, একটুখানি অবদান দিয়ে যেন আমরা চরিতার্থ হতে পারি।*

* ১ মার্চ ১৯৮৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাবের দেড়শত বৎসর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের একশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের অভিভাষণ।

# আনন্দময়ীর আগমনে সানন্দ ঠাকুর

## শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

ঠাকুর একবার ভক্তদের বলেছিলেন, "চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিছ্‌লো। সিংহদর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!—ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন হলো।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১১।১) মাতৃ-ভাবোদ্দীপনই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃমগ্নতার নিগূঢ় রহস্য। কালীরূপিণী অথবা দুর্গারূপিণী জগন্মাতার যে-কোন অনুসঙ্গের সম্পর্কসূত্রেই যখন ঠাকুরের অমন গভীর ভাবোদ্দীপন হত, তখন সত্যই জগন্মাতা ভগবতী সিংহবাহিনীর দেবী-বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করে তাঁর আনন্দের উদ্দীপ্তি আরও প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। কলকাতায় চাষা-ধোপাপাড়ার জনৈক দরিদ্র মল্লিকের শ্রীহীন পোড়ো বাড়িতে সিংহবাহিনীর মূর্তি দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, "…দেখলুম যে, সেখানেও সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জল্ জল্ করছে! আবির্ভাব মানতে হয়।" (ঐ, ১।৭।২) এই আবির্ভাব তো ঠাকুরেরই আন্তর উপলব্ধির প্রতিভাস, যা সেই মুহূর্তে সেখানকার শ্রীহীন পরিবেশকে শ্রীমন্ত করে তুলেছিল। আবার সিংহ নয়, সিংহবাহিনী দেবীমূর্তিও নয়, যদু মল্লিকের গঙ্গার ধারে বাগানে নরেনের মধুর কণ্ঠে 'কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই'—এই আগমনী গান শুনেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন ঠাকুর। আনন্দময়ীর আগমনী-লীলার বাৎসল্যরস-সিঞ্চিত চিত্রটিই কি তখন জেগে উঠেছিল তাঁর তদ্গত হৃদয়ে? প্রতি বৎসর শারদ-শুক্লা-তিথিতে আনন্দময়ী সিংহবাহিনীর পুণ্য আবির্ভাব যখন ঘটত দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বা কোন ভক্তের বাড়িতে, ঠাকুর তাতে সানন্দে যোগ দিতেন, ভক্তিপ্লুত সঙ্গীতে পরিপূর্ণ করে তুলতেন সেই পূজায়োজন। তাঁর উপস্থিতিই তো যে-কোন উৎসবের সম্পূর্ণতা। তেমন কয়েকটি সার্থক শারদীয়া দুর্গোৎসবের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস শুধু ঠাকুরের রসদদারই ছিলেন না, তিনি আর তাঁর সাধ্বী পত্নী জগদম্বা দাসী ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরের সর্ববিধ সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা। ঠাকুরেরও কাম্য ছিল মথুরের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। সম্ভবত ১৮৬৪* খ্রীষ্টাব্দে মথুরবাবুর

* এই সালটি Christopher Isherwood-এর Ramakrishna and his Disciples গ্রন্থের ১১৪ ও ১২৭ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত। লীলাপ্রসঙ্গে সঠিক সালের উল্লেখ নেই।

জানবাজারের বাড়িতে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনায় মধ্যে শারদীয়া দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। মণ্ডপসজ্জা, ঐশ্বর্যপূর্ণ পূজায়োজন ও ভোগনিবেদনের প্রস্তুতিও বিপুল। ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী পরিবারে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সমারোহে পাড়া-প্রতিবেশীদের আনন্দের সীমা নেই। আবার মথুরবাবুর দুর্লভ সৌভাগ্য, সেই উপলক্ষে তাঁর বাড়িতে সশরীরে উপস্থিত দেব-অতিথি ঠাকুর। দিব্যভাবাবিষ্ট ঠাকুরেরও স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা বুঝি বাধা মানতে চাইছে না। মৃন্ময়ী দেবীতে চিন্ময়ী আনন্দময়ীর রূপানুধ্যানে তন্ময় ঠাকুরের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন স্বামী সারদানন্দ—"মা-র নিকটে বালক যেমন আনন্দে আটখানা হইয়া নির্ভয়ে আবদার, অনুরোধ ও হেতুরহিত হাস্য-নৃত্যাদির চেষ্টা করিয়া থাকে, নিরন্তর ভাবাবেশে প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 'বাবার' সেইরূপ অপূর্ব্ব আচরণে, প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন! আর ঐ প্রতিমাতে মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীর-মনে মা-র আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি একটা অনির্ব্বচনীয়, অনির্দ্দেশ্য সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও অনুভূতি হইতেছে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৫৮ গুরুভাব পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ২০৮)।

সেদিন দিনের বেলায় পূজা শেষ হয়ে গেল, সন্ধ্যারতির কিছু আগে ঠাকুর মথুরবাবুর অন্দরে উপবিষ্ট শুধু নন, আবিষ্ট। তাঁর চেষ্টায় ভাষণে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন জগন্মাতার চরণে চির-সমর্পিতপ্রাণা দাসী। মথুরবাবুর দেওয়া সুন্দর গরদের চেলী পরে নারীর রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বসতে না বসতেই ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হয়ে গেলেন। এদিকে আরতির সময় হয়ে গেল, তবু ঠাকুরের সমাধি আর ভাঙ্গে না। কিন্তু তাঁকে যে পূজামণ্ডপে নিয়ে যেতেই হবে। অগত্যা মথুর-পত্নী বুদ্ধি করে তাঁর মূল্যবান রত্নালঙ্কারে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে ভূষিত করে কানে কানে বার কয়েক বললেন,—'বাবা চল মার আরতি হবে, মাকে চামর করবেনা?' একথা শুনে কিছুটা প্রকৃতিস্থ ঠাকুর সেই দাসী ও সখী ভাবাবেশের আনন্দ নিয়েই ঠাকুরদালানে আরতি দেখতে এলেন এবং অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে দেবীপ্রতিমাকে চামর-ব্যজন করতে লাগলেন। আশ্চর্য! পুরুষদের মধ্যে দণ্ডায়মান মথুরবাবু চিনতেই পারলেন না তাঁর স্ত্রীর পাশে চামর হস্তে কে ঐ সুবেশা সুন্দরী রমণী! পরে সত্য ঘটনা জেনে মথুরবাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ঠাকুর তখন দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। মথুরবাবুর স্ত্রী বলেছিলেন, "মেয়েদের মত কাপড়-চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনে হয়না।" (ঐ, পৃঃ ২১৭) ঠাকুরের পবিত্র উপস্থিতি ও দিব্যলীলার সংযোগে সেবারের শারদীয়া দুর্গোৎসবের তিনটি দিন এক স্বর্গীয় আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই বিসর্জনের বিদায়-বার্তা নিয়ে বিজয়ার দিনটি যখন এল, তখন মথুরবাবু অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে সঙ্কল্প করলেন, তিনি প্রতিমা বিসর্জন দেবেন না, ঘরে রেখে নিত্য পূজা করবেন। মাকে ছেড়ে কি করে থাকবেন তিনি? কারো কোন আপত্তি কানে নিলেন না মথুরবাবু। অবশেষে ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বলে? আর বিসর্জ্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়?…এ তিনদিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে বসে তোমার পূজা নেবেন।" (ঐ, পৃঃ ২২০) এ-কথায় মথুরবাবু শান্তমনে

প্রতিমা বিসর্জন দিলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকাল। ভক্ত অধর সেনের বাড়িতে দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়েছে। অধরবাবুর সাগ্রহ আমন্ত্রণে ঠাকুর এসেছেন তাঁর বাড়িতে। নবমী পূজার দিন সন্ধ্যায় ঠাকুর পূজামণ্ডপে দাঁড়িয়ে আনন্দময়ী শ্রীদুর্গার আরতি নিরীক্ষণ করছেন, সঙ্গে ভক্তরাও রয়েছেন। আরতি দেখতে দেখতে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর মধুরকণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত ধরলেন সকল গৃহীভক্তের কল্যাণ কামনায়—

তার তারিণী। এবার ত্বরিত করিয়ে,
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত যায় মা প্রাণী।
জগত অম্বে জন-পালিনী, জনমোহিনী
জগত-জননী॥ ইত্যাদি

গান থামলো, কিন্তু ঠাকুরের মনে রয়ে গেল সেই ভক্তিভাবের আবেশ। অধরবাবুর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "ও বাবুরা, আমি খেয়েছি, এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও" (কথামৃত, ৫।১০।১) এ-কথার নিগূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীম বলছেন, "অধরের নৈবেদ্য পূজা মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার আবেশে বলিতেছেন, 'আমি খেয়েছি এখন তোমরা প্রসাদ পাও?'" (ঐ) ঠাকুর জগন্মাতাকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "মা আমি খাব? না, তুমি খাবে? মা কারণানন্দরূপিণী।" (ঐ) শ্রীরামকৃষ্ণ কি জগন্মাতাকে ও আপনাকে এক দেখছেন? যিনি মা তিনিই কি সন্তানরূপে লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন? তাই কি ঠাকুর 'আমি খেয়েছি বলছেন!' 'জগন্মাতা ও আপনাকে' এক করে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই এবং 'যিনি মা তিনিই সন্তান' এই উপলব্ধি দৃঢ় প্রত্যয়ীভূত হয়েছিল বলেই তো ঠাকুরের মাতৃপূজা ও আত্মপূজা রূপ নিয়েছিল এক অদ্বৈত সাধনার সিদ্ধিতে।

ঠাকুরের অভিনব পূজা-রীতির বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ভাগিনেয় হৃদয়,—"দেখিতাম, জবাবিল্বার্ঘ্য সাজাইয়া মামা প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্বাঙ্গ, এমনকি নিজপদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।...দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগ নিবেদন করিতে করিতে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং থালা হইতে এক গ্রাস অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মার মুখে স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন! 'খা, মা খা! বেশ করে খা!' পরে হয়তো বলিলেন, 'আমি খাব? আচ্ছা, খাচ্ছি!—এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন—'আমি তো খেয়েছি। এইবার তুই খা!'" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ১৩৫৮ সাধকভাব, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ১১৮) এমন অভূতপূর্ব মাতৃপূজার দিব্য অনুভূতি অন্তরে সদা দীপ্যমান থাকত বলেই কি ঠাকুর অধর সেনের নিমন্ত্রিতদের বলতে পেরেছিলেন সেই কথা, "ও বাবুরা, আমি খেয়েছি, এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও।" ধন্য ভক্ত অধরবাবু, সেবারে তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবে ঠাকুর 'যিনি মা তিনি সন্তান' ভাবে আবিষ্ট হয়ে সেই পূজায়োজনকে গভীর তাৎপর্য-মণ্ডিত করে তুলেছিলেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবে বিশেষ করে নবমী পূজার দিনটিতে আনন্দোৎফুল্ল ঠাকুরের বর্ণনা শোনা যাক শ্রীম-র মুখে,—"এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইল। মা-কালীর মঙ্গল আরতি হইয়া গেল। নহবৎ হইতে রোশনচৌকি প্রভাতী রাগ-রাগিণী আলাপ করিতেছে। চাঙারি হস্তে মালীরা ও সাজি হস্তে ব্রাহ্মণেরা পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেছেন।

মার পূজা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়াছেন। ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও মাষ্টার গত রাত্রি হইতে রহিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের ঘরের বারাণ্ডায় শুইয়াছিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন, ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন বলিতেছেন—'জয় জয় দুর্গে! জয় জয় দুর্গে! —ঠিক একটি বালক। কোমরে কাপড় নাই। মার নাম করিতে করিতে ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতেছেন—কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন—সহজানন্দ, সহজানন্দ।" (কথামৃত, ২।১৭।১)

ঠাকুর কঠিন গলরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে ভক্তরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় শ্যামপুকুর অঞ্চলে একটি বাড়িতে নিয়ে এলেন উপযুক্ত চিকিৎসার জন্যে। চিকিৎসা চলছে প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের তত্ত্বাবধানে। ভক্তেরা চিকিৎসা ও সেবার যথাসাধ্য আয়োজন করছেন। সে-বছরও শারদীয়া দুর্গাপূজার দিন ক্রমে এগিয়ে এল। ভক্তরা দুঃখে ম্রিয়মাণ। তাঁর নিত্য আরাধ্য ঠাকুরের দিব্য উপস্থিতিতে জগন্মাতার পূজায়োজন করা আর সম্ভব হবে না। অসুস্থ ঠাকুরকে আর কোন জনসমারোহে নিয়ে যাওয়া চলবে না। ঠাকুর উপলব্ধি করতে পারছিলেন তাঁর ভক্তদের মর্মবেদনা। যে-ঠাকুর সোল্লাস সঙ্গীতে মায়ের কাছে অনুনয় জানাতেন এই বলে 'আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করোনা', তাঁর নিজের মন কি এবারেও অন্যবারের মতো উতলা হয়ে উঠছে না আনন্দময়ীর আগমনকে সানন্দে বরণ করতে? গত বছর দক্ষিণেশ্বরেই তো দেখা গেছে, কি দিব্য আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন ঠাকুর পূজার দিন কয়টিতে। তাই তাঁর মন নিয়েও যখন বিশিষ্ট ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র তাঁর সিমলার (কলিকাতা) বাড়িতে সে-বছর দুর্গোৎসব আয়োজন করলেন, তখন ঠাকুর শুধু সম্মতি দান নয় প্রচুর উৎসাহও দিলেন তাঁকে। সুরেশচন্দ্র এই বিশ্বাসে হৃষ্ট থাকলেন যে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির সম্ভাবনা না থাকলেও অশরীরীভাবে তাঁর দৈবী উপস্থিতির আলোকে উজ্জ্বল ও সার্থক হয়ে উঠবে এই পূজায়োজন। গুরুভ্রাতাদের সহযোগিতায় পূজা শুরু হয়ে গেল। মহাষ্টমীর দিন বিকাল থেকে শ্যামপুকুর বাড়িতে অসুস্থ ঠাকুরকে ঘিরে অন্তরঙ্গ ভক্ত সমাবেশ; অনেকের সাথে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারও সেদিন উপস্থিত সেখানে। নরেন্দ্র-নাথের সুধাকণ্ঠে ভক্তিপ্লুত ভজন শুনতে শুনতে আনন্দে সবাই আত্মহারা। কখন সবার অগোচরে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি শুরু হয়ে গেল। সচকিত হয়ে ডাক্তার সরকার বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ঠাকুর সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন। ভক্তরা সুনিশ্চিত ধারণা করলেন—তখন অষ্টমীর সন্ধি-পূজার লগ্ন, অবচেতনায় সেই শুভক্ষণ অন্তরে সঞ্চারিত হওয়ায়ই ঠাকুরের এই দিব্য সমাধির কারণ। প্রায় আধঘণ্টা পরে সমাধি ভাঙলো, বিস্ময়-বিমূঢ় ডাক্তার তখন চলে গেলেন। পরে ভক্তদের কাছে ঠাকুর এই সমাধির বিষয়ে যা বলেছিলেন তা বিবৃত করেছেন স্বামী সারদানন্দ। "এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতি-রশ্মি নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে মা মা বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার

প্রাণ শীতল হইবে।" ( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৮ম অধ্যায়, পৃঃ ১৬৩ ) নরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরের নির্দেশে তখনই সুরেশচন্দ্রের বাড়ি গিয়ে জানতে পারলেন, ঠাকুরের সমাধিদৃষ্ট ঘটনাই যথার্থ। সত্যই অষ্টমীর ঐ সন্ধিপূজাকালে আলোকোজ্জ্বল উঠানে বসে সুরেশচন্দ্র মাতৃনাম নিয়ে রোদন করেছিলেন। আশ্চর্য ঠাকুরের উপলব্ধির গভীরতা! ৺বিজয়ার দিনে সুরেশ এলেন ঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করতে। ঠাকুর সুরেশকেও সেই সমাধির অভিজ্ঞতার কথা বললেন। "কাল ৭টা ৭৷৷-টার সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ময়। এখানে ওখানে এক হয়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু'জায়গার মাঝে বইছে!—এবাড়ি আর তোমাদের সেই বাড়ি!" ( কথামৃত, ৩।২০।১ ) 'এখানে ওখানে' বলে ঠাকুর বুঝি বোঝাতে চাইলেন, সুরেশের বাড়ির পূজায় বিচ্ছুরিত সেই ভক্তির আলোক তখন শুধু শ্যামপুকুরের বাড়ি নয় তাঁর ঐশী চেতনাখণ্ড অন্তরও উদ্ভাসিত করে রেখেছিল, স্থান কাল জাগতিক পার্থক্য। সুরেশও বললেন তাঁর তৎকালীন অনুভূতির কথা—"আমি তখন ঠাকুর দালানে মা মা বলে ডাকছি,…মনে উঠলো মা বললেন, 'আমি আবার আসবো।'" ( ঐ ) ঠাকুরই যেন অলক্ষ্যে তখন নিজের উপলব্ধির সঙ্গে ভক্তিমান সুরেশের মাতৃ-ব্যাকুলতাকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন ভক্তের প্রতি করুণায় অনুপ্রেরিত হয়ে। মনে হয় সশরীরে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও সুরেশচন্দ্রের বাড়ির এই দুর্গোৎসব রোগজীর্ণ ঠাকুরকে পূজার কয়টি দিন সর্বক্ষণ দেবীভাবে আবিষ্ট করে রেখেছিল শ্যামপুকুরের বাড়িতে। তাই এবারের পূজায়ও মা আনন্দময়ী তাঁকে নিরানন্দ করেননি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৮৮৬ দুর্গোৎসব আর ঠাকুরের ভাবোন্মত্ত বন্দনায় নন্দিত হয়ে উঠতে পারল না। কেননা তার কিছু আগেই আনন্দময়ী জগন্মাতার দেব-সন্তান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর মর্তলীলা সংবরণ করেছিলেন।

# চোখ খুলেও দেখা

## স্বামী নির্জরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, "( বিজয়ের প্রতি )—আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কত্তুম। তারপর ভাবলুম। এমন কল্লে ( চক্ষু বুজলে ) ঈশ্বর আছেন, আর এমন কল্লে ( চক্ষু খুললে ) কি ঈশ্বর নাই, চক্ষু খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু,—গাছপালা চন্দ্রসূর্যমধ্যে, জলে, স্থলে—সর্বভূতে তিনি আছেন।"[১]

সাধারণ মানুষের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তার মনকে বহির্মুখী করে বিষয়সমূহের দিকে আকর্ষণ করে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব-মন জন্ম জন্মান্তরের অভ্যাসের ফলে সংসারকে সত্য ও বিষয়সমূহকেই সুখকর বলে জ্ঞান করে। এ ভ্রমজ্ঞান চিত্তে স্থায়ী সংস্কাররূপে পরিণত হয়। যতকাল মানুষ এরূপ সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে ততকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি লাভের জন্য প্রয়াস করেও সফলকাম হতে পারে না।

অভিজ্ঞতাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষক। বহু জন্মার্জিত অভিজ্ঞতায় মানুষের মনে 'জিজ্ঞাসা'-র উদয় হয়। প্রশ্ন আসে—'কঃ পন্থাঃ' ?—উপায় কি ? যে-জন্মে এ জিজ্ঞাসা আসে সে জন্মই

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯০

সার্থক ও দুর্লভ। কারণ সে জন্মেই তার ভোগ-সুখাদিতে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং সংসারে নির্বেদ উপস্থিত হয়।

ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে সাধক স্বীয় মনকে বিষয়চিন্তা থেকে প্রত্যাহার করে ঈশ্বরাভিমুখী করার জন্য প্রথমে বহিরিন্দ্রিয়নিচয়কে সংযত করেন, চক্ষু মুদ্রিত করেই। কারণ বহির্বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ চিত্তকে স্বভাবতই বিক্ষিপ্ত করে। যতদিন বহির্বিষয় দর্শনমাত্রে মন বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় ততদিন উন্মীলিত চক্ষুরিন্দ্রিয় সাধকের চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়। তাই উপনিষদে আছে: "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্‌ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌॥" অর্থাৎ, "বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমেশ্বর বিনাশ করিয়াছেন, সুতরাং জীব বহির্বিষয়-সমূহই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নহে। কোনও বিবেকী, অমৃতত্বের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিসংযম-পূর্বক প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।"[২]

নিমীলিত-চক্ষু সাধক ধৈর্য ও নিষ্ঠা অবলম্বন করে অভ্যাসের দ্বারা অন্তর্মুখী মনকে ধারণা ও ধ্যান সহায়ে শান্ত করতে সমর্থ হন। এই শান্ত মনই ধ্যেয় বস্তুতে সম্পূর্ণ একাগ্র হয়। সম্পূর্ণ শান্ত ও একাগ্র চিত্তেই আত্মসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বর-দর্শন লাভ হয়। "পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি"—যেখানে গেলে মন একেবারে শান্ত হয়ে যায়, তাকেই বিজ্ঞগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলে থাকেন।[৩] শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলতেন, ঈশ্বর "শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।"[৪]

সমাধিমান পুরুষের মন যখন প্রপঞ্চময় জগতে ব্যুত্থিত হয় তখন তাঁর নিকট জগৎ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত। জগতের পৃথক্‌ সত্তা বা সত্যতা তাঁর কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়। যাঁকে নিমীলিত নেত্রে শুদ্ধ চিত্তে অন্তরে দর্শন করেন, তাঁকেই ব্যুত্থিতাবস্থায় উন্মিলীত নয়নে সর্বত্র দর্শন করেন। "যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।"[৫] এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী প্রত্যক্ষ করেন, "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ অর্থাৎ তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারী; তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ডসহায়ে স্খলিত পদে চল, এবং তুমিই জাত হইয়া নানারূপ ধারণ কর।"[৬]

তখন ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বাবস্থায় চক্ষু খুলেই ঈশ্বরকে দেখেন। এ চক্ষু দিব্য চক্ষু। নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তিকালে স্বামী বিবেকানন্দ) একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচ-ছয় দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কতকটা উত্তেজিত কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ছি ছি তুই এত বড় আধার তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বট-গাছের মতো হবি; তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস। এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! না রে, এত ছোট নজর করিসনি। আমি বাপু

২ স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ্‌ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, কঠোপনিষদ্‌, ২।১।১

৩ শ্রীমদ্‌ভাগবত, ২।১।১৯

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৬৪২

৫ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ

৬ উপনিষদ্‌ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ৪।৩

সব ভালবাসি। মাছ খাব তো ভাজাও খাব, সিদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অম্বলেও খাব, তাঁকে সমাধি অবস্থায় নির্গুণভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্তির ভেতর ঐহিক সম্বন্ধ-বোধেও ভোগ করি। এক ঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর—একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত তুই হ।"

"…নরেন্দ্র আজ…বুঝিলেন, কেবল নিজ মুক্তির জন্য লালায়িত থাকাও এক প্রকার স্বার্থপরতা; আজ মনে হইল, পরমহংসদেব যে বলিয়া থাকেন, 'চোখ বুজিলেই ভগবান আছেন, আর চোখ চাহিলে কি তিনি নাই?'—এ কথার একটা গভীর তাৎপর্য আছে।"[৭]

স্বামী বিবেকানন্দ যখন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষ পরিক্রমা করছিলেন তখন তিনি অন্তরের উপলব্ধি ব্যক্ত করে তাঁরই গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে বলেছিলেন, "হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথাবোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখ-বোধ জেগেছে।"[৮] স্বামীজীর ঈশ্বর তখন নিজ অন্তরেই বিদ্যমান নন, তাঁর ঈশ্বর সকল জীবেরই অন্তরাত্মা। তাই তিনি তাঁর শিষ্যশিষ্যাদের শিক্ষাচ্ছলে বলেছিলেন, "আমরা সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করতে পারি। তাঁকে কোথাও খুঁজে বেড়িও না—তিনি তো প্রত্যক্ষ রয়েছেন, তাঁকে শুধু দেখে যাও।"[৯] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত যে অপূর্ব বাণী "জীব শিব, শিবজ্ঞানে জীব সেবা" তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রবণ করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি এ যুগ স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে শ্রবণ করেছে মহামন্ত্ররূপে "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? / জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[১০]

স্বামীজী বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে আসার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষ তথা এ-যুগের সকল মানুষকেই এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির।" ধ্যানী সাধক যে ভগবানকে নিজ হৃদয়গুহায় ধ্যান ও উপাসনা করেন চক্ষু নিমীলিত করে, তিনিই স্বীয় ইষ্ট বা ভগবানকে সর্বত্র সকলের মধ্যে বিরাজমান বলেও ভাবনা করবেন চক্ষু উন্মীলিত করে। যা সাধনা তাই লাভ হবে সিদ্ধাবস্থায়। এ-প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একখানি চিঠির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন, "তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। আত্মা জীব জগৎ সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। যে বলে তিনি ছাড়া আর কিছু আছে, তাহার মোহ বিগত হয় নাই।"[১১] যুগ-ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনাদি মন্থন করে সিদ্ধান্ত বাক্য-সুধা এ-যুগের মানুষকে উপহার দিয়ে গেলেন—"চক্ষু খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন।"

ধর্মতত্ত্বসকল শাস্ত্রাদিতে নিহিত আছে। যে-ধর্মানুষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র ঠাকুরঘরে, মন্দিরাদি ও তীর্থস্থানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সে-সকল জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পালন করাই এ-যুগের চরম আদর্শ। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জগতের

৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৭৯-৮০
৮ ঐ, পৃঃ ৪০৮
৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৪।২৩৩
১০ ঐ, ৬।২৬৯
১১ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ১৩৮২ সংস্করণ, পৃঃ ১৩৮

মধ্যে যে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মিত হয়েছে তা ভঙ্গ করে বিরাট ব্যবধানের অবসান ঘটাবার সাধনা করতে হবে এ-যুগে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমময় জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় যা অনুভূতি করেছিলেন, সেগুলি স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত না করে ক্ষান্ত হতেন না। ধর্মই জীবনকে সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ধারণ করে রাখতে সক্ষম হয়। তাই প্রত্যেকের জীবন-সংগ্রামে সম্যক্ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনীয়। চক্ষু মুদ্রিত করে যাঁকে ধ্যান সহায়ে অন্বেষণ করা হয় তাঁকেই চক্ষু খুলে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে দেখার সাধনা করে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগীদের জীবনের চরম লক্ষ্য চোখ খুলেও ঈশ্বরকে দেখা।

# সাধক কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ

শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ এক অনন্য প্রতিভা। বাংলা-চরিত কাব্যের ইতিহাসে তিনি সর্বত্র, সর্বসময়ে এবং সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। চরিত কাব্যটি কবির পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর আপন অঙ্গে সর্বত্র বহন করছে। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' রচনাটি বাংলা-সাহিত্যে এক কালজয়ী রচনা।

কৃষ্ণদাসের জীবন পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয়, আত্মপ্রকাশে তিনি ছিলেন স্বভাবকুণ্ঠ। চরিতকাব্যে তাঁর ব্যক্তিপরিচয় সামান্যই উক্ত হয়েছে। শুধু এক জায়গায় কবি 'ঝামটপুর' গ্রামের উল্লেখ করেছেন :

"নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥"

[ কৃষ্ণদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, দেব সাহিত্য-কুটীর, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৭৫, আদিলীলা। ৫, পৃঃ ৬১ ]

কিন্তু ঐ গ্রাম যে কৃষ্ণদাসের জন্মভূমি, সে-বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবু এই গ্রামটিকে তাঁর জন্মভূমি ধরে নেওয়া হয়েছে। কবি জানিয়েছেন, 'নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।' তবে এই নৈহাটি কলকাতার কাছাকাছি নয়; বরং বেশ কিছুটা দূরে,—বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে। রেলপথে ব্যাণ্ডেল থেকে বারহাড়োয়া লাইনে বহরাণ হল্ট নামে একটি ছোট ষ্টেশন পড়ে। বহরাণ থেকে হাঁটাপথে ঝামটপুর গ্রাম প্রায় তিন মাইল। হাওড়া ষ্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় একশো মাইল। ঝামটপুরে যে-জায়গায় কৃষ্ণদাসের বাড়ি ছিল, সেটি কিছু-কাল আগে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন ঐ জায়গার নাম ছিল, চক্রপাণবাটী। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জরিপের সময় চক্রপাণবাটী মৌজা ঝামটপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। [ কৃষ্ণদাস কবি-রাজের জীবন-চরিত প্রণেতা বহরাণ গ্রামনিবাসী শ্রীসত্যকিঙ্কর রায়ের তথ্যানুসারে। দ্রষ্টব্য গ্রন্থ : শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৩২ ] ঝামটপুরে কবিরাজ গোস্বামীর এক পাটবাড়ি আছে। তাঁর গৃহদেবতা গিরিধারী গোপালকে কেন্দ্র করে এই শ্রীপাটের সৃষ্টি।

প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে কৃষ্ণদাস জন্মভূমি পরিত্যাগ করে বৃন্দাবন যাত্রা করেন :

"কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥"

[ ঐ, আদি। ৫, পৃঃ ৬২ ]

জীবৎকালে আর কোনদিন তিনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেননি। বৃন্দাবন যাত্রাকালে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য মুকুন্দদাসের উপর গৃহ-দেবতার সেবা ও পূজাদির ভার অর্পণ করে-ছিলেন। কিছুকাল পর মুকুন্দদাস অন্যের উপর সেই পূজাদির সুবন্দোবস্ত করে বৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামীর আশ্রয়ে উপস্থিত হন; কিন্তু গুরুর আদেশে পুনরায় ঝামটপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিল বাল গোপাল মূর্তি, শ্রীগিরিধারী জীউ শালগ্রাম, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতা-মৃতের প্রতিলিপি এবং কবিরাজ গোস্বামীর ব্যবহৃত একজোড়া খড়ম। শ্রীপাটে অদ্যাবধি সেগুলি ভক্তিসহকারে পূজিত হচ্ছে। কবিরাজ গোস্বামীর সম্মানার্থে আজও ঝামটপুরে কোন ব্যক্তি খড়ম ব্যবহার করেন না। শ্রীসত্যকিঙ্কর রায়ের তথ্যানুসারে ;—দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃঃ ৬৩৩ ] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পূজ্যপাদ গোস্বামীর তিরোধানের পর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষ্ণবগণ তাঁর জন্মভূমিতে সমবেত হয়ে প্রতি সবছর সেখানে একটি স্মরণ উৎসব পালন করেন। প্রায় তিনশো বছরের অধিককাল এই স্মরণোৎসব চলে আসছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের আদি নিবাস সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যগুলি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। অনেক তথ্যই বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কৃষ্ণদাসের জন্মভূমি 'ঝামটপুর' বা তৎপূর্বে কথিত 'চক্রপাণবাটী' নাম দুটির প্রকৃত অর্থ আজও জানা যায়নি। স্বগ্রামে গোস্বামী কবিরাজের কোন নির্ভরযোগ্য স্মৃতিচিহ্ন নেই। তাঁর আদি নিবাসের কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। এমনকি প্রামাণিক স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁর বসতবাটির ধ্বংসাবশেষও লক্ষ্য করা যায় না; অথচ কৃষ্ণদাসের পারিবারিক অবস্থা কোন সময় মন্দ ছিল না। স্বগ্রামে তিনি কৃতবিদ্য-পুরুষরূপে খ্যাত ছিলেন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে তিনি ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্যামদাস (অনেকের মতে, শ্যামাদাস) পিসিমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। পিসিমার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল; কিন্তু তাঁর নিবাস কোথায় ছিল এবং কৃষ্ণদাস কোথায় প্রতিপালিত হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। পিসিমার নিবাস ঝামটপুর হলে কবিরাজ গোস্বামীর আদি নিবাস কোথায় ছিল বা একই গ্রামে ছিল কিনা, সে-সম্পর্কেও কোন প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত হয়নি।

কৃষ্ণদাসের পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল এবং তিনি যে অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে-ছিলেন, চরিতকাব্যে তার সমর্থন পাওয়া যায়। আত্মকথাপ্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন :

"আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্তন।
তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥"

[ ঐ, আদি। ৫, পৃঃ ৬০ ]

উপরোক্ত শ্লোক হতে অনুমিত হয়, তাঁর পিতৃদেব সেই সময় জীবিত ছিলেন না এবং তাঁর গৃহে নাম সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠান প্রায়ই হত। সেই উপলক্ষে বৈষ্ণবগণ আমন্ত্রিত হতেন। তাঁর ভদ্রাসনে ঠাকুর-মন্দির ছিল। মন্দিরে শ্রীরাধা-মদনমোহন মূর্তি ছিল এবং সেই মূর্তি নিত্যপূজা হত। যেহেতু কবিরাজ জাতিতে বৈদ্য, ঠাকুর পূজার জন্য একজন ব্রাহ্মণ পূজারি নিযুক্ত ছিল। চরিত কাব্যে একথার উল্লেখ আছে :

"গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিঁহো করে সেবাকার্য্য ॥"

[ ঐ, আদি। ৫, পৃঃ ৬১ ]

শ্রীমূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীরাধা-মদনমোহন মূর্তি,—কবিরাজের কুলদেবতা।

কৃষ্ণদাস একসময় বিদগ্ধ সমাজে বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে সুখ্যাত হয়েছিলেন। তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে তাঁর জ্ঞান-গরিমা দূরবিস্তৃত হয়েছিল। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক এবং উচ্চস্তরের কবি ও জটিল দর্শনতত্ত্বের সুনিপুণ ব্যাখ্যাকার। ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। অল্প বয়সে তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়ন করে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কিঞ্চিৎ ফরাসী রপ্ত করেছিলেন। যৌবনে 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী', ব্যাকরণ, 'বিশ্বপ্রকাশ' ও 'অমরকোষ' অভিধান পাঠ করেছিলেন। চরিতামৃত রচনায় উক্ত গ্রন্থগুলি উল্লেখ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই কৃষ্ণদাসের সাধুসংসর্গ ও ধর্মালোচনার প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। সুতরাং এমন একজন বিদগ্ধ বৈষ্ণবাচার্যের কোন স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট নেই, এরূপ ঘটনা নিতান্তই কষ্টকল্পিত।

'কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মভূমি' রচনাটির লেখক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ( ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৫৪, পৃঃ ২০৮ ) লিখেছেন—নৈহাটী, ঝামটপুর হতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এর কাছেই দ্বাদশ গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আদি নিবাস, 'উদ্ধারণপুর' গ্রাম। মন্তব্যটির যৌক্তিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট দ্বিধা আছে। দত্ত ঠাকুরের আদি নিবাস যে সপ্তগ্রামে ছিল, সে সম্পর্কে কতকগুলি প্রামাণিক তথ্য ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তী রচিত প্রাচীন ভক্তিরত্নাকরে আছে :

"হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের সপ্তগ্রামে।
নরোত্তম প্রবেশে বিহ্বল হয়ে প্রেমে ॥
লোকে জিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণ দত্তের আলয়।
কহিয়া ক্রন্দন কেহ কহে এই হয় ॥"

[ ভক্তি রত্নাকর ]

চৈতন্যভাগবৎকার বৃন্দাবন দাসের কথায় :

"কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে ॥"

[ শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবৎ, অন্ত্যখণ্ড, শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ৩০৮ ]

দত্ত ঠাকুর জাতিতে সুবর্ণ বণিক। অনেকের মতে তিনি নাকি গন্ধবণিক এবং তাঁর নিবাস ছিল কাটোয়ার উত্তর গঙ্গাতীর সন্নিহিত উদ্ধারণপুরে। বলাবাহুল্য, সুবর্ণ বণিকের মতো গন্ধবণিকেরও 'দত্ত' পদবী আছে ; কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে, সেই উদ্ধারণপুরে দত্ত ঠাকুরের আদি নিবাস ছিল। অনেককাল আগে ত্রিবেণী এবং সপ্তগ্রাম একই বা পাশাপাশি জনপদ ছিল এবং সেখানে দত্ত ঠাকুরের মন্দির এবং বসতবাটি ছিল। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের উত্তর পুরুষ হুগলী জেলা নিবাসী সুবর্ণ বণিক জগমোহন দত্তের বাড়িতে প্রতিদিন অন্যান্য বিগ্রহের সাথে উদ্ধারণ ঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে। উদ্ধারণ দত্ত, ঠাকুর হয়েছিলেন এবং ঠাকুর নামেই তিনি বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধ। দেবকীনন্দনের শ্লোকে এর সমর্থন আছে :

"উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা অবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ ॥"

[ বৈষ্ণব বন্দনা ]

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের উত্তর পুরুষ জগমোহন দত্তের নিবাস, হুগলী-বালী একসময় ছিল সপ্ত গ্রামের কাছাকাছি একটি গ্রাম। [ 'উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর', ৺দীননাথ ধর, বি. এল প্রণীত ( ১৩৩১ ) ]

কাটোয়ার ঝামটপুর গ্রাম নৈহাটি থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। সুদূর অতীতে নৈহাটি ছিল এক বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। শোনা যায়, একসময় 'নৈ' নামে এক রাজা সেখানে বাস করতেন। ঐ অঞ্চলে তাঁর রাজবাড়ি ছিল। আজও লোকে কতকগুলি ধ্বংসস্তূপকে ঐ রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ বলে নির্দেশ করে। 'নৈ' রাজার নামেই ঐ গ্রামের নাম হয়েছে, নৈহাটি। অবশ্য নৈহাটির একটা সংস্কৃত নামও পাওয়া যায়,—'নবহট্ট'। জীব গোস্বামী রচিত 'লঘুতোষণী'-তে নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পৈতৃক নিবাস ছিল। সনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে গঙ্গাতীরস্থ নৈহাটি গ্রামে বসবাস শুরু করেছিলেন। [ রূপ-সনাতন গোস্বামী, হীরেন্দ্র-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৭, পৃঃ ৯১১ ]

ঝামটপুরের মতো কৃষ্ণদাসের পাটবাড়ি আর এক জায়গায় আছে সেই জায়গাটির নাম, 'কৃষ্ণপুর'। জায়গাটি উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আদি নিবাস, উদ্ধারণপুরের কাছাকাছি। 'উদ্ধারণপুর' এবং 'কৃষ্ণপুর' গ্রাম দুটি সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। সপ্তগ্রাম অর্থে সাতটি গ্রামের সমষ্টি। সেই গ্রামগুলি,—'বাসুদেবপুর', 'বংশবাটি', 'কৃষ্ণপুর', 'নিত্যানন্দপুর', 'শিবপুর', 'শঙ্খনগর' ও 'সপ্তগ্রাম'। 'সপ্তগ্রাম' নামে পৃথক গ্রামটির উত্তর পশ্চিমে সরস্বতী নদী, পূর্ব ও উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে দেবানন্দপুর ( কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি )। এই সাতটি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত এবং আজও বর্তমান। সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। স্থানীয় লোকেরা 'পাটবাড়ি' বলে। এখান থেকে দু মাইল দূর অর্থাৎ কৃষ্ণপুরে দাস গোস্বামীর শ্রীপাট। এখানে প্রতি বছর মাঘ মাসের প্রথম দিনে একটি মেলা বসে। একই দিনে ত্রিবেণীতেও অনুরূপ একটি মেলা হয়। লোকেরা উৎসবের দিনে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করে কৃষ্ণপুরে কৃষ্ণদাস গোস্বামীর পাটবাড়িতে সমবেত হয়। ত্রিবেণী থেকে কৃষ্ণপুরের দূরত্ব পাঁচ মাইল।

কৃষ্ণপুরে দাস গোস্বামীর পাটবাড়ি সম্পর্কে ইতিবৃত্ত লোকের জানা নেই। এ-সম্পর্কে কেউ কোনদিন অনুসন্ধান করেছিল কিনা তাও অজ্ঞাত। কবে বা কি কারণে এই শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই তথ্য জানা থাকলে দাস গোস্বামীর ধর্মজীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় এবং ঘটনা প্রকাশ পেত। তবে যতদূর মনে হয়, বৃন্দাবন যাত্রার পথে কৃষ্ণদাস সপ্তগ্রামে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। অবশ্য নিত্যানন্দ প্রভুকে সশরীরে দর্শনলাভ তাঁর জীবনে হয়ে ওঠেনি। কবির স্বপ্নাদেশের চরিত্র-চিত্রনটি সুমধুর :

"অরে অরে কৃষ্ণদাস না করত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়॥"

[ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদি। ৫, পৃঃ ৬২ ]

সেই নিত্যানন্দ প্রভু কিছুকাল সপ্তগ্রামে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর নামেই সপ্তগ্রামের একটি নাম—নিত্যানন্দপুর। চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ প্রথম পানিহাটিতে এবং পরে খড়দহ হয়ে সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। সেই সময় সপ্তগ্রাম এক সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। সেখানে বহু লোকের বাস ছিল। এখন জঙ্গলাকীর্ণ এবং প্রায় জনবিরল স্থান। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীকবি কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ পাওয়া যায় :

"সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥

তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বসয়ে সপ্ত গ্রাম ॥"

[ চণ্ডীমঙ্গল : কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ]

হুগলীর উত্তর পশ্চিমে সপ্তগ্রাম। হাওড়া থেকে রেলপথে প্রায় সাতাশ মাইল। এক সময় সপ্তগ্রাম ছিল বৈষ্ণবগণের পরমতীর্থ। ধন ও ধর্মের এক অতি বিরল স্থান। প্রভু নিত্যানন্দের স্মৃতি বিজড়িত এই জনপদ এক সময় সমৃদ্ধির শীর্ষ শিখরে উন্নীত হয়েছিল। এখানে অনেক সম্রান্ত বণিক ও বৈশ্যের বসবাস ছিল। তাঁরা ছিলেন যেমন বিত্তবান তেমনি ধর্মনিষ্ঠ। চৈতন্য-চরিতের অন্ত্যখণ্ডে কথাগুলির সমর্থন পাওয়া যায় :

"যতেক বণিক কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার ॥
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে ॥"

প্রভু নিত্যানন্দের স্মৃতি বিজড়িত সেই জন্মভূমি সপ্তগ্রামের প্রতি স্বপ্নাদিষ্ট কৃষ্ণদাস যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বৃন্দাবনের পথে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন, এমন ধারণা অযৌক্তিক নয়; বরং অনেকাংশে যুক্তিবহ; কারণ চরিতকাব্যে সপ্তগ্রামের চিত্রগুলি সজীব এবং হৃদয়গ্রাহী। একমাত্র প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই এ-ধরনের নিখুঁত চিত্রচিত্রণ সম্ভব। কৃষ্ণপুরে দাস গোস্বামীর শ্রীপাট মনে হয় এক স্মৃতি মন্দির। তিনি যে সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন, সেটি তারই স্মৃতি।

'ঝামটপুর' বা 'চক্রপাণবাটী' নামের ( যেখানে দাস গোস্বামীর নিবাস ) যেমন কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না, 'কৃষ্ণপুর' নামের তেমনি একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঝামটপুরে পাটবাড়িতে কয়েকটি শ্রীবিগ্রহ ছাড়া চৈতন্য-চরিতামৃতের একটি হস্তলিপি-পুঁথি সংরক্ষিত আছে। শোনা যায় চরিতাকারের শিষ্য মুকুন্দরাম নাকি মূল রচনা থেকে ঐ পুঁথি স্বহস্তে নকল করেছিলেন। তবে এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় আছে। তাছাড়া মুকুন্দ দাসের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে নিঃসংশয়িত তথ্য আজও দুর্লভ। লোক মুখে যা প্রচারিত, সেগুলি নিছক প্রবাদ বাক্য ছাড়া কিছু নয়। মুকুন্দ দাসের নিবাস কোথায় ছিল বা তিনি আদৌ ঝামটপুর নিবাসী ছিলেন কিনা, এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি। শ্রীপাটে যে শ্রীবিগ্রহসমূহ বর্তমান, তার মধ্যে দাস গোস্বামীর কুলদেবতার স্মৃতি ( পূজারী গুণার্ণব মিশ্র যে মূর্তি পূজা করতেন ) নেই। সেই মূর্তি কোথায়, কেউ জানে না।

কৃষ্ণদাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, কবিরাজের জন্ম—১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ। [ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৩১৭ ] 'শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান'-এর গ্রন্থকার, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে কবিরাজের আবির্ভাব কাল ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ। [ শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২৯৬ ] পণ্ডিতপ্রবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ( সাহিত্যরত্ন ) অনুমান করেছেন, ১৪০০ শক বা ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম। [ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, পৃঃ ৬৩২ ] তবে এ সমস্ত সন তারিখ নিতান্তই আনুমানিক। দাস গোস্বামীর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তাহলেও ডঃ মজুমদারের অনুমান যে অযৌক্তিক নয়, একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন।

কৃষ্ণদাসের পিতার নাম, ভগীরথ। মাতা,—সুনন্দা। কিন্তু এই তথ্যও নিছক জনশ্রুতি;

কারণ এগুলি জগবন্ধু ভদ্র লোকমুখে শুনেছিলেন। জগবন্ধু ছিলেন 'গৌরপদ তরঙ্গিণী'র সম্পাদক। কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবনদাস, এবং তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজ বিষয়ে অনেক গল্প গুজব নিজ গ্রন্থে বাণীবদ্ধ করেছেন। [ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, চৈতন্যযুগ, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৩৭-৩৮ ]

ভক্ত-কবির এক ছোট ভাই ছিল। অনেকের মতে ছোট ভাই-এর নাম শ্যামদাস। এই ব্যাপারটিও শ্রুতি নির্ভর। কবি কোথাও তাঁর জন্ম এবং বংশ-পরিচয় উল্লেখ করেননি। আনুমানিক ত্রিশ বছর বয়সে প্রভু নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে তিনি বার বার প্রভু নিত্যানন্দকে ভক্তিবিহ্বল চিত্তে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন :

"জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম॥"

[ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত,
আদি। ৫, পৃঃ ৬২ ]

কৃষ্ণদাস ছিলেন অকৃতদার।

কবির চরিত্র ছিল অতি নির্মল। কবি হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন স্পষ্ট। তাঁর পাণ্ডিত্য, সুগভীর রসবোধ এবং সুপ্রতিভ দার্শনিক প্রত্যয় সমকালীন ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে দুর্লভ। বাল্যকাল থেকে তাঁর চৈতন্য-নিষ্ঠা নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। চৈতন্যের আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ তাঁকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর ভক্তিবিহ্বল চিত্ত অকৃত্রিম ও প্রাণময় চৈতন্য নিষ্ঠায় আপ্লুত। সেখানে রয়েছে একটি আত্ম-নিবেদনের সুর। এই সুর নিতান্তই আন্তরিক ও উপলব্ধিলব্ধ। তা না হলে তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির ঐশ্বর্যটি কাব্যের চিত্তোন্মাদী মাধুর্য স্বরূপতায় সকলের কাছে প্রকাশ পেত না। প্রেম ও ভক্তি ছিল কবির ভাবাদর্শ। যে-কোন গভীর ভাবাদর্শ আধ্যাত্মিক হতে বাধ্য। তাই তাঁর রচনা পাণ্ডিত্যপ্রভায়, ও আধ্যাত্ম ভাবরসে ভরপুর। তিনি কিরূপ মনীষার আধার ছিলেন, 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থখানি পাঠ করলে বুঝা যায়।

কৃষ্ণদাসের রসবোধ অসাধারণ। আবার আদর্শ বৈষ্ণব বিনয়ের ধরনটিও চমৎকার। বিনয়ের স্বরে কোনরকম কৃত্রিমতা নেই,—আছে শুধু গভীর রসবোধ এবং বিদ্যা ও বিনয়ের ঔদার্য :

(ক) "আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥"

[ ঐ, পৃঃ ৬৩ ]

(খ) "এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥'

[ ঐ, পৃঃ ৬২ ]

কবিরাজ ছিলেন শিশুর মতোই সরল। একজন আদর্শ বৈষ্ণবের সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রে সুপরিস্ফুট। খ্যাতির শীর্ষ শিখরে উন্নীত হয়েও তিনি ছিলেন নিরভিমানী—এক শান্ত, দান্ত, সমাহিত পুরুষ।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণদাস ছয় গোস্বামীর [ রূপ ( রূপ মঞ্জরী ), সনাতন ( লবঙ্গ মঞ্জরী ), রঘুনাথ ভট্ট ( রাগ মঞ্জরী ), শ্রীজীব ( বিলাস মঞ্জরী ), গোপাল ভট্ট ( গুণ মঞ্জরী ) ও রঘুনাথ দাস ( রতি মঞ্জরী ) ] কৃপালাভ করেন। তারপর ঐ ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাসের ( মতান্তরে রঘুনাথ ভট্ট ) কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরু রঘুনাথের কাছেই তিনি আশ্রয় লাভ করেন। বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে তাঁদের আশ্রয়স্থল ছিল। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে কৃষ্ণদাস একজন মনোযোগী ছাত্রের মতো নিয়মিত পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থাকতেন এবং

কিছুদিনের মধ্যে 'গীতা', 'ভাগবত', 'ব্রহ্মসংহিতা', 'গীতগোবিন্দ', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত', 'নাম-কৌমুদী' এবং ছয় গোস্বামী রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', মুরারী গুপ্তের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কাব্য', কবি কর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক এবং সেইসঙ্গে রূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামীদের উপদেশাবলী তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঐ গ্রন্থগুলি অবলম্বনে তিনি 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' রচনা করেছিলেন। রচনাগুলির গুণকীর্তন কবির লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে :

"নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলায় তিঁহো হয় আদি ব্যাস॥"

*　　*　　*

"চৈতন্যমঙ্গলে তিঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন, সেই পরম প্রমাণে॥"

*　　*　　*

"চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তিঁহো কৈল পান॥"

*　　*　　*

শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ

[ ঐ, অন্ত্য, পৃঃ ৬২৪ ]

'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' কবির অতি বৃদ্ধ বয়সের রচনা। কবির বয়স তখন পঁচাশি বছর। রচনাটি শেষ করে তিনি স্বল্পকাল জীবিত ছিলেন। তিনি যখন চৈতন্য জীবনী রচনা করেন তখন তাঁর দেহের অবস্থা জরাজীর্ণ, বয়সভারে ন্যুব্জ। চোখ দু'টি দৃষ্টিহীন, কর্ণ বধির। কবির কথায় :

"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগে পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি-দিনে মরি॥"

( পঞ্চরোগ বলতে,—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ) [ ঐ, পৃঃ ৬২৪ ]

চৈতন্য-জীবনকে কবি খুঁটিনাটি বর্ণনা ও ঘটনা বাহুল্যে ভারগ্রস্ত করেননি। ঐতিহাসিক সন তারিখে পরিপূর্ণ এক তথ্য সমৃদ্ধ জীবন-ইতিহাস রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীচৈতন্যের জীবনকে উপজীব্য করে একটি সাহিত্য প্রতিকৃতি গড়ে তুলতেও তিনি চাননি। এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর লেখনী ছিল দার্শনিকের ভাব-চিন্তায় ধ্যান-তন্ময়,—ধীর-মন্থর। সেখানে বৈষ্ণব আদর্শ কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। রচনায় প্রগল্ভ উক্তি, অসহিষ্ণুতা, অকারণ আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস ইত্যাদিকে তিনি কোনরকম প্রাধান্য দেননি ; কারণ তাঁর মতে, বৈষ্ণবের পক্ষে এগুলি অশোভন। তাই চরম আবেগ মুহূর্তেও তিনি শান্ত, দান্ত ও ভারমন্থর। বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং মনে প্রাণে আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন বলেই, কোনরকম আবেগ, উচ্ছ্বাসের অতিরেক তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি। যেহেতু চৈতন্য জীবনকে লক্ষ্য করে তিনি একটি সাহিত্য-প্রতিকৃতি গড়ে তুলতে চাননি, সেই হেতু তাঁর কাব্যে সাহিত্যগত উৎকর্ষ কিছুটা দুর্বল ; কিন্তু চরিত্র-প্রতিমাটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। ইতিহাসের বর্ণবৈচিত্র্যহীন সাধারণ দৃশ্য পরম্পরা থেকে উদ্ধার করে তার মধ্যে ব্যক্তি রূপের বৈশিষ্ট্য, একনিষ্ঠ ভক্তের সহজ ভাবানুভূতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবন-চরিতের সঙ্গে চৈতন্য-তত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ইত্যাদি দুরূহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। কবির নীতিবোধ এবং চরিত্র-চিত্রণ স্বাভাবিক পরিবেশ ও ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর শিল্প-কৌশল কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই সমস্ত দিক

বিচার করে প্রখ্যাত ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন: কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তথ্য বিচার,—সব দিক দিয়ে চৈতন্য-চরিতামৃত শ্রেষ্ঠ। [ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—( প্রথম খণ্ড ) ]

'চৈতন্য-চরিতামৃত' ছাড়াও কৃষ্ণদাস কবিরাজের আরও কয়েকটি রচনা আছে, যথা—'কৃষ্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা, 'গোবিন্দলীলামৃত' ও 'ভাগবতশাস্ত্র-গুঢ়রহস্য'। গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বৃন্দাবনে গোস্বামিগণের উৎসাহ ও নির্দেশে কৃষ্ণদাস গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 'গোবিন্দলীলামৃত'। গ্রন্থে ২৫৮৮টি শ্লোক স্থান পেয়েছে। অনেকের মতে, এই অসাধারণ গ্রন্থটি রচনা করে তিনি 'কবিরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। [ চৈতন্য চরিতের উপাদান, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ] আবার কারও মতে, তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবসমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং তাঁর কবি প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ বৃন্দাবনের বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় ( জীব গোস্বামী-কর্তৃক বিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভা ) তাঁকে 'কবিরাজ', বা 'কবি সম্রাট' উপাধি প্রদান করে। যাই হোক, এই তথ্যগুলিও আনুমানিক। তবে রঘুনাথ গোস্বামী তাঁর 'মুক্ত চরিত্র' কাব্যগ্রন্থে কৃষ্ণদাসকে 'কবি ভূপতি' রূপে উল্লেখ করেছেন। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' দাস গোস্বামীর সর্বশেষ রচনা।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্য-চরিত' রচনা শুরু করেন। রচনার প্রারম্ভিক ও সমাপ্তিকাল যথাক্রমে ১৫৭২ এবং ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ। [ ১। চৈতন্য-চরিতের উপাদান, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ২। 'Krishnadas, therefore, could not have completed his work in 1581 A.D. The date Saka 1537=1615 A.D., therefore appears to be more likely'.—Vaishnava Faith and Movement, Dr. Sushil Kumar Dey, p. 43. ৩। রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ] নিত্যানন্দ দাস তাঁর 'প্রেমবিলাস'-এ লিখেছেন:

> "কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
> পনের শত তিন শকাব্দে যখন॥
> জ্যৈষ্ঠ মাসের রবিবার কৃষ্ণ পঞ্চমীতে।
> পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে॥"
> [ প্রেমবিলাস ]

কিন্তু রসিক কবি কৃষ্ণদাস তাঁর চরিতকাব্যের সমাপ্তি পর্বে বলেছেন, এই গ্রন্থ তিনি লেখেননি। শ্রীমদনগোপাল কৃপা করে গ্রন্থটি লিখিয়েছেন। রচনাটি শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীরঘুনাথের কৃপার ফল:

> "আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
> আমার শরীর কাষ্ঠ পুত্তলী সমান॥"
> [ চৈ. চ., পৃঃ ৬২৪ ]

দাস গোস্বামীর তিরোভাবকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে অনেকের মতে, ১৫৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে পঞ্চমী কৃষ্ণা তিথি, রবিবার দিন তাঁর দেহান্ত ঘটে। [ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ( ২য় খণ্ড ), ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৪১৫ ] রচনাটির সমাপ্তিকাল ও কবির তিরোধান একই বছরে অর্থাৎ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে। পণ্ডিত প্রবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, শারদীয়া শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অর্থাৎ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ৺বিজয়া দশমীর পরে দ্বাদশী তিথিতে কবিরাজ গোস্বামী মর্তলীলা সংবরণ করেন। [ চৈ. চ., পৃঃ ৬৩৪ ]

চৈতন্য-চরিত রচনাটির সমাপ্তি সাধনের পর কৃষ্ণদাস সেটি প্রচারকল্পে ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন

বৈষ্ণবগণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রীরূপ, সনাতন প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণ সেই অনুমতি প্রথমে দেননি; কারণ তাঁরা ধারণা করেছিলেন, গ্রন্থটি প্রচারিত হলে সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সমাদর হ্রাস পাবে। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের ফল এভাবে নিরর্থক হবে, এই আশঙ্কায় কৃষ্ণদাস ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু পরে কবি কর্ণপূরের প্রচেষ্টায় জীব গোস্বামী অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রন্থটি প্রচারের অনুমতি দেন। তখন চৈতন্য-চরিতের এক প্রতিলিপি এবং সেইসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর কয়েকটি স্বরচিত টীকা শ্রীনিবাস মারফত গৌড়-বঙ্গে প্রেরিত হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) জঙ্গলে সমুদয় গ্রন্থ বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা বীর হাম্বীর কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এই দুঃসংবাদ শুনে কৃষ্ণদাস শোকে আকুল হয়ে বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করেন। [জীবনী কোষ, ভারতীয় ঐতিহাসিক শশীভূষণ বিদ্যারত্ন] তাছাড়া 'প্রেমবিলাস'-এর একটি শ্লোকে আছে:

কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ।
উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ॥

তারপর আছে: 'মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রমণ'। [শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কাল নির্ণয়, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৬৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫] প্রচলিত কাহিনী পুরোপুরি কাল্পনিক না হলেও এর মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। 'প্রেমবিলাস' (নিত্যানন্দ দাস), 'ভক্তিরত্নাকর (নরহরি চক্রবর্তী), 'কর্ণানন্দ' (যদুনন্দন দাস) প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত কাহিনী বাণীবদ্ধ হলেও কয়েকটি ব্যাপারে সংশয় উদ্রেক করে। রাজা বীর হাম্বির কখনও নিজে এই লুণ্ঠন কাজ করতে পারেন না; কারণ তাঁর সভায় নিত্য ভাগবত পাঠ হত এবং তিনি প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাগবত শুনতেন। একজন ভক্তিপ্রাণ রাজা কোন সময় নিজে বা কোন দস্যুকে প্রশ্রয় দিয়ে লুণ্ঠনের পোষকতা করবেন, এমন কথা বিশ্বাস করতে স্বভাবতই মনে দ্বিধা আসে। তাছাড়া 'প্রেমবিলাস'-এর অনেক অংশ পরবর্তিকালে কৃত্রিম বলে প্রমাণিত এবং 'কর্ণানন্দ' রচনাটিও মেকি। [হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চৈতন্য-চরিতামৃত, পৃঃ ৬৩৫] অতএব গ্রন্থগুলি পথে লুণ্ঠিত হলেও, বিষ্ণুপুরে হয়নি। অন্যত্র পথে ভিন্ন দস্যুদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয়। রাজা বীর হাম্বির সেকথা জানতে পেরে গ্রন্থগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরই সক্রিয় চেষ্টায় সেগুলি উদ্ধার হয়েছিল এবং যথাসময়ে রাজভাণ্ডারে জমা পড়েছিল। কৃষ্ণদাসের আত্মহত্যার ঘটনাটিও দ্বিধান্বিত। তাঁর মতো একজন সিদ্ধ পুরুষ গ্রন্থ চুরির সংবাদে শোকার্ত হয়ে কখনও আত্মহনন করতে পারেন না। আত্মহননের প্রসঙ্গটি অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে স্থান পায়নি। [উদাহরণস্বরূপ, 'ভক্তিরত্নাকর' (নরহরি চক্রবর্তী), 'নরোত্তমবিলাস' (নরোত্তম ঠাকুর)] 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের অনুলিপি গৌড়বঙ্গে প্রেরিত হয়েছিল। মূল গ্রন্থটি দাস গোস্বামীর কাছে রক্ষিত ছিল এবং আজও সেটি পূর্ণ মর্যাদায় বৃন্দাবনে রক্ষিত আছে।

'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' কৃষ্ণদাসের এক অমর সৃষ্টি। এই রচনায় চৈতন্যলীলা তিন অংশে (আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা) বিভক্ত। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শুধু অন্ত্যলীলা বর্ণনা। আদি লীলা মোট সতেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও কিশোর-লীলা সূত্রাকারে বর্ণিত। মধ্যলীলায় মোট পঁচিশটি পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ, রাঢ়দেশ ভ্রমণ, নীলাচল যাত্রা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, বৃন্দাবন যাত্রা ইত্যাদি বর্ণনা স্থান পেয়েছে;

অন্ত্যলীলায় বিশটি পরিচ্ছেদ আছে। এই অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের শেষ বারো বছর দিব্যোন্মাদ অবস্থার খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়টি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বগুণের আলোকে প্রোজ্জ্বল। সাধক কবি চৈতন্য-কল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন করে চিত্তোন্মাদী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কৃষ্ণ নামের অনির্বাচ্য মর্মস্পর্শিতা এবং চৈতন্যভক্তির গভীর নিষ্ঠা তাঁর রচনার মধ্যে অসীম রসমূল্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। অন্ত্যলীলায় সাধক কবির ধ্যানী-কল্পনার ভাবজ্যোতি এক অপরূপ কলারূপ রচনা করেছে। কাব্য সুষমায় রচনাটি হয়ে উঠেছে স্বতঃভাস্বর—অমৃতস্বাদী। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের ভাষায়, 'চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা রসিকজনের চিত্তহারী, কবিগণের কল্পলোক ও সাধক ভক্তের কণ্ঠহার।' শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'যা ব্যাখ্যাতীত, সূক্ষ্মতম অশরীরী,—মহাপ্রভুর সেই দিব্যোন্মাদ মনোভাবকে বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী আশ্চর্য তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিকতা ও অধ্যাত্ম চেতনার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রামাণ্য জীবনী বাংলা সাহিত্যে নেই। তাঁর নিবাস, আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল, জীবনচর্যা ইত্যাদি অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আজও অজ্ঞাত। কবি তাঁর জীবন তথ্য রেখে না গেলেও, এগুলির যথার্থ অনুসন্ধান প্রয়োজন; নইলে তাঁর ব্যক্তিরূপের বৈশিষ্ট্য, কবিপ্রাণতা, অধ্যাত্ম চেতনার স্বরূপ ইত্যাদি সমস্তই অজানা থেকে যাবে। কবি চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোনদিনই সম্ভব হবে না। এক মহান কর্তব্য হিসেবে জাতির এ-কাজে অবিলম্বে অগ্রণী হওয়া উচিত।

# শ্রীম-কথা

## ব্রহ্মচারী যতীন্দ্রনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অকাতরে শ্রীম বিলাইতেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে। নিচের তলা হইতে বার বার আহারের তাগিদ আসিতেছে। শ্রীম রামকৃষ্ণ কথায় মত্ত। বলিলেন—'আরে রোসো, রোজের কড়াই ডাল ভাত ত আছেই। ভক্তসঙ্গ হইল feast (ভোজ), এ ছেড়ে কি যাওয়া যায়।'

আহার তিন প্রকার। শুধু স্থূল আহারে কি মানুষ চলে? Art (শিল্পকলা), Literature (সাহিত্য), Science (বিজ্ঞান), Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) হইল সূক্ষ্ম আহার, বুদ্ধিমান লোকদের জন্য। আর যারা প্রকৃত মানুষ তাদের সেই আহার চাই—'পরা বিদ্যা'—যাহা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়।

স্থূল আহার করার উদ্দেশ্যও এই শরীর দিয়া ভগবান লাভ। নতুবা আহার তো পশু-পক্ষীও করে। পবিত্র বস্তু ভগবানকে নিবেদন করিয়া ভক্তিভাবে আহারই আহার। 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ'—এইভাব। 'য এতদক্ষরমবিদিত্বাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ'—বস্তুর সদ্ব্যবহার না করাকেই কৃপণতা বলে। একটি মুহূর্তও যেন বৃথা কাজে ব্যয় না হয়। সাধু হইলেন whole time worker (সব সময়ের কর্মী)। বৈরাগ্যহীন সাধু ও অর্থ-বিত্তহীন গৃহস্থ সমান। ভূসার বাক্সে আঙুরের ন্যায় সাধুর দুর্লভ বৈরাগ্যটুকু রক্ষা করিতে হয়। তীব্র বৈরাগ্য আছে বলিয়াই সাধু জগদ্পূজ্য।

মঠের ও দক্ষিণেশ্বরের প্রসাদ আনিলে আগে

ভক্তিভরে মঠের প্রসাদ গ্রহণ করিতেন তারপর দক্ষিণেশ্বরের। বলিতেন—'মঠের পূজা ত্যাগীদের পূজা, নিষ্কাম পূজা, কত পবিত্র প্রসাদ! গৃহস্থের পূজায় কেবল দেহি, দেহি ভাব সকাম।'

প্রথম মঠে কন্‌ফারেন্সের সময় শ্রীম সাধুদর্শন করিতে গিয়াছেন। স্টীমার হইতে নামিয়াই শুনিলেন পাশের একটি বাড়িতে সাধুদের থাকার স্থান হইয়াছে। তিনি সেখানে প্রথম প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সাধুরা কেহ নাই, খালি বিছানা সব পড়িয়া আছে। শ্রীম সব বিছানা স্পর্শ করিয়া মাথায় হাত ঠেকাইতেছেন আর বলিতেছেন—'সাধুর বিছানা কত পবিত্র। কত প্রার্থনা, কত কান্না, জপ-ধ্যান—এই বিছানার উপর হয়। শ্রীমর এই সাধুদর্শনেই কন্‌ফারেন্স দর্শন হইল।'

সাধুদের 'উপদেশম্' 'উপদেশম্' করিয়া বিরক্ত করিবেন না। রহস্য করিয়া বলিতেন—শ্রীমাকে দক্ষিণদেশে ভক্তরা আসিয়া ঐরূপ বলিত। তাই কাহাকেও আসিতে দেখিলেই মা হাসিয়া বলিতেন—'ঐ উপদেশম্ আসছে গো।'

সাধুসঙ্গে কাহারও প্রীতি হইয়াছে দেখিলে বুঝিতেন তার উপর ঠাকুরের কৃপা হইয়াছে।

শ্রীম—'ঠাকুরকে দেখিয়াছি, যাহারা সংসারের চাপে পড়িয়াছেন তাদের জন্য অধিক চিন্তিত থাকিতেন।'

এক ব্যক্তি তর্ক করিতে উদ্যত হইলে শ্রীম তাহাকে বলিলেন—'একবার ছাদে গিয়া আকাশটা দেখিয়া আসুন ত?' ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বলিলেন—'কি দেখিলেন বুঝিলেন? অনন্ত কাণ্ড, কাহারও বুঝিবার সাধ্য আছে? এই পৃথিবী যেন একটি কাদার বল, আর আমরা এক একটি কীটের মতো। এই বিশ্বের সৃষ্টি-কর্তাকে কি তর্ক দ্বারা বোঝা সম্ভব?'

এই যে শ্বাস নিচ্ছি এ যেন মার মাই খাচ্ছি। এটি যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে সব লম্বা লম্বা কথা বলা শেষ। এই যে রোজ সূর্য উঠছে—কি অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার। আমরা নিত্য অলৌকিকের মধ্যে বাস করছি, এ ছেড়ে আবার লোকে অন্য অলৌকিক দেখতে চায়?

পরোপকারবেশে স্বার্থপরতার প্রবেশ। একজন তপস্যা করিতেছে। ভগবতী দর্শন দিয়া বর চাইতে বলিলে ভক্ত চাইল—'মা দেশ স্বাধীন হউক।' মা বলিলেন, 'তথাস্তু। তবে একশত বৎসর পর।' ভক্তটির চক্ষুস্থির, কাতরভাবে বলিল—'সে কি মা! আমি তো তখন থাকিব না?' মা বলিলেন—'সে কথা তো ছিল না বাছা। তুমি যা চেয়েছিলে তা আমি দিয়েছি।' কর্ম, তপস্যা প্রায় এরূপই হইয়া থাকে।

জ্ঞানীদের অপরের প্রতি করুণা কেন হয় ও তাঁহাদের কর্মের ইচ্ছা কেন হয় জানেন? একটি গরীব যদি অপরের সাহায্যে বড়লোক হয় তখন তার গরীবের প্রতি দয়ার ভাব হওয়া যেমন স্বাভাবিক, মহাপুরুষদেরও তেমনি। তাঁহারাও তো অজ্ঞানাবস্থায় কত কষ্ট পাইয়াছেন! তাহা মনে করিয়া তাঁহাদের অপরের প্রতি দয়া হয়।

একজন ঠাকুরের শিষ্যদের কাহারও পানাহার বিষয়ে একটু কটাক্ষ করিলে শ্রীম বলিলেন—'আপনি বলিলেই আমি বিশ্বাস করিব কি? আপনার কথার মূল্য কি? আমি তাঁহাকে বেশি জানি। আমি নিজচক্ষে দেখিয়াছি তিনি নয় মাস ঠাকুরের কি প্রাণপণ সেবা করিয়াছেন। লোকের সাহস দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। নিজেরা সারাদিন কত কুকর্ম করে, সে কিনা অবতারের পার্ষদের নিন্দা করিবে! তাঁর কোন শিষ্যকে অশ্রদ্ধা করিলে তিনি প্রসন্ন হইতেন না।'

স্বামীজী এত কাজ করিয়াছেন। এ ঠাকুরই করাইয়াছেন। স্বামীজীর চেয়েও বিদ্বান লোক

ছিল, বক্তা ছিল, সুপুরুষ ছিল। কিন্তু থাকিলে কি হইবে? সাক্ষাৎ সারদেশ্বর তাঁহাকে দিয়া বলাইতেছেন। তাঁর শক্তি কত! বালক যীশুর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া পণ্ডিতরা অবাক্! ঠাকুরের শক্তিতেই স্বামীজী জগৎ জয় করিয়াছেন। অর্জুনের কি সাধ্য? শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে গাণ্ডীব উঠাইবার শক্তিও তাঁহার রহিল না। ঠাকুরের শিষ্যেরা তবু শিক্ষিত, সদ্বংশজাত। যীশুর শিষ্যরা সব চাষাভূষা, জেলে মালা ছিলেন। তাহাদের দিয়াই তিনি কত মহৎ কাজ করাইলেন!

ভক্ত—আমাদের যে আন্তরিকতা নাই, মন বিষয়মত্ত। কি হবে?

শ্রীম—তাঁর নিকট ব্যাকুলতার জন্য প্রার্থনা করুন।

ভক্ত—প্রার্থনা করিতেও যে ইচ্ছা করে না।

শ্রীম—বেশ তো, গুরুমন্ত্র জপ করুন। চিত্ত একাগ্র না হলেও ১০।১৫ হাজার জপ রোজ করুন দিকিন্? 'নাম নিতে নিতে হবে অনুরাগ, ক্রমে হবে বিষয়ে বিরাগ, ক্রমে কুণ্ডলিনী হবে সজাগ।'

ভক্ত—নাম জপ করিতেও যে ইচ্ছা করে না।

শ্রীম—তাহা হইলে Case serious বাঁচিবার আশা কম। নামে রুচি হইল শেষ চিকিৎসা। নামে রুচি থাকিলে আর ভয় নাই। ধীরে ধীরে সব হইবে। ব্যাকুলতা, অনুরাগ, ধ্যান—সব হইবে। ভোগেচ্ছা থাকিলে ধ্যান হয় না। চক্ষু বন্ধ করিলে ভোগের দৃশ্য মনোহর রূপ ধারণ করিয়া সামনে উপস্থিত হয়। তাই কলিতে নাম মাহাত্ম্য। সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য গেলে ব্রহ্মা বলিলেন, 'আমি সৃষ্টিকর্ম লইয়া ব্যস্ত। মন বড়ই অস্থির। একটু অপেক্ষা কর একটু মন স্থির করিয়া লই'—বলিয়া সমাধিস্থ হইলেন ও পরে উপদেশ দিলেন। কর্ম লইয়া থাকিলে মন স্থির হয় না।

ভগবান উদ্ধবকে বলিলেন—'যাহা বলিবার তোমাকে বলিলাম। এখন বদরিকাশ্রমে গিয়া তপস্যা কর। তাহা হইলে সব ধারণা হইবে।' ঠাকুরের শিষ্যরাও কি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন তবেই তো তাঁর কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। ভগবানও যদি তোমাকে আসিয়া বলেন যে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তপস্যা না থাকিলে তাহা তোমার অনুভব হইবে না। ঠাকুর কেশব সেনকে বলিলেন, 'আর কিছু বলিলে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদের কথা বলিলে তোমার দলটল থাকিবে না।' কেশববাবু অত বড়লোক, তিনি পর্যন্ত ভয় পাইলেন। ভিতরে ভোগেচ্ছা থাকিলে বৈরাগ্যের কথা, অদ্বৈতবাদের কথা শুনিতে সাহস হয় না।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ—এসব তত্ত্ব সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই একমাত্র বিচার করিবার অধিকারী। তাহাদের জন্যই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—অপরের পক্ষে নহে। এখন সব পেটরোগা—সাগু, বার্লি, ছানার জলই হজম হয় না, কালিয়া, পোলাও, রাবড়ী দিলে সর্বনাশ,—পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

# বিশ্বজনীন ধর্ম

## স্বামী বিবেকানন্দ

### অনুবাদ : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[ এই বক্তৃতাটি স্বামীজী আমেরিকার হার্টফোর্ড নামক এক শহরে দিয়েছিলেন, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুআরি তারিখে। পুরো বক্তৃতাটি কিন্তু পাওয়া যায় না। কারণ বোধহয় এই যে, এই বক্তৃতার সময় স্বামীজীর শিষ্য গুডউইন উপস্থিত ছিলেন না। অথবা উপস্থিত থাকলেও যে-কারণেই হোক বক্তৃতার নোট নেননি। স্বামীজীও কোন নোট রেখে যাননি। নোটের সাহায্যে বলার অভ্যাস স্বামীজীর ছিল না। তাঁর সব বক্তৃতাই তাৎক্ষণিক। যা বলতেন সেই মুহূর্তে তাঁর যা মনে আসত তাই বলতেন। কিন্তু এই বক্তৃতাটির একটি রিপোর্ট হার্টফোর্ড শহরের 'হার্টফোর্ড ডেইলি টাইমস্' ( Hartford Daily Times ) দৈনিক পত্রিকায় পরদিন ১ ফেব্রুআরি তারিখে বের হয়। এই বক্তৃতাটি মেরী লুইস্ বার্ক আবিষ্কার করেছেন। স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁর সুন্দর গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডে ( পৃঃ ৪৭৫ ) এই বক্তৃতাটি পাওয়া যাবে। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁর দু-একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

তিনি বলেছেন—'স্বামীজী বিশ্বজনীন ধর্ম-প্রসঙ্গে একাধিকবার এবং একাধিক জায়গায় বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু একই কথা দুবার কখনও বলেননি। বিষয়বস্তু এক, কিন্তু তাঁর বক্তব্য এক নয়। তাঁর চিন্তা সর্বদা গতিশীল, নতুন। একটা ছক বাঁধা পথে তা চলে না, স্থাবর নয়। বক্তব্য যেমন নতুন, তার আকার, বৈচিত্র্য, স্বাদও তেমন নতুন। বিষয়ের উপর নতুন আলোকপাত করে চলেছেন। নতুন দৃষ্টান্ত, নতুন উপমা দিয়ে প্রত্যেকবার ধর্মার্থের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। অথচ যা বলেছেন স্বতঃস্ফূর্ত বলেছেন, সাজিয়ে-গুছিয়ে, আগে থেকে ভেবে-চিন্তে নয়। তাৎক্ষণিক। এরূপ বলতে পেরেছেন, কারণ স্বামীজী চির নতুন।

এবার সংবাদপত্রের রিপোর্টটা দেখুন।—অনুবাদক ]

**'বিশ্বজনীন ধর্ম'**

**বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মমতের উপর**

**বিবেকানন্দের বক্তব্য।**

গতকাল সন্ধ্যায় বেশ বড়-সড় একটা জনসভায় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হয়ে গেল। কিন্তু হার্টফোর্ডবাসীরা যদি জানতো কি একটা জিনিস তারা হারাচ্ছে, তাহলে এই সভায় তিলধারণের স্থান থাকত না। যারা ধর্মযাজক, তাদের পক্ষে এই বক্তৃতা শুনতে না পাওয়া রীতিমত দুর্ভাগ্যের বিষয়। স্বামীর (স্বামী=ধর্মগুরু) এই বক্তৃতা শুনলে তাদের মধ্যে যদি কিছু পরমতসহিষ্ণুতা থেকে থাকে, তাহলে তা মাধুর্যমণ্ডিত হত, আর তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বড় হত। তাদের মধ্যে কেবল একজনই এ-বিষয়ে এগিয়ে এসেছিল। ইমারসন ( Emerson ) একবার বলেছিলেন—'আমাদের ভালো কোন অখ্রীষ্টান ধর্মমতের সাথে পরিচিত হবার প্রয়োজন আছে।' কিন্তু বিবেকানন্দের ধর্মমতকে অখ্রীষ্টান বলা চলে না। তাঁর ধর্মমত বিশ্বজনীন। সভার প্রারম্ভে মিঃ সি. বি. প্যাটারসন ( Mr. C. B. Patterson ) যথোচিত কয়েকটি কথা বলে বিবেকানন্দের পরিচয় দিয়ে দিলেন। বিবেকানন্দ দেখতে বেশ

সুশ্রী। তাঁর মাথায় পাগড়ী, পরিধানে গৈরিক। গৈরিক ত্যাগ ও দারিদ্র্য ব্রতের প্রতীক। তিনি যে-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ের সবাইকে এই দুই ব্রত বরণ করে নিতে হয়। তিনি কৃষ্ণকায়, কিন্তু তাঁর মুখাবয়ব সুমার্জিত, আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ। তিনি যে উচ্চ চিন্তাজগতে বিচরণ করেন, এ তারই সাক্ষ্য। গত রাত্রে যে-বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন, তা হচ্ছে—'আদর্শ কি তথা বিশ্বজনীন ধর্ম কি ?' [ এখানে রিপোর্টার নিশ্চিত নন—অনুবাদক ]

বিশ্বে দুটি শক্তি একই সঙ্গে সক্রিয়—একটি অন্তর্মুখী, অপরটি বহির্মুখী ; একটি যোগাত্মক, অপরটি বিয়োগাত্মক; একটি ক্রিয়া, অপরটি প্রতিক্রিয়া ; একটি আকর্ষণ, অপরটি বিকর্ষণ। একই সঙ্গে ভালবাসা, আবার ঘৃণা; শুভ ও অশুভ। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার চেয়ে আর কোন্ শক্তি আছে যা বেশি শক্তিশালী ? ধর্ম থেকে যে প্রেম বা ঘৃণা সঞ্চারিত হয়, তার তুলনায় সব শক্তি তুচ্ছ। ধর্ম যেমন জগতে সুখ এনেছে, তেমন দুঃখও এনেছে। এমনটি আর কিছুই আনেনি। তার গতি অবাধ। বুদ্ধের শিষ্যেরা তাঁর বাণী বিশ হাজার ফুট হিমালয়ের উচ্চতাকে তুচ্ছ করে অপর প্রান্তে বহন করে নিয়ে গিয়েছে। এর পাঁচশ বছর পরে পাই যীশুখ্রীষ্টের মাধুর্যময় বাণী যা তোমরা মেনে চলেছ। এই বাণীও বাতাসের মতো আজ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। আবার অন্য দিকটাও দেখ। ধর্মের নামে, শুধু প্রচারের খাতিরে এই সুন্দর পৃথিবীতে কত রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে। ধর একজনের অন্য আর একজনের সাথে পরিচয় হল যার ধর্মমত একটু ভিন্ন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে প্রথম ব্যক্তিটির ধরন-ধারণ পাল্টে যাচ্ছে। সে যেন লড়াই-এ মেতে গেছে, ধর্মের জন্যে নয়, তার নিজের মতের জন্যে। নিষ্ঠুরতা ও গোঁড়ামি তখন তাকে পেয়ে বসেছে। দোষ ধর্মের নয়। তার ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই, কিন্তু গোলমাল এইখানে যে সে তার মত বা ধারণাটাকে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আর্মেনিয়ান বা তুর্কীরা ধর্মের জন্যে অনেক নরহত্যা করেছে। এ নিয়ে তাদের নিন্দায় সবাই মুখর। কিন্তু যারা নিন্দা করছে তাদের নিজেদের ধর্মের স্বার্থে যদি নরহত্যা ঘটে সে বেলায় তারা একেবারে নীরব। মানুষের মধ্যে দেবতা, মানুষ, আর অসুর,—এই তিন শক্তিই একসঙ্গে মিশে আছে। ধর্মের খাতিরে কিন্তু তার মধ্যে এই আসুরী শক্তিই সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। কোন বিষয়ে যখন আমরা সবাই একমত, তখন আমাদের মধ্যে দৈবীভাব প্রকট। কিন্তু যেই মতের অমিল ঘটল, অমনি সব পাল্টে গেল। তখন অসুরের জয়জয়কার! এ একেবারে আদিমকাল থেকে হয়ে আসছে। বরাবর এই রকমই চলবে। ধর্মের গোঁড়ামি কাকে বলে তা আমরা ভারতে বসে খুব দেখেছি। দেখেছি, এর কারণ গত হাজারখানেক বছর ধরে ধর্মপ্রচারকেরা ভারতকেই তাঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ধর্ম নিয়ে কলহ চলছে, সংঘর্ষও চলছে, তবু এ সবার উর্ধ্বে কিন্তু শান্তির বাণীও শোনা যাচ্ছে। গত তিন হাজার বছর ধরে ধর্মে ধর্মে একটা মিলন ঘটাবার চেষ্টা চলছে। সে চেষ্টা কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। তা হবার কথা নয়, হবেও না।

আমরা প্রেম, শান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি কত সুন্দর সুন্দর কথার জাল বুনে থাকি। তোতাপাখির মতো এ-কথাগুলি কপচিয়েও থাকি। গোড়াতে হয়তো এ-কথাগুলি আমাদের অন্তরের কথা ছিল, এখন এগুলি শুধু ফাঁকা বুলি। পৃথিবীতে এমন কি কোন দর্শন আছে যা সর্বজন-

গ্রাহ্য? এখনও এরূপ কোন দর্শনের সন্ধান আমরা জানি না। এখন যা আছে, তা হচ্ছে কতকগুলি ধর্ম, আর তাদের স্ব স্ব তাত্ত্বিক বিশ্বাস ও মত। প্রত্যেক ধর্মই ঐ বিশ্বাস ও মত জোর করে প্রচার করে চলেছে। কিন্তু সকলের জন্যে একই ধর্ম চলবে, এ কখনও সম্ভব নয়। এরূপ হওয়া অনুচিতও। আর্মেনিয়ানরা চাইবে সবাই আর্মেনিয়ান হয়ে যাক্। রোমের পোপের কাছে যেয়ে যদি ধর্মসমন্বয়ের কথা বল, তিনি তখন বলবেন—'এ তো অতি সহজ ব্যাপার, তোমরা সবাই রোম্যান ক্যাথলিক হয়ে যাও, তা হলেই তো সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়।' ঠিক এই ধরনের কথা গ্রীক্ চার্চ বলবে, প্রটেস্ট্যাণ্টরা বলবে, সবাই বলবে। এক ধর্ম মানে ধর্মেরই মৃত্যু হওয়া। সবাই যদি একরকমের চিন্তা করে, তার অর্থ কেউ চিন্তা করে না। সবাই যদি একই রকমের দেখতে হত? তা কি একঘেয়েমিই না হত! চেহারায় এক, চিন্তায় এক—এ অবস্থায় মানুষের মৃত্যু ছাড়া আর কোন গতি নেই। মানুষ তো ইঁদুর নয় যে তারা সবাই একই রকমের দেখতে হবে! বৈচিত্র্যই হচ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্য। যেমন এক ঈশ্বর, তেমন এক ধর্ম—এ একটা পুরানো শিশুসুলভ বুলি। শিশুসুলভ, আবার বিপজ্জনকও। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, কার্যতঃ এটা কখনও সম্ভব হবে না। একবার চেষ্টা করে দেখ না। তোমার ধর্মমতটা চালাবার জন্যে অঢেল টাকা খরচ কর, আর তার সঙ্গে কামান-বন্দুকও কাজে লাগাও। এ দুয়ের সাহায্যে যতদূর পার তোমার প্রচার যন্ত্রটাকে কাজে লাগাও। কি ফল হবে এতে? সাময়িকভাবে তুমি হয়তো ধর্মে ধর্মে বিভেদ মুছে ফেলতে পারবে। কিন্তু এই যে কৃত্রিম ঐক্য তুমি গড়ে তুললে দশ বছরের মধ্যে তুমি দেখবে তাতে ফাটল ধরে গেছে। তাই আমরা দেখি প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কত গোষ্ঠী। আজ বৌদ্ধরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্মসম্প্রদায়। তারা জগতে সুখ-শান্তি আসুক, এই চেষ্টা করে চলেছে। সংখ্যায় এর পরেই হচ্ছে খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টানরাও কত সুন্দর সুন্দর কথা প্রচার করে চলেছে। তাদের মতে একে তিন, তিনে এক। এক পরমাত্মা, তিনিই পরমপিতা হয়েছেন, পরমপুত্রও। এই পরমপুত্র যীশু পৃথিবীর সকলের পাপভার নিজে নিয়ে নিলেন। এর বিনিময়ে তাঁকে প্রাণ দিতে হল। কেউ যদি তাঁকে না মানে তাহলে নরকাগ্নিতে পুড়ে মরতে হবে। এরপর এলেন মহম্মদ: তাঁকে যদি না মান, তাহলে তোমাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলা হবে। তোমাকে বার বার এই শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাই সর্বশক্তিমান, এ সত্য মেনে নিলে তবে নিষ্কৃতি। সব ধর্মের উৎপত্তি প্রাচ্য থেকে। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বিভিন্ন নাম ও রূপ নিয়ে এসেছেন। হিন্দুরা দশ অবতারে বিশ্বাস করে। প্রথম অবতার মৎস্যরূপে আসেন। প্রথম চার অবতার চার রকমের প্রাণীরূপে আসেন। পঞ্চম অবতার থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা মানুষের রূপ নিয়ে এসেছেন। বৌদ্ধরা বলেন—'আমরা অবতারে বিশ্বাস করি না, আমরা শুধু একজনকেই মানি।' খ্রীষ্টানরা বলেন—'আমাদের অবতার মাত্র একজন, তিনি যীশুখ্রীষ্ট।' তাঁরা এও বলেন—'তিনিই একমাত্র অবতার।' বৌদ্ধরা বলেন তাঁদের অবতার কিন্তু আগে এসেছেন। যীশুর চেয়ে বুদ্ধ পাঁচশ বছরের বড়। মুসলমানরা বলেন তাঁদের অবতার সকলের শেষে এসেছেন, অতএব তিনিই সর্বোত্তম। প্রত্যেকেই নিজের অবতারকে ভালবাসেন—প্রত্যেক মা যেমন নিজের সন্তানকে ভালবাসেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধের মধ্যে

কোন দোষ খুঁজে পান না। খ্রীষ্টানরাও তেমনই খ্রীষ্টের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পান না, মুসলমানরাও তেমন মহম্মদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পান না। খ্রীষ্টানরা বলেন তাঁদের ভগবান ঘুঘুপাখীর রূপ ধারণ করে নেমে এসেছিলেন। এটা রূপকথা নয়, এটা ইতিহাস। হিন্দুরাও বলেন তাঁদের ঈশ্বর গরুর মধ্যেও বিদ্যমান। তাঁদের দাবী—এটা একটা কুসংস্কার নয়, এটাও ইতিহাস। ইহুদীরা মনে করেন তাঁদের যিনি পরমেশ্বর, তিনি একটা বাক্স বা সিন্দুকের মধ্যে অবস্থিত। সেই সিন্দুকের দুই পাশে দুই দেবদূত প্রহরীরূপে বিদ্যমান। তাঁরা বলেন খ্রীষ্টানরা যে ঈশ্বরকে একজন পুরুষ বা নারীরূপে পূজা করে, এ ঘোর পৌত্তলিকতা। 'এই পৌত্তলিকতা দূর করে দাও', তাঁরা বলেন। একজনের কাছে তার ধর্মগুরুর সব কিছুই অলৌকিক, আর একজনের কাছে তা শুধু অন্ধ-বিশ্বাস। তাহলে একতা কোথায়? এবার আচার-অনুষ্ঠানের কথায় আসা যাক। যিনি রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রী, তাঁর বিশেষ এক রকমের পোষাক আছে। আমার যেমন আছে। তিনি ঘণ্টা বাজান, বাতি জ্বালান, জল ছিটান। তাঁর মতে এগুলি খুব ভাল, ধর্মসাধনের সহায়ক। কিন্তু আপনি যা কিছু করেন, তা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এসব আমরা কিছুতেই পাল্টাতে পারব না। মাত্র একটা ধর্ম সর্বত্র চলবে, এও কখনও সম্ভব হবে না। চিন্তাশক্তির পরিচয় চিন্তার বৈচিত্র্যে। যারা আমাদের বিরুদ্ধমতাবলম্বী, তাদেরও আমাদের ভালবাসতে শিখতে হবে। সবাই আমরা এক মানব পরিবারভুক্ত সত্য, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের পৃথক সত্তা আছে, আমাদের প্রত্যেকের পৃথক মনও আছে; এখন অনেক ছোট ছোট গোষ্ঠী বা দল আমাদের মধ্যে আছে। এই দল বা গোষ্ঠীর মধ্যেও আবার অনেক মতভেদ আছে। দলের মধ্যে দল, গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী—এই হচ্ছে অবস্থা। যেন এক একটা ব্যক্তি এক একটা সম্প্রদায়। তা হোক, তাতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু যে ভিন্নমতাবলম্বী তাকে যেন আমরা ভালবাসতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে বৈচিত্র্যই হচ্ছে মনের ধর্ম। আমাদের সকলের লক্ষ্য এক—পূর্ণতা। আমাদের মধ্যে যে দৈবীসত্তা আছে, তার বিকাশ। এই দৈবীসত্তার বিকাশের পথে ধর্মের মূল্যবান এক ভূমিকা। কিন্তু এই বিকাশ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ভিন্ন, এক নয়। আমরা যেমন সবাই একই রকমের খাওয়া হজম করতে পারি না।

আমাদের লক্ষ্য উচ্চতম হোক। আমরা উদ্যমের সঙ্গে যুক্তির সংযোগ ঘটাব, সর্বজন-স্বীকৃত যে আচারবিধি তাও মেনে নেব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন!

ম্যারি লুইস বার্কের সংযোজন: কৃপানন্দ 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় এক পত্র লিখে জানান যে উপরের ঐ বক্তৃতাটি হার্টফোর্ড শহরের Metaphysical Society-তে দিয়েছিলেন। এর সমর্থনে কোন প্রমাণ কিন্তু আমরা ঐ শহরের কাগজগুলিতে পাই না। ঐ বক্তৃতা সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত ছিল। ঐ বক্তৃতা যে হবে তা সংবাদপত্রের 'ধর্মসভা বিভাগ'-এ বেশ কয়েকদিন আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। বক্তৃতার পর দিন Hartford Daily Times-এর সভা-সমিতির বিভাগে নিম্নলিখিত রিপোর্টটি ছাপা হয়। সভা হবে এ সংবাদটি যদি যথাসময়ে বের হত তাহলে সভাকক্ষ ভরে যেত। বক্তৃতাটি এমনই আকর্ষণীয় যে তা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

### সভা-সমিতি

এ বছরটায় Hartford-এ অনেকগুলি ভাল ভাল বক্তৃতা হয়ে গেল। কিন্তু আগামী শুক্রবার Unity Hall-এ 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ' বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা দেবেন, তাকে ছাড়িয়ে কোন বক্তৃতাই যেতে পারবে না। তিনি বেশ উঁচুদরের বক্তা। আর তাঁর চিন্তাসমূহ উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে সম্ভূত। তার উপর তাঁর ব্যক্তিত্ব। তা যেমন আকর্ষণীয় তেমনই শোভনীয় তাঁর প্রাচ্য-দেশীয় পোষাক ও শিরস্ত্রাণ। এই উভয় মিলিয়ে তাঁকে দেখতে পাওয়া একটা মস্ত বড় লাভ। শুধু এরজন্যেই সভাগৃহে প্রবেশাধিকার পেতে নির্ধারিত মূল্য দেওয়া কিছুই না।

# শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ

## স্বামী ভূতেশানন্দ

একবার কেউ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তিনি সঙ্ঘ স্থাপনের আদর্শ কোথা থেকে পেলেন। উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, বুদ্ধের আদর্শ তাঁকে খুব প্রভাবিত করেছে। অবশ্য স্বামীজীকে ঠাকুর নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। সকলকে সমবেত করে সঙ্ঘকে স্থায়ী করবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন ঠাকুরের কাছ থেকেই তিনি তা পেয়েছেন। ঠাকুর লিখে দিলেন যে, নরেন শিক্ষে দিবে। স্বামীজী বলতেন, ঠাকুর গুরুভাইদের ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছেন। সেই গুরুভার তিনি বহন করেছেন ঠাকুরের আদেশে। ঠাকুর তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য যুবক ভক্তদের নিয়ে একটি ত্যাগী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ স্বামীজীকে দিয়েছিলেন তা স্পষ্টই বোঝা যায়। সেই সঙ্গে যে-সব গৃহস্থ ভক্ত তাঁর কাছে আসতেন তাঁদেরও তিনি প্রস্তুত করেছেন। ঠাকুরের শরীর যাবার পর তাঁর গৃহস্থ ভক্তেরা ত্যাগী সন্তানদের কাছে এসে বলতেন, তোমরা আমাদের জন্য একটা জুড়োবার জায়গা কর।

তারপরে স্বামীজী ধীরে ধীরে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করলেন। অনেক সময় তাঁর গুরুভাইদের মনে সন্দেহ উঠত—স্বামীজী তাঁর নিজের ভাবকে রূপ দিচ্ছেন না এটি ঠাকুরের ভাব। স্বামীজী তাতে খুব বেদনাবোধ করে বলেছিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছা এবং প্রেরণা ছাড়া আমি কিছু করি না। গুরু-ভাইদের সন্দেহ দূর হল। তাঁরা স্বামীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, তাঁকে নেতারূপে বরণ করলেন। বরণ করার পর কী অপূর্ব আত্ম-সমর্পণ সে-কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। নরেন্দ্র যা বলবেন তা স্বীকার করে নিতে হবে এবং তাঁর কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। নরেন্দ্র যখন তাঁর গুরুভাইদের আকর্ষণ করেছেন তখন এ-কথাই বলেছেন যে, আমি একা একাই খেটে মরব, তোরা কিছু সাহায্য করবি না? যেমন ঠাকুর একবার শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, আমি একাই এই কাজ করব তুমি আমার কাজে সাহায্য করবে না? মা বলেছিলেন যে, আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি? ঠাকুর বললেন, না গো, তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি তিনিই জাগ্রত করেছেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর মায়ের ভিতর সেই শক্তি প্রকট হয়েছে। স্বামীজী সেই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন।

সঙ্ঘের সূচনা এবং পরিচালনা এইভাবে হয়েছে। এই সঙ্ঘের কেন্দ্রে একটি সূত্র আছে যা সমস্ত সঙ্ঘকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে, সেই সূত্র হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শই হল এই সঙ্ঘের একমাত্র নিয়ামক। সকলে নিয়মাবলী করবার জন্য স্বামীজীকে বলছেন, তিনি বললেন, নিয়ম করে কি কিছু করা যায়? নিয়মের বন্ধনে বাঁধতে আমি চাই না। পরে অবশ্য কিছু নিয়মকানুন করলেন। কিন্তু বিস্তারিত নয়। তার কারণ বললেন, ঠাকুরই আদর্শ। তবে আমরা যেন আলাদা করে একটি রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় তৈরি না করি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলিকে অনুসরণ ও রূপায়িত করাই উদ্দেশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ আর শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ভিন্ন নয়। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষের মনে নানা সন্দেহ, নানারকম কল্পনা আছে যেগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সেজন্য স্বামীজী বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকের দ্বারা সব দেখতে হবে, তাঁর আদর্শ দিয়ে শাস্ত্রকে বুঝতে হবে এবং বুঝে জীবনে সেই আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হবে। সে চলার উদ্দেশ্য কি? না, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তি এবং জগতেরও কল্যাণ। নিজের মুক্তিকে তিনি উপেক্ষা করেননি কিন্তু কেবল সেটাই কাম্য নয়। ঠাকুর এজন্য স্বামীজীকেও ভৎ'সনা করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যদি বিশেষ কোন আদর্শ, নিয়ম ও অবদান থাকে তা হল স্বীয় মুক্তি এবং সেইসঙ্গে জগদ্বাসীর কল্যাণ। দুটি অভেদ অভিন্ন এবং অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। নিজের অন্তরকে শুদ্ধ না করে আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা নিজের প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি না করে যদি জগৎ-কল্যাণ করতে যাই তাহলে আমরা জগতের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই করব। নিজের মুক্তি এবং জগতের হিত, দুটি একেবারে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত। তাই এই দুটিই সঙ্ঘের আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে স্বামীজী এই আদর্শই দিয়ে গিয়েছেন। তবে সঙ্ঘ শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ করে কেবল সাধু-সঙ্ঘকে বুঝলে হবে না। এর ব্যাপক অর্থটি অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঠাকুরের দৃষ্টিতে সন্ন্যাসী ও গৃহীতে ভেদ নেই, সকলেই তাঁর সন্তান। তবে যেহেতু সর্বত্যাগী না হলে আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা সর্বদা সম্ভব হয় না এইজন্য সন্ন্যাসীদের উপরে তাঁর বেশি দায়িত্ব দেওয়া আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতাররূপে জগতে বিদিত হবার আগে তাঁর গৃহস্থ শিষ্যরাই সর্বপ্রথম সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে অবতার বলে প্রচার করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাতে খুশি না হয়ে প্রতিবাদ করতেন যে, ওরা অবতারের কি বোঝে? সে যাই হোক, ঠাকুরের গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্তরিক সম্বন্ধ তখন থেকেই ছিল। যখন স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইরা বরানগরে মঠ স্থাপন করে অতি কায়ক্লেশে জীবনযাপন করছেন, তাঁদের তীব্র বৈরাগ্য, ভিক্ষায় পর্যন্ত যেতে চাইতেন না; সেই সময় স্বামীজী গৃহস্থ ভক্তদের প্রেরণা দিয়েছেন সন্ন্যাসীদের ভরণপোষণের ভার নেবার জন্য। তার ফলে সঙ্ঘ স্থায়ী হয়েছে, ক্রমশঃ বৃদ্ধিও পেয়েছে।

তবে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ না থাকলে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হত কিনা সন্দেহ। মা চেয়েছিলেন ঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁর আদর্শ যাতে লুপ্ত না হয়, ভাবের প্রবাহ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হোক। ঠাকুরের কাছে তিনি ঐকান্তিক প্রার্থনা করেছিলেন, ছেলেদের থাকা-খাওয়ার একটি জায়গা হোক। সেই সঙ্ঘকে কেন্দ্র করে তারা জগতে তাঁর আদর্শ প্রচার করতে পারবে। তাই তিনি সঙ্ঘজননী।

স্বামীজী করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন-ক্ষমতা দিয়ে আর মা করেছেন তাঁর স্নেহ দিয়ে। ঠাকুরের মতোই তিনি ভক্তদের স্নেহ করতেন। সঙ্ঘ যখন বড় হয়েছে মায়ের স্নেহসুধায় নিষিক্ত হয়ে অনেকে তাঁদের জীবন পরিপূর্ণ করেছেন।

স্বামীজী বলেছেন, এই সঙ্ঘ ঠাকুরের ইচ্ছার মূর্ত রূপ, দীর্ঘকাল এটি তাঁর কাজ করে যাবে। সঙ্ঘের জন্য আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, তা না হলে আমরা প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। অতীতে বড় বড় মহাপুরুষদের আদর্শ নিয়ে কত মতবাদ, সম্প্রদায়, শাখা গড়ে উঠেছে তারপরে কলহ বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে সব লুপ্ত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ মানে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে যেখানে আমরা মূর্ত দেখবার চেষ্টা করি। এটাই সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্যের অর্থ। সেই আদর্শের প্রতি আনুগত্য সঙ্ঘকে শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে পৃথক্ করে দেখতে দেয় না। স্বামীজীর কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ এই সঙ্ঘমূর্তিতে আমাদের কাছে বিরাজিত। এখন, সেই সুমহান আদর্শ কি এক হাজার কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর ভিতরেই সীমিত? তা নয়, এঁরা হচ্ছেন আদর্শের ধারক এবং বাহক। স্বামীজী চেয়েছিলেন তাঁরা এই আদর্শ অনুসারে স্ব স্ব জীবনকে গড়ে নেবেন এবং দিকে দিকে সেই ভাবধারা প্রচারের জন্য সমগ্র জীবন নিয়োজিত করবেন

স্বামীজী আজন্ম ধ্যানসিদ্ধ কাজেই ধ্যান-জপ সাধন-ভজনকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তবে সতর্ক করেছেন ধ্যাননিষ্ঠার নামে স্বার্থপরতা যেন আমাদের গ্রাস না করে। যদি আমরা সকলকে নিয়ে বাঁচি তাহলে সকলেরই একসঙ্গে মুক্তি হবে অথবা সকলে একসঙ্গে ডুবব। স্বামীজী বলেছেন, যতদিন একজনও বদ্ধ থাকবে ততদিন আমি নিজের মুক্তি চাই না। ঠাকুরও বলতেন, আমাকে ফিরে ফিরে আসতে হবে, জগৎ উদ্ধার কাজ করতে হবে। পূর্বে পূর্বে যে-সব সন্ন্যাসিসঙ্ঘ ছিল তাদের কাজ ছিল বেদান্তের প্রচার অথবা যিনি যে-মার্গে ছিলেন সেই আদর্শ প্রচার। তাঁদের কাজের পরিধি অধ্যাত্মরাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বামীজী সেই কার্যের আর একটু ব্যাপক রূপ দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের সঙ্গে পরিচয় হলে তিনি দেখলেন যে ঠাকুরের কথা ঠিক—খালি পেটে ধর্ম হয় না, অর্থাৎ আমাদের ধর্মের যেমন প্রয়োজন তেমন অন্নবস্ত্রেরও প্রয়োজন। তা না হলে ধর্মজীবন বাধামুক্ত হয় না। সুতরাং সেবা করতে হলে সব ক্ষেত্রে সকলের সেবা করতে হবে, কেবল ধর্মপ্রচার করলে হবে না। মানুষ যাতে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ভিতরে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বিকশিত হয়ে তার জীবন যাতে সার্থক হয় এবং জগতের সকলকে সেই কাজে সাহায্য করবার জন্য তার জীবনকে সে যেন নিয়োজিত করে। এই হল সঙ্ঘের আদর্শ। আমরা যেন একথা ভুলে না যাই।

বুদ্ধের জীবনে আমরা ঐহিক সেবার কথা বিশেষ কিছু পাই না। কিন্তু পরবর্তিকালে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সাধুরা একটি ঝুলিতে ওষুধ প্রভৃতি নিয়ে ঘুরতেন এবং যেখানে যেতেন অসুস্থদের ওষুধ দিতেন। সেই থেকে সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে ওষুধ চাওয়ার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। অশোক প্রভৃতি তাঁর অনুরাগীরা অনেক সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিলেন। তখন থেকে ব্যাপক সেবার কাজ প্রচলিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা প্রথম যখন সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন—হাসপাতাল করছেন, স্কুল করছেন, দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা প্রভৃতি বিপদের সময় সাহায্য করবার জন্য দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন তখন প্রাচীনপন্থী সাধু

সম্প্রদায় এসব কাজকে সুনজরে দেখেননি, যদিও এই সেবার দ্বারা তাঁরাও উপকৃত হয়েছেন। তাঁরা মনে করতেন এঁরা সন্ন্যাসের আদর্শ থেকে বিচ্যুত। স্বামীজী তাঁর দুই শিষ্য—স্বামী কল্যাণানন্দ এবং স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে ঋষিকেশ হরিদ্বারে গিয়ে সাধুদের সেবা করতে পাঠিয়েছিলেন। কারণ তিনি দেখেছিলেন সাধুদের সেবা করবার কেউ নেই। তাঁদের যাতে অসহায় অবস্থায় থাকতে না হয় সেজন্য তাঁদের সেবা এবং অসহায় বিপন্ন তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করবার জন্য স্বামীজী তাঁর শিষ্যদ্বয়কে নিযুক্ত করেন। আমরা জানি সেই প্রতিষ্ঠান কিভাবে ধীরে ধীরে বড় হয়ে আজ একটি সুবৃহৎ সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

এই সেবাকার্যের জন্য প্রাচীনপন্থী সাধুরা ওঁদের বলতেন ভাঙ্গী সাধু। ভাঙ্গী কারণ তাঁরা রোগীর মলমূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করেন। এ তো ভাঙ্গীর কাজ, তাই বলতেন ভাঙ্গী সাধু। সেই ভাঙ্গী সাধুরা আর অবজ্ঞাত নন, এখন তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত। কালক্রমে লোকে এটা বুঝেছে যে এর প্রয়োজন আছে। প্রসঙ্গতঃ একটি ঘটনা মনে পড়ছে। উত্তরকাশীতে সাধুদের একটি আস্তানা ছিল। সাধুরা সেখানে যেতেন, থাকতেন, জপধ্যান করতেন। একবার একজনের কলেরা হল। অন্য সব সাধুরা বললেন, 'বিক্ষেপ হোতা হ্যায়', অর্থাৎ মন এতে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, বলে তাঁকে ফেলে চলে গেলেন! স্বার্থপরতা থেকে উচ্চ আদর্শেরও এইভাবে অবনতি হয়। ঠাকুরের আদর্শ ছিল সেবা, স্বামীজী তা সর্বতোভাবে কর্মে রূপায়িত করেছেন। দুর্ভিক্ষ লেগেছে, অর্থের প্রয়োজন, একজন বললেন, অর্থ কোথায়? স্বামীজী বললেন, বেলুড় মঠ বিক্রি করে দেব। এত প্রয়াসে ও যত্নে যা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই মঠকে বিক্রি করে দেবেন বলেছেন। মা বললেন, না বাবা, বিক্রি করতে হবে না। বিক্রি করতে হয়নি। টাকা এসেছে, সেবার কাজ হয়েছে। আজ ভক্তেরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন এবং সাধুরা সেবা করে ধন্য হচ্ছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আদর্শকে যদি নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে না থাকি তাহলে হয়তো যে কাজ আমরা করছি তাই-ই করব কিন্তু তার মূল্য কমে যাবে। সে-আদর্শ সেবার আদর্শ। আমাদের পূর্বসূরীরা এই সেবার ভাব মনে রেখে কাজ করতেন। একবার এক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জায়গা থেকে সেবাকার্য করে ফিরে সাধুরা স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কাছে গিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা কি দিলে? তাঁরা চাল, ডাল ইত্যাদি যা দিয়েছিলেন তাই এক এক করে বললেন। তিনি বললেন, ওসব তো অপরে তোমাদের দিয়েছে তাই দিলে, তোমরা কি দিলে? তখনও তাঁরা বুঝতে পারলেন না কি দিয়েছেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বললেন, তোমরা তোমাদের প্রেম ভালবাসা সেবাবুদ্ধি দিয়েছ। সেবা করলেই হবে না শিবজ্ঞানে জীব সেবা এই বুদ্ধি নিয়ে করতে হবে। ঠাকুরের কথাতেই আছে যে, কাঠ পাথরের প্রতিমায় তাঁর পূজা হয় আর মানুষের ভিতরে তাঁর পূজা হয় না? যেখানে তাঁর প্রকাশ এত উজ্জ্বল সেখানে তাঁর পূজা হয় না? তাই সেই আদর্শ অনুসারে সেবা-কার্যের প্রসার হচ্ছে। প্রথমতঃ জীব নয়, শিব বুদ্ধিতে সেবা। দ্বিতীয়তঃ অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান প্রভৃতি সর্বপ্রকার সেবা। কোন একটি ক্ষেত্রে সেবাকার্য সীমিত থাকবে ঠাকুর বা স্বামীজীর তা অভিপ্রেত নয়। তাঁদের সেই আদর্শ নিয়েই আমাদের সঙ্ঘ চলে আসছে।

এই সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্রথম থেকে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে সঙ্ঘের

সূচনা হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। আরও স্পষ্ট ব্যক্ত রূপে দেখা যায় কাশীপুরে, সেখানে ঠাকুর তাঁর সব যুবক সন্তানদের একটি বিশেষ আদর্শে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন এবং তাদের নেতৃত্বের ভার দিয়ে যাচ্ছেন স্বামীজীকে। কি সুষ্ঠু পরিকল্পনা! গোড়া থেকেই তিনি নিজে যতদূর পেরেছেন প্রচার কার্য করেছেন। একদিন তিনি কাঁদছেন আর বলছেন, নিতাই ঘরে ঘরে হরিনাম বিলিয়েছেন আমি যে হাঁটতে পারি না। নিজের সীমাবদ্ধতা অক্ষমতার জন্য খেদ। পরে সেই সেবার ভাব তিনি সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত করেছেন এবং সঙ্ঘ বলতে কেবল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নয়। যাঁরাই ঠাকুরের ভাবে জীবনকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন তাঁদের প্রত্যেকেরই এই দায় রয়েছে। আমরা সমবেতভাবে চেষ্টা করব জগতের সেবা করতে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের জীবন ধন্য করতে। এই চেষ্টা থেকে কখনও যেন বিরত না হই।

ঠাকুরের এই আদর্শ। তিনি নিজের সমাধিকে পর্যন্ত এর অন্তরায় বলে মনে করছেন। যখন তাঁর বাহ্য জ্ঞান চলে যাচ্ছে তখন বলছেন, মা আমায় বেহুঁশ করিসনি। আমি এদের সঙ্গে কথা কইব। তাঁর কি কথা বলার দরকার? দরকার তাদের, যাদের জন্য তাঁর দেহ ধারণ করে আসা। উদ্দেশ্য লোককল্যাণ। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁরা যখন লোককল্যাণ করছেন না তখনও বাস্তবিক লোককল্যাণ করছেন। তাঁদের জীবন দিয়ে, আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়ে লোকানুগ্রহ করেছেন।

ঠাকুরের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার এই কাজ সুপরিকল্পিত। যতদিন স্থূলশরীরে ছিলেন ততদিন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সকলকে উপদেশাদি দিয়ে ধন্য করেছেন। তাছাড়া সমাজের নেতৃস্থানীয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গিয়েছেন। উদ্দেশ্য তাঁদের ভিতরে তাঁর ভাবের সঞ্চার করা। তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হতে পারেন কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হননি। এই আদর্শ পেলে তাঁরাও জগৎ-কল্যাণে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারবেন। স্থূলশরীরে যতটুকু পেরেছেন করেছেন, শরীর ত্যাগের পর সূক্ষ্ম শরীরে তিনি নিজেকে আরও ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। সর্বব্যাপী সে বিস্তার আমাদের স্তম্ভিত এবং বিস্মিত করে। সব দেশেরই সভ্য মানুষ তাঁর এই ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। সেই আকর্ষণ তাঁদের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিচ্ছে। এটি সামান্য কথা নয়।

অন্যান্য অবতারের ক্ষেত্র ছিল সীমিত, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে দেখা যাচ্ছে সমগ্র বিশ্ব যেন তাঁর ক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে। কেবল সাধুরা নন, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান সকলেরই উদ্দেশ্য হবে তাঁর আদর্শকে নিজের জীবনে রূপায়িত করবার চেষ্টা করা এবং সেই সঙ্গে আবার সকলকেও সেইভাবে অনুপ্রাণিত করা। ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমবেত ভাবে আদর্শে পৌঁছবার জন্য তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টা করবেন, মনে রাখতে হবে যুগধর্মরূপে এটি শ্রীরামকৃষ্ণের দান।

গীতায় ভগবান বলছেন—হে অর্জুন, তোমাকে আমি সনাতনধর্ম বলছি। সনাতন মানে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী সনাতন ধর্মও মানুষের মনের মলিনতার জন্য ক্রমশঃ বিকৃত হয়। সেজন্য মাঝে মাঝে তাঁকে এসে আবার সেই ভাবটিকে শুদ্ধ করে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যেতে হয়। পূর্ব পূর্ব অবতারদের মতো শ্রীরামকৃষ্ণরূপেও তিনি এসেছেন সনাতন ভাবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যেতে। অনেক নতুন দিক আছে যেগুলি হয়তো পূর্বে প্রচার করবার প্রয়োজন হয়নি কিন্তু বর্তমান যুগের সমস্যা অনুসারে নতুন নতুন দিকে সেই ভাবটি প্রবাহিত হবে।

ধর্ম যুগে যুগে নতুন নতুন রূপ নেয়, তাকে বলে যুগধর্ম। কালে কালে অনুষ্ঠানাদি বাহ্যরূপের একটু আধটু পরিবর্তন হলেও মূল বস্তুটি একই থাকে। সেটি হল, সর্বভূতে একটি সত্তাই বিরাজিত এই উপলব্ধি। সুতরাং সর্বজীবে তাঁকে দেখে তাঁরই সেবা বুদ্ধিতে সকলের সেবা করে আমরা যেন ধন্য হই।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী আমাদের এই আদর্শই দিয়ে গিয়েছেন। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী গৃহস্থ নির্বিশেষে সকলে যেন এই আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারি। যার যতটুকু সাধ্য জীবনকে সেদিকে পরিচালিত করে যেন নিজেরাও জীবনে সার্থকতা লাভ করি এবং জগতেরও যেন কল্যাণ হয়।*

* গত ৭.৩.৮৭ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাবের সার্ধশত বর্ষ পূর্তি ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষেপিত অনুলিপি।—সঃ

# শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে শিল্পী নন্দলাল বসু

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণভাবে আমরা যে আন্দোলন চিত্রের সঙ্গে পরিচিত, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের পটভূমি এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই আন্দোলন সেই আন্দোলন নয়, যার সামিল হয়ে তাৎক্ষণিক কিছু পাওয়াতে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই আন্দোলন একটি ভাবান্দোলন যাহা মানুষকে তাৎক্ষণিক কিছু না দিলেও মানুষের জীবনে ঘটায় আমূল রূপান্তর। কেননা এ আন্দোলন স্বরূপ-সন্ধানের আন্দোলন—চৈতন্য অনুভবের আন্দোলন, যার দ্বারা আন্দোলিত হলে পাওয়া যায় মুক্তির সন্ধান। এই আন্দোলন প্রবাহের রূপপতি শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাটি অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে তিনি কেবল বলছেন নয় চাইছেন "তোমাদের চৈতন্য হউক"। তিনি বারবার নানান ভাব-ব্যঞ্জনায় আমাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই চৈতন্য অনুভবের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে নিত্য কর্মের ভিতর দিয়ে, আর তার ইপ্সিত ফলটি অনুভব করতে হবে আমাদের পারিপার্শ্বিক মানুষেরই মধ্যে। বিবেকানন্দও মুক্তিকে আস্বাদন করতে চেয়েছেন মানুষের মধ্য দিয়েই—তিনি কখনও পারিপার্শ্বিকতা স্বজনতাকে ত্যাগ করে মুক্তি পেতে চাননি। বারবার দাঁড়াতে চেয়েছেন এই সচল ধাবমান মানুষের পাশে, যেখানে আত্মা অবিনশ্বরভাবে ধাপে ধাপে সত্যভাবে প্রতীত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে আন্দোলিত হওয়ার জন্য চাই অখণ্ড প্রস্তুতি—চাই সমর্পণের দুর্জয় মানসিকতা। এরূপ মানসিকতা দেখেছিলাম শিল্পী নন্দলাল বসুর মধ্যে। দেখেছি শিল্পী নন্দলাল কেমন ভাবে ওতপ্রোত হয়ে নিজেকে তৈরি করার সাধনায় বৃত ছিলেন।

একথা বলার একটি বিশেষ সুযোগ আমার, নন্দলালকে অনেক অনেক কাছ থেকে দেখার একটি দুর্লভ সময় আমায় ঐশ্বর্যবান করেছে। কিন্তু এই দুর্লভ সময়টির সান্নিধ্য পেয়েছিলাম একটি নামরূপে—তা হল শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রিত যে-কোন প্রাণই তাঁর স্বজন—একথা তিনি সবসময় বলতেন। আমি যখন নন্দলালের সন্নিকটে তখন তিনি বলছেন, আমরা তাঁর কাছে

চাইতে শিখিনি। মানুষ অন্তর থেকে কোন জিনিস চাইলে তিনি দেন, আমরাই ভুল করি, বড় জিনিস চাইতে জানি না, ছোট জিনিস চেয়ে বসি; তাঁর কি দোষ? ঠাকুর আমাদের কত ভরসা দিয়েছেন আমরা সে ভরসায় কতটুকু তৈরি করতে পেরেছি? এই তৈরি করতে পারার দু-একটি ছোট প্রত্যক্ষ ছবির কথা বললে আরও স্পষ্ট হবে। তখন আমার বয়স কম। একটি বই বেরিয়েছে; যা নন্দলাল সম্পর্কে কুরুচি অসত্য মন্তব্যে পূর্ণ। তা দেখে তখনই বইটি সমেত নন্দলালের কাছে গিয়ে এ-বিষয়ে জানতে চাইলাম। কত নিশ্চিত স্থিরভাবে বলতে পেরেছিলেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও নিয়ে ভাববার কি আছে। এখন বুঝি এই মানসিক স্তরটিকে স্পর্শ করার কাজটি সহজ নয়। দ্বিতীয়তঃ নিজেই মন তৈরির কথায় বলছেন: "মন সবসময় নানানভাবে চঞ্চল হয়—মনে হয় এটি হল না ওটি হল না—ক্ষুব্ধ হই। স্থির থাকতে পারি কই? এই ছোট খাতাটি মাঝে মাঝে পড়ি—তাতে উপকার হয়।" ছোট খাতাটি আর কিছুই নয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের উদ্ধৃতিগুলি। বই কিনে রাখা নয়, নিজের হাতে তা লিখে লিখে মনের সঙ্গে শরীরটিকেও যুক্ত করা।

নন্দলালের ব্যক্তিজীবনে আর শিল্পীজীবনে কোন তফাত ছিল না—নিজের ব্যক্তিজীবন গঠনের উপরই শিল্পজীবনকে দাঁড় করিয়েছিলেন। শিল্প ছিল তাঁর জীবন উত্তরণের জপমালা। তিনি চিত্রকে সাধনার পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এই পাথেয় সংগৃহীত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনার ভেতর দিয়েই। চিত্রের ভেতর দিয়েই তিনি এই ভাবনার অনুভূতিকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। আর সেই পরম অনুভবের সাকার রূপানুভূতির দৃষ্টিতে সারাক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে থাকার সাধনাতেই নিজেকে সমর্পণ করার এক অখণ্ড প্রেরণা-প্রবাহ কাজ করত।

নন্দলালের জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অপার্থিব ঢেউ এসে নব ভাবনায় তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। এই আন্দোলনের ঢেউ এসে তাঁকে স্পর্শ করেছিল বলেই শাশ্বত বস্তুকে চিনতে তাঁকে পথভ্রমে ঘুরে বেড়াতে হয়নি। এই ঢেউই তাঁকে অনন্ত আনন্দের রস-বোধের এক দিঙ্‌নির্ণয়ে সাহায্য করেছে, কখনও ভুল করে ফিরে আসতে হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—এই দুটি হৃদয়ের দৃষ্টি তাঁর চিত্র-জীবনের তৃতীয় নয়নের উন্মোচন ঘটিয়েছিল। ছবিকে কেবলই তাৎক্ষণিক না ভেবে চিরস্থায়ী ভাবতেন। আর এই ভাবনা কেবল দেব-দেবীতে তাঁকে আবদ্ধ না রেখে, বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতেই সেই সত্য বর্তমান, এই অনুভূতির পাদপীঠে দাঁড় করিয়ে এক নিশ্চিত গভীরে পৌঁছে দিয়েছিল। নিজেই বলছেন: "আগে কেবলমাত্র দেবদেবী চিত্রচিত্রণের মাঝেই ভাবতুম ঈশ্বর বিরাজ করছেন; এখন বুঝি প্রকৃতির কোলে একটি ঘাসের উপরে পড়ে থাকা শিশির বিন্দুতেও সেই পরমই বিরাজ করছেন।" আবার বলছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন চিত্রকর-রূপপতি। তাঁর দেখার মধ্যে কোথাও সত্যবস্তুর চরিত্রের যথার্থতাকে বাদ দিয়ে নয়, চিত্রকরের অভাবনীয় গুণপনার স্পর্শটি হল সেই দেখাটিকে একটি চির সত্যের বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া,—ভ্রমে ফেলা নয়, অভ্রান্ত করা।" বলছেন: "ঠাকুর এমন কোন ছবিই আঁকেননি যাকে তুমি নিত্যজীবনে দেখতে পাবে না। উপমার চয়নশৈলী কখনই অদেখা কিংবা কচিৎ দেখাও নয়, যা নিত্যদিন পায়ে চলার পথের ধারে জীবনের ওঠাবসায় দেখা যায়, সঙ্গ পাওয়া যায়, কেবল সেই রোজ দেখা অনিত্যবস্তুটির

ভেতর দিয়ে সত্য-নিত্যর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আহ্বানে তিনি কতবার চঞ্চল হয়েছেন। এবার ঠাকুরের আসা আমাদের মতো অজ্ঞানী মূর্খদের জন্য।"

নন্দলালের সারা জীবনের চিত্রসম্ভারের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করলেই দেখব তাঁর হৃদয়টি কতটা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে আন্দোলিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে এসে প্রাপ্ত জীবনেও যখন এমন আদর্শটিকে সামনে রেখে চর্চা করছেন কোথাও চিত্রের বিষয়কে পেতে অসুবিধা হয়নি।

নন্দলালের জীবনে চিত্র ছিল তাঁর সাধনার পুষ্পাঞ্জলি। সেই পুষ্পাঞ্জলির কয়েকটি স্তবক এখানে তুলে ধরা যথার্থ হবে :

"মহাপ্রাণ রূপে রূপে ছন্দিত হচ্ছে, এই উপলব্ধি ছাড়া শিল্প সৃষ্টির অন্য কোন হেতু নেই।"

"শিল্পীকে সদা সচেতন হতে হবে। ভাগীরথীতে মৃণাল সমেত পদ্মফুল, পদ্মপাতা ভেসে যাচ্ছে ঢেউয়ের তালে তালে উঠে পড়ে মাছও খেলা করছে সেই জলে, ইচ্ছামতো অনুকূলে বা প্রতিকূলে যাচ্ছে স্রোতের। দুয়ের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ হল সাধারণ মানুষে আর শিল্পীতে।"

"কুণালজাতকে আছে কামলোকের কথা— তার উপরে রূপলোক, তারও উপরে অরূপলোক। আমি বলি তারও উপরে আনন্দলোক। কাম-লোকে আসক্তি, তাই অন্ধতা। রূপলোকে উঠে রূপ গোচরীভূত হয়েছে। অরূপলোকে পৌঁছে প্রাণে নিখিল প্রাণের ছন্দ স্পন্দন অনুভব করা গেছে। আনন্দলোকে রস। শাস্ত্রেই বলেছে— 'রসো বৈ সঃ'।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রবাহ-পরিমণ্ডলে নন্দলাল কেবল একলাই আন্দোলিত হননি। তাঁর সঙ্গে আন্দোলিত হয়েছে আরও বহু প্রাণ। নন্দলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন কবিতায় আছে—"কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারায়।"

নন্দলাল একা অবগাহন করেননি। সবসময় সশিষ্য অবগাহনে পরিপূর্ণ হয়েছেন। এই নিঃস্বার্থ নির্দ্বিধায় গ্রহণের চরিত্রটি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল এই আত্মচেতনার আন্দোলনের আলোর ফুলকিতে। এই প্রবাহ কেবলমাত্র একজন শিল্পীকেই সত্য চেনার পথ দর্শায়নি, একজনের ভেতর দিয়েই সমগ্র শিল্প ভাবনার আপন ঐতিহ্যের নব প্রবাহের উচ্ছলতা নতুনভাবে প্রাণ দিয়েছিল,—যে প্রাণের স্পন্দনে আজ আমরা নিজের পরিচয়ে পরিচিত।

নন্দলালের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের পরিচয় কিশোর অতিক্রান্ত-প্রায় যৌবনের নব-উন্মেষের উষালগ্নে। এই দর্শন পরিচয় সাক্ষাৎ হৃদয়ে হৃদয়ে। এর আগে থেকেই নিশ্চিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ চিত্র-সান্নিধ্যে মনটি অর্পণ করেছিলেন। চিত্রের আদর্শ সম্পর্কের অনুসন্ধানে বের হলে দেখব নন্দলাল এই পরিমণ্ডলের প্রথম দুটি প্রত্যক্ষ জীবনের স্পর্শে এসে একই সত্যকে দুটি পরি-বেশনার ভেতর দিয়ে শোনেন,—যে শ্রবণ, যে ভাবনা তাঁকে একটি চিরন্তন সত্যের দিকে দিঙ্-নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। প্রথম স্বামী ব্রহ্মানন্দ যাঁর মুখ থেকে চিত্রের সত্যভাব ও অনুভবের যথার্থতার কথা শোনেন আর দ্বিতীয় প্রায় একই পরিধির মধ্যে শোনেন গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে ফেলার চির সত্যকে। শিল্প-সাধনার প্রারম্ভে এই দুটি অমোঘ ভাবনামন্ত্র তাঁর সমস্ত জীবনের সঙ্গী হয়েছে। চিত্রের বিষয়ের সঙ্গে একীভূত হতে না পারলে সৃষ্টি কখনই প্রাণবান হয় না। এই শব্দ তাঁর কৈশোর উত্তীর্ণের সন্ধিক্ষণে শোনা। দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের পরে কি তিনি বলছেন? "হয়ে

যেতে হবে", বনে যাওয়া। সেই অনুভূতির অনুরণনে আবার বলছেন: "একদিকে মেঘ, আর একদিকে আমি; তাই মেঘের সুখ আমাতে অথবা আমার দুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হচ্ছে। একই সত্তা বিষয় ও বিষয়ী। আমার ইন্দ্রিয়গুলি দরজা জানালা মাত্র। সেই পথে আমি ও আমার বিষয় মিলছে। একই চেতনায় নানা রকম দোলা লাগছে ঢেউ জাগছে।" এখানে স্পষ্ট, কিশোর নন্দলালের হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের যে ঢেউ স্পর্শ করেছিল, তার পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্ছি।

নন্দলাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পদৃষ্টির কথায় বারবার অভিভূত হয়েছেন। কিন্তু আমরা কেউ যেন ভুল না করি যে তিনি কেবলমাত্র ভাবস্রোতে আপ্লুত হয়ে এ বিষয়ে বলেছেন। শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখেই নিশ্চিত হয়ে অভিভূত হয়েছেন আর তবেই তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। ঠাকুর ইচ্ছা করলেই যা চাইতেন তাই হয়ে যেতে পারতেন। তিনি কোন সময়েই মানুষকে অলীক ভাবনার অবকাশে ভাবতে বলেননি। আর নিজেও কোন কারণেই সে আচরণে বিচরণ করেননি। আর এই নিত্য পরিশুদ্ধ নির্মল দৃষ্টান্ত নন্দলালের শিল্পজীবনে ক্রিয়াশীল ছিল শেষদিন পর্যন্ত।

একটি বিষয় অনেকেরই মনে হতে পারে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের প্রভাব ও আত্মমগ্নতার কথাই বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। মনে করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা নন্দলালকে এককভাবে এখানে দেখলে ভুল করব। নন্দলাল একটি শিক্ষা পরিবেশের শিল্পগুরু ছিলেন। তাঁকে বিশ্বাস করে, আদর্শ করে কিছু তরতাজা প্রাণ আশ্রয় নিয়েছিল তাদের জীবন গঠনের জন্য। তাই একক নন্দলালের নন্দন-জীবনটির বেড়ে ওঠার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছেই। কেননা একটি দীপশিখা থেকেই আর একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তাই নন্দলাল নিজে তৈরি হয়ে তবেই কতকগুলি জীবনকে সেই প্রবাহে প্রবাহিত করতে সহায় হয়েছিলেন।

নন্দলাল চিত্রজীবনে যে আস্বাদনে পূর্ণ ছিলেন তার কিছু কিছু পরিচয় যেমন আমরা পেয়েছি তাঁর পূর্ণ চিত্রে, তেমন ভাবেই পেয়েছি তাঁর নিত্যদিনের কাজের ভেতর দিয়ে। মানুষের কত কাছাকাছি তিনি হাঁটতে ভালবাসতেন, এ তাঁর প্রতিটি চিত্রই সোচ্চারে বলে উঠবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের কাহিনীগুলিকে যখন রূপ দিয়েছেন তখন তা কেবলই নিছক গল্পের ছবি হয়নি, প্রতিটি চিত্রই চিত্রষড়ঙ্গের মূল্যে মূল্যবান বলে পরিচিত হতে সমর্থ হয়েছে।

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে রাধার ছবি দেখাতে গিয়ে শুনেছিলেন সত্যরাধার রূপ কি হবে। সেই বিরহিণী রাধাই যথার্থভাবে ধরা দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্তজীবনের চিত্রে।

আমরা অনেকসময় স্বদেশ ভাবনা ও চিন্তাকে নিছক এক সঙ্কীর্ণতা বলে ধরে বসি। সেদিনও লেখা হল "নন্দলালের উগ্র ও সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা।" আমার মনে হয় এই লেখায় পেছনে কখনই পূর্ণ নন্দলালের জীবনবোধকে না জানার ইঙ্গিত রয়েছে। বিবেকানন্দের উদার হৃদয়ে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ আপন হয়ে স্থান পেয়েছে, কেউ প্রত্যাখ্যাত হননি। সেই মহাজীবনের স্বদেশ ভাবনা দু-একটি স্তবক তুলে ধরলেই কোন্‌টি সঙ্কীর্ণতা বা কোন্‌টি উদারতা তা পরিষ্কার হতে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করবে।

"আমার ইচ্ছা, প্রাচীন ভারতের সদ্‌গুণগুলি ফের বেঁচে উঠুক। তার সঙ্গে যুক্ত হোক বর্তমান ভালো জিনিসগুলি। এই মিশ্রণ ব্যাপারটি হোক স্বাভাবিকভাবে। নূতন ভারত গড়ে উঠতে হবে

নিজের শক্তিতে বাইরের শক্তির সাহায্যে নয়।" বিবেকানন্দ যে ভারতবর্ষকে হৃদয়ে বসিয়েছিলেন, সে মানুষজনদের তিনি ডাক দিয়েছিলেন নতুন ভারত গড়বার জন্য। নন্দলাল তাঁর চিত্রের ভেতর দিয়ে সেই ভারতবর্ষকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পাশ্রয়ী ভাবনাগুলির অনুধাবন করলে কোথাও বুঝতে আটকাবে না তাঁর গভীর দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ, কত সুদূরপ্রসারী ছিল। আমরা তাঁর শিল্প আলোচনায় কেবলমাত্র ভিন্নদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের শিল্পের প্রকাশ, ভাবনা ও বিচারের তুলনামূলক দৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চমৎকৃত হয়েছি। কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় শিল্পের জন্যই কেবল শিল্পকথা বলেছেন, যেখানে দেশ-কাল-পাত্রের কোন পরিচয় রূপ নেই সেখানে তিনি অনন্য। শুধু অনন্য নয়, কতজন মানুষ শিল্পকে এমনভাবে দেখতে পেরেছেন? শিল্পের নিহিত সত্য প্রকাশের বিশিষ্টতায় অপরূপভাবে বলছেন: "শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে। যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। তবু প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও হবে শিল্পীকে।" এই তো শিল্পের ভাবাশ্রয়ী মর্মকথা—অন্তর উদ্বোধনের জ্ঞানশিক্ষা। এই অনুভবকে হৃদয়ে ধরার জন্যই তো প্রকৃতিতে নিত্য সন্ধান চলেছে। শুধু এই নয়, মানবসেবার জন্য যে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হল তার গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে এই কথাগুলিও আছে—"শিল্পকলাদির বিবর্ধন ও উৎসাহবর্ধন।" এ তো বিস্ফোরণ! আজকের বাতাবরনে দাঁড়িয়ে এই ভবিষ্যতকে দেখা! অকল্পনীয়! আসলে জীবনের সঙ্গে সুন্দরের অবিচ্ছেদ্য ধারা।

নন্দলাল সেই বিবর্ধন ও উৎসাহ বর্ধনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সেই কাজে তিনি কতটুকু সফল হয়েছিলেন, তার থেকেও বড় কথা এই ভাবনার আন্দোলনে তিনি নিজেকে নিশ্চিত ভাবে যুক্ত করে কৃতার্থ হয়েছিলেন—কেবলমাত্র এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে স্থির থাকেননি—এই ভাবনার আলোকে প্রজ্বলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কিছু প্রাণকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের পরিধিতে নন্দলাল খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর চাওয়া সত্যকে। ছবির ভেতর দিয়েই এই পরিমণ্ডলের বাতাবরণ তাঁকে সত্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেবার এক অনন্ত ইচ্ছার জাগরণ ঘটিয়েছিল। এই জাগরণ কেবল কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—এর প্রেক্ষাপট দিগন্ত বিস্তৃত। এই পটের আঁচলে সম্পূর্ণকে উপলব্ধি করার এক অভাবনীয় গতিপথের নির্দেশ আছে, ইঙ্গিত আছে।

নন্দলালের কাছে যখনই যে কেউ উপস্থিত হয়েছেন তখন প্রত্যেকেই তাঁর বিনয়ী আচরণের মনোভাবটিতে মুগ্ধ হয়েছেন। শিল্প-জগতে যুক্ত যে-কোন স্তরের শিল্পীকে যথাযথ সম্মান দিতে ভুলতেন না। কখনও কোন কারিগরকে শিল্পীর সম্মানে বসাতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। ছোট ছোট কাজের মধ্যে যথার্থকে সম্মান দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁরই প্রত্যক্ষ পরিচর্যায় শান্তিনিকেতনের কলাভবনে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালার দ্রব্য-সামগ্রীগুলির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, যে-কোন স্তরের কর্মীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর, কর্মক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর এই বিনয় ও যোগ্যজনে যোগ্য সম্মান দেবার মানসিকতাটির সঙ্গে একটি উক্তি বারবার উঁকি দিচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "যত বয়স বাড়ছে ততই আমি ছোট ছোট কাজের মহত্ত্ব দেখতে চাইছি। একজনকে

ছোট করে নিজে বড় হব? না, সে-জন্য আমি পৃথিবীতে জন্মাইনি।" শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনায় আন্দোলন নন্দলালের জীবনে কি ভাবে পূর্ণ, এ কেবল তারই সামান্য আলোচনা এখানে করা হল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাশ্রয়ী নন্দলালের একটি অনুভূতি দিয়ে আলোচনাটি শেষ করছি—"নিত্যনিয়মিত সাধনার ফলে অবশেষে মনটি হবে পূর্ণ কলসের মতো। কোন কারণে এই পূর্ণ কলসটির একটু নাড়াতেই অক্ষয় রসানুভূতি ছলকে পড়ে হবে ছবি, মূর্তি, গান, কবিতা আর নৃত্য।"

নন্দলাল এত বলেও শেষে যে শব্দগুলি উচ্চারণ করলেন তা আরও মহৎ আরও গভীর—"আত্মাকে মানতে পারলেই এর পূর্ণতা।"

# আশার সীমা

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

সুখের আশায় ব্যাকুলতা নিয়ে আলেয়ার দিকে ছুটেছি,
সংসারে শুধু সঙ্ আর অসার, এ-সরল কথা ভুলেছি।
নিজেকে নিয়ে যে-অহং-বৃত্ত তারি চারপাশে ঘুরেছি,
পতঙ্গসম আগুনে ঝাঁপিয়ে বার বার শুধু মরেছি।
রয়নি কিছুই, ব্যয় হল সব, ছিঁড়ে গেছে তার বীণাটার,
সুরটুকু কভু লাগে না তো আর, নিঃশেষ সব ঝঙ্কার!
প্রাণপণ করে রাখতে যা চাই তাও ভেঙে হয় খান খান,
কিছু নেই বাকী লাভের অঙ্ক ক্ষয়ক্ষতি ক্রমবর্ধমান।

নরকের দ্বারে লেখা আছে নাকি, 'আশাতে দাও জলাঞ্জলি'
মর্ত্যে যতই যন্ত্রণা পাই, আশার ছলনে তবুও ভুলি।
দুঃখে যখন জীবন গড়া, দুঃখ যখন বিধিলিপি,
দুঃখে আমি ভয় পাবো না, তুই যদি মা সঙ্গে র'বি।
শেষ আশাটুকু মনে যা রয়েছে, সে মাতা তোমার করুণার,
কৃপাকণা দিয়ে ধন্য করবে, ব্যর্থ জীবন অভাগার।

## তোমারে নমস্কার

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনাদি অসীম হে মহামহিম
তোমারে নমস্কার,
শিব সুন্দর ভুবনেশ্বর
তোমারে নমস্কার।
কল্যাণময় অমৃতনিলয়
রসতম রসাধার,
আনন্দময় অখিল ভূমায়
তোমারে নমস্কার।
নির্বিকল্প নিরুপাধিক
অরূপ নিরঞ্জন,
শুদ্ধ-সত্ত্ব-বুদ্ধ-মুক্ত
সত্য চিরন্তন,
সর্বকারণমূলাধার প্রভু
জগৎ-সারাৎসার,
চিন্ময় সচ্চিদানন্দ
তোমারে নমস্কার।
মহামহিমায় বিশ্বসভায়
বিরাজো জ্যোতির্ময়,

অনন্ত প্রাণ শান্ত মহান—
অরূপ অভ্যুদয়,
অবাঙ্‌মনসগোচর নিত্য
নির্গুণ নিরাকার,
চিরনির্ভর উদার অপার
তোমারে নমস্কার।
নন্দিত করি মহিমা তোমার
রবি শশী তারা যত
কাল হতে মহাকালের গর্ভে
চলিয়াছে অবিরত,
বিশ্বজীবন করেছো সৃজন—
আলো ও অন্ধকার,
নিখিলের সুর করেছো মধুর,
তোমারে নমস্কার।
দুঃখ-সুখের ভবপারাবারে
রয়েছো কর্ণধার,
জীবন-মরণ-শরণ-বন্ধু
তোমারে নমস্কার।

## ১৩৯৩ উদ্বোধন শারদীয়া সংখ্যার প্রচ্ছদপট দর্শনে

শ্রীমতী হিমানী রায়

উদ্বোধনের অন্তঃপুরে ছিলে মাগো এতদিন,
আজিকার এই আবির্ভাব তব যেন গো তুলনাহীন।
দূরদূরান্তের কত সন্তান তব ব্যাকুল দর্শন তরে,
পুরাতে ভকত বাসনা জননী আপনি আসিলে দ্বারে।
বীরভক্ত তব গিরিশের ডাকে সাড়া তুমি দিয়েছিলে,
অভয়ারূপিণী সারদাজননী আজি পুনঃ প্রকাশিলে।
কৃপা করি যদি, এলে কৃপাময়ী, আর দিবনাকো ছাড়ি,
ভক্তিপুষ্প দিয়ে সদাই পূজিব হৃদিমন্দির গড়ি।

# আহ্বান

ডক্টর পলাশ মিত্র

আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি তো অনেক উপরে
সমস্ত পৃথিবী আজ চেয়ে আছে আমাদের দিকে গভীর আশায় ;
শুধু তো ভারত নয় সসাগরা এ জগৎ প্রতি ক্ষেত্র-স্তরে
সুমহান কোনো কিছু আশা করে আমাদের কাজে ও ভাষায়।

মনে রেখো, উচ্চপদে সমাসীন ব্যক্তি কিংবা দল
তোমার সত্য-প্রেমে পারবে না হানতে আঘাত ;
অকপট মনোলোক—সেই শক্তি তোমার সম্বল
ওঠো, জাগো হে যুবক, কেটে যাবে দুর্যোগের রাত।

স্পষ্ট কথা সত্য কথা বলো আজ শুনে যেতে চাই
তোমাদের মন-মুখ এক কি হয়েছে কোনো কালে ?
মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে পারবে একাই ?
তোমার বুকের মাঝে প্রেমের গভীর শিখা অনির্বাণ আলো কিছু জ্বালে ?

যদি এ-বস্তুগুলির কোনোদিন প্রকৃতই মালিক হতে পারো
মৃত্যুভয় তুচ্ছ তবে ; হে যুবক, ওঠো জাগো, এগিয়ে যাও আরো।*

* [ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ( ষষ্ঠ খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭৯, ৪৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা ) কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অবলম্বনে। ]

# আছ তুমি সকল ক্ষণে

শ্রীশান্তশীল দাশ

সুখের দিনে ভুলে থাকি
দুখের দিনে ডাকি তোমায়,
তাই কি তুমি ভুলেই থাকো
দূরে রাখো অবহেলায়।
নিঠুর তুমি নও তো এমন,
সবার তুমি হও প্রিয়জন ;
এই কথাটি ভুলে যে যাই
হৃদয়খানি ভরি ব্যথায়।

সুখে আছ দুঃখেও আছ,
আছ তুমি সকল ক্ষণে,
মনে রাখি যেন আমি
নিদ্রা এবং জাগরণে।
সবাই যদি যায় ভুলে যায়,
ভুলো নাকো তুমি আমায়,
সাথে সাথেই থাক আমার,
মায়ের মতো কী মমতায়!

# এসো মা এসো

শ্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য

এই অনাদিব্যাপ্ত নিস্তরঙ্গ জ্যোৎস্না
সমুদ্রের বক্ষে
রজতশুভ্র চন্দ্রিমার পদ্ম-স্তবকে
আলতা-রাঙা পা রেখে
স্নেহ-নির্ঝর দৃষ্টিপাতে
দাঁড়িয়ে আছ তুমি বিশ্ব-জননী!
আহা! কী অনুপম লাবণ্যে
উদ্ভাসিত দিক-দিগন্তর
স্নেহ-মধুর বাৎসল্যধারা মধুমিত হয়ে
অবিরত ঝরে পড়ছে চারিদিকে
অকারণ অকৃপণ করুণায়।
পৃথিবীর মাটিতে সুদৃঢ় দাঁড়ানো
সবুজ বনরাজির
মাথায় রেখেছ হাত
আজ্ঞাবহ আত্মদানে ওরা ভূমিকে
করেছে সমৃদ্ধ।
অভয় কর-স্পর্শ পেয়ে কল্লোলিত
সাগর
উচ্ছ্বসিত হয় তোমার স্নেহাতুর
আকর্ষণে।
সেই ঈশারায় তটিনী তীর বেগে
প্রধাবিত হয়
সুশান্ত শান্তির আলয় সাগর
অবগাহনে।
অবারিত পৃথিবীর শৈল তরঙ্গ মালায়
হিমানীর জমাট সমাহিত উপাসনা;
শুভ্র মেঘরাশি সন্তর্পণে বন্দনার
ভঙ্গীতে এসে
ব্যজন করে আরাত্রিক মর্যাদায়।
পবিত্র-পাবনী গঙ্গা গিরিশৃঙ্গ বেয়ে
নেমে আসে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে
তোমার চরণযুগল ধুইয়ে দেয়
দিবারাত্রি।
অগোচরে সুগন্ধ পুষ্পরাশি উন্মোচিত
হয় বনে-কাননে
অঞ্জলি হয়ে প্রণত হবার আকাঙ্ক্ষায়।
আমি কীটাণুকীট মনুষ্য সন্তান
সাধনাহীন হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা
করেছি তোমায়।
এসো মা তুমি এসো—
চরণযুগল রাখো এই বক্ষ-বেদীতে;
সংসার তাপিত তৃষিত হৃদয়ে
একবিন্দু শান্তি দাও
যা পেলে নির্মোহ হয় জীবন প্রবাহ॥

# দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

## স্বামী প্রভানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে বসে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলছিলেন: "আমি আর আমার, এইটির নাম অজ্ঞান। রাসমণি কালীবাড়ি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না ঈশ্বর করেছেন।……হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ-মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ি আমার নয়,……এসব তোমার জিনিস; এ স্ত্রী-পুত্র পরিবার এসব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিস; এর নাম জ্ঞান।" এই জ্ঞান-অজ্ঞানের আবর্তে ঘটনার পর ঘটনার ঢেউ কালের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে, কখনও বা ঢেউয়ের উপর ঢেউ আঘাত হানছে, ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করছে বৈচিত্র্য। অবশ্য এ-সকলের সামান্য কয়েকটি কিছুকালের জন্য কালের বেলাভূমিতে রেখে যাচ্ছে পদচিহ্ন, আর অধিকাংশই আরও অল্প সময়ের মধ্যে মুছে যাচ্ছে। কালের বেলাভূমিতে কিছুক্ষণ স্থায়ী ঐ সকল পদচিহ্নই ইতিহাসের সাক্ষ্য। এ-সকল পদচিহ্ন অনুসরণ করলেই বুঝা যায় ঘটনাপ্রবাহের গতিমুখ ও বৈশিষ্ট্য।

উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। দুই অলোকসামান্য ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল ঘটনাপ্রবাহের দুটি ধারা; ধারা দুটি মিলিত হয়েছিল ইংরেজ-ভারতের রাজধানী কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে—সেখানে গড়ে উঠেছিল ৺মা-কালীর কেল্লা, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বেদীমূলে বসেছিল 'ধর্মমহাসভা',[১] সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন ইতিহাস, আকর্ষণ করেছিল সকল শ্রেণীর মানুষকে, তাদের মনে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল এক মহিমময় ভবিষ্যতের। প্রথম জন গ্রাম বাংলার অসাধারণ প্রতিভাধর এক মানুষ, নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস, যিনি ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার ঘনীভূত মূর্তিরূপে সম্পূজিত। দ্বিতীয় জন কলকাতার এক ধনী অভিজাত পরিবারের কর্ত্রী, যিনি বুদ্ধিতে তেজে দানশীলতায় ও হৃদয়বত্তায় এক মহাশক্তির অভিপ্রকাশরূপে বাংলাদেশে চির-সমাদৃত। দ্বিতীয় জন প্রথম জনের দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত ও আশীর্বাদপুষ্ট।

উপরোক্ত দুটি ধারার সঙ্গমস্থল দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। বর্তমান দক্ষিণেশ্বর উপনগরের প্রায় মধ্যস্থলে দেউলপোতা। জনশ্রুতি, প্রাচীনকালে সেখানে ছিল বাণরাজার প্রাসাদ। দক্ষিণেশ্বর গ্রামের আদি নাম শোণিতপুর। সম্বলপুরও ছিল আরেক নাম। বাণরাজার গৃহদেবতা ছিলেন 'দক্ষিণেশ্বর শিব', তা থেকে গ্রামের নাম হয় দক্ষিণেশ্বর। একমতে দক্ষিণেশ্বর শিব বর্তমানে নিরুদ্দেশ, অপরমতে গঙ্গার ধারে শিব-তলার 'বুড়োশিব'ই দক্ষিণেশ্বর শিব। প্রায় তিনশ বছর আগেও দেউলপোতার মতোই অরণ্যে ঢাকা ছিল সমস্ত দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। জনবসতি ছিল অতি বিরল। কয়েক ঘর জেলে ও মালার বাস ছিল। সাবর্ণ চৌধুরীবংশের দুর্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও ভবানীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী বড়িষা থেকে এসে প্রথম বাস করেন দক্ষিণেশ্বর গ্রামে। তাঁরা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বহুলোক এনে বসত করান এবং নিজেদের পরিকল্পনা মতো গড়ে তোলেন গ্রামটিকে। এই বংশেরই যোগীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের অভয়াশ্রয়

১ স্বামীজী বলেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সমগ্র জীবনই একটি ধর্মমহাসভা-স্বরূপ ছিল।' (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১১)

লাভ করেছিলেন।[২] দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন ইতিহাস যাই হোক, দক্ষিণেশ্বর বর্তমানে ভুবন-খ্যাত এবং এই দক্ষিণেশ্বরের প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির তথা শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্থাপিত অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানাগারে।

ঋষিতুল্য পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও উদারপ্রাণা মাতা চন্দ্রমণির কনিষ্ঠপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ। ইংরেজ সভ্যতার দ্বারা প্রায় অস্পৃষ্ট গ্রামীণ বাংলার পরিমণ্ডলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাঁর বাল্য ও কৈশোর। অলৌকিক স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, পবিত্র জীবন ও মিষ্ট ব্যবহারের ঘেরাটোপে বিস্ফুরিত তাঁর সহজাত অঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়-কুশলতা তাঁকে গ্রামে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সাতবছর বয়সে বালকের বাবার মৃত্যু ও আটবছর বয়সে আকস্মিকভাবে ৺বিশালাক্ষীর দিব্যদর্শন তাঁর জীবনের গতিমুখ স্থির করে দেয়। চালকলাবাঁধা বিদ্যা বর্জন করে তিনি ঝুঁকে পড়েন মুক্তি-অভিলাষী পরা বিদ্যার দিকে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স যখন মাত্র সতেরো, সে-সময়ে তিনি কলকাতার ঝামাপুকুরে এসে দাদা রামকুমারের যজমানীর কাজে সাহায্য করতে থাকেন। ঠিক সে-সময়ে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাসমণির কালীমন্দির তৈরির কাজ সমাপ্তির মুখে। মন্দির তৈরির কাজ শেষ হলেও দেবীপ্রতিষ্ঠার দিন বেশ পিছিয়ে যায়। এদিকে সকলের অজ্ঞাতসারে নতুন তৈরি মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রস্তুতি চলতে থাকে। উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পাষাণময়ী মাতৃ-মূর্তিতে চিন্ময়ী জগন্মাতাকে জাগ্রত করবেন, জগৎ-কল্যাণের জন্য ব্রহ্মকুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করবেন।

রানী রাসমণি[৩] চব্বিশ পরগণার কোনা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। পিতা হরেকৃষ্ণ দাস ঘরামীর ও কৃষকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মাতা রামপ্রিয়া মারা যান যখন রাসমণির বয়স মাত্র সাত। এগারো বছর বয়সে কলকাতা জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের[৪] সহিত বিবাহ হয় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সুলক্ষণা রাসমণির আগমনের পর শ্বশুরবংশে প্রচুর অর্থাগম হয়। রাজচন্দ্র 'রায়বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন। রাজচন্দ্রের বহু সৎকার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাবুঘাট, হাটখোলার ঘাট ও বাবুরোড (বর্তমান নাম রানী রাসমণি রোড) নির্মাণ, বেলেঘাটা খালের জন্য জমি দান, নিমতলা শ্মশানঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য ঘর নির্মাণ, ব্যারাকপুরে তালপুকুর খনন, মেটকাফ হলের গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী ও দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে অর্থদান। তাঁদের চারটি কন্যা-সন্তান —পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। প্রথম তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে রাজচন্দ্র মাত্র ৪৯ বছর বয়সে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। তৃতীয় জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, ধীর স্থির মেধাবী। ১৮৩১

২ সুবোধকুমার রায়ঃ ইতিবৃত্ত—আরিয়াদহ ও দক্ষিণেশ্বর, ১৯৭১, পৃঃ ৮০-৯০ এবং শশিভূষণ সামন্তঃ দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাতত্ত্ব, ১৩৪৫, পৃঃ ১-২

৩ তাঁর মায়ের দেওয়া নাম রানী আর ভাল নাম রাসমণি।

৪ রাজচন্দ্রের পিতা প্রীতিরাম পূর্ব বাংলার এক কায়স্থ মহাজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বেলেঘাটায় এক বাঁশের আড়ত করেছিলেন। অনেকগুলি বাঁশ একত্রে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে নেওয়া হয়। একে বলে বাঁশের মাড়। তা থেকে প্রীতিরামের উপাধি হয় 'মাড়'। প্রীতিরাম জানবাজারে সাতমহলা বাড়ি আরম্ভ করেন ১৮১০ খ্রীঃ এবং তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র রাজচন্দ্র শেষ করেন ১৮২১ খ্রীঃ। মোট খরচ পড়েছিল ৫ লক্ষ টাকা।

খ্রীষ্টাব্দে করুণাময়ীর মৃত্যুর পর তিনি জগদম্বাকে বিয়ে করেন পরের বছর। রাসমণি শেষ পর্যন্ত মথুরমোহনের সাহায্যে অতি বিচক্ষণতার সহিত জমিদারী পরিচালনা করতে থাকেন। একদিকে জমিদারীর সম্প্রসারণ ও ব্যবসায়াদিতে প্রচুর আয় বৃদ্ধি হয়, অপরদিকে বহুবিধ জনহিতকর কার্যের মাধ্যমে রানী রাসমণির নাম বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। রানীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য লোকহিতকর কার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোনাই ও বেলিয়া-ঘাটায় খাল খনন, ভবানীপুর বাজার স্থাপন, কালীঘাটে স্নানের ঘাট ও গঙ্গাযাত্রীনিবাস নির্মাণ, হালিসহরে গঙ্গার ঘাট নির্মাণ এবং সুবর্ণরেখার তীর থেকে জগন্নাথধাম যাওয়ার রাস্তার অনেকখানি নির্মাণ। নিজ জমিদারীর প্রজাগণকে নীলকরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মধুমতী ও নবগঙ্গার সংযোগসাধন তাঁর অপর দুটি স্মরণীয় কীর্তি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রজাহিতৈষণার বহু কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

রানী রাসমণির বহুমুখী অবদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবদান দক্ষিণেশ্বর গ্রামে মা-কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তপোবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা। রানীর উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ের ফলে গড়ে উঠেছে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, আর শ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অলৌকিক তপস্যার ফলে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ।

দৃঢ়চেতা ভক্তিমতী রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিচিত্র। কথিত আছে, রানী রাসমণি ১২৫৫ সনে[৫] পুণ্যতীর্থ কাশীধামে যাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। রানীর অনেক দিনের বাসনা সেখানে গিয়ে বাবা ৺বিশ্বেশ্বর ও মা ৺অন্নপূর্ণার দর্শন করবেন। সেজন্য তিনি বেশ কিছু অর্থও পৃথক করে রেখেছিলেন। সঙ্গে যাবেন তিন জামাই ও মেয়ে, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, পাইক বরকন্দাজ। পঁচিশখানা[৬] বজরা ঠিক করা হল। তীর্থযাত্রার ব্যাপক আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ।

এদিকে সে-সময়ে দেশময় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ভীতির সৃষ্টি করেছিল। ভুখা মানুষের হাহাকার, শত শত মানুষের অকাল মৃত্যুর খবর তাঁর চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। নিত্য গঙ্গাস্নান করতে যাওয়ার পথে তাঁর চোখে পড়ে মানুষের দুর্গতি। যাত্রার অব্যবহিত পূর্বরাত্রে তিনি স্বপ্নে দেবীর দর্শনলাভ করেন।[৭] দেবীর প্রত্যাদেশ, কাশী যাওয়ার দরকার নেই; গঙ্গার তীরে মনোরম একটি স্থানে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে। দেবী তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন: "আমি ঐ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে নিত্য তোর পূজা গ্রহণ করব।" ভোরবেলায় রানী মথুরমোহনকে নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে তীর্থযাত্রা স্থগিত রাখবার জন্য আদেশ দিলেন। বজরায় রাখা খাদ্যদ্রব্য দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হল। রানী তাদের জন্য আরও অর্থ ব্যয় করলেন।

৫ দলিল-দস্তাবেজ থেকে জানা যায় মন্দিরের জমি কেনা হয়েছিল ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭ (২২ ভাদ্র ১২৫৪ সন)। রানীর তীর্থযাত্রার প্রস্তুতি নিশ্চয়ই এর পূর্বে ঘটেছিল। মনে হয় বছরটি হবে ১২৫৪ বা তার আগের বছর।

৬ লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে একশত ছোট বড় নৌকা বিবিধ দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ হয়ে ঘাটে বেঁধে রাখা হল।

৭ অপর একমতে রানী তীর্থযাত্রা করে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত এগেছিলেন, নৌকার উপর রাত্রিকালে সেখানে তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত কাহিনী থেকে জানা যায় রানী দৈবাদেশ অনুসারেই কাশীধামে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ এবং গঙ্গাতীরে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১২৬৭ সনে সম্পাদিত দেবোত্তর দলিলে রানীর বিবৃতি ভিন্ন রকমের। সেখানে রানীর বক্তব্য : "During the life-time of my husband he had a mind to erect a temple and perform Debaseba. But as he died suddenly and could not fulfil his desire I have for carrying out his wishes purchased by a bill of sale of revenue paying land measuring 54½ ( fiftyfour and a half ) bighas, bearing an annual revenue of···।" এই দলিলের অন্য এক অংশেও উল্লিখিত হয়েছে রানীর মন্দির স্থাপনের প্রচেষ্টা "for the fulfilment of the desires of my deceased husband and for his spiritual welfare." অবশ্য, রানীর মন্দির স্থাপনের মূলে উপরোক্ত দৈবাদেশ ও তাঁর পরলোকগত স্বামীর অপূর্ণ ইচ্ছা এই উভয় উপাদানের সমবায় মেনে নিতে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই।

"গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল" এ-ধারণার বশবর্তিনী হয়ে রানী রাসমণি ভাগীরথীর পশ্চিম-কূলে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে জমি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত প্রসিদ্ধ জমিদারগণ আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন যে তাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও অপরের ব্যয়ে নির্মিত ঘাট দিয়ে গঙ্গায় তাঁরা অবতরণ করবেন না। অপর একটি মতে রানী হালিশহর বালিদাঘাটস্থিত প্রসিদ্ধ 'সিদ্ধেশ্বরী' কালীকে আশ্রয় করে ভাগীরথীতীরে মন্দির-স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। সেখানকার প্রভাব-শালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের প্রবল বিরোধিতার ফলে রানী বহু অর্থমূল্যেও সেখানে জমি সংগ্রহ করতে পারেননি।[৮] বাধ্য হয়ে রানী ভাগীরথীর পূর্বকূলে জমির অনুসন্ধান করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত যে-জমিখণ্ডের উপর বর্তমান মন্দির সংস্থাপিত সেটি নির্বাচন করেন।

নির্বাচিত ভূমিখণ্ডের বেশির ভাগ ছিল এক ইংরেজের অধিকারে। অপর ভাগে ছিল মুসলমানদের কবরডাঙ্গা ও গাজী সাহেবের পীরের স্থান। জায়গাটা দেখতে ছিল কচ্ছপের পিঠের মতো। তন্ত্রমতে কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তি-প্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত। শ্রীরাম-কৃষ্ণ বলতেন : "রানী যেন দৈবাধীন হইয়াই উক্ত স্থানটি মন্দির নির্মাণার্থ মনোনীত করেন।"

লীলাপ্রসঙ্গকার বলেন : "কালীবাটীর জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা, দেবোত্তর দানপত্রে লেখা আছে।" কিন্তু প্রাগুক্ত দলিলে দেখতে পাই জমির পরিমাণ ৫৪½ বিঘা। জমিখণ্ডের পশ্চিমে পতিতপাবনী ভাগীরথী, পূর্বদিকে কাশীনাথ চৌধুরী ও অন্যান্যদের জমি, উত্তরে সরকারি বারুদখানা[৯] এবং দক্ষিণে জেমস্ হেস্টির বাড়ি ও কারখানা ( পরে এই জমিতে গড়ে ওঠে যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি )। জমির মালিক ছিলেন জন হেস্টি[১০] ( John Hasties )। তাঁর

৮ কুমারহট্ট—হালিশহর—উচ্চ বিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ( ১৮৫৪-১৯৫৪ ), পৃঃ ৪৯

৯ উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে বারুদাগার স্থাপিত হয়, যেখানে বর্তমানে উইমকো ম্যাচ ফ্যাক্টরী রয়েছে ; ( ইতিবৃত্ত—আড়িয়াদহ ও দক্ষিণেশ্বর, পৃঃ ১০১ )

১০ জন হেস্টি কুঠিবাড়িতে বাস করতেন। করিতকর্মা মানুষ। উঠে পড়ে লেগেছিলেন এখানে একটি চটকল তৈরির চেষ্টায়। কল তৈরির ব্যাপারে কিছুটা এগিয়ে সাহেব রওনা হন বিলাতে যন্ত্রপাতি কেনার আশায়। পথে তার মৃত্যু হয়। কাজেই আর চটকল তৈরি হয়ে ওঠে না।

একসিকিউটর সুপ্রিম কোর্টের এটর্ণি জেমস্ হেস্টির কাছ থেকে রানী রাসমণি ৪২,৫০০৲ টাকায় জমিখণ্ড কিনে নেন। সে দিনটি ছিল সোমবার, ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭ ( ২২ ভাদ্র ১২৫৪ )। এরপর রানী সংগৃহীত জমির আয়তন সম্প্রসারণের জন্য উত্তর ধারে মালোদের কিছু জমি ও পূর্বদিকে মুসলমানদের কবরস্থান ও কিছু জমি ক্রয় করেন।[১১] ফলে জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ বিঘা এবং এই সমস্ত জমি সংগ্রহ করতে রানীর খরচ পড়ে মোট ৫৫,০০০৲ টাকা।[১২] মন্দিরের জন্য কেনা জমি প্রাচীর দিয়ে সে-সময়েই বা কিছু পরে ঘেরা হয়। তাতে বসান হয় দুটি ফটক। সদর ফটক কলকাতার মানুষের জন্য। আর উত্তরের ফটক গ্রামের বাচস্পতিপাড়া, মুখার্জি-পাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া ও চৌধুরীপাড়ার মানুষদের গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য। পরবর্তিকালে বিবেকানন্দ ব্রিজ ও তার উপর দিয়ে রেললাইন পাতবার জন্য কালীমন্দিরের জমিখণ্ডের দক্ষিণাংশের কিছুটা অংশ ছেড়ে দিতে হয়। বর্তমানে মন্দির কর্তৃপক্ষের দখলীকৃত জমির পরিমাণ কম-বেশী ৫৮ বিঘা।*

জমি সংগ্রহের পরই গঙ্গার ধার বরাবর ইটের পোস্তা ও ঘাট বাঁধান হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ঘুষুড়ি থেকে ভাগীরথীতে যে প্রবল বান আসত, তার প্রচণ্ড আঘাতে নবনির্মিত পোস্তা ভেঙে পড়ে। অতঃপর রানী রাসমণি ম্যাকিনটস্ কোম্পানিকে দায়িত্ব দেন পোস্তা ও ঘাট বাঁধাবার জন্য। এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা খরচ করে বর্তমানের পাকা পোস্তা ও ঘাট নির্মিত হয়।[১৩] পোস্তা ও ঘাট বাঁধাবার পর একদিকে মন্দির-নির্মাণ শুরু হয়, অপরদিকে গাছপালা লাগান হয়, ফুলবাগান তৈরি হতে থাকে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণের মনোরম বর্ণনা প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন কথামৃতকার। তার পুনরাবৃত্তি না করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব। একথা অনস্বীকার্য যে মূল মন্দিরের গঠননৈপুণ্য ও বিন্যাস-লালিত্য দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। যে-সময়ে এই মন্দির নির্মিত হয় সে-সময়ে বাংলার মন্দিরের সূত্রধর, শিল্পী সব অবলুপ্তির পথে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, এই মনোহর মন্দিরের স্থপতি কে, বিভিন্ন দেবদেবীর সুন্দর মূর্তির ভাস্করই বা কে বা কারা?

মন্দিরের স্থপতির নামধাম নিশ্চিতভাবে না জানা গেলেও এ-মন্দিরের স্থাপত্যের উপর যে-সকল প্রভাব কাজ করেছে তাদের প্রধান কয়েকটি চিহ্নিত করা বোধ করি দুঃসাধ্য নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের মন্দিরশিল্প চারটি রীতি অনুসরণ করেছে—রেখ বা শিখর দেউল, ভদ্র বা পীড়া দেউল, স্তূপশীর্ষ ভদ্র বা পীড়া দেউল ও শিখর শীর্ষ ভদ্র বা পীড়া দেউল। কিন্তু মুসলিম যুগেই বাংলার মন্দির-স্থাপত্যে সূচনা হয়েছিল 'স্বদেশী' যুগের। কুঁড়ে বা চালাঘরের অনুকরণে নির্মিত এ-যুগের মন্দিরগুলি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত: বাংলা মন্দির, চালা মন্দির এবং রত্ন বা চূড়া মন্দির।[১৪] মন্দিরের ছাদের উপর চূড়া তৈরি করে রত্নমন্দির

১১ দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাতত্ত্ব, পৃঃ ৭।

১২ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ: দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ, ১৩৫৯, পৃঃ ২৬।

* তারকাচিহ্নিত সকল তথ্য দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ও দেবোত্তর এস্টেটের বর্তমান সম্পাদক শ্রীকুশল চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৩ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ২৭।

১৪ অমীয় মুখোপাধ্যায়: চব্বিশ পরগনার মন্দির, ১৩৭৭, পৃঃ ২-৫।

দুটি বাঙালী স্থপতির প্রতিভার স্বাক্ষর। দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন মন্দির এই শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রথম তলে ছাদের চারকোণে চারটি চূড়া, মধ্যে দ্বিতল কক্ষ এবং তার উপর দাঁড়িয়ে আরও চারটি চূড়া। সর্বোপরি নবম চূড়া। মন্দিরের উচ্চতা আরোপের কৌশল হিসাবে নবরত্নের সৃষ্টি স্থাপত্যকলাতে অভিনব সংযোজন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে মুখ্য-মন্দির ৺জগন্মাতার নবরত্ন, দ্বাদশ শিবের বারোটি আটচালা মন্দির এবং আচ্ছাদিত বারান্দাযুক্ত দালানে রাধাগোবিন্দের মন্দির।

সাধারণ বিচারে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরিকল্পনাতে দুটি নিকটবর্তী মন্দিরের প্রভাব সুস্পষ্ট। দক্ষিণেশ্বরের নবরত্নের সঙ্গে গঠনশৈলীতে সৌসাদৃশ্য রয়েছে টালিগঞ্জের রাধাকান্ত মন্দিরের। রাধাকান্তের নবরত্ন কলকাতার সর্বাপেক্ষা উচ্চতম[১৫] মন্দির। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৩১ শকাব্দে (১৮০৯ খ্রীঃ)। মন্দির তৈরি হতে সময় লেগেছিল তেরো বছর। এর প্রতিষ্ঠাতা বাওয়ালীর রামনাথ মণ্ডল।[১৬] এই মন্দিরের আদলেই দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন নির্মিত। ডেভিড ম্যাক্‌কাচন লিখেছেন: "Their appearance and design are more or less the same."[১৭]

আর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বিন্যাসের পরিকল্পনা স্মরণ করিয়ে দেয় কিছু উত্তরে মূলাজোড়-শ্যামনগরের ব্রহ্মময়ীর মন্দিরকে। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার ধনপতি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন এই মন্দিরে দক্ষিণাকালিকা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বর্তমানে ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলির আদিরূপ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় মন্দির-প্রাঙ্গণ আলো করে বিরাজ করত কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির ও রাধাকৃষ্ণ মন্দির। উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত এই দুটি মন্দিরের শিল্পকলার উন্নততর সংস্করণ ও সমন্বয় ঘটেছে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। দক্ষিণেশ্বর নবরত্নের উচ্চতা ১০০´ ফুট। মন্দিরের পীঠস্থানের আয়তন ৪২২½´ স্কোয়ার ফুট।[১৮] ইংরেজ আমলের নব্যধনিক হিন্দু রাজা-মহারাজার নির্মিত দেবালয়গুলির উপর তাদের নিজেদের বসবাসের বাড়ি ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের মন্তব্য: "ভক্তের life-style ভক্তির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরাধ্য দেবদেবীর উপর আরোপিত হয়।"[১৯] আত্মবৎ সেবাপূজায় আকাঙ্ক্ষী রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুচ্ছের শিল্পকলা, ভোগরাগাদির ব্যবস্থা ও পরিচালন ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর life-style-এর সাক্ষ্য বহন করছে।

আমরা দেখেছি মন্দিরের জন্য জমি সংগৃহীত হয়েছিল ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। পোস্তা ও ঘাট নির্মাণের কাজ কিছুটা অগ্রসর হতেই নবরত্ন, অন্যান্য মন্দির ও ঘরবাড়ির কাজ আরম্ভ হয়েছিল। রানী রাসমণির এই কাজে প্রধান সহায়ক ছিলেন প্রথম দিকে তাঁর বড় জামাই রামচন্দ্র দাস এবং পরে সেজ জামাই মথুরমোহন

১৫ কলকাতার সর্বোচ্চ মন্দির ছিল গোবিন্দরাম মিত্রের তৈরি নবরত্ন। চিৎপুর রোডে অবস্থিত এই মন্দিরের চূড়া ছিল ১৬৫´ উঁচু। ১৭৩৭ সনের ঝড়ে ও ভূমিকম্পে ঐ মন্দির ভেঙে পড়ে। (রাধারমণ মিত্র: কলিকাতা দর্পণ, ১৯৮০, পৃঃ ৬১)।

১৬ পঞ্চানন রায়: কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৫৯, পৃঃ ৪০০

১৭ The Temples of Calcutta in 'Bengal : Past & Present'. Jan-June, 1968, p. 52.

১৮ David J. McCutchion: Late Mediaeval temples of Bengal (1972), p. 52.

১৯ বিনয় ঘোষ: কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ৬৭২।

বিশ্বাস। রানী নিজেও মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন তাঁর স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের অগ্রগতি দেখতে। মন্দিরের নির্মাণকার্যের দায়িত্ব পড়েছিল ম্যাকিনটশ কোম্পানির* উপর। রানীর সফল নেতৃত্বে বহু বাধা অতিক্রম করে নির্মাণকার্য মাত্র সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যায়। ১৪ মার্চ ১৮৫৩ (২ চৈত্র ১২৫৯) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' সানন্দে ঘোষণা করে: "আমরা শুনিতেছি উক্তা গুণযুক্তা শ্রীমতী (রাসমণি) আগামী বৈশাখীর পূর্ণমাসি তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে মহতী কীর্তি স্থাপিতা করিবেন, অর্থাৎ ঐ দিবস গুরুতর সমারোহ সহযোগে কালীর নবরত্ন, দ্বাদশ শিবমন্দির ও অন্যান্য দেবালয় এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি উৎসর্গ করিবেন, এতৎ পবিত্র কর্মোপলক্ষে কত অর্থ ব্যয় এবং কত ব্যক্তি উপকৃত হইবে তাহা অনির্বচনীয়।"[২০] কিন্তু আপাত-দুর্বোধ্য কারণে মন্দির-প্রতিষ্ঠা ঘোষিত দিনে না হয়ে পেছিয়ে গেছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য। অবশ্য তিন বছর পরে ১২ এপ্রিল ১৮৫৬ (১ বৈশাখ ১২৬৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' ঘোষণা করে: "১২৬২, জ্যৈষ্ঠ, জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যবতী শ্রীমতী রাসমণি দাসী বহু ব্যয় ও বহু সমারোহপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে নবরত্ন ও শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন।"[২০] অধিকাংশ গ্রন্থকারের অভিমত দেবালয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রানী রাসমণির ব্যয় হয়েছিল নয় লক্ষ টাকা। কয়েকজনের মতে শুধু প্রতিষ্ঠা-উৎসবের ব্যয় দাঁড়িয়েছিল দুই লক্ষ টাকা।

নদীপথে নৌকা থেকে নেমে চওড়া বিশাল সিঁড়ি বেয়ে উঠেই চাঁদনি। চাঁদনির দুদিকে ছটি ছটি করে বারোটি আটচালার শিবমন্দির। আটচালা মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরকার চারচালা মন্দিরের আচ্ছাদক, শীর্ষের ছোট চারচালাটির উপস্থাপনা অঙ্গসজ্জার জন্য। দক্ষিণভাগের ছটি মন্দিরের দেবতা দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে যথাক্রমে যজ্ঞেশ্বর*, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাদেশ্বর, নন্দীশ্বর ও নরেশ্বর শিব। উত্তরভাগে ছটি মন্দিরের দেবতা দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে যথাক্রমে যোগেশ্বর, যত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাকেশ্বর, ও নির্জরেশ্বর শিব। কালো কষ্টি পাথরে তৈরি প্রতিটি শিবলিঙ্গ উচ্চতায় ৩½' ফুট। চাঁদনী ও দ্বাদশ মন্দিরের পুবদিকে টালি দিয়ে ঢাকা বিশাল আঙ্গিনা, দৈর্ঘ্যে ৪৪০' ফুট ও প্রস্থে ২২০' ফুট। আঙ্গিনার মাঝখানে উত্তরে ৺রাধাকান্তের মন্দির, মধ্যে ৺ভবতারিণীর মন্দির ও দক্ষিণে নাটমন্দির। ৺ভবতারিণীর মন্দিরের নটি চূড়া, মনোহর তাদের বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা। কথামৃতকারের বর্ণনায় পাই, "একটি চূড়া এখন ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে। এক সময়ে মন্দিরের উপর বজ্রপাত হয়েছিল।"[২১] দেবমূর্তির কোন ক্ষতি না হলেও চারপাশের মর্মর প্রস্তর কিছু ভেঙ্গে গেছিল। এই দুর্ঘটনার পরে মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে লাইটনিং কনডাকটর লাগানো হয়েছে। কালীমন্দিরের দক্ষিণ দিকে সুবিস্তৃত নাটমন্দির, তার উত্তর-দক্ষিণে স্থাপিত দুই সারিতে বারোটি স্তম্ভ এবং পূর্ব-পশ্চিমে দুই সারিতে চারটি স্তম্ভ। তার উপর

২০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ: ৭৪৮।

* কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই যজ্ঞেশ্বর শিব বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং তিনি এখানকার আদি শিব রূপে সম্মানিত।

২১ এই ঘটনার সাক্ষী শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে বলেছিলেন: 'মা-কালীর মন্দিরে যখন বাজ পড়েছিল, তখন দেখেছিলাম মন্দুর মুখ উড়ে গেছে।' (ক, ৫।১৪।২)।

ছাদ। নাটমন্দিরের উত্তরে বলিদানের স্থান।[২২] ৺রাধাকান্তের মন্দিরের মন্দিরতল মর্মর প্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখের দালানে ঝাড় টাঙানো। ৺রাধাকান্তের মন্দিরগৃহ ও পূর্বোক্ত নাটমন্দিরের গঠনশিল্পে ইউরোপীয় প্রভাব পরিস্ফুট। চকমিলান উঠানের দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর পাশে একতলা ঘরের সারি। পুবদিকের সারিতে ভোগরান্নার ঘর, নৈবেদ্যঘর, অতিথি-শালা। দক্ষিণদিকের ঘরগুলিতে খাজাঞ্চির অফিস প্রভৃতি। এবং উত্তর-পশ্চিমের কোণের ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছিলেন চৌদ্দ বছর ( ১৮৭১-৮৫ )।

৺ভবতারিণী মন্দিরের তল সাদা ও কাল মর্মরে আবৃত। তার উপর কাল মার্বেলের দুই স্তবকের বেদী। বেদীর সোপানে রুপোর ছোট সিংহাসনে নারায়ণশিলা, নাম লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা। পূর্বে একপাশে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিত অষ্টধাতুর রামলালা-মূর্তি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সেটি চুরি হয়ে যায়। বেদীর উপর রুপোর প্রস্ফুটিত শতদলপদ্ম এবং তার উপরে শ্বেতপাথরের তৈরি মহাকালের শায়িত মূর্তি। তাঁর বুকের উপর দাঁড়িয়ে বারাণসী চেলিপরা নানারকমের অলঙ্কারে সুসজ্জিতা ত্রিনয়নী ৺দক্ষিণাকালিকার মূর্তি। মায়ের নাম ৺ভবতারিণী। খুবই সম্ভবতঃ মায়ের এই সুপ্রচলিত নামটি দিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। মন্দির-প্রতিষ্ঠার ছয় বছর পরে সম্পাদিত দেবোত্তর দলিলে দেবীর নাম পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী কালী ঠাকুরাণী' বা 'শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী মহাকালী।' কথামৃতকার ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এসে শুনেছিলেন "মার নাম ভবতারিণী।" শোনা যায় মায়ের অপূর্ব সুন্দর মূর্তিখানির ভাস্কর হাওড়া জেলার দাঁইহাট নিবাসী নবীন ভাস্কর। কাল কষ্টিপাথরে তৈরি মূর্তিখানির উচ্চতা ৩৩½" ইঞ্চি। এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য শ্রীরামকৃষ্ণসূত্রে প্রাপ্ত এবং স্বামী সারদানন্দ-পরিবেশিত একটি তথ্য। তিনি লিখেছেন: "দেবীমূর্তি নির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রানী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপপূজাদি করিতেছিলেন। মন্দির ও দেবীমূর্তি নির্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভ দিবসের নির্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্তিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।"

বিষ্ণুমন্দিরে শ্বেতমর্মরে ঢাকা মন্দিরতলের উপর কালপাথরের দ্বিস্তবক বেদী, তার উপর রুপোর সিংহাসনে সংস্থাপিত কাল কষ্টিপাথরের ত্রিভঙ্গ ৺রাধাকান্ত এবং তাঁর বামে অষ্টধাতু-নির্মিত ৺নিস্তারিণী দেবী। কথামৃতকারের ভাষায়, "রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ"। আর রানী রাসমণির অর্পণনামায় বিষ্ণুমন্দিরের দেবতার নাম 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী'। সেই দলিলের অপর একস্থানে রয়েছে 'শ্রীশ্রীজগ-মোহন কৃষ্ণ' ও 'শ্রীশ্রীজগন্মোহিনী রাধা।' মন্দির-প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পরে ১২৬২ সনের ভাদ্রমাসে নন্দোৎসবের দিন ( ২২শে শ্রাবণ ) পূজক ক্ষেত্র-নাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনবধানতায় ৺গোবিন্দজীর মূর্তির একটি পা ভেঙ্গে যায়। পণ্ডিতগণের বিধান, ভগ্নমূর্তি গঙ্গায় নিক্ষেপ করে নতুন মূর্তি স্থাপন করতে হবে। যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের বিধান: রানীর জামাইদের মধ্যে কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলত তবে কি তাকে ফেলে দিয়ে আর

২২ রাসমণির পত্র বলরাম দাস ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। তিনি সেবায়েত নিযুক্ত হয়ে বলি-প্রথা তুলে দেন এবং বলিস্থানে তুলসীবৃক্ষ রোপণ করেন। এখনও তাঁর বংশধরগণের যখন সেবার পালা পড়ে সে-সময়ে বলিদান স্থগিত থাকে।

একজনকে তার জায়গায় বসান হত? না, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত? এখানেও সেরকম করা হোক। মথুরমোহনের অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহের ভগ্নাংশ নিখুঁতভাবে জুড়ে দেন। সেই বিগ্রহের পূজা হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মবুদ্ধিতে দেবসেবার বিধান প্রথাবদ্ধ পণ্ডিতদের পছন্দ হয় না। একদিন জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন: "মশায়, ওখানকার গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?" শ্রীরামকৃষ্ণের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর: "তোমার কি বুদ্ধি গো? অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কখনও ভাঙ্গা হন?" অবশ্য শেষপর্যন্ত প্রথাবদ্ধতার প্রবল প্রতাপে রাসমণি ও মথুরমোহন লোকান্তরিত হওয়ার পর কোনও এক সময় এই বিগ্রহ পাশের ঘরে স্থানান্তরিত হয় এবং মূল মন্দিরে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩]

কথিত আছে রানী রাসমণির ফুলশয্যার রাতে এক অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী এসে তাঁর হাতে ৺রঘুনাথজীর একটি বিগ্রহ তুলে দিয়ে আদেশ করেছিলেন: প্রেমসে এর সেবা করবি।[২৪] বাড়িতে রঘুনাথজী গৃহদেবতারূপে সংস্থাপিত হন। ৺রঘুনাথজীর নিত্যসেবাপূজা করলেও রানী রাসমণির ছিল মা-কালীর পাদপদ্মে অচলা ভক্তি। শোনা যায় প্রীতিরাম রাঢ় বাঙলার কোনও এক স্থানে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।* রানীর স্বামী রাজচন্দ্রও ছিলেন মা-কালীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী। রানী রাসমণির জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে ব্যবহারের জন্য যে সীলমোহর ব্যবহার করা হত তাতে খোদাই করা ছিল "কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।" এ-সকল বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর অভিমত ছিল যে রানী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "এই কাজটি (কালীমন্দির স্থাপন) করবার জন্যই রানী দেহধারণ করে এসেছিলেন।"[২৫]

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কালীমন্দিরের অম্লান চূড়া মাথা উঁচু করে শোভা পাচ্ছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণের ঘর-বাড়ি সবই শেষ হওয়ার মুখে, সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই রানী রাসমণি শ্রীমন্দিরে শুভ উদ্বোধনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য স্থির করেন পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণীমার দিন, ১২ বৈশাখ, ১২৬০ (২৩ এপ্রিল ১৮৫৩)। পত্র-পত্রিকায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দুরতিক্রমণীয় বাধা এসে উপস্থিত হয়, বাধ্য হয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠা স্থগিত রাখতে হয় কয়েক বছরের জন্য।

প্রায় একশ চৌত্রিশ বছরের ব্যবধানে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা স্থগিত হওয়ার সবকিছু কারণ সুনিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা দুঃসাধ্য হলেও নিম্নলিখিত উপাদানগুলি যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

স্বাভাবিক কারণেই রানী রাসমণির তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব-

২৩ একমতে শ্রীরামকৃষ্ণের মেরামত করা বিগ্রহের পূজা কখনও করা হয়নি।

২৪ আশাপূর্ণা দেবী: রানী রাসমণি, ১৩৭৪, পৃ: ৩৪ ও ৪৪। প্রয়াত রাজচন্দ্রের শ্রাদ্ধবাসরে এই সন্ন্যাসী রানীকে আরেকবার দর্শন দিয়েছিলেন।

* অপর একমতে ১৯০০ খ্রীঃ বিগ্রহের ভাঙ্গা পায়ের জোড়া কতকটা খুলে যাওয়ায় নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজা হতে থাকে। (সুবোধচন্দ্র দে: শ্রীরামকৃষ্ণ, ২য় সং, পৃ:, ৫২)

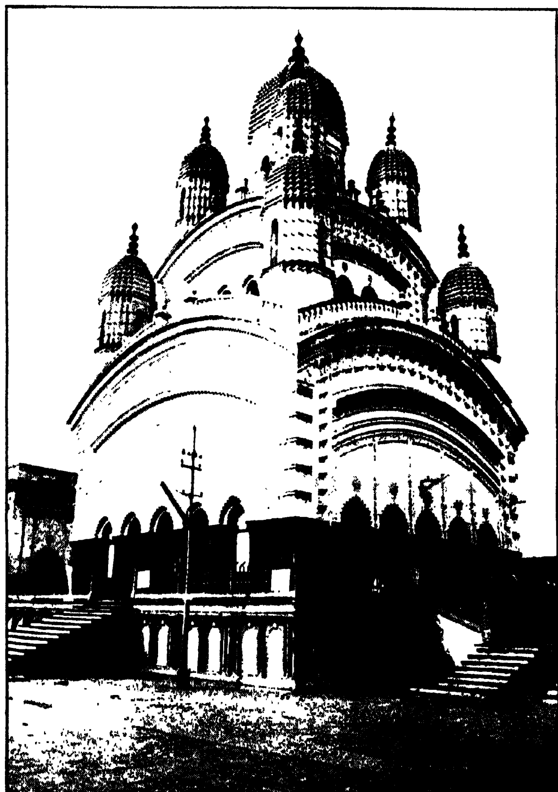
২৫ উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৪৫২

দেবীকে অন্নভোগ দিবেন। কিন্তু কৈবর্ত[২৬] রমণী প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে অন্নভোগ দেওয়ার সমর্থনে কোন শাস্ত্রীয় বিধান পাওয়া যাচ্ছিল না। শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ পুঁথিপাত্ড়া দেখে টিকি নেড়ে যে-সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার দিলেন তা সকলই রানীর অভিপ্রায়ের বিরোধী। শেষকালে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী থেকে ব্যবস্থাপত্র পেয়ে রানীর মনে আশার দীপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে-ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন: "প্রতিষ্ঠার পূর্বে রানী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী-প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না। ঐরূপ ব্যবস্থা পাইয়া…তিনি (রানী) নিজ গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীর পদবী গ্রহণ করিয়া থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন।" এ-প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় দুটি: (ক) শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম নির্ভরযোগ্য জীবনীকার শশিভূষণ ঘোষের মতে ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীর বিধানপত্রের মধ্যে অভিনবত্ব কিছু ছিল না। তিনি লিখেছেন: "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আপ্তবৎ-সেবা মত অবলম্বন করিয়া শূদ্র প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অন্নভোগ দিতে কোনরূপ আপত্তি করেন না এবং স্মার্ত অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গ হইলে শূদ্র দেবালয়ে অন্নভোগের ব্যবস্থা বহুকাল হইতেই দিয়া আসিতেছেন। সুতরাং রামকুমারের পূর্বে এরূপ ব্যবস্থা অপর কেহ প্রদান করেন নাই একথা প্রকৃত নহে, এবং রানী যে অন্য কোন প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী হইতে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কেবল রামকুমারের ব্যবস্থাবলে এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না।"[২৭] (খ) মন্দির সংক্রান্ত দলিলপত্রে দেখা যায় মন্দির-প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরে রানী দিনাজপুরের এক বিরাট জমিদারীসহ দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে রেজেষ্ট্রি করে দিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রানী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সম্পত্তি গুরুবংশীয়দের কাউকে দান করেননি। প্রকৃতপক্ষে মন্দির দেবতার নামেই উৎসর্গ হয়। মন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প যজমানের নামে না হয়ে যজমানের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর গুরুর নামে করা হয়েছিল। এই বিধি অনুসরণ করেই রানীর আকাঙ্ক্ষিত অন্নভোগের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়েছিল।

রানীর দ্বিতীয় সমস্যা, তিনি শূদ্ররমণী, তাঁর সংস্থাপিত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য কে করবে, কে-ই বা নিষ্ঠাপূর্বক ৺মা-কালী ও ৺গোবিন্দজীর নিত্যপূজার দায়িত্ব গ্রহণ করবে? সমস্যার গভীরতা বর্ণনা করে লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন: "শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে থাকুক, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ ঐকালে প্রণাম পর্যন্ত করিয়া ঐসকল মূর্তির মর্যাদা রক্ষা করিতেন না এবং রানীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় ব্রাহ্মণ বন্ধুদিগকে তাহারা শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই দেবালয়ে পূজকপদে ব্রতী হইতে সহসা স্বীকৃত হইলেন না।" একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে প্রাথমিক বাধা এসেছিল স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছ থেকে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রানী বেতন ও পারিতোষিকের হার বাড়িয়ে

২৬ লীলাপ্রসঙ্গকার কৈবর্ত বলে উল্লেখ করলেও স্বামী গম্ভীরানন্দ, রাধারমণ মিত্র প্রমুখ অনেকেই রানী রাসমণির বংশ 'মাহিষ্য' বলে উল্লেখ করেছেন।

২৭ শশিভূষণ ঘোষ: শ্রীরামকৃষ্ণদেব, ১৩৩২, পৃ: ৮৭।



দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির



দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির : নাটমন্দির ও পেছনে বিষ্ণু মন্দিরের একাংশ সহ



দক্ষিণেশ্বরে যজ্ঞেশ্বর শিবের মন্দির



দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর

দিয়ে উপযুক্ত পূজকের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করেন। বাঁকুড়ার শিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রানীর সরকারে চাকুরি করতেন। দু'পয়সা রোজগারের আশায় তিনি দেবালয়ের জন্য পূজক, পাচক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ কর্মচারী জোগাড় করে দেবার জন্য উদ্যোগী হলেন। ৺গোবিন্দজীর পূজকের পদে মনোনীত করলেন নিজের ভাই ক্ষেত্রনাথকে। পাচক ব্রাহ্মণাদি কর্মচারীও নির্বাচিত হল। অবশেষে রানীর একটি বিশেষ অনুরোধপত্র নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন রামকুমারের নিকট। রামকুমার নিজের ব্যবস্থার মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য অন্য কোন সুযোগ্য পূজক না পাওয়া পর্যন্ত কালীমন্দিরের পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। এই তথ্য হৃদয়রাম-সূত্রে প্রাপ্ত। অপরপক্ষে রামলাল-সূত্রে জানা যায় যে পূর্ব-পরিচিত দেশভায় রামধন ঘোষের মাধ্যমে রামকুমার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন বিদায় গ্রহণের জন্য। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনেই তিনি কালীবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দের সিদ্ধান্ত, মহেশ চট্টোপাধ্যায় ও রামধন ঘোষ উভয়ের অনুরোধে দক্ষিণেশ্বর এসেছিলেন এবং পূজকের পদ অঙ্গীকার করেছিলেন।[২৮]

আলোচিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় 'তত্ত্বমঞ্জরী' শ্রাবণ, ১৩১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে। লেখকের মতে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গোস্বামীবংশসম্ভূত রানীর কুলগুরুই ৺ভবতারিণীর ও ৺রাধাকান্তের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উপরন্তু তিনি নিজে দ্বাদশটি শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দ্বাদশ শিবের সেবাপূজার ভার রানীর কুলপুরোহিত বরাহনগর নিবাসী পঞ্চানন ভট্টাচার্য প্রভৃতির উপর অর্পিত হয়।[২৯] প্রতিষ্ঠার দিন মন্দিরের ভাণ্ডার থেকে সিধে নিয়ে রামকুমার ও রামকৃষ্ণ ভাটার সময় গঙ্গাগর্ভে রান্না করে আহার করেন এবং উৎসবের শেষে ফিরে যান ঝামাপুকুরে। দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন মন্দিরে নিত্যপূজা-সেবা চলতে থাকলেও উপযুক্ত যোগ্য ব্রাহ্মণ মা-কালীর পূজার দায়িত্ব গ্রহণ না করাতে রানী নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। রামধনের অনুনয় বিনয় ও অনুরোধের চাপে রামকুমার মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে মা-কালীর পূজায় ব্রতী হয়েছিলেন।

রামকুমার চতুষ্পাঠী থেকে সংসার-নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে ব্যর্থ হলেও রানীর দেবালয়ে দেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করতে দ্বিধা করছিলেন মুখ্যতঃ সামাজিক গোঁড়ামি ও অশূদ্রযাজী বংশের আভিজাত্যের জন্য। তিনি শেষ পর্যন্ত এই পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার কারণ স্বধর্মনিষ্ঠ দেবীভক্ত রামকুমার খুব সম্ভবতঃ জগন্মাতার তদনুরূপ ইচ্ছা জানতে পেরেছিলেন। এরূপ সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছেন স্বামী সারদানন্দ ও শশিভূষণ ঘোষ।

অবশ্য, এ-সকল বিষয়ের চাইতে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল রানী রাসমণির কিছু পারিবারিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে। তীক্ষ্ণধী রানী কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে তাঁর জামাই রামচন্দ্র দাস ও মেয়ে পদ্মমণি দাসীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলার কাগজপত্র থেকে জানা যায় রামচন্দ্র রানীর জমিদারীর স্টুয়ার্ড ও ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছিলেন

২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৯ এখানে লেখকের মন্তব্য ঃ 'অদ্যাপি তৎকালীনের রামচন্দ্র ভট্টাচার্য জীবিত আছেন এবং পূর্ববৎ সেবাকার্য সম্পন্ন করিতেছেন।' রানীর অর্পণনামায় ব্যবস্থা রয়েছে যে কালী ও বিষ্ণুমন্দিরে পূজা করবেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ। আর দ্বাদশ শিবের পূজা করবেন তখন যারা পূজা করেছিলেন তাদের শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ।

৮ মার্চ ১৮৪৫ থেকে ১০ জুন ১৮৪৯ পর্যন্ত। মাঝে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়েছিলেন দুবার—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬ ফেব্রুআরি থেকে ৩১ মার্চ এবং ১৪ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর। অন্যান্য কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ ছাড়াও রানীর একটি অভিযোগ, দক্ষিণেশ্বর মন্দির-নির্মাণের তদারকির কাজে রামচন্দ্রের অবহেলা ইত্যাদির জন্য রানীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যাহোক শেষ পর্যন্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স পীল (Sir Lawrence Peel)-এর কোর্টে ১৪ জানুআরি ১৮৫৫ তারিখে এই মামলা নিষ্পত্তি হয়। সকল বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায়, মোকদ্দমা খারিজ হয়।[৩০]

এছাড়াও রানী রাসমণি তাঁর বিশ্বস্ত ও কর্ম-দক্ষ জামাই মথুরমোহন[৩১] বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও সম্পত্তির বেহিসাব ও আত্মসাৎ করার অভিযোগে প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স পীলের কোর্টে মামলা রুজু করেছিলেন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ১৬ জানুআরি ১৮৫২ তারিখে রানী একটি ডিক্রি পান। অবশ্য বছর দুয়েকের মধ্যে তিনি এই অর্থের অধিকাংশই উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তখন তাঁর আবেদনক্রমে মাননীয় প্রধান বিচারপতি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে মিটমাট করে দেন।[৩০]

অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে রানী রাসমণি বাধ্য হয়েই তাঁর নিকট-আত্মীয়দের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং এ-সকল অপ্রীতিকর মামলা শীঘ্র নিষ্পত্তির জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন। যাহোক উপরোক্ত চারটি প্রধান সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতেই রানী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নির্মাণকার্যের অধ্যক্ষতা করেছিলেন রানীর বড় জামাই রামচন্দ্র দাস এবং তার অব্যবহিত পরেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল মথুরমোহন বিশ্বাসের উপর। তাঁরই সুনিপুণ অধ্যক্ষতায় মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হয় এবং প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়।

মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ প্রায় হয়ে পড়ে থাকায় রানী স্বাভাবিকভাবেই মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময়ে একটি অলৌকিক ঘটনা রানীকে আরও অস্থির করে তুলেছিল। যে-কোন কারণেই হোক একদিন দেখা গেল বাক্সবন্দী কালীমূর্তি ঘেমে উঠেছে। এদিকে রানীও স্বপ্নে ৺মায়ের প্রত্যাদেশ পান, "আমায় আর কতদিন এভাবে আবদ্ধ করে রাখবি? আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে। যত শীঘ্র পারিস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কর।" প্রত্যাদেশ লাভ করেই রানী পণ্ডিতদের পরামর্শক্রমে নিকটতম প্রশস্ত দিন স্নানযাত্রার পূর্ণিমায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত করবার সঙ্কল্প করেন।

মন্দির-প্রতিষ্ঠার শুভ তিথি নির্বাচনের জন্য শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে:

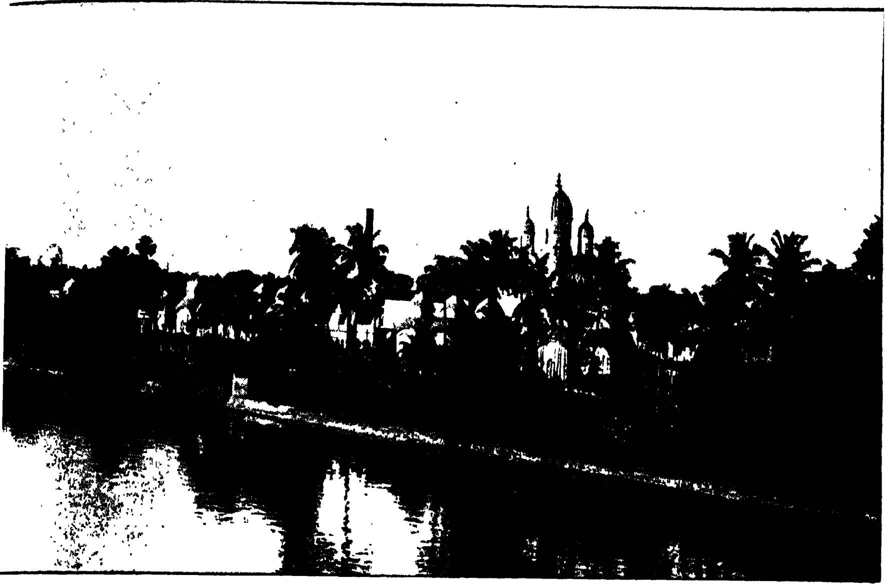
চৈত্রে বা ফাল্গুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথা।
মাঘে বা সর্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ॥
প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে দক্ষিণায়নে।
পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা॥
দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী।
আসু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃতা বহুফলা লভেৎ॥[৩২]

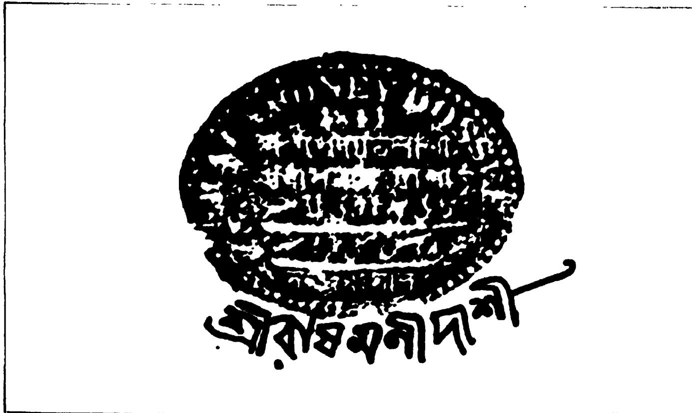
এই বিধান-অনুসারেই দুবছর পূর্বে মন্দির-

৩০ ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়ের সৌজন্যোপ্রাপ্ত তথ্য।

৩১ মামলার কাগজপত্র থেকে জানা যায় মথুরের প্রকৃত নাম মথুরমোহন, মথুরানাথ বা মথুরা-মোহন নয়।

৩২ মৎস্যপুরাণ, ২৬৪ অধ্যায়, ৩-৫ শ্লোক, পৃঃ ৯৯০।


দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী : বিবেকানন্দ ব্রীজ থেকে ফটো : পার্থসারথি নিয়োগী



দলিলপত্রে ব্যবহৃত রানী রাসমণির সীলমোহর

In the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal—
In Equity.

Sree Mutty Ranimoney Dossee
—— vs ——
Ramchunder Doss and Puddomoney Dossee ——

To the Honorable Sir James William Colvile Knight Chief Justice and his Companions Justices of the said Court.

The humble Petition of the Plaintiff abovenamed.

Sheweth

That on the fourteenth day of March one thousand eight hundred and fifty five a Writ of Ne Exeat Regno was issued against the Defendant Ramchunder Doss in this cause which said Writ is still in the hands of the Sheriff unexecuted as appears by the Certificate hereunto annexed.

That your Petitioner and the Defendants above named have Compromised and settled all matters in difference in the above cause amicably and on the thirteenth day of January instant the Bill of Complaint in this cause was dismissed under an order of this Honorable Court as appears by the Certificate hereunto annexed.

That your Petitioner is desirous that the said Writ of Ne Exeat Regno be returned and quashed.

Your.

রামচন্দ্র দাস ও পদ্মমণির বিরুদ্ধে রানী রাসমণি যে মামলা করেছিলেন তার একটি দলিল

# In the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal

## In Equity

Sreematty Rausmoney Dossee Complainant

— vs —

Mothoormohun Biswas — Defendant

Mohendronauth Singhee of Jaunfooker in the Town of Calcutta a writer in the service of Mr. John Newmarch attorney for the Complainant in the above suit Maketh Oath and Saith that he this Deponent did on the Fifth day of January instant serve Messieurs Denman and Abbott attornies for the Defendant in the above suit with the Original Order hereunto annexed and marked with the letter A by delivering to and leaving with one John Baptist a writer in the service of the said Messieurs Denman and Abbott at their Office in the said Town of Calcutta a true Copy thereof and at the same time shewing to him the said Order under the Seal of this Honorable Court.—

Sworn this 7th day of January 1832 Before me

W. W. Smith

Commissioner

Mohendronauth Singhee

মথুরমোহন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রানী রাসমণি যে মামলা করেছিলেন তার একটি দলিল

In the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal.

In Equity.

Sreemutty Rausmoney Dossee. Plaintiff

v.

Ramchunder Doss and Puddomoney Dossee Defendants

The joint and several Answer of the abovenamed Defendants to the Bill of Complaint of the abovenamed Plaintiff. –

In answer to the said Bill we jointly and severally say as follows. –

First. We admit respectively that Rajchunder Doss in the Plaintiffs Bill mentioned was an Opulent Hindoo and that he died not on the Eighteenth as in the Plaintiffs Interrogatories erroneously stated but on the eighth day of June in the Christian year one thousand eight hundred and thirty six as in the Plaintiffs Bill mentioned and that he died intestate and without male issue and leaving the Plaintiff him surviving as in the said Bill stated. –

Second. We admit that the said Rajchunder Doss had four Daughters but we say that one of such Daughters named Sreemutty Coroonamoye Dossee died in his life time and that he left him surviving only three Daughters and we further admit that I the Defendant Puddomoney Dossee am one and the eldest of the said four Daughters and that I did marry and am the wife of the ^me^ Ramchunder Doss. –

Third. We admit that the Plaintiff was and is a Hindoo woman and prevented by Hindoo Law and usage from appearing in Public but we say that she ^can read and write the Bengalee language and character and^ is experienced in business and conducts her own affairs as hereinafter particulary mentioned and we admit that she has from time to time since her said husbands decease employed her sons in law respectively as hereinafter

particulary

পদ্মমণি ও তার স্বামী তাদের হলফনামায় জানায় যে, রানী রাসমণি বাংলা পড়তে ও লিখতে পারতেন এবং বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনায় তিনি ছিলেন দক্ষ

প্রতিষ্ঠার জন্য বৈশাখী পূর্ণিমা স্থির করা হয়েছিল। এ-বছর স্নানযাত্রার দিন বৃহস্পতিবার ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ (৩১ মে ১৮৫৫) নির্বাচন করা হয়। বলা বাহুল্য উপরোক্ত সাধারণ বিধি ছাড়াও ঐ দিনটিতে গ্রহনক্ষত্রের শুভ সমাবেশের জন্য ঐ বছরের ঐ দিনটি বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল প্রস্তুতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে আনন্দের হাট বসে যায়। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনেই রামকুমার তাঁর ছোট ভাই রামকৃষ্ণকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। যদি রামকুমার স্বহস্তে মন্দির-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান করে থাকেন তাহলে তিনি এই দিনটিতে অধিবাস-পূজা ইত্যাদিতে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণ কথা ইত্যাদি নানাবিষয়ে কালীবাড়িতে যেন আনন্দের প্রবাহ ছুটেছিল। রাত্রিবেলায় অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়-প্রাঙ্গণ অপরূপ শোভা ধারণ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "ঐ সময় দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রানী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনিয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।" সুদূর কনৌজ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান থেকে বহু শাস্ত্রীয় অধ্যাপক পণ্ডিত অতিথি হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রত্যেকে পেয়েছিলেন রেশমী কাপড়, উড়ানি ও একটি করে সোনার মোহর। অবশ্য, বহু দূর-দূরান্তর থেকে এসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিদায় গ্রহণ করলেও শূদ্রাণী রানীর দান স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেননি।[৩৩]

বহু প্রত্যাশিত মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত হয়। আকাশে হালকা মেঘের আস্তরণ চন্দ্রাতপের মতো উৎসব-অঙ্গনকে প্রখর সূর্যকিরণ থেকে রক্ষা করছিল। পাশে কুলকুলনাদিনী পতিতপাবনী গঙ্গা। চারদিকে উৎসবের আনন্দময় পরিবেশ। আজ আনন্দময়ী আবির্ভূত হচ্ছেন, সেজন্য আনন্দযজ্ঞের বিপুল আয়োজন। কীর্তন-সঙ্গীত, কবি-তরজা, পূজা-পাঠ ইত্যাদিতে চারদিক মুখরিত। নাটমন্দিরে একশ আটজন ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করতে থাকেন।[৩৪] দানশীলা রানীর ব্যবস্থাপনায় 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে "দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ" হয়ে উঠেছিল।

আনন্দের হাটবাজারে যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরে ফিরে বেড়ান, দেখেন, শোনেন। তদানীন্তন তাঁর মানসপটের একটি চিত্র এঁকেছেন জীবনীকার শশিভূষণ ঘোষ। "গদাধর মন্দিরের পূজাদি সকল কার্যেই দর্শকভাবে উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। এ-সময় তাঁহার মনে একদিকে বিষয় বিরাগ, অপরদিকে তীব্র ঈশ্বরানুরাগ, সর্বোপরি তাঁহার অন্তর্যামিনীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ,—তাঁহার ইঙ্গিত ভিন্ন কোন দিকেই কোন স্থিরতর উদ্দেশ্যে তাঁহার মন পরিচালিত হইতেছিল না।"[৩৫] এরূপ মানসিক অবস্থা নিয়ে যুবক রামকৃষ্ণ ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করলেন। যুবকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন:

এসময় বহুকষ্টে প্রভু গদাধর।
জনতা ঠেলিয়া যান মন্দির ভিতর॥

৩৩ ইতিবৃত্ত—আড়িয়াদহ ও দক্ষিণেশ্বর, ১৯৭১, পৃঃ ১০৫।
৩৪ তত্ত্বমঞ্জরী, ১৩বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৭৬।
৩৫ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৯২।

প্রতিমা প্রতিমা বলি জ্ঞান নাহি হয়।
দেখিলা যেমন শ্যামা আপুনি উদয়॥
কৈলাস করিয়া শূন্য বিরাজ মন্দিরে।
অপরূপ রূপে গোটা পুরী আলো করে॥[৩৬]

প্রতিষ্ঠার চারদিন পরে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ সংখ্যায় প্রতিষ্ঠা-উৎসবের বিবরণ লিখে: "জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে দক্ষিণেশ্বরে বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেব-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঐ দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, এই পুণ্যকর্ম উপলক্ষে রানী রাসমণি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, প্রত্যেক শিবস্থাপনে রজতময় ষোড়শ ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য পট্টবস্ত্র নগদ টাকা দিয়াছেন; তারামূর্তি স্থাপনোপলক্ষে যে যে অনুষ্ঠানের আবশ্যক তত্তাবৎ বাহুল্যরূপে আয়োজন হইয়াছিল, আহারাদির কথা কি বলিব, কলিকাতার বাজার দূরে থাকুক, পানিহাটি, বৈদ্যবাটী, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও সন্দেশাদি মিষ্টান্নের বাজার আগুন হইয়া উঠে, এমন জনরব যে ৫০০ মণ সন্দেশ হয়, নবরত্নের সম্মুখস্থ নাটমন্দির অতি রমণীয়রূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতিতে খচিত হয়, বরাহনগর অবধি নাটমন্দির পর্যন্ত রাস্তার উভয়-পার্শ্বে বাদ্য রোশনাই হয়, কোনরূপ অনুষ্ঠানের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হয় নাই, পুণ্যবতীর পুণ্য-কার্য সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে নির্বাহ হইয়াছে, গঙ্গার উপর পিনিস, বজরা, বোট, ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান কত গিয়াছিল, রাজপথে গাড়ীই বা কত একত্রিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না, কাঙালী লোক অনেক গিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া কেহ টাকা কেহ অর্দ্ধমুদ্রা কেহ কেহ বা সিকি দক্ষিণা বিদায় হইয়াছে, গোস্বামী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, রানী রাসমণি তাঁহাদিগের সকলের যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর টাকা দিয়াছেন, এই পুণ্যকার্যে রানী রাসমণির প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক, অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ-প্রকার বৃহৎ নবরত্ন ও নাটমন্দির কেহই করেন নাই, জগদীশ্বর পুণ্যবতী রানী রাসমণিকে যে-প্রকার অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, সেইপ্রকার মহৎ অন্তঃকরণও দিয়াছেন, তিনি স্বীয় অতুলধনের সার্থকতা করিলেন, এই অবনীমণ্ডলে তাঁহার চিরকীর্তি সংস্থাপিত রহিল।"[৩৭]

সংস্থাপিত মন্দিরে সকলের পূজাসেবার স্থায়ী ব্যবস্থা করবার জন্য রানী রাসমণি দিনাজপুর জেলার শালবাড়ি পরগণায় তিনখণ্ড জমিদারী ত্রৈলোক্য মোহন ঠাকুরের নিকট থেকে ২,২৬,০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন ২৯ অগস্ট ১৮৫৫ অর্থাৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যে। তদানীন্তন কালে এই জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল মোট টাকা ২২,৯১৫।৶৭২ পাই। এই জমিদারী সমেত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও তৎসংলগ্ন জমি রানী রাসমণি দেবোত্তর করেদিয়েছিলেন সোমবার, ১৮ ফেব্রুআরি, ১৮৬১ (৮ই ফাল্গুন, ১২৬৭)। রানী রাসমণি কোর্টের মামলা-মোকদ্দমা মিটিয়ে ফেললেও তাঁর বড় মেয়ে পদ্মমণির মন জয় করতে পারেননি। খুবই সম্ভবতঃ পদ্মমণির আপত্তির ফলেই রানী দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি দানপত্র করে দেবোত্তরে পরিণত করতে এত বিলম্ব করেছিলেন। সকল প্রকারের চেষ্টা ব্যর্থ হলে রানী রাসমণি তাঁর দেহত্যাগের পূর্বদিন,

৩৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ৯ম সং, পৃঃ ৪৪।
৩৭ বিনয় ঘোষ সম্পাদিত: সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৭৫-৭৬।

১৮ ফেব্রুআরি ১৮৬১, ঐ দানপত্রে সই করেন কলকাতার নাম করা সলিসিটর J. F. Watkins এর সম্মুখে। তাঁর দুই মেয়ের মধ্যে ছোট জগদম্বা অঙ্গীকারপত্রে সই করলেন, বড় মেয়ে পদ্মমণি সই করলেন না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রানী রাসমণির শেষ উচ্চারিত কথা: "মা, এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে, মা?" এই দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে রানীর উত্তরাধিকারীগণের পরস্পরের মধ্যে, ট্রাষ্টি ও পূজারীগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমা একের পর এক চলেছে, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্না বুদ্ধিমতী রানী দেবসেবার যে সুব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তা অনুসরণ করেই বিগত ১৩২ বছর ধরে দক্ষিণেশ্বরের বিভিন্ন মন্দিরে পূজা ও ভোগরাগাদি সুসম্পন্ন হয়ে চলেছে।

আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠার পরেই সেই পরিমণ্ডলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঘটনা-পরম্পরার দিকে লক্ষ্য করলে মনে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধনার আসন-পাতার জন্যই যেন দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সকল ঘটনাই ৺জগন্মাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। তাঁর যখন যে বস্তু, ব্যক্তি বা পরিবেশের প্রয়োজন ঘটেছে তাই তাঁর নিকট সমুপস্থিত হয়েছে। তাঁর দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমনও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ৺জগন্মাতা-নির্দিষ্ট নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল।

সরলপ্রাণ দৃঢ়চেতা শ্রীরামকৃষ্ণ দাদা রামকুমারের কৈবর্তের দেবালয়ে বৃত্তি গ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। শেষে ধর্মপত্রানুষ্ঠানের দ্বারা রামকুমারের সিদ্ধান্ত ধর্মসম্মত জেনে তিনি কিছুটা শান্ত হন। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে মন্দির-প্রতিষ্ঠার এক সপ্তাহ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে এসে বাস করতে থাকেন। এখানে আসা অবধি নিজহাতে গঙ্গাগর্ভে রান্না করে অন্ন গ্রহণ করতে থাকেন। সুউচ্চ নবরত্নের উপর নীলাকাশের চন্দ্রাতপ, পঞ্চবটী ঘিরে সবুজের মেলা, পাশে প্রবাহিত কুলকুলনাদিনী গঙ্গা—দিবাকরের আলোতে তার সোনালী কান্তি, নিশাকরের আলোতে রুপোলী কান্তি শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পীমনকে আকর্ষণ করে। তাঁকে আকর্ষণ করে পাখির কাকলি, ফুলের সৌন্দর্য ও সুবাস। ভাবুক শ্রীরামকৃষ্ণ রূপের রহস্যের অন্তরালে দেখতে পান অরূপের হাতছানি। দিন গড়িয়ে চলে। ভাগনে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়—তাঁর চাইতে চার বছরের ছোট—দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয় চাকুরির সন্ধানে। দুজনের সম্পর্ক মধুর, কিন্তু ভাগনে মামাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ভাবে থাকেন, কখনও শিবমূর্তি গড়ে শিবপূজা করেন। তাঁর গড়া শিবমূর্তি দেখে মুগ্ধ হন মথুরমোহন, মুগ্ধ হন রানী রাসমণি। তাঁরা অনেক করে বুঝিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে মা-কালীর বেশকারীর পদে নিযুক্ত করেন; হৃদয়রাম তাঁর ও রামকুমারের সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত হয়। লীলা-প্রসঙ্গকারের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই দায়িত্বে বাঁধা পড়েছিলেন দেবালয়-প্রতিষ্ঠার দু'তিন মাস[৩৮] পরেই। অতঃপর নন্দোৎসবের দিন, ৬ অগস্ট ১৮৫৫ তারিখে ৺গোবিন্দজীর মূর্তির পা ভেঙ্গে গেলে বিষ্ণুঘরের পূজারী বরখাস্ত হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তার পদাভিষিক্ত হন। অর্থাৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার ৬ দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণু-মন্দিরের পূজারীর পদে যোগদান করেন।

কিন্তু অনেক জীবনীকারই প্রশ্ন তুলেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর এবং বিষ্ণুমন্দিরের পূজকের পদ গ্রহণ করবার পূর্বে একবার

৩৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১।

কামারপুকুর গিয়েছিলেন না কি? আমাদের মনে হয় গিয়েছিলেন। শশিভূষণ ঘোষ লিখেছেন: "গদাধর মন্দির-প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার কৈবর্তের মন্দিরে পূজারী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা শ্রবণ করেন। পরে কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া গদাধর সিওড় গ্রামে, ভাগিনেয় হৃদয়ের বাটীতে গিয়াছিলেন। সিওড় গ্রামের নিকট গদাধরের ভবিষ্যৎ পত্নী সারদাদেবীর মাতুলালয়। তিনি তাঁহার জননীর সহিত সেই সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সারদাদেবীর তখন তিন বৎসর মাত্র বয়স। একদিন গ্রামের কোন পল্লীতে বিশেষ কীর্তনাদি উপলক্ষে অনেক লোক সমাগম হয়। জননী কন্যাকে লইয়া গান শুনিতে আগমন করেন। গদাধরও হৃদয়ের সঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিলেন। কেহ কৌতুক করিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'এতগুলি পুরুষের মধ্যে কাকে বিয়ে করবে?' বালিকা হাত তুলিয়া গদাধরকে দেখাইয়া দিল। কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না, কিন্তু গদাধর যে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার পর কিছুকাল স্বদেশে অবস্থান করেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।"[৩৯] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিও এই অভিমত সমর্থন করে। এই মতানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভাইকে দেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করতে দেখে হতাশ হয়েছিলেন এবং তার ইতিকর্তব্য স্থির না করতে পেরে দেশে চলে গিয়েছিলেন। তারপর মেজদা রামেশ্বর ও জননী চন্দ্রমণির অনুরোধে তিনি কোনও একসময়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসেছিলেন এবং প্রথমে মা-কালীর বেশকারীর পদে ও ১২৬৩ সনের জন্মাষ্টমীর (জন্মাষ্টমী পড়েছিল ১১ শ্রাবণ, ইং ২৫ জুলাই ১৮৫৬) পরে বিষ্ণুঘরের পূজকের পদে বৃত হয়েছিলেন।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে সিদ্ধান্ত করতেই হয় যে শ্রীরামকৃষ্ণ সানন্দে মন্দিরে চাকুরি গ্রহণ করেননি। বিবিধ অবস্থার চাপে পড়ে তিনি কৈবর্ত-রানী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তিকালে কখন কখন ৺মায়ের প্রসাদী লুচি খেতে গিয়ে তিনি চোখের জল ফেলে ৺জগন্মাতাকে বলেছেন: "মা, আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি?" পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করে তিনি কখনও বা বলেছেন: "কৈবর্তের অন্ন খাইতে হইবে ভাবিয়া মনে তখন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। গরীব কাঙালরাও অনেকে তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে ঐজন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং অবশিষ্ট গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে।"[৪০] অবশ্য পূজকের পদে বৃত হওয়ার পরই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নিবেদিত অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠার পর প্রায় এক বছর একনাগাড়ে ৺মা-কালীর পূজা করে রামকুমার শ্রীরামকৃষ্ণকে ও হৃদয়কে যথাক্রমে ৺মা-কালীর ও ৺রাধা-কান্তজীর পূজার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। তিনি কামাপুকুরে ফিরে গিয়ে সেখানে কিছুদিনের জন্য বসবাসের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফিরবার পূর্বেই তিনি শ্যামনগর-মূলাজোড় নামক স্থানে গিয়ে মারা যান। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণকে অধিকতর অন্তর্মুখ করে তোলে। তাঁর ঈশ্বরানুরাগ প্রবল হয়ে ওঠে। রাগভক্তির আবির্ভাবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই শাস্ত্রীয়াচার উল্লঙ্ঘন করেন; কালীবাড়ির কর্মচারিগণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে তাঁর ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠা মথুরমোহন ও রানীকে মুগ্ধ করে। তাঁর তদানীন্তন অবস্থা

৩৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৯৩-৪

৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯।

র্ণনা করে তিনি পরবর্তিকালে বলেছিলেন: 'মার দেখা পেলুম না বলে তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; লোকে যেমন জোরে গামছা নিঙ্‌ড়ায়, মনে হ'ত হৃদয়টাকে ধরে কে যেন তেমনি নিঙ্‌ড়াচ্ছে।" তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি একদিন আত্মহননের জন্য এগিয়ে যান, সে-সময়ে অকস্মাৎ এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতি-সমুদ্র যেন তাঁকে গ্রাস করে। সেই জ্যোতি-সমুদ্রের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন চৈতন্যঘন ৺জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি। অতঃপর ৺জগন্মাতার নিয়ত দর্শনলাভের আনন্দাতিশয্যে তাঁর পক্ষে আর নিয়মিত পূজা-সেবা করা সম্ভব হয় না। তাঁর খুড়তুতো ভাই রামতারক ওরফে হলধারী পূজকের পদে নিযুক্ত হয়। তিনি মায়ের পূজার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন। সেটা সম্ভবতঃ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ।[৪১] তাঁর পূজকের দায়িত্বে থাকাকালীন ঘটেছিল একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পরবর্তিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন: "একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে। কালীঘরে এলো! পূজার সময় আসতো আর দুই একটা গান গাইতে বলতো। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্‌ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইলো।" রানীই বুঝতে পেরেচি[illegible] শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব। রানীর ক[illegible] শাসনে [illegible]কৃষ্ণকে কিছু কালীবাড়ির কোন কর্মচারী [illegible] বলতে সাহস করেনি [illegible]মা জগদম্বাকে প্রায় ছয় বছর নিষ্ঠার [illegible] সেবা করে রানী রাসমণি [illegible] বিদায় নেন।

মর্ত্যধা[illegible]মকৃষ্ণ একে একে পুরাণ মতে, তন্ত্রমতে, বেদমতে কঠোর সাধন করে প্রত্যেকটিতে অপূর্ব সফলতা অর্জন করেন। দেশজ যাবতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা শেষ করে তিনি বহিরাগত ইসলাম ও খ্রীষ্ট-ধর্ম সাধন করে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তিকালে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছিলেন: "আমার সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান;—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলে আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।" এ-ঘটনা পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে অভূতপূর্ব। বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবির মতে ইতিপূর্বে কেউ কখনও কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা অর্জন করতে পারেননি। এ-সকল কারণেই তো তিনি অবতারবরিষ্ঠরূপে সম্পূজিত। তাছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্থাপন করেছেন 'নব-যুগধর্ম', যা, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "মহা-প্লাবনের ন্যায়···সমগ্র মানবজাতিকে [illegible]প্লাবিত করিয়া মুক্তিমুখে লইয়া যাইবে।"

কালের বেলাভূমিতে স[illegible]ঙ্কিত পদচিহ্নগুলি অনুসরণ করে দেখা [illegible], রাসমণির জীবনসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণের [illegible] বছরের ধর্মবিজ্ঞানের সাধনা [illegible]মিলিত হয়ে সেখানে গড়ে তুলেছে দক্ষিণেশ্বর [illegible]তীর্থ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতি-হাসিক স্মৃতিচিহ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র গভীর উপলব্ধিসকলের সৌরভে সুবাসিত হয়ে রয়েছে সেখানকার পঞ্চবটী, পীরতলা, মন্দির-অঙ্গন, গঙ্গার ঘাট—এক কথায় সেখানকার আকাশ-বাতাস। তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, এখান থেকে উৎসারিত হয়েছে মহান সত্য যা বর্তমানের বেদনা-বিক্ষুব্ধ, আণবিক যুদ্ধাতঙ্কগ্রস্ত পৃথিবীর মানুষের একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। সেই সত্যের কেতন পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচূড়ায়।

৪১ রানী রাসমণির বরাদ্দের তালিকা থেকে জানা যায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রামতারক ৺মা-কালীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ ৺রাধাকান্তের পূজা করতেন। এই বছর দুর্গাপূজার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর যান এবং পরবর্তী বৈশাখে বিয়ে করেন।

[ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও ব্যবহৃত হয়েছে (ক) প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়: শ্রীদক্ষিণেশ্বর (১৩১৯), শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী: রানী রাসমণি, ত্রিপুরারি মুখোপাধ্যায়: দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা ও সনৎকুমার গুপ্ত: দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ (১৩৬৬)—লেখক ]

# আমেরিকার তিনটি তীর্থ

## স্বামী চেতনানন্দ

শাস্ত্র বলেন, "তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি" অর্থাৎ ভক্তেরা ভগবানের জন্য অনশন, জাগরণ, অশ্রু-বিসর্জন ও প্রার্থনার দ্বারা যে স্থানকে পবিত্র করেন—সে স্থানই তীর্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "ওরে যেখানে অনেক লোক অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়।" [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, (১৩৭৯), গুরুভাব-উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১১৮]

ভারত (ভা=জ্যোতি, রত=মগ্ন) পুণ্য-ভূমি, শা[illegible]ময়, তীর্থে ভরা। ইহার তিনদিকে সাগর, অপর দি[illegible] দেবতাত্মা হিমালয়। ইহার চার প্রান্তে শঙ্করাচা[illegible] ৪ মঠ, তাছাড়া ৫১ শক্তিপীঠ। অসংখ্য দেবদে[illegible] অবতার, সিদ্ধ-পুরুষ ভারতের বুক জুড়ে বসে আছে।

আমেরিকায় এরূপ ধরনের তীর্থ [illegible]। তবে এরকম তীর্থ না থাকলেও সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান আছে, যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। ডিসনিল্যাণ্ডের মতো আশ্চর্যজনক প্রদর্শনী দেখলে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ বলে মনে হয়।

সাধারণতঃ তীর্থ বলতে আমরা পবিত্র নদী, পর্বত বা দেবস্থানকে বুঝি। কিন্তু ভাগবতে (১০।৪৮।৩১) আছে: সাধুর অপেক্ষা জলময়ী গঙ্গাদি তীর্থসমূহ বা মৃন্ময় ও শিলাময় দেবতাগণ কখনও উৎকৃষ্ট হতে পারেন না; কারণ, শিলাদিময়ী দেবতা বা তীর্থসমূহ বহুকাল সেবনে জীবকে পবিত্র করে, কিন্তু সাধুগণের সন্দর্শনেই জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ লাভে জীব পবিত্রতা লাভ করে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে একদিনের জন্যও গেছেন সে স্থান তীর্থস্থান।

এ-প্রসঙ্গে কথামৃতের (২।১১।২) একটি চিত্র মনে পড়ে।

"মাস্টার পঞ্চবটীর শাখা হইতে দু একটি পাতা পকেটে রাখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই ডাল প'ড়ে গেছে, দেখছ; এর নীচে বসতাম।

মাস্টার—আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে গেছি—বাড়ীতে রেখে দিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন?

মাস্টার—দেখলে আহ্লাদ হয়। সব চুকে গেলে এই স্থান মহাতীর্থ হবে।"

কথামৃতকার শ্রীম পরবর্তিকালে বহু ভগবৎ-পিপাসু মানুষকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে শ্রীরাম-কৃষ্ণের লীলাভূমিকে (যেখানে তিনি ত্রিশ বছর [illegible]লেন) তাঁর অমর কথা ও কাহিনী দিয়ে জীবন্ত ক[illegible]তেন। যখন শরীরে কুলাত না, তখন কলকাতায় [illegible] মনন করে বলতেন: "শাস্ত্রে তাই পরিক্রমার [illegible] আছে। তীর্থে গেলে অন্ততঃ তিনবার প[illegible] করা উচিত। পরিক্রমার মানে হলো, ঘু[illegible] দেখা। তাহলে ভাল করে মনে থাকবে।" ([illegible] দর্শন ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১৬-১৭)।

আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচজন সন্ন্যাসী শিষ্য (স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী

সারদানন্দ) বেদান্তের বার্তাবহ হয়ে এসেছেন। তাঁরা যে-সব জায়গায় গেছেন বা থেকেছেন সে-সব জায়গা আমাদের কাছে তীর্থ। গত ষোল বছর আমেরিকায় স্বামীজীর স্মৃতিপূত বহু জায়গা দেখেছি। গত মে মাসে (১৯৮৭) বস্টনে ও প্রভিডেন্সে গিয়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১৫০ তম উৎসব উপলক্ষে। ঐকালে নিউহ্যাম্প-শায়ারের এক ভক্তদম্পতি—আর্চি ও নীনা আমাকে ও সর্বাত্মানন্দকে অ্যানিস্কোয়াম, গ্রীনএকর ও ক্যাম্প পার্সি দেখাতে নিয়ে গেল।

১৪ মে সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে প্রথম আমরা চললুম অ্যানিস্কোয়ামে। আমার সঙ্গে ছিল একটি ক্যামেরা। অ্যানিস্কোয়াম বস্টন থেকে প্রায় ৪০ মাইল। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে একটি গ্রাম। এখানে সব ধনীদের গ্রীষ্মাবাস আছে। স্বামীজী কিভাবে এ সমুদ্র সৈকতে এলেন তার একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

স্বামীজী ভারত ছাড়েন ৩১ মে ১৮৯৩; ক্যানাডার ভ্যাঙ্কুবরে পৌঁছান ২৫ জুলাই এবং চিকাগোতে ৩০ জুলাই। তারপর চিকাগোতে ১২ দিন হোটেলে থেকে ঘুরে ঘুরে বিশ্বমেলা দেখেন। তিনি খবর নিয়ে জানলেন ধর্মসভা সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হবে এবং পরিচয় পত্র ছাড়া প্রতিনিধিত্ব পাওয়া যাবে না, এবং প্রতিনিধিত্ব গ্রহণের সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হোটেলে দারুন খরচ; পয়সার অনটন। অসহায় স্বামীজী অর্থ চেয়ে 'তার' করলেন মাদ্রাজে। বন্ধুদের পরামর্শে টাকা বাঁচানোর জন্য ছুটলেন বস্টনে, কারণ সেখানে হোটেল খরচ কম।

বস্টনের পথে গাড়িতে মিস ক্যাথারিন স্যানবর্ণের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয়। (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহিলার বাড়ি—ব্রীজি মেডোস ও নারী সংশোধনাগার দেখতে গিছলাম।) এই মহিলার মাধ্যমে স্বামীজীর সঙ্গে হার্ভার্ডের গ্রীক অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের পরিচয় হয়। ইনি তখন অ্যানিস্কোয়ামে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করছিলেন।

অ্যানিস্কোয়ামে স্বামীজী মিল লেনের বোর্ডিং-হাউসে ছিলেন। বাড়িটি দোতলা। চারিদিকে ফুলের বাগান ও অদূরে অ্যানিস্কোয়াম নদী যা কেইপ অ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত। অনেক ছোট ছোট বোট বাঁধা রয়েছে। বর্তমানে এই বাড়ির মালিক অ্যালফ্রেড ডুকা। ইনি বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর। মিঃ ডুকা ও তাঁর স্ত্রী আমাদের সমাদর করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং ঘুরিয়ে দেখালেন। স্বামীজীর আমলের সেই বাড়ি কিন্তু বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এই বাড়ি তৈরি করেন অলিভার লেন। ইনি জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং চীনের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। বাড়ির বৈঠকখানায় বহু প্রাচীন গ্রন্থ, বিভিন্ন সমুদ্রের ম্যাপ দেখলুম।

এই বোর্ডিং-এর খুব কাছেই অধ্যাপক রাইটের কটেজ। মিসেস রাইট তাঁর মাকে যে চিঠি দেন তাতে স্বামীজীর অনেক খুঁটিনাটি সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লেখেন। প্রবন্ধটি পড়লে জানা যায় স্বামীজীর ইতিহাসের জ্ঞান, দূরদর্শিতা, ভবিষ্যৎ বিষয়ে কথন, বাগ্মীতার দ্বারা শ্রোতাদের মুগ্ধ করবার কী দারুণ শক্তি ছিল।

অ্যানিস্কোয়ামের ভিলেজ চার্চ দেখলুম। ইহা ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। চার্চের নিচের তলায় ছোটদের স্কুল। চার্চটি সুন্দর। আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখলুম ও ছবি তুললুম। এই চার্চের বক্তৃতামঞ্চে স্বামীজীর প্রথম পাশ্চাত্য বক্তৃতা হয় ২৭ অগস্ট ১৮৯৩। বিষয় ছিল: Customs and Life in India. Cape Ann Breeze পত্রিকায় ২৯ অগস্ট এর খবর বেরোয়।

স্বামীজী আবার অ্যানিস্কোয়ামে আসেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অগস্ট। তিনি তখন মিশিগানের গভর্ণরের স্ত্রী মিসেস ব্যাগলীর অতিথি। ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ওখানে ছিলেন। তিনি হায়াৎ হাউসে উঠেছিলেন। বাড়িখানি নদীর কিনারায়। ছবি তুললুম। স্বামীজীর ২০ অগস্টের চিঠিতে আছে, "কয়েকদিন বেশ নৌকাভ্রমণ করা গেছে এবং একদিন সন্ধ্যায় নৌকা উল্টিয়ে কাপড় জামা ও সবকিছু ভিজে একশেষ।" (বাণী ও রচনা, ৮।২০) গ্রীষ্মে সমুদ্র-স্নান, নৌকাভ্রমণ আমেরিকানরা খুবই পছন্দ করে। স্বামীজীর একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল—তিনি যখন যেখানে যেতেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারতেন।

৪ সেপ্টেম্বর অ্যানিস্কোয়ামের Mechanics Hall-এ স্বামীজী Life and Religion of India বিষয়ে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক রাইট স্বামীজীকে পরিচয় করিয়ে দেন। এ বক্তৃতার খবর Cape Ann Breeze ও Gloucester Daily Times-এ বেরোয়।

অ্যানিস্কোয়াম থেকে গেলুম গ্রীনএকর। দূরত্ব ৩০ থেকে ৪০ মাইল। গ্রীনএকর পিসক্যাটাকোয়া নদীর তীরে মেইন প্রদেশের অন্তর্গত। চারিদিকে সুন্দর বনানী। খুব নিরিবিলি পরিবেশ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোর ধর্মমহাসভার দেখাদেখি মিস সারা ফার্মার "গ্রীনএকর রিলিজিয়াস কনফারেন্স" শুরু করেন। এঁর পিতা ছিলেন বৈদ্যুতিক আলোকের প্রথম প্রচলনকারী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মোসেস গেরিস ফার্মার। মিস ফার্মার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত গ্রীনএকরের এক বিরাট অংশে গ্রীষ্মকালে ধর্মসভার আয়োজন করতেন। ধর্মজীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের বক্তাদের আহ্বান করতেন।

গ্রীনএকর ইন্ (সরাইখানা) ৪ তলা বাড়ি। অনেক ঘর। বর্তমানে এই সরাই-সম্পত্তি বাহাই সম্প্রদায়ের হাতে। রিচার্ড গ্রোভার গ্রীনএকরের বাহাই স্কুলের অধিকর্তা। তিনি আমাদের সরাই-এর চাবি দিলেন যা'তে আমরা ভিতরে ঢুকে সব দেখতে পারি। এখানে বাহাইদের গ্রীষ্ম-ক্যাম্প হয়। মিসেস ওলি বুলের কটেজ এখন বাহাইদের লাইব্রেরী। স্বামীজী যে পাইনগাছের নিচে বসে ধ্যান করতেন ও বক্তৃতা দিতেন তা নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় লোক ওখানকার পাইনগাছগুলো কেটে কাঠ বিক্রি করে দেয়। এই 'স্বামীজীর পাইন' গাছের নিচে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দও বক্তৃতা দিয়েছেন। মিঃ গ্রোভার স্বামী অভেদানন্দের এক গ্রুপ ছবি দেখালেন। গ্রীনএকরের নদীতীরে যেখানে ক্যাম্প করে লোকে থাকত, সেখানে এখন একটা পার্ক হয়েছে।

আমরা আবার স্বামীজীর কথায় ফিরে যাই। মিস ফার্মারের সঙ্গে স্বামীজীর নিউইয়র্কে দেখা হয় এবং তিনি গ্রীনএকরে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। এখানে তিনি ২৭ জুলাই থেকে ১৩ অগস্ট ১৮৯৪ পর্যন্ত ছিলেন। স্বামীজী এখানে বেশ কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন এবং বৈদিক ধাঁচে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে লোকে বক্তৃতা শুনে ধরে রাখতে পারে না, কিন্তু এরূপ আশ্রমকেন্দ্রিক প্রচার সুদূরপ্রসারী। গ্রীনএকরে 'সানরাইজ ক্যাম্পে' গাছের নিচে স্বামীজী ভারতীয় পদ্ধতিতে ধ্যানজপ শেখাতেন। তিনি হেল ভগিনীদের ৩১ জুলাই লেখেন:

"এক বৎসর হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই রাত্রিটা যে কি আনন্দে কেটেছিল—মাটিতে



গ্রীনএকরে স্বামীজী



অ্যানিস্কোয়ামে মিগ লেনের বোর্ডিং হাউস



ক্যাম্প পার্সির সামনের অংশ    অদ্বৈতাশ্রমের সৌজন্যে

শোওয়া, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—তা তোমাদের কি ব'লব! সরাইয়ে যারা রয়েছে তারা অল্পবিত্তর অবস্থাপন্ন, আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল শুদ্ধ অকপট নরনারী। আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহং' করতে শেখাই, আর তারা তাই আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই কি সরল ও শুদ্ধ এবং অসীম সাহসী! সুতরাং এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই তাঁবুবাসীদের দরিদ্র করেছেন। শৌখীন বাবুরা ও শৌখীন মেয়েরা রয়েছেন হোটেলে; কিন্তু তাঁবুবাসীদের স্নায়ুগুলি যেন লোহা বাঁধানো, মন তিন-পুরু ইস্পাতে তৈরী আর আত্মা অগ্নিময়। কাল যখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল আর ঝড়ে সব উলটে পালটে ফেলছিল, তখন এই নির্ভীক বীর-হৃদয় ব্যক্তিগণ আত্মার অনন্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায়, সেজন্য তাদের তাঁবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুলছিল, তা দেখলে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হ'ত। আমি এদের জুড়ি দেখতে ৫০ ক্রোশ যেতে প্রস্তুত আছি। প্রভু তাদের আশীর্বাদ করুন।" (বাণী ও রচনা, ৬।৪৬৮) সংগ্রামপ্রিয় স্বামীজী মানুষকে সংগ্রাম করতে দেখলে খুশি হতেন। কারণ তিনি জানতেন একমাত্র সংগ্রামের দ্বারাই আত্মশক্তি বিকশিত হয়।

গ্রীনএকর থেকে চললুম ক্যাম্প পার্সি। বস্টন থেকে পার্সির দূরত্ব প্রায় ২৩০ মাইল। ইহা নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রদেশের অন্তর্গত। জনসংখ্যা খুবই কম। অনেক গাছপালা, পাহাড় ও লেক আছে। আর আছে বেশ কিছু কাগজ তৈরির মিল। ক্যাম্প পার্সি ছিল মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটের সম্পত্তি। ইনি খুবই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। নিউ-ইয়র্কে কর্মব্যস্ততার পর এখানে প্রায় জনশূন্য পরিবেশে সময় কাটাতেন ও মাছ ধরতেন। এ সম্পত্তি এখন মিঃ লেগেটের দৌহিত্র ভাই-কাউন্ট ফ্রাঙ্ক মার্গেসনের। ইনি প্রতি গ্রীষ্মে এখানে ৩।৪ মাস কাটান। যাহোক আর্চি মিঃ মার্গেসনকে ফোনে জানিয়েছিল যে আমরা ক্যাম্প দেখতে যাব। তিনি তখনই ক্যাম্পের গার্ডকে নির্দেশ দিয়ে রাখেন ঐদিন কটেজ খুলে রাখতে। আমরা বিকাল ৫টা নাগাদ পৌঁছে দেখি ক্যাম্পের বাইরের গেটে তালাবন্ধ অর্থাৎ গাড়ি আর যাবে না। সেখান থেকে কটেজ প্রায় ২ মাইল হাঁটতে শুরু করলুম। কোন জনমানব নেই সাড়েপাঁচটা নাগাদ পৌঁছলুম। তখনও সূর্য রয়েছে। স্থানটি প্রায় কানাডার সীমানার কাছে। সূর্যাস্ত হয় রাত প্রায় ৯টায়।

কটেজে পৌঁছে দেখি গার্ড দরজা খোলা রেখেছে। আমি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে লাগলুম। দুটি শয়নঘর, বড় বৈঠকখানা, উপরে মই বেয়ে উঠলে আর একটি শয়নঘর (attic; সাধারণতঃ এটিতে বাচ্চারা থাকে)। রান্নাঘর ও ভোজনঘর একসঙ্গে। ফোন, আলো, বাথরুম, পাইপের জল প্রভৃতি সব রকম আধুনিক ব্যবস্থাই রয়েছে। কটেজটির নাম 'হোয়াইট বার্চ লজ'। ইহা একেবারে লেক ক্রিস্টিনের উপরে। লেকের জল স্বচ্ছ। কটেজের খোলা বারান্দায় বসে লেকের মনোরম দৃশ্য ও পর্বতমালা দেখা যায়। লেগেটের কটেজের পাশাপাশি আরও কয়েকটা কটেজ দেখলুম। কটেজগুলির একদিকে লেক তিন দিকে নিবিড় বনানী। লরেল, পাইন ও সাদা বার্চ গাছে ভরা। বনের মধ্যে থেকে কুলকুল করে বহু ঝর্ণা এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে লেকে। এটি প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ এবং ½ মাইল বিস্তৃত।

স্বামীজী ৬ জুন ১৮৯৫ মিঃ লেগেটের সঙ্গে তাঁর এই 'হোয়াইট বার্চ লজে' পৌঁছান।

লজের লগবুকে ( যাত্রীদের দৈনন্দিন ঘটনার খাতা ) তাঁরা সই করেন, "বেটি ম্যাকলিয়ড স্টার্জিস, ফ্রান্সিস লেগেট, জোসেফিন ম্যাকলাউড, জর্জিয়া স্পেন্স ও স্বামী বিবেকানন্দ, ইণ্ডিয়া, হিদেন হিন্দু।" [ New discoveries Vol. 3, P. 104 ] তাঁরা ১২ দিন পার্সিতে ছিলেন। স্বামীজী ৭ জুন মিসেস বুলকে লেখেন :

"আমি জীবনে যে-সকল সুন্দরতম স্থান দেখেছি, এটি তাদের অন্যতম। কল্পনা করুন, চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বনের দ্বারা আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী ও তার মধ্যে একটি হ্রদ—আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ, কি শান্তিপূর্ণ! শহরের কোলাহলের পর, আমি যে এখানে কি আনন্দ পাচ্ছি, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এখানে এসে আমি যেন নবজীবন লাভ করেছি। আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি।"

( বাণী ও রচনা, ৭।১২৪ )

টান্টিনের ( মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ) স্মৃতিকথাতে রয়েছে : "ঐ বছরের ( ১৮৯৫ ) জুন মাসে স্বামীজী ক্রিষ্টিন লেকের ক্যাম্প পার্সিতে যান। ওখানে তিনি মিঃ লেগেটের মাছ ধরবার ক্যাম্পে অতিথি হন। আমরাও গিয়েছিলাম। সেখানে মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে স্থির হল; স্বামীজীকে বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি যে কটা দিন ক্যাম্পে ছিলেন সাদা সুন্দর বার্চ গাছের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতেন। আমাদের কিছু না বলে স্বামীজী বার্চ গাছের ছাল দিয়ে ( ভূর্জপত্রে ) দুখানি সুন্দর বই তৈরি করে তাতে সংস্কৃত ও ইংরেজীতে কিছু লিখে ফেললেন। বই দুখানি দিয়েছিলেন আমাকে আর আমার বোনকে।" [ Reminiscences of Swami Vivekananda. P. 237 ]

পার্সিতে বিস্তর বার্চ গাছ দেখলুম। গাছের গায়ে জড়ানো কাগজের মতো ছাল। স্বামীজী ছিলেন কবি ও ভাবজগতের মানুষ। ঐ ভূর্জপত্র দেখে তাঁর প্রাচীন ভারতের স্মৃতি জেগে উঠল। তিনি মেরী হেলকে ভূর্জপত্রে ১৭ জুন লিখলেন : "ভারতবর্ষে যাবতীয় পবিত্র লিপি এই ভূর্জপত্রে লেখা হয়। আমিও সংস্কৃতে লিখলাম—উমাপতি ( শিব ) সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।" ( বাণী ও রচনা, ৭।১২৪ )

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে ফ্রান্সিস লেগেট ( মিঃ লেগেটের কন্যা। এঁর সঙ্গে আমার ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রিজলীতে দেখা হয়। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মারা যান। ) প্রতি বৎসরের মতো পার্সিতে যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে ম্যাক্স-এর দেখা হয়। ম্যাক্সের বাপের নাম ছিল স্তাম। এরাই পার্সির ক্যাম্প রক্ষণাবেক্ষণ করত। মিসেস ফ্রান্সিস লেগেটের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ ম্যাক্স বলে : "স্বামীজীকে আমার খুব মনে পড়ে। আর মনে পড়ে ঐ সন্ন্যাসীর বেশভূষা ও চালচলন। আমি পূর্বে কখনও সন্ন্যাসী দেখিনি। আমি তখন বালক; তাই আমার কৌতূহল জাগত যে ঐ আলখাল্লার নিচে তিনি কি পরিধান করেন। একদিন দেখলুম তিনি বোটে বসে দাঁড় টানছেন। হঠাৎ তাঁর একটি টান ফসকে যাওয়ায় বোটটি উল্টে যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি পিছনে পড়ে গেলেন এবং বোটের পাশে তাঁর মাথা জোরে ঠুকে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য—তিনি কেবল হাসতে লাগলেন। আমি জানলুম—তিনি বেশ ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন।"

( ফ্রান্সিস লেগেট, লেট অ্যাণ্ড সুন, পৃঃ ২১৬ )

মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট লিখেছেন : "স্বামীজী এখানে বেশ সুখেই ছিলেন। তিনি এই নূতন

প্রিয় ভাইবোনদের সঙ্গে হাসতেন, কথা বলতেন, খেতেন আর বেড়াতেন। অধিকাংশ সময় তিনি একাকী নির্জনে থেকে তৃপ্তিলাভ করতেন।... পাখিদের কাকলীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে স্তবগান করতেন বা কোন সুন্দর বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান করতেন।" (ঐ, পৃঃ ২১৮)

ক্রিষ্টিন লেকের কিনারায় এক গাছের নিচে স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি হয়। প্রত্যক্ষদর্শী টাষ্টিন তা আর্জেন্টিনায় স্বামী বিজয়ানন্দকে বলেন: "একদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পূর্বে স্বামীজী একখানি সংস্কৃত গীতা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। আমি তাঁর পিছনেই ছিলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'জো, আমি (নিকটবর্তী একটি পাইন গাছকে দেখিয়ে) ঐ পাইন গাছের নিচে বসে গীতা পাঠ করতে যাচ্ছি। দেখো ব্রেকফাস্টের আয়োজনটা যেন বেশ ভালভাবেই হয়।' আধ ঘণ্টা পরে আমি পাইন গাছটার কাছে গিয়ে দেখি স্বামীজী সেখানে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। গীতাখানি হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেছে, আর তাঁর আলখাল্লার সামনের দিকটা চোখের জলে ভিজে গেছে।

"আমি আরও কাছে গিয়ে দেখলুম যে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি ভয়ে কেঁপে উঠলুম; ভাবলুম স্বামীজী নিশ্চয়ই মৃত। আমি চীৎকার না করে গিয়ে মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললুম, 'শিগ্‌গির আসুন, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।' আমার বোন সেখানে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল; আর আমার ভাবী ভগিনীপতি এলেন চোখের জল ফেলতে ফেলতে। এ-ভাবে ৭।৮ মিনিট কেটে গেল। স্বামীজী তখনও একই ভাবে ছিলেন। মিঃ লেগেট বললেন, 'ইনি সমাধিস্থ। আমি ঝাঁকুনি দিয়ে এঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনব।' আমি তাঁকে থামিয়ে জোরে বললুম, 'কখনও ওরকম করবেন না।' আমার স্মরণ ছিল স্বামীজী একবার বলেছিলেন যে তিনি যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকবেন তখন যেন কেউ তাঁকে স্পর্শ না করে। আরও ৫ মিনিট কেটে গেল। তারপর আমরা আবার তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস লক্ষ্য করলুম। তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল অর্ধনিমীলিত। ক্রমে তারা উন্মীলিত হল। তারপর স্বামীজী স্বগতভাবে বললেন, 'আমি কে? কোথায় আমি?' তিনি তিনবার ঐরূপ বললেন। তারপর পূর্ণরূপে জাগ্রত হয়ে আমাদের সামনে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাদের ভীত করে তুলে আমি বড় দুঃখিত। এরূপ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আমার প্রায়ই হয়। আমি তোমাদের দেশে শরীর ত্যাগ করব না। বেটি, আমি ক্ষুধার্ত। চল, শীঘ্রই (খাবার ঘরে) যাই।'" [ New Discoveries—Vol. 3, P. 106 ] মতান্তরে বাগানের মালী বা রক্ষক স্বামীজীর অচৈতন্য অবস্থা দেখে সকলকে ডাকে এবং তাঁকে স্পর্শ করে চৈতন্য সম্পাদন করে।

৮ জুলাই ১৮৯৫ স্বামীজী মজা করে অ্যালবার্টাকে লিখলেন: "পার্সিতে নৌকায় বেড়াবার সময় আমি দাঁড় চালানোর দু-একটি বিষয় শিখে নিয়েছি। মাসীমা 'জো জো'-কে তাঁর 'মধুরতা'র জন্য খেসারত দিতে হয়েছে, কারণ মাছি ও মশাগুলি মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না। পরন্তু আমাকে তারা অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল; আমার মনে হয়, এর কারণ মাছিগুলি ছিল গোঁড়া; তাই একজন পৌত্তলিককে তারা স্পর্শ করেনি। আবার আমার মনে হয়, পার্সিতে আমি খুব গান গাইতাম, সেই ভয়েই তারা পালিয়ে গিয়েছে।" (বাণী ও রচনা, ৭।১৩৬)

পার্সির লগবুকে স্বামীজী সই করেছিলেন

মজা করে—'স্বামী বিবেকানন্দ, হিদেন হিন্দু'। হিদেন মানে অখ্রীষ্টান ধর্মহীন অসভ্য ব্যক্তি। পরবর্তিকালে মিসেস ওয়াইকফ (সিস্টার ললিতা) স্বামীজীকে একটি ক্রিশ্চিয়ান সঙ্গীত শেখান: "The heathen in his blindness bows down to wood and stone." অর্থাৎ ধর্মান্ধ হিদেন গাছ ও পাথরে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। স্বামীজী আপন মনে এই গানটি গাইতেন আর হো হো করে হেসে বলতেন, "I am that heathen" অর্থাৎ আমি সেই হিদেন। নিজেকে নিয়ে হিউমার করাই হচ্ছে হিউমারের ক্লাইম্যাক্স। (New Discoveries, 2nd visit, p. 230)

সন্ধ্যা সমাগত। লেক ক্রিষ্টিনের উপর অস্তগামী সূর্য ঝিকিমিকি করছে। অপূর্ব দৃশ্য ও পরিবেশ। ছান্দোগ্যোপনিষদের একটি মন্ত্র (৭।৬।১) মনে পড়ল: "পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন, অন্তরীক্ষ যেন ধ্যাননিরত, দ্যুলোক যেন ধ্যানস্তিমিত, জল যেন ধ্যানস্তব্ধ, পর্বতসমূহ যেন ধ্যাননিমগ্ন, দেবসদৃশ মানবগণ যেন ধ্যানস্তিমিত। সুতরাং ইহলোকে যাঁহারা মানবোচিত মহত্ত্ব লাভ করেন, তাঁহারা যেন ধ্যানফলের অংশভাগী হন।"

মন চাইছিল না ফিরতে, তবুও ফিরতে হবে আর্চি-নীনার বাড়ি নিউহ্যাম্পশায়ারের প্রিমাথে। প্রায় ১০০ মাইল। রাত ৯টা নাগাদ ওদের বাড়িতে খেয়ে আমি ও সর্বাত্মানন্দ বিশ্রাম করলুম। পরদিন ব্রেকফাস্টের পর আর্চি ও নীনা আমাদের বস্টনে পৌঁছে দিল। আমি সন্ধ্যায় সেণ্টলুইসে ফিরলুম।

# সর্বমঙ্গলা

শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায়

মায়ের দানেতে মা'র অর্চনা
ভিন্ন অর্ঘ্য মেলে না আর
ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে তাঁহাকে
পূজন করছি বারংবার।

গঙ্গার জল সে তো পূত-বারি
মায়ের পুণ্য সৃষ্টি যে,
শান্তির জল বিলিয়ে দিতে
করে চলি তারই বৃষ্টি যে।

এ যেন গঙ্গা মকরবাহিনী
গঙ্গা জলেতে তাঁরই পূজা,
ভিন্ন কি আর দিয়ে যে পূজিব
সব নিয়ে এই দশভূজা।

দশবাহু তিনি দশ হাতে যেন
ধরেছেন এই পৃথিবীকে,
সব সম্ভার তাঁরই রচিত
তাই দিয়ে পূজা দশ-দিকে।

সর্বজনের মঙ্গলা তিনি
সর্ব-অর্থ-সাধিকা যে
কখনও তিনি যে প্রহরণধারী
কখনও প্রেমিকা রাধিকা যে।

# স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম: স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছে—একথা ঐতিহাসিকরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কিন্তু যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা এ-বিষয়ে কী বলেন তা জানার আগ্রহ নিয়ে কয়েক বছর আগে আমি কয়েকজন প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামীর সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবে খুবই বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁদের অনেকেই এ-বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ দিয়েছেন সাক্ষাৎকার যার বিবরণ তাঁরা স্বয়ং দেখে অনুমোদন করে দিয়েছেন। অনেকের কাছে আবার আমার জিজ্ঞাসার বিষয় কয়েকটি প্রশ্নের আকারে পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা সেগুলির উত্তর লিখে পাঠিয়েছেন। এখানে আমরা সেই সব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যগুলিকে উপস্থাপিত করব। ভারত-বর্ষের জাতীয় জাগরণের ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে এগুলির মূল্য অসাধারণ। লক্ষ্য করার বিষয়, যাঁদের বক্তব্য আমরা সংগ্রহ করেছি তাঁরা পরবর্তিকালে কেউ অহিংস মতে বিশ্বাসী হয়েছেন, কেউ সশস্ত্র বিপ্লবে আস্থাবান ছিলেন, কেউ বা আবার বিশ্বাসী হয়েছেন মার্ক্সীয় মতবাদে যাঁদের স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে মিল থাকার কথা নয়। কিন্তু যখন আমরা দেখি পরিণত জীবনে তাঁরা সকলেই সগর্বে কুণ্ঠাহীন ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তাঁদের ঋণ স্বীকার করছেন তাঁদের জীবনের এক কেন্দ্রীয় প্রভাব-ব্যক্তিত্ব হিসেবে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জাতীয় চেতনা গঠনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর বিরাট প্রভাবের কথা, তখন ভাবি সেই বীর সন্ন্যাসীর কথা যিনি ভারতবর্ষের জীবনে এনে দিয়েছিলেন অন্য এক মহা জীবনের সন্ধান।

বিখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের বিবরণ ইতিপূর্বে 'উদ্বোধন'-এ উপস্থাপিত করেছি।[১] এখন উপস্থাপিত করব নলিনীকান্ত করের স্বলিখিত বক্তব্য।

## নলিনীকান্ত কর: ব্যক্তি-পরিচিতি

বছর কয়েক আগে লোকান্তরিত নলিনীকান্ত কর ছিলেন একজন প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তাঁর কলকাতার ঠিকানায় যখন তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি তখন তাঁর বয়স প্রায় নব্বই বছর (তাঁর জন্ম ২৪ মার্চ, ১৮৮৯: ১০ চৈত্র, ১২৯৫)। বিপ্লব-জীবনে তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। ছোট-খাট সুগঠিত বলিষ্ঠ শরীর এবং প্রচণ্ড সাহসের জন্যে সতীর্থদের কাছে তিনি 'গুর্খাদা' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়ীবালামের তীরে বাঘা যতীন এবং তাঁর চার বীর সহকর্মী চার্লস টেগার্ট ও তাঁর পুলিশবাহিনীর সঙ্গে যে অবিস্মরণীয় সংগ্রাম করেছিলেন তার কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু জানি না

১ উদ্বোধন: আশ্বিন, ১৩৯২; মাঘ, ১৩৯২; আশ্বিন, ১৩৯৩, মাঘ, ১৩৯৩; ফাল্গুন, ১৩৯৩

যতীন্দ্রনাথের পঞ্চম সহকর্মী নলিনীকান্তের কথা। নেতা যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নলিনীকান্ত ১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দলের অন্যতম নেতা যাদুগোপালের কাছে এসেছিলেন। কলকাতা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর রাতে পুরী প্যাসেঞ্জারে ইণ্টার ক্লাশে পরের দিন অর্থাৎ ১০ সেপ্টেম্বর সকালে বালেশ্বরে এসে পৌছেই তিনি বুড়ীবালাম যুদ্ধের খবর পান এবং শোনেন যে তাঁকে পুলিশ খুঁজছে। ঠিক ছিল তিনি পরের স্টেশন খন্তাপাড়ায় নামবেন এবং সেখান থেকে হেঁটে কপ্তিপোদায় যাবেন। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেখানে না নেমে খন্তা-পাড়ায় একখানা থার্ডক্লাশের টিকিট কেটে ঐ ট্রেনেই সোজা পুরী চলে যান এবং সেখান থেকে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন ১২ সেপ্টেম্বর। কলকাতায় এসে যাদুগোপালের পরামর্শে তাঁরা উভয়ে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে চলে যান। সেখানে একদিন খবরের কাগজে দেখেন যে তাঁদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঘোষিত হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের মাথার মূল্য তখন পাঁচ হাজার টাকা। তাঁরা তখন উভয়েই আত্ম-গোপন করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হলে তাঁরা বেরিয়ে আসেন। যদি ১৯১৫-এর ১ সেপ্টেম্বর বাঘা যতীনের নির্দেশে তিনি কলকাতায় না আসতেন তাহলে বুড়ীবালামের মৃত্যুঞ্জয়ী পঞ্চবীরের সঙ্গে তাঁর নামও সংযোজিত হত। সেজন্যে তাঁর এখনও ক্ষোভের শেষ নেই। তাঁর স্বহস্তলিখিত বর্তমান প্রবন্ধটির মূল পাণ্ডুলিপি নলিনীবাবু আমার কাছে পাঠান ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। সঙ্গে ছিল তাঁর নিচের এই পত্রটি। পাণ্ডুলিপিতে তাঁর স্বাক্ষরের তারিখও ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। অবাক হয়ে দেখলাম নব্বই বছর বয়সেও তাঁর হাতের লেখা কত সুন্দর, পরিষ্কার; চিন্তা কত স্বচ্ছন্দ ও সুবিন্যস্ত!

46-4788
9 South End Park
Calcutta 700 029 India

পরম শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী শঙ্কর মহারাজ,

'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' এই বিষয়ে আমার মতামত আপনি জানতে চেয়েছিলেন। আমি সেই অনুসারে আমার বক্তব্য আমি একটি প্রবন্ধের আকারে লিখে পাঠালাম। এতে স্বামীজীকে আমি যেভাবে দেখেছি তার পরিচয় পাবেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিবাণী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। রামকৃষ্ণদেবের বাণী সাক্ষাৎভাবে ঐভাবে আমাদের অনুপ্রাণিত করেনি। কিন্তু বিবেকা-নন্দের স্রষ্টা, বিবেকানন্দের সমস্ত প্রেরণা ও শক্তির মূল তো ছিলেন তিনিই। স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং ভারতের নব জাগরণের পিছনে স্বামীজীর অবদানের কথা আমরা সবাই বলি। কিন্তু এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণদেবের অবদানের দিকটা আমরা সাধারণতঃ দেখি না। আমি বিশ্বাস করি, এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণদেবের ভূমিকা নেপথ্য হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা ফলটিকেই দেখি; কিন্তু ফলের আবির্ভাবের পশ্চাতে ফুলের সাধনার খবর নিই না। রামকৃষ্ণদেবকে বাদ দিয়ে তাই ভারতের স্বাধীনতা অথবা নব-জাগরণের চিন্তা করা তেমনি ইতিহাসের অজ্ঞতারই পরিচায়ক।[২]

গুণগ্রাহী
শ্রীনলিনীকান্ত কর
২১.৯.৭৮

২ এই প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ:
"...একটা কথা বলি, যেটা সেদিন আমরা বিপ্লবীরা অনেকেই তলিয়ে দেখিনি, দেখার বোধ হয় অবসর

**নলিনীকান্ত করের প্রবন্ধ : স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম**

"বৃটিশের অধীনতাপাশ থেকে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার প্রেরণা পাই সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে। ১৯০৮ সালের শেষ-ভাগ থেকে আমি কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য। তখন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে জ্ঞান মিত্রের বাড়িতে কয়েকজন মিলে অনুশীলন সমিতি থেকে পৃথক একটা ক্লাশ প্রতি রবিবারে বসত। তাতে মেম্বার ছিলেন লাড্‌লি মিত্র, সুধীর রায়চৌধুরী, যতীন শেঠ, জ্ঞান মিত্র, মণি শেঠ, আমি এবং আরও কয়েকজন যাঁদের নাম এখন মনে পড়ছে না। আমি ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন বিদ্বান। সেই ক্লাশে পড়া হত স্বামীজীর 'কর্মযোগ', 'পত্রাবলী' এবং 'ভারতে বিবেকানন্দ', যোগেন্দ্র-নাথ বিদ্যাভূষণের 'গ্যারিবল্ডি' এবং ম্যাটসিনীর জীবন-কাহিনী ও সখারাম গণেশ দেওস্করের 'দেশের কথা'। এখানেই স্বামীজীর বাণী ও রচনার সঙ্গে আমার ভালভাবে পরিচয় হয়। আমার মন তখন যা খুঁজছিল তার সন্ধান পেলাম স্বামীজীর বাণী ও রচনার মধ্যে। তাঁর বাণী যেন আগুন ছড়িয়ে দিত। সেই বাণীতে আমাদের অন্তরে ভারতের স্বাধীনতার প্রেরণা জাগে। তখন আমরা দল বেঁধে সপ্তাহে একদিন রোয়িং করে বেলুড়মঠে যেতাম। সেখানে রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ), বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) ইত্যাদি সবারই স্নেহের পাত্র হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। বেলুড়মঠে বাৎসরিক উৎসব হত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী-জীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মঠে দরিদ্র নারায়ণের সেবা হত। আমরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে খিচুড়ি পরিবেশন করতাম। এইভাবে অন্যান্য স্বামীজীদের সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল আমাদের। আমরা মঠে গেলেই প্রসাদ পেতাম।

"তারপর ১৯০৯ সালের প্রথম দিকে মহান বিপ্লবী স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ* মুখোপাধ্যায়ের

ছিল না, অথবা বলা উচিত দেখার যোগ্যতা ছিল না, তা হল ভারতবর্ষের এই নবজাগরণের কেন্দ্রীয় পুরুষটি হলেন রামকৃষ্ণদেব। জানি না, বর্তমান ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে কি বলবেন। মনে হয় এখনও এদিকটায় বিশেষ কারুর দৃষ্টি পড়েনি। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময়ের দূরত্বও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের নবজাগরণ সম্পর্কে আরও গভীর-ভাবে যখন গবেষণা হবে তখন এই তথ্যটিই উদ্‌ঘাটিত হবে যে ভারতবর্ষের জীবনে গত শতাব্দীতে যে বিপ্লব-তরঙ্গ উদ্ভূত হয়েছিল তার শীর্ষে ছিলেন এই ব্যক্তিটি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন তিনিই। তাঁর আগে ইতিহাসের দিক দিয়ে কিছু বিশিষ্ট পুরুষ যাঁরা এসেছেন তাঁরা হলেন তাঁর, ইংরেজীতে যাকে বলে, 'হেরাল্ড', (herald)। যে বাণী তিনি নিয়ে আসবেন, যে চেতনা তিনি সঞ্চার করবেন তার জন্যে তাঁরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন অনবদ্য দক্ষতার সঙ্গে। সম্রাট যখন দরবারে আসেন তখন তাঁর আগে দূত আসেন, ঘোষক আসেন। তাঁরা ইঙ্গিত দেন, তাঁরা জানিয়ে দেন যে সম্রাট আসছেন। আমি ঐতিহাসিক নই, পণ্ডিত নই। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের জীবৎকালে এবং তাঁর তিরোধানের পর থেকেই যে ভারতবর্ষের পট-পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে সেটা আমার চোখে এখন ধরা পড়ছে। আরও পঞ্চাশ বা একশ বছর পরে জিনিসটি আরও পরিষ্কার হবে বলে আমার বিশ্বাস। ভারতবর্ষের জাগরণের মধ্যমণি যে শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যটি ক্রমশঃ ইতিহাসের পণ্ডিতদের নজরে আসবেই। যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তাঁদের ইতিহাস 'ইতিহাস' নয়।" (উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৯৩, পৃঃ ১৩৪—১৩৫)

* স্বামীজী ও নিবেদিতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পৌত্র পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৫৮ 'যুগান্তর' পত্রিকায় তাঁর লেখা একটি

বিপ্লবসংঘে যোগ দেবার পর আর ঘন ঘন আমার বেলুড়মঠে যাওয়া হয়ে উঠতো না। কারণ বিপ্লবপন্থী হিসাবে গোপনচারী হয়ে কাজ করতে হতো। ১৯০৯ সাল থেকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটো আমার নিত্যসাথী হয়ে গেছে। তাঁকে এখনো রোজ পূজা করে থাকি। অবশ্য স্বামীজীর ফটোও তাঁর সঙ্গে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা (অল্প বয়সে) আমার খুব ভাল লাগত, এখনও লাগে। ১৯১৪ সালে ইংরেজীতে লেখা স্বামীজীর বায়োগ্রাফী পড়েছি। আমার মহান বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথও স্বামীজীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। আমেরিকায় তোলা স্বামীজীর বিখ্যাত ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে পাগড়ী-বাঁধা যতীন্দ্রনাথের ফটো তাঁর নিজের কাছে আমি দেখেছি। যতীন্দ্রনাথের চেহারা ছিল সাধারণ, কিন্তু মনে ছিল অসীম শক্তি। তাঁর এই মানসিক শক্তির মূলে স্বামীজীর গভীর প্রভাব ছিল বলে আমি মনে করি। স্বামীজীর আদর্শ ছিল খাঁটি মানুষ তৈরী করা। যতীন্দ্রনাথও সেই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সত্যিকার মানুষ তৈরী না হলে দেশের মুক্তি আসবে না—দাদার

প্রবন্ধে (মহাপুরুষে সান্নিধ্যে বাঘা যতীন) স্বামীজীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া 'ভগিনী নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থে' (২য় পর্যায়, সম্পাদনা : শংকরীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ, নিবেদিতা শতবার্ষিকী সমিতি, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ৫-১৭) তিনি একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন—'বিপ্লব আন্দোলন : স্বামীজী-নিবেদিতা—যতীন মুখার্জী'। বাঘা যতীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজেন্দ্রনাথের কাছে স্বামীজী ও নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর (বাঘা যতীনের) ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন পৃথ্বীন্দ্রনাথ। বাঘা যতীনের কনিষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছেন যে তিনি পিসীমা ও মায়ের মুখে শুনেছেন স্বামীজী ও নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বাবার খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। (শতরূপে সারদা, সম্পাদক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ৪৬২, পাদটীকা, ৮৯)

মা ও পিসীমার কাছে শ্রুত স্বামীজী ও নিবেদিতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সংবাদ-সূত্রে বীরেন্দ্রনাথের অনুমান যে যতীন্দ্রনাথ "শ্রীশ্রীসারদা মায়ের দর্শনেও যেতেন" (শতরূপে সারদা, ঐ)। বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পঞ্চানন চক্রবর্তী বর্তমান লেখককে তাঁর বিবৃতিতে (তারিখ ৮. ২. ১৯৭১) জানিয়েছেন : "কথিত আছে, যতীন্দ্রনাথ পলাতক অবস্থায় বাগনান হইতে বালেশ্বর যাওয়ার রাত্রে হাওড়ার গাড়িতে উঠিয়া শুনিলেন যে, শ্রীশ্রীসারদামাতা ঐ গাড়িতেই কোথাও যাইতেছেন। অমনি ধরা পড়ার নিদারুণ ঝুঁকি লইয়াও তিনি মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার আশীর্বাদ সংগ্রহ করিয়া লইলেন।" সম্ভবতঃ এই ঘটনাটি ঘটে ১৯১৫ সালের ১১ এপ্রিল। সেদিন শ্রীমা জয়রামবাটী যাচ্ছিলেন। শ্রীমায়ের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাতের সংবাদ অন্য সূত্রেও পাওয়া যায়। এই ঘটনা সম্পর্কে পৃথ্বীন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' পত্রিকায় পূর্ব-উল্লেখিত প্রবন্ধে লিখেছেন :

"জনৈক সহকর্মীকে (আনন্দবাজারের সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) যতীন্দ্রনাথ বললেন, 'মাকে প্রণাম করে যাব।' সারদাদেবীও একথা শুনে ব্যাকুল হয়ে সম্মতি দিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছোট একটি কামরায় জননী-সারদা বসেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ উঠে পায়ের ধুলো নিতেই জননী তাঁর হাত ধরে পাশে বসালেন। তিনি সর্বদাই ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখতেন। খুব ঘনিষ্ঠ ভক্ত না হলে ঘোমটা খুলে কথা বলতেন না। এই প্রথম তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। জননী ঘোমটা খুলে তাঁর দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন। বহু গৃহী ও সন্ন্যাসী-ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। অল্পক্ষণ পরে যতীন্দ্রনাথ নেমে এলেন। সত্যেন্দ্র মজুমদার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কি কথা হল মা?' তিনি বিমর্ষমুখে শুধু বললেন, 'দেখলাম আগুন'।"

(যতীন্দ্রনাথের) ছিল এই বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের সূত্র স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

"দেশ মানে শুধু জন্মভূমি নয়, দেশ মানে জননী—বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী থেকে এই ধারণা আমরা পেয়েছিলাম। ১৮৯৭ সালে তিনি বলেছিলেন, অন্য সব দেবতাকে বাদ দিয়ে এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর আমরা যেন শুধু 'দেশজননীর' পূজা করি। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন আমরা যেন অকপট, নিঃস্বার্থ এবং সাহসী দেশপ্রেমিক হই। সমগ্র জাতি যদি এই মানসিকতা নিয়ে জেগে ওঠে তাহলেই আমাদের স্বাধীনতা আসবে। দাদার মুখে বহুবার শুনেছি—'কান্ট্রিজ স্যালভেশন নট ফ্রম উইদাউট বাট ফ্রম উইদিন'। অর্থাৎ আমাদের নিজেদের শক্তিতেই দেশের মুক্তি আসবে। বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হলে আমরা কোনদিন স্বাধীনতা লাভ করতে পারব না। দেশের মুক্তির জন্যে মূল প্রয়োজন খাঁটি দেশপ্রেম এবং নিজেদের নিরলস প্রয়াস। দাদার এই মূল্যবান চিন্তার সূত্র তো আমরা স্বামীজীর কথার মধ্যেই খুঁজে পাই। যতীন্দ্রনাথ মনে করতেন স্বামীজীই ভারতের স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট প্রবক্তা এবং পথিকৃৎ। তিনি বলতেন, বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে অমন ব্যক্তিত্ব খুব কমই জন্মেছেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে (বর্তমানে ৪ বি শ্যামপুকুর লেন) স্বামীজী প্রায়ই আসতেন। যতীন্দ্রনাথও সেখানে যেতেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হতো। যতীন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন।[৩] ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্লেগের সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিবেদিতার নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শুনেছি, নিবেদিতা ঐ সময়ে তাঁকে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। যতীন্দ্রনাথ স্বভাবতই খুব দৃঢ়চেতা এবং তেজস্বী দেশপ্রেমিক যুবক ছিলেন। স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসার ফলে তাঁর ঐ গুণগুলি যে আরও বর্ধিত এবং পরিপুষ্ট হয়েছিল তা বলা বাহুল্য। আমার বিপ্লবসঙ্গী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়েরও স্বামীজীর প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা।

"মোট কথা, স্বাধীনতার প্রেরণা স্বামীজীর বই থেকেই আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা সবার এক ছিল না। কেউ বা বিলাতি দ্রব্য বর্জন করে ইংরেজকে পেটে মেরে তাড়াতে চেয়েছিলেন, কেউ বড় বড় বৃটিশ অফিসারকে হত্যা করে, ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং কেউ বা অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা ইংরাজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করবেন ভেবেছিলেন। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস ছিল বিনা বিপ্লবে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। এখন দেখছি, আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় এবং পৃথিবীর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

"সারা ভারতে মানবসেবা ধর্মের এক অভিনব আদর্শ স্বামীজীই প্রচার করেছিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর সেবার কথা, এমন মহান আদর্শ এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় আর কেউ এদেশে প্রচার করেছেন বলে আমার জানা নেই। অবশ্য এই আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে। সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পুরোহিত যে কী ঐশীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন তা ধারণা করা যায় বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে। জনগণের সেবাকে তিনি দেশসেবার অঙ্গ হিসেবেই দেখতেন। আজ আমরা

কমিউনিজমের কথা শুনছি, সর্বহারাদের প্রতি সহানুভূতির কথা শুনি; কিন্তু দেশের জন্য ব্যথা, দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য এত বেদনা, এত দরদ তো আর কারুরই মধ্যে দেখি না। দেশের জন্য ব্যথা, দেশের অগণিত গরীব মানুষের জন্য, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল নির্বিশেষে ভারতের জনগণের জন্য ব্যথা যেন বিবেকানন্দের মধ্যে মূর্তি ধারণ করেছিল। শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসেই নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দেশপ্রেমিক, এমন মানবপ্রেমিক এবং দরিদ্রের এত বড় দরদী আর জন্মেছেন কিনা সন্দেহ।

"আমেরিকায় স্বামীজীর অভূতপূর্ব সাফল্য এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের প্রভু বৃটিশের দেশ ইংলণ্ডের প্রভাবশালী মহলে তাঁর উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা পরাধীন ভারতবর্ষের হীনম্মন্যতার মূলে এক বিরাট আঘাত দিয়েছিল। বহু শতাব্দী পর ভারতবর্ষ আবার ভাবতে শিখল যে, সে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এক সুমহান দেশ, এক সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার তার কাছ থেকে এখনও অনেক কিছু শেখার আছে, অনেক কিছু নেওয়ার আছে। এমন কি, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভারতবর্ষের এমন একটি মহান জিনিস দেওয়ার ক্ষমতা আছে, যা পৃথিবীতে আর কারুর নেই। সেটি হল আধ্যাত্মিকতা—যা বাদ দিলে বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। অধুনাতন কালের যাঁরা চিন্তাশীল, তাঁরা এটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে যে বিজয়কেতন স্বামীজী উড্ডীন করেছিলেন, তা ছিল ভারতবর্ষেরই বিজয়কেতন সম্রাট অশোকের পর বহির্বিশ্বে ভারতের দিগ্বিজয় এই প্রথম এবং এক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয়কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। রাজর্ষি অশোক ধর্মবিজয়ের নীতি অনুসরণ করলেও তাঁর পশ্চাতে ছিল তাঁর সমগ্র ভারতবর্ষের সার্বভৌম নৃপতির মহিমা। কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে সম্পদশালী, শক্তিমান, সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য পরাধীন ভারতবর্ষের এক কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় মাথা লুটিয়েছিল। তাঁর কোন সামরিক মহিমা ছিল না, রাজকীয় ঐতিহ্য ছিল না। তিনি ছিলেন সনাতন ভারতবর্ষের—দরিদ্র কিন্তু ত্যাগ এবং সংযমে মহান ভারতবর্ষের—এক বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কিন্তু পাশ্চাত্যের কাছে ভিক্ষুকের থলি নিয়ে উপস্থিত হননি; মাথা উঁচু করে নিজ দেশের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে ভারতবর্ষের প্রতি পাশ্চাত্যের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের মহিমাকে পাশ্চাত্যের চোখে যে-তুঙ্গে উত্তোলন করেছিলেন স্বামীজী, তা তাঁর আগে বা পরে আর কেউ করতে পারেননি। পরাধীন ভারতবর্ষকে তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিলেন—যা ভারতবর্ষ হারিয়েছিল কয়েক শতাব্দী আগে। তিনি বলেছিলেন যতদিন ভারতবর্ষ বিদেশী শক্তির গোলাম হয়ে থাকবে ততদিন ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বীকৃতি পৃথিবী দেবে না। তাই স্বাধীনতার প্রয়োজন সবচেয়ে আগে। বিবেকানন্দ অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে ঘৃণা করতেন; কিন্তু অপরের মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে তা তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন যে পাশ্চাত্য থেকে আমরা নেব তাদের কার্যকুশলতা, তাদের স্বাধীনতাস্পৃহা, তাদের প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি; আর বিনিময়ে আমরা তাদের দেব আমাদের আধ্যাত্মিকতা।

"ভগিনী নিবেদিতার দ্বারা ভারতের

স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছিল। তিনি গুরুর মাতৃভূমিকে নিজের মাতৃভূমি জ্ঞান করতেন আর ভারতবর্ষ যাতে ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে সেজন্য তিনি দেশের তৎকালীন জাতীয় নেতাদের এবং সাধারণ বিপ্লবীদের উৎসাহিত করতেন, প্রেরণা যোগাতেন। সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বক্তৃতা করে তিনি দেশে জাতীয়তাবাদী ভাবের একটা জোয়ার এনেছিলেন। পরাধীনতার গ্লানি স্বামীজীর অন্তরে যে গভীর বেদনা পুঞ্জীভূত করেছিল তার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। রেভ্যুলিউশন-এর সঙ্গে নিবেদিতার ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং এর নেপথ্যে যে স্বামীজীর প্রভাবই ক্রিয়াশীল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষের নব-জাগরণ, জাতীয় জাগরণ, স্বাধীনতা, যা-কিছু সত্যিকারের প্রগতি তার মূলে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় অবদান বলে আমার বিশ্বাস।"

* * *

নলিনীকান্ত আমাকে বলেছিলেন: "বিবেকানন্দের মতো মানুষ পৃথিবীতে কাঁড়ি কাঁড়ি জন্মান না। দু-এক হাজার বছরে দু-একজনই জন্মান। বুদ্ধ আর রামকৃষ্ণ ছাড়া তাঁর মতো আর কেউ পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত এসেছেন বলে তো আমার মনে হয় না। আর আসার প্রয়োজনই বা কী? বিবেকানন্দ যা দিয়েছেন তাই বুঝি আগে, ধারণা করি আগে, কাজে লাগাই আগে। বিবেকানন্দ একাই একশ শুধু নন, একাই একশ হাজার কোটি। যুগন্ধর এই মহা বীর্যবান সন্ন্যাসীবর ভারতবর্ষ ও তার ধর্মকে এক মহা সঙ্কট থেকে রক্ষা করেছেন, দিয়েছেন আরও অন্ততঃ হাজার বছরের জন্য পর্যাপ্তের চেয়েও বেশী পাথেয়।"

# উনিশ শতকের নারী-সমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিকের অভিমত অনুসারে "১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন ভারতের মধ্যযুগ শেষ হয়ে শুরু হয়েছে আধুনিক যুগ...১৭৫৭ সালের সেই জুন মাসে আমরা সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবেশ করেছি এক মহত্তর নতুন জগতে যা বাংলাকে বিস্ময়কর ভবিতব্যের দিকে অগ্রসর করে দিয়েছে।"[১] সেই ঘটনার ফলাফল স্পষ্টরূপ নিতে আরও প্রায় ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং সেই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস লোভ, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও শোষণে আকীর্ণ এক রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনের কাহিনী।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার চেহারা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হতে থাকে: ধর্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সভ্যতা সর্ব-স্তরেই এসেছে প্রবল আঘাত। গ্রামীণ অর্থ-নীতি বিপর্যস্ত। রাজা-প্রজার মাঝখানে তৈরি হয়েছে এক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী! এতদিন যে ভূস্বামীরা গ্রামে বাস করে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্ক রক্ষা করতেন, শাসকশ্রেণীর নতুন ভূমিব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের ফলে তাঁরা অবলুপ্ত। নির্মীয়মাণ নগর বন্দর কলকাতায় তখন অর্থ

১ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল—স্যার যদুনাথ সরকার, ২য় খণ্ড, ৪৯৭ (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য) থেকে গৃহীত।

উপার্জনের নানাপথ উন্মুক্ত। সেকালের একজন লেখকের রচনা থেকেই অর্থ উপার্জনের ব্যঙ্গ-চিত্রটি পাওয়া যাবে :

"ধন্য ধন্য ধার্মিক ধর্মাবতার ধর্মপ্রবর্তক দুষ্ট নিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন। এই কলিকাতা নামক মহানগরে আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা অথবা জ্যেষ্ঠভ্রাতা আসিয়া…বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের মাঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারি করিয়া অথবা কোম্পানীর কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।"[২] এই আকস্মিক বিত্তশালী লোকেরাই তখন জমিদার—গ্রামজীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে। বংশ-কৌলীন্যের দিন শেষ হয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা রুচি সংস্কৃতিবিহীন এই বেনিয়ান মুৎসুদ্দিরা জমিদার হয়ে পত্তনিদারদের মাধ্যমে কৃষক-শোষণের অর্থে কলকাতার বাবু শ্রেণীতে পরিণত। স্বভাবতঃই তাদের নতুন মনিব ইংরেজদের অনুকরণেই তাদেরও জীবনধারা প্রবাহিত। এই অনুকরণ-আসক্ত বাবুদের চরিত্র-চিত্রণ পাই সেকালের লেখনীতে :

"বিদ্যা গোটাকতক বিজাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজি কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন, নোটের নাম লোট, বডিগার্ডের নাম বেনীগারদ, লৌরী সাহেবকে নৌরী সাহেব, এই প্রকার ইংরেজি শিখিয়া সর্বদাই হুট, গোটেহেন, ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাংলাভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙালী-পত্রও লিখেন না।"[৩] সাহেবগণ রবিবার গির্জায় গিয়া থাকেন অন্যদিন বিষয়কর্ম করেন। বাবু এ বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান, কখন শকের যাত্রা, খেউর শুনিয়া থাকেন।"[৪]

সমকালীন লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সমাজকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন : (১) দেওয়ানি, মুৎসুদ্দির কাজে যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন সেই হঠাৎ নবাবের দল (২) প্রথম শ্রেণীর অন্নভোগী উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং (৩) দরিদ্র ভদ্রলোক শ্রেণী—যাদের মধ্যে কেউ মুহুরি, কেউ মেট, কেউ বা বাজার সরকার। আধুনিক পরিভাষায় যারা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী। সামাজিক উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব এ সময়ের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে রামমোহনের আবির্ভাব এবং বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্ম বাংলাদেশের স্থির, অনড় জীবনযাত্রায় বড় রকমের আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারণার তীব্র প্রচেষ্টা অন্যদিকে হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষার প্রয়াসে শহুরে বাঙালীসমাজ আন্দোলিত। হিন্দুসমাজের সম্মিলিত প্রতিরোধের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই বিভেদ এসেছে—সনাতনপন্থী হিন্দুদের সঙ্গে সংস্কারপন্থী রামমোহনের বিরোধের মধ্য দিয়ে। রামমোহন মধ্যযুগীয় হিন্দুচিন্তাধারায় আঘাত হেনেছেন—হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত

২ 'নববাবু বিলাস'—প্রমথনাথ শর্ম্মণ ( ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় )

৩ পত্র—সমাচার দর্পণ ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮২১।

৪ 'বাবুর উপাখ্যান'—সমাচার দর্পণ, ৯ জুন ১৮২১। ( ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত হবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান )

করে। ফলে একদিকে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ, অন্যদিকে সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজ এবং উভয়ের প্রবল প্রতিপক্ষ খ্রীষ্টান মিশনারী—এই তিনদলের কোলাহলে দীর্ঘকাল নিদ্রিত বাঙালীসমাজ ক্রমশঃ জাগ্রত হতে শুরু করেছে।

এইকালে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারও ক্রমশঃ আরম্ভ হয়েছে। শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই বাঙালীসমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। নিষ্ঠুর সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন কণ্ঠ আগে শোনা গেলেও রামমোহনই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছেন তিনি স্বয়ং হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত—এই প্রথা যে অশাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে সনাতনপন্থী হিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ষ তীব্রতর হলেও শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়যুক্ত হন। শাসক শ্রেণী এই প্রথা আইনের মাধ্যমে রদ করেন। যে প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত তার চিরস্থায়ী বিলোপ আইনের সাহায্যে সম্ভব নয় কিন্তু প্রথাটির নৃশংসতা চিন্তাশীল হিন্দুদের সচেতন করে তুলেছিল। শিক্ষা বিস্তারের ফলে দীর্ঘকাল প্রচলিত সতীদাহের রীতি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যায়।

সমগ্র উনিশ শতকে ধর্মবিরোধের পাশাপাশি যে সংস্কার আন্দোলনগুলি হয়েছে তার অধিকাংশই কিন্তু নারী-সমাজকে কেন্দ্র করে, যেমন (১) সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তি (২) স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার (৩) বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন (৪) বহুবিবাহ রদ প্রচেষ্টা (৫) সহবাস সম্মতি আইন অর্থাৎ বিবাহের বয়স বৃদ্ধি। নারীদের সম্পর্কে এই সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি: উনিশ শতকের নারী-সমাজের শোচনীয় অবস্থা নবজাগ্রত সমাজ-মানসকে পীড়িত করেছিল। প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি প্রাচীনকালে হিন্দুনারীর ভূমিকা মোটামুটি গৌরবজনকই ছিল কিন্তু মধ্যযুগে বিশেষ করে বিজাতীয় শক্তির অধীনে থাকার কালে নারীর ভূমিকা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রও সাধারণভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়েছে এবং কৌলীন্য-প্রথা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীজীবন বিড়ম্বনার শেষ সীমায় এসে পৌছেছে। বহুবিবাহ প্রথার যে ভয়াবহ চেহারা ইতিহাসে দেখা যায় তা যেমন হিন্দু-সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক, নারীর অবস্থারও তেমনি অভ্রান্ত সাক্ষ্য। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণের নাম সমেত বিবাহ সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে ৪৩, ৬০, ৬০, ১০০ ও ৬০ অর্থাৎ এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ সর্বসমেত ৩২৩ জন হিন্দুকন্যাকে উদ্ধার করার গৌরব লাভ করেছিলেন। সর্বোচ্চ রেকর্ডধারী ব্রাহ্মণ অবশ্য ১৮০টি কন্যা বিবাহ করেছিলেন—একথা জানিয়েছেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।[৫]

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেও এটি রদ করার কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। কারণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির ক্ষেত্রে আইন প্রবর্তনে সরকারি সতর্কতা।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে সতীদাহের ঘটনার শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।[৬] ইচ্ছার পশ্চাতে ছিল সাময়িক ভাবাবেগ,

৫ 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস'—ডঃ স্বপন বসু, ১৫৭-১৫৮।
৬ 'সতী'—ডঃ স্বপন বসু, 'নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী জীবনের অনিশ্চয়তা এবং শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যা। সতীদাহ-প্রথার বীভৎসতার জন্য সমাজ স্বাভাবিকভাবেই এর অবলুপ্তি মেনে নিয়েছিল কিন্তু বিধবা-বিবাহের ক্ষেত্রে সে-কথা বলা যায় না। যেখানে কন্যার একবার বিবাহের ব্যবস্থা করাই রীতিমত সমস্যা সেখানে বিধবা-বিবাহের অগ্রাধিকার স্বীকৃত হওয়া কঠিন। এর মধ্যে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স দশ থেকে বারো হওয়ায় বালবিধবার সমস্যার অনেকখানি সমাধান ঘটে। এর পর নারী ও পুরুষের শিক্ষার ব্যাপকতার দরুণ বিবাহের বয়স ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে এবং কৃষিনির্ভর সমাজ যখন শিল্পনির্ভর হয়ে ওঠে তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের বিবাহের বয়সও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এককথায়, সামাজিক প্রয়োজন অনুসারেই কু-প্রথাগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পায়।

শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা শুরু হলেও তাতে বেগ সঞ্চার হয়েছে অনেক পরে। শতাব্দীর শেষ দশকেও (বিশ শতকের প্রারম্ভেও) স্ত্রীশিক্ষা অনেকখানি সঙ্কুচিত—ছাত্রী জোটে না, যদিও দুচারজন জোটে বাল্যাবস্থাতেই তাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। একজন ব্রহ্মময়ী কিংবা হটীবিদ্যালঙ্কার (অথবা অনেক পরে কাদম্বিনী বসু)-এর নিরিখে সমগ্র সমাজের বিচার চলে না। স্ত্রীশিক্ষার প্রায় সব প্রয়াসই শহরকেন্দ্রিক—সে-শিক্ষা শহরের বৃহত্তর জনসমষ্টিকেও স্পর্শ করেনি—নারীর স্বাতন্ত্র্য-বোধের বিকাশ সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়নি।

এ-যুগের একটি বিস্ময়কর দিক হল পরস্পর-বিরোধিতা। যে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের জন্য সর্বস্বত্যাগ করতে পারতেন তিনিও সহবাস সম্মতি আইনের বিরোধিতা করেছেন। রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিধবা-বিবাহের সমর্থন করতে পারেননি।

সুতরাং নারীমুক্তি আন্দোলনকে সামগ্রিক-ভাবে ধরলে কোন ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকার পক্ষে বা বিপক্ষে নির্দিষ্ট রায় দেওয়া যায় না। আরও একটি দিক চোখে পড়বে একালের নাটক-নক্সাগুলি বিশ্লেষণ করলে। নারীমুক্তিকে প্রগতিবাদের লক্ষণরূপে যেখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেখানেও তার চেহারা যে কতখানি হাস্যকর ও বিকৃত তা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' কিংবা মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র নারীর মর্ম-বেদনায় বিশেষভাবে প্রকাশিত।

উনিশ শতকের নারীপ্রগতি বা নারী-মুক্তির জন্য আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অবশ্যই এই কথাগুলি স্মরণ রাখতে হবে: (১) রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো দু' একজনকে বাদ দিলে বেশিরভাগ সংস্কারপন্থীর প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল বিদেশী শাসকদের কাছে মুখরক্ষা (২) ব্যক্তিগত রাজানুকূল্য লাভের জন্য বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ (৩) ভারতীয় নারী-সমাজের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞতা (৪) পুরুষশাসিত সমাজের স্বাভাবিক রীতি অনুসরণ করে অভিভাবকত্ব ও অধিকার সচেতনতার পরিচয় দান। এখানে মানবতা-বোধের চেয়ে ব্যক্তিগত গৌরববোধ চরিতার্থ করার কামনাই প্রবলতর। একটা কথা নিঃসঙ্কোচেই এখানে উল্লেখ করা যায়: এ-যুগে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের (যাঁরা নারীমুক্তি বা নারীপ্রগতির পক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন করেছিলেন তাঁদেরও অনেকের) ব্যক্তিগত জীবনে বারবনিতাবিলাস খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। এঁদের অনেকেই সমকালীন রীতির অনুসরণে রক্ষিতা পোষণের গৌরববোধ করেছেন

এই পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং ভূমিকা বিশেষভাবে বিবেচ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মপথের সাধক—তাঁর কাছে জীবনের পরম লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ। বাস্তব প্রয়োজনীয়তা, ঐহিক সুখশান্তি, সাংসারিক জীবন ও সমাজের আদর্শরূপ প্রতিষ্ঠা তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে না হলেও মুখ্যতঃ তিনি ঈশ্বর-সাধনাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠবস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশ—উন্মেষ, সাধকজীবন ও সিদ্ধিলাভের ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলে নারীর ভূমিকা নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁর বাল্যজীবন নারীবর্জিত তো নয়ই বরং সেখানে নারীর একটা বড় ভূমিকা রয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হল উপনয়নকালের ঘটনাটি। সেকালের সামাজিক কঠোরতা সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারবেন, উপনয়নের পর তিনদিন নিজের জননী ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোকের মুখদর্শন এবং ব্রাহ্মণেতর কোন শ্রেণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ—এই দুটিই ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। শহর কলকাতা থেকে বহুদূরে গ্রামীণ সমাজের সেই রীতিকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব। কামারপুকুর-জয়রামবাটীর সামাজিক কঠোরতা কতখানি ছিল, সেটা বোঝা যায়, এই উপনয়নের প্রায় ৫০ বছর পরেও একদিন যখন নিবেদিতা সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখন শ্রীমা তাঁকে নিরস্ত করে তাঁর দেহাবসানের পরে তাঁর গ্রামে নিবেদিতাকে যাবার কথা বলেছিলেন কারণ জীবদ্দশায় তাঁর কুটিরে কোন শ্বেতাঙ্গিনী গেলে স্বয়ং সারদাদেবীকে সমাজে 'ঠেকো' ( একঘরে ) হতে হত। এই সমাজে একটি ন' বছরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালকের সাধারণ একটা আব্দারের মূল্য কতটুকু? এক্ষেত্রে ধাত্রীমাতার মাতৃত্ব-অধিকারের যুক্তির চেয়ে সামাজিক সংস্কার অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ( তখন বালক গদাধর মাত্র ) দৃঢ়তা ও শাস্ত্রীয় যুক্তি সমাজপতিরা প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি—এ যেন দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা যার মধ্যে পরবর্তিকালের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পশ্চিমী 'হিউম্যানিজম'-এর সৌখীন বিলাসিতা নয়—তাঁর প্রত্যয় সমস্ত চেতনার মধ্য হতেই স্বতঃ-উৎসারিত। পরবর্তিকালে দেখি, তাঁর সাধকজীবনের বিকাশ ঘটেছে—এক শূদ্র নারীর পৃষ্ঠপোষকতায়—এখানেও হিন্দু রক্ষণশীলতার বাধা একইভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ সকলের সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিল না। জীবন-ধারণের জন্যই তাঁরা এ-পথ গ্রহণ করতেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থের জন্য সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই সমস্ত ঘটনাটিকেই যেন পূর্বনির্দিষ্ট বলে মনে হয়। এই মহিলার আনুকূল্য তাঁর সাধকজীবন বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল—পরবর্তী ঘটনা বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, এইকালে রানী রাসমণি ভিন্ন অন্য কেউ এত গভীরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনতে বা তাঁর সাধনাকে উপলব্ধি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এর জন্য এই ধনী মহীয়সী মহিলাকে যা-কিছু বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে ততখানি সহ্য করার মতো দৃঢ় মানসিকতা কজনেরই বা থাকতে পারে!

রামকৃষ্ণের সাধনাকালে তৃতীয় নারীর আবির্ভাব—ভৈরবী যোগেশ্বরীর। প্রথা অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, শিক্ষালাভ করেছেন তাঁর কাছে। ভৈরবী রামকৃষ্ণের সাধনার পথ চিহ্নিত করেছেন—তাঁর অলোকসামান্য শক্তিকে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছেন। আর শেষে দেখতে পাই দুস্তর সাধনায় সিদ্ধিলাভের ফল সমর্পণ করেছেন এক

নারীরই পদতলে এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, সে-নারী তাঁরই সহধর্মিণী—যাঁকে তিনি দেবীরূপে আহ্বান করে পূজা করেছেন।

তিনি সর্বত্যাগী কিন্তু গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসী নন, কারণ সেখানেও তাঁর ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে মাতৃহৃদয়ের বেদনা। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে নারীর ভূমিকা ঘটনামাত্র নয়। রঘুবীর তাঁর গৃহদেবতা, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃশক্তিকেই গ্রহণ করেছেন বিশ্ব-নিয়ন্ত্রীরূপে। ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে বিচার করলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে নারীর এই গুরুত্বের উপযোগিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমেরিকা বাসকালে স্বামী বিবেকানন্দ সেই গভীরতর তাৎপর্যের দিকটি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন জাতির উত্থানের সঙ্গে নারীর যোগসূত্র কোথায়—বুঝেছিলেন, একটি ডানার ভর করে যেমন পাখির আকাশে উত্থান সম্ভব নয় তেমনি নারীশক্তিকে দুর্বল করে রেখে কেবলমাত্র পুরুষসহায়ে জাতির উত্থানও সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য নারীর শক্তিরূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের জাতীয় জীবনধারাকে উপলব্ধি করে বুঝেছিলেন ভারতের স্বাতন্ত্র্য কোথায় এবং ভারতীয় নারীর শক্তিরূপ কিভাবে জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক হয়ে উঠতে পারে—বলেছিলেন, "সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু'-গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার।"[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে যখন বার বার শোনা যায় "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই জীবনের শ্রেষ্ঠ ত্যাগ" তখন অনেকে তাঁকে নারীবিদ্বেষীরূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখিয়েছেন (প্রসঙ্গত একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই কোন মহিলাকে উপদেশ দেবার সময় তিনি 'পুরুষকাঞ্চন' কথাটি ব্যবহার করতেন। সারদাদেবীকেও উপদেশ দিতে দেখি "পুরুষ মানুষকে কখনো বিশ্বাস করো না মা…")। কামিনীকাঞ্চন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যা, "প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়—সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হ'ল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে,—তারপর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত ক'রে তামাক সাজতে বসে।"[৮] অর্থাৎ সাধনাঙ্গকেই সাবধানতা; কারণ (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়) "আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে,—অবিদ্যা—মুগ্ধ করে। অবিদ্যা—যা থেকে কামিনী কাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম—ঈশ্বরের পথে ল'য়ে যায়।"[৯] সুতরাং অবিদ্যারূপিণী কামিনী সম্পর্কে তাঁর সতর্কতা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না 'অনুকূল বাতাস' বয়। কিন্তু বিদ্যারূপিণী নারী পুরুষের জীবনে বড় শক্তি—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অস্বীকার করেননি। তাঁর স্বীকৃতি: "মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাঙ্গালা দেশে জাঁতি থাকে;—অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন ক'রবে।"[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত ভাষাটিও লক্ষণীয়—'কামিনী' এবং 'মেয়ে' কখন কখন নারী বা

৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড (১ম সংস্করণ) ১১৮
৮ কথামৃত, ৩।২।১ ৯ ঐ, ৩।২।২
১০ ঐ, ৩।২।২

অন্য শব্দ কিন্তু অবিদ্যারূপ বোঝাতেই 'কামিনী' শব্দ ব্যবহৃত (স্থানবিশেষে 'কাম-কাঞ্চন' শব্দটিও পাওয়া যায়)। সাধনাকালে (শুধু আধ্যাত্মিক পথের সাধনা নয়—যে কোন একাগ্র সাধনা সম্পর্কেই এ-কথা সত্য যে) সকল রকম অশুভ-প্রলোভন পরিত্যাজ্য; কারণ তা মানুষকে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করে কিন্তু সাংসারিক জীবনে নারী পুরুষের পরিপূরকরূপেই স্বীকৃতি পেয়েছে। আমরা দেখতে পাই, তাঁর ত্যাগী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা বিবাহিত তাঁদের তিনি মাঝে মাঝে স্বয়ং স্ত্রী-সান্নিধ্যে পাঠিয়েছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্ত্রী দক্ষিণেশ্বরে এলে তাঁকে আপন পুত্রবধূর মতোই সাদরে গ্রহণ করেছেন—শ্রীমাকে বলেছেন যৌতুক দিয়ে বধূ দর্শন করতে। কোন এক ভক্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব ত্যাগ করে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে সাধনভজনের ইচ্ছায়, তিনি তাঁকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নারীর জায়ারূপকে তিনি অস্বীকার করেননি কিন্তু জননীরূপকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন।

এটাই ভারতের প্রবহমান ঐতিহ্য। স্বামীজী বিদেশে ভারত সম্পর্কে যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন প্রায় প্রত্যেকটিতেই ভারতীয় নারীত্বের এই আদর্শ জগৎসমক্ষে উপস্থিত করেছেন। প্যাসা-ডোনার সেক্সপীয়র ক্লাবে এই আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন "প্রত্যেক জাতির পুরুষ বা স্ত্রীর ভিতরে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটি আদর্শের রূপায়ণ ঘটে। ব্যষ্টি একটি আদর্শের বহিঃ-প্রকাশের মাধ্যম। জাতি এই সব ব্যষ্টির সমষ্টি মাত্র এবং জাতিও একটি মহান্ আদর্শের প্রতীক। ...একটি জাতিকে বুঝিতে হইলে প্রথমে ঐ জাতির আদর্শকে অবশ্যই বুঝিতে হইবে।...যখন অপরকে বিচার করিতে যাই, তখন ধরিয়া লই যে, আমরা যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা সকলের পক্ষেই ভাল হইবে।...আমরা যাহা করি না, অপরে তাহা করিলে ঘোর নীতিবিরুদ্ধ হইবে।...পূর্ণত্বের চরম বিকাশ একটি মানুষে সম্ভব নয়। আপনি একটি অংশের রূপ দিন, আমিও আমার সাধ্যমত সামান্যভাবে আর একটি অংশ রূপায়িত করি।

"ভারতে জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই প্রথম ও শেষ কথা।...

"পাশ্চাত্যে নারী জায়া। সেখানে জায়া-রূপেই নারীত্বের ভাবটি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।... পাশ্চাত্যে স্ত্রীই গৃহকর্ত্রী, ভারতীয় গৃহে কর্ত্রী জননী।...হিন্দুমন সেই সব আদর্শকে ভয় করে, যেগুলি অনুসারে দেহ দেহেই আসক্ত হইবে...। 'মা'-নাম ছাড়া এমন কি শব্দ আছে, যাহাকে কোনপ্রকার কামভাব স্পর্শ করিতে পারে না, কোনপ্রকার পশুভাব যাহার নিকট আসিতে পারে না? এই মাতৃত্বই ভারতবর্ষের আদর্শ।"[১১]

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকল নারীই তাঁর আরাধ্যা দেবীমূর্তিরই বিচিত্র বিকাশ। যখন নারী-কল্যাণের জন্য বিগত-নিদ্র সমাজ-সংস্কারকদের কাছে থিয়েটারের অভিনেত্রী সম্প্রদায় ঘৃণা ভিন্ন আর কিছু লাভ করেনি তখন শ্রীরামকৃষ্ণই তাদের মানবিক সত্তা ও শিল্পীরূপকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—অযাচিত স্বয়ং থিয়েটারে উপস্থিত হয়ে তাদের অভয়দান করেছেন। সে নির্ভয়তা শুধু আধ্যাত্মিক পথকেই নির্দেশ করেনি। তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দ্বারা সমাজে কল্যাণকর ভূমিকাগ্রহণেরও পথনির্দেশ করেছে। গিরিশচন্দ্র যখন বার বার থিয়েটার ছাড়ার সংকল্প প্রকাশ করেছেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিরস্ত করেছেন কেননা থিয়েটারের দ্বারা অনেকের উপকার হয়। পতিতা নারীরা বিকল্পজীবিকার

১১ বাণী ও রচনা, ৫ম (১ম সং), ৪২৮-৩১

সন্ধান যে থিয়েটার থেকেই পেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের এই মনোভাবের প্রকৃত অর্থ পরে বুঝেছেন গিরিশচন্দ্র।

ইদানীংকালে নারীমুক্তির নানা আন্দোলন শুরু হয়েছে। নারীর সামাজিক অধিকার নিয়েও নানা বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে 'ওম্যান লিব' আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশে সাড়া জাগিয়েছে। স্বতঃই একটা প্রশ্ন দেখা দেয় নারীমুক্তির প্রকৃত অর্থ কি? কি নারী কি পুরুষ কারও ক্ষেত্রেই সমাজকে অতিক্রম করে মুক্তি সম্ভব নয়। স্বাধীন স্বেচ্ছাতন্ত্রের পথ কখনই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ নয়। নারীর প্রকৃত মুক্তি ঘটতে পারে তার আত্মউন্মোচনে, স্বরূপ উপলব্ধিতে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে। আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মসর্বস্বতা সাময়িকভাবে তাকে বন্ধনহীনতার পথ দেখালেও সমগ্র সমাজের পক্ষে শেষ পর্যন্ত বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কন্যারূপে, ভগিনীরূপে, জায়ারূপে অথবা পরিবার বন্ধনের বাইরে সামাজিক পটভূমিকায় নারীত্বের উদ্বোধন ঘটতে পারে—বন্ধনের মধ্যেও আবার তার স্বকীয়তা ফুটে উঠতে পারে। এই ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের প্রথম শর্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আশ্রয়ের সুনিশ্চিতি। এ-সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ সুস্পষ্ট।

শ্রীমা-সারদাদেবী সম্পর্কে নিবেদিতার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিই। নিবেদিতা বলেছিলেন, "শ্রীমা-ই নারীজাতি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।" নারীজাতির সম্মুখে সারদাদেবীকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদর্শরূপে। সেই শ্রীমাকে তিরোভাবের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন —"তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে—শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।…দেখ কারও কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিৎহাত কোরো না।…একটি পয়সার জন্যে যদি কারও কাছে হাত পাত তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে ·বরং পরভাতা ভালো, পরঘোরো ভালো নয় তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন কামারপুকুরে নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট কোরো না।"[১২] এই সহজ সাধারণ কথাগুলির মধ্যেই রয়েছে এক আনন্দময় স্বাধীন চিত্ত-বিকাশের পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন তাঁর সঙ্গতিসম্পন্ন ভক্তেরা সারদাদেবীকে সুখে রাখার জন্য যথেষ্টই চেষ্টা করবেন কিন্তু সেই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে অনিবার্যভাবে দেখা দেবে পরমুখাপেক্ষিতা, পরনির্ভরতা এবং চিত্তের অবাধবিকাশের প্রতিবন্ধকতা। কামারপুকুর-জয়রামবাটীর পর্ণকুটিরে সচ্ছলতার অভাব আছে—স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। সেই মুক্তির পথ ধরেই আসতে পারে অনমনীয় দৃঢ়তা।—শাকভাতের ক্লেশ সেই স্বকীয়তাকেই মহীয়ান করে তুলবে।

কিন্তু সারদাদেবীর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে দারিদ্র্যময় জীবনকেই নির্দিষ্ট করেননি—তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশটি লক্ষ্য করলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে: "কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো…শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।"[১৩] এক নারীকেই দিয়ে গেলেন সমাজ নেতৃত্বের ভার এবং সেই সঙ্গে নারী ও পুরুষের যৌথদায়িত্বের স্বীকৃতি-পত্র। এই অধিকার দানের পূর্বে তিনি তাঁকে শিক্ষিত করে তুলেছেন নানাভাবে—কিছু পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষায় সুসম্পূর্ণ করেছেন। তাঁকে বিশ্বমাতৃত্বের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—দয়া,

১২ শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৯৫-৯৬
১৩ ঐ, পৃঃ ১৬০

সহানুভূতি ও সেবার মনোভাবকে জাগ্রত করেছেন। কামারপুকুর-জয়রামবাটীর জীবনে ছিল নত হবার পাঠ—সার্থক নেতা হবার জন্য চিত্তগঠন। শুধু সারদাদেবীকেই নয়—গৌরীমা অথবা অন্যান্য স্ত্রীভক্তদের ক্ষেত্রেও শ্রীরামকৃষ্ণের নারীজীবনের আদর্শ ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

নারীদের জন্য যখন সমাজ-সংস্কারকগণ বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন তখন তাঁদের মানসিকতায় প্রচ্ছন্ন ছিল কিছু সহানুভূতি, কিছু অভিভাবকসুলভ আত্মতৃপ্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছেন নারীর মধ্যে শক্তির রূপ। তাঁর একটি কথা। "কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই,—বর বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।"[১৪]

সেই নিঃশঙ্ক শক্তিরূপকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সমাজের সর্বস্তরে।*

১৪ কথামৃত, ৩।২।২

* নিবেদিতা ব্রতীসংঘের রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচারে অনুষ্ঠিত সেমিনারে (১৯৮৬) পঠিত প্রবন্ধ।

# পরিবারসমন্বিতা শ্রীশ্রীদুর্গা

## স্বামী প্রমেয়ানন্দ

বঙ্গদেশে মা দুর্গার যে কাঠামো সচরাচর আমরা দেখে থাকি তাতে থাকে সাতটি মূর্তি—কাঠামোর মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা, তাঁর দক্ষিণে উপরে লক্ষ্মী, একটু নিচে গণেশ, বামপার্শ্বে অনুরূপভাবে উপরে সরস্বতী, নিচে কার্তিক, পদতলে একদিকে সিংহ, অপরদিকে অসুর, দেবীর ডান পা সিংহ-পৃষ্ঠে এবং বাঁ পায়ের শ্রীঅঙ্গুলী অসুরের বুকে স্থাপিত। দেবীর আবাহনমন্ত্রে আছে:

ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥

—হে পরিবারসমন্বিতা ভক্তিসুলভা দেবীশ্রেষ্ঠা দুর্গা, যতক্ষণ আমি তোমার পূজা করি ততক্ষণ কৃপা করে সুস্থিরে অবস্থান কর, অচঞ্চল থাক।

শরৎকালে মহাপূজাতে বাঙালীর হৃদয়ে দেবীর অধিষ্ঠান হয় কন্যারূপে। কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবীর পরিবারভুক্ত। বাঙালী হিন্দুগণ মনে করেন শারদোৎসবের মাধ্যমে কন্যাস্থানীয়া দেবী সপরিবারে তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আগমন করেন। আগমনী-সঙ্গীতও ইহার সাক্ষ্য বহন করে। যেমন:

"তোরা আজ গারে আগমনী।
গেয়ে যা প্রাণ ভরবে, আসে দুর্গা-রানী॥
…　…　…
আসে গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী,
কার্তিক আসে ঐ চড়িয়া ময়ূরী;
ঐ শোন কেশরী, গরজে হরষে মরি রে!"

—ইত্যাদি। তাছাড়া, সিংহবাহিনী মহিষাসুর-মর্দিনী দেবী, এবং তাঁর সঙ্গে ধনদাত্রী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, শৌর্য-বীর্যের প্রতীক কার্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা গণেশ ও তাঁদের বাহন-সকলের মূর্তিসহ মহামহিমময়ী দুর্গামূর্তির পরিকল্পনা ও পূজা বাংলার নিজস্ব।

'দুর্গা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক। যিনি

দুর্জ্ঞেয়া, অর্থাৎ যাঁর তত্ত্ব দুরধিগম্য—তিনিই দুর্গা। তিনি কৃপা করে জানালে তবেই তাঁর তত্ত্ব জানা সম্ভব—"তুমি কৃপা কর যারে সে তোমারে জানতে পারে।" শাস্ত্রবচনে আছে:

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরকীর্ত্তিতঃ॥

—'দ' শব্দটি দৈত্যনাশক, 'উ'কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ্' রোগনাশক, 'গ'-কার পাপনাশক এবং 'অ'-কার ভয় শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন—তিনিই দুর্গা। আবার যিনি 'দুর্গ' নামক অসুরকে নাশ করেন তিনিই নিত্য দুর্গা নামে খ্যাত—'দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা।'[১]

এই দুর্গাই সমস্ত শক্তির আধার, নিখিল দেবগণের শক্তিসমূহের ঘনীভূত মূর্তি—"নিঃশেষ দেবগণশক্তিসমূহ মূর্ত্যা।" তিনি স্নেহময়ী জননী। তাই তাঁর নয়ন থেকে করুণাধারা সতত বর্ষিত হচ্ছে—"মায়ের স্নেহ-চক্ষে প্রেম-বক্ষে অমিয় ঝরে।" যুদ্ধে যখন তিনি অতি ভীষণা তখনও তাঁর আঁখি করুণায় ঢল ঢল। "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা"—হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা, মায়ের মধ্যে এই দুই ভাবের অপূর্ব সমন্বয়।

দেবীর বাহন সিংহ। সিংহ দুর্দান্ত শক্তিশালী পশু, রজোগুণের প্রতীক। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রজোগুণের মধ্যে রয়েছে এক প্রচণ্ড শক্তির উচ্ছ্বাস। এই শক্তি "সত্ত্বগুণের অনুগত হলে সেই শক্তি লোকস্থিতির সহায়ক হয়ে উঠে। সর্ব্বসত্ত্বময়ী দেবী মহামায়া অসুরের বিরুদ্ধে রজোগুণের প্রতীক সিংহকে স্বীয় পক্ষে রেখেছেন আপন নিয়ন্ত্রাধীনে। সিংহ… আসুরিকতা ও পাশবিকতার উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক দেবীর লোকস্থিতিমূলক পুণ্য কর্ম্মের সহায়কারী। …দেবী দুর্গার মহাপূজা ক'রে মহাশক্তি অর্জ্জন আমাদের পরম কাম্য। কিন্তু সত্ত্বগুণের প্রভূত অনুশীলনের দ্বারা সে মহাশক্তির সদুপযোগও শিক্ষা করা চাই। রজোগুণের প্রতীক সিংহকে আপন বাহনভুক্ত করে সর্ব্বসত্ত্বময়ী দেবী আমাদিগকে সে শিক্ষাই কি দিচ্ছেন না?"[২]

এর আর একটি দিকও আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে পশুশক্তি। পুরুষকার ও সাধন-ভজনের দ্বারা মানুষ যখন যথার্থ মনুষ্যত্বে উপনীত হয় তখন তার পশুভাব কেটে গিয়ে দেবভাব জাগ্রত হয়। আর তখনই সে প্রকৃত শরণাগত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে, সার্থক জীবনের অধিকারী হয়। দেবীর চরণ-তলে সিংহ এই ভাবেরই প্রতীক।

দেবীর সম্মুখে বাঁদিকে অসুর। অসুর অর্থাৎ সুরবিরোধী। দৈবশক্তির সঙ্গে আসুরিক শক্তির সংগ্রাম চিরকালের। এই সংগ্রাম বাইরে যেমন অনবরত চলছে, সেরূপ চলছে অন্তরেও, সাধকের সাধনার ক্ষেত্রে। সুতরাং এই অসুর মানুষের জীবনের নিত্য ঘটনারই প্রতীক। "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।/অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥"[৩]—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানতা—এগুলি আসুরিক সম্পদ। অপরপক্ষে অভীকতা, ব্যবহারকালে অচঞ্চল ও মিথ্যাকথন বর্জন, জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্যা,

১ শব্দকল্পদ্রুম, সংবৎ ১৯০২, ৩।১৬৬৬
২ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, স্বামী নির্ম্মলানন্দ, প্রণব মঠ, কলিকাতা ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২৪
৩ গীতা, ১৬।৪

সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, জীবে দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অসৎ চিন্তা ও কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, অবৈরী ভাব, অনভিমান—এগুলি দৈবী সম্পদ।[৪] সকল প্রকার উন্নতি ও কল্যাণের পথে আসুরিক ভাবগুলি অন্তরায়, অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। আসুরী ভাবগুলির প্রতিমূর্তি অসুর। তার প্রাণশক্তি প্রচুর, কিন্তু এই শক্তি অসৎ পথে চালিত। তাই তাকে শুভপথে আনবার জন্য, দৈবী সম্পদের অধিকারী করবার জন্য মায়ের এত চেষ্টা।

সাধকের পক্ষে অসুর অবিদ্যা। বিদ্যারূপিণী মা অবিদ্যা বিনাশ করে মহামুক্তির বিধান করেন। সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ভীতি, আপদ-বিপদ—এ-সকলই আসুরিক শক্তির কার্য। পরমকরুণাময়ী মা নিরন্তর অসুর বিনাশ করে সন্তানের কল্যাণ বিধান করছেন।

লক্ষ্মী বিকাশ বা অভ্যুদয়ের প্রতীক। "ধন, জ্ঞান এবং শীল—তিনেরই মহনীয় বিকাশ দেবী লক্ষ্মীর চরিত্রমাহাত্ম্যে। সর্বাত্মক বিকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেই তিনি কমলা। কমল বা পদ্মের ন্যায়ই তিনি সুন্দরী; তদীয় নেত্রদ্বয় পদ্মের ন্যায় আয়ত; তাঁর শুভ করে প্রস্ফুটিত পদ্মকুসুম; পদ্মবনেই তাঁর বসতি।"[৫]

পুরাণ অনুযায়ী লক্ষ্মী সমুদ্রসম্ভবা, সমুদ্রমন্থনে তাঁর উৎপত্তি। সমুদ্র রত্নাকর, মন্থন করলে রত্ন মিলবেই। বিশ্বপ্রকৃতিও একটি সমুদ্র। "যাঁহারা বিচক্ষণ তাঁহারা ভূমি-প্রকৃতি কর্ষণ করিয়া শস্যধন আহরণ করেন। বন-প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া ধন আহরণ করেন। খনি-প্রকৃতি খনন করিয়া স্বর্ণধন সংগ্রহ করেন। এই সকলই সাগর-মন্থন। ...এই সকল সাগর-মন্থনে ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর আবির্ভাব।"[৬]

কেবল টাকাকড়িই ধন নয়। চরিত্রধনই মানুষের মহাধন। যার টাকাকড়ি নেই সে যেমন লক্ষ্মীহীন, যার চরিত্রধন নেই সে তেমনি লক্ষ্মী-ছাড়া। যাঁরা সাধক তাঁরা লক্ষ্মীর আরাধনা করেন মুক্তিধন লাভের জন্য।

আবার লক্ষ্মী কথাটি যেমন এক অর্থে টাকা-কড়ি বোঝায়, তেমনি আর এক অর্থে মঙ্গলও বোঝায়। তাই লক্ষ্মী মঙ্গলেরও দেবী। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। টাকা ও মাটিতে যাতে তাঁর কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না, সমান জ্ঞান হয়, তার জন্য তিনি এক হাতে নিলেন টাকা আর অন্য হাতে নিলেন মাটি। তাঁর কথায়: "'টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি' এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন একটু ভয় হ'ল। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মী-ছাড়া হলুম!...তখন হাজরার মত পাটোয়ারী করলুম। বললুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো!"[৭] অর্থাৎ মঙ্গলময়ী হয়ে লক্ষ্মী তাঁর হৃদয়ে অবস্থান করুন—এই ভাব।

লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেঁচা দিবান্ধ। যাঁরা দিবান্ধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে অন্ধ, তাঁরাই পেচক-ধর্মী। মানুষ যতদিন পেচকধর্মী থাকে, ততদিন ধনধান্যাদি পার্থিব সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনা করে।

৪ ঐ, ১—৩

৫ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, পৃঃ ১৫৫

৬ মা দুর্গার কাঠামো, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মহাউদ্ধারণ মঠ, কলিকাতা, পৃঃ ৬

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৯।১৩।৪

পেঁচা যমের দূত। যম ধর্মরাজ। কাজেই যারা কুপথে চলবে, অধর্মের পথে যাবে, যমের দণ্ড তাঁদের মাথায় পড়বে।

আগেই বলা হয়েছে পেঁচা দিবান্ধ। রাত্রিতে যখন সকলে ঘুমায় পেঁচা তখন জাগ্রত থাকে। গীতায়[৮] আছে:

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যত মুনেঃ॥

—"ভোগীর পক্ষে যা রাত্রি, যোগীর পক্ষে তা দিন। ভোগীর যা দিন, যোগীর তা রাত্রি। ভোগী আধ্যাত্মিক বহুবিষয়ে ঘুমন্ত, বিষয়সম্ভোগে সজাগ। কিন্তু সংযতেন্দ্রিয় যোগী আত্মিক বিষয়ে সজাগ, বিষয় ভোগে উদাসীন অচেতনতুল্য।

"পেচক মুক্তিকামী সাধককে বলে, সকলে যখন ঘুমায় তুমি আমার মত জাগিয়া থাক। আর সকলে যখন জাগ্রত তখন তুমি আমার মত ঘুমাইতে শিখ, তবেই সাধনে সিদ্ধি কৈবল্যধন লাভ।

"পরমার্থধনাভিলাষী সাধক পেঁচার মত রাত্রি জাগিয়া সাধন করে। লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জ্জনে থাকে। লক্ষ্মীমার বাহনরূপে আসন লইয়া পেচকের যে ভাষণ তাহা বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রকার সাধকের উপাদেয় সম্পদ।"[৯]

গণেশ সিদ্ধির দেবতা। গণেশের পূজায়:

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ মোক্ষার্থী লভতে গতিম্॥

—বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন, পুত্রার্থী পুত্র এবং মোক্ষার্থী মোক্ষফল লাভ করে।

গণেশ একদিকে যেমন সিদ্ধির দেবতা, অপরদিকে তিনি গণদেবতাও বটে। গণশক্তি যেখানে ঐক্যবদ্ধ সেখানে কর্মের সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়। দেবাসুর যুদ্ধে দেবতারা যতবারই ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসুরদের সঙ্গে লড়াই করেছেন ততবারই তাঁরা জয়ী হয়েছেন। গণেশের আর এক নাম বিঘ্নেশ, অর্থাৎ বিঘ্ননাশকারী। বিঘ্নেশ প্রসন্ন থাকলে সিদ্ধি নিশ্চিত।

গণেশের বাহন ইঁদুর। "অথর্বশীর্ষের সায়নভাষ্যে উক্ত হইয়াছে 'মুষ্ণাতি অপহরতি কর্মফলানি ইতি মূষিকঃ'। জীবের কর্মফলসমূহ অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে বলিয়া ইহার নাম মূষিক। প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ কর্মফল বিদ্যমান থাকিতে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই, কর্মফল হরণের উপর সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত।"[১০]

আগেই বলা হয়েছে গণেশ সিদ্ধির দেবতা। তাঁর পূজায় মোক্ষার্থী মায়াজাল ছিন্ন করে অষ্টপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হন এবং ফলে মোক্ষফল লাভ করেন। দাঁত দিয়ে শক্ত জাল ছিন্ন করতে এবং অতি শক্ত দড়ি কাটতে ইঁদুরের জুড়ি আর নাই। ইঁদুর মায়াজাল ছিন্ন করবার অষ্টপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত করবার প্রতীক।

সরস্বতী বিদ্যাদায়িনী। তিনি মায়ের জ্ঞান-শক্তি। সরস্বতীর স্তবে আছে: যিনি কুন্দফুল, ইন্দু, তুষার ও মুক্তামালার ন্যায় শুভ্র, যিনি শ্বেত-বস্ত্রপরিহিতা, যাঁর হস্ত বীণার বরদণ্ডে শোভিত, যিনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্টা, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা সর্বদা বন্দিতা, সেই অশেষ জাড্যবিনাশকারিণী সরস্বতী আমায় রক্ষা করুন। সেই বীণা ও পুস্তকধারিণী মুরারিবল্লভা সর্বশুক্লা সরস্বতী আমার জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হোন।

সরস্বতী "বাণীরূপিণী বাগ্‌দেবতা। দেবীর

৮ গীতা, ২।৬৯

৯ মা দুর্গার কাঠামো, পৃঃ ৭

১০ সাধন সমর, ১ম ভাগ, ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেব, ৭ম সংস্করণ: পৃঃ ১৭৫—৭৬

হাতে পুস্তক ও বীণা। পুস্তক বেদ শব্দব্রহ্ম বীণা স্বরছন্দের প্রতীক নাদব্রহ্ম। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের মূর্তি, তাই সর্বশুক্লা। শ্বেতবর্ণটি প্রকাশাত্মক। সরস্বতী শুদ্ধ জ্ঞানময়ী প্রকাশস্বরূপা। জ্ঞানের সাধক হইতে হইলে সাধককে হইতে হইবে দেহে মনে প্রাণে শুভ্র-শুচি।"[১১]

সরস্বতীর বাহন হংস। "সরস্বতী—ব্রহ্মবিদ্যা। যে সাধক দিবারাত্র অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তিনিই হংসধর্মী। মানুষ সুস্থ শরীরে দিবারাত্র মধ্যে একুশ হাজার ছয়শত 'হংস' এই অজপা মন্ত্রজপ-রূপে শ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া থাকে। মানুষ যতদিন এই স্বাভাবিক জপ উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন 'হংসধর্মী' হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যারও সন্ধান পায় না।"[১২]

হাঁস জলে বাস করে কিন্তু তার গায়ে জল লাগে না। সেরূপ যাঁরা পরমহংস তাঁরা সংসারে বাস করেন বটে, কিন্তু সংসার তাঁদের ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। হাঁসের আর একটি বৈশিষ্ট্য—"হাঁসের সুমুখে দুধেজলে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে। আর হাঁসের গতি দেখেছো? একদিক দিয়ে সোজা চলে যাবে।"[১৩] মানুষও যখন বিবেকবলে অনিত্য সংসার থেকে নিত্য সার অংশটুকু গ্রহণ করতে সমর্থ হয়, গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে হয়, তখনই সে ব্রহ্মবিদ্যালাভে, ঈশ্বরদর্শনে কৃতকৃতার্থ হয়।

কার্তিকেয়ের প্রচলিত নাম কার্তিক। কার্তিক দেব-সেনাপতি, সৌন্দর্য ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। যুদ্ধে শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই সাধক-জীবনে এবং ব্যবহারিক-জীবনে কার্তিকেয়কে প্রসন্ন করতে পারলে শৌর্য-বীর্য আমাদের করতলায়ত্ত। কার্তিকেয়ের ধ্যানে আছে: যিনি দয়াদি অষ্টগুণবিশিষ্ট, ময়ূরের উপর উপবিষ্ট, যাঁর অঙ্গদীপ্তি তপ্ত কাঞ্চনবর্ণের ন্যায়, যিনি শক্তিহস্ত, বরপ্রদানকারী, দ্বিভুজ, শত্রুহন্তা, নানা অলঙ্কারে ভূষিত, প্রসন্নবদন, যিনি ছয়টি আননবিশিষ্ট এবং যিনি উত্তম সন্তানদানকারী—তাঁর ধ্যান করি।

কার্তিকেয়ের বাহন ময়ূর। সৌন্দর্য ও বীর্য—কার্তিকেয়ের চরিত্রে এই দুই ভাবই বিদ্যমান। তাঁর বাহন ময়ূরের মধ্যেও রয়েছে এই দুই ভাব। ময়ূর অনলস, কর্মকৌশলী, নারীরক্ষক, মহোদ্যমী, বিষাক্তভক্ষক, স্বজনপ্রীতিমান, সৌন্দর্যশালী।

"নিজ নিজ সংসার-রাজ্য-মধ্যে প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র নেতা বা কর্তা। সংসারের প্রত্যেক কর্তারই ময়ূরের গুণগুলি গ্রহণীয়। ময়ূরের মত অনলস, কর্মকৌশলী, নারীরক্ষায় মহোদ্যমী বিষাক্ত-ভক্ষক, স্বজন-প্রীতিমান অথচ সৌন্দর্য্যশালী আর কোন্ প্রাণী আছে যাহাকে সেনাপতি কার্তিক নিজ বাহনরূপে বরণ করবেন?"[১৪]

সন্তান প্রতিনিয়ত মায়ের কাছে প্রার্থনা করছে:

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি
দ্বিষো জহি ॥[১৫]

—হে দেবি, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যাবান্, যশস্বী এবং শ্রীমান্ কর। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং শত্রু নাশ কর। মা-দুর্গা স্বয়ং সমস্ত শক্তির আধার, সর্বশক্তির ঘনীভূতা মূর্তি সর্বশক্তি-

১১ মা দুর্গার কাঠামো, পৃঃ ১১
১২ সাধন সমর, পৃঃ ১৭৬
১৩ কথামৃত, ৫।পরিশিষ্ট—ক।২
১৪ মা দুর্গার কাঠামো, পৃঃ ১৫
১৫ চণ্ডী, অর্গলাস্তোত্র ১৭

স্বরূপিণী। তিনি পরিবৃতা হয়ে রয়েছেন সর্বাত্মক বিকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, শৌর্য-বীর্যের প্রতীক কার্তিক এবং সর্ব-বিঘ্নবিনাশকারী সিদ্ধিদাতা গণেশের দ্বারা। কাজেই তাঁকে যে প্রসন্ন করতে পারবে বিদ্যা, যশ, শ্রী—সকলই যে তাঁর করতলগত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই মায়ের কাছে সকাতরে আমরা প্রার্থনা জানাই:

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥[১৬]

—হে ভক্ত-দুঃখ-হারিণি দেবি, আপনি প্রসন্না হোন, হে দেবি, আপনি চরাচর জগতের অধীশ্বরী। হে নিখিলবিশ্বজননি, আপনি প্রসন্না হোন, হে বিশ্বেশ্বরি, আপনি প্রসন্না হয়ে বিশ্ব পালন করুন।

১৬ ঐ, ১১।৩

# চণ্ডীতে মায়ের নিজমুখের কথা

## স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মায়ের কথা পড়িলে মন পুলকিত হয়, শুনিলে প্রাণ নাচিয়া উঠে, ভাবিলে হৃদয় স্তব্ধ হয়। মা কত সময় কত ভাবে—কত শ্রোতাকে তাঁহার কথা শুনাইয়াছেন। সৃষ্টির প্রথম হইতেই তাঁহার কথা বলা শুরু। অবিশ্রান্ত কথা। কখনও মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি, কখনও হাসিতে ভরা বাক্য-লহরী,—কখনও বা মেঘ-মন্দ্র রুদ্র গর্জন—কিন্তু সবই লালিত্যে পূর্ণ, কেননা উহারা যে মায়ের কথা। মায়ের এক নাম ললিতা। তিনি মুখ খুলিলেই মধু ঝরিয়া পড়ে।

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাকের মুখে মায়ের কথা: "যার শ্রদ্ধা আছে শোন, বলিতেছি। আমি সামান্য মেয়ে নই। একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, আরও কত ছোট বড় দেবতার কার্যকলাপ তেজ বীর্যের কথা শুনিয়াছ, কিন্তু আমিই যে পিছনে থাকিয়া তাঁহাদের চালাই তাহা জানো কি? আমিই যজ্ঞের ফল দান করি। আমারই উদ্দেশে সকল যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্তে কাহাকেও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি করিতে পারি। স্বয়ং রুদ্রের দৈত্যদলন আমারই শক্তিতে। আমি ভুবন গগন ছাইয়া আছি, পলকে বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারি। আমি পর-ব্রহ্মের শক্তি সর্বজননী সর্ব পালিনী মহামায়া। আমাকে মনে রাখিও।" (দেবীসূক্ত)

দেবতারা বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন। অসুরদের অধিপতি মহিষাসুরের সঙ্গে একশত বৎসর যুদ্ধ করিয়াও তাহাকে নিরস্ত করিতে তো পারিলেনই না, পরন্তু সেই অসুররাজ তাঁহাদিগকে স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া চরম লাঞ্ছিত করিয়াছে। দেবতারা শিব এবং বিষ্ণুর নিকট গিয়া কাঁদিয়া নিজেদের দুর্দশার কথা বলিলেন। রুদ্র এবং মধুসূদন মহিষাসুরের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। বিষ্ণুর বদন হইতে মহৎ তেজ নির্গত হইল, রুদ্রের এবং ব্রহ্মার কোপাগ্নিও তাহার সহিত মিলিল। ইন্দ্রাদি দেবতাদের শরীর নিঃসৃত তেজও উহার সহিত যুক্ত হইল। এই সম্মিলিত অতুলনীয় তেজোরাশি একটি জলন্ত পর্বতের মতো দেখাইতে লাগিল। অবশেষে উহা একটি নারীর রূপ লইল—মহাশক্তিময়ী মা। মায়ের এমন মূর্তি কখন কেহ দেখে নাই, ভাবেও নাই।

তখন দেবতারা নানা অলঙ্কার আভরণ এবং

অস্ত্রশস্ত্রে দেবীকে সজ্জিত করিলেন। শিব দিলেন শূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র। বাহন সিংহ আসিল হিমালয় হইতে। সিংহবাহিনী আসন্ন সংগ্রামকে যেন আহ্বান করিয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। সকল লোক কাঁপিয়া উঠিল। মহিষাসুরের সহিত দেবীর ঘোর যুদ্ধের কাহিনী চণ্ডীতে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অসংখ্য অসুর সৈন্য এবং সেনাপতিরা দেবীর হাতে বিধ্বস্ত হইলে মহিষাসুর নিজে যুদ্ধ করিতে আসিল। যত আসুরী কলা-কৌশল ও মায়া আছে সব প্রয়োগ করিয়াও দেবীকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া বলবীর্য মদোদ্ধত অসুর গর্জন করিতে করিতে শৃঙ্গদ্বয়ে পর্বত উপড়াইয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রণময়ী মাতা চণ্ডিকা তখন মুখ খুলিলেন। মায়ের ভৎ'সনা—

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥

—"যত পার গর্জন কর নির্বোধ। দেখ, এই আমি মধু পান করিতেছি। তোমার অন্তিমকাল আসিয়াছে। তোমাকে এইবার বিনাশ করিব। তাহার পর দেবতাদের জয়ধ্বনি গগনমণ্ডলে প্রধ্বনিত হইবে।" (চণ্ডী, ৩।৩৮) মাহিষাসুর মরিল। দেবতারা মহিষাসুরমর্দিনী জগদম্বার স্তুতি করিলেন—'শক্রাদয়ঃ' ইত্যাদি—

স্তবে সন্তুষ্টা মায়ের আশীর্বাদ—

"তোমাদের বাঞ্ছিত কিছু যদি থাকে তো চাও। অত্যন্ত খুশি মনে পূরণ করিব।"

দেবগণ কহিলেন, হে ভগবতী আপনি আমাদের ঘোর শত্রু মহিষাসুরকে নিধন করিয়া দিলেন। আর তো কিছু অবশিষ্ট নাই। তবে বর দিতে চাহিতেছেন, এই প্রার্থনা যে যখন আমরা বিপদে পড়িয়া আপনাকে স্মরণ করিব তখন যেন সাড়া পাই। আর মর্ত্যলোকে যে-মানুষ আমাদের কৃত এই স্তব পাঠ করিয়া তোমার উপাসনা করিবে তাহার যেন সর্ববিধ মঙ্গল হয়।

দেবী বলিলেন, 'তথাস্তু'—তাহাই হইবে।

ইহার পরে মায়ের নিজমুখের কথা শুনিতে পাই চণ্ডীর উত্তর চরিতে। দেবতারা আবার বিপদে পড়িয়াছেন; শুম্ভ-নিশুম্ভ দুই দৈত্য-ভাই স্বর্গ আক্রমণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের দুর্দশার আর অন্ত নাই। মায়ের কথা মনে পড়িল। মাতা অপরাজিতা তো বলিয়াছিলেন তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি আসিয়া আমাদের সঙ্কট ত্রাণ করিবেন। তখন সকলে হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়াইয়া ভগবতী বিষ্ণুমায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। "নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ" ইত্যাদি। (চণ্ডী, ৫।৯)

এই অবসরে একটি বালিকা পাহাড়ের শিলার উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে গঙ্গা তটে উপস্থিত। বালিকা হিমালয় কন্যা পার্বতী। স্নানের জন্য আসিয়াছে, দেবতাদের ডাকিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তোমরা কার স্তুতি করছ?"

বালিকার শরীর হইতে শিবগেহিনী মহামায়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "আমাকেই এরা বিপদে পড়ে ডাকছে।" এই বলিয়া দেবী অম্বিকা অতি মনোহর রূপ ধরিয়া পর্বতের একটি শিখরে গিয়া বসিলেন। দৈত্যরাজ শুম্ভের দুই ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড ঐ অঞ্চলে টহল দিতে দিয়াছিল। দেবীর রূপ দেখিয়া তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া শুম্ভরাজকে মনোহারিণীর কথা জানাইল। বলিল, মহারাজ, এই স্ত্রীরত্নকে অধিকার না করিলে আপনার যত কিছু জয় সবই অর্থহীন। শুম্ভরাজ শুনিয়া দূত সুগ্রীবকে পাঠাইলেন। সুন্দরীকে আমার বল-বিক্রম এবং ঐশ্বর্যের কথা বলিয়া আমাকে বা ভাই নিশুম্ভকে যেন বিবাহ করিতে সম্মতা হন। সুগ্রীব দেবী

যেখানে উপবিষ্টা ছিলেন সেখানে গিয়া দৈত্য-রাজের প্রস্তাব নিবেদন করিল।

যিনি সমস্ত বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন সেই মঙ্গলময়ী ভগবতী দুর্গা দূতের কথা শুনিয়া অন্তরে হাসিয়া কিন্তু বাহিরে গম্ভীর ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি যা বললে তা অতি সত্য। শুম্ভ নিশুম্ভ এখন ত্রৈলোক্যাধিপতি সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কাছে পরিণয়ের জন্য যাওয়ার আমার একটি বাধা আছে। অল্প বুদ্ধি বলে আমি আগে একটি প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলাম যে, যিনি যুদ্ধে আমাকে হারিয়ে আমার দর্প চূর্ণ করতে পারবেন তিনিই আমার স্বামী হবেন। এ-প্রতিজ্ঞা তো আমি মিথ্যা করতে পারি না। অতএব দুই ভাই-এর যে কোনও এক জন এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন এবং আমাকে পরাজিত করে আমার পাণিগ্রহণ করুন।"

দূত রুষ্ট স্বরে বলিল, "এ কি বলছেন, দেবি! সকল দেব-দানবের মধ্যে এমন সাহস কার আছে যে শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আপনি তো অবলা স্ত্রীলোক এবং একাকিনী। অতএব নেমে আসুন এবং মহারাজের কাছে স্বেচ্ছায় চলুন। নতুবা কেশাকর্ষণ করে সবলে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। সেটা কি আপনার পক্ষে গৌরবকর?"

কৌতুকময়ী বলিলেন, "হ্যাঁ, দৈত্যরাজের বল-বিক্রম তো আশ্চর্যই বটে। তবে আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙতে পারি না। তুমি যাও, অসুরেন্দ্রকে গিয়ে যা বললাম তা জানাও। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা তাই করুন।"

তাহার পর পর ঘটনা—শুম্ভরাজের দারুণ ক্রোধ। বহু অসুরসৈন্যসহ দৈত্য ধূম্রলোচনকে প্রেরণ, ধূম্রলোচনের দেবীকে কড়া স্বরে হুমকি "শীঘ্র পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নেমে আমার প্রভুর কাছে চল। নতুবা তোমাকে কেশাকর্ষণ বিহ্বলা করে নিয়ে যাব।"

দেবীর উক্তি—"দৈত্যেশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন অনেক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে। বেশ তো—যদি পার তো আমাকে নিয়ে যাও।"

ধূম্রলোচনের সবেগে দেবীর প্রতি লম্ফন। দেবীর একটি হুঙ্কার। ধূম্রলোচনের ভস্মে পরিণতি। তৎপরে চণ্ড মুণ্ড বধ, রক্তবীজের সহিত যুদ্ধ, দেবীর শরীর হইতে অষ্ট মহাশক্তির আবির্ভাব—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী এবং চণ্ডিকা (শিবদূতী)।

রক্তবীজ নিহত হইলে নিশুম্ভ যুদ্ধ করিতে আসিল। মাতা অম্বিকা এবং তাঁহার মহাশক্তিগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। নিশুম্ভ মরিল। তখন দৈত্যরাজ শুম্ভ স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত। ব্যঙ্গ করিয়া জগজ্জননীকে বলিল, "দুষ্টে, অপরের শক্তি ধার করে যুদ্ধ করছো, এতে তোমার কিসের গর্ব?"

সর্বময়ী মায়ের প্রত্যুত্তর,—"ওরে দুষ্ট, আমি ছাড়া জগতে আর দ্বিতীয়া কে আছে?" দেখ, আমারই শক্তি যা নানা রূপে আমা থেকে বাইরে এসেছিল—তাদের আমি নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিলাম।" বিস্মিত শুম্ভ দেখিল সত্যই তো দেবী একাকিনী। কিন্তু নিশ্চিত পরিণাম জানিয়াও মোহান্ধ অসুর পিছাইল না। সেই একাকিনী জগন্মাতার সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। নানাভাবে অসুরকে খেলাইয়া অবশেষে ক্রীড়াময়ী মা ভুবনেশ্বরী তাহার বুকে মহাশূল বিদ্ধ করিলেন।

অসুরের প্রাণহীন বিরাট দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। "সাব্ধিদ্বীপা সপর্বতা" ধারা পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।

শুম্ভ-নিশুম্ভের উৎপাতে ত্রিলোকে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন শান্ত। কৃতজ্ঞ দেবতারা "দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ"—

বলিয়া গম্ভীর সুমিষ্ট স্তব করিতে লাগিলেন। প্রসন্না দেবী কহিলেন, "আমি বর দিব, জগতের উপকারক এমন কিছু বর প্রার্থনা কর।"

দেবতারা বলিলেন, "হে অখিলেশ্বরি, আসুর শক্তির প্রভাবে ত্রিলোক্যের মহৎ বিপদ যখনই উপস্থিত হইবে তখন তুমি সেই সব বাধা দূর করিও।"

জগন্মাতার মুখনিঃসৃত অভয় বাণী :

"হাঁ, তাহাই করিব। বার বার জন্ম নিব ভক্তের সঙ্কট মোচন করিতে। বহুকাল পরে এই শুম্ভ-নিশুম্ভই আবার দুই মহাসুর রূপে আসিবে। তখন নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মিয়া উহাদের বিনাশ করিব।"

দেবী বলিয়া চলিলেন এইরূপ আরও কতকগুলি ভবিষ্যৎ আবির্ভাবের কথা। মানুষের পৃথক পৃথক দারুণ সঙ্কট এবং সঙ্কটমোচনী মহামায়ার নানা নামে নানা রূপে নানা কীর্তিতে সেই ব্যাপক বিপদরাশি দূর করিবার বিবরণ। একবার তাঁর নাম হইবে 'রক্তদন্তিকা', আর একবার 'শতাক্ষী'। আবার 'শাকম্ভরী', 'দুর্গা', ভীমাদেবী, ভ্রামরী।

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

( চণ্ডী, ১১।৫৫ )

—"এই ভাবে যখনি যখনি দানবের অত্যাচার ঘটিবে তখনি তখনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া আমি সেই দানবদের নাশ করিব।"

মেধস মুনির কাছে বহু লাঞ্ছিত একান্ত শোক প্রাপ্ত রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি দেবীর চরিতাবলী শুনিয়া বিস্ময়স্তব্ধ হইলেন। মুনি বলিলেন, "তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীং। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥" ( চণ্ডী, ১৩।৫ )

—"হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর শরণ লও। তিনি আরাধিতা হইলে ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তিও দিতে পারেন।"

সমান দুঃখগ্রস্ত অকালের দুই মিতা রাজা ও বৈশ্য আশায় বুক বাঁধিয়া সর্বদুঃখহারিণী মহামায়ার দর্শন লাভের জন্য নদী তীরে তপস্যায় লাগিয়া গেলেন। তিন বৎসর জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ, তর্পণাদি অনবচ্ছিন্ন অনুরাগে অনুষ্ঠিত হইলে দেবী দর্শন দিলেন।

"আমি পরিতুষ্টা, যাহা চাও তাহা পাইবে। বল।" সুরথ বলিলেন, "এই জন্মে শত্রুরা আমার যে রাজ্য অধিকার করিয়াছে তাহা যেন ফিরিয়া পাই। আর অন্য জন্মে চাই এক বহুকাল স্থায়ী সাম্রাজ্য।" দেবী কহিলেন, "শীঘ্রই তুমি নিজরাজ্য ফিরিয়া পাইবে। আর মৃত্যুর পর তুমি সাবর্ণি মনু হইয়া জন্মিবে—সারা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে।"

দেবীর দর্শন লাভ করিয়া বৈশ্যের পরম নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "হে পরমেশ্বরী, ভব সংসারের কোনও ভোগ-সুখে আমার আর আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি যেন সর্বমুক্তিদায়ী আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি।"

মায়ের আশীর্বাদ,—"তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি—"
"হাঁ, বৎস, তোমার জ্ঞান হইবে।"

বৈশ্যের উপর বর্ষিত মায়ের এই আশীর্বাদ আমাদের সকলের জন্যই রহিয়াছে। আমরা যদি বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি বিশ্বাস লইয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহার আরাধনা করি তাহা হইলে তাঁহার এই অভয় আশীর্বাণী আমরাও শুনিতে পাইব এবং মহামায়ার কৃপায় আমাদেরও সংসার-দুঃস্বপ্ন ঘুচিয়া গিয়া জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। জয় মা॥

# জাতীয় সংহতির সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায়

শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী

দেশ মানে দেশের মানুষ। দেশের সংহতি মানে সেই মানুষেরই সংহতি। কোন দেশের সঙ্কটে ও গৌরবে সেই দেশের মানুষ সংহত হয়, ঐক্যবদ্ধ হয়। তবে সেটা নিতান্তই সাময়িক। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে লালচীন যখন ভারতকে অতর্কিতে এবং বন্ধুত্বের আড়াল থেকে আক্রমণ করেছিল, তখন সেই চরম অপ্রত্যাশিত আক্রমণের বিরুদ্ধে আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ একাত্ম হয়ে উঠেছিল। আবার ক্রিকেটের বিশ্ব-কাপ যখন ভারত জয় করল, তখন গৌরবে ও গর্বে উল্লসিত দেশ এবং জাতি একাত্ম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই দু'টি ক্ষেত্রেই একাত্মতা ছিল সাময়িক, সংহতির ভিত্তিটি ছিল অস্থায়ী।

আসলে আমরা সন্ধান করছি স্থায়ী সংহতির সূত্রটি। এই যে খণ্ডিত ভারতভূমি—যেটা কিনা আজ "ইণ্ডিয়া—দ্যাট ইজ ভারত"—সেই ৭০ কোটি মানুষের বাসভূমিটি বহুভাষা, বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতি এবং বহু খণ্ডজাতির লীলা-ভূমি। স্বাধীনতা লাভ করার পর দেখতে দেখতে ৪০ বছর অতিক্রান্ত, শিশুরাষ্ট্র আজ যৌবনে উত্তীর্ণ, কিন্তু জাতীয় সংহতির প্রতিমাটি এরই মধ্যে বারবার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, হয়েছে কালিমালিপ্ত। তাই, প্রশ্ন দেখা দিয়েছে : আমরা কোথায় চলেছি? ঐক্যবদ্ধ এবং সংহত ভারত-বর্ষের ছবিটি আর কতকাল পরে দেখা যাবে?

জাতীয় সংহতির শত্রুরূপে আজ চিহ্নিত হয়েছে, 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' এবং 'শ্রেণীগত স্বার্থপরতা।' এই দু'টি বিষয়কে অনুধাবন করার আগে আমাদের কয়েকটি ঘটনাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। প্রথমতঃ, ভারতের স্বাধীনতালাভের ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ নিহিত ছিল। এই উপ-মহাদেশে দ্বিজাতিত্বের প্রেতাত্মাকে জাগিয়ে দিয়ে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। আর এই দ্বিজাতিত্বের ধারণা এবং ধারণার ভাববাহী হিংসাশ্রয়ী রাজনীতিকে আমরা প্রত্যক্ষভাবেই সেদিন মেনে নিয়েছিলাম। সেদিন যে বিষবৃক্ষ আমরা রোপণ করেছিলাম, আজ নানারূপে এবং নানাবেশে তারই বিষফল-গুলি ফলতে শুরু করেছে।

অথচ একটু স্মরণ করলেই দেখব, এই সমস্যা এবং সঙ্কটের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বামী বিবেকানন্দই ভারতের প্রথম সত্যদ্রষ্টা ঋষি, যিনি প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতাকে বিসর্জন দিয়ে এক অখণ্ড ভারতের রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনিই প্রথম 'ভারতবাসী' বলে এই বিশাল জনচিত্তকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর আগে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বন্দে মাতরম্' গানে 'সপ্ত কোটি' বাঙালীর অস্তিত্বকে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তিনি গোটা দেশের জনসমষ্টিকে প্রত্যক্ষ করেননি। গোটা ভারতের অখণ্ড মানবিক ও আত্মিক অস্তিত্বের কথা স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম সন্দেহাতীতভাবে তুলে ধরেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের রাজনৈতিক সংহতির ক্ষেত্রটি যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি ঐ শাসনের কু-ফলেই আমাদের বহু ভাষা ও বহু ধর্মের দেশে স্বার্থগত দ্বন্দ্বের ভিত্তিভূমিটিও অনিবার্যভাবেই রচিত হয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে ভাবসূত্রটি এদেশে হাজার হাজার বছর নিহিত ছিল, ইংরেজ দু'শ বছরের শাসনে সেটাকে 'ডিভাইড এণ্ড রুলে'র

বিষাক্ত দংশনে ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাক্ত করে ছেড়েছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, "ইতিহাস ইংরেজের কৃত কার্যের প্রতিশোধ নেবেই। আমাদের গ্রামে গ্রামে—দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে, আমাদের শেষ রক্তটুকু তারা নিজ-তৃপ্তির জন্য পান ক'রে নিয়েছে, আর আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে।" ( স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০।২৩৮ )

তৃতীয়তঃ, স্বাধীন ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত হওয়ায় সকলে মিলে এই দেশ—এমন ধারণাটি খণ্ডিত হল। বরং, দেশের স্থান বিচার্য হল স্বীয় গোষ্ঠীর স্বার্থ পূরণের মানদণ্ডে। ফলে দুর্বল আদিবাসী গোষ্ঠী, পার্বত্য উপজাতি গোষ্ঠী এবং ভাষাগত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলির তুলনায় হীনম্মন্যতার শিকার হল। তার উপর আবার বিদেশী মিশনারি এবং বৈদেশিক শক্তি নানাভাবে বিচ্ছিন্নতার বীজ ছড়িয়ে দিল বিভিন্ন প্রান্তে।

চতুর্থতঃ, স্বামীজীর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে বিভেদের এবং বিচ্ছিন্নতার মৌল কারণগুলি যথাযথভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তাই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিস্তারের ফলে ভারতীয় সমাজে শিক্ষিত উচ্চ বা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট ভাবগত ব্যবধান ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতি তিনি সমকাল এবং ভাবীকালের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন, "যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !!"

( ঐ, ৬।২৪৮ )

পঞ্চমতঃ, স্বামীজী মিশনারিদের বিজাতীয় ভূমিকা এবং পাশ্চাত্যের কিছু কিছু মানুষের ভারতবিরোধী মানসিকতা সম্পর্কেও ছিলেন সচেতন। তাঁদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেই যেন স্বামীজী বলেছেন, "আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ নীচজাতি, উহারা অনার্যজাতি !! উহারা আর আমাদের নহে !!!" ( ঐ, ৬।২৪৯ ) এই শিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি ভারতবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে কম্বুকণ্ঠে বলেছেন, "হে ভারত··· ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই !" ( ঐ )

২

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা, চেতনা এবং আদর্শের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারাই লক্ষ্য করেছেন, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজী একান্তভাবেই ছিলেন ভারত-প্রেমিক। তাঁর এই প্রেম ছিল অনন্ত এবং আপসহীন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে জননীরূপে আমাদের সামনে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর স্বামীজী দেশ-জননীকেই 'একমাত্র আরাধ্যা' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও স্মরণীয়। স্বামীজী ইতিহাস বা ভূগোলের পৃষ্ঠা থেকে ভারতবর্ষকে চেনেননি, চিনেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে। পরিব্রাজকরূপে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ করেছেন, রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রতম মানুষের কুটির পর্যন্ত ছিল তাঁর অবাধ গতিবিধি। তিনি মানুষের সঙ্গে অন্তর মিলিয়েই মানুষকে দেখেছেন, আর সেইজন্যই ভারত আত্মার সত্যরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

তাই জাতীয় সংহতির সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ হিসেবে যখন আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে

অনুসরণ করি, তখন দেখি, তিনি এই সঙ্কটের মোকাবিলা করেছেন দুইদিক থেকে। প্রথমতঃ, এই সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ হিসেবে তিনি ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং মহিমার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ, ভারতের প্রতি জাগ্রত শ্রদ্ধাবোধ এবং ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রতি অখণ্ড আনুগত্যবোধ জাতিকে আত্মিক নৈকট্যে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি বিচ্ছিন্নতাবোধের উৎস এবং কারণগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির প্রতিবিধান এবং প্রতিরোধের সূত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আমরা প্রথমেই এই দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করব। তাতে সঙ্কট এবং সমস্যার স্বরূপটা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

ভারতে আজ যে-সব সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে তার অন্যতম হল বিভিন্ন 'স্থানে'র দাবি। এর মধ্যে ভাষাগত প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনি আছে ধর্ম, গোষ্ঠী এবং বিদেশী প্রভাবসঞ্জাত প্রশ্নও।

ইংরেজশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পর এখন দেশজুড়ে একটা বিরাট সংযোগের জাল তৈরি হয়েছে—যার প্রধান মাধ্যম দূরদর্শন এবং বেতার। আর গৌণ মাধ্যম সংবাদপত্র। দূরদর্শন ও বেতার নিরক্ষর মানুষের কাছেও পৌঁছতে পারে, কিন্তু সংবাদপত্র পারে না। এর ফলে একদিকে যেমন হিন্দি ভাষা ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের মানুষ ভারতীয় জীবনধারার মূলস্রোতের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যেতে শুরু করল, অপরদিকে কোন বিশেষ ভাষা বা অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রশ্নটি কোথাও কোথাও চরম আকার ধারণ করল। এখানেই দেখা দিল সঙ্কট।

বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়ে মহাজাতি গড়ে তোলার দুটি উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। প্রথমটি ধনতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়টি সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত রাশিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এক রাষ্ট্র এবং এক সত্তায় পরিণত করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল, প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বার বার রক্তপাতের। দক্ষিণাঞ্চলকে একীকরণ করার ইতিহাস আজ সকলেরই জানা। তবে সে-দেশে ডাচ,বৃটিশ, ফরাসী, ইহুদি ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়ে মার্কিন সংস্কৃতির রূপরেখা তৈরি করা হলেও শেষপর্যন্ত সেটা সুস্থ ও অনুকরণীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়নি।

অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ায় একদলীয় শাসনের সুবাদে বহুজাতির অস্তিত্বকে অতি সহজেই বিলীন করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রের নির্দেশই শেষ কথা। ফলে রেজিমেন্টেশন বা রোলার চালিয়ে সবকিছুকে সমান করার ঘটনাটাই সেখানে ঘটেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা সোভিয়েত রাশিয়ার পথ অবলম্বন করে ভারতে সংহতিসাধন সম্ভব বা কাম্য—কোনটাই নয়। এখানে ভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে বাঁচিয়ে রেখেই মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

মানুষের দুই সত্তা,—একটি হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষ, অন্যটি হচ্ছে সামাজিক-মানুষ। স্বামীজী দেখালেন, মানুষের এই দুটি সত্তাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে এবং এই দুই সত্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই সংহতির প্রতিমাটিকে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা যায়। স্বামীজী বলছেন, "স্বার্থই স্বার্থ-ত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত।" (ঐ, ৬।২৪৩) আবার তিনি বলছেন, "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ,

সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য।" ( ঐ, ৬।২৩৮) বলছেন, "যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোশ্যালিজম্, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইণ্ডিভিজুয়ালিজম।" ( ঐ, ৮।১৬৭) প্রকৃতপক্ষে তিনি যেমন সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেও অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। এই দুইয়ের সমন্বয়েই আদর্শ সমাজের কথা কল্পনা করেছেন

তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম দেশের সাধারণ মানুষকে, শ্রমজীবী মানুষকে জাতীয় উন্নতি তথা সংহতির প্রশ্নে সম্মানের আসনে বসিয়ে বলেছেন: "সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, তুমি আমি দশ জন বড় জাত !!!" ( ঐ, ৮।২৪ ) একটা জাতি বা জনসমাজ সংহত শক্তিতে এগিয়ে চলে, গতিশীল হয়, টিকে থাকে এবং নতুন নতুন রূপ ও চেতনায় পরিবর্তিত হয় অন্তঃশক্তির প্রেরণায়। সঙ্কটে বা শান্তিতে সমাজকে ধরে রাখে সেই অন্তঃশক্তি—যেটা ভারতবর্ষকে ধরে রেখেছে পাঁচ হাজার বছর ব্যাপী এক দীর্ঘ পথ। সেই জন্যই দেখা যায়, স্থিতি বা গতির ধারণাদুটি তত্ত্বগতভাবে পরস্পর-বিরোধী হলেও, বাস্তবপ্রয়োগের ক্ষেত্রে পরস্পর-সম্পর্কিত। স্বামীজী একজন সমন্বয়ী সমাজ-বিজ্ঞানীর মতোই সেই সূত্রটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

শুধু এই স্থিতিশীলতা কিংবা গতিশীলতার শক্তিতেই একটা জাতি সংহত হতে পারে না। আর জাতি যদি সংহত না হয়, তাহলে তার পক্ষে বড় হওয়াও সম্ভব নয়। তাই স্বামীজী বলছেন, "বড় হইতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন: (১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস, (২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব, (৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগের সহায়তা।" ( ঐ, ৬।৩৯৬ )

অথচ আমরা দেখি, ঐ বাস্তব সত্যকে বিপন্ন করতে ভারতীয় সংহতি এবং ঐক্যবোধের মূলে বারবার আঘাত করেছে গোষ্ঠীচেতনা। ধর্মের মাধ্যমে পাঞ্জাব, ভাষার মাধ্যমে আসাম, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীচেতনায় ঝাড়খণ্ড বা ত্রিপুরী অথবা নেপালী, সাংস্কৃতিক চেতনায় নাগারা এবং বৈদেশিক প্ররোচনায় উর্দুস্তানের দাবিদাররা তারই প্রমাণ। এই গোষ্ঠীগত চেতনাই কখনও প্রাদেশিকতা, কখনও সাম্প্রদায়িকতা বা কখনও আঞ্চলিকতার প্রেতাত্মাকে জাগিয়ে তুলেছে।

দুঃখের বিষয় এদেশের সর্বভারতীয় রাজ-নৈতিক দলগুলিও সুযোগ ও সুবিধামতো ভাষা-গত, ধর্মগত বা সংস্কৃতিগত সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করতে দ্বিধা করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্ররোচিতও করে।

ভারতীয় ধর্মনায়করা কোনদিন কোন সাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের সঙ্কীর্ণতায় নিজেদের আবদ্ধ করেননি। নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত তাঁরা সকলেই মানুষকেই ভালবেসেছিলেন, সম্প্রদায়কে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মসমন্বয়ের সূত্রটি তুলে ধরলেন বিশ্ববাসীর কাছে এবং বিভিন্ন ধর্মের মৌল সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন স্বীয় জীবন সাধনায়। তিনি এক অনন্ত পথের দিশারী। আর তাঁরই পূর্ণায়ত প্রকাশ ঘটেছে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। তাই, ভারতীয় গণজীবনের সত্যরূপটি তাঁর দৃষ্টিতেই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। বৈচিত্র্যের মধ্যে

ঐক্যের ফল্গুধারাটি তিনিই প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঋষির দৃষ্টিতে।

এ-প্রসঙ্গে একটা সত্য অবশ্যই স্মরণীয় এবং সেটা হচ্ছে এই যে, একটি দেশে একটি বিশেষ ধর্মের জনসংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও সেই দেশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে গ্রহণ করেছেন—এমন উদাহরণ ভারত ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এই বিশ্বে একমাত্র ভারতই দ্বিজাতিতত্ত্বের দংশনে ক্ষতবিক্ষত ও খণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে। এর নেপথ্যে আছে ভারতীয় ধর্মনায়কদের শিক্ষা এবং প্রেরণা, আছে পাঁচ-হাজার বছরের উদার জীবনবোধ। সেটাই ভারতের প্রাণশক্তি।

এ-কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন: "সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।" (ঐ, ৫।৩৭৬)

৩

স্বামীজী ভারতের প্রাচীন গৌরবের ইতিবৃত্ত নতুন করে দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন সংহতির ভিত্তিভূমিটি সার্বিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য। তিনি জানতেন, দেশের ঐতিহ্য এবং অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে জাতি কখনও আত্মমর্যাদায় গৌরবে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় না। তাই তিনি বলছেন, "যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে,—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে…মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।" (ঐ, ৫।৩)

স্বামীজী এক ঐতিহাসিক লগ্নে দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "ভারত পুণ্যভূমি ও কর্মভূমি। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

"অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম—সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে…বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে প্লাবিত করিবে।" (ঐ, ৫।৩-৪)

স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত সেই স্বদেশমন্ত্রে হীনমন্যতায় আক্রান্ত জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?" (ঐ,

৬।২৪৯ ) তিনি বুঝেছিলেন, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমেই জাতীয় সংহতির অনুভবটি সুস্থিত হতে পারে। আর একমাত্র জাতীয় ঐতিহ্যে গৌরববোধই সেই স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি এনে দিতে পারে।

তিনিই প্রথম সংহতির ক্ষেত্রটিকে বৃহত্তর এবং সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিকায় স্থাপন করে ডাক দিলেন, "ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!" (ঐ,) জাতি যে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত, সে-কথা এর আগে অন্য কোন জাতীয়তাবাদীর কণ্ঠেও শোনা যায়নি। লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ যেমনি বৃহত্তর জাতীয় সংহতির প্রশ্নে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন, তেমনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সার্থক মিলন ঘটাতেও প্রয়াসী হয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনিই সম্ভবত পথিকৃৎ।

৪

স্বামী বিবেকানন্দ যে-মহান জাতীয়তাবাদের জনক, সেখানে কোন সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতার স্থান নেই। তিনি বলেছেন, "বর্তমানকালে ইউরোপখণ্ডে জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্ছে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ।" (ঐ, ৬।১৩২)

সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির ঐক্য এবং তার ফলশ্রুতি ঐ ঐক্যের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র গঠনের দাবি, তার পরিণাম যে যুদ্ধ ও এক রাষ্ট্রের দ্বারা অপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ—সেটা 'বৈচিত্র্যে একত্ব' তত্ত্বে বিশ্বাসী স্বামী বিবেকানন্দ যেন সুস্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

স্বামীজী বলেছেন, স্বজাতি-বাৎসল্য এবং বিজাতির প্রতি বিদ্বেষ—এই দুই কারণে জাতীয় ভাব বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, "একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির…এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।" (ঐ, ৬।২৪৩)

লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামীজী কিন্তু বাস্তব-ভিত্তিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার পর একবারও বললেন না, ভারতের জাতীয় সংহতি ও উন্নতির স্বার্থে স্বজাতি-বৎসল এবং ইংরেজ-বিদ্বেষী হওয়া প্রয়োজন এখানেও তিনি অনন্য। কারণ, তাঁর মধ্যে নেতিবাচক কিছুই ছিল না। এই পটভূমিকা স্মরণে রেখে এবং সাম্প্রতিক জাতীয় সংহতির সঙ্কটের নিরিখে এবার আমরা সমকালের কয়েকটি সমস্যার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি এবং সেই সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দ ঐ সকল সমস্যার সমাধানে এবং জাতীয় সংহতির সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ হিসেবে কী নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথমেই আমরা শিখ সমস্যার দিকে নজর দিতে পারি। কারণ পঞ্চনদের তীরে একদা যে বীরজাতির অভ্যুদয় হয়েছিল, আজ তাদেরই একটা অংশ খালিস্তানের দাবিতে জাতীয় সংহতির ভিত্তিকে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছে, রক্ত-পাতের বন্যায় পঞ্চনদকে প্লাবিত করে দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছে ভারতের সার্বভৌমত্বকে। প্রকৃতপক্ষে এটা কোন আকস্মিক ঘটনার পরিণতি নয়। আমরা যদি পিছন ফিরে দেখি, তাহলে দেখব, যেমন-ভাবে ইংরেজশাসকরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, যেমনভাবে পার্বত্য-

উপজাতির মনে সন্দেহের বিষ ঢেলে দিয়েছে, ঠিক একইভাবে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে শিখদের মধ্যেও বপন করেছিল বিচ্ছিন্নতার বীজ। স্বামীজী এ-ব্যাপারেও ছিলেন সচেতন।

তাই দেখি, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি পাঞ্জাবে গিয়েছিলেন, তখনই হিন্দু ও শিখদের মধ্যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং প্রেম ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি সেই বীরভূমিতে দাঁড়িয়ে সেদিনই বলেছিলেন: "হে পঞ্চনদের সন্তানগণ…আমি তোমাদের নিকট আচার্যরূপে উপস্থিত হই নাই, কারণ তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার মতো জ্ঞান আমার অতি অল্পই আছে। দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরস্পরের ভাব মিলাইবার জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আসিয়াছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে।" (ঐ, ৫।২৬৭-৬৮)

এখানে আমরা তিনটি জিনিস লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, স্বামীজী দেশের এক অঞ্চলের সঙ্গে অপর অঞ্চলের যোগাযোগ এবং আত্মিক-সংযোগের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, একজন আরেকজনকে শেখাবে বা পথনির্দেশ দেবে—এই মানসিকতায় একজন যেমন সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স (স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা) আক্রান্ত হয়, অন্যজন আক্রান্ত হয় ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এ (হীনম্মন্যতা)। অহংবোধ এবং হীনম্মন্যতায় কখনও মিলন ঘটে না। সংহতি স্থাপিত হয় না। তাই, স্বামীজী এখানে 'ভাব বিনিময়' কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। আর তৃতীয়তঃ, দুটি ভিন্ন-জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিল যেমন থাকে, তেমনি অমিলও থাকে। সংহতির ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করতে হলে অমিলের বিষয়-গুলিকে সরিয়ে রেখে প্রথমেই সাধারণ (common) মিলগুলিকে তুলে ধরা সঙ্গত। তাতেই সংহতির প্রাথমিক ভাবটি রচিত হতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয়, আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরাও ঠিক এই একই মত পরিপোষণ করেন। তাঁরাও বলেন, আঞ্চলিকতা দূর করতে এক অঞ্চলের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের সঠিক ভাবে যোগাযোগ হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন পরস্পরের ভাব বিনিময়। এবং সবশেষে কমন বিষয়গুলির ভিত্তিতেই একটি ঐক্যসূত্র খুঁজে বার করতে হবে।

স্বামীজী শিখদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্র-সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে, তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি তোমাদিগের নিকট কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব করিতে, কিছু ভাঙিবার পরামর্শ দিতে নয়।" (ঐ, ৫।২৬৮)

স্বামী বিবেকানন্দের এই বক্তব্য পড়তে পড়তে মনে হয় সেই অগ্নিঋষি সম্ভবতঃ আজকের অশান্ত পাঞ্জাবে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের সামনে সঙ্কটমোচনের একটা ইতিবাচক উপায় তুলে ধরেছেন।

তাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, "এদেশে সম্প্রদায়ের অভাব নাই। এখনই যথেষ্ট রহিয়াছে, আর ভবিষ্যতেও অনেক হইবে। …সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক।" (ঐ, ৫।২৭৩)

পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার জন্য তিনি তাদের সামনে তুলে ধরেছেন অতীত গৌরবের কথাও, বলেছেন, "এই

সেই বীরভূমি—যাহা যতবার এই দেশ অসভ্য বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই বুক পাতিয়া প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিয়াছে। এই সেই ভূমি—যাহা এত দুঃখ-নির্যাতনেও উহার গৌরব, উহার তেজ সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিত করিয়া সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্যন্ত—আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দসিংহ জন্মগ্রহণ করেন,…।" (ঐ, ৫।২৬৭)

লক্ষ্য করার বিষয়, সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাববাহী স্বামী বিবেকানন্দ শিখধর্ম এবং শিখ ধর্মনায়কদের প্রতি অপার শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দেখিয়েছেন, বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হন, তাহলে সংহতির মৌল ধারণাটাই হবে বিপন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা লক্ষ্য করব, স্বামীজী ভারতের জাতিভেদপ্রথা এবং বিশেষ অধিকার-প্রথাকে দেশের সংহতি তথা অগ্রগতির পরিপন্থী বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই দুটি আত্মঘাতী প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি ও আপসহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনিই প্রথম অনুভব করেছিলেন, এদেশের দলিত, শোষিত এবং অস্পৃশ্য মানুষকে মূল জীবনধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে না পারলে ভারত-আত্মার যথার্থ পরিচয় বিধৃত হবে না। তিনি মনে করতেন, অস্পৃশ্যরা অনুন্নত নয়। বর্ণহিন্দুরাই তাদের দলিত করেছে।

স্বামীজী বুঝেছিলেন, ভোগের অধিকারকে কেন্দ্র করেই বর্তমান সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এই সমাজে একদল সুবিধাভোগী এবং একদল বঞ্চিত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতই বর্তমান সমাজব্যবস্থার মৌল সমস্যা এবং সেটাই কখন কখন সংহতির সঙ্কট হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি চার রকমের বিশেষ অধিকারের কথা বলেছেন, (১) শারীরিক শক্তি মানুষকে আধিপত্য বিস্তারের যে-বিশেষ অধিকার দেয়, (২) ধনসম্পত্তির জোরে মানুষ কর্তৃত্বের যে-বিশেষ অধিকার দাবি করে, (৩) প্রথম দুটির তুলনায় সূক্ষ্ম, কিন্তু প্রবলতর হচ্ছে বুদ্ধি তথা পাণ্ডিত্যের জোরে প্রভুত্বের অধিকার এবং (৪) সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের প্রভুত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মের নামে। এটা সবচেয়ে পীড়নকারি, তাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

স্বামীজী তাই সকলপ্রকার অধিকার-বিলোপের দাবি তুলেছেন, দাবি তুলেছেন সমতার। তাতেই পরস্পরের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধার ভাব ফিরে আসবে এবং তাতেই সংহত হবে জাতীয় অস্তিত্ব।

তৃতীয়তঃ, স্বামীজী উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতিগত পার্থক্যটিকে সযত্নে লক্ষ্য করেছেন এবং এই দুই প্রান্তের সাংস্কৃতি-সমন্বয়ের সূত্রটিও প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি যেমন তামিলদের পৃথক জাতি-প্রকৃতি স্বীকার করেননি, তেমনি স্বীকার করেননি পৃথক জাতি প্রকৃতিকেও। 'আর্য ও তামিল' (ঐ, ৫।৩৭৭) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ভাষা যাই হোক না কেন, এই ভারতের সকলেই আর্য। তিনি ভাষা ও জাতির মধ্যে অবিভাজ্য সম্পর্ক স্বীকার করেননি। তিনি দেখিয়েছেন, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ভারত 'একবারে একটি নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থতঃ, তিনি এই মহাজাতির জীবনধারায় খ্রীষ্টধর্মের নতুন সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিষয়টিকে যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি যীশুর প্রতি

বারবার নিবেদন করেছেন তাঁর অপার শ্রদ্ধা। তিনি খ্রীষ্টান মিশনারিদের যাবতীয় কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র ও বলিষ্ঠ ধিক্কার জানিয়েছেন। আবার তিনিই যীশু সম্পর্কে বলছেন, "নাজারেথের যীশুর সমকালে জন্মলাভের সৌভাগ্য হলে আমি তাঁর চরণ ধুয়ে দিতাম আমার নয়নজল দিয়ে নয়, পরন্তু বক্ষের রক্ত দিয়ে।" ( যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৫ )

প্রকৃতপক্ষে তিনি সংহতি-বিনাশী এবং বিজাতীয় ভাবধারায় অনুসারী খ্রীষ্টান প্রচারকদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে অনন্ত প্রেমময় যীশুর জীবন ও বাণীকে গ্রহণ ও বরণ করতে দ্বিধা করেননি। এটাই সম্ভবত সংহতির মূল সূত্র।

পঞ্চমতঃ, আমরা ভারতের মূল একটি সমস্যার দিকে ফিরে তাকাব। তবে স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বোঝার জন্য প্রথমেই একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আবু পাহাড়ের এক গুহায় তপস্যাকালে স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মুন্সী জগমোহন লাল বিস্মিত হয়ে বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করেন, "আপনি তো হিন্দু-সাধু, আপনি মুসলমান বাড়িতে আছেন কি করে? আপনার খাদ্য হয়ত কখনো-সখনো ছুঁয়েই ফেলল?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "আপনি বলছেন কি? আমি তো সন্ন্যাসী, আপনাদের সমস্ত বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে। আমি ভাঙ্গীর ( মেথরের ) সঙ্গে পর্যন্ত খেতে পারি।...আমি দেখি, বিশ্ব-প্রপঞ্চের সর্বত্র ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। আমার দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ নেই।" ( বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা, উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৯২, পৃঃ ৬৫০ )

স্বামী বিবেকানন্দ ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি যেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিও ছিলেন আস্থাশীল। এর মূলে যে কারণটি প্রবল ছিল, তা হল, "তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) বিশ্বইতিহাসপটে ইসলামের রোমান্টিক আবির্ভাব ও তার বিস্ময়কর অগ্রগতির পশ্চাতে যে জ্ঞানের, প্রেমের ও সাম্যের শক্তি, তার বিজয়-অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল, সে-বিষয়ে তিনি অনেক মুসলমানের চেয়েও বেশি জানতেন।

"...বিবেকানন্দের ইসলাম ও মুসলমান প্রীতি লক্ষ্য করে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'ইসলামের নাম উচ্চারণমাত্রে আচার্য-দেবের মনে যে-চিত্রের উদয় হইত, তাহা উক্ত ধর্মাবলম্বীদের সাগ্রহ ভ্রাতৃত্ববোধের চিত্র—যাহা সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা দান করিয়াছে এবং উচ্চ অবস্থার মানুষদের মনে গণতান্ত্রিক চেতনা আনিয়া দিয়াছে।...' বিবেকানন্দের এই সমন্বয়-ভাবনার পরম পরিচয় বিধৃত রয়েছে মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখিত তাঁর অতি বিখ্যাত পত্রে ( ১০ জুন, ১৮৯৮ )। এই পত্রে সমন্বয়ধর্মী বিভিন্ন কথার মধ্যে তিনি বলেছেন, 'এইজন্য আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন কর্মেপরিণত ( আদর্শযুক্ত ) ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।...

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম-ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।" ( ঐ, ৬৫১, ৬৫৩, ৬৫৪ )

সবশেষে স্মরণ করতে হয় স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহামন্ত্র: "সংহতিই শক্তির মূল... !...চার-কোটি ইংরেজ তাঁহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি এক-যোগে প্রয়োগ করিতে পারেন, এবং উহার দ্বারাই

তাঁহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে; তোমাদের ত্রিশ কোটি* লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন।" (বাণী ও রচনা, ৫।১৯৭) এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, "কার্যশক্তি অপেক্ষা সহ্যশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ; ঘৃণাশক্তি অপেক্ষা প্রেমশক্তি অনন্তগুণে অধিক শক্তিমান।" (বাণীসঞ্চয়ন, পৃঃ ৬)

সংহতি সাধনের প্রয়োজনে তিনি দিলেন চারটি সূত্র: (১) "জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীতকালে যেমন, বর্তমানকালেও তেমনি, চিরকালই তেমনি আমাদিগকে প্রথমে আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় একত্ব সাধনের একমাত্র উপায়।" (বাণী ও রচনা, ৫।২৭৩)

(২) "যতই তোমরা আর্য-দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের উপযোগী শক্তি-সংগ্রহ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাইবে।" (ঐ, ৫।১৯৭)

(৩) "সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক।" (ঐ, ৫।২৭৩)

(৪) "যে সকল বিষয়ে আমাদের সকলের একমত সেইগুলি প্রচার করা হউক—যে-সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, সেগুলি আপনা-আপনি দূর হইয়া যাইবে।" (ঐ, ৫।২৮৬)

আজকের ঐতিহাসিকরা স্বামী বিবেকানন্দকে যে ভারতীয় জাতীয়তার জনক বলে স্বীকার করেছেন, সেটাও, ঐতিহাসিক কারণেই:

"স্বামী বিবেকানন্দকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলা যায়। তিনিই বিপুলভাবে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিলেন এবং নিজের জীবনে এর সুমহৎ দিকগুলির রূপদান করেছিলেন।" (India's Struggle for Swaraj, R. G. Prodhan, p. 60)

উপসংহারে জাতীয় সংহতির মূলমন্ত্রস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের সেই নির্দেশ শোনাতে চাই বর্তমান কালের বিভ্রান্ত প্রজন্মকে:

"স্বদেশহিতৈষী হও,—যে-জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসো।"

(বাণী ও রচনা, ৫।৮৮)

* এই সংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে।

আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করিয়া আমাদিগকে যে প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে তদনুযায়ী কাজ করিবার চেষ্টা বৃথা; উহা অসম্ভব।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# নৈষা তর্কেণ

স্বামী পরাশরানন্দ

বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে মানুষের মনে তার নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা শুরু হল। প্রকৃতির দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠল, এই শৃঙ্খলের হাত থেকে মুক্তি আছে কিনা। জন্ম, তারপর কর্ম, শুভাশুভ কর্মের ফলে পৃথিবীতে ও অন্যান্য লোকে যাতায়াত, অশেষ দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ, তারপর মৃত্যু। আবার জন্ম, আবার কর্ম। এই যে জন্ম-কর্ম-মৃত্যুর চক্রে মানুষ অনাদিকাল থেকে ঘুরছে এর বিরতি কি সম্ভব? না, এর মধ্যেই মানুষকে পিষ্ট হয়ে যেতে হবে?

উপনিষদের যুগে এসে মানুষ তার উত্তর পেয়ে গেল; তার কানে এল ঋষিকণ্ঠের সুধামাখা অমৃতবাণী,—এই জগদ্‌ব্যাপারের অন্তরালে একটি শাশ্বত সত্তা আছে; সেটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, আর একমাত্র তাকে জানলেই এই জন্ম-মৃত্যুর পারে যাওয়া সম্ভব; অন্য আর কোনও উপায় নাই। এই চিরন্তন সত্তাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি নানা নামে ভূষিত করা হল। জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি নিয়ে মানুষ এরপর যেন উপনিষদ্‌কেই প্রশ্ন করল,—তাঁকে জানার উপায় কি?

এই চিরন্তন সত্তা, তাঁকে পাবার উপায় আর মানুষের প্রকৃত স্বরূপ,—এই তিনটি বিষয় নিয়েই ধর্মজগতের বিস্ময়কর গ্রন্থরাজি উপনিষদের সৃষ্টি। সব উপনিষদই একবাক্যে বলছেন, তত্ত্বদৃষ্টিতে বাইরের যে মৌলিক সত্তা আর মানুষের যে প্রকৃত স্বরূপ, তাতে বিন্দুমাত্র ভেদ বা পার্থক্য নেই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় মানুষ তো নিজেকে শরীরধারী, দুঃখ-শোকে কাতর, মরণশীল জীব বলে ভাবে। এই অবস্থা থেকে তার স্বরূপে স্থিতির উন্নততম অবস্থায় উত্তরণ ঘটবে কিভাবে?

উত্তরণের নির্দেশ নিয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিত ও মনীষীরা এগিয়ে এলেন। নানা শাস্ত্র, গ্রন্থ লেখা হল আর তাতে বহুরকমের পথের সন্ধানও দেওয়া হল। কিন্তু এগুলি সব পড়েও, ঐ পথের খবর জানলেও মানুষ যেন শান্তি পাচ্ছে না, তার সংশয়ও পুরোপুরি যেন কাটছে না। আবার, অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, কৌতূহলী মানুষের মন যখনই শোনে দেশের অপর প্রান্তে এক ব্যক্তি থাকেন, যিনি সেই ভগবানকে দর্শন করেছেন; হাজার হাজার ব্যক্তি পথশ্রম, অর্থব্যয় ইত্যাদি সব কষ্ট সহ্য করেও সেই ব্যক্তিকে দেখার জন্য উপস্থিত হয়। তাঁর জীবনযাত্রা, আহারাদি কিরকম তারা লক্ষ্য করে, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে কি উপদেশ দেন, ধ্যানাদি সম্বন্ধে কোনও বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা বলেন কিনা সব শোনে। তাঁর দৈনন্দিন জীবন যদি উঁচুসুরে বাঁধা হয় আর তাঁর উপদেশের সাথে জীবনের যদি একতানতা থাকে মানুষ তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শুরু করে, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবনগঠনও শুরু করে। আস্তে আস্তে এভাবে চিরশান্তির রাজ্যের দিকে এগিয়ে যায়। শাস্ত্রের নির্দেশ থেকেও এ-সব ব্যক্তির উপদেশে মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করার কারণটা কী একটু তলিয়ে দেখা যাক।

বিভিন্ন শাস্ত্রে সেই তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হলেও এবং বহু জায়গায় এ-বিষয়ে অনেক শুনলেও মানুষের এ-ব্যাপারে ধারণা যেন ঠিক স্বচ্ছ হয় না। এর মূল কারণ, জগতের অন্য সব জিনিসের জ্ঞানের সঙ্গে ঐ জ্ঞানের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। জাগতিক জ্ঞান আহরণের যন্ত্র হচ্ছে মন ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়,—

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। এরা বাইরের যে দৃশ্যমান জগৎ যা রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাত্মক তার জ্ঞান এনে দেয়। বাইরের রূপের জ্ঞান এনে দেয় চক্ষু; শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের জ্ঞান এনে দেয় যথাক্রমে কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। আমরা যদি শুধু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি, তবে আমরা কখনই সেই তত্ত্বের বা আমাদের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে পারব না।

প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় বাইরের জগতের অনুভব বহন করে এনে যেন আমাদের মনরূপ হ্রদে একটি ঢেউ বা বৃত্তি তোলে। আমরা এই ঢেউটাকে জানতে পারি আর বলি আমরা বস্তুটিকে জেনেছি,—একেই বলে বৃত্তিজ্ঞান। কিন্তু যাঁরা সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন আর এর ফলে জন্মমৃত্যু রহস্যের সমাধান করেছেন, তাঁরা বলছেন, বৃত্তিজ্ঞান জ্ঞানই নয়। বৃত্তির পশ্চাতে যিনি আছেন, যিনি বৃত্তিপ্রবাহকে সর্বদা জানছেন, তাঁর জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। সাদা স্থির পর্দার উপরে আলোর সাহায্যে সেলুলয়েডের ফিল্মের ছবিগুলি দ্রুতগতিতে চলে গেলে আমরা নানা-রকমের দৃশ্য উপভোগ করি; কিন্তু যদি স্থির পর্দার জ্ঞান লাভ করতে চাই ফিল্মের ছবির যাতায়াত চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। তেমনি বৃত্তিজ্ঞান যিনি লাভ করছেন তাঁর জ্ঞান লাভ করতে হলে সমস্ত বৃত্তি বন্ধ করে দিতে হবে। হ্রদের উপরের জলে যতক্ষণ ঢেউ থাকবে ততক্ষণ হ্রদের তলার জিনিস আমরা দেখতে পাব না। সেই ঢেউ পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেলে তবেই হ্রদের তলদেশের ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারব।

বোঝা গেল যে, বৃত্তিজ্ঞানের পিছনে যিনি আছেন, যিনি দৃশ্যকে উপভোগ করছেন অর্থাৎ দ্রষ্টা, তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারলেই আমরা আমাদের স্বরূপের জ্ঞানলাভ করতে পারি। এই দ্রষ্টাকেই বলা হয় আত্মা। বিভিন্ন যুগে যোগীরা দাবী করেছেন যে তাঁরা এই দ্রষ্টার জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। তাঁরা বলছেন যে তাঁরা এমন একটি অবস্থা লাভ করেছেন বা এমন এক অবস্থায় আরূঢ় হয়েছেন যেখানে বিশ্ব-প্রপঞ্চের কোনও চিহ্ন থাকে না, নিজের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি পুরোপুরি মুছে যায়, নাম-রূপ সম্পর্কিত যা কিছু সব বিলীন হয়ে যায়; থাকে শুধু সীমাহীন অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দ। এটি মন-বুদ্ধির দ্বারা পাওয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা নয়, অতীন্দ্রিয় অবস্থা। এই অনুভবের কথা উপলব্ধিবান্ পুরুষ কিভাবে বিবৃত করেন, তা আচার্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে একটি হল—

সর্বাত্মকোঽহং সর্বোঽহং সর্বাতীতোঽহমদ্বয়ঃ।
কেবলাখণ্ডবোধোঽহমানন্দোঽহং নিরন্তরঃ॥
(৫১৬)

—আমি সর্বাত্মক, আমি সর্ব (দ্বিতীয়-জ্ঞানরহিত), আমি সর্বাতীত ও অদ্বয়, আমি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ ও ভেদরহিত।

স্বামীজী তাঁর 'প্রলয়' গানে নিজের অনুভূত এই অবস্থাকে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গানে সেই অতীন্দ্রিয় বা তুরীয় অবস্থায় পৌঁছানর চারটি ধাপের কথা বলা হয়েছে। প্রথম ধাপে সাধকের অনুভব হয় যে, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রশোভিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্য নয়,—ছবি বা ছায়ার মতো প্রতীতি মাত্র। দ্বিতীয় ধাপে অনুভব হয়, সাধকেরই চিত্তরূপ হ্রদে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ কখনও ভাসছে, আবার কখনও ডুবে যাচ্ছে। অর্থাৎ, এই ছায়ার মতো প্রতীতি এক একবার থাকছে, আবার এক একবার থাকছে

না। তৃতীয় স্তরে এই সমস্ত ছায়া বরাবরের মতো চলে গেছে,—শুধু 'আমি' 'আমি' ভাবের প্রবাহটি থাকে। সাধকের অভিমানের একটি সূক্ষ্ম ধারা (মন বুদ্ধিতে অহং ভাব) তখন থেকে যায়। কিন্তু চতুর্থ বা শেষ ধাপে সব কিছু চিহ্ন-স্মৃতি পুরোপুরি অবলুপ্ত,—যেন এক মহাশূন্যের অবস্থা। কিন্তু অনস্তিত্ব নয়; এটি "'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'। বোঝে—প্রাণ বোঝে যার।" অনুভূতির এই চূড়ান্ত অবস্থাটি কখনই মুখের দ্বারা বলা যাবে না বা ভাষাতেও প্রকাশ করা যাবে না। কারণ লেখা বলা ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশ করতে গেলেই দুই হয়ে যাবে; কিন্তু সে অবস্থাটি সর্ব ব্যবহার রহিত অদ্বৈত অনুভূতি মাত্র। স্বামীজী তাই এ-সম্পর্কে শেষ কথা একটু আভাসের দ্বারা বলে দিলেন যে বাক্য ও মনের পারে অবস্থিত এ অবস্থা শুধুমাত্র সাধকের অনুভবগম্য।

এই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে শাস্ত্রও যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তাও এই আভাস মাত্র। কারণ, তাঁর সম্পর্কে তো কোনও বিশেষণ প্রয়োগ করা যেতে পারে না। কোনও বিশেষণ প্রয়োগ করলেই তা আর শাশ্বত, নির্বিকার সত্তা রইল না। সেজন্য সমস্ত শাস্ত্রই জোর দিচ্ছেন অনুভবের উপর; প্রত্যক্ষ অনুভব না হলে আমরা ধর্মজগতে প্রবেশ করেছি বলতে পারব না। অবশ্য অনুভব মানেই যে চূড়ান্ত অদ্বৈত-অনুভূতি তা নয়,—এর অনেক স্তর আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভবই ধর্মজীবনের মূল কথা। বারবার শাস্ত্র পড়ে বা ধর্মালোচনা শুনতে শুনতে ব্রহ্ম-আত্মা-মুক্তি এ-সব তত্ত্বে বুদ্ধিজাত যে বিশ্বাস, এটি হচ্ছে পরোক্ষজ্ঞান। আর এই জ্ঞান নিজে লাভ করা—বোধে বোধ—এটি হচ্ছে অপরোক্ষজ্ঞান। পরোক্ষজ্ঞান আর অপরোক্ষজ্ঞানে অনেক প্রভেদ, যেমন দুধের কথা শোনা ও দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার প্রভেদ।

আমাদের মধ্যে একটা ধারণা থাকে যে, যিনি অনেক শাস্ত্রপাঠ করেছেন, শাস্ত্রের জটিল গূঢ় অর্থ সহজে বুঝতে পারেন বা বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃতি দিতে পারেন বা চমৎকার শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে পারেন, তিনি বোধহয় আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনেক এগিয়ে গেছেন। কিন্তু খুব সাহসিকতার সঙ্গে শাস্ত্র নিজেই এর উত্তর দিচ্ছেন যে, এই কোনটির দ্বারাই সেই জ্ঞান লাভ করা যাবে না। সাধন না করলে এগুলি শুধু বোঝামাত্র। সাধনহীন এই শাস্ত্রজ্ঞান মানুষের মনে শুধুমাত্র জাগতিক প্রতিষ্ঠা বা মান-যশের ইচ্ছা বাড়িয়ে দেয়। সাধনহীন এই পণ্ডিতদের শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিন্দাও করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এদের অবস্থা পাচকের হাতার মতো; নেমন্তন্নবাড়িতে হাতায় করে নানারকমের সুখাদ্য পরিবেশিত হচ্ছে,—কিন্তু হাতা কোনটিরই স্বাদ জানতে পারছে না। আবার অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে, এদের অবস্থা চন্দনকাঠের বোঝা নিয়ে যাওয়া গাধার মতো। গাধা নিজে জানতে পারে না তার পিঠের বোঝার ভিতরে বস্তু কি আছে,—সে শুধু বয়েই বেড়ায়। উপলব্ধিহীন পণ্ডিতরা শাস্ত্রব্যাখ্যা করলেও অনুভূতি না থাকায় বস্তুর যথার্থ রসাস্বাদন তাঁরা করতে পারেন না।

বিভিন্ন রকমের শাস্ত্রজ্ঞান ও ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিতি আবার তর্কের ইচ্ছা জাগিয়ে দেয়, এই তর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধনলব্ধ তত্ত্বে বা সিদ্ধান্তে আসা নিয়ে হয় না, হয় জয়লাভের ইচ্ছায়। তাই লক্ষ্যের দিকে না গিয়ে গতি হয় বিপরীতমুখী। আবার কখনও দেখা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং যেটুকু ভক্তিভাব আগে ছিল, প্রচুর পড়াশুনা এবং তর্কের ফলে সেটুকুও চলে গেছে। সে একজন নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী বা শুষ্ক তার্কিকে পরিণত হয়েছে।

অশেষ করুণার সঙ্গে শাস্ত্র তাই বলছেন, 'নানুধ্যায়াদ্ বহুঞ্শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ' —বহু শাস্ত্রপাঠ করবে না, এটি অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। অর্থাৎ শাস্ত্রে যে পথের নির্দেশ আছে সেটি জেনে সাধন করে যেতে হবে। এখানে আর একটি জিনিস জানতে হবে। এই রাস্তায় চলতে গেলে একজন ভাল গাইড্ দরকার। পথপ্রদর্শক,—যিনি এই রাস্তার খবর জানেন; এই রাস্তার অনেক দূরের খবর যাঁর জানা আছে, হয়তো বা রাস্তার শেষও তার দেখা আছে। ইন্দ্রিয়জগতের বাইরের রাজ্যের খবর যিনি রাখেন তাঁর সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুতেই সেই রাজ্যের সন্ধান পাব না। আমরা যতই নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবি না কেন, আমরা জাগতিক সব বিদ্যায় যতই পারদর্শী হই না কেন বা জগতে সম্মানিত, মানি ব্যক্তি হিসাবে যতই পূজা পাই না কেন, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হবে। হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মচর্চার ফলে ভারতের মানুষ এই জিনিসটি জানে আর তাই ধর্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন এই ব্যক্তিকে দেখতে ও তাঁর নির্দেশ নিতে সবরকমের কষ্ট তারা হাসিমুখে সহ্য করে। শাস্ত্রও এরকম গুরুর কাছে সশ্রদ্ধ ও বিনীতভাবে যেতে বলছেন এবং সেবাদির দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে পথের সন্ধান জেনে নিতে বলছেন।

প্রত্যক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন গুরুর নির্দেশিত পথে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সাধক যদি একমনে সাধন করে যান, তবে কালে সফলতা আসবেই। এখানে 'একমনে' কথার অর্থ শুধুমাত্র সেই সত্যকে জানতে চাই অন্যকিছু নয় এইভাব নিয়ে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কোনও কিছুর প্রতি আকর্ষণ থাকলে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করা যাবে না এটি জেনে। প্রবল পুরুষকার সহায়ে সাধক অনুভূতির উচ্চ উচ্চতর স্তরে আরোহণ করলেও চরম অবস্থায় যেন পৌঁছাতে পারেন না। তখন তিনি অনুভব করেন যে শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় এই মায়ার দৃঢ় বন্ধন যেন তিনি ছিন্ন করতে পারছেন না; স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে তখন আসে ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতির ভাব আর সাধনার এই শেষ অবস্থায় নেমে আসে শ্রীভগবানের করুণাধারা। মায়া বা বন্ধনের যিনি কর্তা সেই মায়াধীশ কৃপাপরবশ হয়ে তখন এই সাধকের বুদ্ধি থেকে অজ্ঞানের আবরণটি সরিয়ে দেন আর সাধকও স্বরূপের জ্ঞানলাভ করে কৃতকৃত্য হন। পুরুষকার ও কৃপা,—এই দুয়ের মিলনেই যেন ঘটে বস্তুলাভ। "তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।" (শ্বে. উ. ৬।২১) —নিজ তপস্যার প্রভাবে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে শ্বেতাশ্বতর উক্ত ব্রহ্মকে জেনেছিলেন।

যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি।—অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

# মহাপুণ্যা নর্মদা

## স্বামী চৈতন্যানন্দ

নর্মদা মাঈ কী জয়! জয়ধ্বনি দিতে দিতে সাধুসন্ত-ভক্তজনরা অতি কষ্ট স্বীকার করে নর্মদা মাঈকে দর্শন করতে যান অমরকণ্টকে। মধ্যপ্রদেশের মৈকাল পর্বতের উপর ক্ষুদ্র একটি গ্রাম অমরকণ্টক (৩৫০০ফুট)। কিসের টানে ছুটে যান সাধুসন্ত-ভক্তরা সেখানে? তাঁদের বিশ্বাস: অমরকণ্টক অতি পবিত্র স্থান। এখান থেকে পূতা নর্মদা মাঈ নির্গত হয়ে উপলখণ্ডের উপর দিয়ে সদা চঞ্চল কুমারীর ন্যায় নৃত্য করতে করতে চলেছেন সাগরসঙ্গমের অভিসারে। আর শিব সদা এখানে বিরাজ করছেন। এই অমরকণ্টক পাহাড়ে যুগ যুগ ধরে দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি-ঋষি ও তাপসগণ তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এবং আজও সাধুসন্তরা তপস্যা করছেন। তাই এই স্থান অতীব পবিত্র। যে-সব জিতেন্দ্রিয় মানব এই পুণ্যা নর্মদায় স্নান করে অমরকণ্টকে বাস করেন তাঁরা তাঁদের শতকুল উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তাই তো মুমুক্ষু সাধুসন্ত-ভক্তজনরা ছুটে যান অমরকণ্টকে জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়। নর্মদা মাঈও যেন তাঁর পূত স্বচ্ছ, সুশীতল জল দিয়ে সকল প্রাণীর সকলরকম পাপ ধুয়ে-মুছে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই তাঁর পবিত্র জলে স্নান করে, তাঁর আরাধনা করে নিষ্কলুষ হয়।

পুরাণে আছে:

গঙ্গা কনখলে পুণ্যা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্বত্র নর্মদা॥[1]

—কনখলে গঙ্গা এবং কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পুণ্যা, কিন্তু কি গ্রামে, কি অরণ্যে সর্বত্রই নর্মদা পুণ্যা।

পুরাণে আরও বলা হয়েছে যে, সারস্বততোয় তিনদিনে, যমুনানীর সাতদিনে এবং গঙ্গাজল সদ্য মানবকে পবিত্র করে। আর নর্মদা দর্শনমাত্রেই মানব পবিত্র হয়ে থাকে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুমুক্ষু সাধু-ভক্তরা বহুকাল ধরে নর্মদা দর্শন, স্পর্শন ও পরিক্রমা করে থাকেন। বহু কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করে শত শত মাইল নর্মদার তীর ধরে পরিক্রমা করেন। পুণ্যা নর্মদার জলে স্নান করে এবং তাঁর আরাধনা করতে করতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে পরিক্রমা করেন। বিশ্বাস—এই ভাবেই তাঁদের দৈহিক মানসিক কলুষমুক্তি হবে নর্মদা মাঈর কৃপায়। আর তাঁরা চিরশান্তির অধিকারী হবেন।

শঙ্করকন্যা নর্মদা চিরকুমারী। তাই তাঁর চরিত্র বড়ই পবিত্র। স্বভাব বড়ই বিনম্র। কুমারী নর্মদার জল স্বচ্ছ, সুশীতল ধীর ও শান্ত। ধীর গতিতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। মিলিত হয়েছে আরব সাগরে।

নর্মদার উভয় তীরই তীর্থ। বলা হয়, সত্যযুগে নর্মদার উভয় তীরে ষষ্টিকোটি ও ষষ্টিসহস্র তীর্থ ছিল। কলির প্রভাবে অধিকাংশ তীর্থ নষ্ট হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও প্রাচীন বহু তীর্থ আজও বহুকালের নানা স্মৃতি নিয়ে বিরাজ করছে।

শঙ্কর-তনয়া নর্মদা। বহুকাল পূর্বের কথা। কত হাজার বছর হয়ে গেছে—কে তার হিসাব দেবে। প্রকৃতির কত প্রবাহ বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। আজও নর্মদা মাঈ ধীর স্থির শান্ত হয়ে কত অতীতের ঘটনা বহন করে বয়ে চলেছেন। পুরাণে নর্মদার কত না মাহাত্ম্যের কথা আছে।

মহাদেব মানবদুঃখে কাতর। মানবের কল্যাণার্থে তিনি পত্নী উমা সহ ঋক্ষশৈলের উপর

১ স্কন্দপুরাণ: আবন্ত্যখণ্ডে রেবাখণ্ডম, ২১তম অধ্যায়, ৫ম শ্লোক।

কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। তপস্যায় শঙ্করের শরীর থেকে স্বেদ নির্গত হতে থাকে। বিগলিত স্বেদে ঋক্ষশৈল পরিপ্লাবিত করে। এই স্বেদ থেকেই মহাপুণ্যা সরিদ্বরা নদীর উদ্ভব।

সত্যযুগে সরিদ্বরা পিতা মহাদেবের কৃপা-লাভের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। সহস্র বছর তপস্যা করেন। দুশ্চর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব উমা সহ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি প্রসন্ন হয়ে নর্মদাকে আহ্বান করে বলেন: "হে মহাভাগে! তুমি কিসের জন্য এইরকম দুশ্চর তপস্যা করছ? কি তোমার মনোবাঞ্ছা আমাকে বল।" সরিদ্বরা করজোড়ে প্রার্থনা করেন: "হে প্রভো! প্রলয়কাল উপস্থিত হলে জগতের সবকিছু বিনষ্ট হয়। তখন যেন আমি বিনষ্ট না হই। আমি যেন অক্ষয় থাকি। আর আমি যেন পুণ্যনদী বলে জগতে খ্যাতি লাভ করতে পারি। হে প্রভো! জগতে দুশ্চর পাপকারী যে-সকল মানব ভক্তিসহকারে আমার স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করবে, তারাও যেন নিখিল কলুষ মুক্ত হয়। হে শঙ্কর! স্বর্গ থেকে গঙ্গা অবতরণ করে ক্ষিতিতলের উত্তরভাগে যেরূপ বিখ্যাতি লাভ করেছেন, আমিও যেন সেরূপ দক্ষিণ ভাগে মহাপাতকনাশিনী জাহ্নবী বলে বিখ্যাতা হই। সুরগণ সতত যেন আমার পূজা করেন। হে ত্রিদশেশ্বর! ত্রিলোকবাসী আমাকে যেন দক্ষিণগঙ্গা বলে বিদিত হয়। হে দেব! অখিল দান, উপবাস ও তীর্থাবগাহনে যে ফল, আমার জলে স্নান করলেও সেই সকল ফলই প্রাপ্ত হোক। হে শিব! আমার তীরে যারা মহেশ্বরের পূজা-অর্চনা করবে তারা যেন আপনার লোকে গমন করে। হে শঙ্কর! আপনি উমার সঙ্গে সদাসর্বদা আমার তীরে বাস করুন। হে দেব! আমার তীরে যে-সকল প্রাণী প্রাণত্যাগ করবে তারা যেন সকলেই অমরপুরে গমন করে। হে দেব! এই আমার আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা। আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং বরদানে উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে আমাকে এই বর প্রদান করুন।"[২]

সরিদ্বরার প্রার্থনায় শিব প্রসন্ন হয়ে বললেন: "হে কল্যাণি! তুমি যেরূপ প্রার্থনা করলে তাই-ই হোক! হে অনিন্দিতে! ত্রিলোকে তোমার ন্যায় আমার বরযোগ্যা অন্য আর কেউ নেই। হে বরাননে! তুমি আমার দেহ থেকে সমুদ্ভূতা হয়েছ, অতএব তুমি নিখিল কলুষের মোচনকর্ত্রী—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হে দেবি! ভীষণ কল্পক্ষয়কালে যারা তোমার উত্তরকূলে বাস করবে, মানুষের তো কথাই নেই, তোমার উত্তরতীরবাসী কীট-পতঙ্গ, তরুগুল্মলতাদির দেহ পতন হলে সদ্গতি লাভ হবে। যে-সকল ধর্মপরায়ণ দ্বিজ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তোমার দক্ষিণ তীরে অবস্থান করবে, দেহাবসানে তারা পিতৃপুরগমনে সমর্থ হবে। হে কল্যাণি! আমিও তোমার প্রার্থনানুসারে উমার সঙ্গে তোমার তীরে সর্বদা বাস করব। হে সুন্দরি! আমার আদেশে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু ও সাধ্যগণ তোমার উত্তর তীরে বাস করবেন এবং দক্ষিণ তীরে পিতৃগণ ও অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে সর্বদা আমি অবস্থান করব। হে মহাভাগে! উত্তরবাহিনী গঙ্গার ন্যায় তুমি দক্ষিণগঙ্গা নামে বিখ্যাতা হবে। আমি তোমাকে এই অনুত্তম বর প্রদান করলাম। তুমি এক্ষুণি মর্ত্যে গমন করে মর্ত্যবাসীদের কল্যাণ কর এবং তাদের মুক্তিদাত্রী হও।"[৩]

২ ঐ, ৪র্থ অধ্যায়, ২০-৪১ শ্লোক।

৩ ঐ, ৪র্থ অধ্যায়, ৩৪-৪২ শ্লোক।

মহাদেব বর প্রদান করে উমাসহ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কুমারী সরিদ্‌বরার অপরূপ রূপে দেবতা ও অসুরগণ মুগ্ধ। তাঁরা কুমারীর পাণিগ্রহণ করার জন্য মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন। মহাদেব তাঁদের বললেন: "তোমাদের মধ্যে যে সব থেকে বলবান সে-ই সরিদ্‌বরাকে লাভ করবে।" দেবাসুরগণের মধ্যে কে বলবান এই নিয়ে তর্ক বেধে গেল। তর্ক করতে করতে তাঁরা সরিদ্‌বরার নিকট উপস্থিত হন। চোখের নিমেষে সরিদ্‌বরা বহু যোজন দূরে চলে যান। দেবাসুরগণ তাঁকে দেখতে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। হঠাৎ বহু যোজন দূরে সরিদ্‌বরাকে দেখতে পেয়ে সেখানে তাঁরা ছুটে যান। সরিদ্‌বরা আবার অদৃশ্য হয়ে যান। বহু যোজন দূরে তাঁকে দেখতে পেয়ে দেবাসুরগণ সেখানেও ছুটে যান। কিছুতেই তাঁরা সরিদ্‌বরাকে ধরতে পারেন না। হাজার বছর ধরে এমনিভাবে দেবাসুরগণ তাঁকে ধরার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। তাঁদের বিফলতা দেখে শিব ও উমা উচ্চহাস্য করেন। কন্যার শক্তিমত্তায় খুশি হন। সহসা সেখানে উপস্থিত হন কুমারী চিরপবিত্রা সরিদ্‌বরা। সেখানে উপস্থিত দেবতারা তাঁকে দেখে বিস্মিত ও লজ্জিত হন। কন্যাকে সম্বোধন করে শঙ্কর বলেন: "হে কল্যাণি! তুমি তোমার নিজের চেষ্টায় সুরাসুরগণকে লজ্জিত করেছ; সুরাসুরগণের প্রতি এই 'নর্ম' দানহেতু তোমার নাম হল সরিদ্‌বরা নর্মদা।" এই নর্মদা নামে সরিদ্‌বরা ক্ষিতিতলে খ্যাতিলাভ করেন।

বিভিন্ন গুণাবলীর জন্য নর্মদার বহু নাম। তিনি ত্রিকূটী, মহতী, সুরমা, কৃপা, মন্দাকিনী, মহার্ণবা, রেবা, বিপাশা, বিপাপা, বিমলা, করভা, রঞ্জনা, বায়ুবাহিনী প্রভৃতি নামে পরিচিতা।

দেবদেব শিবের আশীর্বাদধন্যা পূত সলিলা নর্মদার তীরে কল্প কল্প ধরে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করে আসছেন। পুরাণে কথিত আছে: পূর্ব-কল্পের কলিযুগে কোন কোন তপস্বী বারো বা ছয় বছর, আবার কেউ কেউ তিন বা এক বছর, অথবা ছয় বা তিন মাস নর্মদার তীরে বাস এবং ত্রিসন্ধ্যা পবিত্র সলিলে অবগাহন করে শিবারাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বর্তমান কলিকালেও নর্মদার তীরে বাস এবং নিজ নিজ ইষ্টদেবদেবীর উপাসনা করলে অতি সহজেই সংসার-মহার্ণব অতিক্রম করতে পারে জিতেন্দ্রিয় ভক্তিমান মানব নর্মদা মাঈর কৃপায়। কীট-পতঙ্গ পিপীলিকাগণও যদি নর্মদার তীরে প্রাণত্যাগ করে, তবে তারা পুনরায় এই পূত সলিলার তীরে জন্মগ্রহণ করে ধর্মপরায়ণ হয়ে শত বছর জীবনযাপন করে। বৃক্ষলতাগুল্মাদি নর্মদার পবিত্র সলিলের স্পর্শে পাপহীন হয়ে দেদীপ্যমানরূপে ত্রিদিবধামে গমন করে। কুৎসিতকাম বা সাধুকাম যেই হোক না কেন, অথবা জড়, অন্ধ বা মূক মানব যে কেউ হোক না কেন নর্মদার তীরে জীবন বিসর্জন করলে স্বর্গে গমন করে। ভক্তিযুক্ত মানবের আর কী কথা!

স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে রেবা অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নর্মদার তীরে আগমন করে যে-সব ভক্তিমান ব্যক্তি বারো, দশ, আট, ছয়, চার বা তিন বছর কিংবা মাসানুষ্ঠান দ্বারা শিবের অর্চনা করে তারা সমস্ত কলিদোষ থেকে মুক্ত হয়। রেবাতীরে অবস্থান, নিত্য স্নান ও ভস্মলেপন করে যে-সব ভক্তিমান মানব শিবপূজা করেন তাঁদের আর বিষ্ঠা, মূত্র, চর্ম, অস্থি শিরাবিজড়িত দেহধারণ ও যুবতীর কোলে বাস করতে হয় না। এই রেবা অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে যে, নর্মদার পূত নীরে অবগাহন করে, অথবা প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে ভক্তিসহকারে নিম্নের স্তবটি পাঠ করলে কলির সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়:

"হে দেবি! আপনার জয় হোক, আপনাকে নমস্কার। হে বরে! সিদ্ধগণ আপনার সেবা করেন, আপনি সর্ববিধ মঙ্গল দান করে থাকেন এবং আপনার হতে সকলে পবিত্রতা লাভ করে, আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আপনি রুদ্র-দেহ হতে উৎপন্না হয়েছেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আপনার সেবা করে থাকেন, আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আপনিই অখিল বস্তু পবিত্র করেন, হে বরদে দেবি! আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আপনার জল সুশীতল, সুখপ্রদ ও পাপহর; হে সরিদ্বরে! আপনার গতি অতীব বিচিত্র, আপনাকে নমস্কার। হে সুখপ্রদে! ভূতসকল আপনার নীরের সেবা করে, আপনি গন্ধর্ব, যক্ষ ও উরগগণের অঙ্গ পূত করেন; মহাগজ, মহামহিষ ও মহাবরাহসমূহ আপনার মহা-উর্মি-মালাসমাকুল জল পান করে; হে উত্তমে! আপনাকে নমস্কার! আপনি আমার পাপরূপ পাশবদ্ধ আত্মার মুক্তিবিধান করুন। মানবগণ যতক্ষণ আপনার নীরে শরীরসংযোগ না করে, ততকালই তাদের নরকসমূহ ভোগ হয়, কিন্তু নিশাকর ও রবিকিরণ দ্বারা আপনার যে উত্তম জল স্পৃষ্ট হয়, হে দেবি! সেই জল স্পর্শ করলে জনগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যারা অনেক সংসারসম্ভূতা পাপে অভিভূত, বহুবিধ পাপ যাদের সতত আবৃত করে রয়েছে, হে পদ্মবদনে! সুখ-দুঃখাদি বহুবিধ দ্বন্দ্বসমন্বিত তাদৃশ মানবগণের আপনিই একমাত্র গতি। হে দেবি! আপনার আশ্রয় লাভ করে নদীসকল পূত ও বিমল হয়েছে—সংশয় নেই; অনেক শিষ্টব্যক্তি আপনাকে পূজা করেন, আপনি দুঃখাতুরদের অভয় দান করে থাকেন। আপনার তরঙ্গভঙ্গ দ্বারা মহাতল বিধ্বস্ত হয়, নরনিকর যে পর্যন্ত আপনার নীর স্পর্শ না করে মূত্রপুরীষময় দেহ-ধারণ করে ততকালই নরকজালে পতিত হয় ও নিরন্তর ভ্রমণ করে থাকে। হে দেবি! ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, রাক্ষস যে কেউ আপনার পুণ্যনীর পান করে ভয়ঙ্কর ঘোর নরকভীতি হতে উদ্ধার পায়; ভবপাশভীতি ভূদেবগণের আর কি বক্তব্য? ঘোর কলিকালে সরোবর ও নদীসকল সবই শুষ্ক হয়ে যায়, কিন্তু হে দেবি! আপনার কলেবর জলপূর্ণ থেকে নক্ষত্রপথে আকাশগঙ্গার ন্যায় আপনার অঙ্গ সমধিক শোভাসম্পন্ন করে। হে দেবি! আপনার প্রসাদে আমরা যাতে এই ভীষণ সময় অতিবাহিত করে মোক্ষপদের অধিকারী হই, হে উত্তমে! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আপনি তা-ই করুন। যারা আপনার আশ্রয় নিয়ে আপনারই শরণাপন্ন হয়েছে, পিতামাতার ন্যায় আপনিই তাদের একমাত্র গতি; অতএব যাতে আমরা অনাবৃষ্টিতে এই ভয়ঙ্কর কাল কর্তন করতে পারি, আপনি সেইরূপ আমাদের রক্ষা করুন।"[৪]

আচার্য শঙ্করও 'নর্মদাষ্টকস্তোত্রম্' রচনা করে পবিত্রস্বরূপিণী নর্মদা মাঈর বন্দনা করেছেন :

সবিন্দুসিন্ধুসুস্খলত্তরঙ্গভঙ্গরঞ্জিতং
দ্বিষৎসু পাপজাতজাতকারিবারিসংযুতম্।
কৃতান্তদূতকালভূতভীতিহারি শর্মদে
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে ॥[৫]

ইত্যাদি

৪ ঐ, ৬৩তম অধ্যায়, ২৪-৩৬ শ্লোক।

৫ স্তবকবচমালা—সম্পাদনা : সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, (১৩৩৪?), পৃঃ ৪৮৭

# মাদকদ্রব্য ও নেশার দাস

ডক্টর সুজিতকুমার চৌধুরী

বর্তমানকালে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। কলকাতার দেওয়ালে আজকাল প্রায়ই দেয়াল-লিখন দেখা যায়, যাতে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে। আবার দেখা যায় যে সাধারণ লোকের মধ্যে মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে বহুপ্রকার কৌতূহল আছে অথচ তাঁদের কৌতূহল মেটানর জন্য সামনে কিছু পান না। জনসাধারণকে এই বিষয়ে কিছুটা অবহিত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। আলোচ্য প্রবন্ধে মাদকদ্রব্য বলতে, ডাক্তারী পরিভাষায় যাকে Drugs and dopes বলে, তাদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নানা কারণে সুরা (মদ)-কে এর আওতায় আনা হচ্ছে না, যদিও ভারতীয় জনমানসে নেশাখোর বলতে প্রথমেই মদ্যপের কথাই মনে আসে। আবার বেশ কয়েকটি মাদকদ্রব্য (যথা পেথিডিন, মর্ফিন, বারবিচুরেট, ভ্যালিয়াম প্রভৃতি) ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া আছে এ্যামফেটামাইন, (amphetamine) যা পূর্বে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু যতক্ষণ কোন দ্রব্য ঔষধ হিসাবে (ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন্ অনুযায়ী) ব্যবহার করা হচ্ছে (যথা অনিদ্রারোগের জন্য ঘুমের ঔষধ) ততক্ষণ তাকে মাদকদ্রব্য বলা উচিত নয়।

## নেশা শুরু কিভাবে হয়? কেন হয়?

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে নেশা শুরু হয় যে-সব কারণে তা হল: (১) **একান্ত ব্যক্তিগত:** অনেকের 'যা নিষেধ', তাই করতে ভাল লাগে। কারো কারো নেশা শুরু হয় প্রেমে বা অন্য কোন মনস্কামনা সিদ্ধিতে বিফলতার ফলে।

(২) **কৌতূহল মেটান:** কিছু লোক আছে যাদের নেশায় হাতেখড়ি হয়েছিল নিছক কৌতূহল থেকে; অর্থাৎ "গাঁজা খেয়ে দেখি তাতে কিরকম লাগে"—এই ধরনের মনোভাব থেকে। ঘটনাচক্রে কোন নেশাখোরের আড্ডায় যাওয়ার পর 'দাদা' শ্রেণীর কারও অনুরোধ এড়াতে না পেরে (খানিকটা প্রেস্টিজ বাঁচানোর জন্য) গাঁজা ইত্যাদি নেশা শুরু হয়ে যায় কোন কোন ক্ষেত্রে।

(৩) **ধর্মীয় নীতির অঙ্গ হিসাবে:** এই পর্যায়ে পড়ে খ্রীষ্টানদের মদ্যপান বা কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের কারণবারিপান বা সাধুদের গাঁজা খাওয়া প্রভৃতি।

(৪) **ঔষধজনিত** (Iatrogenic): চিকিৎসক হয়তো কোন ঔষধ চিকিৎসার জন্য রোগীকে দিলেন, কিন্তু রোগ ভাল হয়ে যাওয়ার পরও অভ্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে রোগী সেটি চালিয়ে গেলেন।

(৫) **শ্রমজনিত অভ্যাস:** যারা অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম করে তারা শ্রমে উৎসাহ আনবার জন্য (যেমন পাঞ্জাবের ভূমিহীন কৃষক, টুর্ণামেণ্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ইত্যাদি) বা যাদের রাত জাগার দরকার তারা ঘুম তাড়ানোর জন্য (যেমন ছাত্র, রাতের গাড়ির ট্রাক-ড্রাইভার) বিশেষ বিশেষ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে।

**মাদকদ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ** (১) **'পুলকসৃষ্টিকারী'** (Euphoriants): এই বিভাগের মাদক সেবন করার পর পারিপার্শ্বিক দীনতা,

মানসিক গ্লানি ইত্যাদি ভুলে যাওয়া যায়; মনে পুলক, অকারণে বা স্বল্প কারণে আনন্দ আসে। কোন কোন মাদকে হ্যালুসিনেশন্ (Hallucination) অর্থাৎ ভুল দেখা, ভুল শোনা, দৃষ্টিবিকার ইত্যাদি ঘটতে পারে। এই বিভাগের মাদকগুলির মধ্যে ক্যানাবিনয়ড্স্, (Canabinoids), এ্যামফেটামাইন (amphatamine), এল এস ডি (LSD) এবং কোকেন (cocaine) পড়ে।

(২) **ঘুমের বা শান্ত হবার বড়ি:** ট্রাঙ্কুইলাইজার (Sedati ve-tranquilizer) বারবিচুরেট শ্রেণীর ঔষধ, (যথা ফিনোবারবিটোন), ভ্যালিয়াম, লিব্রিয়াম, এ্যাটিভান, প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। এই বিভাগের মাদকে যার আসক্তি হয়েছে, তার এইসব ঔষধ না খেলে ঘুম আসবে না এবং যত দিন যায় তত বেশি বেশি মাত্রায় এইসব ঔষধ খেতে হয়।

(৩) **অহিফেন জাতীয়** (Opiods): মর্ফিন, হেরোইন ও পেথিডিন এর মধ্যে পড়ে।

**মাদক সেবনের প্রধান প্রধান প্রক্রিয়া:** বহুবিধ প্রক্রিয়ায় মাদক সেবন চলে। তার মধ্যে কতকগুলি অতি পুরাতন আবার কিছু কিছু অতি আধুনিক।

(ক) **গাঁজা** (Hashish): খাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে, (১) কল্কে করে (ছিলিম) তামাক খাওয়া, যার অধুনা নাম পট্ (Pot) খুব প্রচলিত (২) সিগারেটে পুরে যখন গাঁজা খাওয়া হয় তখন তাকে বলে ম্যারিজুয়ানা (Marijuana) (৩) শরবত করে ভাঙ হিসাবেও চলে। হ্যাশিসের হালফ্যাশন-দুরন্ত নাম হচ্ছে হ্যাশ (Hash); গাঁজার বৈজ্ঞানিক নাম ক্যানাবিস স্যাটাইভা (Cannabis Sataiva)।

(খ) **আফিম জাতীয় মাদক:** আফিমের চাষ পাকিস্তানে অত্যন্ত ভয়াবহভাবে বেড়েছে। আগে আফিমের চাষ প্রধানতঃ অধুনা পাকিস্তান, পারস্যের উত্তর ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে ছিল। বর্তমানে আফিম হতে প্রস্তুত উন্নততর মাদকদ্রব্য এবং আফিম স্বয়ং বিদেশে (প্রধানতঃ আমেরিকায়) চালান হচ্ছে। **গুলি** (আফিমের গুলি) হিসাবে আফিমের ব্যবহার ভারতে অতি প্রাচীন। (গুলিখোর শব্দের ব্যাপকতা এর কিছু প্রমাণ)। **মর্ফিন** ও **পেথিডিন্** ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নেওয়া হয়। হেরোইন্ (Heroin) নানাভাবে নেওয়া হয়, যথা: ইনট্রাভেনাস বা রক্তনালীতে ইঞ্জেকশন্। অনেক সময় হেরোইন লেবুর রসে মিশিয়ে ইঞ্জেকশন্ দেওয়া হয়। **সিগারেটে** ভরেও ধূমপানের মাধ্যমে পান করা যায়—তাকে বলে স্ম্যাক্ (Smack)। স্ম্যাক্ বর্তমানে খুব অভিজাত নেশার মধ্যে পড়ে। রাঙতায় রেখে ধূমপান হিসাবেও চলে—তাকে বলে চেস্ (Chase)। এই চেসেরও বর্তমান আভিজাত্য প্রচুর। ব্রাউন সুগার (Brown Sugar) ও হোয়াইট সুগার (White Sugar) বলতে হেরোইন্ বুঝায়। চোরাচালানকারীরা এইভাবেই হেরোইন পাচার করে।

**কোকেন:** কোকেনের নেশা অতীতে ছিল ও মাঝখানে অনেকদিন কোকেন কিছুটা অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে কোকেন আবার তীব্রভাবে ফিরে আসছে। পুরাতন কায়দায় কোকেন ব্যবহার করতে হলে পানের সঙ্গে বা নস্যির সঙ্গে কোকেন মিশিয়ে নিতে হয়। বর্তমানে এক অভিজাত নেশা হল সিগারেটে মিশিয়ে কোকেন খাওয়া—তার নাম হল ক্র্যাক (Crack) বর্তমানে ক্র্যাকই বোধ হয় সবচেয়ে অভিজাত নেশা।

**নেশার ক্রিয়া:** কয়েকটি প্রধান প্রধান নেশার ফল নিচে দিচ্ছি।

গাঁজা: প্রধান যে যে কারণে গঞ্জিকা সেবন চলে তা হল: (১) মনে পুলক জাগান (২) পারিপার্শ্বিক দৈন্য পরিবেশ থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া; অর্থাৎ এ নেশার ফলে চতুর্দিকের হতাশা দৈন্যতায় মন অভিভূত হয় না। (৩) মনের ওপর চাপ চলে যায়। (৪) পরিমাণ বেশি হলে বিভিন্ন ধরনের হ্যালুসিনেশন বা দৃষ্টি-বিকার দেখা যায়; অনেক নেশাখোর এইজন্যই গাঁজা খায়। তার কাছে তখন অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে যায়। নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ হয়, এমনকি নিজের দেহকেও আর নিজের দেহ বলে মনে হয় না—মনে হয় যেন অপর কারও দেহ; কিন্তু চেতনা থাকে। এই বিশেষ পরিস্থিতিকে ডাক্তারী পরিভাষায় স্পেকটর ইগো (Spector Ego) বলা হয়। সম্ভবতঃ গঞ্জিকাসেবীদের শরীরে যৌন হর্মোন (Sex hormone) কমে যায় ও কামাবেগও কমে যায়। কুফলের মধ্যে বলতে গেলে চোখ লাল হয়ে ওঠা, নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। এই হিসাবে গাঁজাকে বেশ কিছুটা কম ক্ষতিকারক মাদক বলা যায়। কিন্তু গাঁজা যারা বেশিদিন খায়, তাদের জীবন থেকে কর্মোদ্যম চলে যায়। জীবনের একমাত্র ধ্যান হয়ে ওঠে কি করে খানিকটা গাঁজা খেয়ে নেশা করে বুম্ হয়ে বসে থাকব। বংশে কোথাও যার পাগলামির ছিটে-ফোঁটা আছে সেরকম লোক গাঁজা খেলে তার মধ্যে উন্মাদ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। হার্টের রুগীরা যদি গাঁজা খায় তবে পরিণাম খুব খারাপ হতে পারে।

এল এস ডি (LSD) LSD কথাটি এসেছে lysergic acid diethylamide-এর আদ্যক্ষরগুলি জোড়া দিয়ে। ল্যাবরেটরিতে জনৈক বৈজ্ঞানিক হঠাৎ এর আবিষ্কার করেন। এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে আমেরিকাতে এর প্রচলন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। এখন কিন্তু সরকারি তৎপরতায় (খোলা বাজারে আর LSD পাওয়া সম্ভব নয়) এর ব্যবহার খুব কমে গেছে।

LSD এর ফল গাঁজা খাওয়ার ফলের মতোই প্রায়, কিন্তু তীব্রতা অনেক বেশি। হ্যালুসিনেশন্ (Hallucination) অতি তীব্র-ভাবে দেখা দেয়। এও হতে পারে যে LSD বন্ধ হওয়ার পর থেকেই গাঁজার প্রচলন বেড়েছে।

কোকেন: কোকা (Coca) গাছের (Erythroxylon Coca) পাতা থেকে কোকেন তৈরি হয়। কোকেনেরও মজা হল যে মনকে প্রফুল্ল ও তাজা করে দেয়। নেশাখোরের কাছে কোকেনের বিপদ হল এর অত্যধিক দাম। আর ডাক্তারের কাছে বিপদ হল কোকেন হঠাৎ ব্লাড-প্রেশার বাড়িয়ে দিতে পারে এবং ফুসফুসের বিভিন্ন অসুখ খুব বাড়াতে পারে। আমেরিকাতে এই শতাব্দীর অষ্টম দশকে কোকেনের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়েছে।

এ্যামফেটামাইন: রাতের ঘুম তাড়ানোর জন্য ছাত্রেরা ও ট্রাক গাড়ির চালকরা, এবং কর্মক্ষমতা বাড়াবার জন্য খেলোয়াড়রা এককালে এর খুব ভক্ত ছিল। কিন্তু ভারত সরকার এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় (এবং ঔষধ হিসাবে এর ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ায়) এ্যামফেটামাইন এখন খুব দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

হেরোইন: হেরোইন এর এত নাম-ডাকের মূল কারণ বোধ হয় হেরোইন খুব কম মাত্রাতেই কাজ দেয় বলে। কাজেই চোরাই চালানকারী যদি আফিম নিয়ে ব্যবসা করে, তবে তার চালান করতে হবে অনেকখানি আফিম (এমনকি মর্ফিনও); সুতরাং অনেক

জায়গা নেবে। কিন্তু হেরোইন খুব কম জায়গা জুড়বে। আফিম, মর্ফিন, হেরোইন প্রভৃতি সেবন করলে গায়ের ব্যথা মরে যাওয়া, মানসিক চাপ কমে যাওয়া, ঘুম পাওয়া ইত্যাদি হয় বলেই এর চাহিদা বেশি। এর দীর্ঘব্যবহারে যৌন ক্ষমতা কমে যায় এবং মাত্রা বেশি হয়ে গেলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

শেষ করার আগে একটি ছোট সতর্ক বাণী দিয়ে শেষ করছি। একবার নেশার দাস হয়ে পড়লে নেশার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ভীষণ কঠিন এবং এই ধরনের বেশির ভাগ নেশা-খোররাই চুরি করে, ভিক্ষা করে বা বিবিধ অসামাজিক কাজ করে নেশা করার পয়সা জোগাড় করে। অনেকেরই শেষ পরিণতি আত্মহত্যা। সুতরাং নেশা আরম্ভ করাই সত্যিকারের ভয়াবহ পদক্ষেপ। একবার এই পথে ঢুকলে খুব কম লোকই ফিরে আসতে পারে।

# পুস্তক সমালোচনা

**উনিশ শতকের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ** —অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ বসু, হাওড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, ১বি/২, ওলাবিবিতলা লেন, হাওড়া-৭১১ ১০৪ ; প্রথম প্রকাশ ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ; ১৯৮৪। পৃঃ ১১৯ ; মূল্য—১৮ টাকা।

সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য লিখিত হলেও এটি একখানি অসাধারণ বই। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উনিশ শতকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তন এখানে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মকেন্দ্রিক ভারতীয় মন ইতিহাস সম্বন্ধে চিরকাল উদাসীন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অতি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব একটি বিচ্ছিন্ন, আকস্মিক ঘটনামাত্র নয় ; বিগত বহুশতকের ঐতিহাসিক উত্থানপতনের ফলশ্রুতিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের নিকট উপস্থিত।

সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্রচিন্তা, সাহিত্য, ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, মাইকেল, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তদানীন্তন ইয়ংবেঙ্গল-দের কালাপাহাড়ি হুঙ্কার থেকে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজকে অনেকটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। রক্ষণশীলদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পুরানো মূল্যবোধ খসে পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু কোন নতুন মূল্যবোধ স্থায়িরূপ গ্রহণ করতে পারল না। প্রগতির লেবেল সেঁটে পরিবর্তনের ধোঁয়া উনিশ শতককে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ধর্মান্দোলনের নামে সমাজসংস্কার নেতাদের পথবিভ্রান্ত করে তুলল। 'শ্রীম' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে যে কয়েকজনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করেছেন, তার কয়েকটি চিত্র অধ্যাপক এখানে উপহার দিয়েছেন।

পরিশিষ্টে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীম' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উনিশ শতকের যুবমানসের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আবেদনটি বড়ই মধুর ও সহজ সরল ভাষায় পাঠক-পাঠিকাদের নি ট নিবেদন করেছেন—"নিছক জ্ঞানানুশীলনে তো চিত্তের প্রদাহ মেটে না। নিম তিক্ত, শর্করাখণ্ড মিষ্ট—শুধু জ্ঞানে জানলেই কি তিক্ততা ও মিষ্টতার স্বরূপ জানা যায়? আসলে চাই আস্বাদন।"

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ শোনালেন নতুন বাণী—"বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এসব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে চলে যাও, তাঁতে ভক্তি

প্রেম হবার জন্যই মানুষ জন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও।" ( কথামৃত, ১।১১।১ )

বিশ্বমানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রবর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান জগতের বৃহত্তম শক্তিগুলি পর্যন্ত স্বীকার করছেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কবির কল্পনামাত্র নয়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়টি বর্তমান গ্রন্থে সূত্রাকারে, চিন্তা-উদ্রেককারী প্রবন্ধে ভাবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য উপহার দিয়েছেন। এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

—স্বামী জয়দেবানন্দ

**From The Unreal To The Real**—Swami Bhasyananda, Published by Vivekananda, Vedanta Society, Chicago U. S. A. P. 386. Price : ?

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের চিকাগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দের বিভিন্ন ভাষণের সুন্দর সঙ্কলন। কুড়ি বৎসর ধরিয়া বিদেশী শ্রোতাদের সম্মুখে তিনি বিষয়গুলি জ্ঞান ও মননের সহিত আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। এখন সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় জিজ্ঞাসু পাঠকদের মহালাভ হইল, সন্দেহ নাই। গ্রন্থটি চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ধর্মের তত্ত্বাদি সম্বন্ধে তেরটি ভাষণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে আছে হিন্দুধর্ম বিষয়ে নয়টি আলোচনা। তৃতীয় ভাগে আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এগারটি ভাষণ দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পাঁচটি এবং শ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে একটি করিয়া নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে। মোট চল্লিশটি ভাষণের সংকলন।

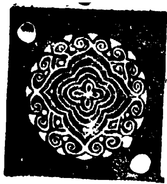
প্রতিটি রচনা স্বচ্ছভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। যুক্তি ও বক্তব্যগুলি ক্রম অনুযায়ী সাজানো থাকাতে পড়ায় আগ্রহ অটুট থাকে। সুন্দর ভাষা হিসাবেও গ্রন্থটি পাঠে আনন্দ আছে।

বইটির কাগজ ও মুদ্রণ স্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট। যাঁহারা সাধারণভাবে ধর্ম সম্বন্ধে এবং বিশেষ করিয়া হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জানিতে বুঝিতে আগ্রহী, যাঁহারা সাধন জীবনে পথনির্দেশ চাহেন, এবং যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের দিগন্ত প্রভাব বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হইতে যত্নবান, তাঁহাদের নিকট পুস্তকখানি বিশেষ সহায়ক হইবে।

—অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর উপরে কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে ; মানুষের সেই রকম চাই।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

গত ১১ এবং ১২ জুন, '৮৭ কেন্দ্রীয় আদিবাসী-কল্যাণমন্ত্রী শ্রীগিরিধর গোমাঙ্গো রামকৃষ্ণ মিশনের আলং কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

গত জুলাই মাসে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে বোস্টন, সানফ্রান্সিস্কো এবং ট্রেবুকো কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

## কৃতিত্ব

গত ১২-১৪ জুলাই, '৮৭ **অরুণাচলে** রাজ্যস্তরে যে ফুটবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে রামকৃষ্ণ মিশন আলং বিদ্যালয়ের ফুটবল দল রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ্ অর্জন করেছে।

## ত্রাণ

**গুজরাট খরাত্রাণ:** রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে রাজকোট, কচ্ছ, সুরেন্দ্রনগর, পঞ্চমহল এবং জামনগর জেলায় নয়টি তালুকে খরায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জল বিতরণ এবং গবাদি পশুদের জন্য খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ অব্যাহত আছে।

**মেঘালয় দাঙ্গাত্রাণ:** শিলং কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্প্রতি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থদের প্রাথমিক ত্রাণসামগ্রী হিসাবে গোর্খা পাঠশালা, বড়পাথার, এবং অন্য তিনটি শরণার্থিশিবিরের শিশুদের জন্য গুঁড়োদুধ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই শিবিরগুলিতে ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল বিতরণ এবং ১৮৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

**অসম বন্যাত্রাণ:** সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অসমের নলবাড়ি এবং বড়পেটা অঞ্চলের দুর্গতদের মধ্যে বিতরণের জন্য ধুতি, চাদর, শিশুদের পোশাক, পুরানো পোশাক, গৃহস্থালীর দ্রব্য এবং লণ্ঠন পাঠানো হয়েছে।

**শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ:** শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে, দুধ, বানরুটি, বিস্কুট ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বিতরণ অব্যাহত আছে।

## দেহত্যাগ

**স্বামী শ্রীনাথানন্দ** (নারায়ণ) গত ৫ জুলাই, '৮৭ বিকাল ৪ ঘটিকায় ৭৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। গত ২৬ জুন সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ তিনি এক দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং মাথায় আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে চিত্রা থিরুনাল মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মস্তিষ্ক পরীক্ষা করার পর দেখা যায় যে তাঁর মস্তিষ্কে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে; ফলে তিনি সম্পূর্ণ পঙ্গু এবং বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে পড়েছেন। উপযুক্ত সুচিকিৎসার সব ব্যবস্থা নেওয়ার পরও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি এবং ক্রমশঃ অবস্থার অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী শ্রীনাথানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন এবং যথাসময়ে স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, কালাডি এবং মহীশূর কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রের প্রধান হন। তাঁর দেহাবসানে সঙ্ঘ একজন কর্মঠ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে হারাল।

গত ১৪ জুলাই, '৮৭ **স্বামী সৎস্বরূপানন্দ** (সুকুমার) ২'৫০ মিঃ সময়ে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত

হয়ে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। ক্রমাগত জ্বরে ভোগার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বিগত কয়েক বছর ধরেই তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভে ধন্য হয়েছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ঠাকুরের অন্যান্য কয়েকজন সাক্ষাৎ শিষ্যের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। বেলুড় মঠ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে গড়বেতা, দেওঘর, মায়াবতী, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ এবং বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমের কর্মী ছিলেন। এই অদ্বৈতাশ্রমেই তিনি অবসর-জীবন যাপন করছিলেন। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রের আচার্য ছিলেন। সুমধুর ব্যবহার ও পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য তিনি অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন.

আমরা তাঁদের দেহ-নির্মুক্ত আত্মার চির-শান্তি কামনা করি।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ২৭ জুলাই, '৮৭ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি এবং গত ৯ অগস্ট '৮৭ শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বিকাশানন্দ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

### উৎসব

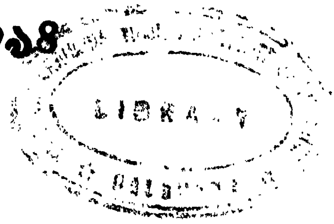
গত ৯ অগস্ট, '৮৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদ, ঈশ্বরকোটি শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের ১২৫তম জন্মতিথি উৎসব **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে** (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪-পরগনা) পূজা, পাঠ, হোম, ভজন-কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠের বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং এই অঞ্চলের বহু ভক্ত ও অনুরাগী এই উৎসবে যোগদান করেন। দুপুরে প্রায় এক হাজার নরনারী বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দজী মহারাজ।

### পরলোকে

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একনিষ্ঠ সেবক ও ভক্ত, ব্রহ্মদেশের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী **উ চিৎ থং** গত ৯ জুলাই, '৮৭ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রেঙ্গুনস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি ছেড়ে যখন সকলকে চলে আসতে হয়, তখন তিনিই নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মদেশে তার একজন বিশিষ্ট অনুরাগীকে হারাল। উ চিৎ থং ছিলেন স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার চির-শান্তি কামনা করি।

উদ্বোধন : কার্তিক ১৩৯৪




# সূচীপত্র



৮৯তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

কার্তিক, ১৩৯৪

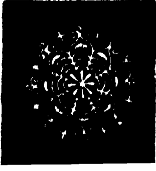
## দিব্য বাণী

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্‌।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্‌॥
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি।

আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনপ্রদাত্রী, পরব্রহ্মকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎকারিণী। অতএব যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সুরনরাদি যজমানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে।

আমারই শক্তিতে সকলে আহার ও দর্শন করে, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নির্বাহ করে এবং শব্দাদি বিষয় শ্রবণ করে। যাহারা আমাকে অন্তর্যামিনীরূপে জানে না, তাহারাই জন্মমরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

[ ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১০ অনুবাক্‌ ১২৫ সূক্ত ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতা আমাদের সকলের হৃদয়ে সতত শুভবুদ্ধি ও আত্মশক্তি জাগ্রত রাখুন এবং তাঁহার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

## 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'

দুর্গাপূজা হইয়া গেল। এখন আসিতেছে কালীপূজা। আকাশে বাতাসে মাটিতে আমরা যেন আবার মায়ের নূপুরধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। এইভাবে বার বার মা আমাদের মধ্যে আসিতেছেন অথবা আমরা তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আনিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি। তবে কি আমাদের মা অনেক? না, আমাদের মা একজনই। এই মা আমার মা, এই মা নিখিল বিশ্বে সকলের মা। তিনি আমার হৃদয়ে রহিয়াছেন, জগতের সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন। সর্বভূতান্তর্যামিনী তিনি। জগতের প্রতিটি প্রাণীর তিনি জননী। সেই এক এবং অদ্বিতীয়া জননীকেই আমরা কখনও বলিতেছি দুর্গা, কখনও লক্ষ্মী, কখনও কালী, কখনও সরস্বতী। কখনও বা আখ্যাত করিতেছি অন্য কোন নামে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হইয়াছে:

উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীং তথাপরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ॥
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহীতি তথাপরে॥

(উদ্ধৃত: স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা, পৃঃ ১৬)

—তাঁহাকে কেহ উমা, কেহ শক্তি, কেহ বা লক্ষ্মী বলেন। আবার কেহ তাঁহাকে ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী প্রভৃতি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

আসলে সেই এক আদি শক্তিকেই আমরা ডাকিতেছি, আমরা চাহিতেছি। শুধু নাম ভিন্ন, রূপ ভিন্ন। সেই কোন কালে (ন্যূনপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে) ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন: 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (১।১৬৪।৪৬)। সত্য এক, শুধু ঋষিরা তাহাকে নানাভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন। চণ্ডীতেও দেবী স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন: 'একৈবাহং জগত্যত্র, দ্বিতীয়া কা মমাপরা' (১০।৫)। এই

জগতে একমাত্র আমিই বিরাজিতা। আমি ছাড়া দ্বিতীয়া আর কে আছে? অর্থাৎ কেহই নাই। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে আমরা যাঁহাদের জানি, দেবী বলিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তাঁহারই অভিন্না শক্তিমাত্র। শান্তনবী টীকাতেও দেবীর এই ঘোষণার উদ্ধৃতি পাইতেছি :

জগতো নাহমন্যা স্যাং স্যাৎ মদন্যৎ জগৎ চ ন।
জগতো মম চাপৈক্যাৎ ব্যক্তিরন্যা ততোঽস্তি কা॥
অহং চ জগতী চৈকা জগতী মন্ময়ী মতা।
দুগ্ধবৎ দধি চাপ্যেকং দধি দুগ্ধময়ং মতম্॥

অর্থাৎ আমি জগৎ হইতে ভিন্না নই, জগৎও আমা হইতে ভিন্ন নয়। আমি ও জগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কে জগতে আছে? দুধ যেমন দই (দইরূপে পরিণত হওয়ার জন্য) হইতে ভিন্ন নয়, এবং দইও দুধজাত হওয়ার জন্য দুধ হইতে পৃথক নয়, তেমনই আমি একাই জগন্ময়ী আবার জগৎও মন্ময়।

এই এক ও অদ্বিতীয়া আদ্যাশক্তিকে ভারতবর্ষ পূজা করিয়া আসিতেছে স্মরণাতীতকাল হইতে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদে (১০।১০।১২৫) ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে আদ্যাশক্তির ঘোষণা : 'অহং রাষ্ট্রী'—আমিই জগতের ঈশ্বরী। তিনি বলিতেছেন : আমিই এই বিশ্ব-ভুবনের, জীব-জগতের প্রসবিত্রী। আকাশের ঊর্ধ্বে, পৃথিবীর ঊর্ধ্বে আমার মহিমা বিস্তৃত। আমিই জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্ম-চৈতন্যস্বরূপা, সর্বজগদাত্মা। ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তেও (১০।১০।১২৭) পাইতেছি শক্তির কথা। তাহার পর সামবেদীয় কেন উপনিষদে (৩।৩-১২, ৪।১) পাই উমা-হৈমবতীর বর্ণনা যিনি ইন্দ্রের কাছে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির মতো ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি যে অভিন্ন এই তত্ত্বটির ইঙ্গিত দিয়াছে কেন উপনিষদের উমা-হৈমবতী উপাখ্যান। উমা-হৈমবতী ব্যতীত দেবীর তিনটি নামের উল্লেখ পাই কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৭) —কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী এবং দুর্গি। (সায়না-চার্যের মতে দুর্গি হইতেছে দুর্গার নামান্তর। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্যত্র 'দুর্গা' নামটিও পাওয়া যায়। পাওয়া যায় 'অম্বিকা' নামটিও।) দেবীর দ্বিতীয় নামটি বহন করিয়া দক্ষিণ ভারতের দেবী কুমারী যে অন্ততঃপক্ষে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পূজিতা হইতেন তাহার প্রমাণ পাই 'পেরিপ্লাস অব দি ইরীথ্রিয়ান সী' গ্রন্থের বর্ণনায় (স্কফ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৬)। 'কালী' নামটির প্রথম উল্লেখ পাই মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।৪)। কালী সেখানে অবশ্য দেবীর নাম নয়, যজ্ঞাগ্নির একটি শিখার নাম। তবে দেবীর অন্যতম প্রকাশ হিসাবে কালী, মহাকালী অথবা ভদ্রকালী যে মহাভারত রচনার (খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী) পূর্বেই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন তাহা শান্তিপর্বের দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় অনেক টেরাকোটা-মূর্তি, মুদ্রা ও শীলমোহরে খোদিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যুগের পূর্বে ভারতবর্ষে শক্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ও প্রাধান্য ছিল। প্রাক-বৈদিক যুগে যে-ভাবনা মূর্ত্যাকারে বিধৃত হইয়াছিল, বৈদিক যুগে যাহা সূত্রাকারে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু মন্ত্র-সূক্তের মধ্যে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্যে। প্রাচীন প্রধান পুরাণগুলির যেগুলিতে শক্তির কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বামন-পুরাণ, বরাহপুরাণ এবং কূর্মপুরাণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'চণ্ডী' বা 'দেবীমাহাত্ম্য' নামে হিন্দুদের বিখ্যাত শাস্ত্রগ্রন্থটি আসলে মার্কণ্ডেয় পুরাণের তেরোটি (৮১-৯৩) অধ্যায়। দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মহাভাগবত প্রভৃতি

উপপুরাণগুলি প্রধানতঃ শক্তিপুরাণ হিসাবেই প্রসিদ্ধ। মহাভারত এবং হরিবংশের নানা অধ্যায়েও দেবীমাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

ইহার পর রহিয়াছে বিরাট শাক্ত তন্ত্রসাহিত্য। অনেক তন্ত্র আছে যেগুলি প্রাচীন পুরাণগুলি অপেক্ষাও পুরাতন। কেহ কেহ আবার দাবী করেন কোন কোন প্রাচীন তন্ত্র বৈদিক সাহিত্যের সমসাময়িক, এমনকি তদপেক্ষাও প্রাচীন। ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিয়া অধিকাংশ পণ্ডিত আবার এই দাবী সমর্থন করেন না। তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে, মহাভারতে তন্ত্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত 'অমরকোষ' 'তন্ত্র' শব্দের নানা অর্থ দিয়াছে, কিন্তু 'তন্ত্র' যে হিন্দুদের একটি বিশেষ ধর্মসাহিত্য তাহা সেখানে উল্লেখিত হয় নাই। তাহা ছাড়া, ফা-হিয়েন প্রমুখ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে আগত চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে কোন তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তন্ত্রের প্রাচীনতার যাঁহারা সমর্থক তাঁহারা বলিবেন তন্ত্র যেহেতু রহস্যশাস্ত্র সেই কারণে সাধারণ্যে তাহার প্রচার ছিল না। সেই কারণে মহাভারত অথবা অন্যত্র তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, তন্ত্র-সাহিত্যের মূল কথা হইল: দেবী জগতের মূল, বিশ্বপ্রপঞ্চের একমাত্র সত্তা। তিনি জগতের প্রসবিত্রী, জগতের স্থিতিরূপিণী, আবার তিনিই প্রলয়কারিণী।

আমরা কালীপূজার কথা বলিতে শুরু করিয়াছিলাম। দেবীর যে মূর্তি আমরা দেখি অথবা দেবীর যে বর্ণনা আমরা পুরাণে বা অন্যত্র পাই তাহাতে তিনি ভীষণা—তাঁহার রণচণ্ডী রূপ। তিনি অসুর বিনাশ করিতেছেন। অসুরের ছিন্ন মুণ্ড তাঁহার হাতে ঝুলিতেছে। অসংখ্য অসুরের ছিন্নমুণ্ড মালা করিয়া তিনি তাহা গলায় ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য, সেই সংহার মূর্তির মধ্যেও মায়ের মুখে রহিয়াছে এক অপরূপ করুণা ও মমতার ভাব। 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা' ( চণ্ডী, ৪।২২ )—শিষ্টজনের প্রতি করুণা আর অশিষ্টজনের প্রতি ভয়ঙ্কর কঠোরতা—এই দুই বিপরীত ভাবের প্রকাশ দেখি তাঁহার মধ্যে।

কবে, কোন্ দিন দেবীর সঙ্গে অসুরের এই যুদ্ধ হইয়াছিল, আদৌ হইয়াছিল কিনা—তাহা লইয়া গবেষণা অর্থহীন। কারণ পৌরাণিক কাহিনীর প্রতীকী তাৎপর্যই প্রধান। ইহা তো আমরা সবাই জানি যে নিরন্তর, প্রতিক্ষণে আমাদের নিজেদের অন্তরে সুর এবং অসুরের, শুভ এবং অশুভের দ্বন্দ্ব চলিতেছে এবং সেই দ্বন্দ্বে আমরা ক্ষত-বিক্ষত। অসুরের সহিত দেবীর এই সংগ্রাম মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সেই শুভ ও অশুভের চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রতীক বাল্যকালে একটি কবিতায় পড়িয়াছিলাম:

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক
কে বলে তাহা বহু দূর ?
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক,
মানুষেতে সুরাসুর।

বাস্তবিকই তাই। অসুরের তাণ্ডবলীলা বাহিরের জগতে যে আছে তাহা তো আমরা নিত্যদিনই দেখিতেছি। কিন্তু তাহা তো আমাদের অন্তরের জগতে অশুভ প্রবৃত্তির যে তাণ্ডব চলিতেছে তাহারই প্রকাশ। লোভ, হিংসা, কুটিলতা, ভোগসর্বস্বতা—এই সব অশুভ বৃত্তিগুলি আমাদের হৃদয়ের সদ্‌গুণগুলির সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাহার ফলেই সমাজে, রাষ্ট্রে, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে আমরা দেখি হানাহানি, রেষারেষি এবং পরিণামে সভ্যতাধ্বংসকারী যুদ্ধ। প্রাচীনকালে দেবতা ও দানবের যে সংগ্রাম তাহার চেয়ে মানুষের আন্তর জগতের এই সংগ্রাম, এই সংঘর্ষ অনেক ভয়ঙ্কর। আমাদের মধ্যে যে শুভশক্তি অসুরনাশিনী দেবী সেই শক্তির

প্রতীক, তাহার সাকার বিগ্রহ। আর, আমাদের আন্তর জগতের যে অশুভ প্রবৃত্তি, আসুরিক প্রবৃত্তি, অসুর তাহারই প্রতীক। দেবী ও অসুরের এই সংঘর্ষে দেবীর জয় আসুরিক শক্তির উপর শুভ শক্তির জয়। যখনই আসুরিক শক্তি আমাদের আচ্ছন্ন করে তখনই দেবীশক্তি আমাদের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া আমাদের রক্ষা করেন, সভ্যতাকে রক্ষা করেন। চিরকাল এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ( ১১।৫৪-৫৫ ) দেবী আশ্বাস দিয়াছেন :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদা অবতীর্যাহং করিষ্যামি অরিসংক্ষয়ম্ ॥

—যখনই এই প্রকার দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া শত্রু নাশ করিব।

তাই আমরা মাকে পূজা করি। তিনি প্রসন্না হইলে আমাদের সব সঙ্কট দূর হইয়া যাইবে। তাঁহার কৃপায় আমরা মুক্তির আস্বাদ লাভ করিব। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে" ( চণ্ডী, ১।৫৬ )।

এই শক্তি-ভাবনার মূল তত্ত্বটি কি? জগৎ-প্রপঞ্চের পিছনে একটি শক্তি আছে যাহা হইতে এই জগৎপ্রপঞ্চের বিকাশ হইয়াছে। সেই শক্তিকে কখনও আমরা বলি ব্রহ্ম, কখনও বলি আদ্যাশক্তি। আসলে একই শক্তি, শুধু প্রকাশের ভেদমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন : যেমন নিস্তরঙ্গ জল, আবার তরঙ্গযুক্ত জল। যেমন সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া আছে, আর সাপ ফণা তুলিয়া গর্জন করিতেছে। নিত্য আর লীলা। শক্তি যে অবস্থায় নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় তখন তাহাকে ব্রহ্ম বলি, আর সেই শক্তি যখন গুণময়ী, ক্রিয়াশীলা তখন তাহাকে বলি আদ্যাশক্তি। একই মুদ্রার দুই দিক। কালী সেই আদ্যাশক্তি। আমরা যখন তাঁহার মূর্তি গড়িয়া পূজা করি তখন কিন্তু আমরা মূর্তির পূজা করি না, আমরা আসলে সেই আদ্যাশক্তিরই পূজা করি। আমরা পৌত্তলিক নই। এই বিষয়ে আলোয়ারের মহারাজাকে স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা বহুল পরিজ্ঞাত। মূর্খেরা বলিবে : মূর্তি তো মাটি, কিন্তু আমরা জানি—আমাদের শাস্ত্র, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সাধনার ইতিহাস আমাদের শিখাইয়াছে : মূর্তি মাটি নয়, আমার মা-টি। আমরা মায়ের পূজা করি আমাদের ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য। সেই শক্তি শুধু পেশীর শক্তি নয়, আসলে তাহা জ্ঞানশক্তি, পূর্ণ মনুষ্যত্বের শক্তি। আমাদের সকলের মধ্যে সেই শক্তি জাগরিত হউক—মায়ের কাছে ইহাই প্রার্থনা।

**আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোথাও এমন এক মহাশক্তি আছেন, যিনি নিজেকে প্রকৃতি-সত্তা বলে মনে করেন। তাঁরই নাম কালী, তাঁরই নাম মা।...আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাস করি।—নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ হয়ে পড়েন।**

**—স্বামী বিবেকানন্দ**

# স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

মঠ, বেলুড়, হাওড়া

১লা নভেম্বর, ১৯১৯

প্রিয় অতুল,

তোমার ৺বিজয়ার প্রণামপত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। নানা কারণে তোমার ৺বিজয়ার আশীর্বাদী পত্র লিখিতে পারি নাই—এই পত্রে তাহা জানিবে। ৺পূজা এবার খুব সমারোহে মার কৃপায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূজায় এত লোক মঠে আমি কখনই দেখি নাই। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ১৭।১৮ শত লোক আমরা আন্দাজ করিয়াছিলাম। সপ্তমীর দিন ৫০০, ৮মী ১০০০, ৯মী ৫০০ লোক হইবে। কিন্তু মার ইচ্ছায় তিনদিনে প্রায় ৩২।৩৩ শত লোক হইয়াছিল। মার ইচ্ছায় মাছ তিনদিনই যথেষ্ট আসিয়াছিল। আমরা ভাবিও নাই এমন সব স্থান হইতে। জিনিসপত্র যথেষ্ট। কোন বিষয়ে অপ্রতুল হয় নাই। খই মুড়কি নারকেল নাড়ু খুব দেওয়া গিয়াছে তিন দিন। দই বুঁদে প্রচুর মার ইচ্ছায়…। ৺কালীকীর্তন রোজ খুব হইয়াছিল। এবার প্রতিমা মঠেই গড়া হইয়াছিল। ডাকের গহনায় মাকে সাজান হয়—অনেকদিন এরূপ হয় নাই। বিসর্জনের দিন নৌকায় করিয়া প্রতিমা লইয়া অনেকদূর এদিক ওদিক বেড়ান হয়। পরে মঠের সম্মুখে নিরঞ্জন করা হয়। মহারাজ ৮মীর দিন হইতে ৪।৫ দিন মঠে ছিলেন। শরৎভায়া ২ দিন মঠে ছিলেন। সকল লোকই খুব আনন্দ লাভ করিয়াছে। মার কৃপায় ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি সব ছিল।…

বেলুড় স্টীমার ঘাট খুব শীঘ্র হবে। ওখানে [ আলমোড়ায় ] এবার ফসল ভাল হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। পর্বতের লোক বড় গরীব এবং বহু পরিশ্রম করিয়া উদরান্ন উৎপন্ন করিতে হয় বা জোগাড় করিতে হয়। পূর্ববঙ্গে পূজার অব্যবহিত পূর্বে ভয়ানক ঝড় ও বন্যা ও ভূমিকম্পে ৪।৫ জেলার কতক অংশ একেবারে সর্বনাশ করিয়াছে। এমন বর্ষা হয় নাই—৭০।৮০ বৎসরের বৃদ্ধরা বলিতেছে। ইটের বাড়ি যা পূর্ববঙ্গে প্রায় নাই তাছাড়া কোন বাড়িঘর নাই—গাছপালা কিছু নাই। গৃহপালিত পশু একটি নাই বলিলেও হয়—মানুষও বহু মারা গিয়াছে। মহাবিপদ! গভর্ণমেণ্ট দুঃখ নিবারণের চেষ্টা খুব করিতেছেন, অন্যান্য সেবাসমিতিও করিতেছেন, মিশন হইতেও খুব চেষ্টা হইতেছে। অনেকে সেদিকে গিয়াছে। মঠের স্বাস্থ্য এখন একেবারেই ভাল নয়। পাড়া ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত। মহারাজ ৪।৫ দিন ভুবনেশ্বরে গিয়াছেন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে।… সকলকে আশীর্বাদ। ইতি

…

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

**শিবানন্দ**

পুঃ—এবার শ্যামাপূজাও প্রতিমায় হইয়াছিল। প্রতিমা মঠে গড়া হয়। খুব ধুমধামে পূজা হইয়াছিল। সাড়ে তিনশত লোক প্রসাদ পাইয়াছিল।

# ঈশ্বরদর্শনের উপায়

## স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁর বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখতে গিয়ে প্রথমেই এমন কিছু কথা লিখেছেন, যা আজ পর্যন্ত কেউ বদলাতে পারেনি বা খণ্ডন করতে পারেনি। তিনি বলেছেন, আত্মা আর অনাত্মা হচ্ছে চৈতন্য আর জড়; এই দুটো পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। একটির সাথে আরেকটির মেলে না। কিরকম বিরুদ্ধস্বভাব? 'তমঃ-প্রকাশবদ্'—আলো ও অন্ধকার, দিন ও রাত্রির মতো পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। অতএব এ-দুটোকে আমরা কোনরকমে মিশিয়ে বলতে পারব তা সম্ভব নয়। তাহলেও মহামায়ার এমনি খেলা যে এই বিরুদ্ধস্বভাব দুটো জিনিসকে আমরা মিশিয়ে ফেলি। মিশিয়ে ফেলি কিরকম করে? 'আমি এ-ঘরে আছি', 'আমি ক্ষত্রিয়', 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি ফর্সা', 'আমি কালো', 'আমি দুঃখী', 'আমি সুখী', 'আমার পরিবার', 'আমার ছেলে', 'আমার স্বামী', 'আমার বাড়ি', 'আমার জমিদারী', 'আমার ব্যবসা'—এই সব বলে থাকি।

এই যে প্রথমেই বললাম, 'আমি এ-ঘরে আছি'—এটা কি করে হতে পারে? আত্মা সর্বব্যাপী, আমি এ-ঘরে আছি, এখানে বসে আছি, কি করে হবে? দেহের সঙ্গে তাদাত্ম্য বুদ্ধি করে আমি বলছি যে, আমি এখানে আছি। দেহ হল জড় আর আমি চৈতন্য, এই দুটোকে মিশিয়ে ফেলেছি। ঠিক সেই ভাবেই আবার বলে থাকি, আমি ক্ষত্রিয়, আমি ব্রাহ্মণ। তারপর আবার মনের ধর্ম, আমি আত্মাতে আরোপ করি, আর বলি, আমি সুখী, আমি দুঃখী—এইসব কথা। আবার বাইরের জিনিস, সেগুলি আমরা আত্মাতে আরোপ করি আর বলি, আমার পরিবার, আমার স্বামী, আমার ছেলে। এ-দুটোই বিরুদ্ধস্বভাব; তা সত্ত্বেও এই দুটো মিশে যাচ্ছে। কি কারণে? এটা হচ্ছে অজ্ঞানের জন্য। এটাই হল মায়া। এই অজ্ঞান অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। তার জন্য আমরা মিশিয়ে ফেলি। এর নাম চিদ্-জড় গ্রন্থি। এই যে চৈতন্য আর জড়ের গ্রন্থি, এটাই হচ্ছে আমাদের বন্ধনের কারণ। এই দুটোকে যদি আমরা পৃথক্ করে দিতে পারি, আমরা চৈতন্য—আমাদের সঙ্গে জড়ের কোন সম্পর্ক নেই—এই জ্ঞান যদি আমাদের হয়ে যেতে পারে, তাহলেই আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে। যাঁরা ভগবান-দর্শন করেছেন তাঁরাই চিদ্-জড়ের গ্রন্থি কাটতে পেরেছেন। তাঁদের জড়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। তাঁদেরই কোন রকম সংশয় থাকে না। সমস্ত কর্মফল নাশ হয়ে গিয়ে তাঁরা মুক্ত হয়ে যান।

উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩৮)

—আমি সেই পুরুষকে দেখেছি, যিনি আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সেই তমসার ওপারে—মায়ার ওপারে। তাঁকে না জানলে পরে এই সংসার বা মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার নেই। তাহলে ভগবান লাভ করাই হচ্ছে একমাত্র উপায় যার দ্বারা আমরা এই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারি বা অনাদি অজ্ঞানকে নষ্ট করতে পারি। এই অজ্ঞান দ্বারাই আমাদের জ্ঞান আবৃত আছে;

তাই আমরা চৈতন্যকে দেখতে পারছি না। এই অজ্ঞান কি? 'আমি-আমার'—এই ভ্রম। ঠাকুর বলতেন যে আমি-আমার ভাব হচ্ছে অজ্ঞানের আর তুমি-তোমার ভাব হচ্ছে জ্ঞানের লক্ষণ। আমি-আমার থেকে আসে স্বার্থপরতা। যে আমি ছোট-আমি, তাকে আমি সন্তুষ্ট করছি, তার ভোগের জন্য আমি সমস্ত জিনিস যোগাড় করছি—এটাই হচ্ছে স্বার্থপরতা। unselfishness (নিঃস্বার্থপরতা) হল ভগবানের দিকে যাবার রাস্তা। আমরা যদি একেবারে নিঃস্বার্থ হতে পারি তাহলে ভগবানের দর্শন লাভ হবে। নিঃস্বার্থপর হতে পারলে আমরা প্রেমস্বরূপ হয়ে যাব। ভগবান নিজে হচ্ছেন প্রেমস্বরূপ। সুতরাং আমাদের ভগবদ্দর্শন হয়ে যাবে।

এখন এই অজ্ঞান—'আমি-আমার'—এই বোধটা নষ্ট করার উপায় কি? আমরা ব্রত পালন করছি, তীর্থ ভ্রমণ করছি, দান করছি। দান করা, তীর্থে যাওয়া, মন্দিরে ঘুরে আসা বা প্রণামী দেওয়া, ব্রত পালন করা—এ-সমস্ত হল সাধারণ ব্যাপার। শঙ্করাচার্য বলে গেছেন, এ-সবের দ্বারা কিছু হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানলাভ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নেই। তাছাড়াও আজকাল যে-রকম দাঁড়িয়েছে—ধর্ম মানে হচ্ছে লোকাচার; যে সমস্ত লোকাচারকে পণ্ডিতমহল নিজেদের সমর্থন দিয়ে দিয়েছেন সেগুলি। এটিই হচ্ছে আমাদের ধর্ম। এই লোকাচার ছাড়া আমরা অন্য কিছু মানতে চাই না। আর যারা এই লোকাচার মানে না তাদের আমরা বলি অধার্মিক। আমাদের এই রকম সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছে যে, আমরাই ধার্মিক কারণ লোকাচার নিয়ে থাকি। অথচ যাদের আমরা অধার্মিক বলি, তারা হয়তো ঠিক ঠিক সত্যের অনুসন্ধান করছে, ঠিক ঠিক ধর্মপথে চলছে। আমাদের ভাবটা এই যে, আমি যা করছি সেটাই ধর্ম, এর বাইরে কোন ধর্ম থাকতে পারে না।

এরকম যখন আমাদের বুদ্ধি হয় তখন ভগবান আসেন। এসে আমাদের ঠিক ঠিক ধর্ম কি বুঝিয়ে দেন। ঠিক এই যুগেও তাই হল। ঠাকুর এসে বুঝিয়ে দিলেন যে ধর্মটা কি। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্দর্শন আর সেটাই ধর্ম। স্বামীজীও বলে গেছেন—"Religion is realisation"—ধর্ম হচ্ছে অনুভূতি। আবার তিনি বলেছেন—ঠিক ধর্মটি কি? বাইরের প্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতিকে দমন করে সুপ্ত ব্রহ্মকে ব্যক্ত করাই হচ্ছে ধর্ম। এটাই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি? যে-কোন একটা যোগের দ্বারা—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এবং রাজযোগ। এর যে-কোন একটার দ্বারা, না হয় একটার সঙ্গে আরেকটা মিশিয়ে, না হয় সব গুলি মিশিয়ে আমরা ব্রহ্মকে—আত্মাকে ব্যক্ত করতে পারি। আর যখন আত্মদর্শন হয়ে যাবে, তখনই আমরা মুক্ত হয়ে যাব। এটাই হচ্ছে ধর্ম। আর যা কিছু মন্দির, শাস্ত্র, পূজাপার্বণ ইত্যাদি সব হচ্ছে গৌণ ব্যাপার। কিন্তু আমরা গৌণটাকে মুখ্য করে ফেলি, আর মুখ্য জিনিসটাকে একেবারে বাদ দিয়ে দিই।

ধর্মের প্রথম প্রমাণ হল—ত্যাগ। ত্যাগ না হলে কোন ধর্ম হতে পারে না। আমার যদি বৈরাগ্য না থাকে, জগতের সমস্ত ভোগ্য বিষয়ের প্রতি যদি বিরাগ না হয়ে থাকে, এই জিনিসগুলি আমাকে শান্তি দিতে পারে না—এই ধারণা যদি পাকাপাকি ভাবে না হয়ে থাকে, তাহলে আমি ধর্মজীবনের দিকে কখনই যাব না। এই সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে আমি মত্ত হয়ে থাকব। কিন্তু ঘা খেয়ে খেয়ে যখন আমি বুঝব আমার এই ধারণাটা ঠিক নয়; তখন এ-ছাড়া অন্য কোন জিনিস আছে কি না অনুসন্ধান করে দেখতে থাকি। এভাবে যখন আমরা বিচার

করি তখন দেখি—জগতে যা কিছু সবই মৃত্যুর বশীভূত, একদিন না একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। বিচার করে দেখলে—জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি—এই হচ্ছে সংসারের ধর্ম। বুদ্ধদেব ঠিক সেইভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি বাইরে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন যে, মানুষ মাত্রেই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে ভোগে, আর এটাই হচ্ছে সংসারের ধর্ম। এর থেকে বাইরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কিনা জানবার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলেছেন, "জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্"। কাজেই সংসারের ভিতর তুমি শান্তি পাবে, এটা হতে পারে না। সংসারে যে ঝামেলা এই রকমই থাকবে। যদি তুমি শান্তি পেতে চাও তাহলে আমার কাছে এস, আমার আরাধনা কর, আমার উপাসনা কর—এই হচ্ছে গীতার সার কথা। ঠিক সেই জন্যই একটি বা একাধিক যোগকে ধরে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

চারটে যোগের মধ্যে জ্ঞানযোগে আমি বিচার করে দেখব—আমি দেহ নই, বুদ্ধি নই, অহঙ্কার নই, এসব নই। এইভাবে বিচার করে করে আমি আত্মাকে আলাদা করে ফেলে শেষপর্যন্ত আত্মাতে গিয়ে পৌঁছাব। আর যখন সেই বিচারে, ধ্যানে আমি ঠিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাব, তখন আমার আত্মজ্ঞান হবে।

ঠিক সেইভাবে কর্মযোগে আমার নিজের জন্য কোনরকম চিন্তা না করে অপরের জন্য যদি আমি কাজ করে যাই, করতে করতে আমার কথা ভুলেই যাব, অপরের কথাই মনে করব, আর শেষপর্যন্ত আমি জগতের সঙ্গে এক হয়ে যাব। তখন আমি-আমার জ্ঞানটা একেবারে লোপ পেয়ে যাবে আর আমার ভগবদ্দর্শন হয়ে যাবে।

ভক্তিপথে ভগবানের চিন্তা করতে করতে, যা-কিছু আমি করছি ভগবানের জন্য করছি—এইরকম ভগবানের বিষয়ে চিন্তা করে তন্ময় হয়ে, আমি নিজের কথা ভুলে যাব। তখন ভগবদ্দর্শন হবে।

আবার যোগেও তাই। যখন আমি সমস্ত চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এক ভগবানের চিন্তায় দেহ-মন স্থির করব, তখন সমস্ত বৃত্তিগুলো নষ্ট হয়ে গিয়ে শুধু একটা মাত্র বৃত্তি থাকবে অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তায় মন মগ্ন হয়ে যাবে। মনটি হবে নিবাত দীপশিখার মতন—যেখানে বাতাস নেই সেরকম জায়গায় দীপশিখা যেমন জ্বলে, একটুও নড়ে না, স্থির হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি। মন যখন ভগবচ্চিন্তায় ঐরকম একাগ্র হয়ে যাবে, তখন ভগবদ্দর্শন হয়ে যাবে।

এভাবে যে-কোন উপায়েই আমাদের এই ছোট আমিকে যদি ভুলে যাই, আর বড় আমি অর্থাৎ ভগবানের দিকে মন যায়, আর শেষ-পর্যন্ত তাতে তন্ময় হয়ে যাই—তাহলেই ভগবান লাভ হবে। আমরা সাধারণতঃ বেশিরভাগ লোক ভক্তিমার্গটাই ধরি। যাদের বৈরাগ্য বেশি, তারাই জ্ঞানমার্গে যেতে পারে। যোগের অভ্যাস খুব শক্ত। কিন্তু ভক্তিমার্গ সহজ। সংসারে আসক্তিও আছে আবার ভগবানের উপর ভালবাসা, ভক্তিও আছে—এই রকম লোকই সংসারে বেশি দেখা যায়। সেইজন্য, বেশিরভাগের জন্যই ঠাকুর উপায় হিসাবে বলেছেন—"কলিতে নারদীয় ভক্তি"। আমরা ভক্তিমার্গে দ্বৈতবুদ্ধি দিয়ে শুরু করি। ভগবান আলাদা, আমি আলাদা। আমাকে ভগবদ্দর্শন করতে হবে—এইভাবে শুরু করি। শেষপর্যন্ত ভগবানের কৃপায় তাঁর যে অদ্বৈতরূপ আছে, নিরাকাররূপ আছে, সেটা আমরা দর্শন করতে পারব। যেরকম ঠাকুর মা-কালীর দর্শন প্রথমে করলেন, তারপর মা-কালীর কৃপায় নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি করলেন।

ঠিক সেই ভাবেই কেউ দ্বৈত বুদ্ধি দিয়ে আরম্ভ করলেও শেষপর্যন্ত যখন ভগবানের দর্শন হয়ে গেল, তিনি নিজের ইষ্টদেবতাই হন অথবা অন্য কোন দেবতা হন, তারপর নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি করতে বেশি সময় লাগবে না। ভগবানের কৃপায় সগুণ ব্রহ্মেরই একটি রূপ বা যে-দেবতার উপাসনা করেছে তাঁর দর্শনের পর তার শীঘ্রই নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হবে।

কিন্তু গোড়াতেই সগুণ ব্রহ্মের বা আমাদের ইষ্টদেবতার উপলব্ধি করা খুব শক্ত ব্যাপার। সেজন্য প্রথমে বাইরের পূজা, তার পরে জপ, তারপর ধ্যান। এই বাইরের পূজা সবথেকে নিম্নস্তরের সোপান। বাইরের পূজা করতে করতে মন যখন তৈরি হয়ে যাবে, তখন জপ করতে হবে। জপে মন তৈরি হতে হতে ধ্যানের জন্য মন তৈরি হয়, তখন ধ্যান করতে হবে। ধ্যানই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এখন আমাদের অনেকেই যারা ধর্ম-জীবন যাপন করেন, তারা বাইরের পূজার উপর বেশি জোর দেন, জপ-ধ্যানের উপর তত জোর দেন না। বাইরের পূজা নিয়ে সমস্ত সময় কাটান। ঠাকুরঘরে যাচ্ছেন, অনেক দেবতা সেখানে আছেন, সবাইকে একটু ফুলটুল দিলেন, জলটল দিলেন—তাতেই সমস্ত সময় কেটে যায়। তারপর আর জপের সময় থাকে না। আর ধ্যানের কথা তো দূরের কথা। অনেকেই বলেন, আমাদের তো মন স্থির হয় না। কি করে মন স্থির হবে? জপ আর ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না। অনেকে মনে করেন দীক্ষা নিলেই দু-একদিনের ভিতর মনস্থির হয়ে যাবে। এ আরেকটা ব্যাপার। শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "বাবা, ঋষি-মুনিরা জন্মজন্মান্তরে যা পায়নি, কত কষ্ট করে সাধন ভজন করে পেয়েছেন, তোমরা দেখছি ঝট্ করে তা পেতে চাও? তা কি হয়?" তারপরেই বলছেন—"তবে ঠাকুর এসেছেন, সব সোজা করে দিয়েছেন। এখন অল্প করলেই হয়ে যাবে।" কিন্তু অল্পটাও তো করতে হবে। সেই অল্পটাই যদি আমরা না করি, তাহলে কি করে হবে? সাধারণতঃ আমি দেখেছি, যাঁরা জপ করেন, অবশ্য সকলের কথা বলছি না, বেশিরভাগ সময় বাইরের পুজো নিয়ে কাটান; তারপর ১০৮ বার জপ করেই ব্যস্ হয়ে গেল। তাঁদের ধারণাই নেই যে ১০৮ এর বেশি জপ করার প্রয়োজন আছে। যেন এই করলেই সব হয়ে যাবে! জপ যত বেশি করা যাবে তত তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগুনো যাবে।

জপ মানে কি? ঈশ্বরের কোন বিশেষ মূর্তি যিনি আমার ইষ্টদেবতা তাঁর নাম বা মন্ত্র পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার নাম জপ। মন্ত্র মানে কি? যা আমাদের মনকে বাইরের জগৎ থেকে টেনে এনে ভগবৎ পাদপদ্মে ধরে রাখে তাই হচ্ছে মন্ত্র। আর বীজমন্ত্র হচ্ছে—যে-মন্ত্রের জপের দ্বারা অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ হবে, যে-শক্তির জোরে মানুষকে আস্তে আস্তে ভগবদ্দর্শনের দিকে নিয়ে যাবে। সেইজন্য জপ করাটাই হচ্ছে মুখ্য জিনিস। জপের ভিতর যে বীজমন্ত্র তার মধ্যে তোমার সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। জপ না করলে সেই শক্তির স্ফুরণ হবে না। সেইজন্য শুধু ১০৮ বার জপ করলে কি করে এগুনো যাবে? কাজেই বেশি জপ করতে হবে। কিন্তু অনেকেরই হয়তো সংসারের নানা কাজের জন্য বেশি সময় থাকে না। তাদের জন্য বলা হয়েছে, সবসময় তোমরা মনে মনে জপ কর। তোমাদের কাজকর্মের ভিতরে মনে মনে জপ কর।

অর্জুনকে শ্রীভগবান বলছেন—

"তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।"

—সবসময় আমার স্মরণ-মনন কর আর যুদ্ধ কর। এই দুটো একসঙ্গে হবে। তুমি স্মরণ-মনন করতে গিয়ে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে, তা চলবে না। তুমি হচ্ছ

পাণ্ডবদের যুদ্ধের প্রধান আশা-ভরসা। তুমি দু'মিনিট চুপ করে থাকলে যুদ্ধে কি হয়ে যাবে ঠিক নেই। সেজন্য তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। অথচ, তুমি আমাকে ভুলতে পারবে না। এই দুটো একসঙ্গে করতে হবে। ঠিক সেরকম আমাদেরও সংসারের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম নিতে হবে। মনে মনে স্মরণ করতে হবে। এটা যদি করতে পার, তবে কম সময়ের জন্য কম জপ করলেও অনেকটা পূরণ হয়ে যাবে। আর মনে যেন এটা পরিষ্কার ধারণা হয় যে, ১০৮ বার জপ করলে হয়ে গেল, তা নয়। দীক্ষা নিয়ে ১০৮ বার জপ করব, তার জন্য দীক্ষা নয়। তোমাদের জপ করতে হবে সবসময়। মা বলেছেন—"সবাই এসে বলছে কিছু হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না। প্রতিদিন দশ-পনের হাজার জপ করুক দেখি—হয় কিনা দেখব।" তার চেয়ে কমই না হয় কিছু হোক। কিন্তু, শুধু ১০৮ বার জপ করলে কি হবে? সেজন্য জপের উপর জোর দিতে হবে। জপ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের, তোমাদের ইষ্টদেবতার চিন্তা করতে হবে। যদি তোমাদের জপ ঠিক ঠিক হয়, তাহলে মন আপনিই ধ্যানে চলে যাবে। তুমি টেরই পাবে না, এক সময় আপনিই তোমার জপটপ, হয়তো গোনা-টোনা, এসব বন্ধ হয়ে যাবে।

এছাড়া আর একটি জিনিস হচ্ছে, আমরা যতই ধর্মজীবন যাপন করি, যদি আমাদের সংসারের প্রতি টান থাকে, তাহলে বেশি এগুনো যাবে না। ঠাকুর যেমন বলেছেন—নৌকা যদি নদীর ধারের গাছে বাঁধা থাকে, তাতে দাঁড় টানলে কি হবে? নৌকা ওখানেই থেকে যাবে। ঠিক সেইভাবে আমাদের বৈরাগ্য অবলম্বন করতে হবে। বৈরাগ্য অবলম্বন করতে গেলেই আমাদের প্রথমে বিচার করতে হবে। বিচার করে আমরা দেখব সংসারের কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবই নশ্বর; অতএব যিনি সর্বদা আছেন সেই ভগবানকে আমাদের পেতে হবে। যখন মনে এই ভাবটি ওঠে, তখনই আমাদের ধর্মজীবনের পক্ষে সুবিধা।*

[ ক্রমশঃ ]

* গত ১৫.৮ ১৯৭৫ তারিখে গুয়াহাটী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের প্রথমাংশের অনুলিপি।

# বৃন্দাবনে স্বামী জগদানন্দ মহারাজ

## স্বামী ধ্যানানন্দ

[ স্বামী জগদানন্দজী মহারাজ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর বৃন্দাবন সেবাশ্রমে ৭২ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর মন্ত্রশিষ্য। অদ্বৈত-বেদান্তে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী জগদানন্দজী প্রথম থেকেই ছিলেন একজন মননশীল ও তপস্বী সাধু। তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন ছিল সকলের নিকট অনুপ্রেরণার উৎস। বেশির ভাগ সময়ে তিনি রাম-কৃষ্ণ মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে সাধু-ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্র অধ্যাপনায় রত থাকতেন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উচ্চাদর্শের প্রতি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিকতার জন্য তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বায়ু-পরিবর্তন ও বিশ্রামের জন্য জগদানন্দজী বৃন্দাবনে আসেন। সেখানে তাঁর শাস্ত্র ক্লাসে যোগদানকারী সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে উদ্বোধনের ভূতপূর্ব সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী ধ্যানানন্দ ছিলেন অন্যতম। ইংরেজীতে লেখা ঐসময়ের একটি বিবরণী স্বামী ধ্যানানন্দের কাগজ-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। এটি পড়লে অনেকেই উপকৃত হবেন—

এই বিবেচনায় লেখাটির বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল।—সঃ। ]

শ্রীবৃন্দাবনের পুণ্যভূমিতে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ থেকে বিনির্মুক্ত হওয়াই বৈষ্ণব মতাবলম্বীগণের মতে জীবনের পরম পুরুষার্থ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য লীলা-সহচরী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী জগদানন্দজী মহারাজ সেই পবিত্র ভূমিতেই ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। জীবনের শেষের দু'বছর তিনি তিনবার বৃন্দাবনধামে গিয়েছিলেন এবং মোট এগার মাস ওখানে কাটিয়েছেন। বৃন্দাবনে তাঁর অবস্থান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের আশ্রমিকদের নিকটে আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। ওখানে অবস্থানকালে তিনি স্বীয় জীবন ও অপূর্ব চরিত্রমাধুর্যের দ্বারা সমীপাগত আশ্রমিকদের সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন।

আমাদের সঙ্ঘের দু'জন সন্ন্যাসী এবং দু'জন ভক্তসহ জগদানন্দজী বৃন্দাবনে এসে পৌছান ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ত্রিশ বছর আগে প্রথম তিনি বৃন্দাবনে এসেছিলেন। এবার বৃন্দাবনে আসার পূর্বে দেরাদুনের কিষণপুর আশ্রমে তিনি বেরিবেরি রোগে ভুগছিলেন। বায়ু-পরিবর্তন ও চিকিৎসার্থ বৃন্দাবন সেবাশ্রমে আসার জন্য বারবার তাঁকে অনুরোধ করা হয়। তিনি অবশ্য প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পরই বৃন্দাবনে আসেন। এ-প্রসঙ্গে পরে তিনি কতকটা কৌতুকের সঙ্গে বলেছিলেন: "কিষণপুরে থাকার সময় আমি মনে মনে ভাবলুম, বৃন্দাবন-দর্শনের একটা বাসনা আমি বহুদিন ধরেই মনে লালন করছি; কিন্তু এখন যদি সেখানে যাই তবে তো চিকিৎসার্থই যাওয়া হবে, তীর্থ-দর্শনোদ্দেশে নয়। কাজেই সুস্থ হওয়ার পরেই আমার সেখানে যাওয়া উচিত।" ঐ সময় তাঁর কাশ্মীর যাওয়ারও ইচ্ছা ছিল এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ও সঙ্গে এনেছিলেন। কাশ্মীরের সৌন্দর্যের কথা তিনি প্রায়ই বলতেন, আর স্বামীজীও যে কাশ্মীরকে খুব পছন্দ করতেন সে-কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিতেন। বৃন্দাবন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী-প্রদত্ত বাংলায় দু'খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর পত্রাবলী পড়তে পড়তে একখানি চিঠিতে কাশ্মীর সম্বন্ধে স্বামীজীর নিম্নোক্ত কথাগুলি পেয়ে তিনি খুব খুশি হন। কথাগুলি এরূপ:

"..কাশ্মীর বাস্তবিকই ভূস্বর্গ—এমন দেশ আর নাই। যেমন পাহাড়, তেমনি জল, তেমনি গাছপালা, তেমনি স্ত্রী-পুরুষ, তেমনি । এতদিন দেখি নাই বলিয়া মনে দুঃখ হয়।"[১]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীকে ডেকে একটি শিশুর মতো আগ্রহ নিয়ে কাশ্মীর সম্বন্ধে স্বামীজী কি লিখেছেন তা তিনি দেখাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কাশ্মীর যাওয়া আর হল না। কাশ্মীরে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকায় তাঁকে সেখানে যেতে সবাই বারণ করলেন।

বৃন্দাবনে আসার কদিন পরেই জগদানন্দজী বললেন: "আমি শুধু শুধু বসে থাকব কেন? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাস্ত্রাদির ক্লাস আরম্ভ করব।" আমরা পূর্বেই শুনেছিলাম যে, তিনি বহুবছর ধরে বেদান্ত-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছেন, আর তাঁর কাছে বেদান্ত-পড়া নাকি মহাভাগ্যের কথা। কিন্তু তিনি তখন তাঁর সঙ্গে কিষণপুর থেকে আগত সাধুদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণকে প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা শাঙ্করভাষ্যসহ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছিলেন বলে, এবং তাঁর শরীর তখনও দুর্বল

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭।৩১৫

থাকায় শাঙ্করভাষ্যসহ গীতা অধ্যয়নের জন্য আমাদের প্রায় তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হল।

যাহোক পাঠ আরম্ভ হল পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথির দিনটিতে —সোমবার ২৮ নভেম্বর, ১৯৪৯। প্রতিদিন দুপুরে দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা করে ক্লাস হত। প্রথম কয়েকটা দিন তিনি ইচ্ছা করেই খুব ধীর গতিতে পড়াচ্ছিলেন যাতে শিক্ষার্থিগণ 'তত্ত্ব'টি ভাল করে বুঝতে পারে। খুব সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি 'দৃগ-দৃশ্য-বিবেক',[২] 'অবস্থাত্রয়-বিবেক',[৩] এবং 'অন্যোন্যাধ্যাস'[৪] প্রভৃতির সারতত্ত্ব আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। জীবাত্মাকে কিভাবে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর থেকে পৃথক করা যায়—এই তত্ত্বটি বোঝাতে গিয়ে জগদানন্দজী বলেছিলেন যে, সেই একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যতীত এ-জগতে আর দ্বিতীয় বস্তু নেই, এবং সেই ব্রহ্মবস্তুর উপরই দেহ, মন, ইন্দ্রিয় এবং তৎকর্মাদি অজ্ঞানবশতঃ আরোপিত হয়ে থাকে। বেদান্তমতে এটাই শেষ কথা। তাঁর দ্বিতীয় দিনের শিক্ষাদানের সময়ও তিনি একই ধরনের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেনঃ "আমি বেদান্তের সবকিছুই তোমাদের বলেছি। যদি তোমরা কোটি কোটি বেদান্তগ্রন্থও পাঠ কর, এর বেশি কিছু পাবে না। তোমাদের নিয়ে এই পাঠচর্চা যদি আজই আমি বন্ধ করে দিই, তাহলেও কোন ক্ষতি হবে না; কারণ সমগ্র বেদান্তই ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে।"

শাঙ্করভাষ্যসমেত ভগবদ্গীতার অধ্যয়নাদি স্বল্পাধিক তিন মাস সময়ের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। শিক্ষার্থীর মানসিক সন্দেহ নিরসনার্থ জগদানন্দজী যদিও কোন প্রশ্নের উত্তর দানে কখনও শ্রান্তিবোধ করতেন না, তথাপি তাঁর শারীরিক অবস্থা বিশেষ ভাল না থাকায় অতিরিক্ত কোন ক্লাসের ব্যবস্থা সে সময়ে আর করা হয়নি। বায়ু-পরিবর্তনের জন্য ১৯৫০, ৪ মে বৃহস্পতিবার একজন সন্ন্যাসীসহ তিনি আলমোড়ার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন।

শ্রীবৃন্দাবন সেবাশ্রমের আশ্রমিকগণ বছরের শেষ ভাগ পর্যন্ত তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য আগ্রহ-ভরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। জগদানন্দজীরও বৃন্দাবন সেবাশ্রমটি খুব ভাল লেগেছিল এবং শীতের প্রারম্ভেই সেখানে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁকে কনখল এবং নতুন দিল্লী আশ্রমে কিছুদিন করে থাকতে হয়েছিল, সে বছরে তিনি আর বৃন্দাবনে আসতে পারেননি।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুআরি সোমবার তিনজন সন্ন্যাসী ও একজন ভক্তসহ একটি গাড়িতে করে জগদানন্দজী নতুন দিল্লী থেকে বৃন্দাবন এসে পৌছলেন। সময় নষ্ট না করে তিনি শাস্ত্রক্লাস আরম্ভ করতে চাইলেন। ঠিক হল দুটো ক্লাস হবে, একটিতে শাঙ্করভাষ্য সহ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এবং অপরটিতে ভাষ্য ছাড়াই শুধু মূল গীতা পড়ানো হবে।

৪ জানুআরি বৃহস্পতিবার বৃহদারণ্যক উপ-নিষদের ক্লাস আরম্ভ হল। সময় ঠিক হয়েছিল সকাল ৬টা থেকে ৭টা। ক্লাসের শুরুতেই তিনি কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বললেনঃ "বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পড়ে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেননি, তিনি তা লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীগোবিন্দপাদের নিকট থেকে। স্বামী বিবেকানন্দ শাস্ত্রাদি পড়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেননি,

২ দৃশ্যবস্তু থেকে দ্রষ্টা পৃথক—এই জ্ঞান

৩ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় থেকে আত্মা আলাদা—এই জ্ঞান

৪ পারস্পরিক অধ্যারোপ

লাভ করেছিলেন তাঁর আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকে। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আমাদের বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পাঠ করার প্রয়োজনীয়তা একবারেই নেই। তাহলে এ-ক্লাসের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এটাই যে স্বামীজী বলেছেন, ধর্মীয় সত্ত্ব শাস্ত্রাদি পাঠে যত্নশীল না হলে তার পতন হয়। আমরা স্বামীজীর আদেশই পালন করে যাচ্ছি।"

৮ জানুআরি সোমবার আরম্ভ হল গীতাক্লাস। সময় ঠিক হয়েছিল বেলা দেড়টা থেকে আড়াইটা। এই ক্লাসগুলো ছিল খুবই প্রয়োজনীয় এবং আমাদের খুব উপকারে লেগেছিল, বিশেষ করে তাঁদের যাঁদের সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকায় ভাষ্য বুঝতে পারতেন না। সংস্কৃত ভাষায় খুব সীমিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সহজেই তাঁরা আচার্য শঙ্করের গীতাভাষ্য পাঠের সুফল গ্রহণে সমর্থ হয়েছিলেন। জগদানন্দজী সর্বদাই শাঙ্করভাষ্যা-লোকে মূল গীতার ব্যাখ্যা করতেন।

এই সময়েই সকালের দিকে স্বল্প সংখ্যক বিদ্যার্থী নিয়ে আরও একটি ক্লাস আরম্ভ হয়েছিল, 'বাক্যবৃত্তি' এবং 'উপদেশসাহস্রী'র উপর। যাঁরা সময় পেতেন তাঁরা এসে ঐ ক্লাসে যোগদান করতেন।

জগদানন্দজী মহারাজের শরীর ঐ সময়ে ভালই ছিল এবং ক্লাসগুলোও নিয়মিত ভাবে হচ্ছিল। পরে তিনি যখন বেশ কিছুদিনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন ক্লাস বন্ধ করতে হল। তাঁর সুস্থতার পরে আবার ক্লাস শুরু হয় এবং ১০ মে পর্যন্ত চলে।

বায়ু-পরিবর্তনের জন্য তাঁর আলমোড়া যাওয়ার কথা হয়েছিল। সে-উদ্দেশে ১১ মে, (১৯৫১) তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করলেন। কিন্তু মধ্যরাত্রে মথুরা ক্যান্টনমেণ্ট থেকে ফিরে এলেন সাতজন সাধু-ব্রহ্মচারী সহ। কারণ, তাঁর বসার জন্য সিট্ দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কামরায় সংরক্ষণ করা হয়েছিল সেটি হালদুয়ানি পর্যন্ত যাবে না। পরদিন ভোরে আগ্রা থেকে ট্রেন ধরার জন্য তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং পরের দিনে নির্বিঘ্নে আলমোড়া পৌঁছলেন।

শীতের সময় জগদানন্দজী আবার বৃন্দাবনে ফিরে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন অসমাপ্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পাঠ সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে। যদিও তাঁর ইচ্ছা ছিল যতদিন না খুব বেশি শীত পড়ে ততদিন আলমোড়াতেই থাকবেন, কিন্তু অপর সকলের অনুরোধে তিনি তিনজন সাধু এবং একজন ব্রহ্মচারী সহ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর শুক্রবার বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। বৃহদারণ্যক উপ-নিষদের উপর ক্লাসও পুনরায় শুরু হয়ে গেল ক'দিন পরেই, ২৪ নভেম্বর তারিখে। সময় ঠিক হল সকাল পৌনে ছটা থেকে পৌনে সাতটা। বৃহদারণ্যকের উপর আরও একটি ক্লাস শুরু হল প্রত্যহ সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে (জ্ঞান-গুদ্রিতে অবস্থিত সেবাশ্রমের বাড়িতে)। এই ক্লাসে অন্যদের সঙ্গে আলমোড়া থেকে আগত তিনজন সন্ন্যাসী এবং একজন ব্রহ্মচারী উপস্থিত থাকতেন।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২ ডিসেম্বর সকালের ক্লাসে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণে নবম অনুচ্ছেদ (যেখানে পরলোকের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে কখন কখন মানুষের স্বপ্নদৃষ্ট এমন বস্তুর দর্শন হয় যা সে এই জীবনে দেখেনি) অংশের ভাষ্যের ব্যাখ্যার সময় জগদানন্দজী মহারাজ বললেন: "কেউই একথা বিশ্বাস করবে না যে, স্বপ্নে পরলোক দর্শন করা যায়; কিন্তু আমরা এটা বিশ্বাস করি—কারণ শ্রুতি ঐরূপ বলেছেন।" তখন একজন ব্রহ্মচারী বলল: "শোনা যায়, বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পরলোক-বিষয়ক দর্শনাদি পায়।"

একথাটি তিনি খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন করে বললেন: "শ্রুতি-বাক্য চতুর্দিকেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাই আমরা বিভিন্ন স্থান থেকে ঐসব ঘটনা শুনতে পাই।" সেদিনের মতো ক্লাস ঐখানেই শেষ হল।

সেদিনই যে তাঁর সঙ্গে আমাদের শেষ ক্লাস হবে তা আমরা তখন একেবারেই বুঝতে পারিনি। ঠিক ঐদিনই বিকেলে বেড়ানোর জন্য তিনি একটু হাঁটার পরই শ্রান্ত বোধ করেন, তাই সেদিন আর বেড়ানো হল না। ঘরে ফিরে এসেই সন্ধ্যা ছটার সময় তাঁর একবার পায়খানা হল এবং রাত দশটায় আবার একবার। এটা ছিল তাঁর পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। পরদিন প্রাতে তিনি ক্লাসের ঘণ্টা দেওয়ার দায়িত্বে নিরত ব্রহ্মচারীকে ডেকে ঘণ্টা দিতে নিষেধ করলেন। এই সর্বপ্রথম তিনি নিজে ক্লাস বন্ধ রাখার জন্য আমাদের বললেন। বেশ কয়েকবার তাঁর স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে অন্যান্যদের মতানুযায়ী। কিন্তু তিনি নিজে সব সময়ই বাধা দিয়ে বলতেন যে, ক্লাস চলাকালীন তিনি বেশ সুস্থই থাকেন। জ্ঞান-গুদ্‌রিতে অনুষ্ঠিত ক্লাসটিও সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল। শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে তিনি বললেন যে একটু দুর্বলতা অনুভব করছেন, তবে গুরুতর কিছু নয়। সেদিন তাঁকে একটু উদাসীন দেখাচ্ছিল, যাহোক তিনি যথারীতি প্রাতরাশ এবং দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণ করলেন। বিকাল চারটা নাগাদ তিনি স্বীকার করলেন যে আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই তাঁর বক্ষাস্থির নিচে ( sub-sternum ) তিনি সামান্য ব্যথা অনুভব করছিলেন। বিকাল চারটা থেকে ব্যথা তীব্র হয়ে উঠল, কিন্তু তাতেও তিনি তাঁর স্বাভাবিক হাস্য-কৌতুকের ভাবটি হারালেন না। বিকাল পাঁচটা নাগাদ তাঁর বমি হল এবং তাতে অম্লতা লক্ষ্য করে তাঁকে অম্লতা-প্রতিষেধক ওষুধ ( antacid ) দেওয়া হল। একজন সন্ন্যাসী তাঁকে একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধও দিলেন। এবং তারপরেই হোমিওপ্যাথি বনাম অ্যালোপ্যাথি নিয়ে নানা হাস্য-কৌতুক আরম্ভ হল যাতে মহারাজ স্বয়ং অংশ নিলেন।

তাঁর সেবায় রত একজন সন্ন্যাসীকে তিনি তাঁর বুকের ব্যথা প্রসঙ্গে বললেন: "এর নাম হচ্ছে 'যম-কণ্টক'—যা কোন ভাবেই আরাম বোধ হয় না।" প্রথমে সন্দেহ করা হয়েছিল যে মহারাজের ব্যথা হৃৎপিণ্ডের ব্যথা এ্যানজাইনা ( angina )—যা গুরুতর ধরনের নয়; কিন্তু ঐ রাতেই ধরা পড়ল যে ব্যথার কারণ হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহকারী শিরায় রক্ত জমে যাওয়া অসুখ—করোনারি থ্রম্বোসিস ( Coronary Thrombosis )। ইন্‌জেক্‌শন নেওয়ায় তাঁর আপত্তি থাকায় সে-রাতে আর ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হল না। যথোপযুক্ত ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও সে-রাতটি তিনি অনিদ্রা এবং অস্বস্তিতেই কাটালেন।

পরদিন, অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর তিনি বললেন: "যদি ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে আমার এই ব্যথা তোমরা কমাতে পার, তবে তোমাদের আমি হাজার ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার অনুমতি দিলাম।" তখন থেকে প্রয়োজনীয় ইন্‌জেক্‌শনগুলো তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়া হতে থাকল। তাতে একটু আরাম হলেও বেলা ১১টা নাগাদ তাঁর অবস্থা খুব সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিয়ে সে অবস্থা কাটিয়ে আবার একটু শক্তি ফিরে পেলেন এবং চিকিৎসারত ডাক্তারদের বললেন: "তোমরা যমের বাড়ি থেকে আমাকে ফিরিয়ে এনেছ।" তারপর বেলা ১টা, সন্ধ্যে ৬টা এবং রাত্রি ৮টা ৪০ মিনিটে অবস্থার পুনরায় অবনতি ঘটে। প্রত্যেক বারই অক্সিজেন দিয়ে সাময়িক-ভাবে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা হচ্ছিল।

রোগের আক্রমণগুলো ছিল আকস্মিক এবং ক্ষণস্থায়ী ; কিন্তু প্রত্যেকটি আক্রমণেই প্রাণসংশয় দেখা দিত। দুপুর ১ টায় আক্রমণ এত প্রবল ছিল যে তাঁর জীবনের আশা সকলেই ছেড়ে দিয়েছিল এবং সাধু-ব্রহ্মচারীরা সমবেত-ভাবে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নাম উচ্চারণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সর্বশেষ আক্রমণ এল রাত দশটা সতের মিনিটে। এই আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে এক মিনিটের মধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। রোগের তীব্র আক্রমণের সময় যখন তাঁর বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে যেত সেই সময়গুলো বাদ দিলে বাকি দীর্ঘ ত্রিশ ঘণ্টার তীব্র রোগ যন্ত্রণার মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ বজায় রেখেছিলেন। শরীর ছেড়ে দেওয়ার মাত্র দু'ঘণ্টা আগেও তিনি বলেছিলেন : "আমার যন্ত্রণার প্রকাশ আমি করছি, যদিও কোন 'ভদ্রলোক' তা প্রকাশ করবেন না!" জগদানন্দজীর মুখের শেষ কথাটি ছিল : 'মা, মা'। রোগ-যন্ত্রণা চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেল, আর তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল এক দিব্য প্রশান্তির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

দ্বৈতবাদীদের ভূমিতে একজন মহান অদ্বৈত-বাদী শরীর ত্যাগ করলেন। অনেকের কাছেই এটা একটা অপূর্ব ঘটনা বলে মনে হবে। কিন্তু যাঁরা জগদানন্দজীকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁদের কাছে এটা ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, জ্ঞানমার্গী হলেও স্বামী জগদানন্দজী অন্তরে ছিলেন প্রচণ্ড ভক্তিমান। তিনি বলতেন : "যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসবেন তাঁরা শুধু জ্ঞানী হবেন না, তাঁরা হবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, 'বিজ্ঞানী'। তাঁরা জ্ঞান-ভক্তি উভয়ই পাবেন।" বৃন্দাবন তিনি খুব ভালবাসতেন এবং বলতেন, যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামীজী সেখানে এসেছেন এবং বাস করেছেন সেজন্য শ্রীবৃন্দাবন নিশ্চিতভাবে আবার জেগে উঠবে। এমন কি 'দশনামী' সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ অধিক সংখ্যায় শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করতে আসছেন দেখে তিনি খুব খুশি হতেন। বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলো তিনি দর্শন করেছিলেন এবং ঐ পবিত্রতীর্থ পরিক্রমাও করেছিলেন। এমন কি তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি নন্দগ্রাম, বর্ষানা, গোবর্ধন এবং রাধাকুণ্ড দর্শন করতে গিয়েছিলেন। অনেক সময়েই তিনি উদ্ধবকে গোপীদের শিক্ষাদানের সেই গল্পটির উল্লেখ করতেন যেখানে উদ্ধব বৃন্দাবনের গোপীদের ধ্যাননেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

জগদানন্দজীর কাছে সন্দেহাচ্ছাদিত কোন প্রশ্নের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে উত্থিত সকল বাদ-প্রতিবাদের মীমাংসা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যেত যদি কেউ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা অথবা স্বামীজীর কোন কথা সে-বিষয়ে উদ্ধৃতি করতে পারত। তিনি ছিলেন আচার্য শঙ্করের একজন বড় সমর্থক এবং শঙ্করের সমগ্র রচনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ার জন্য সর্বদাই তিনি আমাদের উৎসাহিত করতেন। শঙ্কর রচনাবলীর উপর দখল হয়ে গেলে সুরেশ্বরাচার্য এবং সর্বগাত্মমুনির রচনাবলী পাঠের কথা তিনি বলতেন। বহু পুস্তক পাঠ করে সময় অপচয় করা থেকে তিনি আমাদের নিবৃত্ত করতেন এবং খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখতেন আমরা যেন সবচেয়ে প্রামাণিক বইগুলো একটি সঠিক ক্রম অনুযায়ী পাঠ করি। ক্লাসে বেদান্ত পাঠের চরমোদ্দেশ্যের প্রতি তিনি বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি চাইতেন না যে পণ্ডিত বা বক্তা হওয়ার জন্যই আমরা বেদান্ত পাঠ করি। বলতেন : "তোমাদের যদি সেরূপ কোন দুরাশা থাকে তবে কখনও তোমরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে না। বেদান্তের

জন্যই তোমাদের বেদান্ত পাঠ করা উচিত। 'ত্বম-পদার্থ-বিবেক'[৫] ব্যতীত কখনও তোমরা বেদান্ত উপলব্ধির পথে এক পাও এগুতে পারবে না।" আবার কখনও বলতেন: "আমি এই ভেবে আশ্চর্য হই যে ঈশ্বরলাভের জন্য কেউ সংসার ত্যাগ করে সাধু হয়ে গেলে আত্মজ্ঞানলাভ করার পথে তার আর কি বাধা থাকতে পারে!" তিনি ধরেই নিতেন যে যারা ঈশ্বরলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করে তারা সকলেই সর্বোচ্চ জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীসম্পন্ন। এর মধ্যে কেউ তার সীমাবদ্ধতার কথা বললেও তিনি তাকে হতাশ হতে তো দিতেনই না, বরং উৎসাহ দিতেন। বলতেন: "যেহেতু তারা সবাই ঈশ্বরোদ্দেশে সংসার ত্যাগ করে এসেছে সেজন্য তাঁদের চিত্ত যথেষ্ট পবিত্র। 'চিত্তশুদ্ধি' মানে মনে কখনও সামান্য মলিন চিন্তাও আসবে না—তা নয়। 'চিত্তশুদ্ধি' মানে 'বিবিদিষা'।[৬] তুমি যদি যথার্থই সত্য-জিজ্ঞাসু হও, সত্যলাভ তোমার হবেই। যে চায়—সেই পায়। আন্তরিকতাই আসল কথা।" তিনি বারবার বলতেন: "ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রধান বাধাই হচ্ছে, তা লাভ করা অসম্ভব বলে মনে চিন্তা করা। লোকে ভাবে যে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণই শুধু ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীমা বলেছেন যে, এমন কি এখনও অনেকে 'দিব্যদর্শন' এবং 'দিব্যজ্ঞান' পাচ্ছে।"

যে-অদ্বৈততত্ত্ব এত জোরের সঙ্গে জগদানন্দজী তাঁর ক্লাসে পড়াতেন তাতে তিনি যে সম্পূর্ণ আস্থাশীল ও বিশ্বাসী ছিলেন সেটা তাঁর কাছে যাঁরা পড়তেন তাঁদের সকলের নিকটই বিশেষভাবে প্রতিভাত হত। কারণ তিনি ঐ বিষয়ে যা বলতেন প্রামাণিক কর্তৃত্ব নিয়েই বলতেন। নিজের অনুভূতির বিষয়ে কিছু বলা সর্বদাই তিনি এড়িয়ে যেতেন। তথাপি কোন কোন ঘটনায় আমাদের কাছে তিনি স্বীকার করেছেন তার সেই অনুভূতির কথা যা পাওয়ার পর জীবনে অধিক কিছু আর লাভ করার থাকে না।

আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছাড়াও স্বামী জগদানন্দজীর হৃদয় এবং মস্তিষ্কজাত এমন কতকগুলি গুণাবলী ছিল যা তাঁর সংস্পর্শে আগত সকলের নিকটই তাঁকে প্রিয় করে তুলত। তাঁর স্বভাবটি ছিল মধুর। তাঁর ছাত্র ব্যতীত কদাচিৎ কখনও অপর কারও মতের তিনি প্রতিবাদ করতেন। কথা বলার সময় অপরের মনোভাব ও দৃষ্টিকোণ বোঝার ক্ষমতা তাঁর ছিল। কখনও তিনি কারও সমালোচনা বা নিন্দা করতেন না। যদি কখনও কারও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলতেই হত তবে তিনি যত্ন সহকারে সে ব্যক্তির নাম এড়িয়ে যেতেন। তিনি কখনও 'আমাদের বাড়ি', 'আমাদের গ্রাম', 'আমার বাবা'—ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করতেন না। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন রক্ষণশীল সন্ন্যাসী। তিনি কখনই 'তোমাকে খুব রোগা দেখাচ্ছে', 'তুমি একটু মোটা হয়েছ'—এ-ধরনের কথা বলে শরীরের দিকে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন না।

জগদানন্দজী খুব বেঁটে বা খুব লম্বা ছিলেন না। গায়ের রঙটি ছিল উজ্জ্বল। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর বুদ্ধি ছিল অবিশ্বাস্যভাবে পরিষ্কার আর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তাঁর মুখমণ্ডল দুর্লভ স্মিতহাস্যে জ্যোতিঃপূর্ণ থাকত। যে-কোন লোক পাঁচ মিনিট তাঁর সঙ্গে কথা বললেই তাঁর মুখে সেই স্মিতহাসির খেলার দর্শন থেকে বঞ্চিত হত না। তিনি ছিলেন একটি শিশুর মতো সরল। অনেক সময়েই তাঁর বয়স সত্ত্বেও তাঁকে ঠিক একটি শিশুর মতোই দেখাত।

৫ 'তৎ-ত্বম্-অসি' শ্রুতিবাক্যে 'ত্বম্' শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থবোধ।
৬ সত্যকে জানার ইচ্ছা।

তাঁর চারদিকে কি ঘটছে সে বিষয়ে জগদানন্দজী কখনই উদাসীন ছিলেন না। সেবাশ্রমের কাজকর্মে তিনি স্পষ্টতই উৎসাহ প্রদর্শন করতেন। সরকার সেবাশ্রমকে একটি নতুন জমির অধিকার দিয়েছে এ-কথা জেনে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছিলেন এবং সেখানে নতুন হাসপাতালগৃহ নির্মাণের বিষয়ে উৎসাহপূর্ণ কথা বলতেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ নভেম্বর বৃন্দাবনে পৌঁছেই চল্লিশ হাজার টাকার একটি দান সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর করেন। টাকাটা জনৈক বম্বেবাসী নতুন জমিতে একটি মহিলা-বিভাগ নির্মাণের জন্য দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। যে-ব্রহ্মচারীর নিকট তিনি সব খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, সেই ব্রহ্মচারী বিস্মিত হয়ে গেল যে স্বামী জগদানন্দজীর মতো একজন সন্ন্যাসী, যিনি আপাতদৃষ্টিতে মিশনের সকল কার্যকলাপ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন, তিনি এতটা কৌতূহল দেখাবেন কোন প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও তার কাজের অগ্রগতির উপর!

সকলের প্রতিই ছিল তাঁর মমতা। একবার তিনি আলমোড়া যাওয়ার সময় সেবাশ্রমের জনৈক অসুস্থ কর্মীর ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেন, কারণ কর্মীটি নিজের অসুস্থতার জন্য এসে বিদায় জানাতে অক্ষম ছিল।

রেডিওতে সংবাদ শুনতে তিনি খুব ভাল বাসতেন, আর খুব কৌতূহল নিয়ে নিয়মিত সংবাদপত্র দেখতেন। ভারতের এবং বিদেশের সব রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি নিজেকে যথেষ্ট অবহিত রাখতেন। তৎকালীন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রায়ই তিনি বলতেন: "লোকে ভুলে যায় যে এটা তাঁদের নিজেদের সরকার। একদিনে চরম উৎকর্ষ (perfection) লাভ করা যায় না। আমরা কি এই সেদিন স্বাধীনতা পাইনি?"

শেষ বিদায় এসেছিল আকস্মিক ভাবেই। সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁর ছাত্র সাধু-ব্রহ্মচারী—যাঁরা বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য দূর নিকট নানাস্থান থেকে এসে তাঁর চারিদিকে জড় হতেন—তাঁদের জীবনে যেন এক শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল যা আর কখনও পূরণ হওয়ার নয়। কিন্তু যে অত্যুচ্চ ভক্তি ও জ্ঞানের শিক্ষা তাঁরা তাঁর পদতলে বসে পেয়েছিলেন তা তো ব্যর্থ হবার নয়। তা সমস্ত জীবন ধরে তাঁদের উদ্দীপিত করবে। গুরু ও শ্রুতির প্রতি যাতে তাঁদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস কখনও দ্বিধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য তাঁদের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় আচার্য বলতেন: "মানুষকে মুক্ত করার জন্য ভগবান দুটি রূপ ধরে আসেন—গুরুরূপে এবং শ্রুতিরূপে। একটি রূপ আরেকটি থেকে আলাদা নয়। এক আত্মারই দুই রূপ। এই দুটিতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ছাড়া কেউ জ্ঞানলাভ করতে পারে না।"

# শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম*

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

একজন ভদ্রলোক, নাম শ্রীগোপালচন্দ্র রায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেছেন। আমি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তিনি কোন্ স্তরের লেখক বা ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তাও আমি জানি না। কোন জীবন-চরিত লিখতে গেলে নিজের একটি বিশিষ্ট ধারণাকে প্রমাণ করবার জন্যই গ্রন্থ রচিত হলে সেটা ঠিক বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক-মনের পরিচয় দেয় না। কেননা বিজ্ঞান ও ইতিহাস পুরুষতান্ত্রিক নয়, এগুলি বস্তুতান্ত্রিক। সুতরাং অত্যন্ত নিরপেক্ষ না হলে কোন উত্তম জীবনী লেখা সম্ভবপর নয়। শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থটিতে কতদূর নিরপেক্ষভাবে জীবনী লেখা হয়েছে তা আমি বলতে পারছি না। কেননা তাঁর সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করার মতো সময় আমার নেই। কেবল একজন ব্যক্তি 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিম-চন্দ্র' প্রবন্ধটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সেই অধ্যায়টি আমি পাঠ করেছি। পাঠ করে এই কথাই মনে হয়েছে যে, এই লেখা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবমূল্যায়নের জন্য লিখিত। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এমন একজন ব্যক্তি নন যাঁর অভিমতকে কোন গুরুত্ব দিতে হবে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র ও সেই যুগের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পরের যুগেও বিরাট মনীষী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউই জীবনের গভীরতা এবং ব্যাপ্তির দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনীয় নন। সাধারণ মানুষের—তিনি সাহিত্যিক হন বা রাজনীতিবিদ হন বা সমাজসংস্কারক হন, এমন কি দার্শনিক হন—তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দের তুলনা হতে পারে না। কেননা তাঁদের প্রভাব তাঁদের জীবৎকালে এবং তার পরেও কিছুদিন হয়তো দু-এক শতাব্দী প্রসারতা লাভ করে ধীরে ধীরে তা নামেমাত্র বর্তমান থাকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তির প্রভাব উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মতো প্রবহমান থেকে সমগ্র মানব জাতিকে তার পরিমণ্ডলের ভিতরে নিয়ে আসে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের দেড়শত বর্ষ পূর্তির পর আমরা দেখছি যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সমগ্র বিশ্বে কী বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা জাতির জীবনে দেড়শ বছর কিছুই না। এটা জগতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রথম চরণপাত মাত্র। পূর্বগগনে সূর্যোদয়ের প্রথম অরুণিমা। তাঁদের জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়মাত্র মানুষের সম্মুখে অপাবৃত। এর পূর্ণরূপ কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করবে তা এখনই মানুষের সীমিত দৃষ্টির মধ্যে আনা সম্ভব নয়। কিছুদিন পূর্বে আমি সোভিয়েত রাশিয়ার 'লৌহ যবনিকার' অন্তরালে প্রবেশ করেছিলাম। কেউ প্রচার করেনি—প্রচার করা বা কোন ভাবের অনুপ্রবেশ সেখানে অসাধ্য ছিল। তবুও দেখা গেছে সেখানকার বিদ্বজ্জন মধ্যে শ্রীরাম-কৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহ কিভাবে যেন অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। ওখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্বন্ধে এবং স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও লেখমালা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। মস্কো পরিত্যাগের প্রাক্ মুহূর্তে একজন বিশ্ববিখ্যাত মাইক্রো-বায়োলজিস্ট আমার

* গোপালচন্দ্র রায় প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের 'সংযোজন' অংশের অন্তর্গত 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা।

সঙ্গে দেখা করে অন্তর্জগত সম্বন্ধে আলাপ-কর-ছিলেন। তারপর আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি তাঁর পকেট থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের অ্যালবাম দেখালেন। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি মানুষ এখন বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে উর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছে। কম্যুনিস্টদের স্বর্গ রাশিয়াতেও এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেছে। আমাদের দেশের যারা কম্যুনিস্টদের অনুসরণকারী তাঁরা এখনও তাঁদের স্ট্যালিনের যুগে বা ব্রেজনেভের যুগে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন কিন্তু রুশ দেশেও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এটা আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য এই যে, বঙ্কিম বা অন্য কোন লেখক বা তথাকথিত অধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যাতা বা ধর্মমতের প্রচারক, তাঁদের সঙ্গে সমভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং শিক্ষার বিস্তৃতি বুদ্ধের জীবন এবং তাঁর ভাবধারার বিস্তৃতির সঙ্গেই কেবল তুলনা করা যায়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর মতে এই আণবিক যুগে অশোক এবং গান্ধী প্রচারিত অহিংসার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও সর্বধর্ম সমন্বয় কেবলমাত্র জগৎকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে। এই রাজ্যে বঙ্কিম নেই, কেশবচন্দ্র নেই, রবীন্দ্রনাথ নেই; সারা পৃথিবীতে আর কোন মানুষ নেই যাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা চলে। সুতরাং শ্রীযুক্ত রায় কর্তৃক 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা লিখিত হয়েছে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও অনেকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে বলে আমি 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইছি।

এই প্রাক্কথনের পরে শ্রীযুক্ত রায়ের যে গবেষণা তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। এর প্রয়োজনও আছে। কেননা এই পণ্ডিতম্মন্য এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির লিখিত অনেক পুস্তক আছে। শুনেছি লেখক বলে কিছু খ্যাতিও আছে। সুতরাং তাঁর লেখা যেহেতু ছাপা অক্ষরে বেরিয়েছে, অনেকের কাছে তা অবধারিত সত্য বলে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং দেখা দরকার যে তাঁর লেখা সত্য বলে গ্রহণীয় কিনা।

প্রথমেই তিনি বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কাহিনী বহুকাল ধরেই নির্বাধায় চলে আসছে।" এই বলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার এবং তাঁদের মধ্যে কথোপকথন নিয়ে নানারকম প্রশ্ন উঠিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, "আজ পর্যন্ত কেউই এই কাহিনীটির উৎস অনুসন্ধান তো করেনইনি, এমন কি এর সত্যাসত্য নিয়েও যাচাই করেননি। এই কাহিনীটি সম্বন্ধে অনেকদিন থেকেই আমার একটা দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ বলা তো দূরের কথা, রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোন-দিন দেখাই হয়েছিল কিনা সন্দেহ।"

কেউ যদি বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত এবং বহু ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত একটি ঘটনাকে নিজের পূর্ব-নির্ধারিত কোন দৃঢ় ধারণা নিয়ে বিচার করতে আরম্ভ করেন তবে সেটা মুক্ত মনের পরিচায়ক নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিয়ম হচ্ছে suspended judgement অর্থাৎ স্থগিত সিদ্ধান্ত বা রায়। কিন্তু যিনি দৃঢ় ধারণা নিয়ে একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন সেটা বিচার হয় না, বিচারের প্রহসন হয় মাত্র। একটি গল্পে পড়েছিলাম যে, একজন ব্যক্তি 'যুক্তিসঙ্গত' 'যুক্তিসঙ্গত' বলে খুব চিৎকার করছিল। অপরপক্ষ বলল যে, যুক্তিসঙ্গত কথার অর্থ কি? তৃতীয় ব্যক্তি বললেন যে, যুক্তিসঙ্গত মানে মনের মতো। শ্রীযুক্ত রায়ও এই রকম যুক্তিসঙ্গত কথাই বলে গেছেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র যত বড় সাহিত্যিকই হন না কেন

এবং তিনি ধর্ম নিয়ে যত আলোচনা করে থাকুন না কেন তাঁকে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষানবীশ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তিনি বিচারের দিক দিয়ে ধর্ম আলোচনা করেছেন। তাও কোঁত, বেন্থাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক যাঁরা ধর্মের সঙ্গে সাধনার যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁদের অনুসরণ করে 'অনুশীলনতত্ত্ব' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধে সাধনা প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না।

রামচন্দ্র দত্ত, স্বামী সারদানন্দ, অক্ষয়কুমার সেন এবং শ্রীম বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হওয়ার কথা লিখে গিয়েছেন। কিন্তু এঁদের অনেকেই অপরের কাছ থেকে ঘটনা সংগ্রহ করেছেন, বিশেষতঃ স্বামী সারদানন্দ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী লিখেছিলেন এবং বাল্যকাল থেকে তাঁর শেষদিন পর্যন্ত ঘটনাবলী তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। কাজেই তিনি সব জিনিসই নিজের দৃষ্ট ঘটনার উপরে নির্ভর করে লেখেননি। বহু তথ্য তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল নানা জনের কাছ থেকে। সেগুলি সংগৃহীত হয়েছিল এবং লিখিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের বহুদিন পরে। সুতরাং যে তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন সে-তথ্য যে সর্বদা একেবারে অভ্রান্ত তা নাও হতে পারে। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ এমন একজন ব্যক্তি যিনি নানা গবেষণা করে তবেই লিখেছেন। বঙ্কিম বা শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে যাঁদের কথা অবান্তরভাবে শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়ে এসেছেন, স্বামী সারদানন্দের গ্রন্থে তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লেখাটা প্রাসঙ্গিক নয়। সেজন্যই স্বামী সারদানন্দ সংক্ষেপে এঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। যখন তিনি লিখেছিলেন তখনও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' যে-ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উল্লেখ রয়েছে তা প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কিম সম্বন্ধে কথামৃতের ৫ম ভাগে ১৩৩৯ সালে অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্বামী সারদানন্দের দেহান্ত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত শ্রীম'র বর্ণিত বঙ্কিম-শ্রীরামকৃষ্ণের যে কথোপকথন সেটি দেখেননি। তিনি উপস্থিত যদি বা থেকে থাকেন তবুও তাঁকে বহুদিন পরে স্মৃতিনির্ভর হয়েই সংক্ষেপে ঐ ঘটনার উল্লেখ করতে হয়েছিল। রামচন্দ্র দত্ত যে বঙ্কিম-শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের সময়ে উপস্থিত ছিলেন এটা পাচ্ছি না। সুতরাং একজন বিখ্যাত ব্যক্তির (বঙ্কিমচন্দ্রের) সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সাক্ষাৎকার হয়েছিল সেটির বিশদ বিবরণ রামচন্দ্রের কাছে আশা করা যায় না। এবং যেহেতু তিনি সাক্ষাৎকারের সময়ে উপস্থিত ছিলেন না সেই হেতু তাঁর যে লেখা সেটিকে শ্রীম-কথিত তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ বলে মনে করা যেতে পারে। যেটিকে শ্রীম বর্ণিত "hearsay and unrecorded at the time of the Master" বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন জনসাধারণের জন্য পুঁথি রচনা করতে আরম্ভ করেন এবং তা দেখে স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং ভাবকে পৌছে দেওয়ার যন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় অশিক্ষিত ছিলেন। কাজেই কিছু কিছু ভুল তাঁর গ্রন্থে থাকা সম্ভব, যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন এবং তিনি যখন গ্রন্থ রচনা করেন তখন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম'র বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। শ্রীগোপালচন্দ্র অক্ষয়কুমার সেন সম্বন্ধে মনের ময়লাধারী বলে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার সেনও শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শলাভে ধন্য হয়েছিলেন। এই ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সর্বজনবিদিত। তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে ভাবাবেশে অঙ্গ-বিকৃতি ঘটায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আদর করে 'শাঁখচুন্নী মাষ্টার' এই অভিধায়

অভিহিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ নাম অনেককেই দিতেন। যেমন তিনি স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দকে 'কেলুয়া' এবং বলতেন। যখন জাপানী বিদগ্ধব্যক্তি ওকাকুরা তাঁকে জাপানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এদেশে আসেন তখন তাঁকে তিনি 'অক্রুর খুড়ো' বলতেন। অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি জানি না শ্রীযুক্ত রায়ের অবচেতন থেকে চেতন মন পর্যন্ত ধোপাবাড়ির কাচা কাপড়ের মতো ময়লাহীন এবং শুভ্র কিনা। যাঁরা মন বিশ্লেষণ করেন এরূপ কারুর কাছে গিয়ে তিনি যদি তাঁর মনের বিশ্লেষণ ( psycho-analyis ) করেন তখন বোঝা যাবে তাঁর মন ময়লাবিহীন কিনা। তবে আমাদের সমাজে বাইরের ভদ্র আচরণটুকুই ময়লাবিহীন রাখতে পারলেই তিনি শুদ্ধ এবং পবিত্ররূপে পরিগণিত হন। কিন্তু গোপালচন্দ্র রায় প্রচারিত যে-বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পানদোষ ছিল, চরিত্রগত অন্য দু-একটি দোষও তখনকার মানুষের জল্পনা এবং আলোচনার বিষয় হয়েছিল, একথা মনি বাগচী লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মের একজন আদর্শ পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন না।

এর পরে লেখক কেন রামকৃষ্ণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়নি, তার সংখ্যাগত একটি দীর্ঘ পর্যালোচনার অবতারণা করেছেন। এগুলি সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে এই লেখকের ইতিহাসজ্ঞান এবং দৃষ্টিনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন, "এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা—শিকাগো ধর্মসম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দেশে ফিরলে হাওড়া স্টেশনে তাঁকে অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সমুৎসুক হয়েছিলেন। অথচ এ ব্যাপারে রামকৃষ্ণের প্রধান-শিষ্য বিবেকানন্দকে অভিনন্দন তো নয়ই, এমন কি তাঁর সম্বন্ধে তিনি একটা কথা কোথাও বলেননি। এ থেকেও বলা যেতে পারে রামকৃষ্ণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন আকর্ষণই ছিল না।" কী অপূর্ব ইতিহাসজ্ঞান এবং অপূর্ব যৌক্তিকতা! প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শিকাগো ধর্মসম্মেলনের বক্তৃতার পরে যা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়, যখন দেশে এসেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত। বঙ্কিমের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রীঃ দীর্ঘকাল রোগভোগের পরে। তিনি বিবেকানন্দকে জানতেন কিনা এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত ছিলেন কিনা কোথাও উল্লিখিত নেই। স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফেরেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, তার তিন বছর পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকে। বিদ্যা-ধুরন্ধর গোপালচন্দ্র কি মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোক থেকে এসে হাওড়া স্টেশনে স্বামী বিবেকানন্দকে অভিনন্দন এবং সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত হয়ে তাঁর সমুৎসুকতা প্রদর্শন করবেন?

লেখক ভূধর চট্টোপাধ্যায়কে 'শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক ভক্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। ভূধর চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন না। তাঁর দাদা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজে শশধর তর্কচূড়ামণিরই ভক্ত ছিলেন।

শশধর তর্কচূড়ামণির কথা লেখক তাঁর প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে উঠিয়েছেন। সুতরাং তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেইসময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা

দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

"কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে-ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

"আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম। আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্র-আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্র কেউই শশধর তর্কচূড়ামণিকে বিশেষ কোন পাত্তা দেননি।

তর্কচূড়ামণির ব্যাপারে আর একজনের লেখাও উদ্ধৃত করা যায় যদিও তিনি তর্কচূড়ামণিকে ব্যঙ্গ করেছেন কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'ভাববার কথা' গ্রন্থে একটা ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখেছেন। সেটার সংক্ষেপিত রূপ হচ্ছে এই: লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের ভারী ধুম! লক্ষ্ণৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম্ হাসেন-হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে। এই উপলক্ষে দর্শকবৃন্দের মধ্যে দুজন ভদ্র রাজপুত ঠাকুর সাহেব ধুম দেখতে লক্ষ্ণৌ এসেছেন। সবাই ইমামবাড়ার দিকে যাচ্ছে দেখে তাঁরাও সেদিকে গেলেন। ইমামবাড়ায় ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন একজন সিপাহীর কাছে। সে বলল যে, দ্বারপাশে যে মুরদ খাড়া রয়েছে ওকে আগে পাঁচ জুতা মারলে তবে ইমামবাড়ার ভেতরে যাওয়া যাবে। সে মূর্তি কার? সিপাহী বললেন ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। সে হাজার বছর আগে হাসেন-হোসেনকে মেরেছিল, যার জন্য এদিনের ক্রন্দন ও শোক-প্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কিন্তু রাজপুত ঠাকুররা জুতা মারা তো দূরের কথা গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদের মূর্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি ও গদগদস্বরে স্তুতি আরম্ভ করল এবং বলল যে—ভেতরে আর কি ঠাকুর দেখব? ভল্ বাবা অজিদ, দেবতা তো তুঁহি হায়, অস্ মারো শারোকো কি অভি তক্ রোবত। অর্থাৎ ধন্য বাবা ইয়েজিদ, এমনি মেরেছো শালাদের—কি আজও কাঁদছে!! এই গল্পটি লিখে স্বামীজী আরও কয়েকটা গল্প এর সঙ্গে যোগ করেন তার মধ্যে একটা এই: "গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে, তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হলে ঐরকম চেহারাই হয়ে থাকে। যাই হোক্, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বক-শক্তির গতাগতিবিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুণ দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হতে মায় কাদা পুনর্বিবাহ, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ-প্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ

ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে !!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে-সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি। তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ !! 'বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালদলের আদর! ভল্ বাবা 'অভ্যাস' 'অস্মারো' ইত্যাদি।"

উপরে লিখিত রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দের লেখা থেকেই বোঝা যায় যে শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম প্রচারের যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা হিন্দু ধর্মের উন্নতি না করে মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছিল। তাই আজ তাঁর নাম এবং তাঁর উপদেশ খুব কম লোকেরই জানা আছে। শশধর তর্কচূড়ামণির নাম এখন অধিকাংশ বাঙালীর কাছেই অজ্ঞাত ও অবলুপ্ত।

লেখকের হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আছে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র কোঁত, বেন্থাম প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুধর্মের আলোচনামাত্র করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের যে প্রধান অবলম্বন সাধনার দ্বারা সত্যের সাক্ষাৎকার তা তাঁর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা ছিল পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো বৌদ্ধিক ভূমিতে ধর্মব্যাখ্যার চেষ্টামাত্র, যার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ছিল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে। তিনি কোন কিছুই গ্রহণ করেননি যতদিন সেটি তাঁর জীবনে প্রমাণীকৃত (verified) না হয়েছে। মূর্তিপূজা থেকে অদ্বৈতব্রহ্মের উপলব্ধি পর্যন্ত সবই তিনি তাঁর জীবনে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন। এই সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমত তা হিন্দু-ধর্মের অন্তর্গত হোক বা বহিরাগতই হোক সব গুলিরই সাধনা করে তাদের সত্যতা নির্ণয় করেছিলেন। জগতের ধর্মের ইতিহাসে, আর্নল্ড টয়েনবীর মতে, এটি একটি অদ্বিতীয় এবং অনুপম ('unique') ব্যাপার। সুতরাং লেখক—যিনি ধর্ম সম্বন্ধে কোন সাধনা ইত্যাদি করেছেন বলে মনে হয় না—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মসাধনার সমালোচনা করতে গিয়ে নিজের প্রাজ্ঞতাই প্রকাশ করেছেন। এখানে ঔপনিষদিক অর্থে 'প্রাজ্ঞ' শব্দ ব্যবহার করছি—যিনি প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ। তাঁর পক্ষে স্ত্রীজাতির গোপনীয় অঙ্গ অশ্লীল ভাবের উদয় ঘটায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মনে তা জগৎ-যোনি ও মাতৃভাবেরই উদয় করত। শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিক সাধনার সময়ে লিঙ্গপূজা, রাধাযন্ত্র নিয়ে সাধনা প্রভৃতি যা বলেছেন তা লেখকের পক্ষে বোঝা সাধ্যাতীত। সুতরাং 'অব্যাপারেষু ব্যাপারং' তাঁর না করলেই ভাল ছিল। এবিষয়ে যদি উনি সংস্কৃত জানেন—তাঁকে 'হিতোপদেশ' পাঠ করতে বলছি।

লেখক স্বামী সারদানন্দের পুস্তক এবং অক্ষয়কুমার সেনের পুস্তক সম্বন্ধে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে এঁদের পুস্তক সামগ্রিক জীবনের ঘটনাবলী দিয়ে রচিত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত। তাই বহুলোকের কাছে

বহু ঘটনা শুনে সেগুলির উপর নির্ভর করে তাঁদের পুস্তক লিখতে হয়েছিল। সুতরাং যেগুলি প্রত্যক্ষ ঘটনা নয় তাতে কিছু ভ্রমপ্রমাদ থাকতে পারে। প্রত্যেক জীবনীতেই এটা হওয়া সম্ভব। বিশেষ করে বাল্যকালের ঘটনা এবং যে-সমস্ত ঘটনা লেখকের স্বয়ং না-দেখা সেগুলি সম্পর্কে অপরের কাছে শ্রুত বিষয় না নিয়ে উপায় থাকে না। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আমরা শ্রীম'র তথ্যই গ্রহণ করব। কেননা তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন।" এ-বিষয়ে শ্রীম আরও যা লিখেছেন সেটি দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন: "তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর অর্থাৎ শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে।" এ-বিষয়ে লেখকের বক্তব্য: "রাম-কৃষ্ণের এক-এক সময়ের দীর্ঘ আলোচনা বা কথাবার্তা সঙ্গে সঙ্গে না লিখে পরে লিখলে, তাতে যে শ্রীম'র নিজের অনেক কথাই ঢুকবে, তা বলাই বাহুল্য। কেননা শ্রীম এমন শ্রুতিধর ছিলেন না যে, পরে ঐ অত কথা লিখবার সময় তিনি স্মৃতি থেকে হুবহু সেই কথাগুলোই লিখে-ছিলেন।" লেখক কেমন করে জানলেন যে শ্রীম শ্রুতিধর ছিলেন না? যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে তিনি শ্রুতিধরই ছিলেন এবং স্মৃতিধরও ছিলেন। সুতরাং শ্রীম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় লেখকের কথা অর্বাচীনতার এবং অজ্ঞানতার পরিচায়ক। তিনি লিখেছেন রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গের সময় শ্রীম "উপস্থিত ছিলেনই না" এবং "ডায়েরী থেকেও নেওয়া নয়।" এটি লেখকের কোন্ অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত? শ্রীম যেখানে উপস্থিত ছিলেন না সেটি তাঁর সূত্রানুযায়ী তিনি কথামৃতে লিপিবদ্ধ করেননি। সুতরাং তিনি সেদিন উপস্থিতই ছিলেন। বরি-শালের বিখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন: "যাক্ তুমি অনেক দিন হ'ল ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হয়েছিল জানতে চেয়েছিলে। তাই জানাবার একটু চেষ্টা করি। কিন্তু আমি তো আর শ্রীম'র মতো কপাল করে আসিনি, যে শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ মুহূর্ত আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একে-বারে ঠিক ঠিক লিখে রাখবো।" এতেই বোঝা যায় দেশবিখ্যাত অশ্বিনীকুমারও জানতেন যে শ্রীম কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখেছিলেন এবং পরিবেশন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও লিখেছেন: "The Socratic dialogues are Plato all over, you are entirely hidden." অর্থাৎ সক্রেটিসের যে কথোপকথন সেটা প্লেটোর মতামতেই পূর্ণ। কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ নিজেকে গোপন রেখেছ। কাজেই শ্রীম নিজের উল্লেখ কথামৃতে খুব কমই করেছেন, করলেও প্রথম দিকে দর্শনের সময় কিছুটা আছে। আর যখনই নিজের ভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তখন অন্য নামে সেই ভাব দিয়েছেন। তাছাড়া মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করে তিনি কি বলেছিলেন সেটা জেনে নিতেন এবং দেখতেন তিনি ঠিক সব কথা ধরতে পেরেছেন কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণের একজন যুবক শিষ্য (পরে সন্ন্যাসী) কাগজ পেন্সিল নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখে রাখছিলেন দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, ওকাজ তাদের নয়, ওকাজ মাস্টারের। লেখক শ্রীম সব ঘটনা পরপর না লেখায় অস্বাভাবিকতার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শ্রীম কি কারও আদেশমাফিক গ্রন্থ লিখেছেন? তাঁর কাছে যখন যেটি প্রকাশযোগ্য এবং লোকের

পক্ষে কল্যাণকর মনে হয়েছে সেটা তিনি তাঁর 'কথামৃত' প্রকাশের সুদীর্ঘকালে ( ১৯০১ থেকে আরম্ভ করে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ) নানা সময়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। এর ভেতরে পারম্পর্য রক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না। লেখকের নিজের কি কোন স্বাধীনতা থাকবে না? গোপালচন্দ্রের বই-এর ভেতরে তিনি লিখেছেন, "বিক্রি দেখে বই-এর সংখ্যা বাড়াবার" বা "এতেই তো মনে হতে পারে, পরে তিনি তাঁর গ্রন্থের অপর ভাগটি রচনা করবার জন্যই আগের দিনের লেখার জের টেনে বাড়িয়ে এই ভাগ রচনা করেছেন। এবং এরূপ সন্দেহ বা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক।" অপূর্ব যুক্তি! সন্দেহ উঠতে পারে সেই মন সম্পর্কেই যে-মন একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে কোন একটা জিনিস প্রমাণ করতে চায়। আর অনুমান করা কাকে বলে লেখক কি সেটা জানেন? অনুমান করার কতকগুলি নিয়ম ন্যায়শাস্ত্রে আছে। ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রের (logic-এর) ভিতরেও আছে। অনুমান করতে গেলে আমাদের তর্কশাস্ত্রে বলা হয়েছে পাঁচটি অবয়ব-বাক্য প্রয়োজন আছে। সেগুলো হল—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন এবং নিগমন। এগুলো না থাকলে ঠিক অনুমান হয় না। সুতরাং লেখককে অনুরোধ, অনুমান প্রভৃতি করার আগে নিজে একটু ন্যায়শাস্ত্র পাঠাদি করে তারপর অনুমান করতে যাবেন। 'অনুমান' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে নিজেকে তিনি হাস্যাস্পদই করে তুলেছেন।

লেখক, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার কখনই হয়নি এটা প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করেছেন। সবগুলোর এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তবুও কয়েকটা বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিম-চন্দ্রের দর্শন হয়েছিল এবং সে দর্শনে শ্রীম উপস্থিত ছিলেন। এ-বিষয়ে প্রমাণ হচ্ছে এই যে, শ্রীম নিজে বলেছেন যে, তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপরেই নির্ভর করেছেন, শোনা কথার ওপরে নয়। যাঁরা শ্রীম-কে জানেন এবং দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে তিনি কতটা সত্যাশ্রয়ী ছিলেন, বিনয়ী ছিলেন এবং গৃহস্থ হয়েও সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত ছিলেন। এগুলো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের কথা কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়নি বলেই যে সে সাক্ষাৎ-কার হয়নি একথা এক নির্বোধ ছাড়া কেউ বলবে না। আচার্য ব্রজেন শীল প্রভৃতি অনেকে তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথাও কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লেখক কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের যে অনুভব সেটারই উল্লেখ করেছেন। সেটা পড়লে এই কথাই মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র যেন সুকুমার রায়ের লেখা—"হুঁকো-মুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা, মুখে তার হাসি নাই দেখেছ?" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নানা জীবনী পাঠে জানা যায় তিনি কেমন সব রকম মানুষের সঙ্গেই সহজভাবে মিশতেন এবং দীনবন্ধু প্রভৃতি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে রঙ্গরসিকতা, একই ঘরে বসবাস তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের যে বর্ণনা "কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার কিছুমাত্র গা-ঘেষাঘেষি ছিল না।"—এটা মাত্র আংশিক উপলব্ধি।

গ্রন্থকার শ্লীল, অশ্লীল ব্যাপার নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করেছেন। অশ্লীলতা কেবলমাত্র মুখের কথার ভেতরেই থাকে, লেখার ভেতরে কি থাকতে পারে না? রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে "প্রতি অঙ্গ কাঁদে তার প্রতি অঙ্গ তরে" 'দেহের মিলন' কবিতায় লেখা আছে।

সমগ্র কবিতাটি অশ্লীল। 'বিবসনা' কবিতাটি— সেটিও ঠিক তাই। 'চুম্বন' কবিতাটিও ঠিক তাই। আরও অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অশ্লীলতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটা স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়াতীতকে ধরতে পারেননি, ইন্দ্রিয়গত জীবনকে নিয়েই ছিলেন। সুতরাং তাঁর ভেতরের যে ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রকাশ তাঁর কাব্যে থাকবেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তা নয়। তাঁর মন মুখ এক ছিল, তাঁর গ্রাম্যভাষা ছিল এবং গ্রাম্যভাষার ভিতর দিয়ে তিনি নিজের ভাব প্রচার করতেন। এমন একটি ঘটনার কথা অশ্বিনীকুমার দত্ত উল্লেখ করেছেন। কেশবের সামনে তিনি বলেছেন: "'আমি তোমার খাবো দাবো থাকবো, আমি তোমার খাবো শোবো আর বাহ্যে যাব। আমি ওসব পারবোনি।' কেশববাবু দেখছেন আর ভাবে ভরপুর হয়ে যাচ্ছেন, এক একবার ভাবের ভারে 'আঃ আঃ' করছেন।" সুতরাং নিরক্ষর গ্রাম্য মন-মুখ এক একটি ব্যক্তি উচ্চতত্ত্ব যদি সভ্যসমাজের তথাকথিত অশ্লীল ভাষায় কথা বলে থাকেন এবং উচ্চতত্ত্বও প্রকাশ করে থাকেন, তাতে কি বোঝা যায় যে তাঁর ভেতরটা অশ্লীলভাবে পরিপূর্ণ?

গোপাল চন্দ্র রায়ের আদর্শ পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র কি করেছেন তাঁর জীবনের যে অনুশীলনতত্ত্ব তাতে লেখা আছে। তিনি মানুষের সমস্ত বৃত্তিকেই অনুশীলন করতে বলেছেন পরিমার্জিতভাবে। এর ভেতরে কামেরও স্থান আছে। সুতরাং অশ্লীলতারও স্থান আছে। স্ত্রী-সম্ভাষণ প্রভৃতির ভেতরে তাঁর নিজের জীবনে এর প্রকাশ কি হয়নি? এমন কি তাঁর উপন্যাসের ভেতরে রোহিণীকে কিভাবে তিনি মগ্নাবস্থা থেকে উদ্ধার করে চেতনা ফিরিয়েছেন গোবিন্দলালকে দিয়ে। তার বর্ণনাও খুব শ্লীল নয়। দেবী চৌধুরাণীকে তিনি নিষ্কাম কর্মের আদর্শ হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার ভেতর দিয়ে দেবী চৌধুরাণীর জীবনের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "যথাকালে পুত্র পৌত্র সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল।" প্রফুল্লর যে পুত্রাদি হয়েছিল সেটা কি নিষ্কাম কর্মের দ্বারা? বঙ্কিমচন্দ্র গীতার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং গীতাকে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ মনে করে তার একটি টীকাও লিখেছিলেন। কিন্তু এই গীতার ভেতরে চতুর্দশ অধ্যায়ে একটি শ্লোকার্ধ আছে, "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্"। যোনি, গর্ভ এবং গর্ভাধান যে গ্রন্থের ভেতরে আছে সেই অশ্লীল কথায় পরিপূর্ণ গ্রন্থকে কি করে বঙ্কিমচন্দ্র একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন?

পূর্বেই বলেছি যে, সাধারণ মানুষের ধর্ম আচারভিত্তিক ও বুদ্ধিভিত্তিক। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাই ছিল। অধ্যাত্মবিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলে তিনি কোথাও বলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমের যে কথাবার্তা সেটা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম যা দিয়েছেন তাইই ঠিক। লেখকের আবোল তাবোল কথা দিয়ে সেটা খণ্ডন করার চেষ্টা একটা হাস্যকর ব্যাপার। বঙ্কিম অধরের সঙ্গে এবং আরও কয়েকটি বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঠাকুরকে তাঁরা কিভাবে দেখেন সেটা নির্ণয় করবার জন্যই এসেছিলেন। শ্রীম'র ভাষায়, "তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন ও বলিবেন, যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কিনা।" শ্রীম বঙ্কিমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে লিখেছেন যে, প্রথম যখন অধর তাঁকে 'বঙ্কিমবাবু' এই নামে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পরিচিত করান তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলেছিলেন, "তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!" বঙ্কিম তার উত্তরে ন, "আর মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য)

সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে বলেছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।" এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ব্যাখ্যান করেছিলেন। তখন বঙ্কিম প্রভৃতি অভ্যাগতগণ ইংরেজীতে কথা বলছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ইংরেজী বুঝতেন না। কাজেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইংরেজীতে কি কথাবার্তা হচ্ছে? অধর বলেছিলেন যে তাঁরা কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা আলোচনা করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে হাস্য-পরিহাস করে বলেছিলেন একটা নাপিতের গল্প। এক ভদ্রলোককে সেই নাপিত কামাচ্ছিল। ভদ্রলোকের একটু লাগায় সে বলেছিল 'ড্যাম'। তাতে নাপিত জিজ্ঞাসা করে 'ড্যামে'র অর্থ কি? ভদ্রলোক বলেন যে ও কিছু নয়, তুই সাবধানে কামা। নাপিত সন্তুষ্ট না হয়ে বলেছিল, 'ড্যাম' মানে যদি ভাল হয় তাহলে তাদের চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত সকলে ড্যাম আর যদি 'ড্যাম' মানে খারাপ হয় তাহলে ঐ ভদ্রলোকের চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত সকলেই ড্যাম। এই গল্পটি সকলেই খুব উপভোগ করে-ছিলেন। তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচারের জন্য বঙ্কিম বলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে চাপরাস না পেলে কেউ প্রচার করতে পারে না। এ-বিষয়ে একটু রসিকতাও করেছিলেন। চাপরাস অর্থে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ দেওয়া। আমরা জানি বঙ্কিম অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন, প্রচার করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "আদেশ হয়নি তুমি বকে যাচ্ছ; ঐ দুদিন লোক শুনবে তারপর ভুলে যাবে।" বঙ্কিমও বহু প্রচার করেছিলেন তাঁর গ্রন্থের মধ্য দিয়ে—ধর্মতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ। কিন্তু আজ সে গ্রন্থগুলি বা কে পড়ে আর সে মতই বা কে গ্রহণ করে! কিন্তু অশ্লীলভাষী শ্রীরামকৃষ্ণের যে-প্রচার তার সম্বন্ধে শ্রীঅশ্বিনী-কুমার দত্ত শ্রীমকে লিখেছিলেন, "ঠাকুরের সঙ্গে ও মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা···ঐ ক'দিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃত-কণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে 'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ'। আমারই যদি এই, এখন বোঝ তুমি কেমন ভাগ্যধর!"

তারপরে নানা বিষয়ে আলোচনা হতে হতে শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "মানুষের কর্তব্য কি?" বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন: "আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।" তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ছ্যাচড়া' বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যা রাতদিন তিনি করেন তাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। লোক যা খায় তার ঢেকুর ওঠে এবং মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। এ-সম্বন্ধে লেখকের অভিমত "অতএব, মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? এর উত্তরে বঙ্কিমের মতো মানুষ কখনই আহার, নিদ্রা, মৈথুন বলতে পারেন না বা বলেনওনি।" কেন পারেন না বা বলেননি এ-বিষয়ে যে-সমস্ত কথা লেখক তুলেছেন সেগুলো মোটেই ঠিক নয়। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি যে 'কথামৃত' শ্রীম'র প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি যা লিখেছেন সেটাই ঠিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময়ের লোক এবং তিনি যে-উদ্দেশ্যে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন তাতে মৈথুন শব্দের উচ্চারণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় এবং তাঁর জীবনীতে রঙ্গ-রসিকতার অনেক কথা পাওয়া যায়। কাজেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষার জন্য মৈথুন শব্দ উচ্চারণ করে থাকেন যেটা সে যুগের পক্ষে

অসম্ভব কিছু নয়। প্রাচীন শাস্ত্রেও রয়েছে, "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। ধর্মহি তেসামধিকো বিশেষঃ ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" সুতরাং যে-বঙ্কিমচন্দ্র বেদ, গীতা, স্মৃতি, পুরাণ পাঠ করেছেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি বেদ থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতেই মৈথুন প্রভৃতি কথা পাঠ করেছেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যখন আলোচনা করতেন বা কথাবার্তা বলতেন বিশেষতঃ সেই যুগে যখন মানুষের মুখ আলগা ছিল তখন এইসব কথা বলতেন না এটা কি করে বলা যাবে? বঙ্কিমচন্দ্রের কোন 'বস্‌ওয়েল' বা শ্রীম ছিল না। তাঁর দৈনন্দিন কথাবার্তা, বন্ধুদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস কি ধরনের হত তা কে বলবে? লেখক অবশ্য সর্বজ্ঞ, তিনি একেবারেই বলে দিয়েছেন, 'বলেনওনি'। কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করতেই গিয়েছিলেন এবং সেই সময়ে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেটা সংস্কৃত গ্রন্থ হতে পাওয়া, যার উদ্ধৃতি আমরা পূর্বে দিয়েছি। সেটাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণীতে' এক জায়গায় লিখেছেন, "কি রকমে কি হইল, বলিতে পারি না, ব্রজেশ্বর তো জিতেন্দ্রিয় কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোল বাধিয়াছিল। সেই আর একখানা মুখ মনে পড়িল বুঝি, সে মুখে সেই রাত্রে এমনই অশ্রুধারা বহিয়াছিল—সে চোখের জল মোছানটাও বুঝি মনে পড়িল; এই সেই, সেই এই, কি এমনই একটা কি গোলমাল বাধিয়া গেল। ব্রজেশ্বর, কিছু না বুঝিয়া কেন জানি না—দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লের মতো দেখিল। বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে—আঃ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার!" দেবী চৌধুরাণীতেই 'প্রফুল্লকে চুম্বন করেছিলেন' এভাব আছে। লেখক রবীন্দ্রনাথের লিখিত কয়েকটি লাইন পড়েই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে-ধারণা করেছেন তাতে মনে হয় বঙ্কিম ভিক্টোরীয় যুগের একটি 'প্রুড' ছিলেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থসমূহ এবং তাঁর লেখা পাঠ করলে বঙ্কিম তা ছিলেন বলে মনে হয় না। পূর্বেই বলেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগণ গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপুরুষ কিনা স্থির করবেন বলেই। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণকে 'আহার নিদ্রা মৈথুন' এই কথা উচ্চারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া দেখে জানবার ইচ্ছা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। সেজন্য ঐরকম কথা ব্যবহার করে তিনি নিজেকেও হেয় করেননি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাও প্রকাশ করেননি। তিনি পরীক্ষাই করেছিলেন। লেখক আরও নানারকম কথার অবতারণা করেছেন। সেগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যক্ষদর্শী, সত্যবাদী, মহা ধার্মিক পুরুষ শ্রীম যা লিখেছেন সেগুলিই ঠিক এবং সত্য। কিন্তু লেখকের তা বোঝবার মতো শক্তি নেই। বোধহয় শোপেনহাওয়ার একজায়গায় বলেছেন—"Books are like mirrors and if an ass looks into it you cannot expect an angel to look out" (বইগুলি হচ্ছে দর্পণের মতো, তার দিকে যদি একটি গাধা তাকায় তাহলে তুমি আশা করতে পার না যে দর্পণের ভেতর থেকে একজন দেবদূত বাইরের দিকে তাকাচ্ছে): আর এক জায়গায় বলেছেন, "If a book and a head come into contact and one sounds hollow, is it always the book?" (যদি একটা বই-এর সঙ্গে এবং একটি মাথার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে এবং তার একটি শূন্যগর্ভ মনে হয়, তবে সেটা কি পুস্তকই?) সুতরাং "পড়িলে ভেড়ার শিঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"—এই বলেই আমার প্রবন্ধ সমাপ্ত করতে হচ্ছে।

# সমর্পিতা ক্রিস্টিন

## শ্রীমতী চিত্রা বসু

ভগিনী ক্রিস্টিন বিবেকানন্দ-পদে নিবেদিত একটি মহান্ প্রাণ। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক আলোয় বিচ্ছুরিত তাঁর জীবনকথা। যাঁরা স্বামীজীর নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মতে ক্রিস্টিন ছিলেন স্বামীজীর শ্রেষ্ঠতম ও সর্বাধিক প্রিয় শিষ্যা। স্বামীজীর অন্যতম আমেরিকান অনুরাগিণী মিস্ ম্যাকলাউড বলতেন যে স্বামীজী ক্রিস্টিনকে অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। ক্রিস্টিনের উন্নত জীবন সম্বন্ধে স্বামীজীর কোন চিন্তা ছিল না। শিষ্যাকে লিখেছিলেন, "...আমি জানি যে তুমি মহৎ, আর তোমার মহত্ত্বে আমার সর্বদা আস্থা আছে। অন্য সকলের বিষয়ে ভাবনা হলেও তোমার সম্পর্কে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই।"[১]

ক্রিস্টিনের জীবনী ও তাঁর অপূর্ব মহিমময়ী চরিত্রটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁরই 'মেমোয়ার্স অফ্ বিবেকানন্দ' রচনায়। এর ছত্রে ছত্রে বিধৃত অসাধারণ নৈষ্ঠিক গুরুভক্তি। শিষ্যার কাছে তাঁর মহান্ গুরু শুধুমাত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ নন, তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ময় দেবতা; এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখলেন—"ধন্য সেই দেশ যে দেশে তিনি জন্মেছিলেন, তাঁরাও ভাগ্যবান যাঁরা তাঁর সময় এই পৃথিবীতে ছিলেন, আর আশীর্বাদপুষ্ট, শতধারায় আশীর্বাদপুষ্ট অল্প কয়েকজন যাঁরা তাঁর পাদমূলে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।"[২]

ক্রিস্টিনের জন্ম জার্মানীর নুরেনবার্গ শহরে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ অগস্ট। কাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজার দেশের রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল এই মননশীলা নারীর ধমনীতে। পিতা ফ্রেডারিক গ্রীনস্টাইডেল জার্মান পণ্ডিত। তিন বছর বয়সের শিশু ক্রিস্টিনকে নিয়ে তাঁর বাবা-মা সুদূর জার্মানী ছেড়ে আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে চলে আসেন স্থায়ী বসবাসের জন্যে। তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান হল ৪১৮ নং অ্যালফ্রেড স্ট্রীটের বাড়ি, আমেরিকার জার্মান অধ্যুষিত এলাকায়। মাত্র সতেরো বছর বয়সে ক্রিস্টিন পিতাকে হারালেন। পিতা আত্মভোলা সংসার-অনভিজ্ঞ পণ্ডিত মানুষ; কিছুই সঞ্চয় রেখে যাননি। ক্রিস্টিনের কাছে পিতাই ছিলেন আদর্শ পুরুষ—পরম শ্রদ্ধেয়। পিতার মৃত্যুর পর ক্রিস্টিনকেই মা-বোনেদের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। শুরু হল তাঁর জীবন-সংগ্রাম, দীর্ঘ বিশ বছর দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ। সংসারের দাবিতে তাঁকে ডেট্রয়েটের ফ্রি পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। জীবনধারণের কঠিন সংগ্রামই তাঁকে সংসার জীবনের প্রতি অনীহা এনে দিল। অন্তর্জীবনে তিনি যেন কোন অদৃশ্য মহাশক্তির প্রেরণা অনুভব করতেন। চার্চের নিষ্প্রাণ উপদেশ ক্লান্তিকর মনে হত তাঁর কাছে। তিনি খ্রীষ্টান সায়েন্টিষ্ট দলের সদস্য হলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন না।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুআরি এক শীতের সন্ধ্যায় ক্রিস্টিন বন্ধু মিসেস্ ফাঙ্কির সঙ্গে ইউনিটেরিয়ান চার্চে এসেছিলেন ধর্ম সম্বন্ধে গতানুগতিক বক্তৃতা শোনার জন্য। সেদিন ঘোষণা করা হল ভারত থেকে আগত এক সন্ন্যাসী, বিবেকানন্দ বক্তৃতা করবেন। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি এসেছিলেন বন্ধুর অনুরোধে, কারণ ফাঙ্কি ছিলেন

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৮।১৮৯

২ Reminiscences of Swami Vivekananda, 2nd edition, P. 149

আশাবাদী ; ভাবতেন কোনদিন হয়তো পরশ-পাথরের সন্ধান তিনি খুঁজে পাবেন। কিন্তু ক্রিস্টিন সেদিন সে-মুহূর্তেই তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা বুঝলাম আমরা সেই পরশপাথরের সন্ধান পেয়েছি যা আমরা এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক নিঃশ্বাসে আমরা বলে উঠেছিলাম 'ভাগ্যিস এসেছিলাম।' "[৩] ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথায় —সেই নবীন সন্ন্যাসীর দেহ স্বর্ণাভায় মণ্ডিত; সুদূর ভারত থেকে তিনি প্রাচীন আদর্শ ও আত্মার বাণী বহনকরে এনেছিলেন।[৪] ডেট্রয়েটে বিবেকানন্দের বক্তৃতাসভায় জনসমাবেশ বৃদ্ধি পেতে লাগল, কারণ এর আগে শ্রোতৃবৃন্দ এত নতুন কথা শোনেননি। স্বামীজী শোনাতেন ভারতের রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদের কথা। উপনিষদের সংস্কৃত শ্লোকগুলি যখন তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হত তখন সভায় বিরাজ করত গাঢ় নিস্তব্ধতা। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের অনেকেই স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করে তাঁদের বহু সমস্যার উত্তর জেনে নিতেন। ক্রিস্টিন লিখেছেন, "আমার কিন্তু স্বামীজীকে এই কষ্ট দেবার কথা মনেই ওঠেনি।…সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের সান্নিধ্যে এসেই সব সন্দেহের অবসান হয়েছিল। তাঁর বক্তৃতার প্রথম ক'টি বাক্য শোনার পরে সব-সময়েই মনে হত এ শুধু শোনা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি।"[৫] প্রথম দর্শনেই এই ভারতীয় ঋষির পায়ে ক্রিস্টিন নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। সেবার ক্রিস্টিন বা ফাঙ্কি কারুরই স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি, কারণ ২৩ ফেব্রুআরি স্বামীজী ডেট্রয়েট শহর ছেড়ে চলে যান। 'গুরু' শব্দটি তখনও দুই বন্ধুর কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ক্রিস্টিন বলেছেন, "কি এসে যায় তাতে, যা জেনেছি তা হৃদয়ঙ্গম করতেই তো কত বছর কেটে যাবে।"[৬] স্বামীজীর ভাবী এই দুই শিষ্যা সেদিন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন এই মহিমান্বিত পুরুষের দৈব সান্নিধ্যে তাঁরা কোনও দিন কোনও ভাবে শিক্ষালাভ করবেন। তাঁদের আশা সফল হয়েছিল। স্বামীজীকে তাঁরা গুরুরূপে পেয়েছিলেন সেণ্টলরেন্স নদীর তীরে নির্জন বনমধ্যস্থ সহস্রদ্বীপোদ্যানের শান্তিময় পরিবেশে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই ক্রিস্টিন ও ফাঙ্কি স্বামীজীর উদ্দেশ্যে সহস্রদ্বীপোদ্যানের পথে যাত্রা করেছিলেন। পথ ছিল তিনশত মাইল দীর্ঘ ও দুর্গম। সেই দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে দুর্যোগের রাতে শ্রীমতী ডাচারের গৃহের সন্ধান করে যখন তাঁরা পৌছলেন তখন তাঁরা বর্ষণসিক্ত, ক্লান্ত। বিবেকানন্দ-সমীপে পৌছেই তাঁরা বলে উঠেছিলেন "ভগবান্ যীশু এখন পৃথিবীতে বর্তমান থাকলে যেভাবে আমরা তাঁর কাছে যেতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা করতাম, আমরা আপনার কাছে সেভাবেই এসেছি।"[৭] বিবেকানন্দ বলেছিলেন "শুধু যদি আমার ভগবান্ খ্রীষ্টের মতো তোমাদের এই মুহূর্তে মুক্ত করে দেবার ক্ষমতা থাকত।"[৮]

৩ Ibid, P. 106

৪ Ibid, P. 161

৫ উদ্বোধন ৭৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১০০

৬ Reminiscences, P. 164-65

৭ দ্রঃ দেববানী ১০শ সংস্করণ, পৃঃ ২১

৮ ঐ, পৃঃ ২১

সহস্রদ্বীপোদ্যানের দিনগুলি স্বামীজীর পাশ্চাত্য ভ্রমণের সবচেয়ে মনোরম সময়। সেখানে প্রকৃতির নিঃস্তব্ধ পরিবেশ তাঁকে দিয়েছিল তাঁর একান্ত কামনার আধ্যাত্মিক মুহূর্তগুলি। স্বামীজী তাঁর আদর্শ প্রচার ও রূপায়ণের জন্য পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের প্রথম দলটি এখানেই তৈরি করেন। এখানে দীক্ষার পূর্বে স্বামীজী মানসনেত্রে দেখেছিলেন ক্রিস্টিনের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ণ চিত্র—ভারতের বেদীতে স্বামীজীর উৎসর্গীকৃত পুষ্প। গুরু অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন, ঐ জীবনেই ক্রিস্টিনের তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে। সেণ্টলরেন্স নদীর তীরে শ্রীমতী ডাচারের কুটিরের বারান্দায় নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে ক্রিস্টিন অন্যান্যদের সঙ্গে গুরুদেবের আধ্যাত্মিক উপদেশবাণীর অমৃত-পীযূষধারা পান করতেন। কোন কোন দিন রাত্রি অতিবাহিত হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠত, গুরু তাঁদের নিয়ে বসতেন জগদতীত এক অসীমের রাজ্যে যেখান থেকে প্রাত্যহিক জগতে ফিরে আসা এক বেদনাময় অনুভূতি।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি বর্ণনা করতেন। সেই সময়ই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত 'India' শব্দটি ক্রিস্টিনের মনে এক মহাসঙ্গীতের আহ্বান এনেছিল, যার মধ্যে ছিল নানা স্বর—"ভালবাসার, প্রচণ্ড আবেগের, আকুল আকাঙ্ক্ষার, ভক্তি-শ্রদ্ধার বিয়োগান্তক নাটকের, বীরত্বের…এবং আবার ভালবাসার সুর।"[৯]

ভারতের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, পরিবেশ সবকিছু নিয়ে ভারতবর্ষ তাঁর কাছে প্রিয় বাসনাভূমি হয়ে উঠল। ক্রিস্টিন তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন "এরপর থেকে ভারতবর্ষই হয়েছিল আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।"[১০]

৯ Reminiscences, P. 163

১০ Ibid, P. 163

স্বামীজী ভারতের মহীয়সী নারী চরিত্র সীতা, সাবিত্রী, সতী, উমা, পদ্মিনী এঁদের কাহিনী বর্ণনা করতেন, এবং শিষ্যার হৃদয়েও ভারতীয় নারীর আদর্শ চিরকালের মতো অঙ্কিত হয়ে উঠত। এখানেই শিষ্যার কাছে গুরু ভারতের ভাবী নারী-শিক্ষার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন, এবং ভারতের অসহায় বিধবাদের শিক্ষাদান করার ও অর্থোপার্জনের দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কথাও বারবার বলতেন।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে শিষ্যা দেখলেন আধুনিকতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি হয়েও স্বামীজী ভারতের প্রাচীন কুপ্রথাগুলির নিন্দা তো করতেনই না, বরং কিভাবে তাঁদের সংশোধন করা যায় তার কথাই তিনি বলতেন। শিষ্যা এখানে আরও প্রত্যক্ষ করলেন যে তাঁর গুরু এক নিঃস্ব সন্ন্যাসী, যিনি মুহূর্তের জন্য নিজের স্বরূপ ভোলেননি; একটি মুক্ত স্বাধীন আত্মা যেন দেহপিঞ্জরে বদ্ধ থেকে ছটফট করছেন।

স্বামীজী তাঁর এই আমেরিকান শিষ্যাটিকে কত যে স্নেহ করতেন তা' তাঁর 'ক্রিস্টিনা'কে (স্বামীজী ক্রিস্টিনা বলেই ডাকতেন) লেখা চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায়। গুরু জানতেন শিষ্যা শান্ত প্রকৃতির, মিতভাষী এবং সর্বোপরি অত্যন্ত ধৈর্যশীল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের সময় ক্রিস্টিনাকে যে চিঠিগুলি রিজলী মেনর এবং নিউইয়র্ক থেকে লিখেছিলেন তার অনেকগুলিতেই তিনি ক্রিস্টিনের স্নেহময় ও শান্ত সাহচর্যে ডেট্রয়টে কয়েকদিন বিশ্রাম উপভোগ করার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১১ এপ্রিল স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য ভ্রমণের প্রাক্কালে ক্রিস্টিনকে ইংল্যাণ্ডে আসার জন্য লিখেছিলেন "তোমাকে দেখলে বড় খুশী

হবো।"[১১] স্বামীজী দিনের পর দিন অসুস্থ শরীরের যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তা মনে হয় একমাত্র ক্রিস্টিনকেই জানিয়েছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর প্যারিস থেকে স্বামীজী ক্রিস্টিনকে লিখেছিলেনঃ "তোমার পরম সুন্দর শান্তিময় চিঠিখানি আমাকে নূতন শক্তি দিয়েছে, যে-শক্তি আমি অনেক সময় হারিয়ে ফেলি।"[১২]

সহস্র দ্বীপোদ্যানে গুরুর পূত সান্নিধ্যের পর ক্রিস্টিন ও মিসেস্ ফাঙ্কির আবার গুরুদর্শন হল স্বামীজীর দ্বিতীয় পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময়। স্বামীজী উভয়কে ইংল্যাণ্ডে আসতে লিখলেন। ৩১ জুলাই ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হল। পনেরো দিন লণ্ডনে থাকার পর তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গেই আমেরিকায় ফিরে যান। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ক্রিস্টিনের আবার গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যখন স্বামীজী ক্রিস্টিনের অতিথি হয়ে ডেট্রয়টে এসেছিলেন। স্বামীজী আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন ক্রিস্টিন ভারতে এসে তাঁর আরব্ধ কাজে অংশগ্রহণ করুন। তাঁর শেষের দিকের চিঠিতে ক্রিস্টিনের কাছে বার বার স্বামীজী সেকথা প্রকাশ করেছেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের মৃত্যুর পর ক্রিস্টিন সাংসারিক বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্ত হলেন। স্বামীজী কলকাতা থেকে মিসেস্ সেভিয়ারের দেওয়া চারশো আশি ডলার পাঠালেন ক্রিস্টিনকে ভারতে আসার জন্য। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল ক্রিস্টিন কলকাতা পৌঁছলেন স্বামীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে। স্বামীজী ক্রিস্টিনের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন নিবেদিতার কাছে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে

দীর্ঘদিন পরে ক্রিস্টিনের বেলুড় মঠে গুরুদর্শন দৃশ্যটি বড় মধুর। শিষ্যার নৌকাটি ঘাটের কাছে আসামাত্র স্বামীজী তাঁর ঘরের জানালা থেকে অভিবাদন জানালেন। ক্রিস্টিনের অন্তরে আকুল বাসনা প্রথমেই গুরুর শ্রীমুখ দর্শন করবেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। কন্যাপ্রতিম শিষ্যাকে স্বামীজী আদর করে এটা-ওটা খাওয়ালেন। ক্রিস্টিন গুরুকে দেখেছিলেন পাশ্চাত্যে 'বীর সৈনিক' বেশে; এখন দেখলেন বেলুড় মঠে তাঁর নিজস্ব পরিবেশে। দেখলেন এখন সৈনিকের যুদ্ধ শেষ, তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে, জার্মানী ও ফ্রান্সে। দৈন্যদলিত ভারতে কলম্বো থেকে আলমোড়া এই সিংহের ব্যথিত আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর ঈপ্সিত বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণের ও গুরুভাইদের জন্য নিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। তরুণ ভক্তরা তাঁর পাশে জড়ো হয়েছেন—যাঁরা বেদান্তের পাঠ নিচ্ছেন এবং সেবার আদর্শে আত্মনিয়োগ করে ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছেন। স্বামীজীর বাণী তাঁর ভক্ত শিষ্য গুড্উইনের পারদর্শিতায় বিধৃত হয়েছে চিরকালের পাঠকদের জন্য।

ক্রিস্টিন কলকাতায় আসার পর গুরুর সঙ্গে তাঁর কয়েকবার মাত্র দেখা হল। কলকাতার প্রচণ্ড গরমে কষ্ট হবে ভেবে স্বামীজী ক্রিস্টিনকে মায়াবতী পাঠিয়ে দিলেন। ৪ জুলাই ১৯০২ অকস্মাৎ ইন্দ্রপতন—স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ। নিবেদিতা গুরুর মহাপ্রয়াণের সংবাদ জানিয়ে ক্রিস্টিনকে মায়াবতীতে চিঠি দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আরব্ধ কার্য সম্পাদনের আহ্বান জানালেন। ক্রিস্টিন শোকাহত, স্তব্ধ। গুরুর জন্যই তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি ঠিক করলেন ভারতেই থাকবেন, গুরুপ্রদত্ত কর্মভার যে-ভাবেই হোক সম্পন্ন করবেন। ক্রিস্টিন সমতলে নেমে

১১ অমৃত ১৩৮৩, ১৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা ফাল্গুন, পৃঃ ৪৪

১২ বাণী ও রচনা, ৮।১৬২

এলেন এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতার সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে নারী শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয়ের সূচনা করেছিলেন। স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা সেই প্রতিষ্ঠানটির ভার বহন করেন নিরলস চেষ্টায় ও বহু বাধার মধ্যে। নিবেদিতাকে সেজন্য ভিক্ষাপ্রার্থিনী হতে হয়েছে। নিবেদিতা যার কাঠামো তৈরি করলেন, ক্রিস্টিন এসে যত্ন ও আন্তরিক চেষ্টায় তাকে গড়ে তুললেন। মেয়েদের পড়ার ক্লাসের প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত কঠোর এবং ক্লান্তিকর পরিশ্রমে ক্রিস্টিন ভারতীয় দর্জির কাছে সেলাই শিখলেন। নিবেদিতা লিখেছিলেন ভগিনী ক্রিস্টিনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই এক নতুন রূপ নিল, কারণ এর আগে বিদ্যালয়টির প্রাথমিক বিভাগই শুধু ছিল। ক্রিস্টিন এসে বিধবা মহিলা ও বালিকা বধূদের সেলাই শিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং ক্রমে ইংরেজী, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠেরও ব্যবস্থা করেন। পুরাণ ও মহাকাব্যগুলি ছাত্রীদের পড়ানো হত, কারণ ক্রিস্টিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল ভারতের নারীদের দেশীয় ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে তাদের প্রকৃত ভারতললনায় পরিণত করা। ক্রিস্টিনের চরিত্রের শক্তি, দৃঢ়তা ও নম্রতায় মুগ্ধ হয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "হিন্দু মহিলার ধরনে শাড়িপরা সেই লাবণ্যময়ী গঠন ভঙ্গিটি যেন তাঁর আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যবোধ ও পরিবেশকে আপন করে নেবার ক্ষমতাই প্রকাশ করত। তাঁর চারপাশের রমণীবৃন্দ ক্রিস্টিনের সৌজন্য ও কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে বলতেন—'উনি কি শান্ত', আর এই কথা কয়টির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সম্বন্ধে এদেশের মানুষের সশ্রদ্ধ মনোভাব।"[১০] ছাত্রীদের কাছে ক্রিস্টিন নিয়েছিলেন মায়ের স্থান। তাই তাঁর দেহরক্ষার পর পুষ্প নামে এক ছাত্রী মিস্ ম্যাকলাউডের কাছে লিখেছিলেন, ক্রিস্টিন তাঁদের কাছে ছিলেন মাতৃসমা, আর নিবেদিতা নিয়েছিলেন পিতার স্থান। ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিস্টিন দুজনেরই যেমন ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা, তেমন স্বামীজীর কাছে তাঁরা শিখেছিলেন হিন্দুনারীর পবিত্রতা, সহনশীলতা ও ধর্মবোধের আদর্শ। তাঁদের নৈষ্ঠিক জীবনযাপনের জন্য দেশের সাধারণ মানুষ ও গোঁড়া হিন্দু বাড়ির মহিলারা পর্যন্ত তাঁদের আপনজন ভাবত। ১৭নং বোসপাড়া লেনের "হাউস অফ দি সিস্টারস্" যেন তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার নীলরতন সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি তৎকালীন বুদ্ধিজীবি ও মনীষিবৃন্দ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁদের পদতলে এসে বসতেন বশী সেন, নন্দলাল বসু প্রমুখ সেকালের বুদ্ধিমান যুবকগণ।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরে নিবেদিতা ক্রমে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। অধিকন্তু তিনি ব্যাপৃত হয়েছিলেন 'মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম' এবং অন্যান্য নানা রচনায়। তাই তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ের জন্য অধিক সময় ব্যয় করা সম্ভব ছিল না। ক্রিস্টিন এসে বিদ্যালয়ের ভার নিলেন। [ ক্রমশঃ ]

১০ ভারতচেতনা—নিবেদিতা, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১২৪

# শৃঙ্গেরী সারদাপীঠ

## স্বামী অমলেশানন্দ

বন পাহাড় আর আকাশের নিবিড় সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা প্রাচীন জনপদ শৃঙ্গেরী। তুঙ্গ ও ভদ্রা নদীর স্নেহ পীযূষধারা শৃঙ্গেরীকে ঘিরে রচনা করেছে স্নিগ্ধ শ্যামল বনশ্রী। এ আরণ্যক পরিবেশ স্মরণ করিয়ে দেয় বৈদিক যুগের ঋষিদের তপোভূমির কথা। এবং বাস্তবিকই তাই। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক প্রদেশের মালনাড় উপত্যকা একদিন সেই প্রাচীন ঋষিদের বেদমন্ত্র ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। রামায়ণের বহুপরিচিত ঋষ্যশৃঙ্গমুনির তপস্যাপূত স্থান ঋষ্যশৃঙ্গগিরি। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ, যিনি অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের আহ্বানে তাঁর অনাবৃষ্টি-পীড়িত রাজ্যে পদার্পণ করামাত্র সেখানে বহুকাঙ্ক্ষিত ঘন বর্ষার পদসঞ্চার ঘটেছিল। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ, যিনি অযোধ্যায় রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। অন্তিম জীবনে এই মুনিবর সস্ত্রীক শৃঙ্গেরীর কিগ্‌গা নামক এক ছোট্ট পাহাড়-শীর্ষে অতিবাহিত করেছিলেন কঠোর তপশ্চর্যায়। বর্তমান শৃঙ্গেরী মঠ থেকে আট কিলোমিটার দূরে সেই ঋষিবরের তপস্যাপূত স্থানে শৃঙ্গেশ্বর শিবমন্দির। স্থানীয় অধিবাসীরা আজও খরা ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে শৃঙ্গেশ্বর শিব মন্দিরে রুদ্রাভিষেকের অনুষ্ঠান করে। এ বিশ্বাস কেবল হিন্দুদের মনেই নয়, মুসলমানদের মনেও সঞ্চারিত। টিপু সুলতান যখন মহীশূরের শাসনকর্তা, তাঁর রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবসান ঘটাতে তিনিও শৃঙ্গেশ্বর মন্দিরে 'রুদ্রাভিষেকের' আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়—এ সংবাদ জানিয়ে তিনি শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্গুরুকে পত্র লেখেন।[১] সেই ঋষ্যশৃঙ্গগিরিই আজ শৃঙ্গেরী নামে পরিচিত।

সনাতন হিন্দুধর্মকে বৌদ্ধধর্মের প্রবল তরঙ্গাঘাত থেকে রক্ষা করতে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শাখায় শতধা বিভক্ত হিন্দুজাতিকে এক ঐক্যসূত্রে বন্ধন করতে আচার্য শঙ্কর ভারতবর্ষের চারপ্রান্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চারটি মঠ এবং উপযুক্ত শিষ্যদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন প্রতিটি মঠের দায়িত্বভার। শৃঙ্গেরীর সারদামঠ শঙ্করাচার্যপ্রতিষ্ঠিত চারটি মঠের অন্যতম। শঙ্করাচার্যের পূর্বে ভারতবর্ষে ত্যাগের পতাকাবাহী বৈদিক সন্ন্যাসীর অভাব ছিল না; কিন্তু প্রয়োজন ছিল সেই ত্যাগব্রতী অনিকেত সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সনাতন ধর্মের শিখাটি উজ্জ্বলতর করার। শঙ্করাচার্য সেটি অনুভব করেছিলেন। তাই স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সনাতন ধর্মের সেই সুপ্রাচীন ধারাটি অব্যাহত রাখবার জন্যে তাঁর এই প্রয়াস।

শৃঙ্গেরীতে মঠ স্থাপনার এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে। আচার্য শঙ্কর দক্ষিণভারতে এই অঞ্চল পরিভ্রমণকালে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এই অরণ্যময় প্রদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। চতুর্দিকে পাহাড় পরিবেষ্টিত চিরসবুজ বৃক্ষের সীমাহীন বিস্তার, নিকটবর্তী বরাহপর্বত হতে উৎসারিত দুই নদী তুঙ্গ ও ভদ্রার স্বচ্ছ নির্মল স্রোতোধারা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরসাধনায় তন্ময় যোগীর কুটীর। এমন মনোরম শান্ত, নির্জন বনময় পরিবেশ স্বতঃই আচার্যকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রসিদ্ধি আছে, একদিন তিনি শৃঙ্গেরীর এক স্থানে হঠাৎ চমৎকৃত হন একটি দৃশ্য

১ A History of Sringeri, Sri A. K. Shastri, Karnataka University, Dharwar, P. 48

দেখে। এক বিষধর নাগ ফণা বিস্তার করে রৌদ্রতাপে দগ্ধ এক ভেককে রৌদ্রকিরণ হতে রক্ষা করছে। অহিংসার এই অলৌকিক দৃষ্টান্ত দর্শনে স্থান-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় নিশ্চয় হন। অতঃপর তুঙ্গভদ্রার তীরে এই পবিত্র স্থানে আচার্য শঙ্কর মঠ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা অনুসারে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবকাল আজও মতদ্বৈধতার বিষয়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের স্বীকৃত মত ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ (কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক কাল) শঙ্করের আবির্ভাবকাল। সুতরাং সে হিসাবে শৃঙ্গেরী মঠের সূচনাও ঐ অষ্টম শতাব্দীতে। অর্থাৎ আজ হতে প্রায় বারোশ বছর আগে।

আচার্য শঙ্কর অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যাতা। তাঁর মতে সমগ্র উপনিষদের সারমর্ম—'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। তাঁর ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব উপাধি বিবর্জিত। তাঁর ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হলেও তিনি রূপ কল্পনা সহায়ে অরূপের উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। কর্ম ও ভক্তি সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানের কারণ না হলেও, শঙ্করাচার্য সাধারণ মানুষের পক্ষে অদ্বৈতসাধনার সহায়করূপে কর্ম ও ভক্তি সাধনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করেছেন। তিনি হিন্দুধর্মের তৎকালীন ছয়টি প্রধান শাখা-সমূহের (সৌর, গাণপত্য, স্কান্দ, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব) পূজা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির সংস্কার সাধন করেছিলেন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেব-দেবীর স্তোত্রাদি রচনা করে স্বীয় উদারতার সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখেছেন। তাঁর এই সমন্বয় সাধনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'ষন্মতস্থাপকাচার্য' বলে অভিহিত হয়েছেন। তিনি শৃঙ্গেরী মঠে স্বহস্তে অদ্বৈত সাধনার সহায়ক জ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মূর্তি স্থাপন করে তাঁর পূজা প্রবর্তন করেন। কথিত আছে, এই সারদা-মূর্তি যেখানে স্থাপিত, তার নিচে প্রস্তর গাত্রে শঙ্করাচার্য শ্রীচক্র যন্ত্র উৎকীর্ণ করেছিলেন এবং সাধনার অঙ্গস্বরূপ এই শ্রীচক্রের যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্রের ধ্যান ও উপাসনা প্রচলন করেন। প্রথম মঠাধীশ শ্রীসুরেশ্বরকে নিত্যপূজার জন্য স্ফটিক নির্মিত চন্দ্রমৌলেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং গণপতির এক মূর্তিও শঙ্করাচার্য দেন।

শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের অন্তর্গত দশনামী সন্ন্যাসী-দের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠগুলির মাধ্যমে। মঠগুলির প্রতিটির পরিচালন ব্যবস্থা স্বতন্ত্র এবং তিনি বিভিন্ন মঠের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী-দের ভিন্ন ভিন্ন পদবী, তীর্থ, বেদ প্রভৃতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। অবশ্য মঠগুলির কোন কেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থা ছিল না, আজও নেই। যদিও শঙ্কর প্রতিটি মঠকে বেদান্ত প্রচারের আদেশ ও ধর্মপ্রচার কার্যে সমান ক্ষমতা দিয়েছিলেন, শৃঙ্গেরীর সারদাপীঠই কালক্রমে ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্রে চারটি মঠের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের সুবাদে শ্রীরাম-কৃষ্ণ ছিলেন 'পুরী' সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। পুরী সম্প্রদায় শৃঙ্গেরী মঠের অধীন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণমঠের সন্ন্যাসীরাও শৃঙ্গেরী মঠের অন্তর্ভুক্ত।

সারদাপীঠের শঙ্কর-নিযুক্ত আচার্য সুরেশ্বর পূর্বাশ্রমে ন্যায় ও পূর্ব-মীমাংসা দর্শনে প্রখর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে তিনি মণ্ডন মিশ্র নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী উভয়ভারতীও ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী। তর্কযুদ্ধে শঙ্করের নিকট পরাজিত হয়ে মণ্ডন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁর নাম হয় সুরেশ্বর। শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি গভীরভাবে গুরুর অদ্বৈততত্ত্ব-প্রতিপাদিত ভাষ্যসকল অধ্যয়ন

করেন। ফলে ন্যায় ও মীমাংসার দৃঢ় ভিত্তির উপর তিনি তৎকালে প্রচলিত মতসকল খণ্ডন করে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে 'নৈষ্কর্মসিদ্ধি', শঙ্করকৃত বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ ভাষ্যের বার্তিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধ্যক্ষতাকাল ৮৩৪

সুরেশ্বরাচার্যের পর সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর শৃঙ্গেরী মঠের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। এইসময় জৈনধর্ম রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; যদিও বৌদ্ধধর্ম তখন ক্রমশঃ নিস্তেজপ্রায়। একাদশ শতাব্দীতে রামানুজাচার্য মেলকোট, কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গমে মঠ স্থাপন করে স্বীয় বিশিষ্টাদ্বৈত মতের পক্ষে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তিকালে সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ প্রভৃতি অন্যান্য শক্তিশালী মতবাদ। সুতরাং এই সময়ে শৃঙ্গেরী মঠের আচার্যগণকে প্রবল পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির সহায়তায় আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে দ্বাদশ মঠাধীশ শ্রীবিদ্যারণ্যের অধ্যক্ষতাকালে শৃঙ্গেরী সারদাপীঠ পুনরায় গৌরবের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় ইতিহাসে চতুর্দশ শতাব্দী চরম অস্থিরতার কাল। মুসলমান শাসকরা দিল্লীতে তাদের সিংহাসন সুদৃঢ় করে অতঃপর দক্ষিণভারতের ধন-সম্পদে পূর্ণ হিন্দু মঠ-মন্দিরগুলির প্রতি তাদের লোভী থাবা বাড়িয়েছে। দেবগিরির যাদবরাজ্য, অন্ধ্রের কাকতীয় ও কর্ণাটকের হয়সাল রাজত্ব উচ্ছেদ করে তারা ক্রমশঃই তাদের অধিকারের সীমানা বিস্তৃত করতে থাকে। ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলক মাদুরা আক্রমণ করে শ্রীরঙ্গম মন্দির দখল করে নিলেন। শত শত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে তিনি তাঁর রাজত্ব কায়েম করলেন। মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুধর্মের উপর যে প্রচণ্ড আক্রমণ এল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দল-মত-সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দুনেতারা সচেষ্ট হলেন। উত্তর ভারত ইতিমধ্যে মুসলমান অধিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে হিন্দুদের অবস্থা সেখানে খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। আর দক্ষিণ ভারতেও তাদের দুর্দান্ত অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব হল না। সনাতন ধর্মের সেই চরম সঙ্কটের কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় নেতারা সকল সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতা ভুলে সমগ্র হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে জাতির এই দুর্দিনে শৃঙ্গেরী মঠ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যারণ্য তাঁর গুরু বিদ্যা-তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করে কর্ণাটক রাজ্যের হাম্পির নিকটবর্তী বিরূপাক্ষ মন্দিরে তপস্যায় নিরত ছিলেন। ওয়ারঙ্গল রাজ্যের দুই বীর ভাই হরিহর ও বুক্ক এই কালে বিদ্যারণ্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই হিন্দু ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। দেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের সংস্পর্শে এসে তাঁরা মুসলমান শাসকদের দক্ষিণদেশ হতে বিতাড়িত করে পুনরায় হিন্দু শাসন প্রবর্তন করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। সেই স্বপ্ন সফল করতে রণ্য তাঁদের হাম্পিতে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠন করার পরামর্শ দেন। বিদ্যারণ্যের উদ্যোগে ধর্মান্তরিত ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় হিন্দুসমাজে হিন্দুরূপে গৃহীত হন। বিদ্যারণ্য তাঁদের আধ্যাত্মিক গুরু হলেন, সেই সঙ্গে হলেন রাজনীতিরও গুরু।

হরিহর ও বুক্কের প্রাণে মহাশক্তির স্ফুরণ ঘটল। নবশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা হাম্পিতে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করে তাঁরা ক্রমশঃ বিজয়নগর রাজ্যের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন এবং দক্ষিণভারতের এক বৃহত্তম অংশ শত্রুদের অধিকার থেকে মুক্ত করলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র বিজয়নগরকে কেন্দ্র করে দক্ষিণভারতের হিন্দুরা আবার জেগে উঠল। সেই কেন্দ্রভূমিতে সন্ন্যাসী রাজগুরু বিদ্যারণ্যের অতি মর্যাদাপূর্ণ আসন নির্দিষ্ট ছিল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ-স্বরূপ তাঁকে 'কর্ণাটক-সিংহাসন-স্থাপকাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে বিজয়নগর বা বিদ্যানগর রাজ্য, শৃঙ্গেরী মঠ ও বিদ্যারণ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আচার্য শঙ্কর যে মহান উদ্দেশ্যে শৃঙ্গেরীতে মঠ স্থাপনা করেছিলেন, হিন্দু-ধর্মের চরম সঙ্কটকালে শৃঙ্গেরীর সারদাপীঠ পাঁচশ বছর পরে যথাযোগ্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেই উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়েছিল। বিদ্যারণ্য তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা একটা জাতির জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, বিদ্যারণ্যই ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিকদের বিচারে যাই হোক, একথা কিন্তু সত্য যে বিদ্যারণ্য দিয়েছিলেন পরিকল্পনা, হরিহর ও বুক্ক তাকে দিয়েছিলেন বাস্তব রূপ। বস্তুতঃ সেসময় মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুধর্মের উপর যে আক্রমণ শুরু হয়েছিল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে তার মোকাবিলা করেছিল। বিদ্যারণ্য, হরিহর ও বুক্কের প্রয়াস ভিন্ন হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই যে তখন বিপন্ন হয়ে পড়ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিদ্যারণ্য সারদাপীঠের প্রধান মঠাধীশ পদে অভিষিক্ত হন ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর অধ্যক্ষতা-কালে শৃঙ্গেরী মঠ রাজানুকূল্যে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতায় দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে। সমগ্র দক্ষিণভারতে জনজীবনে শৃঙ্গেরী মঠের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক-ভাবে প্রসারিত হয়, যা আজও বর্তমান। শৃঙ্গেরী মঠে রক্ষিত বিভিন্ন সনদ, দলিল, তাম্রপত্র ইত্যাদি হতে জানা যায়, বিজয়নগরের তিনশ বছরের রাজত্বকালে বিভিন্ন রাজা উদার হস্তে প্রভূত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মঠকে দান করেছেন। এছাড়া সাধারণ মানুষদের দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তিগত দানও নানা সময়ে অজস্রধারায় বর্ষিত হয়েছে।

বিজয়নগরের তিন শতাব্দীকাল রাজত্বকালে হরিহর, বুক্ক ও তাঁদের পরবর্তী রাজারাও শৃঙ্গেরী মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন। কেবলমাত্র হিন্দুরাজারাই নন, বিজয়নগরের পতনের পর কর্ণাটকে অধিষ্ঠিত অন্যান্য মুসলমান শাসক এবং তার পর ব্রিটিশ সরকারও শৃঙ্গেরী মঠের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। মুসলমান শাসকবর্গের মধ্যে হায়দার আলি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন উপলক্ষে শৃঙ্গেরীর 'জগদ্‌গুরু'দের অসংখ্য পত্রালাপ হয়েছে। সেই সকল পত্রাদির ভাব ও ভাষা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ। তাঁরা, বিশেষতঃ টিপু, বিভিন্ন বিপদে আপদে পরস্পরের সহযোগিতা কামনা করেছেন এবং আপৎকালে যথাযোগ্য সাহায্যও প্রাপ্ত হয়েছেন। টিপু যখন শত্রুর আক্রমণে বিশেষ বিব্রত, তখন তিনি শৃঙ্গেরীর 'জগদ্‌গুরু'র আশীর্বাদ ও শ্রীসারদাম্বার প্রসাদ ভিক্ষা করেছেন। অপর পক্ষে, ১৭৯১-১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সৈন্যের একাংশ যখন শৃঙ্গেরী মঠ আক্রমণ করে ধন-সম্পত্তি লুঠ, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের হত্যা এবং সারদাম্বার বিগ্রহের

অবমাননা করে, সেই সময়ে টিপু এই বর্বর আক্রমণের সংবাদ পাওয়ামাত্র মঠের ক্ষতিপূরণ বাবদ এবং মন্দির সংস্কার কার্যের জন্য প্রভূত অর্থ সাহায্যাদি পাঠান। এই আক্রমণে বিচলিত হয়ে টিপু তদানীন্তন জগদ্গুরুকে যে পত্র লেখেন, তাতে তাঁর মঠের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের গভীরতা অনুমান করা যায়। তিনি লেখেন: "এইরূপ পবিত্র স্থানে যে সকল মানুষ পাপকার্যের অনুষ্ঠান করে, অদূর ভবিষ্যতে এই অন্যায়ের সমুচিত ফলভোগ তারা অবশ্যই করবে।"...[২]

শৃঙ্গেরী মঠ বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা গত বারোশ বছরে বিভিন্ন মঠাধীশ কর্তৃক সংস্কৃত হওয়ার ফল। এই সংস্কার-কার্য ব্যাপকভাবে শুরু হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দ্বাদশ মঠাধীশ বিদ্যারণ্যের অধ্যক্ষতাকালে। তিনি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত সারদাম্বার চন্দনকাষ্ঠ নির্মিত মূর্তিটির স্থলে স্বর্ণময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সারদাম্বার জীর্ণ মন্দিরটির স্থলে কালো গ্রাণাইট পাথরের বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণ শুরু হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই নির্মাণ কার্য শেষ হয়। দ্রাবিড় স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত এই মন্দিরটির শিল্প-সৌন্দর্য প্রশংসনীয়। তুঙ্গ নদীর তীরে সারদাম্বার প্রধান মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে অপর যে কয়টি মন্দির গড়ে উঠেছে তার মধ্যে বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরটি স্থাপত্যশিল্পের এক অনবদ্য নিদর্শন। হয়সাল ও দ্রাবিড় স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ে রচিত এই শিবমন্দিরটি বিদ্যারণ্য কর্তৃক নির্মিত হয়, তাঁর গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ। বলা বাহুল্য, বিজয়নগরের রাজারাই মন্দির নির্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন। মন্দিরের বিগ্রহ শিবলিঙ্গের নাম বিদ্যাশঙ্কর লিঙ্গ। সমগ্র মন্দিরটির পরিকল্পনা অসাধারণ। এখানে হিন্দুধর্মের গভীর দার্শনিক-তত্ত্ব পাষাণের বুকে ভাষায়িত হয়েছে। শিল্প ও দর্শনের এ এক অপরূপ সমন্বয়।

বিদ্যারণ্যের অধ্যক্ষতাকালে রাজা হরিহরের অনুমোদন ক্রমে শৃঙ্গেরী মঠ 'শৃঙ্গেরী ধর্মসংস্থান' রূপে ঘোষিত হয়। ৪৪ বর্গমাইল বিস্তৃত এই সংস্থানের সর্বেসর্বা প্রধান মঠাধীশ—'জগদ্গুরু'। মঠের 'জগদ্গুরু'রা অতঃপর কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক মাত্রই ছিলেন না, তাঁরা এই বিশাল 'ধর্মসংস্থানের' আইন শৃঙ্খলা প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারেও সর্বময় কর্তা হলেন। বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর কর্ণাটকের পরবর্তী শাসকগণ মারাঠা, মুসলমান অথবা ব্রিটিশ কেউই 'শৃঙ্গেরী ধর্মসংস্থানের' এই মর্যাদা ক্ষুন্ন করেননি। শৃঙ্গেরী জনপদের সর্বপ্রকার পরিচালন ও শাসন ব্যবস্থায় মঠাধীশগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

হাজার বছর অতিক্রান্ত। মালনাড় উপত্যকার নির্জন তপোবনে নদী নির্ঝরিণীর স্নিগ্ধ ক্রোড়ে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী সারদাম্বাকে প্রতিষ্ঠিত করে যে জ্ঞানপীঠের সূচনা করেছিলেন, আজও তা লক্ষ লক্ষ ধর্মপিপাসুর হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে চলেছে।

২ Ibid, P. 46-47

# কামড়ান বারণ, ফোঁস করা নয়

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

কথামৃতের 'কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়' অভিমতটি অনেককে চিন্তিত করে এবং সমস্যায় ফেলে ; কারণ দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রত্যেককেই কখনও না কখনও অন্যায়, অত্যাচার এবং ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। সে-সব ক্ষেত্রে প্রতিরোধ বা প্রতিকারের জন্য ফোঁস করা বা ভয় দেখান ছাড়া কি আর অন্য কিছু করণীয় নাই ? ভয় দেখিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে কী করা কর্তব্য ? অন্যায় সহ্য করার অর্থ কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া নয় ? বাল্যে গুরুজনের কাছে শিক্ষা, মহাপুরুষদের বাণী স্মরণ, সামাজিক অনুশাসন, পুরাণের নানা আদর্শের চরিত্র—এগুলির অন্তর্নিহিত আপাতবিরোধী নির্দেশগুলি অনেক সময়েই বিভ্রান্তিকর। তাছাড়া এও প্রশ্ন উঠে : আগেকার যুগের আদর্শ কি বর্তমান যুগে চলতে পারে ? শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার, এবং অন্যান্য অবতারদের মতোই বেদ-উপনিষদের অন্তর্নিহিত নির্দেশকে এ-যুগের উপযোগী করে তুলে ধরাই তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁকে 'নূতন ও প্রগতিশীল' বলেছেন। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী ও জীবনী পর্যালোচনা করে 'কামড়ান নয় ফোঁস করা' বিষয়ে তাঁর সঠিক বক্তব্য কী, তা নির্ণয় করার চেষ্টাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের সূত্রাকারে বর্ণিত আপাতসহজ নির্দেশগুলির ভাষ্য করা সহজ নয়, এবং প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে। সে-কারণে সাহায্য নিতে হবে, তাঁরই ভিন্নরূপে প্রকাশ শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর বাণী হতে, এবং প্রয়োজন হলে, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য অন্তরঙ্গ পরিকরদের কাছ হতে।

"মহাশয়, যদি দুষ্ট লোকে অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হলে কি চুপ করে বসে থাকা উচিত ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রহ্মচারী, রাখালবালক ও সাপের উপাখ্যান বলেন যাতে ব্রহ্মচারী অহিংস ধর্মাবলম্বী সাপকে বলছেন "আমি কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়! ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন ?" সেইসঙ্গে আরও যোগ করেছেন 'তাদের অনিষ্ট করতে নাই।' অন্য এক সময়ে মাষ্টারের 'আমার পাতের কাছে বেড়াল মুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, আমি কিছু বলতে পারি না'[১] বলার উত্তরে 'ফোঁস করতে'ও 'বিষ না ঢালতে' উপদেশ দেওয়ার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন "একবার মারলেই বা তাতে দোষ কি ?" এই-সমস্ত হতে 'কামড়ান' বা 'বিষ ঢালা'র অর্থ করা যেতে পারে অনিষ্ট করা বা হিংসা করা, এবং 'ফোঁস করা'র অর্থ করা যেতে পারে, হিংসার ভান করা। মাষ্টার মশাইকে 'একবার মার'তে বলার অর্থ নিশ্চয় মৃদু আঘাত করা, যা 'ফোঁস করা'রই সামিল। দুজায়গাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ হিংসা ও অহিংসার প্রকৃত মর্মার্থ বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন অভিধানে 'হিংসা'র অর্থ দেওয়া আছে—অন্যের অনিষ্ট বা হানি করবার প্রবৃত্তি, বধ, প্রাণীপীড়ণ, ঈর্ষা, অসূয়া, ক্ষতি, ক্ষতি করার প্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি। অনিষ্ট করার প্রবৃত্তি অনেক সময় কার্যে পরিণত না হতে পেরে কর্কশ বাক্যে বা ক্রোধে পরিণত হয়, অথবা প্রতিহিংসাপরায়ণতাতে পর্যবসিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই সবগুলিকেই 'কামড়ান'র পর্যায়ে ফেলা হবে।

একথা সকলেরই জানা যে কথামৃতে বর্ণিত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর কতকগুলি সন্ন্যাসীদের ( অথবা যাঁদের তিনি সন্ন্যাসজীবনের জন্য

১ কথামৃত, ১।১।৬

উদ্বুদ্ধ করছেন তাঁদের ) জন্য, কতকগুলি গৃহীদের জন্য, আবার অনেকগুলি উভয় শ্রেণীর জন্য। তাছাড়া তিনি তাঁর ত্যাগী বালকভক্তদের, বিশেষ করে নরেন্দ্রনাথকে যে আলাদাভাবে উপদেশ দিতেন, সে কথা অনেকেই জানেন। কাজে-কাজেই 'কামড়ান', 'ফোঁস করা' বা এই ধরনের কথা তিনি কাকে কি পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন তা জানা দরকার। জীবনের ও জগতের উপর সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা ; সেজন্য তাঁদের লৌকিক ব্যবহারও গৃহীদের থেকে তফাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাল করেই জানতেন যে তাঁর অনেক নির্দেশ সংসারক্লিষ্ট জীবের পক্ষে তাদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পালন করা সম্ভব নয়। লাটু মহারাজও অনুরূপ কথাই বলেছেন।[২] স্বামীজী তো স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সকলের নিকট একই প্রকার নৈতিক উপদেশ প্রচার করা যাইতে পারে না।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে হিংসা-অহিংসার ব্যাপারে যে-সব কথা বলেছেন, তাতে সন্ন্যাসীদের অদ্বৈত-দৃষ্টিভঙ্গিই নির্দিষ্ট হয়। যাঁদের মন বিরাটের সঙ্গে একীভূত, তাঁরা হিংসা বা রাগ করবেন কার উপর ? তাই তাঁর গল্পের সাধু মার খেয়েও বলছেন, "ভাই ! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।"[৪] শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র বলেছেন "ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।"[৫] অদ্বৈত অবস্থাতে থাকাকালীনই নৌকাতে অবস্থিত মাঝির পিঠের আঘাত শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠে দাগ সৃষ্টি করেছিল। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছেও ঠিক এইভাবেরই কথা শুনি। বাঘ মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে, এমন অবস্থাতেও আক্রান্ত সাধুর মুখ হতে উচ্চারিত হচ্ছে "শিবোঽহং, শিবোঽহম্।" সিস্টার নিবেদিতা বলেছেন : "তাঁর ( স্বামীজীর ) নিজের আদর্শ ছিলেন সিপাহী-বিদ্রোহের কালের সেই সন্ন্যাসী যিনি একজন সৈনিক কর্তৃক বিদ্ধ হওয়াতে পনের বৎসরের মৌন ভঙ্গ করিয়া তাঁহার ঘাতককে বলিয়াছিলেন, "মেরেছ তাতে কি ? তুমিও তিনিই—তত্ত্বমসি।"[৬] ঠিক এই সুর হতেই জাহাজে গোঁড়া মিশনারী ক্যাম্বিঙ্গের কাছ হতে অপমানকর ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও স্বামীজী হঠাৎ ক্যাম্বিঙ্গের কাঁধে হাত দিয়ে বলে উঠেছিলেন… "কিন্তু মহাশয় আমরা—আমরা দুইজনে জানি আমরা সর্ব-স্বরূপের অংশমাত্র।"[৭] নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ হতে এও শুনেছিলেন যে সন্ন্যাসীর মনে কোন কিছুর দ্বারা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়।

অনিষ্টকারী প্রাণী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহার ভিন্নরূপ। তিনি আরশুলাকে মেরে ফেলতে বলছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমা সারদাদেবীও জোনাকীপোকাকে মেরে ফেলতে বলেছিলেন।[৮] আবার অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ কঠোর, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নয়। গুরুনিন্দা শুনেও যোগেনের প্রতিবাদ না করায় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আবার অনুরূপ কারণে নিরঞ্জনকে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নৌকা ডুবাতে উদ্যত হওয়ার ঘটনা শুনে তিরস্কার করেছেন। এইসব হতে বুঝা যাচ্ছে যে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চাচ্ছেন, কিন্তু সেটিকে ধরে রেখে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ক্ষতিসাধন করা চাচ্ছেন

২ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা (১৩৫২), পৃঃ ৩৪৮

৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।২১৪

৪ কথামৃত, ২।৩।১    ৫ ঐ, পৃঃ ২।৮।২

৬ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, ( ১৩৬১ ), পৃঃ ৫৭

৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড ( ২য় সং ), পৃঃ ৩৫৭

৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় ভাগ ( ১১শ সং ), পৃঃ ৩৩৮

না। তাঁর একটি কঠোর নির্দেশ পাই যখন তিনি মাষ্টারমশাইকে, ধর্মপথের বাধা হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বলছেন, এমনকি এর ফলে স্ত্রীর আত্মহত্যা করার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও। বোধহয়, তিনি এখানে কঠোর এইজন্য যে তাঁর মূল উপদেশ (মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ) এর সঙ্গে কোন অবস্থাতেই তিনি আপোষ করা চান না।

অন্যায়ের সামনে গৃহীর কর্তব্য সম্বন্ধে নানা নির্দেশ পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর কাছ থেকে। সে-বিষয়ে আসার আগে অন্য একটি আলোচনা দরকার। প্রবন্ধের শিরোনামায় লিখিত 'কামড়ান'র অর্থ ধরা হয়েছে ক্ষতি বা অনিষ্ট করা, অন্যভাবে যা হিংসার পর্যায়ে পড়ে। হিংসা ও অহিংসা বর্তমান যুগে একটি বহু আলোচিত বিষয় এবং এ-সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার। 'অহিংসা' বললেই প্রথমে মনে আসে ভগবান বুদ্ধের কথা। "পাঁচশতবার পরার্থে জীবন-বিসর্জনের ফলে অল্পে অল্পে সেই পবিত্র দয়ারাশির উদ্ভব হয়েছিল, যাহাতে তাঁহাকে বুদ্ধ পদবীতে আরোহণ করাইয়াছিল।"[৯] বুদ্ধের বাণীর সারাংশ হচ্ছে যে দুঃখ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় অহং বিসর্জন; ঈশ্বর, আত্মা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পূজা ও পশুবলি কুসংস্কার; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে হবে; একটি পিপীলিকার জন্য প্রাণ দিতে হবে। স্বামীজী বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু তিনি এও বলেছেন "আর বুদ্ধের শিক্ষায় দেখ—ঈশ্বর বলে কেউ নেই, আত্মা কিছু নয়, শুধু কর্ম। কিসের জন্য? 'অহং'-এর জন্য নয়, কারণ তাও এক ভ্রান্তি।…জগতে এমন লোক সত্যই মুষ্টিমেয়, যারা এতখানি উঁচুতে উঠতে পারে এবং নিছক কর্মের জন্যই কর্ম করে।"[১০] বৌদ্ধ সঙ্ঘ সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন, "বিরাট ছিল সেই সঙ্ঘ; তবে চিন্তা ও মতবাদ এককথা আর বাস্তবভূমিতে তার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অন্য কথা।…অর্থাৎ তত্ত্ব হিসাবে ঠিক হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার [অহিংসা, মৈত্রীর] সার্থক প্রয়োগের পথ কেউ নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।"[১১] মাছ-মাংস না খাওয়াকে অহিংসার পর্যায়ে ফেলার কারণ হিসাবে স্বামীজী বলেছেন, "বৌদ্ধধর্ম মরে যাওয়ার সময় হিন্দুধর্ম তার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভেতর ঢুকিয়ে আপনার করে নিয়েছিল। ঐ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম বলে বিখ্যাত। 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—বৌদ্ধধর্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না ক'রে বলপূর্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত জনসাধারণের সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে, আর টাকার জন্য ভায়ের সর্বনাশ করছে!… বৈদিক ও মনুক্ত ধর্মে মৎস্য-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারি-বিশেষে হিংসা ও অধিকারি-বিশেষে অহিংসা-ধর্ম পালনের ব্যবস্থা আছে।"[১২] শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধদের অহিংসা-ধর্মপালনের এক হাস্যকর চিত্র এঁকেছেন স্বামীজী। এক 'অহিংসা-পরমো ধর্মে'র বাড়িতে চোরকে ধরে কর্তার ছেলেরা বেদম প্রহার দিচ্ছে দেখে কর্তার অহিংস নির্দেশ "মারিসনি, ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দে।" এইখানে জৈনদের অহিংসা সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত[১৩] প্রাসঙ্গিক। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে বেদ পুরোহিতের তৈরি; ভগবানের কোন অস্তিত্ব নাই; "অস্তিত্ব

৯ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, (১৩৬১) পৃঃ ২৫৮

১০ বাণী ও রচনা, ৮।৩২৯

১১ ঐ, ১০।২১৪ (১৩৭০)

১২ ঐ, ৯।১৫১,

১৩ ঐ, ১০।২৭৯ (১৩৭০)

আছে পৃথিবীর, অস্তিত্ব আছে আত্মার ; কেবল সৎকর্ম করে যাও ; কাউকে আঘাত কোরো না ; কেবল উপকার কর। স্বামীজীর মতে, শুধু অবৈরী ও পরোপকারের ভিত্তিতে সকল নৈতিক আদর্শকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া একটি অভিনব আদর্শ। অহিংসার ধারণাটিকে এঁরা ক্রমশঃ এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। স্নানের সময় শরীর মার্জনা করলে অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় মনে করে এঁরা স্নান করতেন না ; জল ফুটিয়ে পান করতেন না, তবে ভিক্ষার্থী হয়ে কোন গৃহে গেলে কোন গৃহস্থ যদি জল পান করতে দিত, সে জল তাঁরা পান করতেন, কারণ সেক্ষেত্রে প্রাণীহত্যার দায় ছিল গৃহস্থের। খ্রীষ্টধর্মের অহিংসা সম্বন্ধে স্বামীজীর মত : "যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁর ধর্ম মূলতঃ কেবল সন্ন্যাসীদের উপযোগী।…'অপর গাল ফিরাইয়া দাও'—এই শিক্ষা অসম্ভব, অসাধ্য।…সাধারণ লোকের ধর্ম হইল—'নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হও।'"[১৪] মহাত্মা গান্ধী নির্দিষ্ট অহিংসার প্রসঙ্গ এখানে আনছি না, কারণ তা সাধারণতঃ রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা হয়ে থাকে।

গৃহীদের দৈনন্দিন জীবনে 'ফোঁস করা' এবং 'কামড়ান'র কিরকমভাবে এবং কতটা প্রযোজ্য হবে সেটি নির্দেশ করাই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তো তাদের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, "একটু কাম-ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। তাই তোমরা কেবল কমাবার চেষ্টা করবে।"[১৫] কথামৃতের গল্পে গৃহস্থ যখন চোরকে ধরে প্রথমে টাকা কেড়ে নিয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহার দেওয়ার পর তাকে ম্যাদ খাটাবার জন্য পুলিশে দেয়[১৬] তখন তার রজোগুণাত্মক 'আমি'টাই পুলিশ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ, চোরের কাছ হতে টাকা আদায় করে তাকে প্রহারের পর পুলিশে দেওয়ার মধ্যে অহমিকা ও প্রতিহিংসার ভাব দেখতে পাচ্ছেন। চোরকে কোনরূপ শাস্তি না দিতে, অর্থাৎ চৌর্যবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে তিনি নিশ্চয় চাচ্ছেন না। তার সংশোধনের জন্য বা তাকে সাবধান করার জন্য যতটা হিংসার দরকার, ততটুকু করার ইঙ্গিতই বোধহয় এই গল্পে রয়েছে। মনে রাখা দরকার যে ভালবাসার প্রতিমূর্তি শ্রীমা সারদাদেবীও হরিশের অন্যায় ব্যবহারে ভীষণা মূর্তি ধরেছিলেন। স্ত্রীলোকের উপর পুলিশের অত্যাচারে অগ্নিময়ী মূর্তি ধরে বলেছিলেন, "এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে (পুলিশকে) দু চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?"[১৭] বাস্তবক্ষেত্রে গৃহী অহিংসাকে কিভাবে রূপদান করবে এ-সম্বন্ধে কার্যকরী নির্দেশ পাওয়া যায় স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে স্বামীজী 'সপ্তর্ষির একজন ঋষি' ও কেশব সেন যে-শক্তির জোরে বিখ্যাত সেকরম 'আঠারটি শক্তি'র অধিকারী হলেও অন্যদিক দিয়ে তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে ভাবতে অসুবিধা হয় না, কারণ কখনও কখনও সাধারণ মানুষের মতোই তাঁর মধ্যে বন্ধুপ্রীতি, ক্রোধ, তিরস্কার, কৌতুক প্রভৃতি ভাবের অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। সেজন্য তাঁর কথা গৃহীদের উপর বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে। তিনি বলেছেন, "অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা ; কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন—তুমি গেরস্থ তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।"[১৮] আরও বলেছেন, "গৃহস্থ ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিবে না,

১৪ ঐ, ১ম সং, ১০।২১৪   ১৫ কথামৃত, ৪।১।২   ১৬ ঐ, ১।৪।৬

১৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯

১৮ বাণী ও রচনা, ৬।১৫৫

অপ্রতিকার বিষয়ক বাজে কথা বলিবে না।"[১৯] "যদি কেহ কর্মের ফেরে বলবানকে দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে দেখে, তবে তাহার কি করা উচিত?" এই প্রশ্নের জবাবে স্বামীজী বলেছেন "কেন, বলবানকে উত্তম মধ্যম প্রহার দেওয়া—এর আর কথা কি আছে?…অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অধিকার তোমার চিরকালই রয়েছে।"[২০]

কিন্তু হিংসার আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজীর বাণী বা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে সব সময়েই উচ্চ আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখার নির্দেশ পাওয়া যায়। কথামৃতে দেখা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ বহু অর্বাচীন প্রশ্নের ও অভদ্র ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েও উদার দৃষ্টিতে সেগুলিকে নিয়েছেন; পদাঘাত পেয়েও নালিশ করেননি।[২১] শ্রীমা সারদাদেবী গালাগালিকে বলেছেন "দুটো শব্দ বই তো নয়।" নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ হতে শুনেছিলেন "যদি লোকে আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তা হলেও আমাদের তাদিকে ভালবেসে যেতে হবে। এইরকম করতে করতে শেষে তারা এই ভালবাসায় বশ না হয়ে থাকতে পারবে না।"[২২] স্বামীজী আরও বলেছেন "পশুগুলিও তো সেই অনন্ত সত্তারই অংশ। যদি মানুষের জীবন অমর হয়, পশুর জীবনও অমর।"[২৩] "শত্রুগণকে বীর্য-প্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য।" তাঁর এই মতটির প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখিয়েছিলেন (রাগের ভান করে এবং খানিকটা কৌতুকভরে) জাহাজে হিন্দুধর্মের নিন্দারত মিশনারির কলার চেপে ধরে।"[২৪]

অহিংসার প্রকৃত মর্মার্থ সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মত বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। মাছ-মাংস খাওয়াতে হিংসাবৃত্তি হয় কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন "ও কোন কথা নয়। তবে যে বলে 'অহিংসা পরমো ধর্ম' সে কখন?—যখন সমাধি হয়েছে, জ্ঞানলাভ হয়েছে, সর্বভূতে ভগবান দর্শন হয়েছে। তা না হলে অমনি মুখে বললেই বুঝি অহিংসা হল? যখন দেখবেন আপনিও যা এ পিঁপড়েটিও তা, কোন ভেদ নেই তখন ঠিক ঠিক অহিংসা; তার পূর্বে কি কখন হয়? এই যে বলছেন অহিংসা, আপনি কি হিংসা avoid (ত্যাগ) করতে পারেন? কি খাবেন—আলু? আলু পুঁতলে তাতে গাছ হয়, তাতে আবার আলু হয়। সেটার প্রাণ নেই?…আচ্ছা ধরুন জল—ওতে কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে, আপনি একটা microscope (অণু-বীক্ষণ যন্ত্র) দিয়ে দেখুন। কি করে সে জল খাবেন?…প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে অসংখ্য জীব নষ্ট করছেন, তার বেলা দোষ নেই,—যত দোষ হল মাছের।…যারা vegetable-diet (নিরামিষ আহার) ভাল বলে, তারা দুধ, ঘি এসব তো খায়। দুধটা কি রকম করে খাওয়া যায়? একটা প্রাণীকে deprive (বঞ্চিত) করে মায়ের দুধটা নিচ্ছে, ওটা তো বিচার করলে একটা মহা cruel (নিষ্ঠুর) ব্যাপার। ও কোন কথা নয়। আমাদের ও সমস্ত কখনও ছিল না, পরে ওসব ঢুকে গেছে।"[২৫] ঠিক এইভাবেরই কথা শুনি আমরা

১৯ ঐ, ১।৬৩

২০ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ১২০

২১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম ভাগ (১৩৭২) গুরুভাব—পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৮৪

২২ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ১০৯

২৩ বাণী ও রচনা, ২।২২৬

২৪ ঐ, ১।৬৩

২৫ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, (৪র্থ সং) পৃঃ ১৪১

স্বামীজীর কাছেও।[২৬]

তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা অনুসারে হিংসা, অহিংসা সম্বন্ধে এইসব আলোচনা হতে কি ধরনের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে? সাধুরা মনে হয় অদ্বৈতদৃষ্টি নিয়ে হিংসাত্মক কোন কার্যই করবেন না, এমনকি হিংসার ভানও করবেন না। কিন্তু গৃহী ফোঁস করে, অর্থাৎ রাগ বা ভয় দেখিয়ে অন্যায়ের মোকাবিলা করতে চেষ্টা করবে; তবে প্রয়োজনের খাতিরে, অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য, অনিষ্টকারী জন্তু হতে রক্ষা পাবার জন্য, অথবা অন্যায়ের প্রতিরোধ বা প্রতিকারের জন্য তার হিংসাত্মক কার্যও বিধেয়। তবে সেই হিংসাত্মক কাজ যেন প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় এবং তার মধ্যে যেন প্রতিহিংসাপরায়ণতা না আসে। নিরামিষ আহারকে অহিংসনীতির প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে না ধরে সকল প্রাণীর প্রতি, এমনকি অনিষ্ট-কারীকে শাস্তি দেবার সময়ও, হৃদয় যেন প্রেমে পূর্ণ থাকে। হৃদয়কে প্রেমে পূর্ণ রাখাই হবে গৃহীর প্রধান প্রচেষ্টা, কারণ এইরূপ হৃদয়ই তার মধ্যে সকল প্রাণীর সঙ্গে মমত্বভাব জাগিয়ে রাখবে এবং তাকে হিংসা-অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবে।

২৬ বাণী ও রচনা, ৯।১৬২

# শ্মশানেশ্বরী ডাকে যে আয়

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

কার সংসারে বসালে কাকে?
আকুল কণ্ঠে ডাকে সে মাকে।
ফিরে দাও তাকে—নিক সে ভার,
নিজ রাজ্যে নিজ অধিকার।
আমি ভিনদেশী পথিক জনা—
পরদেশে রহি অন্যমনা।
আমার রাজ্য আমাকে দাও,
এ রাজসজ্জা ফিরিয়ে নাও।
　　নিজের আসনে যে বসায় মাকে
　　শ্মশানেশ্বরী ডাকে যে তাকে।
　　ডাকে—আয় আয়, চিতার শবে,
নর-করোটিতে পানোৎসবে;
আহা উৎসব—আগুন খেলা,
মুণ্ডমালিনী জাগার বেলা।
তারা ঝিকমিক জড়োয়া হার—
শ্মশান চিতায় আলো বাহার—
গায় শিবা, নাচে প্রেতের দল,
প্রমথনাথও কী চঞ্চল!
আমার রাজ্য আমাকে দাও—
শ্মশানেশ্বরী এ প্রাণ নাও।
খর্পরভরা শোণিত পিয়ে—
মৃত্যুকে ভরো মাধুরী দিয়ে॥

# সহস্রদ্বীপ একবার

**শ্রীসুকৃতি রায়চৌধুরী**

সকল তীর্থ বারবার, 'সহস্রদ্বীপ একবার। সেই সহস্রদ্বীপ—যেখানে পড়েছে স্বামী বিবেকানন্দের পদধূলি। ছোটভাই সুখেন্দু আর তার স্ত্রীর কাছে টরোণ্টোতে বেড়াতে গিয়ে শুনি নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার-এর প্রধান স্বামী আদীশ্বরানন্দ রয়েছেন সহস্রদ্বীপে। সহস্রদ্বীপে স্বামী বিবেকানন্দ যে কটেজে ছিলেন, সেটি বর্তমানে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারের পরিচালনাধীন। সেখানে 'সামার রিট্রিট' বা গ্রীষ্মাবকাশকালীন স্মরণ-মনন ও ধ্যানের ক্লাস পরিচালনার জন্য তিনি এই সময় প্রতিবছর আসেন। ঠিক করলাম সেই পরম তীর্থটি দেখে আসব।

সহস্রদ্বীপ নামে খ্যাত হলেও এখানে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১৮৭০, বিস্তৃত ২৫০০ বর্গ মাইল ক্ষেত্র জুড়ে। সেণ্ট লরেন্স নদী মিশেছে লেক অণ্টারিওতে—জল আর জল, জল আর জল। আর সেখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সহস্রাধিক দ্বীপ। একপ্রান্তে কানাডা, অপর প্রান্তে আমেরিকা। দুটো দেশের মাঝে এই দ্বীপের সমাহার। একজন ফরাসী ভ্রমণকারী জেকুইস কার্টিয়ার এই দ্বীপগুলির 'সহস্রদ্বীপ' নামকরণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। আমেরিকার দিকে এই দ্বীপগুলি নিউইয়র্কের ক্লেটন থেকে অগডেনসবার্গ অবধি ছড়ানো, আর কানাডার দিকে কিংস্টন থেকে ব্রকভিল্ অবধি। সেণ্ট লরেন্স নদীর মায়াময় স্বচ্ছতা, ঐতিহাসিক নিদর্শন-সমৃদ্ধ নয়নমুগ্ধকর সবুজ বনানী ঘেরা এই ছোট ছোট দ্বীপ ট্যুরিস্টদের তো আকর্ষণ করবেই। প্রত্যেকটি দ্বীপে আছে কটেজ, বসতবাড়ি, হোটেল আর যোগাযোগের জন্য বর্ণাঢ্য স্টীমার। অনেক ক্ষেত্রে কটেজের মালিকের নিজস্ব নৌকাও থাকে। ভাবলাম আমার দেশ দেখার আশা মিটবে আর তার সঙ্গে মিটবে সহস্রদ্বীপের পুণ্য তীর্থে প্রণাম জানিয়ে আসার আশা।

কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর গন্তব্যস্থল শিকাগো। সেখানে তিনি ধর্মমহাসম্মেলনে যোগ দেবেন। নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছুলেন শিকাগো। সেখানে ধর্মমহাসম্মেলন শুরু হবে ১১ সেপ্টেম্বর। ধর্মসম্মেলনে তাঁর অশ্রুতপূর্ব সাফল্যের ইতিহাস তাঁর জীবনী-পাঠকদের সকলেরই জানা। যাহোক, শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতার পরে স্বামীজী আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বেদান্ত প্রচারান্তে ১৮৯৪ তে তিনি এলেন নিউইয়র্কে। নানা জায়গায় নানা পরিবেশে বিদেশীদের কাছে বেদান্ত প্রচার করে চলেছেন স্বামীজী। মানুষের শরীর তো, তাই অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে এক সময় তিনি ক্লান্ত হয়ে কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে চাইছিলেন। তাঁর এক ভক্তের সেণ্ট লরেন্স নদীর বৃহত্তম দ্বীপ 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক ওয়ে'তে একটি 'কটেজ' ছিল। তিনি সেটি স্বামীজী ও তাঁর অনুরাগীদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। ঘুরে ঘুরে ক্লাস করতে হবে না। সেখানেই চলবে ক্লাস—আর স্বামীজীও পাবেন বিশ্রামের অবকাশ। কটেজটি স্বামীজীর বাসোপযোগী করে তৈরি করা হল।

নতুন এই আবাসটি একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। তীর থেকে বেশি দূরে নয়। একদিকে নদীর দৃশ্য, অপর দিকে ক্লেটন সহর। দোতলার ঘরটি প্রশস্ত, তাই সেখানেই স্বামীজী ক্লাস নিতেন। আর উপরের ঘরটি

স্বামীজীর বাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উপরের ঘরে যাবার জন্য একটি আলাদা সিঁড়িও ছিল, একমাত্র তাঁর ব্যবহারের জন্য। সমস্ত কটেজটিকে ঘিরে রেখেছে বিশাল তরুশ্রেণী। আশেপাশের কোন বসতি চোখে পড়ে না। ধ্যান আর অধ্যাত্ম সাধনার সেইতো উপযুক্ত পরিবেশ।

এখানে ১৯ জুলাই ১৮৯৫ তারিখে বারো জন ভক্ত নিয়ে স্বামীজীর ক্লাস শুরু হল। এক নাগাড়ে সাত সপ্তাহ স্বামীজী সেখানে নিয়মিত ক্লাস করেন। সেইগুলি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত মিস্ এস. ই. ওয়ালডো। পরে সেটি সংকলিত হয়ে 'Inspired Talks'-নামে প্রকাশিত হয়। ৭ অগস্ট ১৮৯৫ তারিখে স্বামীজী সহস্রদ্বীপ ত্যাগ করে নিউইয়র্কের পথে যাত্রা করেন। দ্বীপ-ত্যাগের আগে তিনি বলেন, "I bless the Thousand Islands."

টরোণ্টোতে অনেক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত আছেন। শ্রী এস. আর. ঘোষ ও তাঁর পত্নী তাঁদের অন্যতম। ওঁদের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হল স্বামী আদীশ্বরানন্দ মহারাজের সঙ্গে। মহারাজকে চিঠি দেওয়া হল। উত্তর পেয়ে ওঁর পরামর্শমতো যাওয়ার দিন স্থির করি। সরাসরি গাড়িতে যাব—আমি, সস্ত্রীক সুখেন্দু আর সস্ত্রীক শ্রী ঘোষ। ম্যাপ দেখে রাস্তা ঠিক করে নেওয়া হল। টরোণ্টো থেকে সহস্রদ্বীপের দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল। টরোণ্টো থেকে হাইওয়ে নং ৪০১ ধরে কিংসটন হয়ে গ্যালানক। গ্যালানক হল কানাডার দিক থেকে সহস্রদ্বীপের প্রবেশ পথ। 'গ্যালানক' শব্দের অর্থ 'যে জমি নদীপথে হারালো'। সেন্ট লরেন্স নদীর মাঝে গজিয়ে ওঠা দ্বীপগুলি দেখেও তাই মনে হয়। গ্যালানক থেকে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কওয়ে ধরে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড ইণ্টারন্যাশানাল ব্রীজ পার হয়ে আমেরিকার দিকের সহস্রদ্বীপে পৌঁছুতে হয়।

সহস্রদ্বীপের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে জলপথের কথা অবশ্যই এসে পড়ে। এরই মধ্যে প্রবহমান একটা জাতির সংঘর্ষ ও প্রসার। গোড়ার দিকে যা ছিল শিকারের পক্ষে প্রশস্ত এক ভূমি, কয়েকজন ফরাসী ব্যবসায়ী ও পর্যটক এসে তাকে করলেন উন্নত। বৃটিশের সঙ্গে লাগল সংঘর্ষ। বৃটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সাক্ষী এই সহস্রদ্বীপ আর তার মনুমেণ্ট। আমেরিকার নতুন ধনী সম্প্রদায়েরা উনবিংশ শতকে এখানে আস্তানা গাড়লেন। ব্যক্তিগত মালিকানার আয়ত্তে এল এক একটি দ্বীপ। স্বর্গ—সে তো এখানেই। বর্তমানে হাজার হাজার শো-বোট ট্যুরিস্টদের নিয়ে যায় দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে। আমোদ-প্রমোদ আর ভোজনের এলাহি কারবার।

দুপুরে আমরা রওনা হলাম। হাইওয়ে ৪০১—সে যে কত প্রশস্ত রাজপথ তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। দুপাশের শোভা নয়নমুগ্ধকর। আশি মাইল গতিতে গাড়ি ছুটেছে—তবে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে। কেননা একটানা যাওয়ায় চালক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার এবং গাড়ির বিশ্রামের প্রয়োজন। গাড়ির যেমন প্রয়োজন গ্যাসোলিন, চালক ও যাত্রীদের তেমন প্রয়োজন স্ন্যাকস্। প্রত্যেকটি পেট্রল-পাম্পের সঙ্গে আছে রেস্টুরেণ্ট ও টয়লেট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হাত ধোয়ার সাবান আর হাত মোছবার জন্য বিশেষ কাগজ—ন্যাপকিন। কিছু খেয়ে নাও, গাড়িতে গ্যাসোলিন ভর্তি কর, আবার চল। এমনি করে আমরা সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে গেলাম গ্যালানক। সেখান থেকে ব্রীজ পেরিয়ে সোজা 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক' নামে সেই বিখ্যাত দ্বীপে যেখানে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের সেই ঐতিহাসিক কটেজ।

স্বামী আদীশ্বরানন্দজী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সন্ধ্যারতিতে যোগ দিলাম। প্রথমে ধ্যান। তারপর 'খণ্ডন ভব বন্ধন' দিয়ে শুরু করে স্তব, প্রণাম। মন ভরে গেল স্নিগ্ধ পবিত্রতায়। স্বামীজী যে ঘরটিতে থাকতেন, সেখানে ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি। যে কার্পেটে স্বামীজী বসতেন সেটি এখনও রয়েছে।

মেয়েদের থাকবার জন্য হোস্টেল আছে কাছাকাছি একটি কটেজে—কিন্তু পুরুষদের জন্য থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের যে হোটেলে রাত্রিবাস করতে হবে তা আমরা আগেই জানতাম। তবে হোটেলে জায়গা পাওয়াই হল মুস্কিল। ট্যুরিস্ট সীজন্—সর্বত্রই হাউসফুল। অগত্যা আমরা ফিরে আসি গ্যালানকে। আবার ব্রীজ পেরুতে হল। গ্যালানকের ৬ মাইল দূরে পাওয়া গেল 'আইভী লী ইন্ রেস্টুরেন্ট।' থাকা খাওয়া, রাত্রিবাস এবং গাড়ি রাখার সুন্দর ব্যবস্থা।

পরের দিন সকালে আবার এলাম স্বামীজীর সেই কটেজে। সেদিনও ধ্যান, জপ, স্তবের পরে মহারাজের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা, তবে ঘরোয়া আসরে। 'সামার রিট্রিট' চলছিল স্বামী আদীশ্বরানন্দের তত্ত্বাবধানে। আমরা যে সময় গেছি, এ বছরের 'রিট্রিট' তখন শেষ হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে এলে এতে যোগদানের সুযোগ পেতাম। যোগ দিতে না পারার জন্য আফশোস হচ্ছিল। যাহোক, আমরা সবাই প্রসাদ পেলাম। আমাদের দেশের মতো খিচুড়ি বা ডাল, ভাত, তরকারি নয়; আলুসেদ্ধ, নানারকম সবজী সেদ্ধ, স্যালাড, সুজির হালুয়া, কাটাফল, কিসমিস, আখরোট ইত্যাদি। শেষে আইসক্রীম চা, কফি। অপূর্ব সে সব খাবারের স্বাদ। সব ঘরে তৈরি।

স্বামী আদীশ্বরানন্দ মহারাজ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা হই টরোন্টোর পথে। সহস্রদ্বীপ ভ্রমণ আমার কাছে তীর্থযাত্রার সামিল। তাই তার পুণ্য স্মৃতি আজও মনকে আন্দোলিত করে।

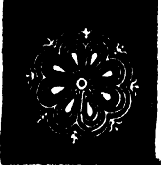
# সূর্যটা জ্বলছে জ্বলবে

শ্রীমতী গীতি সেনগুপ্ত

সবুজ ফসলে ক্ষেত ভরছে, ভরবে—
তমিস্র ঘন রাত সরছে, সরবে।
সময় দেবো না যেতে স্বপনে,
সময়টা যাবে বীজবপনে।
কর্মবৃক্ষে ফল ধরছে, ধরছে॥

নানা কাজে আছি মোরা যুক্ত
কাজ ছাড়া নেই কোনো সুখ তো।
হাত হলো আমাদের হাতিয়ার
এর চেয়ে নেই ভালো সাথী আর।

সবে মিলে দেশটাকে সাজাবো
ভাগ করে নেবো মোরা যা পাবো।
অলসতা বরফটা গলছে, গলবে
সূর্যটা জ্বলছে, জ্বলবে॥



# পুরাতনী

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

## মহামায়ার মহিমা

পরীক্ষিৎপুত্র মহারাজ জনমেজয় দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্য অবগত হবার জন্য পরাশরনন্দন মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট আগমন করে দেবীর গুণকীর্তন করতে অনুরোধ করলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন: হে রাজন্, পূর্বে আমি মহর্ষি নারদের মুখে যা শুনেছি, আমি তা-ই এখন তোমাকে বলছি। সমাহিত চিত্তে দেবীর স্বরূপের কথা শ্রবণ কর।

পরমেশ্বরী মহামায়া এই অখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তিনি সত্ত্ব-রজ-তম এই ত্রিগুণ-ময়ী। কার্যভেদে তিনি কখনও সগুণা এবং কখনও নির্গুণা। এই মহাশক্তিময়ী মহামায়াই বিশ্বের সকল কার্য সম্পাদন করেন। পুরুষ বা ব্রহ্ম অব্যয় ও পূর্ণ হলেও কোন কার্য করতে সক্ষম হন না। এই মহামায়াই সৎ ও অসদাত্মক সকল কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে স্ব-স্ব কার্য করতে সমর্থ হন। তাঁর শক্তিতে শক্তিমান না হলে কোন কার্যই তাঁরা করতে সমর্থ হন না। হে রাজন্, এই মহামায়াই মহালক্ষ্মী, তিনিই মহাকালী এবং তিনিই মহাসরস্বতী। তিনি সকল ভূতগণের ঈশ্বরী এবং সকল কারণের কারণরূপিণী। এই মহামায়াই সকল লোকের আরাধ্যা। এই করুণাময়ীর আরাধনা করলে তিনি ভক্তজনের সর্ববিধ কামনাই পূর্ণ করেন।

হে নৃপবর, আমি একবার তীর্থপর্যটন করতে করতে মুনিজনসেবিত পরমপবিত্র নৈমিষারণ্যে গিয়েছিলাম। সে-সময় মহামুনি লোমশের মুখে শুনেছিলাম এই শক্তিরূপা দেবী মহামায়াই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। যাঁরা নিজ নিজ এবং সর্বভূতের জন্য কল্যাণ কামনা করেন তাঁদের দেবী মহামায়ার আরাধনা করাই কর্তব্য। তিনি পরমাপ্রকৃতি, ব্রহ্মস্বরূপিণী। তিনিই সর্বকামপ্রদা, সর্বস্বরূপিণী। এই দেবীকে স্মরণ করলে কিংবা তাঁর নাম উচ্চারণ করলে তিনি ভক্তের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করেন। ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়, সে-উচ্চারণে যদি কোন ত্রুটিও হয় তথাপি ভক্তবৎসলা দেবী ভক্তকে কৃপা করে থাকেন। এইরূপে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ব্যাসদেব দেবীর বীজমন্ত্র জপের মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি কাহিনী রাজা জনমেজয়কে শোনালেন।

পুরাকালে কোশল রাজ্যে ধ্রুবসন্ধি নামে সূর্যবংশীয় এক ধার্মিক প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। তাঁর দুই পত্নী—মনোরমা ও লীলাবতী। দুই পত্নীর গর্ভে তাঁর দুটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে-ছিল। মনোরমার পুত্র সুদর্শন এবং লীলাবতীর পুত্র শত্রুজিৎ। সুদর্শন জ্যেষ্ঠ এবং শত্রুজিৎ কনিষ্ঠ। উভয়েই রূপে-গুণে অতুলনীয়। নৃপতি ধ্রুবসন্ধি একদিন মৃগয়ায় গিয়ে সিংহ কর্তৃক নিহত হলেন। রাজধানীতে এ-সংবাদ পৌঁছলে সকলেই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। অতঃপর রাজার সৎকার ও পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করে মন্ত্রিগণ কাকে সিংহাসনে বসানো যায় এ-বিষয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। সুদর্শন এবং শত্রুজিৎ উভয়েই তখন বালক। সুদর্শন যেহেতু জ্যেষ্ঠ এবং প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত এজন্য মন্ত্রিগণ সুদর্শনকেই রাজা করার

সিদ্ধান্ত নিলেন। লীলাবতীর পিতা উজ্জয়িনীরাজ যুধাজিৎ ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং পরাক্রান্ত নৃপতি। তিনি সুদর্শনের রাজা হবার মন্ত্রণা শুনে কোশল রাজ্যে উপস্থিত হলেন এবং বলপূর্বক নিজ দৌহিত্র শত্রুজিৎকে রাজা করার কথা ঘোষণা করলেন। মন্ত্রিগণ এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের আপত্তিতেও তিনি কর্ণপাত করলেন না। মনোরমা পুত্রের প্রাণনাশ আশঙ্কা করে মন্ত্রী বিদল্লের সঙ্গে কৌশলে সুদর্শনকে নিয়ে রাজ্য থেকে পলায়ন করলেন। চিত্রকূট পর্বতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়ে তাঁরা আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও তাঁদের এই বিপদের কথা শুনে আশ্রমের পর্ণকুটীরে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। সুদর্শন মুনিবালকদের সঙ্গেই বড় হতে লাগল। আশ্রমে অধ্যাত্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে দেবী জগদম্বার প্রতি তার ভক্তি জন্মাল। মুনিবালকেরা মন্ত্রী বিদল্লকে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। একদিন সুদর্শন যখন মুনিবালকদের সঙ্গে খেলা করছিল এমন সময় মন্ত্রী বিদল্ল সেখানে উপস্থিত হলে মুনিবালকগণ ব্যঙ্গ করে 'ক্লীব' 'ক্লীব' বলে তাঁকে সম্বোধন করল। সুদর্শন একটু দূরে থাকায় শব্দটির পূর্ণ উচ্চারণ বুঝতে পারল না। সে শুধু 'ক্লী' শব্দ শুনতে পেল। সে ভাবল এটি নিশ্চয় দেবীর বীজমন্ত্র হবে। ঐদিন থেকে সে ভক্তিভরে 'ক্লী' শব্দ জপ করতে লাগল। এই মন্ত্রজপে তার অতি নিষ্ঠা। ক্রীড়াকালে এবং শয়ন করার সময়ও সে এটি জপ করতে ভুলত না। 'ক্লীং' দেবী কালিকার বীজমন্ত্র। এই মন্ত্রজপে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। এজন্য এই বীজমন্ত্রের নাম 'কামরাজ মন্ত্র'। সুদর্শনের ভক্তিতে দেবী সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর মুখে বীজমন্ত্র অর্ধ-উচ্চারিত অর্থাৎ অনুস্বার-বর্জিতভাবে উচ্চারিত হলেও দেবী ভক্তের উচ্চারণজনিত দোষ গ্রহণ করলেন না। ক্রমে সুদর্শন যুবাবস্থায় উপনীত হল। কিন্তু তার জপের বিরাম নেই। অবশেষে দেবী একদিন সুদর্শনকে দর্শন দিয়ে তাকে দিব্য অস্ত্র এবং রক্ষাকবচ প্রদান করলেন। দেবীপ্রদত্ত এই দিব্য অস্ত্র এবং রক্ষাকবচের শক্তিতে সুদর্শন এখন সকলের অপ্রতিরোধ্য।

ঐ সময়ে বারাণসীর রাজা ছিলেন সুবাহু। শশিকলা নামে তাঁর এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। শৈশবকাল থেকেই শশিকলা দেবীর ভক্ত। একদিন দেবী শশীকলাকে স্বপ্নে আদেশ করলেন যে, সে যেন সুদর্শনকে পতিরূপে বরণ করে। তাহলে সে ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হবে। যথাসময়ে কাশীরাজ কন্যার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করলেন। অন্যান্য নৃপতিগণের মতো সুদর্শনও দেবীর ইচ্ছায় প্রেরিত হয়েই যেন বারাণসীতে উপস্থিত হলেন। শশিকলা দেবীর আদেশানুযায়ী সুদর্শনকেই পতিরূপে বরণ করলেন। এ-সংবাদ রাজা যুধাজিতের কানে পৌঁছল। তিনি দৌহিত্র শত্রুজিৎকে সঙ্গে নিয়ে বহু সৈন্য-সামন্ত সহ সুদর্শনকে হত্যা করতে কাশীরাজ্যে উপস্থিত হলেন। সুদর্শন এখন দেবীর বলে বলীয়ান। যুদ্ধে যুধাজিৎ, শত্রুজিৎ ও বহু সৈন্য নিহত হল। সুদর্শন পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করল। ভাগ্য-বিড়ম্বিত যে-রাজকুমার শৈশবে পিতৃরাজ্য হতে জননীর সঙ্গে পলায়ন করে জীবন বাঁচিয়ে ছিল, দেবীর কৃপায় এখন সকল সামন্ত রাজন্যবর্গ এবং প্রজাপুঞ্জ তার জয়ধ্বনি করে তাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করল। রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে সুদর্শন ভক্তিভরে দেবীর পূজা ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করতে লাগল।

[ দেবীভাগবতের ৩য় স্কন্ধ অবলম্বনে ]

# পুস্তক সমালোচনা

**ফার্স্ট মীটিংস উইথ শ্রীরামকৃষ্ণ** (ইংরেজী) **—স্বামী প্রভানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ মাইলাপুর, মাদ্রাজ-৪, পৃঃ ৬+৪১৩, মূল্য : ২৩'০০ টাকা।**

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীন সন্ন্যাসী (বর্তমানে মঠ-মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক) স্বামী প্রভানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ইদানীং বিশেষ সুপরিচিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গবেষণামূলক রচনা ছাড়াও তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা' (দু'খণ্ড) এ-যাবৎ অজ্ঞাত বহু নূতন সংবাদ পরিবেশন করে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বহু জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করেছে। অতি সম্প্রতি তাঁর ইংরেজী ভাষায় লিখিত 'ফার্স্ট মীটিংস উইথ শ্রীরামকৃষ্ণ' এই জাতীয় একটি গ্রন্থ যা কৌতূহলী পাঠককে আনন্দিত করবে। পুস্তকান্তর্গত রচনাগুলি যখন 'বেদান্ত কেশরী' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই পাঠকসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল। মোট ৩৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি কখন, কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে এসেছিলেন আলোচ্য গ্রন্থে উপযুক্ত তথ্য সহযোগে তার বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে সুনিপুণ যুক্তির দ্বারা আপন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেশব সেন বা নটী বিনোদিনীর প্রথম সাক্ষাৎকারের কাল অনেকেরই জানা আছে কিন্তু তোতাপুরী, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের সময় অনেকটাই অস্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই সেই কাল নির্ণীত হয়েছে অনুমানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু অনুমাণেরও যথার্থ ভিত্তি থাকা চাই। লেখক সেই ভিত্তিরই সন্ধান দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে।

বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের জীবনেতিহাস বা তাঁদের সান্নিধ্যে এসে যাঁদের জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়েছিল তাঁদের সম্পর্কে যথার্থ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া কঠিন এবং সেইকারণে তা অতিরিক্ত মাত্রায় অনুমাননির্ভর। আমাদের সৌভাগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ পেয়েছিলেন দুজন উৎসাহী শিষ্য যাঁরা পরবর্তিকালের জন্য বহু সংবাদ রেখে গেছেন 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থদ্বয়ে। এ-ছাড়াও সমকালীন অন্যান্য লেখকের রচনা এবং সাময়িক পত্র থেকেও সংবাদ সংগ্রহ সম্ভব। কিন্তু এই সকল তথ্য সত্ত্বেও কিছু কিছু ফাঁক থেকে গেছে কারণ আকরগ্রন্থের লেখকরা রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে পৌছেছেন তাঁর লীলার প্রায় শেষ প্রহরে। সমাজে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরিচিতি ও কৌতূহল ক্রমশঃ বেড়েছে। তার ফলে যে ফাঁকগুলি থেকে গিয়েছে সেগুলি পূরণের ভার পড়েছে পরবর্তী প্রজন্মের উপর। এই অপূর্ণতা দূর করা সহজসাধ্য তো নয়ই বরং যথেষ্ট ধৈর্ব ও অধ্যবসায়সাপেক্ষ। স্বামী প্রভানন্দ তাঁর বহুমুখী কর্তব্য সম্পাদনের পরেও স্বেচ্ছায় সেই কাজের ভার গ্রহণ করেছেন এবং বলাবাহুল্য তাঁর প্রচেষ্টা সর্বাংশে সার্থক হয়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আগত ব্যক্তিরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।—(১) শ্রীরামকৃষ্ণের আচার্য ও আচার্যগণ যথা তোতাপুরী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি (২) তাঁর ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলী যথা নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র, তারকনাথ প্রভৃতি (৩) গৃহী ভক্তমণ্ডলী যথা শ্রীম, রামচন্দ্র দত্ত, দুর্গাচরণ নাগ প্রভৃতি (৪) অঘোরমণি, গোলাপসুন্দরী প্রমুখ নারী ভক্তমণ্ডলী (৫) সমকালীন সমাজ ও ধর্মীয় জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যথা কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি (৬) সমকালীন উৎকেন্দ্রিক সমাজের অবশ্যম্ভাবী ফসল যথা

গিরিশচন্দ্র, কালীপদ ঘোষ প্রভৃতি এবং (৭) যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটনাক্রমে এবং তাঁদের ইচ্ছানুক্রমে যথা মধুসূদন দত্ত, প্রভুদয়াল মিশ্র, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রামকৃষ্ণ-সকাশে এঁদের প্রথম আগমনকাল এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তঁাদের পরবর্তী জীবনে তাঁর প্রভাব প্রদর্শনই গ্রন্থকারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপূরণের ফলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রের স্থানগুলিতে ধারাবাহিকতার সন্ধান পাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে উক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সকল ব্যক্তিদের আচরণ তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপরও আলোকপাত করে—সমকালীন সমাজ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। 'প্রথম সাক্ষাৎ'-এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণের মধ্যে তিনি আগত ব্যক্তিকে কিভাবে গ্রহণ করবেন, সেই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি হতে চলেছে তার ছায়াপাত ঘটে এই প্রথম দেখার ক্ষণটিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের আরও ভালভাবে জানা বা বোঝার জন্য গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য। সহজ সরল ইংরেজী ভাষায় লিখিত রচনাগুলি তথ্যসমৃদ্ধ হয়েও নীরস হয়নি—সহজ গল্পপাঠের তৃপ্তিও পাঠক এতে খুঁজে পাবেন।

পুস্তকের মুদ্রণ ও সৌষ্ঠব মঠ-মিশন প্রকাশনার উচ্চমানকে রক্ষা করেছে। মাইলাপুর মঠ-কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ তাঁরা এই ধরনের উচ্চমানের সুবৃহৎ একটি গ্রন্থ স্বল্পমূল্যে সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। গ্রন্থটি ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে আকরগ্রন্থ হিসাবে গুরুত্ব লাভ করবে—সাধারণ পাঠক পাবেন রামকৃষ্ণ-জীবন সম্পর্কিত মূল্যবান অথচ সুখপাঠ্য অনেক সংবাদ।

**—অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

**বটের বাটে—স্বামী কৃষ্ণানন্দ। প্রকাশক: শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ, ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯। পৃঃ ৩১, মূল্য: ৪'০০ টাকা।**

এটি একটি সঙ্গীতপুস্তিকা। রচয়িতা স্বামী কৃষ্ণানন্দ, যিনি স্বামী অভেদানন্দ-শিষ্য স্বামী সত্যানন্দের দীক্ষায় দীক্ষিত। লেখকের অন্য কাব্য গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীসারদা পুঁথি'; তা ছাড়া ডঃ ডি. কে. রায় নামেও তাঁর আরও কিছু বই আছে। এই বইটিতে আছে সহজিয়া সাধকদের সঙ্গীতধারায় রচিত পঁচিশটি গান। অধিকাংশ গানই শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের ভাবধারা বহন করে; দুটিতে আছে লেখকের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। 'লেখকের নিবেদন' হতে বুঝা যায় যে বইয়ের নাম 'বটের বাটে'র অর্থ 'পঞ্চবটীর পথে'; ওটি না পড়লে নামের অর্থ বুঝা কঠিন। গানের ভাষা সরল, এবং এখানে-ওখানে কথামৃতের কথা ছড়ান থাকায় বইটি ভক্তদের কাছে, বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগীদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। কয়েকটি গানে শ্রীশ্রীসারদামায়ের প্রতি লেখকের আবেগ-ভালবাসা সত্যই প্রাণস্পর্শী। গানগুলির বহুল প্রচার কামনা করি।

**—ডক্টর জলধিকুমার সরকার**

**গ্রামোন্নয়নে মনীষীরা—পরিমল চক্রবর্তী। প্রকাশক: সুবীর দাস, রত্না বুক এজেন্সী, ৬৯ কলেজ-স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩। পৃঃ ১৫৯, মূল্য: ২৫'০০ টাকা।**

গ্রন্থটির নামকরণেই বিষয়বস্তুর আভাষ মেলে। গ্রামীণ সমস্যা আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়-বস্তু। গ্রামীণ উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্য থেকে অর্থনৈতিক দিকটি বেছে নিয়েছেন গ্রন্থকার। ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকজন মনীষীর গ্রামোন্নয়নপ্রসঙ্গে চিন্তা ও মতবাদ সাবলীল

ভাষায় ও স্বচ্ছন্দ গতিতে উপস্থাপিত করেছেন অধ্যাপক পরিমল চক্রবর্তী।

অর্থনীতি ও সমাজ-জীবনের উপর অধ্যাপক চক্রবর্তীর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঐ প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। ওখান থেকে কতকগুলি বেছে নিয়ে অল্পবিস্তর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। সেজন্য এটিকে সংকলন-গ্রন্থই বলা ভাল।

অর্থনীতিবিদদের বাদ দিয়ে গ্রন্থকার বিভিন্ন সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী, ধর্মীয় নেতার রচনা-ধারা ও কর্মধারার মধ্যে যে গ্রামোন্নয়ন ভাবনার ইঙ্গিত আছে তা তুলে ধরেছেন এই বইয়ে। এই অভিনব পরিকল্পনার জন্য লেখককে সাধুবাদ জানাই। গ্রন্থমধ্যে লেখক জানিয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহাত্মা গান্ধী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলামের কথা। কৃষিব্যবস্থা, ভূমি-রাজস্ব, পল্লী উন্নয়ন, সমবায় প্রথা, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, শিক্ষা, কিষাণসমস্যা, আদিবাসী বুনিয়াদি শিক্ষা, গ্রামীণ শিল্প-বিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে এই মনীষীদের মতামত বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। তথ্য ও যুক্তির ঘাটতি নেই। বইটি নিঃসন্দেহে সুলিখিত। পড়তে পড়তে মনেই হয় না অর্থনীতির বই পড়ছি। অর্থনীতির মতো খটমট বিষয়কে এমন সহজ, সরল করে বোঝানোর জন্য লেখকের তারিফ করতে হয় বইকি!

তবে সবগুলি প্রবন্ধই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখনীয় এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অনেক দিক বাদ পড়েছে। তা কি গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরের জন্য?

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভূমিকা বইটির মূল্য ও গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

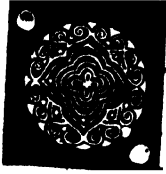
লেখার মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পার্থ-প্রতিম বিশ্বাস প্রচ্ছদ আর অলঙ্করণ করেছেন। ল্যামিনেটেড মলাটের উপর কুটিরের ছবি বেশ মানানসই হয়েছে। চিত্তাকর্ষকও বটে।

—স্বামী শান্তরূপানন্দ

## প্রাপ্তি-স্বীকার

**নবাঙ্কুর:** রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির, নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থা (২) সরিষা, সার্ধশতবর্ষ সংখ্যা। সম্পাদক: স্বামী যজ্ঞানন্দ, প্রকাশক: স্বামী যজ্ঞানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, সরিষা, পৃ: ৪২।

**প্রবোধচন্দ্রিকা:** সম্পাদক: সন্তোষকুম চট্টোপাধ্যায় এবং সন্তোষকুমার দে, প্রকাশক



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## পরিদর্শন

গত ১৬ অগস্ট, '৮৭ বিহারের রাজ্যপাল শ্রী পি. বেঙ্কটসুব্বাইয়া রাঁচির **মোরাবাদী** কেন্দ্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন-প্রকল্প দিব্যায়ন পরিদর্শন করেন।

গত ১৮ অগস্ট, '৮৭ অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগেগং আপাং **আলং** কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

## ত্রাণ

**পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণঃ** মালদা আশ্রমের মাধ্যমে পাঁচটি খাদ্যবিতরণ কেন্দ্র থেকে মালদা জেলার গাজল ব্লকের ২৫,০০০ জন বন্যাপীড়িত মানুষকে প্রত্যহ খাবার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ঐ জেলার ইংলিশ বাজার ব্লকের অধীন নরহট্টা ও কোতোয়ালী অঞ্চল এবং রাতুয়া ২নং ব্লকের হাজার হাজার বন্যাপীড়িত মানুষের মধ্যে রুটি ও গুড় বিতরণ করা হয়েছে।

মালদা আশ্রমের মাধ্যমে পশ্চিম দিনাজপুর

পাবেন। ...শাজার বন্যাদুর্গতদের

পুস্তকের মুদ্রণ ও সৌষ্ঠব ম... বিতরণ করা

উচ্চমানকে রক্ষা করেছে। ম... ও বহির্ন

কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ তাঁরা এই ধরনে

সুবৃহৎ একটি গ্রন্থ স্বল্পমূল্যে জেলার

পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। ...লিত

ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে আকরগ্রন্থ হি

গুরুত্ব লাভ করবে—সাধারণ পাঠক পাবে

রামকৃষ্ণ-জীবন সম্পর্কিত মূল্যবান অথচ সুখপাঠ্য

অনেক সংবাদ।

—অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

**অসম বন্যাত্রাণঃ** অসমের নলবাড়ি এবং বড়পেটা জেলার বন্যাদুর্গতদের মধ্যে গুয়াহাটি কেন্দ্রের মাধ্যমে মেখলা, চাদর, মশারি, বিভিন্ন প্রকার পোশাক-পরিচ্ছদ ও লণ্ঠন পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে।

**বাংলাদেশ বন্যাত্রাণঃ** দিনাজপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে ২—৫ অগস্ট পর্যন্ত চিঁড়া, রুটি এবং গুড় বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসাকার্যও শুরু হয়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত যে-সব মানুষ ঢাকা আশ্রমের বিদ্যালয়-গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের রান্নাকরা খাবার দেওয়া হয়েছিল। অসুস্থদের প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্রও দেওয়া হয়েছে।

**মেঘালয় দাঙ্গাত্রাণঃ** দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যে-সকল পরিবার শিলং-এর গোর্খা পাঠশালা, বড়পাথার এবং আরও তিনটি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের ১১২৫ জন শিশুকে গুঁড়ো দুধ দেওয়া হয়েছে। ঐসব ত্রাণশিবিরে ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল বিতরণ এবং ৪১৫ জন রোগীর চিকিৎসাও করা হয়েছে।

**গুজরাট খরাত্রাণঃ** রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে রাজকোট, কচ্ছ, সুরেন্দ্রনগর এবং জামনগর জেলার খরায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জল বিতরণ করা হয়েছে। গবাদি পশুর জন্যও খাদ্য ও পানীয় ...রবরাহ করা হয়েছে।

**মহারাষ্ট্র খরাত্রাণঃ** পুনা আশ্রমের মাধ্যমে ... জেলার মুলশী তালুকের ছয়টি গ্রামের

থরাপীড়িত ৮৭২ জনের মধ্যে জোয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

**শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ:** শ্রীলঙ্কা থেকে আগত যে-সব শরণার্থীরা এখনও মণ্ডপম শিবিরে আছে, মাদ্রাজ মিশন আশ্রম তাদের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ২৩ অগস্ট, '৮৭ রবিবার শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

## সংবাদ

### সঙ্গীতে রোগ নিরাময়

মাইকেল ব্রাডফোর্ড নামে এক শরীরবিজ্ঞানী রোগ নিরাময়ের একটি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। সেই পদ্ধতিটি হল সঙ্গীতথেরাপি। নরম বিছানায় কিছুক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে হবে। পাশে ক্যাসেটে বাজবে রোগ অনুসারে বিশেষ সঙ্গীত। কম্প্যুটার সেই সঙ্গীতকে রূপান্তরিত করবে কম্পনে। সেই কম্পন শরীরের পেশীগুলিকে ধীরে ধীরে শিথিল করে দেবে। আর তার ফলেই হবে রোগের নিরাময়। মাইকেল ব্রাডফোর্ডের মতে, শতকরা ৮০ থেকে ৮৫টি ক্ষেত্রে রোগের কারণ মানসিক চাপ। তাঁর উদ্ভাবিত এই নতুন থেরাপি সেই চাপের উপশম করিয়ে মানুষের রোগমুক্তি ঘটাবে।

### 'স্ট্রোক'-এর পরিসংখ্যান

'স্ট্রোক' (stroke) কথাটির অর্থ হঠাৎ আক্রমণ। কিন্তু অসুখ হিসাবে স্ট্রোক বলতে বুঝায়, মস্তিষ্কের কোন অংশের বৈকল্য হেতু হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া। অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে রক্ত চলাচল হঠাৎ বিঘ্নিত হওয়ায় গুরুতরভাবে অসুস্থ বা অজ্ঞান হওয়াকেও কেহ কেহ স্ট্রোক বলেন, কিন্তু কথাটি মস্তিষ্কের ব্যাপারেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে প্রতি লক্ষ লোক পিছু ২০০ জনের স্ট্রোক হতে দেখা যায়। ওখানে দেখা গেছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। যদিও ৮৫ বৎসর বয়সের ঊর্ধ্ব বয়স্কের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, ৬৫-৭৫ বৎসরের লোকের মধ্যেই বেশি সংখ্যক স্ট্রোক রোগী দেখা যায়, কারণ জনগণের মধ্যে এই বয়সের লোকের সংখ্যা বেশি। মধ্য বয়সে, স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের এই অসুখ বেশি হয়, তবে আরও বেশি বয়সে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ঘটনার বিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায় না। বিভিন্ন দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের পরিসংখ্যান নেওয়ার পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য, তুলনামূলক ভাবে আলোচনা সম্ভব না হলেও, মোটামুটিভাবে স্ট্রোকের ঘটনা বিভিন্ন দেশে প্রায় একই ধরনের। নিগ্রোদের মধ্যে স্ট্রোকের হার সামান্য বেশি হতে পারে।

স্ট্রোকের কারণ প্রধানতঃ দুইটি: মস্তিষ্কের মধ্যে বা ঠিক বাইরে রক্তক্ষরণ (haemorrhage) এবং মস্তিষ্কের রক্তনালীতে রক্ত জমে যাওয়া (embolism বা thrombosis)। এই উভয়ের ফলেই মস্তিষ্কের অংশবিশেষে রক্তচলাচল বিঘ্নিত হয়। বর্তমানে নানা উপায়ে (C.T. Scanning, Arteriography) উদ্ভাবনের ফলে মস্তিষ্কের ঠিক কোন্ অংশে রোগের কারণ রয়েছে, তা ধরা সম্ভব হচ্ছে, এবং সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসাও সম্ভব হচ্ছে। যে যে কারণ থাকলে স্ট্রোক হওয়ার কোন সম্ভাবনা বাড়ায়, সেগুলি হচ্ছে উচ্চ-রক্তচাপ (hypertension) হৃৎপিণ্ডের অসুখ, ধূমপান, সন্তাননিরোধের বটিকা খাওয়া প্রভৃতি। সন্দেহজনক কারণ: মদ্যপান, চর্বিজাতীয় খাদ্য প্রভৃতি।

## গোয়েন্দা বেজি

কলম্বো বিমান বন্দরে বেআইনি মাদকদ্রব্য অনুসন্ধানের কাজে পরীক্ষামূলকভাবে কুকুরের বদলে বেজিকে ব্যবহার করা হবে বলে সংবাদে প্রকাশ। এক বছর ধরে ট্রেনিং দিয়ে কিছু বেজিকে এই কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেছে। এই পরীক্ষা সফল প্রমাণিত হলে অন্যান্য দেশেও সেই ব্যবস্থা গৃহীত হবে বলে আশা করা যায়।

## স্মৃতিফলক উন্মোচন

সিঁথির বেণীপালের উদ্যানস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদীতে ভক্তসাধারণের জ্ঞাতার্থে একটি স্মৃতিফলক গত ২৬ জুলাই স্বামী অমলানন্দ কর্তৃক উন্মোচিত হয়েছে। ঐদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদীতে 'সিঁথি বেণীপাল উদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ'-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় পৌরোহিত্য করেন সমাজের সভাপতি, বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়।

## এবছরের লোকমান্য তিলক পুরস্কার

পুনের 'লোকমান্য তিলক স্মারক ট্রাস্ট' এবং 'কেশরী মারাঠা ট্রাস্ট' যুগ্মভাবে প্রতি বছর লোকমান্য তিলক 'পুরস্কার' প্রদান করে। দেশের কোন অগ্রণী সমাজসেবীকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের মূল্য নগদ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা. এবছর এই পুরস্কার পেলেন ভূতপূর্ব স্বাধীনতা-সংগ্রামী অচ্যুতরাও পটবর্ধন। তিনি পুরস্কারের সম্পূর্ণ অর্থ দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে দান করেন। শ্রীপটবর্ধন দীর্ঘকাল ধরে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

## জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

এবছর ১৯৮৬ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের প্রাপক ওড়িশার অন্যতম প্রধান সাহিত্যশিল্পী ডঃ সচ্চিদানন্দ রাউথরায়। ইতিপূর্বে 'সাহিত্য আকাডেমি' ও অন্যান্য সম্মানজনক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ডঃ রাউথরায়ের সাহিত্যজীবনের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্রে'র প্রভাবে ওড়িশায় সমকালে 'সবুজ' গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। সেই গোষ্ঠীর অন্যতম অগ্রগণ্য প্রতিভূ ছিলেন সচ্চিদানন্দ রাউথরায়।

## পরলোকে

আমলাগোড়া (জেলা: মেদিনীপুর) নিবাসী, গড়বেতা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরিচালন কমিটির সভাপতি **শম্ভুনাথ কুণ্ডু** গত ২৪ অগস্ট '৮৭ রাত্রি ১০ ঘটিকায় পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

# উদ্বোধন : অগ্রহায়ণ ১৩৯৪

## সূচীপত্র



৮৯তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪

# দিব্য বাণী

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

(ঋগ্বেদের এই সূক্তের ঋষি প্রত্যেকের কাছে নিবেদন করছেন:) তোমরা সম্মিলিত হও, একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর, তোমাদের মনসমূহ পরস্পর একমত হোক, পূর্বে দেবগণ যেমন ঐক্যমত্য প্রাপ্ত হয়ে (যজ্ঞের) হবির্ভাগ গ্রহণ করেছিলেন (তোমরাও সেরূপ সম্মিলিতভাবে ধনসামগ্রী গ্রহণ কর)।

এদের (পুরোহিতগণের) স্তুতি একরূপ, প্রাপ্তি একবিধ, অন্তঃকরণ একরূপ, বিচারজ জ্ঞান একবিষয়ে একীভূত হোক। আমিও তোমাদের তুল্যরূপ মন্ত্রকে সকলের ঐক্যবিধানের জন্য সংস্কার করি; তোমাদের সকলের সাধারণ হবির দ্বারা আহুতি প্রদান করি।

তোমাদের সঙ্কল্প সমান, তোমাদের হৃদয়সমূহ সমান ও তোমাদের অন্তঃকরণ-সমূহ সমান হোক। যাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয় তা-ই হোক।

[ ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২-৪ ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটি আশ্চর্য দেশ। আশ্চর্য এই দেশের সংস্কৃতি। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই সংস্কৃতির বয়স পাঁচ হাজার বছর, কাহারও কাহারও বিচারে আরও বেশি। এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারায় চোখ রাখিলে অনায়াসেই যে-বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ী ঐতিহ্য। ভারত-সংস্কৃতির মূল সুর হইল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন, বিভেদের মধ্যে মিলনের সূত্রসন্ধান, বিসদৃশের সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধন, বিরোধের মধ্যে সংহতিসাধন। ভারতবর্ষের সাধনার এই বীজমন্ত্রটি সেই কোন স্মরণাতীত কালে ভারতের প্রাচীন ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল: "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" সত্য এক, ঋষিরা তাহাকে নানা ভাবে, নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন। ঋগ্বেদের এই মন্ত্র-সত্য ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনপ্রবাহকে এতকাল ধরিয়া অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে এবং অনাগত কালেও ইহার রূপায়ণের সাধনায় ভারতবর্ষ নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন স্তোত্রে বলা হইয়াছে:

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

—অর্থাৎ রুচির বিভিন্নতা হেতু লোকে সরল বক্র নানা পথ অবলম্বন করে। [গতিপথ বিভিন্ন হলেও] নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গন্তব্য, তেমনই হে ঈশ্বর, তুমিও [মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও] সকল মানুষের একমাত্র গতি।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতিও যেন সমুদ্রেরই প্রতীক। কোন দূর প্রাচীন কাল হইতে কত জাতির মানুষ, কত উপজাতির মানুষ, কত ভাষার মানুষ, কত ধর্মের মানুষ ভাগ্যান্বেষণে অথবা রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্যবিধ কারণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" কবি বলিয়াছেন:

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হূণদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

ভারতবর্ষের বুকে মানবের এই মহামিছিল আজও অব্যাহত। অব্যাহত "এক দেহে লীন" হইয়া যাইবার প্রক্রিয়াও। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।" কেমনভাবে ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস হইয়াছে তাহার ইতিহাস স্বামীজী বলিয়াছেন, "সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ—নিশ্চয়ই কোন কালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্রসজ্জা-পরিহিতগণ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসিক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হূণ, চীন, সীথিয়ান—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদী, পারসিক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মাণ বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এইসব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

স্বামীজীর 'আত্মসাৎ' কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি আজ 'ভারতীয় সংস্কৃতি' নামে রূপলাভ করিয়াছে তাহা কোন বিশেষ জাতির নয়, বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়—বহু জাতির, বহু সম্প্রদায়ের, বহু সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ, সমন্বিত আকার। সকলের মধ্যে যাহা কিছু ভাল তাহাকে গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি যুগে যুগে কালে কালে তাহার নিজ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি ঘটিয়াছে নীরবে, অত্যন্ত সহজভাবে। ইহার জন্য কোন সংঘর্ষের প্রয়োজন হয় নাই, প্রয়োজন হয় নাই কোন প্রলোভন প্রদর্শনের। ইহা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের রক্তের মধ্যে রহিয়াছে গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার সহজাত ক্ষমতা। ইহা ভারতবর্ষের জীবনদর্শনেরই অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।" এইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় ও অন্য সংস্কৃতির পার্থক্য। ভারতীয় সংস্কৃতি যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা নিতান্তই মিলনমূলক, আর অন্যান্য সংস্কৃতি যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছে তাহা বিরোধমূলক। ইহার প্রধান কারণ, অন্যত্র এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রাজনৈতিক বা সামাজিক আদর্শ, আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাহার স্থান লইয়াছে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: "ইহাই ভারতীয় জীবনসাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।"

ধর্মাশ্রয়ী ঐক্যসাধনার যে মহান আদর্শ ভারতবর্ষ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার কেন্দ্রে রহিয়াছে তিনটি বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্যধারা। এক: সহিষ্ণুতা ( tolerance ), দুই: গ্রহীষ্ণুতা ( acceptance ), এবং তিন: আত্মীকরণ ( assimilation )। একটি অপরটির নিরপেক্ষ নয়, একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত,

একে অন্যের পরিপূরক। ভারতবর্ষ অপরের মত বা চিন্তাকে শুধু সহ্যই করে নাই, তাহারও যে নিজস্ব ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা বা প্রাসঙ্গিকতা রহিয়াছে বা রহিতে পারে তাহা স্বীকার করিয়াছে। আবার স্বীকার করিয়াই ভারতবর্ষ সেখানে থামিয়া যায় নাই। যখনই বুঝিয়াছে তাহার মধ্যে কল্যাণপ্রদ কিছু রহিয়াছে, তখনই সেই অংশকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে, স্বামীজীকে অনুসরণ করিয়া বলি, 'আত্মসাৎ' করিয়া লইয়াছে। বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্মমহাসভায় প্রথম ভাষণেই ভারতবর্ষের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের পবিত্র সংস্কৃতভাষায় ইংরেজী 'এক্‌সক্লুশন' (অর্থ: বহিষ্করণ, পরিবর্জন) শব্দটি অনুবাদ করা অসম্ভব।

এই বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীতে ভারতবর্ষ একটি অনন্য ও অভূতপূর্ব সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যই নানা বিপর্যয়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুর আজও হারাইয়া যায় নাই। আজও তাহার সমগ্রতা ও অবিচ্ছিন্নতা অম্লান। ধর্ম ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। শুধুমাত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া রোম, গ্রীস, মিশর, পারস্য প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির কোন প্রভাব আজ আমরা ঐ সমস্ত দেশে বর্তমানে খুঁজিয়া পাইব না। কারণ ঐ সমস্ত সংস্কৃতি ছিল বস্তু-আশ্রয়ী বা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি-আশ্রয়ী সংস্কৃতি। তাহাদের মধ্যে কোন মহৎ-ভাবের গভীরতা ছিল না, ছিল না উচ্চ কোন আদর্শবাদ বা প্রেরণার প্রভাব। কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্রে থাকিবার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাটি মূলতঃ একইভাবে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। মহেঞ্জোদারোর শীলমোহর ও মুদ্রায় খোদিত অথবা টেরাকোটা মূর্তিতে পূজিত মহাদেবী ও পশুপতি আজও ভারতবর্ষে আরাধিত হইতেছেন। বৈদিক যুগের সূর্য, অগ্নি, রুদ্র বর্তমান ভারতবর্ষেও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। নিত্যপূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে একই মন্ত্র আজও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সর্বত্র হিন্দুরা উচ্চারণ করিয়া থাকে। কাশ্মীরের অমরনাথ, হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশের কেদারনাথ-বদ্রীনাথ, গুজরাটের সোমনাথ, উড়িষ্যার জগন্নাথ, মধ্য-প্রদেশের মহাকাল, পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর, অসমের কামাখ্যা, ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী অদ্যাবধি সমগ্র হিন্দু-সমাজের কাছে সমানভাবে পবিত্র। বিভিন্ন প্রান্তে প্রবাহিত গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী এখনও ভারতবর্ষের অগণিত হিন্দু নরনারীকে একইভাবে আকর্ষণ করে। আচার্য শঙ্কর ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সংস্কৃতির এই মূল ধারাটিকে শক্তিশালী করিয়া দিয়াছিলেন।

উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ভারত-বর্ষের হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ধর্মগ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনার অভীপ্সাকে যেন বাণীরূপ দিয়াছে রামায়ণ ও মহাভারত। ভারত-বর্ষের আপামর হিন্দু-জনসাধারণের কাছে রাম-চন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদর্শপুরুষ, তেমনি তাঁহাদের প্রাণের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। আর সীতা? নিবেদিতা যথার্থই বলিয়াছেন, "সীতা ভারতবর্ষের চিরকালের রানী।" স্বামীজী বলিয়াছেন: "মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।... আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমনকি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃতভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কাল-স্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অবহিত হইয়া

শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতি অমার্জিত গ্রাম্য ভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান।" শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু আজও সেই রাম, সেই সীতা, সেই কৃষ্ণ, তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের কাহিনী ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের হৃদয়ে একইভাবে ধ্বনি তুলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।" ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের 'হৃৎপিণ্ড' স্পন্দিত হইয়া আসিতেছে। এস. ওয়াজেদ আলির লেখা 'ভারতবর্ষ' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটির কথা মনে পড়িতেছে। সেখানে তিনি দেখাইয়াছেন তিনপুরুষ ধরিয়া একটি পরিবার একইভাবে রামায়ণ পড়িয়া ভারতীয় সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রীয় 'ট্র্যাডিশন'কে কিভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে। বাস্তবিক, ভারতবর্ষে তাহার সংস্কৃতির ঐতিহ্যধারা এইভাবেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাহা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতের প্রাচীন স্মৃতিকার আচার্য মনু যদি আজ ভারতবর্ষে আবার ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তাঁহার মনে হইবে তিনি যেন তাঁহার সময়কার পুরাতন ভারতবর্ষেই আসিয়াছেন।

ইহা তো যাইল হিন্দু ভারতবর্ষের কথা। কিন্তু ভারতবর্ষ তো শুধু হিন্দুদের মাতৃভূমি নয়। জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ সকলেরই মাতৃভূমি ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সমন্বয়ী ঐতিহ্যের গুণে মহাবীর, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ এবং নানক ভারতবর্ষে পরম শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানে যে, ইহুদী এবং জরথুস্ত্রীয়গণ নিজ নিজ দেশে উৎপীড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষও তাহাদের সাদরে আপন হৃদয়ে আশ্রয়দান করিয়াছিল। আবার খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মকেও ভারতবর্ষ আতিথ্যদান করিয়াছে। পরবর্তিকালে সে তাহাদের নিজ অঙ্গভূক্ত করিয়া লইয়াছে। কতকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে কত বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ বসবাস করিয়া আসিতেছে। আর্য, অনার্য, আদিবাসী, পরবর্তিকালে আগত পারসিক, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলের অবদানেই ভারত-সংস্কৃতির সম্মিলিত রূপটি স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগে কবীর, নানক, দাদু ও চৈতন্য এবং বর্তমানকালে রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ভারতসাধনার এই ধারায় নতুন শক্তি ও গতি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। দিবার ও লইবার এই প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। কারণ ভারতবর্ষ থামিয়া থাকিবার নীতিতে বিশ্বাস করে না। তাহার আদর্শ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই বাণী:

চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যৌন তন্দ্রায়তে চরণ্।
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

—চলাই হইল অমৃতত্বলাভ, চলাই হইল তাহার স্বাদু ফল। ঐ দেখ সূর্যের আলোকসম্পদ—যে সূর্য জগতের বিকাশের সময় হইতে চলিতে চলিতে একদিনের জন্যও ঘুমাইয়া পড়ে নাই। অতএব চল, চল।

দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের সংহতির উপর আঘাত আসিতেছে। যাহারা সেই আঘাত করিতেছে তাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হয় ভুলিয়া গিয়াছে, নতুবা তাহাকে

অস্বীকার করিতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, জাতি, ধর্মমত অথবা সম্প্রদায় লইয়া ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে কোন বিরোধ কখনও প্রশ্রয় পায় নাই এবং পাইবেও না। রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় বলিয়াছেন: "ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব-জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।" নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও সেই মহান উদার ঐতিহ্যকে বিগত পাঁচহাজার বছর ধরিয়া ভারতবর্ষ সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। তাহাই ভারতবর্ষের তপস্যা, ভারতবর্ষের সাধনা। সেই সাধনার মধ্যেই রহিয়াছে তাহার শক্তির ভিত্তি। যদি সেই সত্যকে কেউ অস্বীকার করিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে সে-ই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে ভারতবর্ষের মূল প্রবাহ হইতে। ভারতবর্ষ তাহার স্বাভাবিক পথেই চলিবে। চলার পথে ক্লান্তি আসিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্লান্ত যাত্রাকে নূতন প্রেরণায় প্রাণিত করিতে, তাহাকে নূতন উদ্যমে উদ্বুদ্ধ করিতে, তাহার গতিতে নবতর শক্তি সঞ্চার করিতে প্রয়োজনীয় বস্তু আমরা আমাদের ঐতিহ্য হইতেই আহরণ করিব। কালের নিয়মে অনেক কিছু হারাইয়া যায়। আমরাও হারাইয়াছি অনেক। কিন্তু আমরা একটি আদর্শবাদে বিশ্বাস করি। সেই আদর্শবাদ আমাদের সকলকে স্বীকার করিবার, সকলকে গ্রহণ করিবার, সকলকে একাত্ম করিবার প্রেরণা দেয়। তাহা আমরা কোনভাবেই হারাইতে রাজী নই।

# দারুব্রহ্ম রূপে

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

চরাচর এই বিশ্বে মহা মহীয়ান্!
ঘটে ঘটে, রূপে রূপে, করি অধিষ্ঠান
পালিছ এ বিশ্ব তুমি। করিছ বিনাশ-
আপন সত্তায় তুমি না করি প্রকাশ!
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সূত্রধার—
বিশ্বব্যাপী লীলা তব মহিমা অপার

বুঝিবারে নাহি সাধ্য হে জগৎস্বামি!
তোমার বিশাল সৃষ্টির অণুমাত্র আমি।
হস্ত-পদ-হীন যেন অক্ষম অচল,
ধরিছ বামনরূপ করিবারে ছল—
মায়াধর! বিশ্বনাথ! মানবে ছলিতে
তুমি নাহি দিলে ধরা কে পারে ধরিতে?

আমারে করিতে কৃপা দারুব্রহ্ম রূপে
আমার এ দেহরথে এস চুপে চুপে।

# স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

বেলুড় মঠ,
২৩.৩.১৯১৯

প্রিয় অতুল,

আজ কয়দিন হইল তোমার এক কার্ড পাইয়া বড় আনন্দ হইয়াছে। অনেকদিন আলমোড়ার সংবাদ পাই নাই; তুমি শারীরিক ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আলমোড়া যাইবার আমার খুব ইচ্ছা আছে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা না হইলে কি করিয়া যাই? বাবুরাম মহারাজ মঠে উপস্থিত থাকিতে আমি বা আমরা যেখানে ইচ্ছা যখন তখন যাইতে পারিতাম। এখন দেখিতেছি প্রভুর ইচ্ছায় সেরূপ আর হয় না। সা'জির শরীরটা বড়ই খারাপ শুনিয়া দুঃখ হয়। উপায় কি? সবই প্রভুর ইচ্ছা। আন্তরিক প্রার্থনা—প্রভু তাঁহাকে কুশলে রাখুন। মহারাজ কলিকাতাতেই থাকেন, দৈবাৎ কখনও মঠে আসেন। শরীর তাঁহার বড় ভাল থাকে না। উৎসব প্রভুর ইচ্ছায় খুব সমারোহে হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাস অনেকে লইয়াছে, সব নাম মনে পড়িতেছে না—মুক্তি, ভোলা ইত্যাদি ১৮।১৯ জন। তুমি বোধ হয় অনেককে জান না। সীতাপতি একজন—তার নাম হইয়াছে রাঘবানন্দ। খুকুমণি হঠাৎ রেঙ্গুনে গিয়াছে। ডিমেলোর জন্য একজন ব্রাহ্মণ, একজন চাকর লইয়া গিয়াছে—তাহার বিশেষ দরকার ছিল। শীঘ্রই আবার ফিরিবে। গোবিনলাল ছেলেকে কাপড়ের দোকান করিয়া দিয়াছে। আমাকে একবার লিখিয়াছিল। কলকাতায় সন্ধান করিলে নিশ্চয়ই কোন ভক্ত পাওয়া যাইবে যাহার কাপড়ের ব্যবসা আছে এবং বাহিরে পাঠাইতেও পারে। আমি সন্ধান করিয়া গোবিনলালকে লিখিব। শুকদেবকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিবে। বাসু ডেপুটি হইয়াছে শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। প্রভুর ইচ্ছা সে বেঁচে থাকুক এবং ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত খুব কাজকর্ম করুক। সে এখন কোথায় আছে? শুকদেবকে বলিও সে যখন বাসুকে চিঠি লিখিবে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ যেন তাহাকে দেয় এবং উপরোক্ত কথাগুলি তাহাকে লিখে এবং বাসু যেন আমাকে একখানা পত্র লিখে। তাহার ঠিকানা পাইলে আমিও তাহাকে লিখিতে পারি। জয়রাম, গাঙ্গি, ধনলাল, মোহনলাল, গোবিনলাল, ঠাকুরদাস, লছিরাম, গোপালু সকলকে আমার আশীর্বাদ দিও। পাতালদেবীর ব্রাহ্মণকে আমার আশীর্বাদ। তাহার ছেলেটি মারা গিয়াছে শুনিয়া আমার দুঃখ হইয়াছিল। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

# ঈশ্বরদর্শনের উপায়

## স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

সংসারে তিনটি জিনিস দুর্লভ। সেই তিনটি হচ্ছে—মনুষ্যজন্ম, ভগবানলাভ করার ইচ্ছা, আর মহাপুরুষের সঙ্গ। আমাদের সকলেরই মনুষ্যজন্ম তো হয়েছেই, আশা করি, আমাদের সকলের ভগবানলাভ করার ইচ্ছাও আছে। যাঁরা মহাপুরুষ-সংস্পর্শে আসতে পারেননি, তাঁরা কথামৃত পড়লে ঠিক সেই মহাপুরুষসঙ্গ, সাধুসঙ্গ পাবেন। যদি ধীরভাবে কেউ কথামৃত পড়ে কোন একটা দিনের ঘটনাকে ধ্যান করে, তবে সে ঠিক দক্ষিণেশ্বরে চলে যাবে ঠাকুরের ঘরে, আর ধ্যানে বসে সে ঠাকুরের কথাই শুনবে। ঠিক এই ভাবে চিন্তা করতে হবে। এই ভাবে যদি হয় তাহলেই সাধুসঙ্গ হয়ে গেল। রাজা মহারাজ বলতেন, "তোমাদের এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞান দিচ্ছি আমি। রোজ কথামৃত পড়বে। রোজ কথামৃত পড়লে সংসারের যা ঝামেলা, সংসারের দিকে আসক্তি, এসব আস্তে আস্তে কমে যাবে। আর ভগবানলাভের জন্য মনে খুব তীব্র ইচ্ছা হবে।"

বেদান্তের আচার্যরা বলছেন, বেদান্ত পড়বার অধিকারী কে? সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন যারা। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন কারা? যাদের নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক হয়েছে। যারা এজগতে এবং স্বর্গে গিয়ে ভোগ করবার লালসা ত্যাগ করতে পেরেছে; যাদের শমদমাদি ষট্‌সম্পদ আছে; এবং যারা মুমুক্ষু অর্থাৎ ঠিক ঠিক মোক্ষলাভ করার ইচ্ছা যাদের আছে। এসব গুণ যদি কারও থাকে তবেই সে ব্যক্তি শাস্ত্র পড়বার অধিকারী। এসব না থাকলে শাস্ত্রের অর্থ ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারা যায় না। ইন্দ্র আর বিরোচন দুজনেই গেলেন গুরুর কাছে শাস্ত্র পড়তে। তারপর গুরু যখন উপদেশ দিলেন, তখন বিরোচন একরকম অর্থ করলেন, ইন্দ্র আরেকরকম অর্থ করলেন। বিরোচন মনে করলেন, শরীরটাই ব্রহ্ম। এই মনে করে তিনি জড়বাদী হয়ে গেলেন। আর ইন্দ্র, তাঁর সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ছিল। তিনি দেখলেন, এই শরীর ব্রহ্ম কি করে হতে পারে? শরীর তো স্থায়ী নয়। এই বিচার করে তিনি আবার গুরুর কাছে তাঁর উপদেশের প্রকৃত অর্থ জানতে গেলেন। বার বার গুরুর কাছে গিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেল। ঠিক সেইভাবে আমাদেরও যদি বিচার-বুদ্ধি না থাকে, ভগবান-লাভ করার জন্য আমাদের মন যদি তৈরি না থাকে, শাস্ত্রের কথা আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারব না। অনেকক্ষেত্রে বিরোচনের মতো উল্টো বুঝব। তার জন্য মন সূক্ষ্ম করতে হবে, শুদ্ধ করতে হবে, পবিত্র করতে হবে। সেজন্য বলা হয়েছে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হতে। তা হলে মন শুদ্ধ পবিত্র থাকবে। তখন সেই ব্যক্তিকে ঠিক ঠিক বেদান্ত উপদেশ দেওয়া যায়। সেও চট করে তা ধারণা করতে পারে। সাধনচতুষ্টয় দ্বারা যার মন ঠিক ঠিক তৈরি হয়েছে, মহাবাক্য যদি তাকে একবার বলা যায়—"তত্ত্বমসি শ্বেত-কেতো"—সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান হয়ে যাবে।

সেইজন্য আমাদের ত্যাগ অবলম্বন করতে হবে। ত্যাগ ছাড়া ধর্মজীবন হয় না। ঠাকুর বার বার এই ত্যাগের কথা বলেছেন। গীতায় কি আছে? ত্যাগেরই কথা। এছাড়া আর কিছু নেই। শ্রীশ্রীমা ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছেন, এবারে তাঁর ত্যাগটাই হচ্ছে মুখ্য জিনিস, এরকম ত্যাগ আর কোনও অবতারপুরুষের ভিতর দেখতে

পাওয়া যায় না। সমস্ত জগতে আজ ত্যাগের বড় অভাব। সর্বত্র আজ যেন সকলেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে মুখ্য হচ্ছে এই স্বার্থচিন্তা। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, ঠাকুরের জীবনের আদর্শ হচ্ছে ত্যাগ। এই ত্যাগের আদর্শ ঠিক থাকলে বাকি সব আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে

অনেকেই বলেন, সংসারে সাধন-ভজন করবার সময় পাওয়া যায় না। যারা এরকম মনে করেন তাঁরা ঠিক বলেন না। সব জিনিস করবার জন্য সময় পাওয়া যাচ্ছে, আর শুধু ভগবানের নাম করতে সময় পাওয়া যায় না, এটা হতে পারে না। যে কাজটা আমরা ফেলে রাখতে পারি, সেটা আমাদের ফেলে রাখবার tendency হয়ে যায়। যদি সমুদ্রের ধারে বসে বলি, সমুদ্রে স্নান করব, কিন্তু ঢেউ আসছে। ঢেউ এর ভয়ে ভাবছি ঢেউ যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন নিশ্চিন্তে স্নান করব। এ কখনই হবে না। কিন্তু যদি দুটো ঢেউ-এর মাঝখানে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে পারি তাহলেই সমুদ্রস্নান হবে। তা না হলে কখনই হবে না। সংসারেও ঠিক তাই। ঝামেলা লেগেই থাকবে। কিন্তু এরই ভিতর যদি সময় করে ভগবানের নাম করতে পারি তবেই সময় পাওয়া যাবে, না হলে নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম করব, এ হবে না। সেজন্য যখন যেরকম অবস্থায় থাকি না কেন চেষ্টা করতে হবে।

আমরা শরীরের জন্য সব রকম করি। শরীর সুস্থ রাখবার জন্য আমরা খাওয়া দাওয়া করি তারপর টনিক ভিটামিন ইত্যাদি খাই, ডাক্তারকে দিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করাই। কেন? তা না হলে শরীর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়বে, অপটু হয়ে পড়বে। তখন কাজকর্ম করতে পারব না, কোন রকম উৎসাহ পাব না কাজকর্মে, সংসার চালাতে পারব না। এ ব্যাপারে আমাদের টনটনে জ্ঞান আছে। তার জন্য শরীরের যত্ন নিই। খুব ভাল। কিন্তু মনের সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। মনকেও সুস্থ রাখতে হবে। মনকে সুস্থ না রাখলে আমাদের নিস্তার নেই। কিন্তু এ ব্যাপারটায় আমরা কোন গুরুত্ব দিই না। আমরা যে অবস্থায় আছি, সেটা রোগগ্রস্ত মন। কোন একটা কিছু আমাদের মনের মতো হল না, তখনই মন খারাপ হয়ে যাবে। কোন লোক একটা কথা শোনাল আর সমস্ত দিন মন খারাপ হয়ে থাকল কিংবা একটা খারাপ ঘটনা হল, তাতে মন খারাপ হল। মনটাকে ধীর স্থির শান্ত রাখতে হবে। খুব সুস্থ মন হলে এমন ধীর শান্তভাবে তা থাকবে যে, দুঃখ কষ্ট বা নানা রকম অশান্তিদায়ক ঘটনা ঘটলেও মন এতটুকু বিচলিত হবে না, শান্ত থাকবে। এই হচ্ছে সুস্থ মনের অবস্থা। কিন্তু সেটা লাভ করতে গেলে, আমাদের অনেক সাধন-ভজন দরকার।

তাছাড়া এটাও বলি, যখন আমরা এই জগৎ থেকে চলে যাব এবং তারপর আবার যখন জন্মাতে হবে, তখন হয়তো সুস্থ সবল শরীর পাব, কিন্তু সুস্থ মন পাব না। কারণ, এই মনই তো আবার গিয়ে জন্মাবে। কেন? আমি স্থূল শরীরটা ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর আবার গিয়ে আর একটা স্থূল শরীর গ্রহণ করবে। সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে একটা অঙ্গ হল মন। মন, বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীর আবার গিয়ে জন্মাল যে স্থূল শরীরটা নিয়ে, তখন একই মন আবার জন্মাবে। সেইজন্য এই জন্মে মরবার সময়, আমার মন যদি সুস্থ না থাকে, রোগগ্রস্ত থাকে তাহলে সেই রোগগ্রস্ত মন নিয়েই আবার আমি জন্মাব। আর যদি মরবার সময় ভাল সংস্কার নিয়ে যাই, তবে কি হয়? অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করছেন—যোগভ্রষ্ট কোথায় যায়,

কি হয় তার পরে? ভগবান বলছেন, যোগভ্রষ্ট আবার জন্মাবে, ভাল জায়গায়, ভাল কুলে জন্মাবে। সে আগের জন্মে যেখানে যোগাভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিল, ঠিক সেই জায়গা থেকেই আবার আরম্ভ করবে। এরকম করতে করতে যতক্ষণ না ভগবদ্দর্শন হয়, সে চলতে থাকবে। সেইজন্য মনের উপর আমাদের নজর বেশি দিতে হবে। কিন্তু, আমরা ঠিক উল্টোটি করি। মনের উপর কোন নজর দিই না। শরীরের উপরই নজর দিই। মনের উপর নজর দিতে গেলে জপ-ধ্যান এসব করতে হবে। তাহলে মনটা সুস্থ থাকবে।

আর একটা কথা বলি। শ্রীশ্রীমা বলতেন, "সবাই একটা কথা শিখে রেখেছে, ভগবানের কৃপা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারব না।" এ যেন টিয়াপাখির 'রাধাকৃষ্ণ' বলার মতন। আমি যখন চেরাপুঞ্জিতে গিয়েছিলাম, ওখানে তখন একটা ময়না পাখি ছিল। সে আমাকে বললে "রামকৃষ্ণ কও, রামকৃষ্ণ কও।" এদিকে যদি বেড়াল আসে, তখন 'রামকৃষ্ণ' বলা ছেড়ে, 'ক্যাঁ ক্যাঁ' করবে। ঠিক সেইভাবে আমরা সব ভগবানের উপর ছেড়ে দিই, বলি: "আমাদের করবার কোন শক্তি নেই, সব তাঁর ইচ্ছা।" এ নিজেকে ঠকানোর ব্যাপার। মা বলতেন, "সবাই বলে কৃপা কৃপা। কৃপায় কি করবে? কৃপা গিয়ে ফিরে আসে। কেন? যার কাছে কৃপা যাচ্ছে, সে কৃপা নেওয়ার উপযুক্ত হয়নি। সে নিতে পারছে না। এইজন্য কৃপা ফিরে আসছে"। তাই আমরা যদি সাধন-ভজন না করি, তাহলে আমরা ভগবানের কৃপা পাব না।

রামানুজ সম্প্রদায়ের 'প্রপত্তি' হল সাধনার একটি অঙ্গ। 'প্রপত্তি' অর্থাৎ শরণাগতি। ভগবানের শরণাগত হতে হবে। তবে তাঁর কৃপা হবে। ভগবানের কৃপা হলে তাঁর দর্শন হবে। কঠোপনিষদে একটা মন্ত্র আছে তার দুরকম অর্থ হয়। একটা অর্থ—আত্মা যাকে বরণ করেন, অর্থাৎ যে স্বয়ং আত্মদর্শন করতে উদ্যমী হয়, তিনি আত্মদর্শন করেন। আর একটা অর্থ—ভগবান যাঁকে কৃপা করেন, তিনি আত্মাকে পান। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে প্রথম অর্থ করেছেন, রামানুজাচার্য তাঁর ভাষ্যে পরের অর্থটি করেছেন। ভগবান যাঁকে কৃপা করেন তিনি তাঁর দর্শন পাবেন, এ-কথাটা ঠিকই। ঠাকুরও বলেছেন, ভগবানের কৃপা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। গানেও আছে, "কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে?" ঠিক কথা! কিন্তু ভগবান কি আমাদের কাছ থেকে কোনরকম প্রত্যাশা করেন না? আমরা সাধন-ভজন কিছু করলাম না, তাঁর কৃপা এমনিই পাব, তা হবে না। আমাদের সাধ্যমত সাধন-ভজন করে তাঁর দরজায় পড়ে থাকতে হবে, তবেই একদিন না একদিন তাঁর কৃপা হবে। তখন তাঁর দর্শন হবে। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে যীশু আসবেন বলে লোকেরা বসে ছিল বাতি জ্বালিয়ে। কিন্তু কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ল এবং যীশু যখন এলেন, তখন অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। দু-একজন শুধু জেগে ছিল। ঠিই সেই ভাবেই আমাদেরও যদি সাধন-ভজন না থাকে তাহলে ভগবানের কৃপা আমরা পাব না।

এটি মনে রাখতে হবে যে, আমরা যখন সাধ্যমত সাধন-ভজন করব, ভগবান আমাদের যত শক্তি দিয়েছেন সেই শক্তির সম্পূর্ণ ব্যবহার করব, তখনই ভগবানের কৃপা হবে। তাঁর কাছ থেকে আমাদের কাছে তখন বেশি শক্তি আসবে। এ-কথাটা ভুললে চলবে না। তাই বলি, ভগবানের কৃপা একথাটা ভুলে যাও। আমারই কৃপা, আত্মকৃপা দরকার প্রথম। আমি যদি সাধন-ভজন করি তখন ভগবানও কৃপা করবেন, না হলে নয়। এ-কথাটা ধর্মজীবনে সবসময় মনে রাখতে হবে।

ধর্মজীবনে কখন হতাশ হওয়া উচিত নয়। হতাশ হলে কখনও এগোতে পারবে না। ভগবান গীতায় অর্জুনকে যোগাভ্যাসের উপদেশ দিয়েছেন। যোগাভ্যাস করতে গেলে কিভাবে করতে হবে? বলছেন: "যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা" (গীতা, ৬।২৩)—নির্বেদশূন্য চিত্তে যোগ অভ্যাস করতে হবে। কখনও মনে হতাশ ভাব আসতে না দিয়ে রোজ লেগে থাকলে এই যোগাভ্যাস হবে। এরকম যদি করি, তবেই এগোতে পারব। আর হতাশ হলে, আমার কিছু হচ্ছে না, আমার কি হল, আমার কি হবে—এসব নেতিবাচক ভাবে মানুষের সাহায্য হবে না। ঠাকুর যেমন বলেছেন, আমি ভগবানের নাম করছি, আমার কেন হবে না? আমার হতেই হবে। এই রকম একটা ভাব নিয়ে চলতে হবে। অনেকেই আমরা কোন না কোন ভাবে ভগবানলাভের জন্য চেষ্টা করছি; কিন্তু আমাদের সাধন-ভজনের উপরেই আমাদের ভগবানলাভ নির্ভর করছে। এটা মনে রাখতে হবে।

অবশ্য শুধুমাত্র সাধন-ভজনের দ্বারাই ভগবদ্দর্শন হয় না। ভগবান আমাদের লিখে-পড়ে দেননি যে, তুমি এত লাখ জপ কর, এত ঘণ্টা ধ্যান কর, তাহলে আমি তোমাকে দর্শন দেব। এ তাঁর মর্জি। কিন্তু এসব আবার না করলেও তিনি খুশি হবেন না। দুটোই ঠিক। এটি যেন আমাদের সর্বদা মনে থাকে। আমরা যেন কখনও নিজেদের না ঠকাই যে আমরা ভগবানের উপর সব ছেড়ে দিয়েছি, ভগবানের কৃপা না হলে আমরা কিছু করতে পারব না। এসব কথা যেন আমরা না বলি। এসব কথাকে মনে কোথাও স্থান না দিয়ে আমাদের যতটুকু শক্তি আছে, তার পুরো সদ্ব্যবহার করে যাব, তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্য।*

* গত ১৫.৮.১৯৭৫ তারিখে গুয়াহাটী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের শেষাংশের অনুলিপি।

# হবে না সঠিক গাওয়া

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ শীল

হবে না সঠিক গাওয়া।
কোথা পাব শুদ্ধ স্বর, একটা অবিমিশ্র
ভাবনা?
জমাট-বাঁধা সব কথা হয় না সঠিক বলা,
হৃদয়ের অস্ফুট ধ্বনি ধোঁয়াটে নেশায় মেশে।
এক স্বর মিশে যায় আর এক স্বরে,
একটি স্বর অপর একটি স্বরে।
অন্তরের উৎসমাঝে স্বরে স্বরে হয় একাকার।
কল্পনার ধূসর আকাশে বৃথা চোখ মেলা,
শুধু লাগে ধাঁধা।
সন্ধানী মন আমার শুধু মরে খুঁজে।
একটা শুদ্ধ স্বর, একটা অবিমিশ্র ভাবনা।

# হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবন ও সাহিত্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রূপান্তর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘটিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ স্পর্শের দ্বারা। স্পর্শ-কথা সেখানেই শেষ হয়নি। তাঁর অপ্রত্যক্ষ স্পর্শে কত জীবনে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে তার সকল কাহিনী আমাদের জানা নেই, জানা সম্ভবও নয়। একটি কাহিনী কিন্তু জেনেছি। লৌকিক-অলৌকিকের বেড়া-ভাঙা সে-কাহিনী আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লেখককে নিয়ে, তাঁর নাম ফণীশ্বরনাথ রেণু।

ফণীশ্বরনাথের জন্ম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণিয়ার ঔরাহি হিঙ্গনা গ্রামে। স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতিতে তিনি বিশেষ জড়িত ছিলেন। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি, ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনে বাল্যকালেই যোগ দিয়ে কয়েকদিন কারাবাস করেছেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে বৎসর খানেক জেল। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, কারাবাস। তারপরে জয়প্রকাশের জনসংঘর্ষ আন্দোলনে যোগদান এবং কারাবাস। ফণীশ্বরনাথ ভারত সরকারের কাছ থেকে পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন, এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভাতা। কিন্তু ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি তাঁকে অস্থির করে ফেলেছিল। "বারবার মনে হত দম বন্ধ হয়ে আসছে, ছটফট করছি নিজের হাড়মাংসের মধ্যে, চতুর্দিকে কী অসহ্য ভয়ঙ্কর অবস্থা ; এই ভারতবর্ষ কি আমরা চেয়েছিলুম ?" রাষ্ট্রপতিকে পদ্মশ্রী ফেরত দিয়েছিলেন এবং রাজ্যপালকে ফেরত দেন ভাতা।[১]

সমাজ-চেতনা এবং রাজনীতি যাঁর নাড়িতে নাড়িতে—তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে ঐসব বস্তু প্রাধান্য পাবেই। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে গণচেতনা প্রকাশের ক্ষেত্রে ফণীশ্বরনাথের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দীর্ঘসময় রোগশয্যায় ছিলেন। রোগমুক্তির পরে সাহিত্যের দিকে বিশেষ ঝুঁকে পড়েন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বেরোয় প্রথম উপন্যাস, 'মৈলা আঁচল'। তার জন্য সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার পান। 'মৈলা আঁচল', 'পরতী পরিকথা'-সহ তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। বহু অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন এই লেখককে "পাটনায় ডাকবাংলো রোডে যে-কোন সন্ধ্যায় দেখা যেত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী আর রাজনৈতিক ছোকরাদের জমজমাট আড্ডায়।" অস্থির বেপরোয়া মানুষটি প্রচলিত নৈতিকতার ধার ধারতেন না, প্রায় সবরকম আত্মক্ষয়ী নেশায় আসক্ত ; দহনে ও সহনে ক্ষতবিক্ষত।

ফণীশ্বরনাথের বয়স যখন ত্রিশ পেরিয়ে গেছে তখন তাঁর জীবনে অলৌকিক-ভাবে রামকৃষ্ণের প্রবেশ। এ-বিষয়ে মুক্ত স্বীকারোক্তিতে তিনি অক্লান্ত। দেখা যায়, তিনি কেবল ব্যক্তিগত আরাধ্য হিসাবেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে গ্রহণ করেননি (যা অনেক লেখক করেছেন), সাহিত্যেও তাঁদের উপস্থিত করেছেন (যা ঐধরনের অনেক লেখকই করেননি)।

১ সমীর রায়চৌধুরী, 'এখন সকলের দৃষ্টি বিহারের দিকে', কৃত্তিবাস, অগ্রহায়ণ, ১৩৮১

ফণীশ্বরনাথ রেণুর সহধর্মিনী শ্রীমতী লতিকা রেণুর (মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে ১৮.৩.৮৫ তারিখে তাঁর পাটনার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেছিলুম (সঙ্গে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত বড়াল ও বিমল ঘোষ)। তিনি স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলেছেন :

"১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে আমাদের বিয়ে হয়। ঐকালে ফণীশ্বরনাথ ঠাকুরদেবতা মানতেন না। সোস্তালিস্ট পার্টির লোক, জয়প্রকাশ, অশোক মেহতা, রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। আমি হিন্দুবাড়ির রীতি অনুযায়ী পূজা-অর্চনা করতাম। তা দেখে বলতেন, 'ওসব ছবিটবি রাখছ কেন? কাঁচ-কাঠে কী আছে?' ওঁর বাড়ির লোকরাও বলত, 'ও ঠাকুরদেবতা মানে না।' ওঁর শরীর বহু বৎসর ধরেই খারাপ। ১৯৪২ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে ছিলেন ভাগলপুর জেলে প্লুরিসি হয়। তারপর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভয়ানক অসুখ। প্রচুর রক্তবমি হতে থাকে। বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল না। ব্যানার্জি-সাহেব (ডাঃ টি. এন. ব্যানার্জী) ওঁকে চিকিৎসা করে বাঁচান। ঐ সময়ে এক ভিশন্ দেখেন, তার কথা বারবার আমাকে বলেছেন।…[ঐ রামকৃষ্ণ-দর্শনের বিষয়ে ফণীশ্বরনাথের নিজের কথা পরে উদ্ধৃত করব।] পাটনা রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাতায়াত ১৯৬০-এর পর থেকে। ওখানে স্টুডেন্টস্ হোমে ওঁর বোনের ছেলে নির্মল বিশ্বাসকে রাখার ব্যবস্থা করেন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাকে দেখতে নিয়মিত যেতেন। স্বামী বীতশোকানন্দ এবং সুনীল মহারাজের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা হয়েছিল।

"১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী মাধবানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। দীক্ষার পরে সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত জপ করতেন। গুরু-মহারাজের ছবি রেখেছিলেন। আশ্রমে উনি দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময়ে নিয়মিত যেতেন, অন্য কোথাও নয়। আমি যদি বলতাম, অন্য কোথাও কি পূজা হয় না, সেখানে যাবে না কেন—তাতে বলতেন, 'ওসব কথা আমাকে বলবে না; আমি শুধু আশ্রমেই যাব।' কালীপূজার সময়ে আশ্রমে সারারাত থাকতেন। গানের সময়ে তবলা বাজাতেন। প্রচুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বই বাংলা ও হিন্দীতে কিনতেন এবং পড়তেন। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বই পড়তেন তখন কাউকে কাছে আসতে দিতেন না। কেউ ডাকলে খুব বিরক্ত হতেন।"

ফণীশ্বরনাথের সঙ্গে পরিচয় ও কথাবার্তার এক চমৎকার স্মৃতিকথা লিখে পাঠিয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী :

"১৯৬৫-র শেষ দিক থেকে ১৯৬৯-এর মার্চ পর্যন্ত পাটনায় ছিলাম। সে-সময়ে রেণুজীর সাথে প্রায়ই দেখা হত। প্রায়ই বিকেলে আশ্রমে আসতেন। ঘাসের ওপর একা-একা বসে থাকতেন। কখনও বা স্টুডেন্টস্ হোমের ছাত্রদের ভলিবল খেলা দেখতেন। লাইব্রেরিতে যেতেন। সাধুদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে চুপ করে থাকতেন বেশিক্ষণ, কথা শুনতেই বেশি ভালবাসতেন। মন্দিরে ঠাকুরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন।

"ঐ সময়েই তাঁর সাথে আলাপ হয়েছিল। একদিন বলেছিলাম, আপনার একটা ইণ্টারভিউ নিতে চাই; লিটল ম্যাগাজিনে ছাপাব। হেসে বলেছিলেন: 'তাহলে বাড়িতে আসুন'। বিকেলের দিকে একদিন গিয়েছিলাম। বারান্দায় চেয়ারে বসে রেণুজীকে প্রশ্ন করেছিলাম।

"আমি: আপনি তো হিন্দীতে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক। আপনার ছোটগল্প আমার খুব ভাল লাগে।

"রেণুজী: ওসব কথা ছেড়ে দিন মহারাজ।

ঠাকুর স্বামীজীর কথা বলুন। আপনাকে যখন পেয়েছি তখন এই সুযোগ ছাড়ব না।

"আমি: সে কি! আমি এসেছি আপনার ইণ্টারভিউ নিতে। আপনার বক্তব্য, অনুভূতি —এগুলি বলবেন না? আচ্ছা, আপনি তো একদিন ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করতেন না!

"রেণুজী: আজও কি করতে চাই? কিন্তু ওঁকে অস্বীকার করব কি করে? ভালবাসাকে কি অস্বীকার করা যায়?

"আমি: ভালবাসা?

"রেণুজী: রামকৃষ্ণদেবের ছবিটা দেখছেন না! ভালবাসা—জমাটবাঁধা ভালবাসা। তাঁকে আপনারা অবতার বলুন, মহাপুরুষ বলুন, যা-ই বলুন—আমার কাছে ভালবাসার জীবন্ত সম্রাট। ঐ ছবির দিকে যখন তাকিয়ে থাকি, মনে হয়, তিনি আমার চিরকালের আপনজন। মনে হয়, তিনি যেন শুধু আমাকেই ভালবাসেন। (রেণুজী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন আবেগে)। ভেবেছি এসব মনের ভুল। কিন্তু যখনই তাকাই ঐ ছবির দিকে, মনে হয় কত আপন। ঐ চোখ দুটি থেকে ঝরে পড়ছে শুধু ভালবাসা।

"আমি: আপনি শিল্পী। আপনার ঐ চিন্তা আবেগ নয় তো?

"রেণুজী (হেসে): কি জানি! কতদিন তাঁর ছবির দিকে তাকিয়ে বলেছি—'ঠাকুর তুমি আমাকে এত ভালবাস কেন? আমি তো মদ খাই, যা-ইচ্ছে করি। মানুষ যাকে পাপ বলে তাও করেছি। তবে কেন আমাকে ভালবাস?' তিনি শুধু মিটিমিটি হাসেন, আর বলেন, 'শালা, কত পাপ করবি কর। কত মদ খাবি খা। তবু তোকে ছাড়ব না। তুই আমার। আয়, আমার কোলে বসে খা।'

"আমি: এগুলি তো হ্যালুসিনেশন্ হতে পারে!

"রেণুজী: (উত্তেজিতভাবে) হ্যালুসিনেশন্? কি বলছেন আপনি? আমি তাঁকে দেখেছি। এই আপনাকে যে-রকম দেখছি, ঠিক এ-রকম। (শান্ত হয়ে) জানেন, আমার জীবনে একটা সময় এসেছিল—টি.বি. হয়ে শয্যাশায়ী, ডাক্তাররা পর্যন্ত জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কেউ কাছে আসত না। হাসপাতালে একদিন দেখলাম —একটি লোক, খালি গা, ধুতিপরা, মুখে দাড়ি। আমার কাছে এসে বলছে, 'দূর্ শালা, অত চিন্তা করছিস কেন? তুই মরবি না, বেঁচে যাবি।' আমি বললাম, 'ডাক্তাররা যে বলছেন, মরে যাব।' লোকটি আবার বলল, 'শালা ডাক্তাররা কি জানে? আমি বলছি, তুই বেঁচে যাবি।' জানেন মহারাজ, সত্যি আমি বেঁচে উঠলাম। আর ঐ লোকটি কে জানেন—আমার রামকৃষ্ণদেব।

"আমি: আর স্বামীজীকে আপনার কী মনে হয়?

"রেণুজী: স্বামীজী? ও বাবা! একটা হিমালয় পাহাড়! বাঘের বাচ্ছা!

"আমি: আপনি তো গান্ধীজীর আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। পরে সোশ্যালিস্ট আন্দোলনেও। এই পটভূমিকায় স্বামীজী···

"রেণুজী: Swamiji was far greater than all those leaders. তিনি আমাদের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে দিয়েছেন। আগে যখন গল্প লিখতাম, তখন গ্রামের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা লিখতাম। স্বামীজী আমাকে দেখালেন, ওরা মানুষ নয়, দেবতা। সাহিত্যের মাধ্যমে আজ আমি দেবতার পূজা করি। আর সোশ্যালিজম্? Swamiji was the greatest socialist. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বামীজীর পথ নিলে দেশের অবস্থা আরও অনেক ভাল হত।

"আমি: আর মা [ সারদাদেবী ] সম্বন্ধে আপনার ধারণা ?

( হেসে ) ও-কথা বলতে পারব না। মা, আমার মা। 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে। মন, তুই ছাখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না ছাখে।'

"আমি: আপনার সাহিত্যিক-জীবনে এঁদের প্রভাব কি-রকম ?

"রেণুজী: একটা উপন্যাস লিখেছি, শিগ্‌গিরই বেরুবে।[২] ওতে দেখিয়েছি যে, বাপুজীর চেয়েও স্বামীজীর আদর্শ মহান। আমার নিজের মনে যে সব প্রশ্ন উঠেছিল, তার পরিচয় পাবেন ওতে।

"আমি: আর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ?

"রেণুজী: ঠাকুর আর স্বামীজী আমাকে দুটি জিনিস শিখিয়েছেন। ভালবাসা আর totality of life. মানুষকে আগেও ভালবাসতাম। সেই ভালবাসা জোরালো হয়েছে যখন তাঁদের কাছ থেকে শিখেছি—সব মানুষের অন্তরেই দেবত্ব লুকিয়ে আছে। আগে দুঃখ-বিপদে অসহিষ্ণু ছিলাম। এঁরা আমাকে শিখিয়েছেন, এগুলিও জীবনেরই অঙ্গ। আমি এখন জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা, সব মিলিয়েই দেখি। এবং এভাবে দেখাটাই আমাকে সাহিত্যিক হিসাবে এগিয়ে দিয়েছে। সত্যকে আরও কাছ্ থেকে দেখতে শিখেছি। স্বামীজীর 'Kali the Mother' কবিতাটা আসল জীবনের ছবি। অবশ্য সাতু মহারাজ ( স্বামী বীতশোকানন্দ ) আমাকে এটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

"আমি: কিভাবে ?

"রেণুজী: অনেক দিন আগেকার কথা। তখন আমি আশ্রমে বিশেষ যেতাম না। সাধুদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। একদিন রাত দশটা নাগাদ খুব মদ খেয়ে আশ্রমের মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরের বন্ধ দরজার সামনে পড়ে হাউ-হাউ করে কাঁদছি। প্রায় দশ-বারো মিনিট কাঁদার পরে একজন সাধু এসে আমায় ধরে উঠিয়ে বললেন—আপনি কাঁদছেন কেন ? বললাম—আমার মনে যে খুব দুঃখ স্বামীজী। তিনি আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। চেয়ারে বসতে দিয়ে বললেন— জীবনে তো সুখ-দুঃখ আছেই। ও নিয়ে চিন্তা করছেন কেন ?

"আমি: ফিলজফিটা আপনার ভাল লেগে গেল ?

"রেণুজী: ফিলজফি নয়। আমি অবাক হলাম এই দেখে যে, আমার মুখে মদের গন্ধ পেয়েও তিনি আমায় ঘৃণা করলেন না। সেই থেকেই আশ্রমে regular যাই, অন্যান্য মহারাজদের সঙ্গেও আলাপ হয়। আশ্রমের স্টুডেন্টস্-হোমে আমার ভাগ্নেকে ভর্তি করে দিলাম। আর অর্জুনকেও ধরে নিয়ে গেলাম একদিন। অর্জুন ইঁটের খোয়া ভাঙত। মজুর বলতে পারেন। মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম—মহারাজ, এই ছেলেটি স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করেছে। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য রাজমিস্ত্রীদের হেল্‌পার হয়ে কাজ করছে। সাতু মহারাজ বললেন—দিন্ ব্যাটাকে স্টুডেন্টস্-হোমে ঢুকিয়ে; কলেজে পড়বে।"

ফণীশ্বরনাথ রেণুর সাহিত্য ও জীবনদর্শনের অনেক ইঙ্গিতই উপরের সাক্ষাৎকারের বর্ণনার মধ্যে মিলবে।

এর পরে আমি ফণীশ্বরনাথের 'শ্রুত অশ্রুতপূর্ব' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রস্‌কে বসমে চার রাত' নামক রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করব—যার মধ্যে তাঁর রামকৃষ্ণ-দর্শনের সরাসরি বর্ণনা আছে। ( লেখাটি পাঠিয়েছেন শ্রীঅমল সেনগুপ্ত। শ্রীঅরুণ ঘোষ অনুবাদের ব্যবস্থা করেছেন )। পূর্বে প্রদত্ত তথ্যের

২ 'কিতনে চৌরাহে' ( প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬ )

অনুরূপ কথা থাকলেও এই অংশ এক প্রতিভাবান লেখকের অন্তর্জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লিপিকথা হিসাবে পুনশ্চ উল্লেখযোগ্য :

"হাসপাতালের ঐ মহান দিনগুলোর কথা বারবার মনে পড়ে। সে মুহূর্তের কথা—যখন আমি ভাববিহ্বল হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ঠিক এক রকম এক মূর্তিকে কথা বলতে দেখেছিলাম। ঐ সময়ের আগে পর্যন্ত রামকৃষ্ণের ছবি দেখে আমার মনে কখন ভক্তিভাব জাগেনি, বরং অশ্রদ্ধার ভাবই জাগত। এবং আমি ওঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। জানার কোন ইচ্ছাই হয়নি। বিবেকানন্দ ওঁর শিষ্য। বিবেকানন্দ কী-কী বলেছেন, কী-কী করেছেন, সেসব না জেনেই আমার মনে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটা বৈরীভাব ছিল। যেসব লোক মার্কসবাদী মনোভাবসম্পন্ন, তারা ধর্মীয় মানুষদের আফিম-খোর বা গাঁজাখোর বলে মনে করে।

"বালতি-বালতি রক্তবমির ফলে আমি তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছি। ঐ দিন আমাদের ওয়ার্ডে আধ ডজনের বেশি লোক মারা গেছেন। পাখা বন্ধ, কলে জল নেই। আমার জিভে থুতু আঠার মতো আটকে গেছে—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—ফুসফুসের রোগী আমি—শেষ সময় পর্যন্ত হুঁশ আছে—ওয়ার্ডে জলের হাহাকার—আমার থেকে-থেকে ঘুম আসছে—দুর্গন্ধে জায়গাটা নরক। হঠাৎ চোখ খুলতেই দেখি, আমার শরীরের উপর একটা ছায়া ঝুঁকে—ছায়াটি তারপরেই সরে গেল। বুঝতে পারলাম, মৃত্যুপথযাত্রী বেওয়ারিশ রোগীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক ডোম; মরলেই দখল নেবে; পরীক্ষা করে দেখছিল, শ্বাস বের হচ্ছে কিনা? আমাকে জীবিত দেখে সে ছিটকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। আমি বালিশের নিচে রাখা ঘড়ি আর কলমটাকে হাত দিয়ে দেখলাম। হাত বোধ হয় বালিশের নিচে রয়ে গেল, আমি আবার শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চেষ্টা করতে লাগলাম আপ্রাণ—যাতে জেগে থাকি।...

"এমন সময়ে এক দাড়িওয়ালা পাগল বা নেশাখোর, ধোঁয়া ওড়াতে-ওড়াতে আমার পাশে এল। আমার দিকে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে হাসতে লাগল। আমাকে সে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কাঁদছ কেন?' এবং আশ্চর্য—আবার হাসতে-হাসতে বাংলাতেও বলল—'দূর্ শালা! কাঁদছিস কেন?' আমি বললাম—'আমার অনেক কাজ করবার ছিল, কিন্তু করা হল না। আমি শুয়ে থাকতে চাই না।' দাড়িওয়ালা গম্ভীরভাবে ব্যঙ্গের স্বরে বলল—'দেশকে তো উদ্ধার করেছ, আর কি! শালা দেশের সেবক! সেবকের জ্বালায় লোকে—। তোর তো সোনার কলম?' 'হাঁ, পার্কার ফিফটি ওয়ান'—আমি লজ্জার সঙ্গে বললাম। দাড়িওয়ালা বলল—'এই সোনার কলম দিয়ে কি-কি লিখেছিস—কখনও আমার নাম লিখেছিস?—দূর শালা, কিছুই জানে না—হাঃ হাঃ হাঃ—দূর শালা, তোর রোগ কিছুই নেই, তুই এখন ভাল, তুই রোগী নয়—তুই সুস্থ—সুস্থ—ওঠ!'

"চোখ খুলে দেখি, ওয়ার্ডের বারান্দা রোদে ঝলমল করছে। মনে হল আমি সুস্থ হয়ে গেছি। দেড় বছর ধরে যে জ্বর চলেছে, তা আজ আধ ডিগ্রি কমে গেল—এই প্রথমবার। ডাক্তার হর্ড সাহেব এলেন—সঙ্কটের রাত কেটে গেছে।

"হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে পরের দিনই আমি এক বইয়ের দোকানে গেলাম। বাংলা বইয়ের মধ্যে একটি প্রচ্ছদ আমাকে আকর্ষণ করল —'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'—লেখক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—সত্যজিৎ রায়ের। (ঐ সময় পর্যন্ত উনি চিত্র-পরিচালক হননি)। ভিতরের ছবিগুলি দেখে আমি ঘাবড়ে

গেলাম। এ তো-তো-তো-তো—ঐ দিনে—ছ'সাত মাস আগে হাসপাতালের ঐ মহান দিনে—ঐ রাতে দেখা—সেই মূর্তি!

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়া শুরু করলাম। বহুদিনের অভুক্ত মানুষের যেন আহার জুটে গেল। বারবার পড়েও যেন তৃপ্তি হত না।

"রামকৃষ্ণের ছবির সামনে বসে আমার প্রথম উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম। পাণ্ডুলিপির উপর সবার আগে 'ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' লিখতে চাইছিলাম।—'সে কি রে! সোনার কলম দিয়ে বই লিখবি? আমার নাম লিখবি? প্রথমে গণেশের নাম লিখতে হয় রে বোকা—শালা! আমার কি শুঁড় আছে যে আমি গণেশ হব? যা শ্‌শালা, তোর যা মনে ইচ্ছে তাই লেখ।' তখন আমি 'শ্রীগণেশ', না লিখে লিখলাম—'সির গণেশ'৩ এবং তারপর উপন্যাস লেখা শুরু করলাম।

"রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'মা, আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিস না। আমাকে রসে-বশে রাখিস।' যদি রামকৃষ্ণ রসে-বশে না থাকতেন, যদি শুকনো সন্ন্যাসী হয়ে যেতেন, তাহলে আমার মনে হয় আজ বাংলা দেশে কেউ গান গাইতে পারত না, কেউ নাটক করতে পারত না, কেউ ছবি আঁকতে বা ফিল্‌ম্ করতে পারত না, কোন সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারত না।"

ফণীশ্বরনাথ রেণুর অলৌকিক রামকৃষ্ণ-দর্শনের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানগত একটা দিক আছেই। এই গ্রন্থে আমাদের বিশেষ আলোচ্য ইতিহাসের প্রসঙ্গেও তার মূল্য কম নয়। ঐ দর্শনের ফলে এক শক্তিশালী লেখকের মনোজীবনে গভীর রূপান্তর ঘটেছিল আর তাঁর সাহিত্যে তার স্পষ্ট প্রতিফলন আছে।

স্মৃতিকথাগুলি থেকে পেয়েছি—পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনের স্টুডেন্টস্ হোমের কাজকর্ম ফণীশ্বরনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। 'কিতনে চৌরাহে' নামক উপন্যাসে স্টুডেন্টস্ হোমের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে এনেছেন। কাহিনীতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা আছে—তার আকর্ষণে দেশে প্রাণতরঙ্গ বইছে। তারই অন্তঃস্রোতরূপে বইছে বিবেকানন্দের সেবাধর্ম ও সর্বস্বত্যাগের আদর্শধারা। স্টুডেন্টস্ হোমের কিশোর ছাত্র মনোমোহনকে প্রিয়দা (প্রিয়ব্রত রায়) লোকসেবার সঙ্গে স্বদেশী ব্রতেও যুক্ত করেছিলেন। সে অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছিল। মনোমোহন স্টুডেন্টস্ হোমে থাকার আগে ও থাকার সময়ে মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসীর দ্বারা সেবাভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মনোমোহন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং সেবাব্রত—উভয় প্রেরণা প্রবলভাবে অনুভব করেছে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, মনোমোহন সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী সচ্চিদানন্দে রূপান্তরিত। তার বহুপূর্বেই প্রিয়দা-সহ অনেকে পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। ছোট ভাই গুণীজীও দেশের সেবাতে প্রাণ দিয়েছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন তখনও বাস্তবায়িত হয়নি। মনোমোহনও আত্মাহুতি দিতে চেয়েছিল—নীলুর বাধাদানে তা করে উঠতে পারেনি। কিন্তু

৩ যতদূর মনে হয়ঃ 'শ্রীগণেশ' সাধারণ শুভসূচক শব্দ যা যে-কোন জিনিস আরম্ভের পূর্বে লিখিত হয়। আর 'সির (শির) গণেশ'-এর অর্থ গণেশ শিরোপরি রইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সোনার কলম দিয়ে তাঁর নাম লিখতে বলেছিলেন ফণীশ্বরনাথকে (ফণীশ্বরনাথের 'দর্শন' অনুযায়ী)। ফণীশ্বরনাথ তা করতে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে প্রথমে গণেশ-স্মরণ করতে বলেন। তদনুযায়ী রেণুজী গণেশকে 'শিরে' রাখেন, যা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে করতে চাইছিলেন।

আত্মদানের তীব্র আকুতি তাকে নিয়ে গেছে সন্ন্যাসজীবনে, যেখানে একদিকে লোকসেবার ব্রত অন্যদিকে এই গভীর জীবনদর্শন: জীবন ও মৃত্যু—সবই চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি; তাতে বিশেষ সুখ বা দুঃখ পাবার কিছু নেই; মনে সুখ-দুঃখের ছায়া পড়ে, কিন্তু চোখের জল মুছে পথ চলতে হয়; চলার পথের সঙ্গী একজন প্রিয়দা বা একজন গুণীজী—একজন মরে, শতজনে ফুটে ওঠে—চলতে হয়ই, চলার নামই জীবন—এই জীবনেরই পথিক সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ।

এই উপন্যাসের সর্বত্র স্বামীজীর ভাব ও চিন্তা ছড়িয়ে আছে। বিবেকানন্দের জীবন ও সাহিত্যের যে-কোন অনুরাগী পাঠক শক্তিবাদ ও সেবাবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হবেনই। সুতরাং 'বুকে হাত রেখে দাঁড়ানো' ব্যাপারটা ফণীশ্বর-নাথের কাছে কৈশোরেই 'বিবেকানন্দের পোজ' বলে মনে হয়েছিল; এই উপন্যাসেও সে-রকম কথা বলেছেন। উপন্যাসে প্রিয়দা একবার খুশি হয়ে বলেছিলেন, "স্বামীজীর কথা মনে রেখেছ দেখছি। বাঘের বাচ্চা হও। লোহার মতো শক্ত শরীর, ইস্পাতের স্নায়ু-শিরা। নিজেকে চেন। হে বীর বল—আমি ভারতবাসী।" স্টুডেন্টস্ হোমের পরিচালক সন্ন্যাসীও মনো-মোহনকে বারবার বলেছেন, "অশক্ত শরীর দ্বারা পৃথিবীতে কোন কাজ হয় না।" উপন্যাসটি যেহেতু স্টুডেন্টস্ হোমের পটভূমিকায় প্রধানতঃ রচিত তাই সে-বিষয়ে বর্ণনা অনেক। প্রিয়দা স্টুডেন্টস্ হোমের প্রতি আকৃষ্ট; তাঁর কাছ থেকে শুনে মনোমোহনও আকর্ষণ বোধ করেছে। দেশের নানা জায়গায় মিশনের বিভিন্ন স্টুডেন্টস্ হোমের মতো পাটনাতেও স্টুডেন্টস্ হোম হয়েছে। সেখানে নিয়ন্ত্রিত শুদ্ধাচারের জীবন, ভোরে শয্যাত্যাগ, প্রার্থনা, ব্যায়াম, আসন, পরিচ্ছন্নতা। "মনোমোহন সে-সব কথা শুনে পুলকিত রোমাঞ্চিত; তার মনে হয়েছে পূর্বজন্মে সে যেন কোন আশ্রমেরই বিদ্যার্থী ছিল। স্টুডেন্টস্ হোমে প্রবেশের পরে অনুভব করেছে—বহুদিন পথে বিপথে ঘোরার পরে আজ সে ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে।" 'সন্ন্যাসী আশ্রমের' বড় মহারাজের ইচ্ছায় প্রিয়ব্রত 'কিশোর ক্লাব' ও 'শিশুমেলা' সংগঠন করেছেন। "বছরে একবার শিশুমেলা হয় সন্ন্যাসী আশ্রমে। সর্ব জাতি ও শ্রেণীর শিশুদের এই মিলন দেখার মতো। শত-শত শিশু এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খিচুড়ি খায়। দুপুর বেলায় ঘুড়ি ওড়াবার প্রতিযোগিতা। আকাশে হাজার রঙিন ঘুড়ি—ভো-কাটা ভো-কাটা—। খেলাধূলা, পুরস্কার, উল্লাস, গানবাজনা, সারাদিন ধরে।" কিশোর ক্লাবের ছেলেরা মুষ্টিভিক্ষায় বেরোয়। "মনোমোহন একদিন একটি পরিবারকে বোঝাচ্ছে, 'আপনার একমুঠো চাল দেশের সহস্র পীড়িত দীন-দুঃখীদের কাছে বরদানের মতো।… বন্যা, মহামারীতে সর্বস্বান্ত লোকদের ওষুধ, বস্ত্র, সেবা।—দিন মা, একমুঠো চাল'।" এই ছেলেরা যখন ভূমিকম্পের পরে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী তৈরি করে সেবাকাজে যাচ্ছে তখন সুনীল মহারাজ মনোমোহনকে বললেন, "মানুষের নয়, ভগবানকে সেবা করতে যাচ্ছ, মনে রেখ।"

এই সকল-কিছুর কেন্দ্রে দুইজন। একজন হলেন মন্দিরের 'দাড়িওয়ালা সাধুমূর্তি'—সুনীল মহারাজ যাঁর পূজা ও আরতি করেন, যাঁর সামনে শ্যামাসঙ্গীত গান। অন্যজন অবশ্যই বিবেকানন্দ। "চিত্তচাঞ্চল্য বা ভয় হলেই সে-সব জয় করার জন্য মনোমোহন স্মরণ করে বিবেকা-নন্দকে—তাঁর মূর্তি, বাণী—জাগ, ওঠ, এগিয়ে চল—।…শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে উঠে পড়ে, বাতির আলোয় বিবেকানন্দ-বাণী পড়তে থাকে। কিংবা তাঁর ছবি দেখতে থাকল—বহুক্ষণ এক দৃষ্টিতে দেখতেই থাকল।"

দেরাদুনের বড় মহারাজজী কৃপা করে গোলাপের কলম পাঠিয়েছিলেন। "মনোমোহন বাগানে তিনমাস ধরে সেই গোলাপ ফুটবার প্রতীক্ষা করেছে, তার রূপ ও রঙের কল্পনা করেছে কতভাবে। তার পরিচর্যা করার সময়ে মনে করেছে, সে যেন স্বামীজীর মূর্তিকেই সেবা করছে। সেই গোলাপ—হলদে গোলাপ—যার নাম 'দি গ্রেট সন্ন্যাসী'—প্রস্ফুটিত হয়েছে সুনীল-মহারাজ ডাকছেন, "মোনা, এসেছে মহাসন্ন্যাসী—তোমার দ্বারে! খোল দ্বার! খোল দ্বার! ওরে দৌড়ে আয়, শাঁখ নিয়ে আয়। আবির্ভাব হয়েছে।" মনোমোহন বাইরে এসে দেখল—তার বাগানে এক গৈরিক বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

'কিতনে চৌরাহে'-র জীবনদর্শন :

"এগিয়ে চল। পথে কোথাও কোন ছায়ার তলায় বসা চলবে না। কত চৌরাস্তা আসবে। না, পথে বেঁকবে না—ডানদিকে, বাম-দিকে কোন দিকে নয়। সোজা চলবে সামনে।"

[ এই উপন্যাসটির সারাংশ করে দিয়েছেন শ্রীআনন্দ সেনগুপ্ত। এক্ষেত্রে অধ্যাপিকা অণিমা মিত্রের সাহায্যও পেয়েছি। ]

ফণীশ্বরনাথের অন্য কয়েকটি উপন্যাসেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আছেন। 'পল্টুবাবু রোড' উপন্যাসে একটি চরিত্র 'ঘণ্টা' ইন্দ্রিয়রসাতুর; সে কিন্তু প্রভাবিত করতে পারে না 'ফেলা' নামক চরিত্রটিকে—"যে ফেলা আজকাল রামকৃষ্ণ মিশনে যায়, ব্যায়াম করে, বই নিয়ে আসে, এবং শুধু ঘণ্টাকেই নয়, নিজের পরিবারের সবাইকে অসুস্থ মনে করে।"

রেণুজীর 'ঋণজল ধনজল' উপন্যাসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ওতপ্রোত। উপন্যাসটি বিহারে ১৯৬৬-র খরা এবং ১৯৭৫-এর বন্যার পটভূমিকায় লেখা। খরার সূত্রে উপন্যাসে স্মরণ করা হয়েছে তীর্থযাত্রাপথে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান—তাঁর সত্যাগ্রহের কথা: "প্রথমে এদের ভরপেট খাওয়াও। নিকুচি করেছে তোমার কাশীর গঙ্গা। আমি তীর্থ করতে যাব না। এদের ভরপেট খেতে দাও—এরাই শিব, এরাই নারায়ণ।"

ফণীশ্বরনাথের জীবনদর্শনের সুগভীর রূপ ফুটে উঠেছে ভয়াল বন্যার সম্মুখীন তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণের দুই বিপরীত মূর্তি থেকে। একরূপে রামকৃষ্ণ পরম করুণাময় প্রভু। অন্যরূপে মহাকালের ত্রিনয়নধারী ভয়ঙ্কর পুরুষ।

প্রথম মূর্তি :

"দিল্লী থেকে রেডিও বলছে—পাটনার মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। ঘরের কোণ থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন—'কী রে! সারাদিনে তিনবার তো পেট ভর্তি করে খেয়েছিস। দিনভর সিগারেট ফুঁকছিস। চা খাচ্ছিস। এই তোর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই? ঘরের বাইরে যাচ্ছিস না কেন? আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে দুঃখীদের সেবা করতে যাচ্ছিস না কেন? সে-বার তো খুব উৎসাহের সঙ্গে গিয়েছিলি—এবার তোর কী হয়েছে?"

দ্বিতীয় মূর্তি :

"থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ছাদ থেকে নেমে নিজের ফ্ল্যাটে এলাম, আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ-দেবের কাছে গিয়ে বললাম—ঠাকুর রক্ষা কর! এই শহরকে বাঁচাও!…এই জলপ্রলয়ে…

"আরে দূর শালা। কাঁদছিস কেন? বাইরে দ্যাখ! তোদের একটু আনন্দ হলে রাস্তায় চলতে চলতে কোমর দুলিয়ে টুইস্ট নাচতে পারিস।… সেখানে বৃহৎ সর্বগ্রাসী মহামত্তা রহস্যময়ী প্রকৃতি কখনও নাচবে না? এবার নাচ দ্যাখ—ভয়ঙ্করী নেচে চলেছে— তা-তা-থৈ-থৈ—তা-তা-থৈ-থৈ!

তীব্রা, তীব্রবেগা শিবনর্তকী গীতপ্রিয়া বাষ্পরতা প্রেতনৃত্যপরায়ণা নাচছে। তুইও নাচ।”

ভয়ঙ্করের মুখে নির্ভয়ে দাঁড়াবার এমন অর্জন করতে পেরেছিলেন, অন্ততঃ তা করতে চেয়েছিলেন বলে, ফণীশ্বরনাথ জনবিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন অকুতোভয়ে। জয়প্রকাশের আন্দোলনে যোগ দেবার পরে “জনজাগরণমে সাহিত্যকার কী ভূমিকা” প্রবন্ধে (‘শ্রুত অশ্রুতপূর্ব’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) বলেছেন: “যাঁরা বলেন যে, এই আন্দোলনের পিছনে জনসঙ্ঘ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লোকেরা আছেন, তাঁরা যেন বুঝে নেন যে, তাঁরা ছাড়াও আর একজন অতিরিক্ত রামকৃষ্ণভক্ত এই আন্দোলনে আছেন যাঁর নাম ফণীশ্বরনাথ রেণু। যাঁর বিশ্বাস—এই দেশে গান্ধীর আগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের থেকে বড় বিপ্লবী হননি। যাঁরা দরিদ্রনারায়ণের সেবা করাকে আসল পূজা করা মনে করেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়াবাদী কে বলবে?…আমি জানি, রামকৃষ্ণ পরমহংস মার্কসের থেকে ভিন্ন কিছু বলেননি। বরং কিছু বেশি বলেছেন, যা সময়ের ব্যবধানে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।”

পরম জীবনসত্য ফণীশ্বরনাথ পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই। ‘ঋণজল ধনজল’ উপন্যাসের আরও এক অংশে তার আছে:

“…‘জীবন শুধু খুন ও ধর্ষণই করে না, জীবন গড়তেও পারে, গড়ছেও। তা রচনা করছে সমাজের জন্য, বন্ধ্যা ধরণীকে শস্যশ্যামলা করবার জন্য।…সমাজকে মানবিক আর মানুষকে সামাজিক করে তোলাই মুক্তির একমাত্র পথ। আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক সোনা ফলতে পারে। কিন্তু প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই। আজ মানুষ কেবল যন্ত্রই চালাচ্ছে। টেকনলজির যুগে আমরা জীবন-উপভোগের আসল টেকনিকই হারিয়ে ফেলেছি…’

“‘পরতী পরিকথা’-র [১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রেণুজীর উপন্যাস] এই লাইনগুলি দাগ দিয়ে রেখে দিলাম। আমার ‘জুলুস’ বইটা নিয়ে এলাম। তার শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইনগুলি পড়তে লাগলাম: ‘আমি এক বিশাল পরিবারের মেয়ে। এই আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি আর সহযোগিতা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আমার সত্তাকে আমি এই সমাজে বিলীন করে দিচ্ছি লোকসংস্কৃতিমূলক সমাজ গঠনের জন্য…’

“রঙের বাক্স নিয়ে এলাম। ‘পরতী পরিকথা’ আর ‘জুলুস’-এর চিহ্নিত লাইনগুলির উপর ঘন কালো রঙ বুলিয়ে দিয়েও তৃপ্ত হলাম না। মনের মধ্যে জমে-ওঠা অশান্তি কিছুতে যাচ্ছে না। তখন দেশলাইয়ের একটা কাঠি জেলে পৃষ্ঠাগুলিতে আগুন লাগাতে গেলাম। হঠাৎ কোণায় বসা দেবতা চীৎকার করে উঠলেন—‘এ—এ—এ—কী হচ্ছে? এসব কী হচ্ছে? তোর মাথা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি?’ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললাম—‘ঠাকুর, তুমি তো জানো, কতখানি অগাধ আস্থা, অটুট বিশ্বাস আর দৃঢ় নিষ্ঠা নিয়ে আমি একদিন এইসব লাইনগুলি লিখেছিলাম। এইসব চরিত্র নির্মাণের জন্য আমি আমার বুকের কতটা রক্ত…’

“‘শালা! গাঁজাখোর, অহঙ্কারী! বল্, তুই লিখেছিস এসব লাইন?…ম্যায়-ম্যায়-ম্যায় করে তখন থেকে ছাগলের মতো চেঁচাচ্ছিস আর মেয়েদের মতো কাঁদছিস। তুই লিখেছিলি?…’

“হুঁশ ফিরে এল।—‘না ঠাকুর, আমি কে যে লিখব, চরিত্র গড়ব? তুমি যা-কিছু যেমনভাবে লিখিয়েছিলে সেইরকমই লিখে গেছি।’

“‘তাহলে? তাহলে নিজের ইচ্ছায় এসব

লাইনে কালি বুলিয়ে দিলি কেন? আগুন লাগাতে যাচ্ছিলি কেন? আর কালি বুলিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে কি অক্ষর মোছা যাবে? আমি মানুষের কি সংজ্ঞা দিয়েছি মনে আছে?'

"'হাঁ ঠাকুর। যার নিজের মান সম্বন্ধে হুঁশ আছে—সে-ই মানুষ···।'

"'তবে? সব সময়ে নিজের মান সম্বন্ধে হুঁশ রাখ। মানুষ হয়ে থাক। কান্নাকাটি করে কিছু হবে না। ঠাকুর হাসলেন। 'এখন বাইরে গিয়ে খোঁজ। কোথাও পেয়ে যাবে।'

"মনের অবসাদ দূর হয়ে গেল। বইগুলিতে মাথা ছুঁইয়ে শেল্‌ফে রেখে দিলাম।"

[ এই উপন্যাসের প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ করে পাঠিয়েছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ ]।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আশা-নৈরাশ্য, সাফল্য-ব্যর্থতার অগণিত তরঙ্গে ওঠা-পড়া করতে-করতে ফণীশ্বরনাথের আর্তনাদ যখন রক্তবমনে স্তব্ধ হবার মুখে তখন তিনি একদা স্থির বিশ্বাসের ভিত্তিতে পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে—যিনি তাঁকে নানা বাঁক-নেওয়া নদীর গোটা চেহারাটা দেখিয়ে দেন। সেই চির কাণ্ডারীর দিকে দৃষ্টি রেখেই ফণীশ্বরনাথ শেষপর্যন্ত দাঁড় টেনে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন-প্রান্তের বিবরণ শুনে নিতে পারি শ্রীমতী লতিকা রেণুর স্মৃতিকথা থেকে:

"শরীরের উপর উনি অনেক অত্যাচার করেছেন। ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস করেছিলেন। অবিরাম সিগারেট খেতেন; তবে শেষের দিকে প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। পেটে খুব যন্ত্রণা হত। ১৯৭৬ অক্টোবরে বললেন, 'আমার বোধ হয় ক্যান্সার হয়েছে।' আমি বললাম, 'ওঃ তুমি বড়লোক, বড়ো অসুখ ছাড়া ভাবতে পারো না, তাই ক্যান্সারের কথা বলছ।' উনি বললেন, 'না, সে-কথা নয়। ঠাকুরের ক্যান্সার হয়েছিল, আমারও হবে।'

"ডাক্তাররা ক্যান্সার বুঝতে পারেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন—পেপটিক আলসার। ডাক্তাররা অপারেশনের কথা বলেন। আমিও বললাম—এত যন্ত্রণা পাচ্ছ, অপারেশন করে নাও, কষ্ট থাকবে না। উনি অপারেশনে রাজি ছিলেন না। বলতেন, 'অপারেশন করলেই আমি চলে যাব, সমাধি হয়ে যাবে।'

"ডাক্তাররা পেট ওপেন্ করেই দেখেন—ক্যান্সার। তাড়াতাড়ি তা বন্ধ করে দেন। ক্যান্সার খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। কি করে যে তিন বছরের উপর তা সহ্য করেছেন কে জানে! মনের খুব জোর ছিল। অপারেশনের পরে জ্ঞান ফিরে আসেনি। ১৯ দিন পরে দেহ যায়।"

রেণুজীর সঙ্গে শেষের দিকে পরিচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্র ভারতী। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৮৪ সংখ্যায় তিনি রেণুজীর অপারেশনের জন্য যাত্রা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"২৪ তারিখে সকাল আটটায় গিয়ে দেখি, অপারেশনের প্রস্তুতি। রেণুজী মাথার কাছ থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দের ছবি বার করে মস্তকে স্পর্শ করেন। তারপর বুকে। স্ট্রেচার এসে পড়লে তিনি শুয়ে পড়েন। হাত যুক্ত করে বলেন, 'এবার আমি যাচ্ছি'।"

আমরা জেনেছি, অপারেশনের পরে উনিশ দিন অজ্ঞান থেকে রেণুজীর শরীর যায়। ঐ অন্তর্গত চৈতন্যের প্রহরগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোন্ বিনিময় হয়েছিল? জাগ্রত চৈতন্যের কালে বিনিময়ের অনেক সংবাদই রেণুজী লিখে গেছেন। কিন্তু এই গভীরতর বার্তালাপের কোন সংবাদ নেই—তা পাওয়াও সম্ভব নয়। তখন কথার অতীত তীরে দেওয়া নেওয়া।

# চরণধ্বনি

শ্রীমতী সংযুক্তা মিত্র

অস্তগামী বিংশ শতাব্দীর
প্রলম্বিত ছায়া চলে দিগন্তের পারে।
জরা মৃত্যু বার্ধক্যের জীর্ণ হাহাকার
বাতাসে বারুদগন্ধ
অবিশ্বাস সন্দেহ দংশন।
আলো কই? আশা কই?
কই সেই প্রাণ প্রস্ফুরণ, নব জাগরণ?
আত্মশক্তি এতই কুণ্ঠিত?
ক্ষীয়মান চেতনায় কে জাগাবে
নব আশ্বাসনা
নূতন জীবনতন্ত্র নব উদ্দীপনা?

তাই আমি স্বপ্ন দেখি
অতীতের ছায়া-বিহারিণী
পুরব দিগন্তে শুনি কার আগমনী?
শেষ নেই লয় নেই সে যে এক অনন্ত মিছিল
মহাকাল অক্ষমাল্যে নিত্য জাগে তারি
ছন্দমিল।

যুগ হতে যুগান্তরে
তারাই তো লেখে ইতিহাস
দুর্মদ শপথমন্ত্রে আত্মদানে অগ্নির আখরে।
তারাই তো মুছে দেয়
বিলাপের বিষণ্ণ হুতাশ।
একবার মনে কর তাহাদের কথা
উপমন্যু শ্বেতকেতু সেই নচিকেতা;
কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত জীবন-জিজ্ঞাসা,
মৃত্যুকে তরণ করার কি দুর্জয় কঠিন প্রত্যয়!

মনে কর যৌবনের প্রতিমূর্তি রঘু শিরোমণি
জীবনের সুখস্বপ্ন ত্যাগযজ্ঞে দিয়ে পূর্ণাহুতি
নবীন বসন্ত দিনে বৈরাগ্য-বল্কল পরিধান,
জ্যোতির্ময় মূর্তিখানি কালপৃষ্ঠে নিত্য দীপ্যমান।

মনে পড়ে,
একদিকে স্নেহময় পিতা শুদ্ধোদন, প্রাণপ্রিয়া
গোপা আর আত্মজ রাহুল,
অতুল বিভবরাশি অমেয় সম্ভোগ,
বাসন্তী যৌবনদিনে জীবনের সহস্র আহ্বান।
অন্যদিকে মুণ্ডিতমস্তক আর কাষায় বসন
জগতের মুক্তিলাগি বোধিলাগি সর্ব বিসর্জন
দুশ্চর তপস্যানলে বুদ্ধত্ব অর্জন।

মনে কি পড়েনা একবার
সেই সৌম্য মূর্তিখানি প্রিয়তম সারা নদীয়ার?
যৌবন পাণ্ডিত্য অভিমান
বৈরাগ্যের যজ্ঞানলে কে দিল আহুতি?
কার কণ্ঠে জাগে সেথা নিখিলের মুক্তির
আকূতি?
যুগান্তরে আরবার ফিরে ফিরে চাই
মূর্ত মহেশ্বর ভাস্করতুল্য সেই নবীন সন্ন্যাসী,
শৃঙ্খলিতা স্বদেশজননী—
অন্নহীন আলোহীন নিশ্চেতন জড়ের জনতা
যার অভিমন্ত্রে জাগি;
সিংহমন্দ্রে গর্জি হাঁকে অভয় বারতা—
মৃত্যুমাঝে গুপ্ত আছে অমৃতজীবন
জড়তা-তামস ছেদি জীবনের সত্য-উত্তরণ।
তবে কেন রব আমি সংশয়-ব্যাকুল?
নতুন ভরসাভরে নাহি গাব সূর্য্যমুখী গান?
নতুন দিগন্তে জাগে
একবিংশ শতাব্দীর মৃদু পদধ্বনি,
সুরে তার ঝঙ্কারিত নবীন রাগিনী।
সব হিংসা মৃত্যুলীলা তাণ্ডবের পরে
জীবন-শ্মশান মাঝে
আসে ঐ শোনাতে আবার
প্রাণসঞ্জীবনী নতুন জীবনবেদ, নব মন্ত্রধ্বনি।

# হরির লুট যাদের সাধন-ভজন

শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী

আমাগো বাড়িতে আইজ হরির লুড। আপনারা যাইবেন।

প্রতিবেশীর কাছে এই হল নিমন্ত্রণ। বাড়ির কর্তাকেই যে নিজে গিয়ে বলতে হবে এমন কোন কথা নেই। বাড়ির কেউ একজন গিয়ে বললেই হল। সময়ের কথাও বলার দরকার হয় না, কারণ সবাই জানেন হরির লুট সন্ধ্যার পরেই হয়।

ঘরের বারান্দা বড় থাকলে সেখানে, না থাকলে ঘরের মধ্যেই বসে হরির লুটের আসর। গরমকালে উঠোনেও হতে দেখা যায়। যেখানেই আসর বসবে সে জায়গাটি গোবর দিয়ে সুন্দর করে নিকানো। ঘরের ঠিক মাঝখানে, কোথাও বা এক পাশে ছোট্ট কাঠের জলচৌকি। তার উপরে চটের আসন পাতা। আসনখানিতে সেলায়ের কাজ করা। আসনের উপরে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির ছবি। পাশে বা নিচে গৌর-নিতাই-এর ছবি। জুটলে ফুলের মালা, নইলে শুধু ফুল দিয়েই সাজানো। মাটির পিলসুজের উপর জলছে মাটির প্রদীপ। ছোট হাতওয়ালা মাটির ছোট্ট ধুনুচিতে নারকেলের ছোবরার সাথে পুড়ছে ধুনো। সামনে একখানা রেকাবি বা কলাপাতায় কিছু বাতাসা বা ফল-মিষ্টি, আর এক গ্লাস জল। যে যেমন জোটাতে পারে। সামনে ঘরের মেঝেতে খেজুর পাতার চাটাই পাতা। তাতে বসবেন গাইয়ে-বাজিয়ে আর নিমন্ত্রিত প্রতিবেশীরা। খড়ের ঘরের আড়ার সাথে দড়ি দিয়ে ঝোলানো হ্যারিকেন। না থাকলে দুপাশে দুটো কেরোসিনের কুপি। হ্যাজাক লাইট খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়। কারবাইড গ্যাসের বাতিও দেখা যায় কোথাও কোথাও। বেশির ভাগ জায়গাতে কেরোসিনের কুপিই আলো সরবরাহ করে। গাইয়ে-বাজিয়েরা এলেই হরির লুট শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক গ্রামেই গানবাজনার লোক দু-চার-জন থাকেন। তাঁরা খবর পেলেই আসেন গানের যন্ত্রপাতি নিয়ে। যন্ত্রপাতির মধ্যে হারমোনিয়াম।—এটা অবশ্য অতি সম্প্রতি অনুপ্রবেশ করেছে, আর আছে খোল ও করতাল, কোথাও দোতারা বা একতারা দেখা যায়। যার যার যন্ত্র তিনি নিজেই নিয়ে আসেন, অথবা গৃহকর্তা যোগাড় করে রাখেন। গাইয়ে-বাজিয়েরা কোন পারি-শ্রমিক দাবি করেন না। খবর পেলেই আসেন। এ তাদের ভাল লাগে। হরির লুটে যাওয়াকে সাধন-ভজনের অঙ্গ বিবেচনা করে কর্তব্যবোধে আসেন। প্রতিবেশী আর গাইয়ে-বাজিয়েদের পান-বিড়ি দিয়ে অতিরিক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা। ইদানীংকালে চা-ও যুক্ত হয়েছে তার সাথে। প্রতিবেশী আর গাইয়ে-বাজিয়েরা সকলেই সারাদিন কাজের পর হাটবাজার করে বাড়িতে আসেন। বাড়ি এসে তারপর হরির লুটে আসেন। হরির লুটের আসর বসতে তাই সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। আমন্ত্রিতদের মধ্যে বেশিরভাগই পুরুষ। মহিলা যাঁরা আসেন তাঁরা পিছনে এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসেন; নইলে রান্নাঘরে গিয়ে গৃহকর্ত্রীকে সাহায্য করতে করতে হরির লুটের গান শুনে নিজেদের আনন্দে রাখেন।

পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জায়গাতেই হরির লুটের ব্যবস্থা আছে। কোথাও সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় বাতাসা দিয়ে হরির লুট দেওয়া হয়। নিজেরাই 'হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে লুট দেন। কোথাও গ্রামের লোক এসে হরির লুটের জন্য নির্দিষ্ট গান করে হরির নামে লুট দিয়ে বাতাসা ছড়িয়ে দেন। কোথাও দেব-দেবীর মন্দিরে

গিয়েও হরির লুট দেওয়া হয়। সেখানে দেব-দেবী যিনিই থাকুন—হরির নামেই লুট দেওয়ার প্রথা।

যে হরির লুটের কথা নিয়ে এই আলোচনা তার রকম একটু আলাদা। পূর্ববাংলার গ্রাম এলাকায় দরিদ্র এবং সমাজের নীচু শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই হরির লুটের আবেদন বেশি। পূর্ববাংলার অধুনা বাংলাদেশের, এই শ্রেণীর মানুষের জীবনের সাথে হরির লুট নিবিড়ভাবে জড়িত। হরির লুট তাদের সাধনা। হরির লুট তাদের সামাজিক প্রথা। হরির লুট তাদের বহমান সংস্কৃতির একটি প্রধান ধারা, তাদের সাধনার অঙ্গ। অঙ্গ বলেই পূর্ববাংলা ছেড়ে এই বঙ্গে এসে নানা দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগের মধ্যেও তাঁরা হরির লুটকে ছাড়েননি! আঁকড়ে রয়েছেন। তাই দেখা গেছে উদ্বাস্তু-শিবির, রেলের প্ল্যাটফরম বা রাস্তার পাশের ঝুপড়ি—যেখানেই বাস করছেন হরির লুটও সেখানেই আছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনার মাঝেও হরির লুটের আসর বসেছে। হরির কাছে তারা মনের প্রার্থনা জানিয়েছেন। হরির লুট তাদের জীবনের অঙ্গ।

নানা উদ্দেশ্য নিয়েই হরির লুটের আয়োজন। নতুন একখানা ঘর তৈরি হয়েছে হরির লুট দিয়ে গৃহ-প্রবেশ। ঘরে কোন শুভ কাজ হবে—তার আগে ঈশ্বরের শরণ-উদ্দেশ্যে হরির লুট, শুভ কাজ ভালভাবে হয়ে গেছে হরির লুটের আয়োজন করে ভগবানকে সে-কথা জানানো। কোন দৈব-দুর্বিপাক ঘটেছে—বিপদত্রাণের প্রার্থনায় হরির লুট, গাই বাচ্চা দিয়েছে বা বাড়ির কোন গর্ভবতী সন্তান প্রসব করেছে, বাড়ির নতুন গাছে কোন ফল হয়েছে, গাছে ফল পেকেছে, জমির ফসল ঘরে উঠেছে—অমনি হরির লুট। নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে কোন দুঃসংবাদ এসেছে, কেউ অসুস্থ হয়েছে, ঘরের অসুখ-বিসুখ ছাড়ছে না, বিপদ-আপদ কাটছে না তো হরির লুট। কোন গাইয়ে আত্মীয় এসেছেন, হরির লুট লাগাও। এ ছাড়া কোন নির্দিষ্ট তিথি বা বিশেষ দিনেও হরির লুট দেবার প্রথা আছে এদের মধ্যে। দোল, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, জন্মাষ্টমী, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, পূর্ণিমা তিথি—প্রভৃতিতে রাতভরও হরির লুট হয়ে থাকে। ওদের একজনের কথা: "হরির লুড অইল গিয়া আমাগো দোল দুগ্‌গোচ্ছব। আমরা গরীব মানুষ, ভগবানরে দেওনের মতো আমাগো কিছু নাই। মন্ত্র তন্ত্র জানিনা, পূজা করুম ক্যামনে। আমরা হরির লুড দিয়া হরিরে ডাকি—মনের কথা কই—সকলে মিল্যা আনন্দ করি।"

হরির লুটের আসরে গাইয়ে-বাজিয়েরা এসেছেন। তাদের পান বিড়ি চা ( যিনি পারেন ) দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়েছে। এবার আসর শুরু। গাইয়ে-বাজিয়েরা যে যার যন্ত্র ধরলেন। 'হরি প্রেমানন্দে হরি হরি বল'—ধ্বনি দিয়ে সব যন্ত্রপাতি সহযোগে প্রথমে খানিকটা বাজনা হয়, যেমন যাত্রার পালার আগে কনসার্ট। আমন্ত্রিত যারা তারাও আসরে উপস্থিত। গাইয়ে-বাজিয়ে আর আমন্ত্রিতদের প্রায় সকলেরই খালি গা, কারোর গায়ে একটি গেঞ্জি বা জামা, কারোর শুধু গামছা। পরনে সবারই ধুতি। প্রায় সকলের গলাতেই তুলসীর মালা। বাজনা শেষ হলেই হরির লুট শুরু। কেউ গুরুবন্দনা দিয়ে শুরু করেন। এটা তাদের আবশ্যিক। কেউ আবার গৌরাঙ্গ-বন্দনা দিয়ে আরম্ভ করেন। গৌরাঙ্গবন্দনা দিয়ে শুরু করাটাই বেশি প্রচলিত। অতি প্রচলিত একখানি গৌরাঙ্গবন্দনা:

জয় শচীর নন্দন
গৌরাঙ্গ একবার এস হে, এস হে, এস হে।
তোমায় ভক্তে ডাকে বিনয় করে
গৌরাঙ্গ একবার এস হে, এস হে, এস হে।

তুমি আসিলে আনন্দ হবে, নিরানন্দ দূরে যাবে
গৌরাঙ্গ একবার এস হে, এস হে, এস হে।
এস দুটি ভাই, গৌর নিতাই
দ্বিজমণি দ্বিজরাজ হে।
পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন
রাখিব হৃদয়-মাঝে হে।
চরণপূজা করিব ; মনতুলসী দিয়ে চরণপূজা
করিব।
যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে
যন্ত্রিক বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে।
বাজাও হে, বাজাও হে।
আমি সাধন জানি না হে,
কোন সাধনে তোমায় পাব,
সাধন জানি না হে।
গৌরাঙ্গ একবার এস হে, এস হে, এস হে।

একজন গানের একটি কলি গান করেন। দোহাররা পেছনে ধরেন। উপস্থিত আমন্ত্রিত-রাও গলা মেলান। একখানা গান শেষ হলেই আর একখানা গান। কোন সময় একই গায়ক ধরেন, আবার কোন সময় অন্য এক জনে ধরেন। গান যখন খুব জমে ওঠে, গাইয়ে দ্রুত তালে গান করেন, খোল করতালও দ্রুত তালে বাজে, দোহাররাও গলা ছেড়ে গান। সেই সময় মহিলারা উলুধ্বনি দেন, শাঁখ বাজান। শ্রোতাদের মধ্য থেকে ঘন ঘন 'হরিবোল' ধ্বনি ওঠে। বাজিয়েদের দেহ থেকে দর দর ধারায় ঘাম ঝরে। হয়তো সারাদিন তাদের খাবারই জোটেনি। বাড়িতে অসুস্থ পরিজন—এই আসর সেসব কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। ভুলে আছেন, কাল সকালে কাজ না জুটলে খাবেন কি! সেসব ভাবনা এখন দূরে চলে গেছে। বিভোর হয়ে আছেন হরির লুটের গানে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এত রাত ধরে এই খাটুনি। এতে তাদের কষ্ট নেই। একজন খোল বাজিয়ের কথা : "হরির দয়ায় এতে কষ্ট মনে অয় না। মুনি-ঋষিরা বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে কত কষ্ট করে। আমরা আর কি করি! হরির নামে কিছুডা সময় কাটল। ...এই আমাগো সাধন-ভজন। আর তো কিছু করতে পারি না।" আরেক জনের কথা : "হরি গুরু লইয়াই তো আছি। না অইলে বাঁচুম কি লইয়া।" পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় এসে অতি যত্নে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের প্রাণের এই সংস্কৃতি। লালন-পালন করে তাকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন।

পূর্ববাংলার এই হরির লুটের আসর একটু স্বচ্ছল পরিবারেও হয়ে থাকে। তবে হরির লুটের প্রভাব গরীব পরিবারেই বেশি। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও হচ্ছে। একজন গাইয়ের কথা : "গেরামে বড় লোকের বাড়িতেও বছরে দুই এক সময় হরির লুড দেয়। হেই আসরে আমাগো বেশি ডাক পড়ে না। আলাদা গায়নের লোক আইন্যা করায়। আমাগো হরির লুডে দুই একজনকে কইয়া-বুল্যা আনি। বেশিক্ষণ থাকতিই চায় না। দুই একখান গান গাইয়া চইল্যা যায়।" একটু সচ্ছল পরিবারে এদের নিমন্ত্রণও হয় না সবার। এরাও সহজ হতে পারেন না সেইসব আসরে। হরির লুট পূর্ব-বাংলার রেওয়াজ। গরীব বড়লোক মধ্যবিত্ত প্রায় সব বাড়িতেই হয়।

হরির লুট শুরু হল। ঘরখানিতে এক আনন্দ-ময় পরিবেশ। মানুষগুলি যেন সব ভুলে বিভোর হয়ে হরির নাম গাইছেন। গান চলছে হরি, রাধা-
য়ক। দেহতত্ত্বের গানও হয়। কিন্তু শক্তিবিষয়ক কোন গান বড় শোনা যায় না। হরি-গুরুর কাছে প্রার্থনার গানও হয়। ভাবো-দ্দীপক সেসব গান। গানের রচয়িতার কথা অনেকেই জানে না। বাবার মুখে শুনেছি, ঠাকুরদা গাইতেন, অমুক আসরে শুনেছি, এই

পর্যন্ত। গানের ভাষাও তাদের কথাবার্তার ভাষা। গানগুলিতে নিজের দীনতা জানিয়ে প্রার্থনা, ব্যাকুলতার ভাবটিই বেশি। কৃপার জন্য আর্তি। রচয়িতারা খুবই সাধারণ মানুষ। লেখা-পড়াও বেশি জানেন না। আপনার অন্তরের আবেগ দিয়ে তাঁরা গান বাঁধেন। সেই গানে সুর দেন, আসরে এসে গান করেন। শিষ্য-পরম্পরায় চলে সেই ধারা। গানগুলির মূল ভাব মানুষকে ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দেওয়া, ভগবানের দিকে টেনে নেওয়া। বস্তুতঃ, কোন হরির লুটের আসরে বসলে সে জায়গাটুকু হরিময় বলেই তখন অনুভূত হয়। উপস্থিত সবাই বিশ্বাস করেন: হরি আসরে এসে সব শুনছেন। গানগুলিও সে ভাবেই রচিত। অতি প্রচলিত একখানা গান:

অনিত্য সংসার ছাড়ি বল হরি হরি
দিন যায় অবোধ মন কর ঐ পদ শরণ,
(ও) যার নাম নিয়ে দেই ভব পাড়ি,
এমন সুপথ থাকিতে রে মন কুপথে ডুবাস সে তরী

বল হরি হরি।
আমার আমার বলে রয়েছে মায়ায় ভুলে
কী হবে অন্তিমে না ভাবিলে।
শ্রীহরির চরণ না করলে সাধন
বৃথা এ জনম হারাইলে।
যেদিন হবে কাল আগত ভবের খেলা হবে হত
এ সুখ সম্পদ পড়ে রবে,
যেদিন রবির নন্দন করিবে বন্ধন
সকল ত্যাজিয়ে যেতে হবে—
এই যে দেখ দালান কোঠা মরলে নিবে শ্মশান ঘাটা।

বিছানার ছেঁড়া ত্যানা সঙ্গে দিবে।
আমার মন হরি বলরে, দিন তো বৃথাই গেল।
( ঐ নাম ) ব্রহ্মা জপে চতুর্মুখে বসে যোগাসনে;
জগাই মাধাই উদ্ধারিল হরিনামের গুণে।
দিন তো বৃথাই গেল।
দিন যায় অবোধ মন কর ঐ পদ শরণ

আবার কখনও সমর্পণের ভাবে অনুপ্রাণিত করা হয় হরির লুটের আসরের গানের মধ্য দিয়ে। সব ভার হরির উপর দেবার আকুল বাসনা। এরকম একখানি প্রচলিত গান যা প্রায় সব আসরেই হয়ে থাকে:

নিয়ে তব নাম, ওহে গুণধাম
ঝাঁপ দিলাম হরি পরীক্ষা-সাগরে।
(আমার) শুভাশুভের ভার ধরো কর্ণধার
তোমা বিনা আর সে ভার দিব কারে।
কর্তা তুমি তোমার এ বিশ্ব গঠন,
কর্ম তুমি তারে করেছ পালন,
ক্রিয়ারূপে তুমি জীবের অন্তর্যামী
ইচ্ছা অনুগামী সকলি সংসারে।
করাইয়াছ যাহা তাই করেছি হরি
ফলাফলের চিন্তা কিছু নাহি করি,
কেবল চিন্তা শুধু ভব-চিন্তাহারি
বিষয়-চিন্তায় যেন ভুলি না তোমারে।

রাত বারটা-একটা পর্যন্ত, কোথাও তার চেয়েও বেশি সময় ধরে চলে হরির লুট। বিরাম-বিহীন ভাবে চলে গানের পর গান। আসরে উপস্থিত সবাই এতে অংশ নেন। অংশ গ্রহণেই আনন্দ। এই জন্য কষ্ট হয় না। কোন আর্থিক লোভ নেই এতে। তাদের সকলের কাছে এটাই যেন সাধনার পথ।

হরির লুট শেষ হয় দু'ভাবে। কোথাও শেষ হয় নাম গান দিয়ে। অর্থাৎ সব শেষে:

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

—এই নাম গান দিয়ে হরির লুট শেষ করা হয়। কোথাও আবার রাধাকৃষ্ণের মিলন গান গেয়ে ইতি টানা হয়। সবাই মিলে তখন ধ্বনি দেন:

রাধাকৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি বল
হরি বল হরি।

কোন কোন জায়গায় এ-সময় কিছু বাতাসা ভক্তদের মাঝে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় আবার তা করা হয় না। সবাইকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। রেকাবি বা কলাপাতায় যে ফল-মিষ্টি তাই প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়। মন্ত্র পড়ে উৎসর্গের ব্যবস্থা থাকে না। হরির নাম করেই নিবেদন। প্রসাদের পর আবার বিদায় কালে পান-বিড়ি। এবার সবাই যে যার ঘরমুখো। কোথাও গাইয়ে-বাজিয়েদের ডালভাতের ব্যবস্থা হয়। সে খুবই কম ক্ষেত্রে।

হরির লুটের আসরে ঘরের মেয়েদের অনেক কাজ। জায়গা লেপাপোছা, ফুল তোলা, ঠাকুর সাজানো, সমস্ত আয়োজন করা, জলপান, চা করে দেওয়া এসব অনেক কাজ। এর ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা গান শোনেন। সময় বুঝে উলু দেন, শাঁখ বাজান। এতেই তাঁদের আনন্দ। একজন গৃহকর্ত্রীর কথা : "বাড়িতে এত মানুষ অইলো, হরিরনাম অইলো, ঘরডা পবিত্র অইয়া গেল। আমাগো মনেও আনন্দ অইলো। কষ্ট কি? কষ্ট তো আছেই। মনে লয় এই রকম আনন্দ মাঝে-মাঝেই অউক। ঠাকুর-দেবতার নাম লইয়া থাকন যায়।"

প্রশ্নের জবাবে আর একজনের কথা : "হ, অন্যায় তো করিঅই। মিথ্যা কথাও কইতে হয়। না কইলে চলন যায় না। খুব ঠেকায় না পড়লে মিথ্যা কই না। অন্যায়ও করি না, মিথ্যা কথা কওনের সময় বুকে একটা ধাক্কা লাগে, অনেকক্ষণ ছটফট করে। ক্যান অন্যায় করলাম, ক্যান মিথ্যা কইলাম—আফশোষ হয়। শ্যাষ-ম্যাস হরির কাছেই কাইন্দা কৈয়া পরাণডা ঠাণ্ডা করি।"

কেউ কেউ এই আসর সম্পর্কে বলে থাকেন, এসব জায়গায় গাঁজা, ভাঙ চলে। কেউ কেউ আবার গাঁজার আড্ডাও বলে থাকেন। এরকম শতাধিক হরির লুটের আসরে যোগদানের অভিজ্ঞতা এই প্রতিবেদকের আছে। পান বিড়ি চা ছাড়া আর কোন নেশা করতে এই প্রতিবেদক কখনও কাউকে দেখেনি। খুব অন্তরঙ্গভাবে মিশেও দেখেছি, এমন অভিযোগ সত্য নয়। হরির লুটের আসরে ওদের বিভোর হয়ে গান করার দৃশ্য দেখলে এমন কথা ভাবা যায় না। কেমন তন্ময় হয়ে সবাই মিলে হরিনাম করছেন! দেখলে প্রেরণা জাগায়। হরির লুটই যে ওদের সাধন-ভজন! সাধন-ভজনের সেই নিষ্ঠা পালনে ওরা সদাই সচেষ্ট।

এখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। রেডিও আজ ধানক্ষেতেও স্থান করে নিয়েছে। চাষী ধান কাটেন রেডিওকে পাশে রেখে। অনেকের বাড়িতে টি. ভি. পৌঁছে গেছে। কখন সন্ধ্যা নামে টি. ভির পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকে অনেকেরই তা ভুল হয়ে যায়। গলায় আঁচল দিয়ে তুলসী তলায় প্রদীপ দেখিয়ে গৃহবধূর বিনম্র প্রণাম আজ গ্রামজীবনেও বিরল ঘটনা হয়ে উঠছে। সন্ধ্যার শাঁখও আজ অনেক বাড়িতে প্রায় শব্দহীন। বিদ্যুৎ আলোকিত গ্রামের সন্ধ্যা আজ প্রায় নীরব। কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি স্তিমিত হয়ে আসছে। সেই নীরবতা ভেঙে গ্রামপ্রান্তে দরিদ্র মানুষদের কোন না কোন ঘরের মাটির মেঝেতে পাতা হয়েছে হরির লুটের আসর। খোল-করতাল সহযোগে চলছে হরিনাম। অন্ধকার ভেদ করে, নীরবতা ভেঙে ভেসে আসছে হরির লুটের গান :

হরি মাতা হরি পিতা, হরি জীবের মুক্তিদাতা
(ভাইরে) হরি বিনে অন্য কথা না বলিও ভাই।

গ্রামজীবন থেকে এই দৃশ্য আজও মিলিয়ে যায়নি একেবারে।

# রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাতীর্থ

## দ্বিতীয় পর্ব

### স্বামী প্রভানন্দ

[ গত ফাল্গুন, ১৩৯৩ সংখ্যার পর ]

অন্যান্য তীর্থস্থানের মতো রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাতীর্থের উৎপত্তি-কাহিনীও বিচিত্র, তবে বিশেষ এই যে এই কাহিনী সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। এই তীর্থস্থলী অধিকতর মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে তীর্থসেবী স্বামী অখণ্ডানন্দের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অতন্দ্র সাধনার দ্বারা। তাঁর প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিল "দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।" তিনি এই পরমধর্মের সাধন করেছিলেন এই তীর্থস্থলীতে এবং সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনালব্ধ অমৃত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অঙ্গগণের চিরকালের প্রেরণাসুধা তাঁর এই দীর্ঘ সাধনকালের উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ প্রথম পাঁচ বছরের ইতিবৃত্ত আলোচনা করে সেবা-তীর্থের স্বাতন্ত্র্য, মহিমা ও তাৎপর্য অবধারণের চেষ্টা করব।

অখণ্ডানন্দজীর এই সাধনক্ষেত্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাযজ্ঞের প্রথম প্রদর্শন-ক্ষেত্র। এখানে অনুষ্ঠিত সেবাযজ্ঞ সঙ্ঘের সেবাকাজের গতি-নিয়ামক। বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মন্তব্য: "রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-বিভাগের বীজ মহুলায় স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্তৃক উপ্ত হইয়াছিল।" এ-ধরনের সেবাকাজই জন-সাধারণকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সেবাকাজের মধ্য দিয়েই বুদ্ধিজীবিগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণীর ব্যবহারিক দিকটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। যদিও এখানে ত্রাণ-কাজ নিবিড়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিন মাসাধিক কাল, রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন, "অনধিক এক বর্ষকাল দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে অন্ন-বস্ত্র-ঔষধাদি দানে" নিযুক্ত ছিল মহুলা ত্রাণকেন্দ্র। মুর্শিদাবাদের এক অজ পাড়াগাঁয়ে সেবাকাজ যে-আবর্ত সৃষ্টি করেছিল তার তরঙ্গ প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরিধির মধ্যে এবং সাড়া জাগিয়েছিল জনসমাজের বিভিন্ন স্তরে।

সঙ্ঘজীবনে এই আলোড়নের বাহ্যরূপের স্ফূর্তি ঘটেছিল ত্রাণকাজের বিস্তারে। তিন মাসের মধ্যে বিহারের দেওঘরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করতে গেছেন স্বামী বিরজানন্দ। স্বামী প্রকাশানন্দ দক্ষিণেশ্বর গ্রামে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করেছেন ১২ অক্টোবর থেকে পরবর্তী ৮ জানুআরি। দিনাজপুরে বিরোলগ্রামে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সংগঠন করেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ভাগলপুর জেলার ঘোগাতে বন্যাপীড়িতদের সেবা করেন স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী সদানন্দ। কলকাতায় ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগাক্রান্তদের সেবাকাজে নেতৃত্ব দেন ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী সদানন্দ। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানার কিষেণগড়ে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকাজ ব্যাপকভাবে করেন স্বামী কল্যাণানন্দ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য-প্রদেশের খাণ্ডোয়াতে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ পরিচালনা করেন স্বামী সুরেশ্বরানন্দ। সংক্ষেপে, মহুলায় অনুষ্ঠিত ত্রাণকাজের তিন বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ন্যাসিগণ পরিচালিত ত্রাণকাজ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর সঙ্ঘজীবনে এই আলোড়নের আন্তররূপটির

পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানতঃ সন্ন্যাসী সেবকদের মনোভাবের বিবর্তনের মধ্যে। প্রথমদিকে সন্ন্যাসজীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে সংগঠিত সমাজসেবার সামঞ্জস্য সাধন দুঃসাধ্য মনে হয়েছিল কারো কারো ক্ষেত্রে। ঈশ্বরনির্ভরতার সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিলেন না স্বামী অখণ্ডানন্দ। স্বামী যোগানন্দের মনে হয়েছিল এধরনের সেবাকাজ রামকৃষ্ণভাববিরোধী এবং বিদেশীভাবের। অবশ্য, কিছুকালের মধ্যে এসকল মানসিক দ্বন্দ্ব দূর হয়েছিল এবং সঙ্ঘের অঙ্গগণের সমবেত চর্যায় সেবাযোগ নতুন যুগের সূচনা করেছিল। উপরন্তু, সঙ্ঘের ইতিহাসলেখকের দাবী ব্রাহ্মণবংশের সেবক দ্বারা অন্ত্যজ কলেরা রোগীর সেবাকাজের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ শুনতে পেয়েছিলেন অবশ্যম্ভাবী সমাজবিপ্লবের প্রথম পদধ্বনি।[১]

এই সেবাকাজ সঙ্ঘের বাইরে জনসমাজে যে সাড়া জাগিয়েছিল তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় সমকালীন পত্র-পত্রিকার[২] মাধ্যমে। নতুন ভাবধারার রূপ ও তাৎপর্যজ্ঞাপক সামান্য কিছু উপাদান দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। 'Indian Social Reformer' ৯ অক্টোবর ১৮৯৮ তারিখে মন্তব্য করে: "We consider it a matter for congratulation that a Hindu Sannyasin, should invest old ideas with a new significance such as will commend itself to the spirit of the times।" এই ভাবধারা বাস্তবায়িত হয়ে যে রূপ ধারণ করেছিল তার সম্বন্ধে 'The Mahratta' পত্রিকা ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখে: "The creed of self-denying and self-sacrificing Swami was upto now to lead a holy life of abstenance and seclusion and resignation far off from the busy lives of humanity. But it is really more laudable, more meritorious to devote a life of entire resignation and self-denial to relieve distress and help destitution of our fellow creatures. The Ramakrishna Mission have followed this principle in practice; and their work both in plague and famine cannot but inspire great respect. The Mission had opened orphanages at Kishengur, Khandawa and Bellur Matha. They collected by appeals for help nearly 7000 rupees and spent them on the maintenance of nearly 444 orphans and the distribution of money, cloths, blankets and doles of grain to nearly 15000 men". এই নতুন ভাবধারা সম্বন্ধে গীতা সোসাইটির সভাপতি নরেন্দ্রনাথ সেনের অভিমত প্রকাশ করে 'ব্রহ্মবাদিন': "This silent but practical altruism has left a permanent record in the annals of the country and impressed the popular mind with a profound sense of moral duty, with which asceticism can be associated" ( Vivekananda in Indian Newspapers, p. 576 ). বিখ্যাত বিবেকানন্দ গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুরও সিদ্ধান্ত: "সমকালীন ভারতীয় সমাজে

১ Swami Gambhirananda, History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, 2nd Edn., p. 98

২ শংকরীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত Vivekananda in Indian Newspapers দ্রষ্টব্য।

এই ধরনের সেবা সত্যই অভিনব ব্যাপার ছিল। আমরা বুঝতে পারি, ভারতীয় সমাজে এর পূর্বে যেসব সেবাপ্রয়াস দেখা গিয়েছিল, তার গভীর প্রভাব জনজীবনে পড়েনি।"[৩] কিন্তু এ-ভাবধারার সংঘাত সমকালীন সমাজেই সীমিত ছিল না। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব, বিশেষতঃ ভারতীয় সাধুসমাজে এর গভীর প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক জি. এস. ঘুরে তাঁর 'Indian Sadhus' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Social service of varied kinds has now come to be recognized as a legitimate and important objective of ascetic and monastic life."[৪]

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাগুক্ত ত্রাণকাজের বিস্তৃতির অন্তরালে সেবাতীর্থে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল অখণ্ডানন্দজী ওরফে 'দণ্ডীঠাকুরের' দ্বিতীয় পর্বায়ের সাধনা। তাঁর দ্বিতীয় পর্বায়ের সাধনা উন্মোচিত করেছিল এক নতুন দিগন্ত। তিনি ক্রমেই ঝুঁকে পড়েছিলেন স্থায়ী ফলপ্রসূ সেবাকাজের দিকে। একটি চিঠিতে তিনি আলমবাজার মঠে লিখে পাঠিয়েছিলেন: "এখানে একটি স্থায়ী মঠ খুলিবার চেষ্টায় আছি। স্বামীজীকে plan-আদি লিখিয়াছিলাম। তিনি encourage করিয়াছিলেন।" নব্বই বছরের ব্যবধানে অখণ্ডানন্দজীর এরূপ সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য নিম্নলিখিত কারণগুলি অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। সে কারণগুলি হচ্ছে:

(ক) দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দুটি অনাথ বালকের পুনর্বাসনের সমস্যা। তিনি তাদের জন্য অনাথাশ্রম সংগঠনের কথা ভেবেছিলেন। তদানীন্তনকালে অনাথ বালকদের সমস্যার রূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছিল 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের সপ্তদশ সংখ্যায়: "হিন্দু-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত অনাথাশ্রম বাঙ্গালাদেশে ত কুত্রাপি নাই, সমগ্র ভারতবর্ষেও আছে কিনা সন্দেহ। যদি দুই একটি মাত্র থাকে, তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং স্থানীয় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত; তাহাতে ভারতের যাবতীয় প্রদেশের অনাথ বালক-বালিকাগণ (হিন্দু হইলেও) স্থান পায় না। সুতরাং খ্রীষ্টানগণ আমাদের দেশের অনাথ বালক-বালিকাগণকে কিছুদিন লালনপালন করিয়া অনায়াসে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লয়েন।···আমাদিগকে নিজদেশের অনাথগণের প্রাণরক্ষা, কেন বিদেশ হইতে বিধর্মিগণকে আসিয়া করিতে হয়?—ইহা কি লজ্জার কথা নয়?" অস্বাক্ষরিত এই প্রবন্ধ মনে হয় স্বামী অখণ্ডানন্দের নিজের বা তাঁর ভাবনাচিন্তা অবলম্বন করে অপর কারুর লেখা।

(খ) সঙ্ঘাধিনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ গত কয়েকবছর ধরেই চাইছিলেন স্থায়ী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। তিনি কয়েকবছর পূর্বে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন: "জায়গায় জায়গায় এক একটা সেণ্টার করিতে হইবে—এতো বড় সহজ! যেমন তোমরা জায়গায় জায়গায় ফেরো, অমনি একটা সেণ্টার করবে সেখানে। এই রকম করে কার্য হবে। যেখানে পাঁচজন লোক তাঁকে মানে, সেইখানেই এক ডেরা—অমনি করে চল।"[৫] মুর্শিদাবাদে ত্রাণকাজ চলার সময়েও স্বামীজী 'স্থায়ী সৎকার্যের প্রতিষ্ঠার' জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন: "গঙ্গাধর ও সারদা যেখানে-যেখানে গেছে, সেই-সেই জেলায় এক-একটা সেণ্টার না করে আর যেন বিরত না হয়।" স্বামীজীর নির্দেশ ছাড়াও স্থানীয় অবস্থা

৩ শংকরীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৫
৪ G. S. Ghurye, Indian Sadhus, 2nd Edn., 1964, p. 235
৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭।৫০-৫৪

বিবেচনা করে অখণ্ডানন্দজী একটি স্থায়ী সেবাকেন্দ্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন।

(গ) স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা ছিল দেশের মূর্খ দরিদ্র জনসাধারণকে শিক্ষাদান করা। তাঁর মতে, শিক্ষাই সকল সমস্যা সমাধানের যাদু-দণ্ড। শিক্ষা শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তাকে স্বয়ম্ভর করে তুলতে সাহায্য করে। রাজপুতানায় জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার সময় অখণ্ডানন্দজী 'আদর্শ বিদ্যালয়' স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন, এবার তিনি সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার সঙ্কল্প করলেন।

(ঘ) উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও ইংরেজ রেশমশিল্পীগণের সমর্থন ও উৎসাহদান তাঁকে অনাথাশ্রম স্থাপনে উৎসাহিত করেছিল। অখণ্ডানন্দজী বলতেন: "সাহেবরাই তো এই আশ্রমের খুঁটি। আমার উপর দিয়ে যখন ভয়ানক ঝড় বইছিল, যখন গ্রামের এক শ্রেণীর লোক আমাকে উচ্ছেদ করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, তখন কেয়ো ( Keogh ) সাহেব বহরমপুর গ্রাণ্ট হলে আমার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।"৬

(ঙ) অখণ্ডানন্দজীর বিভিন্ন চিঠিপত্র ও আচরণ-বিচরণ থেকে জানা যায় তিনি যেমন ত্রাণকাজ তেমনি অনাথাশ্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে তিনি এই অনাথাশ্রম স্থাপনের ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন কিনা। তাঁর বিভিন্ন আচরণ দেখে মনে হয় তিনি পূর্বেকার ন্যায় এ-ব্যাপারেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য অখণ্ডানন্দজীর প্রয়াসের অবিলম্ব পটভূমিকা হিসাবে স্মরণ করা যেতে পারে দুটি মর্মস্পর্শী প্রথম ঘটনার কাল জুলাই ১৮৯৭, যখন মহুলায় ত্রাণকাজ পুরোদমে চলেছে। একদিন দুপুরে অখণ্ডানন্দজী এক কলেরারোগীকে দেখে ফিরছেন, দেখেন বাড়ির দরজায় একটি পাঁচ-ছয় বছরের মেয়ে কাঁচা চাল চিবাচ্ছে। সে জাতিতে 'বুনো', অনাথা, সঙ্গীরা তাকে ফেলে চলে গেছে। অখণ্ডানন্দজী মেয়েটিকে সেবাকেন্দ্রে নিয়ে আসেন, তার স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দেন। পরদিন সে সঙ্গীদের দেখে চলে যায়। স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনীকার মন্তব্য করেছেন: "অখণ্ডানন্দ ব্যথিত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া নিরাশ্রয় অনাথদিগকে আশ্রয় দিয়া শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তোলা যায়।" দ্বিতীয় ঘটনার কাল কয়েকমাস পর। অখণ্ডানন্দজী একদিন মোশহার জাতের একটি ছোট ছেলেকে খাগড়ার রাস্তায় দেখতে পান। সে সবে বসন্ত থেকে উঠেছে, কিন্তু গায়ের ঘা শুকোয়নি। আত্মীয়স্বজন আশ্রয় না দেওয়ায় মারাত্মক বসন্তরোগ নিয়েও সে পথে পথে ঘুরছে। দরদী সন্ন্যাসী তাকে মহুলায় নিয়ে আসেন। চণ্ডীমণ্ডপ প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে সেবাকেন্দ্র, অপর প্রান্তে একটি চালাঘরে অনাথবালকটি স্থান পায়। বলা যেতে পারে এই বালকটিকে নিয়েই অনাথাশ্রমের সূচনা। অখণ্ডানন্দজী বালকটিকে স্নান করিয়ে, তার ক্ষতে নিজের হাতে ঔষধ লাগিয়ে দেন—তাকে নারায়ণবুদ্ধিতে সেবাশুশ্রূষা করেন। বালক সুস্থ হয়ে ওঠে। তার মুখে 'বিমল হাসির রেখা' দেখে অখণ্ডানন্দজীর প্রাণে শিহরণ লাগে। কয়েকদিন পর ছেলেটিকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় তার আত্মীয়স্বজন। সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে, অখণ্ডানন্দজীর প্রাণ কেঁদে ওঠে। সেসময়ে 'দণ্ডী-ঠাকুরের' মনের অবস্থা এমন হয়ে উঠেছিল যে পথে-ঘাটে কোন অসহায় দুর্গত বালককে দেখলেই আশ্রমে নিয়ে এসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে, তেল মাখিয়ে, সাবান

৬ স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১১০

দিয়ে গরম জলে স্নান করিয়ে দিতেন, সে-সঙ্গে ভাবগম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করতেন: 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে খবর আসে পাদরীগণ কৃষ্ণনগরে হিন্দু অনাথ বালকদের নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টান করে দিচ্ছে। এর প্রতিকারের জন্যও অখণ্ডানন্দজী অনাথাশ্রম স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

উপরোক্ত প্রথম ঘটনাটির পরেই অখণ্ডানন্দজী পথনির্দেশের জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে লিখে-ছিলেন। ২৪ জুলাইয়ের উত্তরে স্বামীজী লেখেন: "Orphanage সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় অতি উত্তম ও শ্রীমহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ) তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত। একটি Centre যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।...যে-প্রকার আমাদের কলিকাতার মঠ, ঐ নমুনায় প্রত্যেক জেলায় যখন এক একটা মঠ হইবে, তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রচারের কার্যও যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারা-পেক্ষাও বিদ্যাশিক্ষাই প্রধান কার্য; গ্রামের লোকের lecture-আদি দ্বারা ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে—বিশেষ ইতিহাস।" ছয়দিন পরেই তিনি অখণ্ডানন্দজীকে লেখেন: "Orphan যোগাড়ের কি করছ? মঠ হতে চারি-পাঁচজনকে না হয় ডাকিয়া লও, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজিলে দুদিনেই মিলিবার সম্ভাবনা।"

নেতার সম্মতি ও সমর্থন পেয়ে অখণ্ডানন্দজী প্রকৃত অনাথ বালকের সন্ধান করতে থাকেন। শুনতে পান খাগড়ায় এক বৈষ্ণবী দুর্ভিক্ষের সময় থেকে দুটি দুঃস্থ অনাথ ছেলেকে ভিক্ষা করে খাওয়াচ্ছে। 'দণ্ডীঠাকুর' তার কাছে হাজির হন। ছোট ছেলেটি, নাম হুটবিহারী দাস, বয়স নয়-দশ বছর, 'দণ্ডীঠাকুরের' সঙ্গে মহুলায় উপস্থিত হয়। সেদিনটি ৩১ অগস্ট ১৮৯৭। হুটবিহারী অনাথাশ্রমের প্রথম বালক। কয়েকদিন পরে একজন পুলিসের দারোগার চেষ্টায় তার বড় ভাই, বয়স এগারো, তাকেও পাওয়া গেল। জ্বর-প্লীহা-যকৃত রোগে ম্রিয়মাণ দুই ভাই অখণ্ডানন্দজীর সেবাপরিচর্যায় সুস্থ হয়ে ওঠে।

অনাথাশ্রমের খবর শুনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লেভিঞ্জ মন্তব্য করেন, "Laudable scheme' indeed!" তিনি অখণ্ডানন্দজীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।[৭] সাহেব অখণ্ডানন্দজীকে একটি অনাথা মুসলমান বালিকার ভার নিতে অনুরোধ করলে তিনি দুঃখিত অন্তরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বুঝিয়ে বলেন মেয়েদের দেখাশুনার

৭ ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রতিবেদন ভিন্নরূপ। তিনি লিখেছেন: "The forlorn condition of the two orphans also affected the heart of the noble, and high souled Mr. Levinge, and he requested the Swami, to establish an orphanage, the land necessary for the purpose, he being ready to grant him, if he had no objection. The idea appealed also to the heart of the Swami who is ever ready to be of any service to his fellow brethren, and accordingly he consented. Fifty bighas (17 acres) of land were forthwith granted to him from the Government, and a shade also was erected in it as a house of the orphans. This is the history of the orphanage of Mohula (Brahmavadin, Vol. III, No. 19, p. 773). প্রকৃতপক্ষে মিঃ লেভিঞ্জের অনুরোধে অখণ্ডানন্দজী অনাথাশ্রম আরম্ভ করেননি। জমির সাহায্যের ব্যাপারে মিঃ লেভিঞ্জের প্রস্তাবিত সাহায্য তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন: কিন্তু মিঃ লেভিঞ্জ বদলি হয়ে যান এবং জমিদার তাঁর সে-অনুরোধ রক্ষা করেন না।

জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিতা সেবাপরায়ণা নারী, সমাজে সেরূপ নারীর খুবই অভাব। এই ঘটনা তাঁর কোমলপ্রাণে যে আঘাত হেনেছিল তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় পরবর্তিকালে তাঁর লেখা প্রবন্ধের একটি অংশে: "একটি অনাথা বালিকা হইতে আশ্রমের সূত্রপাত, পরে আমরাই অনাথ আশ্রমের প্রসূতি-স্বরূপা বালিকাকে প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। মা, আমরা তোমার দুর্বল অপটু সন্তান। আমাদের সাধ্য নাই যে তোমার সেবা করি। কেবল সানুনয়ে আমরা তোমারই নিকটে প্রার্থনা করি—মা, তোমার কার্য তুমি কর।"

প্রারম্ভিক পর্যায়ে অনাথাশ্রমের পরিকল্পনার একটি রূপরেখা ফুটে উঠেছে সংগঠক অখণ্ডানন্দজীর সে-সময়কার একটি চিঠিতে। ১২ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখের চিঠি। তিনি কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছেন: "আমি যেরূপ অনাথাশ্রম করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা যদি সফল হয় তো তাহা ভারতের একটি আদর্শস্থানীয় মহৎ কার্য হইবে। সকলই ভগবানের ইচ্ছাধীন। কি হইবে বলিতে পারি না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও এ-জেলায় কতকগুলি অনাথ বালক জোটাইতে পারিলাম না। কয়েকটি ব্রাহ্মণ অনাথ বালক না পাইলে আর বেদ বিদ্যালয় হইতে পারে না। আপনার সন্ধানে যদি এমন অসহায় অনাথ বালক থাকে তো আমাকে লিখিয়া বাধিত করিবেন। এই জেলার Collector সাহেব আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন এবং তিনি এই আশ্রমের patron হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।...যাহা হউক, আপনিও যাহাতে আমার এই মানস ব্যাপারটি কার্যে পরিণত করিতে পারি তজ্জন্য বিশেষ মনোযোগী হইবেন। আপনি একটি বৈয়াকরণ বৈদিক ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে থাকিবেন। আমি ভাবিতেছি যে, যদি ২।১টি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আমরা জমি-জরাৎ দেওয়াইয়া কোনও রকমে এখানে স্থায়ী করিতে পারি তো এ-অঞ্চলে বৈদিক বিদ্যাপ্রচারের বড়ই সুবিধা হয়। যাহা হউক আপাততঃ আপনি এমন একটি পণ্ডিতের অনুসন্ধানে থাকুন যিনি এখানে আসিয়া প্রথমতঃ নিঃস্বার্থভাবে কার্যারম্ভ করিতে পারেন।" প্রমদাদাস মিত্র এ-চিঠির উত্তরে কি লিখেছিলেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু দেখা যায় অখণ্ডানন্দজী পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি বিবেচনা করে বৈদিক বিদ্যাপ্রচারের কর্মসূচী বর্জন করেছিলেন। আজকের দিনে দুর্বোধ্য মনে হলেও তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় দুঃস্থ অনাথ বালক সংগ্রহ করা ছিল দুঃসাধ্য। এবং অনাথ বালক সংগ্রহ করতে অখণ্ডানন্দজীকে অনেক মেহনত করতে হয়েছিল।

এসময়ে অখণ্ডানন্দজী পেলেন মরী থেকে ১০ অক্টোবর তারিখে লেখা স্বামীজীর চিঠি। এই চিঠিতে স্বামীজী প্রাঞ্জলভাষায় সেবাযোগের দার্শনিক ভিত্তি তুলে ধরেছেন, আবার ধর্ম সম্বন্ধে অনাথাশ্রমের দৃষ্টিভঙ্গির পথনির্দেশ দিয়ে লিখেছেন: "মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ।...হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে অর্থাৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ হয়; আর ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণ ভাব তাই শিখাইবে।"

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুআরিতে অনাথ বালকের সংখ্যা ছিল ৩৫। ২৬ ফেব্রুআরি বেলুড় থেকে অখণ্ডানন্দজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন:

"প্রথমতঃ মহুলাতে একখানা চালা করিয়া আমার অনাথ বালকটিকে ঠিক-ঠাক করে রেখে আসতে বড় ব্যস্ত ছিলুম।"

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ গ্রেহাম এক পরোয়ানা জারি করেছিলেন যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অনাথ বালক পেলেই মহুলা অনাথাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হবে। এতে কোন সাড়া পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। তখন অখণ্ডানন্দজী পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের লিখে এবং নিজেও অনাথ বালক সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকেন। সময় সময় বিপদও উপস্থিত হয়। একবার এক গ্রামে 'মরীচবনের ছেলেধরা'[৮] সন্দেহ করে গ্রামবাসীরা তাঁকে হত্যা করতে যায়। অবশ্য পরিচিত এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহায়তায় তিনি সে-যাত্রায় রেহাই পান।

অনাথাশ্রমের পৃষ্ঠপোষক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লেভিঞ্জ বদলি হয়ে যাবার পূর্বে আশ্রমের জন্য জমি সংগ্রহের চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। তাছাড়া তিনি দশজন অনাথ বালকের ভরণ-পোষণের জন্য একটি হিসাব তৈরি করিয়ে একটি অর্থভাণ্ডার খোলার পরামর্শ দেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত সাহেবকে একদিন আশ্রমে এনে অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত অনাথাশ্রম চলেছিল মহুলাতে মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের চালাঘরে। কর্মীর মধ্যে ছিলেন অখণ্ডানন্দজী, ব্রহ্মচারী সুরেন[৯] ও দীননাথ চোবে। দীননাথ কনৌজী ব্রাহ্মণ, নিরক্ষর, বাড়ি গাজীপুর জেলায়। কিন্তু দীননাথ উদারচরিত নিবেদিত-প্রাণ। সে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়েছিল। কিছুদিন পরে অখণ্ডানন্দজী তাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। এর সম্বন্ধে স্বামীজী একদিন অখণ্ডানন্দজীকে বলেছিলেন: "ধন্য ভাই তোমার চোবেজী! তুমি এমন এক worker তৈরি করেছ, যে নিজের বাড়া ভাত অভুক্তকে দিয়ে অম্লান বদনে ফেন খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতে পারে—এ কত বড় প্রাণের কথা! ওর মতো worker কজন আছে? তোমার কাছে থেকে ও অত বড় হয়ে গেল।"

২২ ফেব্রুআরি ১৮৯৮ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব। স্বামীজীর আহ্বানে অখণ্ডানন্দজী বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে অবস্থিত মঠে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য এনেছেন জমিদার বনবিহারী সেনের দেওয়া দুটি বৃহৎ ছানাবড়া। সেবাব্রতী গুরুভাইকে স্বামীজী প্রেমালিঙ্গন দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি ঠাকুরঘরে চলে গেলে স্বামীজী তাঁর পাশে দাঁড়ানো শরৎ চক্রবর্তীকে বললেন: "দেখছিস কেমন কর্মবীর! ভয়, মৃত্যু—এসবের জ্ঞান নাই। একরোকে কর্ম করে যাচ্ছে—বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।" অখণ্ডানন্দজী কয়েকদিন মঠে বাস করে স্বামীজীর সঙ্গে দার্জিলিং যান। স্বামীজীর সাহচর্যে তিনি ভাবৈশ্বর্যে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে খবর আসে কলকাতায় সংক্রামকভাবে প্লেগ দেখা দিয়েছে। কলকাতার মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দলে দলে শহর থেকে পালাচ্ছে। প্লেগরোগীদের সেবাকাজ সংগঠনের জন্য স্বামীজী কলকাতায় ফিরে আসেন ৩ মে।

দার্জিলিং-এ স্বামীজী মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অতিথি হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী

৮ সেসময়ে মরিশাস দ্বীপে শ্রমিকের কাজের জন্য আড়কাঠিরা ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

৯ পরবর্তিকালে অখণ্ডানন্দজী বলেছিলেন: "নিত্যানন্দ আমার নিকট প্রায় একমাস থাকিয়া চলিয়া যায়। সুরেনই (স্বামী সুরেশ্বরানন্দ) বরাবর আমার সহকারীরূপে কাজ করিয়াছিল।". (স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৪৪)

কাশীশ্বরী দেবী দুটি নেপালী অনাথ বালক জোগাড় করে দেন, পরে আরও দুটি পাহাড়ী ছেলে জুটে যায়। এই চারটি বালককে সঙ্গে নিয়ে অখণ্ডানন্দজী যাত্রা করেন। দার্জিলিং-এ ট্রেন ছাড়বার মুখে আরও দুটি[১০] বালক উঠে বসে। তারা নিজেদের অনাথ বলে পরিচয় দিয়ে অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গী হয়। কিন্তু শিলিগুড়িতে পুলিস এসে শেষোক্ত বালক দুটিকে ধরে নিয়ে যায়। এ-ঘটনার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ শোনা গেছিল অখণ্ডানন্দজীর মুখে: "দার্জিলিং থেকে ফিরছি—স্টেশন থেকে একটি ছেলে গাড়ি ছাড়বার একটু আগে আমার গাড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়ল। ভাবলাম অনাথ, নিয়ে আসছিলাম। শিলিগুড়িতে জানলাম তার বাপ আছে, তখ্‌খুনি পুলিসের কাছে সব কথা জানিয়ে তাকে রেখে এলাম।···কলকাতায় এসে শুনলাম স্বামীজীর কাছে ছেলের বাপের টেলিগ্রাম, "তোমার লোকেরা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে।" আমি তো স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেছি মায়ের বাড়ীতে। সেদিন তাঁর সেখানে আসবার কথা। দেখা হতেই স্বামীজীর মৃদুহাসি ও তিরস্কার—"অনাথ ছেলের জন্য নাল গড়িয়ে পড়ছে?" "আমি সব কথা খুলে বললাম। তখন তিনি খুব খুশি।"[১১] ছেলে কয়টিকে সাময়িকভাবে বলরাম ভবনে রাখা হয়।

কলকাতায় এসে অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর নির্দেশে প্লেগ-রিলিফের সংগঠনের কাজে সহায়তা করেন। প্লেগের প্রকোপ কিছুটা নিয়ন্ত্রনাধীন এবং সেবাকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে দেখে স্বামীজী আলমোড়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন ১০ মে। তারপরই অখণ্ডানন্দজী চারটি বালককে নিয়ে মহুলা রওনা হলেন।

প্রায় তিন মাস অনুপস্থিতির পর অনাথাশ্রমে এসে তিনি দেখতে পেলেন যে প্রাগুক্ত অনাথ বালকটি চলে গেছে। চোবেজী নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। এই কারণে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক তাঁর বিবরণীতে মন্তব্য করেছেন: "সুতরাং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে দার্জিলিঙের ভূতপূর্ব গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ৺মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী প্রদত্ত চারিটি পাহাড়ী অনাথ বালক লইয়াই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় বলা যাইতে পারে।" যশবীর, ছবিলাল, রণবীর ও বাহাদুর এই চারটি বালকের উপস্থিতিতে আশ্রম প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে কনিষ্ঠ বাহাদুর ছিল বিশেষ প্রতিভাবান, কিন্তু স্বল্পায়ু। অল্পসময়ের মধ্যে আরও কয়েকটি অনাথ বালক এসে জোটে। ২৭ জুন ১৮৯৮ তারিখে অখণ্ডানন্দজীর প্রমদাদাস মিত্রকে একটি চিঠিতে লেখেন: "এক্ষণে আমার এই আশ্রমে ৮টি অনাথ বালক আছে। তাহাদিগকে রীতিপূর্বক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। দিন গেলে ৬ সের চালের খরচ এবং আনুষঙ্গিক অনেক খরচ আছে। আমি এসকল খরচই voluntary contribution-এর দ্বারা নির্বাহ করিয়া থাকি। সম্প্রতি অনাথদিগের জন্য একখানি ঘর করাইতে হ ;তেছে। তাহার জন্য প্রায় ৪০৲ টাকা আবশ্যক আমি এখানেও কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিতেছি। আপনিও যদি এসময়ে কিছু সাহায্য করেন তো বড়ই উপকার হয়।" এই চিঠির শেষাংশে রয়েছে: "আমি আমার বালকগণ সহ এখানে খানিকটা জায়গা লইয়া সে-স্থানটিকে কৃষিকার্যের উপযোগী করিবার জন্য সাধ্যমত খাটিতেছি। যাহাতে আশ্রমের আয়েই আশ্রমের ব্যয় সঙ্কুলান হয় তজ্জন্য আমি বিশেষ সচেষ্ট আছি।"

১০ 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' গ্রন্থে দুটি বালকের উল্লেখ রয়েছে। আমাদের মনে হয় বালকের সংখ্যা ছিল এক।

১১ স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়, পৃঃ ৯৯,

এসময়কার অনাথাশ্রমের দৈনন্দিন জীবনের বিবরণ এবং পরিচালক অখণ্ডানন্দজীর কল্পনায় বিধৃত আশ্রমের লক্ষ্য পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর অপর একটি চিঠিতে। এই চিঠির ইংরেজী অনুবাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ১৬ জুন ১৮৯৮ তারিখের 'ব্রহ্মবাদিনে' প্রকাশ করেন: "Now-a-days I have got eight orphans with me and I mean to start a model institution with them. This is the daily report of my works here. Early in the morning, at 5, the bell rings, and all my orphans rise from their beds, wash their hands and face, and take a little breakfast, in the shape of boiled chana. Then they are made to go through a little exercise with the dumbels, from seven to ten they are employed in the field to look after the herbs and vegetables that have already been planted, or to plant some new ones and sow some fresh seeds. I have planted Indian corns, cucumbers, melons, gourds, spinach, and other pot herbs. I mean to plant other vegetables too. After they have taken their dinner [?] at eleven, they take rest for a while, and then study until the afternoon when they again go to the field with me for gardening. After the nightfall they again pursue their studies, and after taking supper they go to bed. I mean to educate my orphans in such a way as will enable them to know all works from ploughing and felling the trees to the mysteries of the Vedanta. I mean to make them as much self-helping as possible. Our country wants self-relying and God-fearing men and not men of the stamp of modern graduates, weak and dependent upon others. I depend upon the grace of Sri Ramakrishna for my success."[১২]

পূর্বোক্ত আবেদন প্রমদাদাস মিত্রের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু তিনি অনাথাশ্রমের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কটাক্ষ করেন। উত্তরে অখণ্ডানন্দজী বিনীতভাবে নিবেদন করেন আশ্রমের আর্থিক অবস্থা। তিনি লেখেন: "অনাথ বালকগুলির আহারাদির জন্য যাহা কিছু ডাল, চাল, গম, নুন ইত্যাদি প্রত্যহ আবশ্যক সে-সকলই ধার করিয়া চলিতেছে। এখানকার দোকানীর নিকট ২০ টাকা ধার হইয়াছে। তাহার পর একখানি ঘর করাইতে হইতেছে তজ্জন্যও কতগুলি টাকা আবশ্যক। এসকল ব্যয়ই আমি ভাবিতেছি যে আপাততঃ আমাদের বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে চালাইব। পরে স্থানীয় সাহায্যের কথা লিখিয়াছেন তাহা তো হইবে। তবে স্থানীয় সাহায্যের জন্য প্রথমতঃ একটি কমিটি করিয়া prospectus[১৩] ছাপাইয়া দেশময় চাঁদার খাতা লইয়া বাহির হইতে হইবে। তাহা হইলে অবশ্যই কিছু অর্থসংগৃহীত

১২ The Brahmavadin, Vol, III, No. 19, p. 773

১৩ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ট মাসে অখণ্ডানন্দজী আবেদনপত্রের একটি খসড়া তৈরি করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেটি দেখে নামঞ্জুর করেন। সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করে স্বামী সারদানন্দ এই বছরের অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ একটি সুন্দর আবেদনপত্র তৈরি করে দেন। কিন্তু অনাথাশ্রমের অর্থসংগ্রহের জন্য চাঁদার খাতা দিয়ে দেশময় অখণ্ডানন্দজী কখনও ঘুরে বেড়াননি।

হইবে সন্দেহ নাই। তবে সেটার কিছু বিলম্ব আছে। আমি এখনও কেবল ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করিয়া কার্য করিতেছি। কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণ ও বিশেষতঃ স্নেহী (?) জনের নিকট সময় সময় এমন একটা লোকহিতকর কার্যের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেও কুণ্ঠিত হই না। সেইজন্যই বোধ করি আমার পূর্ব পত্রে আপনাকে কিছু সাহায্যের জন্য লিখিয়াছিলাম।···আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে যাহাতে এই অনাথাশ্রমটি self-supporting হয়। অনাথ বালকদিগের দ্বারা উত্তমরূপে আবাদ করাইতে পারিলেই আশ্রমস্থ বালকগণের শ্রমলব্ধ ধনেই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে। যতদিন না সেরূপ হয় ততদিন আমি কেবল ভগবানের ,উপর এবং তাঁহার কতিপয় ভক্তবৃন্দের উপর নির্ভর করিয়াই কার্য করিতে ইচ্ছা করি।"

তিন মাস পরে ৩ অক্টোবর তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে অনাথাশ্রমের আরও কিছু খবর পাওয়া যায়। তিনি লেখেন: "এই আশ্রমে এক্ষণে সর্বশুদ্ধ ১২টি বালক। ৫।৭ বিঘা পরিমিত একখণ্ড ভূমি এই গ্রামেরই জমিদার আশ্রমের জন্য দিতে প্রস্তুত আছেন।. আমরা সেইটি এখন যত শীঘ্র পারি মৌরসা করিয়া লইব মনে করিয়াছি। তৎপরে তাহাতে আশ্রমের উপযোগী গৃহবাটিকা নির্মাণ করাইতে হইবে। তখন কিছু অর্থ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। অর্থ ও নিঃস্বার্থপর উদারচেতা পুরুষ ভিন্ন এসকল কার্যের কিছুই হইতে পারে না। এই ১৫।১৬ মাস হইল আমরা এই জেলায় শ্রীপ্রভুর যৎকিঞ্চিৎ কার্য করিতেছি। কিন্তু এ জেলার লোক এমনি অদ্ভুত যে আজ পর্যন্ত কেহই বড় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু সাহায্য করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন নাই। তবে আর বৎসর (১৮৯৭) বস্ত্র বিতরণের সময় অবশ্য বহরমপুর হইতে অনেকগুলি বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল। আমাদের আশ্রম আকাশবৃত্তিতেই চলিতেছে।"

মিত্রমহাশয়কে লেখা ১১ অক্টোবরের চিঠিতে পাওয়া যায় আশ্রমজীবনের আরও একখণ্ড চিত্র। তিনি লিখেছেন: "অনাথদিগকে লইয়া সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ প্রায় আধ ঘণ্টার উপর ভগবৎ গুণানুকীর্তন করিয়া থাকি এবং বৈদিক রীত্যনুসারে ভগবানের নিকট তাঁহার তেজ ও বল প্রভৃতি যাহাতে আমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি। তারপর সদা-সর্বদাই বালকদিগের নৈতিক ও ধর্মজীবন উন্নতির জন্য তাহাদিগকে সৎকার্যোপযোগী করিতে চেষ্টা করিতেছি।" [ ক্রমশঃ ]

**যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে—জগতের জীবগণের সেবা আগে করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দাস।**

**—স্বামী বিবেকানন্দ**

# সমর্পিতা ক্রিস্টিন

## শ্রীমতী চিত্রা বসু

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

নিবেদিতা বলেছিলেন, ক্রিস্টিনের একাগ্রতা, দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের ফলেই বিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি সম্ভব হয়েছে। নিবেদিতা গুরুর মাতৃভূমির সেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চললেন, এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট মেটাতে একটির পর একটি গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত রইলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহাবসান হল। মিসেস্ বুল বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করতেন, তিনিও নিবেদিতার মৃত্যুর আগে চিরবিদায় নিলেন। ইতিমধ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টিনকে একবার আমেরিকা যেতে হয়েছিল বিশেষ কারণে। কয়েকমাস পরে ভারতে ফিরে তিনি মায়াবতী চলে যান। এখানেই তিনি দার্জিলিং-এ নিবেদিতার আকস্মিক প্রয়াণের খবর পান। ক্রিস্টিন কলকাতায় চলে এলেন এবং ভগিনী সুধীরার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরিচালনায় অংশ নিলেন। তিনটি বছর তিনি বিদ্যালয়টিকে বাঁচাবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছেন; এমন কি স্কুলের অর্থসঙ্কট মেটাতে তাঁকে কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিতে হয়েছিল। এইসময় ক্রিস্টিন সন্ধ্যা-বেলায় শ্রীশ্রীসারদামায়ের চরণ-সমীপে উপস্থিত হতেন তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য। মায়ের পূত সান্নিধ্যে অপরূপ নিস্তব্ধতা ও শান্তি তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিত। কিন্তু একটানা পরিশ্রমে শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িক বিশ্রাম ও আত্মীয় বন্ধুদের সাথে দেখাশোনার ইচ্ছায় ক্রিস্টিন আমেরিকা রওনা হলেন। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। ক্রিস্টিন জাতিতে জার্মান হওয়ায় তাঁর পক্ষে তখনই ভারতে ফেরা সম্ভব হল না।

দীর্ঘ দশ বছর তাঁকে আমেরিকায় থাকতে হয়েছিল, যদিও ভারতগতপ্রাণা এই নারী ভারতে ফেরার জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব হয়েছিলেন। আমেরিকায় থাকলেও তাঁর মন পড়েছিল ভারতবর্ষে এবং মনে প্রাণে তিনি ছিলেন প্রাচ্য-সন্ন্যাসিনী—পোষাকে, চিন্তায়, আদর্শে ও ধ্যানে। তিনি আমেরিকার ডেট্রয়টে ও অন্যান্য জায়গায় ভারতের বাণী ও বেদান্ত-দর্শন প্রচার করে গুরুর আরেকটি স্বপ্ন সফল করতে প্রয়াসী হলেন। কারণ স্বামীজী বলেছিলেন আমেরিকানরা যেদিন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করবে সেদিনই যথার্থ কাজ হবে। ব্রহ্মবাদিনী সন্ন্যাসিনী বেদান্ত ব্যাখ্যা করার সময় মঞ্চে উঠে স্ব-পরিচয় দিতেন না, আত্মসমাহিত নারী দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেন নিজেকে আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যাত আদি পুরুষরূপে যিনি সর্বত্র বিরাজমান, যিনি পরমানন্দ শিব। শ্রীমতী গ্রাট্রুড এমারসন (শ্রীমতী বশী সেন) লিখেছেন, অনেকদিন পরে আমেরিকায় এক শিল্পীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। সেইসময় তাঁর ক্রিস্টিনের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যা করার সময় তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনের মুখমণ্ডলের চারিপাশে এক নীলাভ জ্যোতি দর্শন করতেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টিন ভারতে ফিরে এলেন। বিদ্যালয়ের তৎকালীন পরিচালকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ফলে তিনি বিদ্যালয় থেকে সরে আসেন। আজীবন তিনি দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনের মধ্য দিয়ে চলেছেন। এসময়েও ক্রিস্টিন অবিচলিত রইলেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, গুরুর আশীর্বাদ তাঁর সঙ্গে আছেই। বহুদিন আগে আমেরিকায় গুরুর সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণের সময়

নীরবে প্রার্থনা করেছিলেন, গুরুর সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ থেকে যেন বঞ্চিত না হন তাঁর হতাশার দিনে। নীরবতার মধ্যে তার উত্তর পেয়েছিলেন। ক্রিস্টিনের কথায়, "তাঁর নীরব আশীর্বাদের মধ্যে লুকিয়েছিল বিরাট শক্তি।"[১৪] বলতেন: "যদি আমাকে আবার জন্ম নিতে হয়, হাসিমুখে আমি আরও হাজার-গুণ দুঃখ সইতে রাজি আছি আমার জীবনের এই বিরাট সৌভাগ্যের জন্য

ক্রিস্টিনের এরপর ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বাস করা সম্ভব হয়নি, তিনি দার্জিলিং চলে যান। এসময় তিনি প্রচণ্ড অর্থাভাবের মুখোমুখি হলে, অপ্রত্যাশিতভাবে জনৈকা শ্রীমতী স্টার্লিং ওর তাঁর জন্য অর্থ সাহায্য পাঠাতে থাকেন। মিসেস্ ওরকে লেখা ক্রিস্টিনের চিঠি-গুলিতে দেখতে পাই কি দুঃসহ আর্থিক কষ্ট তিনি ভোগ করেছেন। পরবর্তিকালে তাঁর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হয় এবং উদীয়মান বৈজ্ঞানিক বশী সেন তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, বশী সেন তাঁকে ৮নং বোসপাড়া লেনের নিজের বাড়িতে এনে রাখেন। পরে ক্রিস্টিনকে তিনি আলমোড়ায় নিয়ে আসেন। স্বামীজীর এই বিদেশিনী শিষ্যাকে বশী সেন শেষদিন পর্যন্ত মায়ের শ্রদ্ধাসনে অধিষ্ঠিতা রেখেছিলেন। ভারতে অবস্থানের শেষ দুবছর ক্রিস্টিন আলমোড়ায় ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে বসেই তিনি স্বামীজীর স্মৃতিকথা লেখেন, যা তিনি বশী সেনকে দিয়ে যান। বলেছিলেন, তিনি বিদেহ হলে তাঁর স্মৃতিকথা যেন ছাপা হয়।

ক্রিস্টিনের মৃত্যুর পর বশী সেন তাঁর সম্বন্ধে যে স্মৃতিকথা লিখেছিলেন তার ভিতরে ক্রিস্টিনের অন্তর ও বাহিরের রূপ সুন্দরভাবে ধরা আছে: "তাঁর ঋজু তন্বীদেহে এক স্বর্গীয় আভিজাত্যের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ছিল। তাঁর চিক্কণ সুগঠিত মাথাটি, ঈষৎ বক্র নাসিকা, কম্পমান নাসারন্ধ্র সব কিছুর মধ্যেই আভিজাত্যের পূর্ণপ্রকাশ। মুখের রঙ ও গঠনে মাধুর্য ও বিষাদের এক অপূর্ব মিলন। পরের দুঃখে গভীরভাবে অভিভূত হতেন তিনি। ভারত ও ভারতবাসীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। কারণ ভারত ছিল তাঁর প্রিয় গুরুর দেশমাতৃকা—তাই পুণ্যভূমি। তাঁকে দেখে মনে হত ভারতে থাকতে পারায় ও ভারতের কাজে নিজেকে নিবেদন করতে পারায় তিনি যেন এক পরম সৌভাগ্যের অধিকারী।"[১৬]

ক্রিস্টিনের আলমোড়াবাসের দিনগুলির ছবি আমরা দেখতে পাই শ্রীমতী বশী সেনের প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত 'As I Knew Her' প্রবন্ধে এবং মিসেস্ অ্যাকশা বার্লো ব্রুস্টারের স্মৃতি-সঞ্চয়নে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টিন 'কুন্দন হাউস'-এর বারান্দায় বসে স্বামীজীর 'মেমোয়ার্স' লিখতেন, আবার সন্ধ্যাবেলা সেগুলি পড়ে শোনাতেন। কত গল্পই না করতেন। বলতেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং মা সারদাদেবীর অপার করুণার কথা। শিল্পী-দম্পতি ব্রুস্টাররা প্রাচ্য অনুরাগী। এঁদের সঙ্গে ক্রিস্টিনের প্রথম দেখা হয় ৮নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে। প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনায় শ্রীমতী অ্যাকশা লিখেছেন, ক্রিস্টিন অতি স্নেহের সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করেছিলেন। ক্রিস্টিনের মুখের প্রথম কথাতেই তাঁর চরিত্রের ঐশ্বরিক ভাব, পবিত্রতা ও মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি অঙ্গ সেই ভাবই ব্যক্ত

১৪ উদ্বোধন, ৭৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৮, পৃঃ ১৯৬

১৫ ঐ, পৃঃ ১৯৬

১৬ অমৃত, ১৬ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১৩৮০ ফাল্গুন, পৃঃ ৩৯

করেছিল। মুখের প্রতিটি রেখা, নাসিকা, নাসারন্ধ্র দেখে মনে হয়েছিল যেন রাজপুত ছবিতে সীতার মূর্তি। চোখ দুটি যেন প্রাচ্যের সন্ন্যাসিনীর। সে চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অন্তরের আলো। এই শিল্পী-দম্পতি ক্রিস্টিনের সঙ্গে কলকাতা থেকে আলমোড়া গিয়েছিলেন এবং আলমোড়ায় তাঁর সঙ্গ করেছিলেন। মিসেস্ অ্যাকশার স্মৃতিসঞ্চয়নে বর্ণিত আছে: "আলমোড়ার বারান্দায় বসে যখন তিনি নিজ গুরু বিবেকানন্দের কথা বলতেন, তখন মনে হত অমন কণ্ঠস্বর কখনও শুনিনি। আবেগে স্বরের ওঠানামা, সেই সঙ্গীতময়তা কারো কণ্ঠে কখনও শুনিনি, সবটাই পরিপূর্ণ সঙ্গীত। বিবেকানন্দের নাম ওঁর মুখে উচ্চারণ হওয়ামাত্র যেন ঈশ্বরের উপস্থিতি সকলে অনুভব করত। মনে হত আমরাও যেন তাঁকে দেখেছি এবং চিনেছি।"[১৭] কোন কোন দিন সন্ধ্যায় আলমোড়ার মঠ-মিশনের তরুণ সন্ন্যাসীরা ও গুরুদাস মহারাজ আসতেন। সেই স্বর্গীয় পরিবেশে ক্রিস্টিন মা সারদাদেবীর অনুপম চরিত্র সামান্য কটি কথায় জীবন্ত করে তুলতেন। কখনও বা গোপালের মায়ের অপূর্ব সাধিকা জীবনের বর্ণনা করতেন। স্বীয় গুরুর কথায় বলতেন: "বিবেকানন্দ অবতার ছিলেন; আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরকে আমি দেহধারীরূপে দেখেছি।"[১৮] আলমোড়ায় তাঁর সামনে যখন 'দেববাণী' পড়া হত, ভগিনী বলতেন: "আহা তোমরা যদি তাঁর মুখ থেকে শুনতে, বই সে তুলনায় কিছুই নয়।"[১৯] তাঁকে বলা হয়েছিল যে তাঁর উপলব্ধির কথা ভবিষ্যতের মানুষের জন্য লিখে রাখা প্রয়োজন। উত্তরে তিনি জানান: "আমার ওপর কিভাবে যে স্বামীজীর প্রভাব হত! নিবেদিতা বরং নোটখাতা নিয়ে বসত, আমি উপলব্ধি করতাম, উনি প্রথম পঙ্‌ক্তি বলবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার জগৎ থেকে অন্য জগতে চলে যেতাম, ব্যক্ত করার চেষ্টা থেকে উপলব্ধি করার দিকে মন দিতাম।"[২০] আরও বলতেন: "সকলে কত প্রশ্ন করত, কিছু পাবার চেষ্টা করত; কিন্তু আমার বড় দুঃখ হত তাঁর জন্য।...ঐরকম জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের সামনে সব সন্দেহ, সব প্রশ্নের আপনিই নিরসন ও নিবৃত্তি হয়ে যায়।"[২১] শেষের দিকে আলমোড়ায় তাঁর শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল, রোগযন্ত্রণার মাঝেও কি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অনুভব করতেন যে অসুখ যদি না হত সারাজীবন কাজের তাড়নায় ছুটতে হত, এমন করে চিন্তা করার, উপলব্ধি করার সময় পেতেন না। এখানে উল্লেখ্য যে তাঁর আলমোড়ায় থাকাকালীনই পাশ্চাত্যের মনীষী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনীকার রোমাঁ রোঁলা প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদককে এক পত্র লেখেন ২৬ জুন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে: "আমার ও আমার ভগ্নীর ইচ্ছা আমরা সিষ্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গলাভ করি যাঁর কথা আমরা লোকের মুখে ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে শুনতে পাই। বিবেকানন্দের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তিনি যেমন পেয়েছেন এমন খুব কম লোকেরই সৌভাগ্য হয়েছে। আমরা তাঁর সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদান করতে পেলে সুখী হব, যদি একদিন তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়!"[২২]

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মার্চ বশী সেনের সঙ্গে ভগিনী ক্রিস্টিন ডেট্রয়টের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যাত্রা করেন আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এই সময় কানাডায় মিসেস স্টার্লিং ওবের

১৭ অমৃত, ১৬ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, পৃঃ ৩৯
১৮ ঐ, ১৬ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, পৃঃ ৪২ ১৯ ঐ ২০ ঐ
২১ ঐ, ১৬ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, পৃঃ ৩০
২২ উদ্বোধন, ৩০ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৫, পৃঃ ৩৪৯

গৃহে তিনি কিছুদিন কাটান। সেখানে তিনি স্বামীজীর বাণী ও অদ্বৈতবাদ আলোচনা করতেন। বাড়ির সকলে, এমনকি মিসেস্ ওরের বার বছরের ছেলে কার্টার পর্যন্ত ভারতীয় বেদান্তবাদের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। পরবর্তিকালে মিসেস্ ওর ক্রিস্টিনের মৃত্যুর পর বশী সেনকে লিখেছিলেন যে, ভারতীয় বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার সময় ভগিনীর মুখমণ্ডল থেকে জ্যোতির আলোক বিচ্ছুরিত হত এবং তাঁকে দেখার পর মৃত্যু সম্বন্ধে কোন ভয় বা সংশয় মিসেস্ ওরের মন থেকে বিদূরিত হয়। মিসেস্ ওর ক্রিস্টিনের সংস্পর্শে এসে অনুভব করেন যে এই মহীয়সী নারী তাঁকে বহু উর্ধ্বস্তরের—যেন ক্রিস্টিনের নিজেরই জীবনের মহিমান্বিত শিক্ষা ও উপলব্ধির অমৃতলোকের—অনুভূতি দিয়েছিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তবুও ভারতে ফিরে আসার দিন গুনতেন। তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজও তাঁকে ভারতে এসে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কার্যভার গ্রহণ করার জন্য লিখলেন। কিন্তু আসা আর হয়নি। তিনি ক্রমে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থায় বান্ধবী শ্রীমতী লিয়র তাঁকে নিজের নার্সিং হোমে এনে রাখলেন সেবা, শুশ্রূষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে এবং যতটা সম্ভব চিকিৎসা করার জন্য। স্বামীজী যেন শিষ্যার শেষদিনগুলির ভার তুলে নিলেন। অসুস্থ অবস্থায় ক্রিস্টিন কাপড়ের উপর তোলা বিবেকানন্দের রক্তিম পদচিহ্ন বুকে রেখে শুয়ে থাকতেন। বলতেন: "এত দীর্ঘ, এত দুঃখময় জীবনটি; তবুও মুহূর্তের জন্য অন্তর্নিহিত সর্বশক্তিমত্তাকে ভুলে যাইনি, জীবনটাকে দিনের পর দিন ইচ্ছামত তৈরি করার চেষ্টা করেছি, কত ভুল করেছি, কত যন্ত্রণা সয়েছি, আর কতবার হতাশা এসেছে দীর্ঘ বছরগুলিতে।...শেষে এ জীবনে ইচ্ছাশক্তিটাকে করে তুলেছি দুর্জয়।...এই ইচ্ছাশক্তিই আমাকে টেনে এনেছিল ভারতে। মানুষের পক্ষে অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণার মুহূর্তগুলিতে এই ইচ্ছাশক্তিই আমাকে এই দেহে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর আজ এই ইচ্ছাকে সমর্পন করেছি প্রভুর ইচ্ছার মধ্যে। এবার আমার নয়, প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"[২৩] ভারতের নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণের ইতিহাসে নেপথ্যচারিণী এই জ্যোতিষ্ক, জ্যোতির্ময়ী ভারতপ্রাণা ভগিনী ক্রিস্টিন ২৭ মার্চ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করলেন। প্রয়াণের আগে শেষ সাতদিন তাঁর অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন ছিল, তবে পূর্ণ জ্ঞান ছিল। দীর্ঘ অসুস্থতা মুখমণ্ডলে ক্লান্তির ছাপ আনলেও মহাপ্রয়াণের পরই সেখানে এক অপার্থিব জ্যোতি ও প্রশান্তির আবির্ভাব ঘটে।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের কল্যাণে আত্মনিয়োজিতা নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন, এই দুই বিদেশিনী পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নিবেদিতার বর্ণনানুসারে ক্রিস্টিন স্বভাবে ছিলেন একজন ভারতীয় মহিলা। গভীর কৃতজ্ঞতায় নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলাউডের কাছে উল্লেখ করেছেন যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ তাঁর অসুখের সময় ক্রিস্টিন অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর সেবা করেছেন, যদিও ক্রিস্টিন নিজে মোটেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন না এবং নিবেদিতা সেজন্য শঙ্কিত থাকতেন। স্বামীজীর স্নেহধন্যা কন্যাদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে একটি সহানুভূতিশীল অটুট সখিত্ব গড়ে উঠেছিল। ক্রিস্টিনের সাহচর্য থেকে নিবেদিতা পেতেন আনন্দ ও উৎসাহ। ক্রিস্টিনের অসামান্য সহিষ্ণুতায় মুগ্ধ নিবেদিতা

২৩ উদ্বোধন, ৭৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১৯৭

লিখেছেন : "কোনসময়ই ও বিরোধ সৃষ্টি করে না, সবসময় ও যেন মিলন-রাখি।"[২৪] লিজেল রেঁম-এর কথায় ক্রিস্টিন হলেন নিবেদিতার "জীবনতরীর নোঙর, গৃহের আতপ্ত আরাম।"[২৫] নিবেদিতা জানতেন ক্রিস্টিন স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির এবং নিজেকে আড়ালে রাখেন, তাই ক্রিস্টিনের পোষাক, অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে সুব্যবস্থার জন্য মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। এমনকি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টিন যখন আমেরিকায় যান, তখন তাঁর যাবার টিকিটের জন্য ৫০০৲ টাকার ব্যবস্থা নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের মারফৎ করেছিলেন। ম্যাকলাউডকে চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর লেখা বইগুলির আয় ক্রিস্টিনের কাছে যাবে কারণ সে স্বামীজীর আরব্ধ কর্মসম্পাদনে উৎসর্গীকৃত।

ক্রিস্টিন ছিলেন গভীর আত্মবিশ্বাসী এবং তাঁর মন ছিল ইস্পাতদৃঢ়। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে নিবেদিতার চোখে পড়ত তাঁর নিজের অস্থিরতাময় বৈপরীত্য। ১৯০২ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে নিবেদিতা ক্রিস্টিন সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় ক্রিস্টিন ছিলেন শান্ত, সুমিষ্ট, নির্বিরোধী, এবং গুরুনির্দিষ্ট কর্মে সমর্পিতপ্রাণা এক মহনীয় চরিত্র। সেই সঙ্গে নিবেদিতা লিপিবদ্ধ করেছেন যে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা যে ক্রিস্টিনের কাছে ধর্মস্থাপকতা অপেক্ষা মানবিকতাই ছিল বিবেকানন্দের প্রকৃত পরিচয়; আর ভারতের নারীকল্যাণে স্বামীজীর চিন্তাধারা বাস্তবায়িত করার কাজে নিবেদিতা অপেক্ষা ক্রিস্টিনই নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেছিলেন। সহস্র দ্বীপোদ্যানে স্বামীজী তাঁকে দেখেই বুঝেছিলেন, ত্যাগ ক্রিস্টিনের সহজাত। একে নূতন করে দীক্ষা দেবার কিছু নেই। ক্রিস্টিনও নিজেকে আড়ালে রেখে গুরুধ্যানে ও গুরুকার্যে জীবন কাটিয়ে গেলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুআরি স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যা 'ক্রিস্টিনা'কে যে কবিতাটি উপহার দেন সেইটি পরার্থে নিবেদিতপ্রাণ এই নারীর সঠিক ও সুন্দর বর্ণনা এবং শিষ্যা এটিকে মন্ত্রজ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন।

"তুষার-কঠিন মাটিই না হয়
হোক না তোমার শয্যা,
আবরণ তব শীতার্ত ঝঞ্ঝার,
জীবনের পথে নাই বা জুটিল বন্ধুজনার হর্ষ,
ব্যর্থ তোমার সৌরভ-বিস্তার;

* *

তবু প্রশান্ত বিকশিত থাক, পবিত্র মধুময়
থাক অবিচল আপনার মহিমায়,
দাও, ঢেলে দাও স্নিগ্ধ উদার মধু সৌরভ তব
চির-প্রসন্ন অযাচিত করুণায়।"[২৬]

নৈর্ব্যক্তিক বেদান্তের নির্যাসের মূর্ত বিগ্রহ বিবেকানন্দের করুণাঘন মানবিকতা যা ব্যক্তিস্তরে প্রকাশ পেয়েছে কখনও পিতার স্নেহে, কখনও ভ্রাতা বা বন্ধুর প্রীতি মাধুর্যে। ক্রিস্টিনের কাছে স্বামীজী প্রতিভাত হয়েছিলেন স্নেহময় পিতারূপে। অবশ্য স্বামীজী ক্রিস্টিনের কাছে ছিলেন পিতারও অধিক—স্বয়ং দেহধারী ঈশ্বর। একান্ত প্রিয় এই কন্যাটিকে স্বামীজী কোনদিন তিরস্কার করেননি। স্নেহময় পিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হতেন দীর্ঘদিন

২৪ নিবেদিতা-লিজেল রেঁম (অনুবাদিকা নারায়ণীদেবী) পৃঃ ৪২৭
২৫ ঐ, ১ম সং (১৩৬২)
২৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ ১৩৬৯, ৭।৪২৪

ক্রিস্টিনের কুশল সংবাদ না পেলে; টাকাও পাঠাতেন মাঝে মাঝে। পাশ্চাত্য ভ্রমণ শেষে দেশে ফেরার পথে অনেক ঘুরে ডেট্রয়েট গিয়েছেন শুধু প্রিয় কন্যাটির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। স্বামী বিবেকানন্দের অপার্থিব স্নেহ স্বর্গীয় সুষমায় ভরিয়ে দিয়েছিল গুরুপদে সমর্পিতা ক্রিস্টিনের জীবন। আর সেই স্নেহ আসলে ঈশ্বরের কৃপারই নামান্তর। সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি গুরু তাঁকে লিখছেন একটি চিঠিতে (প্যারিস, ১৪ অক্টোবর, ১৯০০): "ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রতি পদে তোমার উপর বর্ষিত হোক, প্রিয় ক্রিস্টিন, এই আমার নিরন্তর প্রার্থনা।"[২৭]

২৭ বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ১৩৬১, ৮।১৬২

# একটি কবিতা উপহার দিও

শ্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য

সৃষ্টির উষাকাল থেকে
অবর্ণনীয়রূপে তুমি অনুপম।
আকাশ-ছোঁয়া শীর্ষভূমি
তুষার-ধবলে আবৃত;
অসীম মৌনতায় দণ্ডায়মান বৃক্ষদল
তোমার যে-কোন আজ্ঞার অপেক্ষায়—
যেন উৎসুক আনন্দিত!
সীমাহীন প্রশান্ত এই পরিবেশে
উপলখণ্ডে আছড়ে পড়া নির্ঝরের অমিত বিক্রম,
সূর্য-করোজ্জ্বল দিনের হিমেল স্নিগ্ধতা,
নীলাঙ্গনে নির্ণিমেষ নক্ষত্রের মোহিত দৃষ্টিপাত,
শব্দশূন্য বিশাল অঞ্চল জুড়ে
বিস্তৃত তোমার সুনির্মল সিংহাসন,
আপ্লুত করল আমায়।
পথক্লেশে শ্রান্ত বিবশ দেহ
তবুও, আনন্দ শিহরণ তরঙ্গায়িত হল
সর্বাঙ্গের শিরায়-শোণিতে—
দেখা পেলাম তোমার।

দীনতম তুচ্ছ আমি এই মুহূর্তে
দুর্বল মনের কামনায়
নগণ্য কিছু যদি চেয়ে ফেলি!
কী চাইব তোমার কাছে?
জীবনবোধ দিয়ে সুদূর সুন্দরকে উপলব্ধি করবার
দুর্লভ সৌভাগ্য মিলেছে আজ।
সংস্কারহীন এই সত্তাকে
একটি কবিতা উপহার দিও—
মহা নিঃশব্দ মাধুর্যের মধ্যে
সকল সত্য যেখানে তোমার উন্মোচিত।

# স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে

## স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

### জীবনতারা হালদার

জীবিত প্রবীণতম স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে জীবনতারা হালদার অন্যতম। অনুশীলন-সমিতির এক সময় তিনি সহকারী কর্মসচিব ছিলেন। তাঁর উত্তর কলকাতার বাড়িতে (২২।১।১এ, সুধীর চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৬) গোলপার্ক থেকে আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ১৮ তারিখ বিকাল চারটায়। আগেই পত্রমাধ্যমে আমার আসার উদ্দেশ্য তাঁকে জানিয়েছিলাম। তিনি ঐদিন ঐসময় আমাকে যেতে বলেছিলেন। তাঁর বয়স তখন ৮৫ বছর (জন্ম: ১৮৯৩)। বললেন, এখনও যখন বাইরে যান বাসে-ট্রামেই চলাফেরা করেন। কারও সাহায্য প্রয়োজন হয় না। এই বয়সেও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, কোন অসুখ-বিসুখ নেই। অগ্নিযুগের কথা বলার জন্য সভা-সমিতিতে প্রায়ই তাঁর ডাক পড়ে। উনিও পারতপক্ষে কোথাও 'না' করেন না। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে দেখলাম গভীর আগ্রহ। তাঁর মতে, স্বামী বিবেকানন্দই ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের বলিষ্ঠ পথিকৃৎ। খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীজীর কথা তিনি বলছিলেন। বলছিলেন স্বদেশীযুগের নানা ঘটনা, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কথা। দেখছিলাম তাঁর স্মৃতি সম্পূর্ণ সজীব। দেহে বার্ধক্য অনিবার্য ছাপ রাখলেও মনের সতেজতায় বয়সকে তিনি প্রতি কথায় অগ্রাহ্য করছেন দেখলাম। বললেন, এই মানসিকতা তিনি পেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে। তিনি 'অনুশীলন-সমিতির ইতিহাস' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন। ঐদিন তিনি ঐ গ্রন্থের একটি কপি আমাকে স্বাক্ষর করে উপহার দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে জীবিত প্রবীণ বিপ্লবীদের বক্তব্য সংগ্রহ করছি শুনে তিনি খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন: "আরও ২৫।৩০ বছর আগে এটি করলে আমাদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের বক্তব্য সংগ্রহ করা যেত। আমাদের চাইতেও তাঁদের বক্তব্য অনেক মূল্যবান। তবে এখনও শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ জীবিত আছেন। তাঁর স্মৃতিও খুব ভাল আছে। তিনি স্বামীজীকে দেখেছিলেন। শুনেছি স্বামীজীর কথাতেই হেমচন্দ্র ঘোষ বিপ্লব-জীবনে এসেছেন।" আমি বললাম: "হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আমি দেখা করেছি এবং তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছি। পেয়েছি তাঁর লিখিত প্রবন্ধও।" শুনে জীবনতারাবাবু খুব খুশি হলেন। বললেন: "তাহলে তো একটা কাজের কাজ হয়েছে। এ-বিষয়ে হেমচন্দ্র ঘোষের বক্তব্যের মূল্য অনেক। তিনি সূর্য সেন, বাঘা যতীন প্রভৃতির সমগোত্রীয় নেতা।"

জীবনতারাবাবুর কাছে আমি আমার বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন রেখে এলাম সেদিন। তিনি বললেন তিনি নিজে সেগুলির উত্তর লিখে আমার কাছে দিয়ে আসবেন অগস্ট মাসের ১০ তারিখ নাগাদ। কথা রেখেছিলেন তিনি। ঠিক ১০ অগস্ট বিকেলে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আমার কাছে গোলপার্কের ইনস্টিটুট অব কালচারে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রতিশ্রুত

স্বহস্তে-লেখা আমার প্রশ্নাবলীর উত্তর।' দেখলাম খুব যত্নের সঙ্গে তিনি আমার প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার উত্তর লিখেছেন। বললেন: "দেখ, স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে যে-কোন গবেষণায় আমার ভীষণ আগ্রহ। আর সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা যারা কম-বেশি অংশগ্রহণ করেছিলাম তাঁদের যিনি প্রাণপুরুষ ছিলেন তাঁর অবদানের কথা লিখতে লিখতে আমি বার বার আত্মহারা হয়ে যাচ্ছিলাম। তবে আমি যা লিখেছি তা আবেগের কথা লিখিনি। যা ঘটনা, যা ইতিহাস—যে ইতিহাস আমার প্রত্যক্ষভাবে অথবা অগ্রজ বিপ্লবীদের সূত্রে জানা—তাই আমি লিখেছি। কারণ আমি জানি এইসব লেখাই একদিন ইতিহাসের উপাদান হবে।" জীবনতারাবাবু আমার সামনেই তাঁর লেখাটিতে স্বাক্ষর করলেন। বললেন, "আজই সকালে লেখা শেষ করেছি। তাই আজকের তারিখেই (১০. ৮. ১৯৭৮) সই করলাম।"

মাস কয়েক পর জীবনতারাবাবু আমার কাছে আবার একবার আসেন এবং বলেন, "আমি ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে আরও কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছি। তাই আমার লেখাটিতে একটু সংযোজন-সংশোধন করতে চাই।" সেদিন লেখাটি তিনি নিয়ে যান এবং কিছুদিন পর তিনি পুনরায় আমাকে তাঁর লেখাটি ফেরৎ দেন। সংযোজিত ও সংশোধিত লেখাটিতে তাঁর স্বাক্ষরের তারিখ ১৫ এপ্রিল ১৯৭৯।

জীবনতারা হালদারের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল:

**স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে আপনি কখন, কিভাবে যুক্ত হলেন এবং কতখানি যুক্ত ছিলেন?**

**উত্তর:** বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার আদিপর্বে 'অনুশীলন-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ দোলপূর্ণিমার দিন কলকাতায়। পরবর্তি-কালে সারা ভারতব্যাপী সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এই অনুশীলন-সমিতি। 'অনুশীলন-সমিতির ইতিহাস' গ্রন্থের মুখবন্ধে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: "ভারতের বিপ্লববাদ উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রে আরম্ভ হইলেও এই প্রদেশের বাহিরে বেশি প্রচার হয় নাই। বিংশ শতকের প্রথমে বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে বঙ্গদেশে যে বিপ্লববাদের সূত্রপাত হয় তাহাই ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া মুক্তি-সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশের বিপ্লববাদের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল 'অনুশীলন-সমিতি'। সুতরাং ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সফলতায় অনুশীলন-সমিতির অবদান খুবই মূল্যবান।" আমি অনুশীলন-সমিতিতে যোগদান করি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে—বঙ্গ বিভাগের অগ্নিময় বছরে। আমার বয়স তখন বার বছর (আমার জন্ম: ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে)। আমার সেজমামা যতীন্দ্রনাথ শেঠ অনুশীলন-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। তিনি আমাকে সমিতির সভ্য করে দেন। হেদুয়ার কাছে ২১ নং (অধুনা ২৪ নং) মদন মিত্র লেনের মাঠে সমিতির ব্যায়ামক্ষেত্র ছিল। সেখানে সপ্তাহে ছদিন আমাদের ব্যায়াম, ড্রিল, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতি শেখানো হত যাতে সমিতির সভ্যরা সুগঠিত সুদৃঢ় স্বাস্থ্য এবং সতর্ক মনের অধিকারী হয়। কাছেই একটি ছোট বাড়িতে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্যালয় ৪৯ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। এখানে প্রতি রবিবার সমিতির নিয়মিত 'ময়্যাল ক্লাস' বসত। ক্লাসে ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, মহাপুরুষ ও বীর দেশপ্রেমিকদের জীবনী, বাণী প্রভৃতি পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা হত। উদ্দেশ্য ছিল সভ্যদের মানসিকতাকে সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

ক্রমে সমিতি ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহভাজন হয়ে পড়ল এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সমিতি বেআইনী ঘোষিত হল। সমিতির প্রধান কর্মকর্তারা গোপনচারী হয়ে গেলেন। সমিতি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যাদুগোপাল মুখার্জীর সহকর্মী অতুল ঘোষ কিছুদিন গুপ্তভাবে ৮৩ নং হরি ঘোষ স্ট্রীটে সমিতি পরিচালনা করেন। অল্পদিন পরে তিনি আত্মগোপন করলে আমার উপর সমিতির পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়। উত্তর কলকাতায় সিমলা অঞ্চলে আমাদের আট-পুরুষের বাড়ি। আমাদের পৈত্রিক বাড়ির পিছনে দুকাঠা খোলা জমিতে প্রায় চার বছর (১৯১২—১৯১৬) আমি গোপনে সমিতি (পুলিশের ভাষায়, 'আখড়া') পরিচালনা করি। ঐ একই সময়ে আমাদের বাড়ির রাস্তার ধারে একটি ছোট ঘরে আমার নামে সাইনবোর্ড দিয়ে একটা ঘিয়ের দোকান খুলেছিলাম। ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই ছিল গুপ্ত বিপ্লবী কর্মী। অতুল ঘোষের দাদা উত্তর ভারতের নানা স্থান থেকে পাইকারী দরে ঘি পাঠাতেন। আমার দোকানে খুচরো বিক্রি হত। প্রকৃতপক্ষে আমার দোকানটি ছিল বিপ্লবীদের সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম। এভাবে ছত্রভঙ্গ সমিতির সভ্যদের একত্রিত করা গেল ভূপতি মজুমদারের পরিকল্পনায়।

সমিতির একজন সভ্য, আমার সহপাঠী নলিনচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি ছিল চট্টগ্রামের দোনলা ঝরনা। দেশে চালের ব্যবসা করবার জন্য তাকে দুহাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম। আসলে তার নেতৃত্বে চালের ব্যবসার অন্তরালে চট্টগ্রামে আর একটি বিপ্লবকেন্দ্র পরিচালিত হত। এইসূত্রে আমি চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড পাহাড়, কক্স বাজার এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করি।

উত্তর ভারতে কাশীতে ও অন্যত্র বন্ধু নেপাল ব্রহ্মচারী একটি স্কুলের আড়ালে গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করত। তার সঙ্গে গোপনে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাকে পাঠ্যপুস্তক, ভারতের মানচিত্র প্রভৃতির সঙ্গে অন্যান্য 'মারাত্মক' বস্তু দিয়ে সাহায্য করতাম।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানী। সেই সুযোগে যাদুগোপাল মুখার্জী, জিতেন লাহিড়ী (শ্রীরামপুর), হরিকুমার চক্রবর্তী (বালেশ্বর ইউনিভারস্যাল এম্পোরিয়াম—এটিও ছিল আসলে ঐ নামের আড়ালে বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত ঘাঁটি), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তিকালে মানবেন্দ্রনাথ রায়—এম. এন. রায়), লাডলিমোহন মিত্র, যতীন্দ্রলোচন মিত্র প্রভৃতি নেতারা গুপ্তপথে ইংলণ্ডের শত্রু জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ-সাহায্য লাভের পরিকল্পনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে ভারতে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো। এই ব্যাপারে মূল দায়িত্বে ছিলেন জিতেন লাহিড়ী। তাঁর সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করার ভার ছিল আমার উপরেই। পূর্বোক্ত অন্যান্য নেতাদেরও আমি বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলাম। ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত নিয়ে এম. এসসি. পড়ছি। এই সময় বিলেত থেকে উন্নতমানের কিছু গণিতের বই আমি আনিয়েছিলাম। ঐসঙ্গে Rifle Shooting, Infantry Training প্রভৃতি আট-দশখানা যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত বইও আমদানী করেছিলাম। সেগুলি চিলেকোঠায় লুকিয়ে পড়তাম।

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি ব্রিটিশ সরকারের গোচরে আসে, আসে সমিতির গুপ্ত কার্যকলাপের কথাও। ঐসময় Defence of India Act পাশ হল। সন্দেহভাজন ব্যক্তিমাত্রকেই গ্রেপ্তার করা শুরু হয়ে গেল। সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অপরাধে

যে রাত্রে পুলিশ এসে আমাদের বাড়ি খানাতল্লাসী করে আমাকে গ্রেপ্তার করে, সেদিনই আমার এম. এসসি. পরীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রথমে দিন কয়েক আমাকে রাখল আলিপুরে জেল-হাজতে, তারপর মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের তের মাইল উত্তরে বিনপুর গ্রামে অন্তরীণ অবস্থায় ছ'মাস, তারপর দমদম-সিঁথি অঞ্চলে নজরবন্দী অবস্থায় আরও ছ'মাস। আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসে পুলিশ আমাদের বাড়ি খানাতল্লাসী করবার সময় যুদ্ধবিদ্যাসংক্রান্ত বিলেতি বইগুলি নিয়ে যায়। তার সঙ্গে উল্লেখিত ঘি ও চালের ব্যবসা (!) সংক্রান্ত খাতাপত্রগুলিও যায়; যায় সমিতির সভ্যদের নামের গুপ্ত তালিকা যার 'কোড' নম্বর আমার কাছে ছিল।

বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় আমি যে সামান্য অংশগ্রহণ করেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৎকালীন গোপন পুলিশ রিপোর্টে পাওয়া যাবে:

**[ Confidential Report from Police Register ( C. I. D. Special Branch, Calcutta ) ]**

GREEN LIST

Serial No. 1095

Jibantara Halder S/o Ratan Lal of 22/1/1 Jeliatola Street, Calcutta.

Year of birth : 1893

Member of the West Bengal Party under Atul Ghosh. Started an Akhara and Gheeshop, both of which were used as rendezvous for revolutionists. He also advanced a large sum of money to start another rendezvous in Chittagong.

A diary which he kept shows that he was in communication with members of the Indo-German Conspiracy **and** of the organisation in the United Provinces [ now Uttar Pradesh ]. He appears to have been **a dangerous person.** [ স্থূলাক্ষর প্রবন্ধকারের নির্দেশে ]

Interned : 2.12.1916—31.5.1917

Released : 17.11.1917

অনুশীলন-সমিতিতে এই 'বিপজ্জনক লোক'টি অগ্রজ নেতাদের কিরূপ আস্থাভাজন ছিলেন তা বোঝা যাবে একটি ঘটনায়। স্বাধীনতা-লাভের পর অনুশীলন-সমিতির পূর্বতন সভ্য ও প্রবীণ কর্মীদের একটি সভায় সমিতির একটি ইতিহাস রচনার প্রস্তাব করা হয়। সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয় এবং প্রকাশের পর তাঁর 'অনুশীলন-সমিতির ইতিহাস' গ্রন্থটি যাদুগোপাল মুখার্জী প্রমুখ সমিতির জীবিত প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের দ্বারা 'master piece' হিসেবে প্রশংসিত হয়। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও গ্রন্থটি যাতে তথ্যপূর্ণ ও প্রামাণিক হয়ে ওঠে সেবিষয়ে তিনি 'যথার্থ Research scholar'-এর মানসিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—এ স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং যাদুগোপাল মুখার্জী। ( দ্রষ্টব্য: অনুশীলন-সমিতির ইতিহাস, ৪র্থ সং ১৯৭৭, পৃ: ৬০ )

জীবনতারা হালদারের কাছে আমার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল:

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে একজন প্রবীণ বিপ্লবী হিসেবে আপনার কি ধারণা?

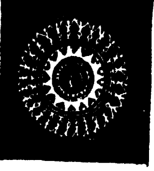
উত্তর: ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান অতুলনীয়। শুধু স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেন, ভারতের সর্বাত্মক নবজাগরণে তাঁর প্রভাব সর্বাধিক বলে আমি মনে করি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর তেজোদীপ্ত

ভাষণ মৃতপ্রায় ভারতবাসীর সম্বিত ফিরিয়ে দিয়েছিল, সমগ্র জাতিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখিয়েছিল। তাঁর বক্তৃতা, চিঠিপত্র, 'জ্ঞানযোগ', 'কর্মযোগ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'ভারতে বিবেকানন্দ', 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ, 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'সখার প্রতি', 'কালী দি মাদার' প্রভৃতি কবিতা অনুশীলন-সমিতির সভ্যদের অবশ্যপাঠ্য ছিল গীতা ও চণ্ডীর সঙ্গে। তাঁর বাণী ও উপদেশ জীবনে অনুসরণ করার জন্য সভ্যদের বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হত। প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যায় সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'ময়াল ক্লাস'-এ তাঁর রচনা, বাণী প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও আলোচনা হত। আমরা দৃপ্তকণ্ঠে তাঁর বাণী, তাঁর 'স্বদেশমন্ত্র', তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতাম। তাতে আমরা অভী হতাম, পেতাম সাহস এবং আত্মপ্রত্যয়।

অনুশীলন-সমিতি ছিল স্বামীজীর বিশেষ আশীর্বাদধন্য। অগ্রজদের কাছে শুনেছি, অনুশীলন-সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রতিষ্ঠাতারা স্বামীজীর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রবীণ বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখার্জী ও অন্যান্য প্রবীণ নেতাদের কাছে শুনেছি, সমিতির প্রাণ-পুরুষ যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই আগে থেকে স্বামীজীর কাছে বেলুড় মঠে যেতেন এবং তাঁদের উপর স্বামীজীর আদর্শের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল।

স্বামীজীর বাণী ও আদর্শের অনুসারী 'অনুশীলন-সমিতি' ছিল বস্তুতপক্ষে একটি 'মানুষ তৈরির কারখানা।' স্বামীজী বলেছিলেন: "Man making is my mission"—মানুষ তৈরিই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। তাই স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্ব' অনুসারে আদর্শমানুষ গঠনই ছিল অনুশীলন-সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই ছিল সমিতির লক্ষ্য। সর্বপ্রকার চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য নীতি ও ধর্মশিক্ষার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত। সমিতির মূল নীতি ছিল—স্বামীজী-নির্দেশিত নিষ্কাম কর্ম, নিঃস্বার্থ পরোপকার, জাতির মঙ্গল সাধনায় প্রাণ-নিবেদন এবং দেশের জন্য আত্মবলিদান। আমাদের অগ্রজেরা [ স্বামীজীর ] এই সকল নীতি অনুসরণ করে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন। বস্তুতঃ, অনুশীলন-সমিতির পর ভারত-বর্ষে, বিশেষতঃ সমগ্র বঙ্গদেশে যেসব স্বদেশী সংগঠন গড়ে উঠেছিল তাদের সকলের সামনেই আদর্শ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর নির্দেশিত পথই ছিল তাদের লক্ষ্য।

জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার উপর স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জনসেবার মাধ্যমে শিক্ষিত যুবকরা সেকাজটি যথাযথভাবে করতে পারে এরকম চিন্তাও স্বামীজীর। আমার প্রথমে ধারণা ছিল স্বেচ্ছাসেবক-প্রথা বোধহয় অনুশীলন-সমিতিই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে প্রচলন করে। কিন্তু পরে জেনেছি, আমার ধারণা ঠিক নয়। সমিতির জন্মের কয়েক বছর পূর্বে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগ-মহামারীতে ক্লিষ্ট কলকাতার পথে-বস্তিতে স্বামীজীর নির্দেশে, স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার নেতৃত্বে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় বঙ্গদেশে প্রথম স্বেচ্ছাসেবকরা জন-সেবার কাজে নেমেছিলেন। বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর সেবা করতাম, দরিদ্রনারায়ণ-ভোজন পরিচালনা করতাম। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কলকাতায় গঙ্গাস্নানের জন্য বিরাট লোক-সমাগম হয়েছিল। তা নিয়ন্ত্রণ ও জনসেবার জন্য সমিতি ব্রতী হয়েছিল। অনুশীলন-সমিতির সভ্যদের এই সেবাকার্যে অংশ গ্রহণের পিছনে ছিল স্বামীজীর আদর্শের প্রেরণা। [ ক্রমশঃ ]



# অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

## হিন্দুর প্রতিমাপূজা

( শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ )

ঈশ্বরের প্রকৃতি অসীম, অনন্ত। কোনও লক্ষণ দ্বারা তাঁহার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা যায় না। তথাপি হিন্দুরা ঈশ্বরের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। কোথাও শান্তরূপে, কোথাও ভীমরূপে, কোথাও মূর্ত্তিমান ত্যাগ ও বৈরাগ্যরূপে, কোথাও বা ভোগমূর্ত্তিতে—হিন্দুগণ সেই অনন্ত ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুর এইভাবে প্রতিমাপূজা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহার আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে যুক্তি অতি স্পষ্ট। মৃত্তিকা, প্রস্তর বা ধাতু হইতে মনুষ্যহস্ত দ্বারা যে প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাকে ঈশ্বররূপে পূজা করিলে ঈশ্বরের অসীমত্ব খর্ব্ব হয়, আজকাল অনেকেই এইরূপ ধারণা করিয়া বসেন। কিন্তু দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা হিন্দুধর্ম্মের আলোকস্তম্ভরূপে এখনও দীপ্তি পাইতেছেন, যাঁহারা উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মসূত্র-প্রতিপাদ্য সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব স্বয়ং অনুভব করিয়া সকলকে সেই রসের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও প্রতিমাপূজা প্রচার করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারাও কি ভ্রান্ত? এই সহজ আপত্তিটি কি তাঁহারা দেখিতে পান নাই?

এই আপত্তির যে উত্তর সচরাচর দেওয়া হয়, তাহা এই যে, প্রতিমাপূজা Symbol worship (প্রতীকোপাসনা) মাত্র। বাস্তবিক এই জড়-মূর্ত্তিকে আমরা ঈশ্বর বলিয়া ভাবি না, আমরা জানি যে, ঈশ্বর অনন্ত, এই মূর্ত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা সেই অনন্ত পরমেশ্বরকেই পূজা করিয়া থাকি। কারণ, মানবমন সান্ত, সেইজন্য উক্ত মনের দ্বারা অনন্ত, অপরিসীম ভগবানের স্বরূপ কল্পনা করা তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব; তজ্জন্য ঈশ্বরের ধারণা করিতে যাইয়া মানুষ সহজেই সসীম প্রতীকের আশ্রয় লইয়া থাকে। ব্যবহারিক জগতেও একটি জিনিষকে বুঝাইতে হইলে আমরা প্রতীক ব্যবহার করিয়া থাকি। হস্তপদবিশিষ্ট আমাদের স্বশ্রেণীভুক্ত জীবকে বুঝাইতে আমরা 'মানুষ' এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি। এই শব্দটি ঐ জীবের প্রতীক। বিচার করিলে দেখা যায়, ভাষার প্রত্যেক কথাই কোন না কোন দ্রব্য বা গুণ বা কার্য্যের প্রতীক। বালকবালিকারা খেলনার ঘোড়া বা গাড়ী পাইলে উৎফুল্ল হয়, তাহাদেরও নিকট ঐ ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রীড়নকগুলি যথাক্রমে তেজস্বী জন্তু এবং আনন্দদায়ক গতিশীল পদার্থবিশেষের প্রতীক বা নিদর্শন। এইরূপে ব্যবহারিক জগতে প্রতীকের প্রচলন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ ঈশ্বরকে বুঝাইতেও হিন্দুরা প্রতিমারূপ Symbol ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রতিমাপূজা করিবার সময় ও প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করিবার সময় আমাদের মনে ভগবানের ভাবই উদয় হইয়া থাকে। আমরা ক্ষুদ্রজীব, আমাদের ক্ষুদ্র ধারণাশক্তি তাঁহার বিরাট প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে অক্ষম, তাই মূর্ত্তিরূপ প্রতীকের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারি না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন:—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"

হিন্দুরাও সেইজন্য প্রতিমার দ্বারা তাঁহাকে

নির্দ্দেশ করিয়া পূজা করে। ভগবানের আরাধনায় এরূপ প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ প্রায় সকল ধর্ম্মেই লক্ষিত হয়। যাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারাও শব্দপ্রতীকের আশ্রয় লইয়া সেই অসীম অনির্ব্বচনীয় ভগবানের উপাসনায় অগ্রসর হয়। তাহার কারণ, প্রতীকাশ্রয়ে উপাসনা করিতে সুবিধা হয়, মনে ভক্তির সঞ্চার হয়। আর মনেই যদি কল্পনা করিতে পারিলাম, তাহা হইলে তাহার বাহ্য আকার দিতে দোষ কি? মানসিক মূর্ত্তিতে যে ভক্তির সঞ্চার হয়, বাস্তব মূর্ত্তিতে তদপেক্ষা বেশী ভক্তির সঞ্চার হওয়াই সম্ভব

কিন্তু এই প্রতিমাপূজা সাধকের প্রথম অবস্থাতেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যাঁহারা পূর্ণজ্ঞানী, তাঁহাদের আর প্রতিমারূপ প্রতীকের কোনও আবশ্যক হয় না। ইঁহারা প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই বাহ্যজগৎ সাধারণ মানবের নিকট ভগবানের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। প্রতিমারূপ ব্যবধানের মধ্য দিয়া দৃষ্টি সহজেই এই বাহ্যজগতের আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার অসীম প্রকৃতির মধ্যে প্রসারিত হইতে পারে।

কিন্তু প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মত যে ইহা, তাহা বোধ হয় না। প্রতিমাকে ঈশ্বরের নিদর্শন বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুকে উপদেশ দেওয়া হয় নাই, ঈশ্বরই প্রতিমারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন এই ভাবেই পূজা করিতে এবং এইরূপ ঈশ্বরজ্ঞানে প্রতিমাপূজাকে ধর্ম্মপথের শুধু প্রথম সোপানরূপে কেন, অদ্বৈতানুভূতিরও বিশেষ সহায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা চরম-জ্ঞান (অদ্বৈতানুভূতি) লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত জ্ঞানলাভের পরও প্রতিমাপূজা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণও প্রতিমাপূজা ত্যাগ করেন নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বর ত অনন্ত অসীম, তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে দেবমন্দিরস্থ পরিদৃশ্যমান বিগ্রহ হইতে পারেন? তাহার কারণ, ব্যবহারিক জগতের সত্যসকল তাঁহার প্রতি খাটে না। ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, কোনও জিনিষ একই সময়ে "ক" এবং "ক নয়" উভয়ই হইতে পারে না। সংসারের সকল জিনিষ এই নিয়মের অধীন বটে কিন্তু ঈশ্বর ইহার অধীন নন। বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল তাঁহার মধ্যে সমভাবে অবস্থান করিতেছে—তিনি 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্', তিনি সগুণ এবং নির্গুণ, তিনি সাকার এবং নিরাকার। তিনি অসংখ্য দেবমন্দিরে বিগ্রহরূপে বিরাজ করিয়াও নিরাকার প্রকৃতি রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার যে শক্তির সীমা নাই! তাঁহার প্রকৃতি যে মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। 'অবাঙমনসোগোচর', 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' আর দেখ, ঐ মৃন্ময় মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলে বাস্তবিক কিছু অন্যায় হয় না। কারণ, তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সুতরাং এই বিগ্রহমধ্যে নিশ্চয়ই অবস্থিত আছেন। আর তিনি যদি বিগ্রহমূর্ত্তি ধারণে অসমর্থ হন, তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার লাঘব হয় না কি? বস্তুতঃ এজগতে তিনি বই আর কিছুই নাই, তাঁহারই সত্তায় সকলে সত্তাবান্। যাহা কিছু দেখিতেছি—আকাশ, বায়ু, জল, বৃক্ষ, পৃথিবী সকলই প্রকৃতপক্ষে সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে; তিনি এই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, উভয়ই তিনি। তোমার আমার দেখিবার চক্ষু নাই বলিয়া পাঁচ রকম জিনিষ দেখি, তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাই না। যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে ঈশ্বরের

জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে প্রস্তর হইতে বিগ্রহ নির্ম্মিত হয়, তাহা সাধারণ মানবচক্ষে জড়পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বাস্তবিক তাহা প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট জড়পদার্থ নহে, তাহা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রকাশ মাত্র।

নিমাই গয়ায় আসিয়াছেন, বিষ্ণুপাদপদ্মের সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অলৌকিক পরিবর্ত্তন হইল—তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইল। অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ধীর, সুরসিক নিমাই অধীর হইয়া পড়িলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তিনি আর বাড়ী ফিরিতে পারিবেন না। তাঁহার অনুচরেরা বহুকষ্টে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল বটে, কিন্তু আর তাঁহার সংসারে মন বসিল না। বৃদ্ধা মাতা এবং বালিকা পত্নীকে ছাড়িয়া তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। এই যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল, তাহার সূচনা হইল একটী প্রস্তরাঙ্কিত পদচিহ্ন দেখিয়া। পুরীতে জগন্নাথের বিগ্রহ দেখিয়া তিনি ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং তাহার পর হইতে আর বিগ্রহের নিকটে যাইতে সাহসী হইতেন না; দূরে গরুড় স্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, অশ্রুধারায় নিকটবর্ত্তী স্থান ভিজিয়া যাইত। ইহা দেখিয়া কি মনে হয় যে প্রতিমা-পূজা জ্ঞানহীন লোকেদেরই উপযুক্ত, জ্ঞানীদের অনুপযুক্ত? ঐ শ্রীবিগ্রহে মহাপ্রভু কি দেখিতেন, ঈশ্বরের নিদর্শন দেখিতেন, না সাক্ষাৎ ঈশ্বরই দর্শন করিতেন? দেবদেবীর বিগ্রহ এবং দেব-মন্দিরগুলি ভারতের অমূল্য সম্পদ এবং অতীত কীর্ত্তি। কত সাধকের সাধনা, কত পবিত্র হৃদয়ের ভক্তি উচ্ছ্বাস, কত আর্ত্ত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা এই সকল দেবমন্দিরে সঞ্চিত রহিয়াছে। কত মহাপুরুষের পদধূলিতেই না ইহারা পবিত্র হইয়াছে! উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, কাশী ও বৃন্দাবনের যে সকল প্রাচীন মন্দির এখনও বর্ত্তমান, সেগুলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কত মহাপুরুষ ভগবানের নামে পুলকিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সুন্দরতমের রূপসাগরে মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন! সেই সকল স্থানের ধূলি কুড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে হয়, গৃহে গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদিগকে কি পরিত্যাগ করা যায়? তাহারা যে মানবমনে ভগবদ্ভাব উদ্দীপিত করিয়া তাহাকে এই শোকতাপপূর্ণ সংসার হইতে শান্তিময় ধর্ম্মরাজ্যে লইয়া যায়!

সেদিনও পাশ্চাত্যশিক্ষিত ভারতের চক্ষের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের কঠোর সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলেন। প্রতিমাপূজা কি জিনিষ এবং ইহা ধর্ম্মপথের কতদূর সহায়ক সে বিষয়ে এই সকল সিদ্ধ মহা-পুরুষগণের জীবনগাথা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কথাটা এই যে, কিসে সহজে ভক্তি ও অনুরাগের সঞ্চার হয়, কিসে মনে ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা আসে। এই অনুরাগ এই ব্যাকুলতা চাই—তা সাকারভাবে উপাসনা করিয়াই হউক, বা নিরাকারভাবে উপাসনা করিয়াই হউক। ভগবান সাকার নিরাকার দুইই। সাধক তাঁহাকে যে ভাবে ডাকিবে, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখা দিবেন। তিনি উপায় দেখেন না—তিনি হৃদয় দেখেন। কি বলিয়া তোমার তৃপ্তি হয়, কিরূপে তুমি মন প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পার তাহা ঠিক করিয়া লও। যদি তাঁহাকে সাকারভাবে, সাক্ষাৎ বিগ্রহরূপে অবস্থিত ভাবিয়া ভজনা করিলে তোমার মনে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয়, তোমার পক্ষে তাহাই প্রকৃষ্ট পথ, আর যদি তোমার দেহজ্ঞান দূর হইয়া থাকে, যদি তুমি নামরূপের পারে যাইয়া থাক, যদি তুমি স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, তরুলতা, মৃত্তিকা প্রস্তর—সর্বভূতে সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বিকাশ দেখিতে সক্ষম হও, তবে তোমার আর কোন বিশেষ মূর্ত্তির পূজা করিবার আবশ্যকতা নাই। সাকার উপাসকের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা তুমি লাভ করিয়াছ।*

* উদ্বোধন-এর ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

# পুস্তক সমালোচনা

**শ্রীরামকৃষ্ণমুখে শ্রীচৈতন্যকথা—নির্মল-কুমার রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ১৯৮৫। নবভারতী প্রকাশনী, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ৬+১০০, মূল্য : দশ টাকা।**

উনিশশো ছিয়াশি খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পাঁচশো বছর ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের দেড়শো বছর (তিরোধানের একশো বছর) পূর্ণ হয়েছে। ভক্তসমাজে দুজনেই অবতার পুরুষরূপে বন্দিত এবং এই অবকাশে দুজনকে একযোগে স্মরণ ও মননের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কেবল ভক্তসমাজে নয়, সংস্কৃতিমান্ ব্যক্তিমাত্রের কাছেই তিনশো বছরের ব্যবধানে আবির্ভূত দুই যুগপুরুষের জীবন ও বাণীর যুগপৎ অনুধ্যানের প্রয়োজনও স্বীকার করতে হয়।

'ভূমিকা ভুমার ভূমিতে' নামে প্রস্তাবনায় স্বামী শিবানন্দ গিরি বলেছেন : "এ বই পড়ে মনে হয় একজন আর একজনের পরিপূরক। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ, শ্রীচৈতন্য তার ভাষ্য। যখন শ্রীচৈতন্য বেদ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তার ভাষ্যকার।"

গ্রন্থটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত।

প্রথম—'শ্রীরামকৃষ্ণমুখে শ্রীচৈতন্যকথা'। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি চয়ন করে ভাবানুসারী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সাজিয়েছেন। দ্বিতীয়—'শ্রীচৈতন্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ', কথামৃত থেকে সংকলিত। তৃতীয় অংশ—'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি' বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ, কথামৃত ও স্বামি-শিষ্য-সংবাদ থেকে সংগৃহীত। এরপর 'একই ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণরূপে'। এই চতুর্থ অংশে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বন করে দুই অবতার-পুরুষের সাদৃশ্য তথা ঐক্য প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। মাঝে মাঝে শাস্ত্রবাক্য থাকলেও গ্রন্থকার তাত্ত্বিক শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হননি, সহজ ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। ভক্তজনের কাছে এই অংশটি উপাদেয় বোধ হবে। পরিশেষে 'শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে গৌরগাথা'—গ্রন্থকারের 'সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ' থেকে পনেরটি গানের সংকলন।

মুদ্রণাদি পরিপাটি। তবে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতির মুদ্রণ প্রায়ই ত্রুটিপূর্ণ—সমাসবদ্ধ পদকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়েছে। কথামৃত থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতির আকরনির্দেশ কথামৃত ভবন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের সঙ্গে মেলে না। 'ঠাকুর দেহরক্ষা করেন মাত্র ৫২ বছর বয়সে' (৮৫ পৃষ্ঠা)—তথ্যটি সঠিক নয়; লীলাবসানের সময় ঠাকুরের বয়স প্রায় সাড়ে পঞ্চাশ বছর। 'কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে, তবে জ্ঞান হয়' (৪ পৃষ্ঠা—কথামৃত ৪।৯।৪)—প্রকৃতপক্ষে গৌরী পণ্ডিতের উক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন মাত্র।

**—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ**

**শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও কাহিনী—কাঞ্চনকুমার দাস। প্রকাশক অরিন্দম দাস, ২০ চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা-৭০০ ০০৩। পৃঃ ৩৬, মূল্য : চার টাকা।**

যুক্তাক্ষর-বর্জিত সদ্য-সাক্ষরদের জন্য লিখিত এই পুস্তিকাটি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত দশটি গল্পের সংক্ষিপ্ত সংকলন। শিশু এবং সদ্য-সাক্ষরদের জন্য যুক্তাক্ষর-বর্জিত ভাষায় সরস কাহিনী বর্ণনায় যে দক্ষতার প্রয়োজন এই পুস্তিকায় তা সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। ধর্ম, নীতি এবং উদার লোক-ব্যবহার শিক্ষায় এই জাতীয় গ্রন্থের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। সদ্য-স্বাক্ষর এবং শিশু সাহিত্যে ইহা একটি সার্থক সংযোজন। গ্রন্থকারের সাধু প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

**—ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর**



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ভাবগম্ভীর পরিবেশে এবং মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। আবহাওয়া ভাল থাকায় পূজার কয়দিন প্রচুর জনসমাগম হয়। পূজায় প্রতিদিনই হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখা-কেন্দ্রগুলিতেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে: আগরতলা, আঁটপুর, আসানসোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বম্বে, বারাসত, কাঁথি, ঢাকা, গুয়াহাটি, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জী), শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

## ছাত্রকৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় (১৯৮৭ ইং) রহড়া, পুরুলিয়া, মালদহ, নরেন্দ্রপুর এবং বরানগরের ছাত্ররা যথাক্রমে নিম্নলিখিত স্থান অধিকার করেছে।

রহড়া: ২য়, ৫ম এবং ৯ম। পুরুলিয়া: ২য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১০ম এবং ১১শ। মালদহ: ৯ম। নরেন্দ্রপুর: ১০ম। বরানগর: ১১শ। পশ্চিমবঙ্গ স্টেট কাউন্সিল অব্ টেকনিক্যাল এডুকেশন পরিচালিত 'জুনিয়র ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং' পরীক্ষায় সারদাপীঠ শিল্পায়তনের ছাত্ররা যথাক্রমে ২য় থেকে ৮ম এবং ১০ম স্থান অধিকার করেছে।

বমডিলায় অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের 'সায়েন্স সেমিনার'-এ আলং বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ১ম স্থান অধিকার করেছে।

এই বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষায় মাদ্রাজ বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিম্নলিখিত স্থান অর্জন করেছে:

বি. এসসি.: ১ম এবং ৮ম; বি. কম.: ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম; এম. এ. (অর্থনীতি): ১ম; এম. এ. (দর্শন): ১ম থেকে ৪র্থ এবং এম. এ. (সংস্কৃত): ১ম।

তামিলনাড়ু সরকার মাদ্রাজ 'সারদা বিদ্যালয়'-এর দু'জন শিক্ষককে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' সম্মানে ভূষিত করেন।

## বেদান্ত-সম্মেলন

৭ থেকে ৯ অগস্ট শিকাগো কেন্দ্রের পরিচালনায় তিনদিনের এক বেদান্ত-সম্মেলন আয়োজিত হয়। মিশিগানের গ্যাঞ্জেস-এ অবস্থিত বিবেকানন্দ মঠে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সন্ন্যাসী, শিক্ষাব্রতী এবং ভক্তরা অংশগ্রহণ করেন। আরতি, বৈদিক স্তোত্র-আবৃত্তি, ধ্যান, পূজা, ভাষণ, গোষ্ঠী আলোচনা এবং সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। এই সম্মেলনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অন্যান্য দেশ থেকে প্রায় ৮০০ জন যোগ দেন।

## ত্রাণ

**পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ:** মালদা কেন্দ্রের মাধ্যমে ঐ জেলার গাজল ইংলিশ বাজার এবং রাতুয়া ২নং ব্লকের ৫,৭০,৭০৪ জন বন্যাদুর্গতকে প্রায় একমাস যাবৎ খিচুড়ি ও চাপাটি বিতরণ করা হয়। এ জেলার কালিয়াচক ৩নং ব্লক

দ্বিতীয়বার বন্যা কবলিত হলে বৈষ্ণবনগরের অস্থায়ী ত্রাণশিবির থেকে প্রত্যহ ১৭০০০ ক্ষতিগ্রস্তকে খাবার দেওয়া হয়। মালদা আশ্রমের মাধ্যমে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তপন ও রায়গঞ্জ অঞ্চলের ৫৬,২৫৪ জন দুর্গত মানুষকে খিচুড়ি, চাপাটি, চিঁড়া ও গুড় দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে ঐ জেলার বোয়ালমারি-নন্দনপুর অঞ্চলে বন্যাক্লিষ্টদের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। এছাড়া সেখানে গুঁড়ো দুধ এবং ঔষধপত্রও বিতরণ করা হয়েছে।

সারগাছি আশ্রমের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার সাতুই এবং তৎসংলগ্ন গ্রামসমূহে বন্যা-দুর্গতদের মধ্যে গুঁড়ো দুধ, শিশুখাদ্য, ব্লিচিং পাউডার ও ওষুধপত্রাদি সরবরাহ করা হয়।

কামারপুকুর কেন্দ্রের মাধ্যমে হুগলী জেলার খানাকুল অঞ্চলের ৪টি গ্রামের এবং বালি-দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের দুর্গত মানুষের মধ্যে চিঁড়া ও গুড় বিতরণ করা হয়েছে

সারদাপীঠ কেন্দ্রের মাধ্যমে হাওড়া জেলার ভাতোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গত মানুষের মধ্যে চাল, ডাল, আটা, লবণ, চিঁড়া এবং গুড় বিতরণ করা হয়।

**বিহার বন্যাত্রাণ:** কাটিহার জেলার রামপাড়া, বিলাপাড়ি, প্রাণপুর এবং আরো ৮টি গ্রামের বন্যাক্লিষ্টদের মধ্যে কাটিহার আশ্রমের মাধ্যমে আটা, ছোলা, চিঁড়া দেশলাই ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে।

পাটনা আশ্রমের মাধ্যমে পাটনায় প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু হয়েছে।

**বাংলাদেশ বন্যাত্রাণ:** ঢাকা শহরের বন্যাকবলিত যেসব মানুষ আশ্রমের বিদ্যালয় ভবনে আশ্রয় নিয়েছিল, ঢাকা কেন্দ্র তাদের জন্য প্রাথমিক ত্রাণকার্য করেছিল। তাছাড়া একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল বন্যাকবলিত অঞ্চলের অসুস্থদের মধ্যে সেবাকার্য চালাচ্ছে।

দিনাজপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭,৮৪৩ জন বন্যাপীড়িত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি ও শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল বন্যাপীড়িতদের মধ্যে সেবাকার্য চালাচ্ছে।

বালিয়াটি আশ্রমের মাধ্যমে বালিয়াটিতে প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু হয়েছে।

**গুজরাট খরাত্রাণ:** রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে রাজকোট ও সুরেন্দ্রনগর জেলার খরাক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে জল ও বাজরা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর, কচ্ছ, জামনগর এবং জুনাগড় জেলায় জল এবং পশুখাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

**শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ:** মাদ্রাজের ত্যাগ-রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মণ্ডপম শিবিরের শরণার্থিদের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি হয়। পূজার তিনদিনই অগণিত ভক্তনরনারীর মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২১ অক্টোবর রাত্রে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীকালীপূজা সুসম্পন্ন হয়। পরদিন সকালে বহু ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

### সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

# বিবিধ সংবাদ

## আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের মাতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মহাদেবী বর্মার জীবনাবসান

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের মাতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মহাদেবী গত ১১ সেপ্টেম্বর ( ১৯৮৭ ), এলাহাবাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় একাশি বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। শ্বাসকষ্ট ও রক্ত চলাচলে বাধা শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুকে তরান্বিত করে।

কবি হিসেবেই প্রধানতঃ তাঁর পরিচিতি হলেও, গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর প্রতিভার উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন। চিত্রশিল্পী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সন্ধ্যাগীত', 'দীপশিখা' এবং 'নীহার' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। জীবনে বহু সম্মান তিনি পেয়েছেন, লাভ করেছেন বহু পুরস্কার। তার মধ্যে রয়েছে 'পদ্মভূষণ' উপাধি ও 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার।

মহাদেবীর মধ্যে আশৈশব ছিল একটি ভগবদমুখী আকুতি যার প্রেরণায় যৌবনে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর জীবন বরণ করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষ করে উপনিষদ্-সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। আবার রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে ছিল তাঁর প্রগাঢ় আগ্রহ।

বাল্যেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাত্ম-জীবনের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ এবং ঋজু মানসিকতার ফলে দাম্পত্যজীবনের পরিধির মধ্যে তিনি কোনদিন নিজেকে আবদ্ধ করতে পারেননি। তাঁর জীবন কেটেছে অতন্দ্র সাহিত্য-সাধনায় এবং স্বেচ্ছারোপিত ধর্মকেন্দ্রিক কঠোর কৃচ্ছ্রতায়। তাঁকে হিন্দী সাহিত্যের 'মীরা' নামে আখ্যাত করা হত সম্ভবতঃ তাঁর অধ্যাত্মমুখী শুদ্ধ জীবনচর্চার জন্যই।

## নোবেল শান্তি পুরস্কার

১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন কোস্টা রিকার প্রেসিডেণ্ট অস্কার এরিয়াস সানসেজ ( Oscar Arias Sanchez )। দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়ায় স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে তাঁর 'শান্তি পরিকল্পনা' যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার স্বীকৃতিতে তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয় বলে নরওয়ে সংসদের নোবেল কমিটি ঘোষণা করেছেন। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোস্টা রিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই সানসেজ তার 'শান্তি পরিকল্পনা'র কাজ শুরু করেন। নোবেল কমিটির সভাপতি ইগিল আরভিক ( Egil Aarvik ) সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত ৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে সানসেজই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন। পুরস্কার ঘোষণা হওয়ার পর সানসেজ বলেছেন : "আমি এর যোগ্য নই। তবে এ পুরস্কার আমি গ্রহণ করব কোস্টা রিকার জনগণের নামে।" পুরস্কারের অর্থমূল্য ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার।

## নোবেল সাহিত্য পুরস্কার

এবছরের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেলনে কবি যোসেফ ব্রডস্কি ( Joseph Brodsky )। বর্তমানে মার্কিন নাগরিক ব্রডস্কি জন্মসূত্রে রুশ। এক সময় তাঁকে সোভিয়েত শ্রমিক শিবিরে অন্তরীণ থাকতে হয়েছিল। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁর বয়স বর্তমানে সাতচল্লিশ বছর। সুইডিশ একাডেমি যোসেফ ব্রডস্কির কবি-

প্রতিভার প্রশংসা করে বলেছেন: স্থান এবং কালের এক মহান ব্যাপ্তি ব্রডস্কির কবিতার উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য। ব্রডস্কির কবিতায় মেধা এবং সংবেদনশীলতার গভীর সন্নিবেশ লক্ষ্য করার মতো।

কম করে ১২টি ভাষায় ব্রডস্কির কবিতা অনূদিত হয়েছে। 'এলিজি টু জন ডান', 'পোয়েমস ইন বোসলে', 'পোয়েমস অন স্ট্রীট কর্ণার' ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি। পুরস্কারের অর্থ-মূল্য ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার সলঝেনিৎসিনের পর তিনি প্রথম রুশ লেখক যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন।

## বিবেকানন্দ কেন্দ্রের যুব সম্মেলন

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দপুরমে বিবেকানন্দ কেন্দ্র একটি সাতদিনব্যাপী ( ১৮ থেকে ২৪ জানুআরি, ১৯৮৮ ) যুব সম্মেলনের আয়োজন করছেন বলে জানিয়েছেন। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীরা এই সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা:

The Convener—VYOMA'88
Vivekananda Kendra
Vivekanandapuram
Kanyakumari-629702

## বিবেকানন্দ সোসাইটির অনুষ্ঠান

১৫.৮.৮৭ তারিখে ৩য় 'মাখনচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা'টি দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয় ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতীয় উন্নয়নের ধারা'। ২৩.৮.৮৭ তারিখে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী সভাপতিত্ব করেন এবং ছাত্র ও সর্বসাধারণের মধ্যে 'বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে স্বামী ববেকানন্দ' বিষয়ে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পারিতোষিক ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১১. ৯. ৮৭ তারিখে স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার স্মরণে আয়োজিত সভায় শিকাগো ধর্মসম্মেলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ।

১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ দুদিন ব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য পরিক্রমার ৪টি অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্ব-অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ', 'শ্রীশ্রীমা সারদা ও নারী সমাজ', 'নব-ভারত ও স্বামী বিবেকানন্দ' ও 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় যুক্তিবাদ'। অধিবেশনগুলিতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী, অধ্যাপক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

## শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ

শ্বাসযন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ ( Acute respiratory infections—যেমন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া প্রভৃতি ) জনিত শিশুমৃত্যুর যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায় যে সমস্যাটি কত বিরাট। যতদূর হিসাব পাওয়া গেছে—এক বৎসরে প্রায় দেড় কোটি পাঁচ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশু মৃত্যুর মধ্যে ৪০ লক্ষ মারা যায় শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ জনিত অসুখে। আবার এদের দুই-তৃতীয়াংশ প্রাণ হারায় এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই। উপরোক্ত দেড় কোটির ৯০ শতাংশ হচ্ছে উন্নয়নশীল জাতিগুলির মধ্যে। এই উন্নয়নশীল জাতিগুলিতে সামগ্রিক মৃত্যুসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে শিশুমৃত্যু। বলা বাহুল্য, এই সব দেশে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণগুলি হচ্ছে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, পেটের অসুখ ও অপুষ্টি।

# উদ্বোধন : পৌষ ১৩৯৪



23 DEC 1987

## সূচীপত্র



৮৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

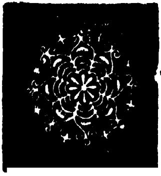
পৌষ, ১৩৯৪

# দিব্য বাণী

শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারাণী এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন। ঐশ্বর্যের লেশ নাই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; তাঁর ভাবাবেশ সমাধি এসব আমরা জন্মে দেখেছি—কত দেখেছে। কিন্তু মার? তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি! জয় মা!! জয় মা!!! জয় শক্তিময়ী মা!!! দেখছ না কত লোক সব ছুটে আসছে!…মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! জয় মা!…স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন!…আর এখানে—মা'র এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত! অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন!…মা! মা! জয় মা!

—স্বামী প্রেমানন্দ

[ স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৬, পৃঃ ১৩১—৩২ ]



# কথাপ্রসঙ্গে

## 'নিখিল-মাতৃহৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মুরতি'

কিছুদিন পূর্বে পৃথিবীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসের দুইটি মহাঘটনা কালের বিচারে শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে। একটি বহুল পরিজ্ঞাত। তাহা হইল শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান যাহা ঘটিয়াছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অগস্ট। অপরটি বিশ্বপ্লাবী মাতৃস্নেহ বক্ষে ধারণ করিয়া সারদাদেবীর 'আবির্ভাব' যাহার ব্যাপকতর সূচনা শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের মুহূর্ত হইতেই। তাঁহার এই আবির্ভাবের মধ্যে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আকুতি ও সাধনার পরিপূর্তি। পৃথিবীর সকলের প্রতি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব। কিন্তু তাঁহার পুরুষশরীরে সেই ভাবের বাঞ্ছিত বিকাশ সম্ভব ছিল না। তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল সমতুল শক্তিসম্পন্ন আর একটি বিগ্রহের। সেই বিগ্রহ সারদাদেবী। তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মাতৃভাব বিকাশের জন্য রাখিয়া গেলেন। পুরুষশরীর ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে মাতৃভাব বিকাশের আর একটি বাধাও ছিল। তাহা তাঁহার জীবনের তীব্রতা। বর্তমান পৃথিবীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সূর্যসদৃশ ব্যক্তিত্ব। তাঁহার অসাধারণ তপস্যা, অভূতপূর্ব ত্যাগ, অলৌকিক জীবন এবং অপরিমেয় অধ্যাত্ম-বিভূতি জগতের বিরাট বিস্ময়। এমনই সেই মহাজীবনের প্রখর দ্যুতি-বিচ্ছুরণ যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র চোখ ধাঁধাইয়া যায়। সেই অগ্নিসঙ্কাশ পুরুষ যখন স্থূল অর্থে বিদায় লইলেন, তখন জগতের অধ্যাত্ম-গগন সূর্যহীন হইয়া পড়িল। সূর্যহীন হইলেও শূন্যতা সৃষ্টি হয় নাই। কারণ আর এক রূপে তিনিই তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দ্বিতীয় রূপটি হইল সারদাদেবী। বাহ্য প্রকৃতিতে যখন দিনের শেষে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য বিদায় গ্রহণ করেন ঠিক তখনই পূর্ব দিগন্ত আলোকিত করিয়া উদিত হন চন্দ্র। এখানেও তাহাই হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সারদা-চন্দ্রের হইল তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়। কিন্তু এই চন্দ্রের উদয় এমন অনাড়ম্বর ছিল যে, তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে মুষ্টিমেয় দুই-চারজন ছাড়া কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। বড় নীরবে, বড় ধীরে সারদা-চন্দ্রের কিরণমালা বিস্তৃত হইতেছিল। বড় নীরবে ঠিকই, বড় ধীরে যথার্থই; কিন্তু বড় নিশ্চিতভাবে তাহা পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছিল, পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিতেছিল। অশ্রুত, অলক্ষ্য—কিন্তু অব্যর্থ ফলপ্রসূ। যেমন শেষরাত্রির শিশিরসম্পাত। কখন তাহা ঘটে কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু জানিতে না পারিলেও, দেখিতে না পাইলেও তাহা তো ঘটনা এবং তাহার প্রাণপ্রদ স্পর্শেই তো তৃণ-গুল্ম-শস্যাদি পরিপুষ্ট হয়, গাছে গাছে পুষ্প বর্ণ-গন্ধে সতেজ হইয়া ফুটিয়া উঠে। শিশু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে কেমন করিয়া সারদাদেবীর নেপথ্য মাতৃশক্তি লালন করিয়াছে, রক্ষা করিয়াছে তাহার সংবাদ এখন অনেকেই অবগত আছেন। অবগত আছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য নরনারীর প্রতি তাঁহার সীমাহীন মমতা ও ভালবাসার সংখ্যাতীত কাহিনী। কিন্তু লীলাবিগ্রহ ত্যাগ করিবার পর সূক্ষ্ম দেহে এবং সূক্ষ্মভাবে দূর-দূরান্তে দেশে-

দেশান্তরে "শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের সেই নিজস্ব পাত্রটি" কিভাবে অগণিত মানুষের হৃদয় জুড়াইয়া চলিয়াছে, আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছে, তাহার ইতিহাস আমরা কতটুকু জানি? অথচ আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে সারদা-চন্দ্রের প্রভাব বিরাটভাবে বিস্তারলাভ করিতেছে। আবার ভারতবর্ষের সীমা ছাড়াইয়া বাংলাদেশ, জাপান, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, কানাডা, আমেরিকা, আফ্রিকা এমনকি 'লৌহ-যবনিকা'র অপর পারে সোভিয়েত রাশিয়া—সর্বত্র এখন অগণিত নরনারী সারদা-চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে বিধৌত হইতেছে। কিভাবে ইহা ঘটিল কেহই জানে না, কিন্তু হইতেছে। ইহা ঘটনা।

বড়ই মর্মস্পর্শী সেই কিরণ-বিস্তারের কাহিনী। কল্প-কথা নয়, সত্য ইতিহাস। দুই-একটি দৃষ্টান্ত হইতে কিছুটা বুঝা যাইবে কিভাবে সারদাদেবী তাঁহার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে। কয়েকমাস আগের কথা। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্রের গ্রন্থবিক্রয় বিভাগে একদিন বেলা এগারটা নাগাদ একজন রিক্সাওয়ালা আসিয়া একটি বই কিনিতে চাহিল। বইটির নাম সে বলিতে পারিল না। শুধু বলিল: "এইমাত্র একজন মহিলা আপনাদের এখান থেকেই বইখানা কিনে আমার রিক্সায় উঠেছিলেন। তাঁকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েই আমি এখানে এসেছি বইখানা কিনতে। বইটির উপরে একজন মহিলার শুধু মুখখানির বড় ছবি আছে। বইটির নাম কি আমি জানি না।" লোকটিকে 'শতরূপে সারদা' বইটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল সে এই বইটি খুঁজিতেছে কিনা। বইটি দেখিবামাত্র তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ব্যগ্রভাবে বলিল: "হ্যাঁ, বাবু, হ্যাঁ। এই বইটিই আমি কিনতে চাই। এটিই ঐ মহিলার হাতে আমি দেখেছিলাম।" বিক্রয় বিভাগের কর্মচারী বলিল: "বইটির দাম ষাট টাকা।" রিক্সাওয়ালাটি জানাইল তাহার কাছে মাত্র দশ টাকা আছে যাহা সে সেদিন তখন পর্যন্ত উপার্জন করিয়াছে। তাহার উপার্জনের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়াও বইটি সে কিনিতে পারিবে না জানিতে পারিয়া সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। বিষয়টি বিক্রয়-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি ঐ রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "আপনি এই বইটি নিয়ে কি করবেন? আপনি কি পড়তে পারেন?" রিক্সাওয়ালা বলিল: "না বাবু, আমি লেখাপড়া জানি না। তবে বাড়িতে আমার ছেলে আছে, সে লেখাপড়া জানে। সে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। আমি তাকে বলব, সে আমাকে পড়ে শোনাবে।" সন্ন্যাসী বলিলেন: "কিন্তু, আপনি কি জানেন বইটি কার সম্বন্ধে লেখা—উপরের ছবিটিই বা কার?" সে বলিল: "না, বাবু, আমি কিছুই জানি না। শুধু যে ভদ্রমহিলাকে আমি রিক্সা করে নিয়ে যাচ্ছিলাম তাঁর হাতে ঐ বইটি আমি দেখলাম। বইয়ের উপরের ছবিটি দেখার পর থেকে আমার মনটা কেমন আকুলি-বিকুলি করছে। ঐ ছবিটি দেখে আমার মনে হল ওটি আমার মায়ের ছবি। আমার মাকে আমি খুব ছোটবেলায় হারিয়েছি। মা আমার কেমন দেখতে ছিল আমি জানি না। আমার মনে হল, ওই আমার মা—ওটি আমার নিজের মায়ের ছবি। তাই ভদ্রমহিলাকে নামিয়ে দিয়েই আমি এখানে ছুটে এসেছি বইটি কিনব বলে। কিন্তু বইটির দাম ষাট টাকা, আমার কাছে আছে মাত্র দশ টাকা।" বলিতে বলিতে লোকটি ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসী তাহার কথায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কয়েক মুহূর্ত তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাহার পর তিনি লোকটিকে বলিলেন: "ভাই, আপনাকে টাকা দিতে হবে না। বইটি

আপনি এমনিই নিয়ে যান।” কিন্তু লোকটি বলিল: “বিনা পয়সায় আমার মায়ের বই কেন আমি নেব? আমার কাছে যা আছে তাই দেব আমি।” তাহার মিনতিতে সন্ন্যাসী তাহার ঐ দশটি টাকা লইতে বাধ্য হইলেন। সন্ন্যাসী বইটির সঙ্গে তাহাকে তাহার ‘মায়ের’ একখানি ছবিও উপহার দিলেন। বই ও ছবি পাইয়া লোকটির মুখে আনন্দ যেন উপচাইয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ বাহিয়া নামিতে লাগিল অবিরল ধারা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির স্থান পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশ। তখন বাংলাদেশ সবেমাত্র জন্মলাভ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য ভারত হইতে বাংলাদেশে গিয়াছেন। তাঁহারা একদিন জিপ গাড়িতে ঢাকা হইতে যশোহরের পথে চলিয়াছেন। রাস্তায় পিপাসা পাওয়ায় একটি চায়ের দোকানের সামনে তাঁহারা গাড়ি থামাইলেন। দোকানটি একজন মুসলমানের। সন্ন্যাসীরা চা খাইতে গিয়া দেখিলেন দোকানে একটি ছবি টাঙানো এবং ছবিটি সারদাদেবীর। দোকানে আর কোন ছবি নাই। কৌতূহলের বশে তাঁহাদের একজন মুসলমান দোকানদারটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: “এই ছবিটি কার জানেন?” দোকানদার বলিল: “কার ছবি তা জানি না।” “তাহলে ছবিটি এখানে রেখেছেন যে?”—সন্ন্যাসী বলিলেন। তাহার উত্তরে লোকটি যাহা বলিল তাহার সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত রিক্সাওয়ালা যাহা বলিয়াছিল তাহার আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। লোকটি বলিল: “আমার যখন চার বছর বয়স তখন আমার মা মারা গেছেন। মা কেমন দেখতে ছিল আমার কোন স্মৃতিই নেই। বড় হয়ে শুনতাম বন্ধুদের মুখে তাদের মায়ের কথা, দেখতাম তাদের মা তাদের কত ভালবাসে, আদর করে আমার খুব কষ্ট হত। কাঁদতাম একা একা কল্পনায় আমার মায়ের একটা মূর্তি গড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখতাম সেই মূর্তিকে। একদিন হঠাৎ একটা ক্যালেণ্ডার হাতে এল। তাতে ছিল এই ছবিটা—কার ছবি আমি জানি না, জানার ইচ্ছেও হয়নি। কারণ ছবিটি দেখেই আমার মনে হয়েছে—এই তো আমার সেই স্বপ্নে-দেখা কল্পনায় গড়া মা। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চেহারা! যে-মাকে আমি পেয়েও পাইনি, দেখেও যাঁকে দেখার কোন স্মৃতি আমার নেই, সেই মাকেই পেলাম ঐ ছবির মধ্যে। তাই পরের দিনই ছবিটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনে দোকানে টাঙিয়ে রেখেছি। ওঁকে দেখলেই আমার প্রাণ ভরে যায়। আমার মা, আমার হারিয়ে যাওয়া মা!” বলিতে বলিতে লোকটির চোখ দুইটি চিক চিক করিয়া উঠিল। দুই চোখের কোণে টল টল করিয়া কাঁপিতেছিল বড় বড় দুইটি জলের ফোঁটা!

তৃতীয় কাহিনীর স্থল আমেরিকার হলিউড—সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র ‘বেদান্ত সোসাইটি’। বছর পনের আগেকার কথা। একদিন সকালে সোসাইটিতে একজন উচ্চশিক্ষিতা মার্কিন যুবতী আসিয়াছেন। তিনি সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজীর দর্শনপ্রার্থী। দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট বসিবার ঘরে তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। সেদিন প্রভবানন্দজী সোসাইটির বাহিরে থাকায় সহকারী অধ্যক্ষ স্বামীজী মেয়েটির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া দেখেন, অদ্ভুত কাণ্ড! মেয়েটি ঐ ঘরে টাঙানো সারদাদেবীর ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছেন আর হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন। স্বামীজীকে দেখিয়া মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যগ্রভাবে বলিলেন: “কে উনি? আমি তো ওঁকেই সারা আমেরিকায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।” স্বামীজী বলিলেন: “কি ব্যাপার? কেন ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপনি?” মেয়েটি বলিলেন: “আমাকে

যে উনি প্রাই স্বপ্নে দেখা দেন, আর ওঁর ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। কি যে জাদু আছে ওঁর দুটি চোখে! আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছেন উনি আমি আমেরিকার কত জায়গায় গেছি ওঁর খোঁজে, ওঁর ছেলেদের খোঁজে। শেষে একজন আমাকে এখানকার ঠিকানা দিয়ে বললেন এখানে আমি ওঁর খোঁজ পেতে পারি। তাই আজ এখানে এসেছিলাম। কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার! আমায় বলুন ওঁর কথা, ওঁর পরিচয়।" অধীর ব্যগ্রতা তাঁহার চোখে-মুখে মূর্ত হইয়া উঠিল

চতুর্থ দৃষ্টান্তটি সোভিয়েত রাশিয়ার। সেখানকার একজন প্রবীণ বুদ্ধিজীবী, মার্কসীয় দর্শনে সুপণ্ডিত, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক-মনস্কতায় সমৃদ্ধ মানুষ—নাম ডঃ আর. বি. বিরাকভ। তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি হইবে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী। কিন্তু সেই গ্রন্থের বিরাট অংশ জুড়িয়া থাকিবেন—না, স্বামী বিবেকানন্দ নন, সারদাদেবী। কেন? তাহার উত্তর দিয়াছেন ডঃ বিরাকভ নিজেই একটি চিঠিতে। তিনি ঐ চিঠিতে রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে লিখিয়াছেন (৩০ নভেম্বর ১৯৮৬): "I have now an idea about my future book on Sri Ramakrishna. The idea is to start with Sarada Devi whom I consider to be one of the greatest, nay—THE GREATEST—if you permit me to say—achievement of Sri Ramakrishna in this world. She was an ordinary Indian village girl and he made her into an absolutely outstanding personality which for me is a **symbol of India herself.** Divine, yet human, a real woman, but saintly, the MOTHER has an irresistible appeal to me. She was so modest that only few could fathom her greatness while she was alive. But in my view she was the force and inspiration behind the whole Mission and behind Swami Vivekananda as well." [ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে আমার ভবিষ্যৎ গ্রন্থটি সম্পর্কে আমার একটি পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনাটি হইল গ্রন্থটি সারদাদেবীকে দিয়া শুরু করা, যিনি আমার ধারণায় বর্তমান পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, না—**সর্বশ্রেষ্ঠ** (যদি আমাকে বলিতে অনুমতি দেন) অবদান। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ভারতীয় পল্লীবালা, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অনন্যসাধারণ এক বিরাট ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। আমার কাছে তিনি **ভারতবর্ষের প্রতীক-স্বরূপা।** দেবী হইয়াও যিনি ছিলেন মানবী, সাধারণ নারী হইয়াও যিনি ছিলেন এক মহান সন্তসাধিকা, দুর্নিবার আমার কাছে সেই **মায়ের** আকর্ষণ তিনি এমন সাধারণভাবে থাকিতেন যে তাঁহার জীবৎকালে মুষ্টিমেয় কয়েকজন-মাত্র তাঁহার মহিমা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অথচ আমার বিবেচনায় তিনিই ছিলেন সমগ্র (রামকৃষ্ণ) মিশনের নেপথ্য শক্তি এবং প্রেরণা। শুধু মিশনই নয়, স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন শক্তি ও প্রেরণাস্বরূপা। ]

কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? হইয়াছে তাঁহার বিশ্বপ্লাবী মাতৃত্বের শক্তিতে। একখানি গানে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: "নিখিল-মাতৃহৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মুরতি।" সারদাদেবী আজ শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের (অথবা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের) অনুরাগী ভক্তবৃন্দের জননী নন, সেই পরিধির বাহিরে বহু

মানুষেরও তিনি জননী। বিশ্বের নানা প্রান্তের কত মানুষ যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী নন, অনেকে আবার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অবহিতও নন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই দেখি সারদাদেবীর জীবন হইতে অনুপ্রেরণা পাইতেছেন, তাঁহার ছবি দেখিয়া গভীর ও দুর্নিবার এক আকর্ষণ বোধ করিতেছেন। কেন ইহা হইতেছে? তাহার উত্তর আমরা পাইয়াছি পূর্বোল্লেখিত ঐ গানের পঙ্‌ক্তিটিতে। উচ্চ-বংশীয়-নিম্নবংশীয়, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভারতীয়-অভারতীয়, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া যেখানে যত জননী আছেন সকল জননীর হৃদয়কে মন্থন করিয়া, সকল জননীর হৃদয়ের স্নেহ-নির্যাসকে নিঙড়াইয়া লইয়া সকলের জন্য একটি সাকার বিগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই বিগ্রহের নাম সারদাদেবী। তাঁহার স্নেহের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। হিন্দু-মুসলমান, পারসিক-খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, উন্নত-অধঃপতিত, সাধু-তস্কর—তিনি ছিলেন সকলের মা। কেহই তাঁহার স্নেহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বিজাতীয় অথবা অধঃপতিত কোন পুরুষ অথবা নারীকে আশ্রয়দান অথবা স্নেহ করিবার জন্য, প্রভাবশালী ভক্ত অথবা নিকট-জনেরা তাঁহাকে সতর্ক করিলে, এমনকি অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করিতে চাহিলে 'গণ্ডিভাঙ্গা' জননী নিষ্কম্পকণ্ঠে বলিয়াছেনঃ আমি উহাদের লইয়াই থাকিব, উহারা আমার কাছে আসিবেই। ইহাতে যদি কাহারও আপত্তি অথবা অসুবিধা থাকে তাহা হইলে আমি নিরুপায়। যাহাদের আপত্তি অথবা অসুবিধা তাহারা প্রয়োজন মনে করিলে আমার সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে।

তিনি সচেতনভাবে কোন সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন নাই। কিন্তু তিনি এমন একটি জীবন যাপন করিয়াছিলেন যাহা নীরবে, লোকলোচনের অন্তরালে একটি মহাবিপ্লব সূচনা করিয়া চলিয়াছিল। শুধুমাত্র স্নেহের মন্ত্র দিয়া যে মানুষের চেতনার ঊর্ধ্বায়ন করা সম্ভব তাহা পৃথিবীকে দেখাইয়া দিয়াছেন সারদাদেবী। মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধ শান্ত কিরণের মতো তাঁহার দ্যুতি। কিন্তু সুরধুনীর মতো অপ্রতিরোধ্য গতিতে তাঁহার সর্বপ্লাবী মাতৃত্ব সমগ্র মানবজাতিকে একদিন সেই মহাসঙ্গমের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, যে মহাসঙ্গমের এক নাম শান্তি, আরেক নাম প্রেম। আবার সেই মহাসঙ্গমেরই অপর নাম সারদাদেবী। আমরা জানি অথবা না জানি, আমরা বুঝি অথবা না বুঝি, আমাদের জীবনে তিনি প্রবেশ করিতেছেন। নিবেদিতা তাই লিখিয়াছিলেনঃ "সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁহার সন্তানদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—যাহারা নিঃসঙ্গ, যাহারা নিঃসহায়।··· সত্যিই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তাহা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, গঙ্গার মধুরিমা—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।"

নীরব সেই মহাজীবন ক্রমেই বাঙ্ময় হইয়া উঠিতেছেন। কোনভাবেই তাঁহার প্রকাশকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁহার অপর নাম যে সত্য।

# স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া,
১০.৫.১৯১৯

প্রিয় অতুল,

সিদ্ধদাসের পত্রে অবগত হইলাম আমাদের পরম আত্মীয় প্রাচীন ভক্ত লালা বদ্রীসা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নিরাপদ পাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়াছেন। অবশ্য তাঁর বয়সও হইয়াছিল এবং অনেকদিন যাবৎ [ তিনি ] নানা রোগে ভুগিতেছিলেন এবং সাংসারিক নানারকম কষ্টে তাঁর মনও অতিশয় দুঃখিত থাকিত। যাহা হউক প্রভু দয়া করিয়া তাঁহার আত্মাকে তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি স্বামীজীর বহু সেবা করিয়াছেন এবং তিনি ( স্বামীজী ) তাঁহাকে বড়ই দয়া করিতেন এবং ভালবাসিতেন। আমরা প্রায় সকলেই অনেকদিন অনেক মাস তাঁহার আতিথ্যগ্রহণে কৃতার্থ হইয়াছি। ওরূপ হৃদয়বান লোক কুমায়ুনে আর দ্বিতীয় নাই। প্রভুতে বিশ্বাস, তাঁহার ভক্তদের সেবা তাঁহার জীবনের একটা ব্রত ছিল। কেবল প্রভুর ভক্ত নয়, সকল সাধুকেই তিনি সেবা করিতেন যথাসাধ্য। কেবল সাধু নয়, অভাবগ্রস্ত যে কেহ তাঁহার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করিত তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত এবং যথাসাধ্য অন্ততঃ কর্জ করিয়াও তাঁহার অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান পুণ্যবান ব্যক্তি দ্বিতীয় আর আলমোড়ায় বা সমস্ত কুমায়ুনে নাই। তাঁহার আত্মা আনন্দে প্রভুর পদে বিশ্রাম করিতেছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। গত বৎসর বারাণসীনিবাসী আমার পুরানো ভক্ত—নাম বাবু ভগবতীপ্রসাদ আলমোড়া যাইয়া কিছুদিন সাধন-ভজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নানা কারণবশতঃ [ তখন ] যাইতে পারেন নাই। এবার এই মে মাসে সম্ভবতঃ তিনি যাইতে পারেন। তোমাকে শীঘ্রই বোধহয় লিখিবেন। যদি তিনি যান, তাঁহাকে আশ্রমে একটু স্থান দিও এবং আহারাদির বন্দোবস্ত করিও। যেন [তাঁহার] কোন কষ্ট না হয়। অবশ্য খরচপত্র তিনি সব দিবেন। লোক খুব ভাল, তুমি তাঁহার সঙ্গে [ আলাপ করিয়া ] সুখী হইবে। ভক্তিমান, সরকারী ভাল কাজ করিতেন। সাব-ডেপুটি ইনস্পেকটর অফ্ স্কুলস্ ছিলেন। অবিবাহিত, বেশ পবিত্র চরিত্র, ত্যাগের দিকে খুব ঝোঁক। আহারাদির কোন হাঙ্গামা নাই। সাংসারিক অবস্থাও নেহাৎ মন্দ নয়।

জীবন কি ওখানে আছে ? তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ৺বদ্রীসাজীর শ্রাদ্ধ কিরূপ হইল ? সিদ্ধদাস তো একঘরে পুত্র এবং জ্ঞাতিরা সব কিরূপ ব্যবহার করিল বিস্তারিত সব লিখিও। এখানকার সংবাদ একপ্রকার প্রভুর ইচ্ছায় কুশল। Famine Relief কাজ খুব চলিতেছে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

# মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

## স্বামী ভূতেশানন্দ

মহাপুরুষ মহারাজের পূত জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলবার ইচ্ছা হয়। কিছু গুছিয়ে বলতে পারা যায় না। তাঁকে আমরা এত কাছে পেয়েছি যে গবেষণা করে তাঁর সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা কখনও করিনি, ইচ্ছাও হয়নি। শিশু তার মাকে যখন পায় মায়ের মূল্য বিচার করতে সে পারে না, করতে চায়ও না। আমরাও সেইরকম মহাপুরুষ মহারাজকে এত কাছে পেয়েছি যে তাঁকে বিচার করবার মনোভাব কখনও হয়নি। যখনই দেখেছি মুগ্ধ হয়েছি এবং নিঃশর্তভাবে তাঁর শরণাগত হবার ইচ্ছা হয়েছে।

তাঁর কাছে যখন থেকেছি তখনকার ছোট ছোট অনেক ঘটনাই মনে পড়ছে। বিচ্ছিন্নভাবে ঘটনাগুলো যেভাবে মনে আসছে সেইভাবেই বলব, সাজিয়ে গুছিয়ে নয়।

আমরা তখন মঠে আছি। একদিন মহাপুরুষ মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন: "আমাদের এইসব মঠ-মিশন করতে হবে এমন কথা কখনও ভাবিনি। ভাবতাম সাধন-ভজনে তন্ময় হয়ে থাকব। কিন্তু স্বামীজী আমাদের সেভাবে থাকতে দিলেন না। ঠাকুর যেমন স্বামীজীকে সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতে দেননি স্বামীজীও সেই-রকম চাননি যে তাঁর গুরুভায়েরা কেবলমাত্র ধ্যান-ভজনেই নিমগ্ন থাকবেন। সকলকে তাঁর কাজের সহযোগী করেছেন।" মহাপুরুষ মহা-রাজকে দেখেছি তাঁর যেন প্রতি পদে এই ভাব সর্বদা জাগ্রত থাকত যে তিনি ঠাকুরের কাজের জন্য দেহটি রেখেছেন। তিনি ঠাকুরের দাস। তাঁর একটি পোষা কুকুর ছিল। তাকে দেখিয়ে বলতেন: "এটা (অর্থাৎ কুকুরটা) এর (অর্থাৎ নিজের) কুকুর, আর এটা (অর্থাৎ নিজে) ওঁর (অর্থাৎ ঠাকুরের) কুকুর।"

মহারাজ ঘুম থেকে উঠতেন খুব ভোরে। তারপর মুখ হাত ধুয়ে পুরনো ঠাকুরঘরে বসে ধ্যান করতেন। তখন বড় মন্দির হয়নি, পুরনো ঠাকুরঘরেই সকলে ধ্যান করতেন। মহাপুরুষ মহারাজ বসেছেন, আমরাও সেখানে বসেছি। তিনি না ওঠা পর্যন্ত উঠতে সঙ্কোচবোধ হত। পা টন্‌টন্ করুক, মন ততটা নিবিষ্ট হোক বা না হোক, বসে থাকতাম। তিনি উঠে গেলে আমরা যে যার কাজে যেতাম। তিনি ঘরে গিয়ে সব বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। কেউ অসুস্থ থাকলে তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হয়েছে সে খবর জানতেন। ঠাকুরসেবার কি ব্যবস্থা হচ্ছে ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসা করতেন। ডিস্পেনসারির ডাক্তার আসতেন। তাঁর কাছে অসুস্থ সাধুদের কথা এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে কারও অসুখ থাকলে কে কেমন আছে, কার জন্য কি ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা হয়েছে সব ঘরে বসেই জেনে নিতেন। এরপর তিনি মঠের চারিদিকে বেড়াতেন, গোয়ালে যেতেন। যে ব্রহ্মচারী গোয়াল দেখতেন তাঁর কাছে গরুগুলির খবর নিতেন। গোসেবা করেন বলে সেই ব্রহ্মচারীকে বিশেষ স্নেহ করতেন। ঠাকুরসেবা থেকে আরম্ভ করে সাধুসেবা, গোসেবা, অতিথি-সেবা, প্রতিবেশীদের সেবা সব দিকেই তাঁর খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

সর্বদা ধ্যানতন্ময় হয়ে থাকা মহাপুরুষ মহা-রাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। একদিনের ঘটনা। তিনি চলতে চলতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন, মঠের এক সাধু সেইসময় তাঁকে প্রণাম করতে

গিয়েছেন। ঠিক তখনই মহাপুরুষ মহারাজ আবার চলতে আরম্ভ করেছেন। সামনে বাধা, তিনি পড়ে গেলেন, হাতে আঘাত লাগল। সাধুটিকে ভৎ'সনা করলেন। তারপর ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করছেন। শুয়ে শুয়ে সেবককে বললেন: "আমি ওকে বকলাম; কিন্তু ওর তো কোন দোষ নেই। ও কি করে জানবে যে আমি তখন কিছু দেখছিলাম না।" চোখ চেয়ে আছেন অথচ কিছু দেখছেন না, এ সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে? সমাধির কথা আমাদের শোনা ছিল; কিন্তু ওঁদের জীবনে তা প্রত্যক্ষ করেছি।

ঠাকুরসেবার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ঠাকুর ভোরবেলায় উঠে ভগবানের নাম করতেন। মহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশ ছিল ভোর চারটেয় যেন ঠাকুরঘর খোলা হয়। হতও তাই। একদিন পূজারীর উঠতে একটু দেরি হয়েছে। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘর থেকে লক্ষ্য করেছেন যে ঠাকুরঘর খোলা হয়নি। তিনি নিজে উঠে ঠাকুরঘর খুলে মঙ্গল-আরতি করলেন। এদিকে পূজারী তখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। তিনি তাঁকে কিছু বললেন না। কিন্তু পূজারীর জীবনের মতো শিক্ষা হয়ে গেল যে ঠাকুরসেবার জন্য কত-দূর নিষ্ঠা দরকার। তিনি বলতেন: "ঠাকুরকে আপনার মনে করে, তিনি সাক্ষাৎ আছেন এইটি জেনে তাঁর সেবা করবে।" নিজের দৈনন্দিন সমস্ত কাজও তিনি এই সেবাবুদ্ধিতে করতেন।

ভক্তেরা কেউ তার দুঃখ-বেদনার কথা বললে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ত। তাদের উপর এমনই তাঁর সহানুভূতি ছিল, সমবেদনা ছিল। দূর থেকে দেখে অনেকে তাঁকে ভয় করত। আমাদের তাঁর খুব কাছে যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। দেখেছি কঠোরতা তাঁর বাইরের আবরণমাত্র; ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল। মায়ের মতো স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছে।

তাঁর অসাধারণ সংযম ছিল। তেলমশলা-বর্জিত একটা বিস্বাদ বস্তু তাঁর খাদ্য ছিল। তাঁর গুরুভাইরা পরিহাস করে বলতেন 'মহাপুরুষের ঝোল'। ঠাকুরের প্রসাদ তাঁকে সব সাজিয়ে দেওয়া হত। তিনি একটু একটু জিভে ঠেকাতেন, ঠেকিয়ে বলতেন: "বাঃ বেশ হয়েছে!" কিছুতেই কোন বিলাসের জিনিস তিনি স্পর্শ করতেন না। একবার এক ভক্ত মাদ্রাজ থেকে তাঁর জন্য দামী গরম-জামার কাপড় পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি বিরক্ত হলেন। তারপরে যখন শুনলেন জামা তৈরি করতে দশ টাকা লাগবে, তখন খুব রেগে গিয়ে বললেন: "দশটাকা খরচ পড়বে? কাপড় ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।" শীতের সময় তুলোর জামা পরতেন। ভক্ত সিল্কের কাপড় দিয়ে তুলোর জামা করে পাঠালে তাতেও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: "ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।"

তখন তিনি খুব অসুস্থ। ডাক্তার বললেন, হাওয়া বদলাবার জন্য দার্জিলিং-এ নিয়ে যেতে। ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে সে প্রস্তাব করা হল। বললেন: "যাদেরই অসুখ করে সবাই দার্জিলিং-এ যায় নাকি?" গেলেনই না। অনেক চেষ্টায় একবার এক ভক্ত তাঁকে মধুপুরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ির অনেকটা অংশ তিনি সাধুদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি থাকতেন বলে বহু সাধু সেখানে গিয়ে হাজির হতেন; কিন্তু মহারাজ লক্ষ্য রাখতেন গৃহস্থের পক্ষে বোঝা না হয়। কাজেই কেউ গেলে একদিন পরেই তিনি তাঁকে বিদায় দিতেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, সেবা করবার সময় তিনি দেখতেন সেবকদের যেন কষ্ট না হয়। তাঁর শরীর স্থূল ছিল, মাংসপেশী বেশ শক্ত, সেবা করতে হলে বেশ জোর লাগত। একদিন গরমের সময় তাঁর পা মাসাজ করছি। একসময় আমার শরীর থেকে এক ফোঁটা ঘাম তাঁর পায়ে পড়েছে।

তিনি টের পেয়ে বলে উঠলেন: "তোমার কষ্ট হচ্ছে খুব, ঘেমে গিয়েছ।" বললাম: "না মহারাজ, ঘামটা কষ্টের নয়, গরমের জন্য।" অনেক করে বুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করা হল। তাঁর চিকিৎসক কলকাতায় থাকেন, সেখান থেকে ওষুধ আনতে গিয়েছি একদিন বিকালে। ডাক্তার বাড়ি ছিলেন না। অপেক্ষা করে ওষুধ নিয়ে ফিরতে দেরি হয়েছে। তখন বেলুড় মঠে যাতায়াতের বাস ছিল না, রাস্তায় আলো থাকত না। মঠে ফিরতেই একজন বললেন: "শিগগির যাও, মহাপুরুষ মহারাজ বারবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছেন।" আমি ছুটতে ছুটতে গেলাম। বললেন: "তোমার এত দেরি হল কেন?" আমি কারণ জানালে বিরক্তির সঙ্গে বললেন: "যে-ডাক্তারের ওষুধ আনতে সাধুদের এরকম ভুর্ভোগ, আর তার ওষুধ খাব না।" মহা মুশকিল! ঐ ডাক্তারের ওষুধেই তাঁর উপকার হয়েছে, আর খাব না বলে যদি জিদ ধরেন তাহলে কারো সাধ্য নেই তাঁকে রাজী করাবে। কাজেই সেই ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি খবর পাঠান হল। তিনি শশব্যস্ত হয়ে এসে হাজির। করজোড়ে বললেন: "মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করবেন।" "তুমি এরকম করে সাধুদের ভোগাচ্ছ কেন? তুমি কি ওষুধ তৈরি কর? যা দরকার বলে দিও আমরা বাজার থেকে কিনে আনব।" ডাক্তার বললেন: "মহারাজ, সবই হয় জানি, তবে আমাকে দয়া করে এই সামান্য সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না—এইটুকু প্রার্থনা।" তিনি আশুতোষ, সব ভুলে গেলেন। কখন কখন এইরকম রাগ হলেও তাঁকে পরিষ্কার করে বললে শান্ত হয়ে যেতেন। খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। নিজে সকলকে স্পষ্ট কথা বলতেন, অপরের কাছ থেকেও সেইরকম স্পষ্ট কথা আশা করতেন। 'হয়তো', 'বোধহয়', এই ধরনের কোন অস্পষ্ট কথা পছন্দ করতেন না।

মহাপুরুষ মহারাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মঠে পড়াশুনা, শাস্ত্রচর্চায় উৎসাহ দিতেন। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রেও তাই। ঠাকুর যেমন তাঁদের দিয়ে সাধন-ভজন করাতেন তেমনি তাঁরাও আবার চাইতেন আমরা সকলে সেইভাবে ভাবিত হই।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। সেইসময় হিমালয় বা বাইরে কোথাও তপস্যায় যাবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়েছে; কিন্তু সেকথা তাঁকে জানাতে সাহস হচ্ছে না। তাই ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। একদিন একা তাঁর ঘরে মাস্সাজ করছি, ঐ ইচ্ছেটা খুব তোলপাড় করছে মনের ভিতর। বললাম: "মহারাজ, আমার মনে একটা সংশয় এসেছে। এখানে আপনার কাছে আছি এই সৌভাগ্য অনেকেরই জীবনে হয় না, কতদিন আর এ সুযোগ পাব জানি না; কিন্তু তপস্যায় যাবার জন্যও মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করছি।" শুনেই তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বললেন: "যাবে বৈকি, নিশ্চয় যাবে, নিশ্চয় যাবে। তবে যাবার আগে খুব জপধ্যান করে জমিয়ে নাও। তা না হলে গিয়ে ভাল হয় না।" তারপর থেকে প্রায়ই বলতেন: "তুমি কোথায় যাবে আমি ভাবছি। তুমিও ভাব। তোমার শরীর তো ভাল নয়। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে তোমার পথ্যের ব্যবস্থা হতে পারে।" তারপরে একদিন বললেন: "কাশী যাও। সেবাশ্রম আছে, দরকার হলে তোমার প্রয়োজনীয় পথ্য সেখানে পাবে।" তাঁর ইচ্ছামত সেখানে গেলাম। তবে এ-ব্যাপারে আগ্রহ আমার চেয়ে তাঁরই ছিল বেশি। যাওয়ার আগে যে-কয়দিন মঠে ছিলাম সে-কয়দিন প্রত্যহ বলতেন: "জপধ্যান ভাল করে হচ্ছে তো?" একথাও বললেন যে, "সাধন-ভজন কিছুদিন করবে, তারপরে আবার ফিরে আসবে।

একটানা বেশিদিন বাইরে থাকা ভাল নয়, তাতে ভাবের হানি হয়।"

এর অনেকদিন পরের কথা। উত্তরকাশীতে আছি। ওখানে সাধুদের কুঠিয়ার অভাব। কুঠিয়া করবার জন্য একজন সাধু টাকা পাঠাতে চাইছেন। ওখানে সাধু যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমাকে এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বলায় মহাপুরুষ মহারাজকে জানালাম সেকথা। উনি উত্তর দিলেন : "এখানে আমাদের অনেক জায়গায় ঘর-বাড়ি হচ্ছে। এসব করতে হলে এখানে চলে এস। আর ওখানে যখন থাকবে তখন 'পরগৃহে সুখী সর্পবৎ' তাঁর উপরে নির্ভর করে নিরালম্ব হয়ে থাকবে; ঘরদোর করার দরকার নেই।" আর একবার আমার কাশী গিয়ে শাস্ত্রচর্চা করবার ইচ্ছা হওয়ায় সেকথা ওঁকে জানালাম। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন : "কতকগুলো ব্যাকরণ-চচ্চড়ি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে যদি বেদান্তের চর্চা করতে চাও মঠে ভাল পণ্ডিত আছেন, সেখানে চর্চা করা ভাল।" তাঁর কথায় আমার সঙ্কল্পের পরিবর্তন হল।

একবার আমার খুব অসুখ। মঠে আছি। তিনি আমার জন্য বিশেষ বিশেষ পথ্য করিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর জন্য ম্যাঙ্গোস্টিন আসত। এদেশে সেটা দুষ্প্রাপ্য। আমার পক্ষে সেটা সুপথ্য ছিল। খুব ভাল লাগত খেতে। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর নিজের ম্যাঙ্গোস্টিন পাঠিয়ে দিতেন আমার জন্য।

আর একবারও আমার খুব বাড়াবাড়ি অসুখ হয়েছে। সেইসময় মঠের ম্যানেজার গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন : "ও বোধহয় বাঁচবে না, কোন চিকিৎসায় কাজ হচ্ছে না। ডাক্তার বলেছেন তাঁর আর করবার কিছু নেই।" বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। মহাপুরুষ মহারাজ কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন : "ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে।" তাঁর কৃপায় সেবার সেরে উঠলাম। প্রত্যেকের জন্যই ছিল তাঁর গভীর দরদ, আন্তরিক স্নেহ। যাঁরা তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা সকলেই তা অনুভব করেছেন।

তিনি দীক্ষা দিতেন যে আসত তাকেই, কাকেও বঞ্চিত করতেন না। এমনকি যেদিন দীক্ষার্থী থাকত না, ব্যাকুল হয়ে বলতেন : "তাঁর নাম নেবার জন্য আজ কেউ এল না?" মন্ত্রও তিনি যাকে যেরকম প্রয়োজন মনে করেছেন দিয়েছেন। শাস্ত্রীয় মন্ত্র সবসময় দেননি। এমনও হয়েছে যারা সংস্কৃত জানে না তাদের তিনি ঠাকুরের একটি নাম দিতেন। তাথেকেই তাদের যথেষ্ট প্রেরণালাভ ঘটত। দীক্ষা শুধু মন্ত্র দেওয়া নয় দীক্ষার্থীর ভিতরে শক্তি দেওয়া, প্রেরণা দেওয়া, তার ভার নিয়ে তাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এটি তিনি অদ্ভুতভাবে করতেন। একজন ভক্তের সাধু হবার ইচ্ছা। তাঁকে কিন্তু মহারাজ সম্মতি দিলেন না। তবু ভক্তটি ছাড়বে না। তিনি যখনই গিয়েছেন মহারাজ ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম : "আপনি আর চেষ্টা করবেন না, মহাপুরুষ মহারাজ যখন অসম্মত হয়েছেন তখন আর মত দেবেন না।" পরে বোঝা গেল মহারাজ ঠিকই করেছিলেন। ভক্তটির পরবর্তিকালে মাথার গোলমাল হয়।

আমরা মহাপুরুষ মহারাজের চরণপ্রান্তে থেকে বুঝেছি, তাঁদের কৃপা সর্বত্র এবং সর্বদা প্রসারিত। ঠাকুরের স্থূলদেহ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের যেমন শেষ হয়নি তেমনি তাঁর পার্ষদদেরও কাজ শেষ হয়নি। তাঁরা সূক্ষ্মদেহে থেকে এখনও সর্বত্র ঠাকুরের ভাবের প্রসার করছেন, আমাদের আশীর্বাদ করছেন। তাঁদের আশীর্বাদ আমরা যেন গ্রহণ করতে পারি সেই যোগ্যতা যেন আমরা অর্জন করি।*

* গত ২৭. ১২. ১৯৮৬ তারিখে বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

# স্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীমায়ের শরৎ

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের কয়েকজন যখন বরানগর মঠে বিরজাহোম করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে 'সারদানন্দ' এই সন্ন্যাস-নামটি দিয়েছিলেন। কালে এই নামকরণের তাৎপর্য এবং তার পরিপূর্ণ সার্থকতা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

অনেক বছর পরের কথা।

স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে নিচের ঘরে বসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখছেন। শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য শ্রীশচন্দ্র ঘটক উপরে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে নিচে এসে স্বামী সারদানন্দকে প্রণাম করলেন। শরৎ মহারাজ প্রশ্ন করলেন: "মাকে প্রণাম করে আসছ, আবার আমাকে এত বড় প্রণাম কেন? আমার কী বৈশিষ্ট্য আছে?" অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমার আর এক মন্ত্রশিষ্য সুরেন্দ্রকান্ত সরকার বলেছিলেন: "সে কী মহারাজ, আপনাকে করব না তো কাকে করব?" শুনে শরৎ মহারাজ বলেছিলেন: "তুমি যাঁর কাছে যাও, যাঁর কৃপা পেয়েছ—আমিও তাঁর মুখ চেয়ে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এখনই আমার এই আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।" শ্রীশচন্দ্র কিন্তু একেবারে অন্যভাবে উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন: "আপনার নামটি বড় সুন্দর।" একেবারে অন্তরের কথা! নামের অধিকারী শুনে প্রসন্ন হয়েছেন।

শরৎচন্দ্র যেন বিধাতার অদৃশ্য অমোঘ নির্দেশে এ-নামটি পেয়েছেন। নামটি যে তাঁর কত প্রিয়, কত যে গভীর অর্থবহ—পরে সারদানন্দজী তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করার সময় থেকেই শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে এলেও, তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করলেও বা তাঁর যথাযোগ্য সেবা করলেও, তাঁর 'অন্তরঙ্গ'-রূপে ভূমিকা—'মায়ের ভারী' আখ্যায় শ্রেষ্ঠ পরিচয়ের সম্ভাবনার কথা 'স্বামী সারদানন্দ' এ নামকরণের সময় তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

উত্তরজীবনে তাঁর এই বিশেষ ভূমিকার মূলে ছিলেন স্বামী যোগানন্দ—যোগীন মহারাজ। শরৎ মহারাজ একবার তাঁকে বলেছিলেন: "যোগীন, নরেনের সব কথা তো বুঝতে পারি না; কত রকম কথা বলে—যখন যেটাকে ধরবে, তখন সেটাকে এত বড় করবে যে, যেন অপরগুলো একেবারে ছোট হয়ে যায়।" যোগীন মহারাজ তখন উত্তর দিয়েছিলেন: "শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর। তিনি যা বলবেন, তাই ঠিক।"

শরৎ মহারাজ তারপর মাকেই ধরেছেন। অথবা শ্রীশ্রীমাই তাঁকে বেছে নিয়ে আপন করে নিয়েছেন। অবশ্য মাতৃহৃদয়ের কাছে সন্তানমাত্রেই স্নেহের অধিকারী। "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা"—তাঁরই মুখের কথা। তাঁর দৃষ্টিতে "আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।" —আমজদ জয়রামবাটীর কাছেই শিরোমণিপুর গ্রামের এক তুঁতে-মুসলমান, চুরি-ডাকাতি করার জন্য কুখ্যাত—শ্রীশ্রীমার এই উক্তির সময় সে তাঁর বাড়ির দেওয়াল তৈরি করছে।

তবু এই নির্বাচিত সন্তানটির অসামান্যতার কথা শ্রীশ্রীমা স্বীকার করেছেন, নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কাশীতে কিছুকাল থাকার সময় একদিন নিজেই তাঁর কলকাতায় থাকার কথায় স্বামী অরূপানন্দকে বলেছেন: "শরৎ যে-কদিন আছে, সে-কদিন আমার ওখানে থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না। যোগীন ছিল। কৃষ্ণলালও

আছে, ধীর, স্থির—যোগীনের চেলা।…শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে। শরৎ হচ্ছে আমার ভারী। রাখাল, শরৎ-টরৎ এরা সব আপনার শরীর থেকে বেরিয়েছে।"

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপিত হবার পর স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দকে সঙ্ঘের সম্পাদক নির্বাচন করেছিলেন। সে গুরুদায়িত্বের ভার তিনি আজীবন বহন করে গেছেন—কেবল নিষ্ঠার সঙ্গে নয়, অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে। মঠ-মিশনের কাজে তাঁকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়েছে; বিশেষতঃ সঙ্ঘ-পরিচালনগত বা বৈষয়িক কোন ব্যাপারে যখনই কোন সমস্যা এসেছে, তাঁকেই তার সমাধানের জন্য এগিয়ে যেতে হয়েছে। এছাড়া 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনার মতো অসাধারণ কাজ, স্বামীজীর গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ, 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা, ঠাকুরের ক্রমবর্ধমান ভক্তগোষ্ঠির সঙ্গে সংযোগ রাখা বা আরও অসংখ্য কাজ তো ছিলই। সেসবের একাংশ করলেও যে-কোন ব্যক্তিকে কর্মবীর আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু এসব কাজ ছাপিয়ে যেটি তাঁর জীবনে মুখ্য হয়ে উঠেছে, সেটি শ্রীশ্রীমায়ের সেবা।

এই সেবা পরিচর্যামাত্র নয়—শ্রীশ্রীমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, পরিতৃপ্তির জন্য সর্বতোমুখী ব্যবস্থা, তিনি (শ্রীশ্রীমা) স্বেচ্ছায় বা দয়াবশে যেসব কাজের ভার দিয়েছেন সেগুলি সুসম্পন্ন করা।

জননী শ্যামাসুন্দরী লোকান্তরিত হবার পর শ্রীশ্রীমার ভায়েরা পৃথগন্ন হতে চাইলে স্বামী সারদানন্দ নিজে জয়রামবাটী গেছেন। বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার দুরূহ কাজ তিনি পরিশ্রম বা তদারকি ছাড়াও যথেষ্ট ধৈর্যসহকারে সম্পন্ন করেছেন। কাজটি দুরূহই, কেননা মামাদের অর্থাৎ শ্রীশ্রীমার সহোদরদের সকলকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

এই ঘটনার আগে তিনি বিভিন্নসূত্রে ঋণ সংগ্রহ করে (অক্লান্ত পরিশ্রম করে তো বটেই) কলকাতার বাগবাজারে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' তৈরি করিয়েছেন। ছোট বাড়ি হলেও শ্রীশ্রীমা এখানে স্বাধীন হয়ে স্বচ্ছন্দভাবে থাকতে পারবেন। এর আগে শ্রীশ্রীমা কলকাতায় এলে কোন ভক্তের নিবাসে বা ভাড়াবাড়িতে তাঁকে থাকতে হত। সহনশীলা জননী অবশ্য কোনদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেননি, কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ সন্তান তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন। ভায়েদের বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়ে শ্রীশ্রীমা কলকাতায় নিজের বাড়িতে এসে স্বস্তিবোধ করেছেন।

পরে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার নতুন বাড়ি হবার পর তাঁর ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর নামে অর্পণনামা লিখে বেলুড় মঠের ট্রাস্টীদের উপর পরিচালনার ভার দেওয়ারও ব্যবস্থা স্বামী সারদানন্দ করেছেন। শ্রীশ্রীমার আবাল্য সেবক স্বামী ঈশানানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় এই অর্পণনামার দলিল রেজিস্ট্রি করানোর জন্য কোতুলপুর থেকে সাব-রেজিস্ট্রারকে আনিয়ে তাঁকে বিশেষভাবে আপ্যায়নের বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনার শেষাংশ—

"শরৎ মহারাজ রেজিস্ট্রারকে কিছু জলযোগ করাইয়া পালকিতে তুলিয়া দিলেন ও তাঁহার সহিত একটু অগ্রসর হইয়া রওনা করাইয়া দিলেন। মহারাজ এক গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করিয়া যেন মনে মনে স্বস্তি ও আনন্দবোধ করিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া আমাদের কিন্তু অনেকেরই প্রথমে একটু অস্বস্তি-বোধ হইতেছিল, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীমায়ের কাজ মান-অভিমান ত্যাগ করিয়া ঐরূপ একনিষ্ঠভাবেই করিতে হয়।"

শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে থাকতেন, তখন তিনি নিজেই সব কিছু করতেন বা করিয়ে নিতেন—অল্পবয়সী জনা দুই-তিন সাধু বা ব্রহ্মচারী

তাঁকে সাহায্য করতেন এইমাত্র। কিন্তু কলকাতায় দায়দায়িত্বের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের বর্ণনার অংশ :

"শ্রীশ্রীমা যখন কলিকাতাদি স্থানে গমন করিতেন তখন রাধু ও তাহার গর্ভধারিণী ব্যতীত নলিনী, মাকু, ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেব, প্রতিবেশিনী ভানুপিসী প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন; ক্বচিৎ কোন ভ্রাতৃবধূ সন্তানাদিসহ দলবৃদ্ধি করিতেন; আবার শ্বশুরকুলের আত্মীয়েরাও সময়ে সময়ে আসিয়া দুই-চারিদিন তাঁহার কাছে অবস্থান করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বিরাট ভক্ত-সংসারও গড়িয়া উঠিতেছিল; দেশে বা কলিকাতায় বা অন্যত্র যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, প্রবাহাকারে ভক্তগণের ভিড় লাগিয়াই থাকিত।

"শ্রীশ্রীমায়ের সেবা বলিতে প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সকলেরই সেবা—ইহাদের সকলের তত্ত্বাবধান এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও মনস্তুষ্টি-বিধান। মহা-শক্তিধর আধিকারিক পুরুষ ব্যতীত অপর কেহই এ-কাজের যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন না। স্বামী সারদানন্দ এই গুরু দায়িত্ব বহন করিবার শক্তি ও অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

নিজে বলেছেন: "ছেলে যোগেন আমার খুব সেবা করেছে; তেমনটি আর কেউ করতে পারবে না। পারে কেবল শরৎ। ছেলে যোগেনের পর থেকেই শরৎ করছে। আমার ঝক্কি পোয়ান বড় শক্ত, মা। শরৎ ছাড়া আর কেউ আমার ভার নিতে পারবে না।…দু-চার দিন সবাই করতে পারে। আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া আর কেউ আমার ভার নিতে পারে এমন তো দেখিনি। সে আমার বাসুকি, সহস্রফণা ধরে কত কাজ করছে, যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।" অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছেন: "শরৎ আমার মাথার মণি। সে যা করবে তাই হবে।"

কিন্তু নিরভিমান সন্তান নিজেকে শ্রীশ্রীমার সেবক-দাস ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। মায়ের 'ভারী' 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'র 'দ্বারী'—দারোয়ান বলে নিজের পরিচয় দিতেন। 'স্বামী সারদানন্দের জীবনী'তে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর অভিমানশূন্যতার নিদর্শনস্বরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

"সুরেন্দ্রনাথ রায় নামে মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এক যুবা হ্যারিসন রোড হইতে সপ্তাহে একবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিত। একদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় পায়ে হাঁটিয়া ও ঘামিয়া সে আসিয়াছে, সরাসরি উপরে চলিয়া যাইবে এমন সময় দেখিতে পাইল, স্বামী সারদা-নন্দ সিঁড়ির নিচে দাঁড়াইয়া আছেন। 'এখন মার কাছে যেতে দেব না, তিনি এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরচেন'—এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া সে আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, তাঁহার বিশাল দেহে এক ধাক্কা দিয়া 'মা কি একা আপনার?' বলিয়াই উপরে যাইতে উদ্যত হইল। মহারাজ একপাশে সরিয়া গেলেন। কিন্তু উপরে যাইয়া মাকে প্রণাম করিতেই যুবকটির মন কেমন হইয়া গেল এবং নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া সে কহিল, 'মা আজ এক মহা অন্যায় করে ফেলেচি, আমার কি হবে?' মাদুর পাতিয়া বসিতে দিয়া মা পাখা লইয়া হাওয়া করিতে গেলেন, কিন্তু সে পাখাখানি টানিয়া লইয়া নিজেই হাওয়া করিতে ও কৃতাপরাধের কথা বার-বার ব্যক্ত করিতে লাগিল। মা বলিলেন, 'অপরাধ কি বাবা, ছেলের আবার অপরাধ কি? আচ্ছা, আমি শরৎকে বলে দেব সে যেন তোমার উপর খুশি হয়।' সিঁড়ি দিয়া সসঙ্কোচে নামিতে নামিতে কেবলই সে ভাবিতেছিল, আজ শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা না হইলেই বাঁচি।

শরৎ মহারাজ কিন্তু সিঁড়ির নিচে পূর্ববৎ দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাহাকে দেখিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছিলেন। সে প্রণাম করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতেই তিনি হাতে ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন ও বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'অপরাধ আবার কি? এমন ব্যাকুল না হলে কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়?' " (এই ঘটনার বর্ণনা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' দ্বিতীয় ভাগে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিচারণেও পাওয়া যায়।)

শ্রীশ্রীমার সেবাও শরৎ মহারাজ যেন মাতৃভাবে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হয়ে করেছেন—বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমা যখনই অসুস্থ হয়েছেন তখনই তাঁর এই ভাবটি ফুটে উঠেছে। শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথায় স্বামী ঈশানানন্দ লিখেছেন যে কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমা অসুখের ঘোরে মাঝে মাঝে 'শরৎ, শরৎ' বলে প্রিয় সন্তানকে খুঁজলে তাঁকে পত্র দেওয়া হয়। ডাঃ কাঞ্জিলাল, যোগেন-মা, গোলাপ-মা প্রভৃতিকে নিয়ে বিষ্ণুপুর হয়ে গরুর গাড়িতে এসে শরৎ মহারাজ কোয়ালপাড়ায় পৌঁছে জামাকাপড় না ছেড়েই একেবারে শ্রীশ্রীমার কাছে গেছেন। "মায়ের জ্বর তখন খুব বাড়িয়াছে হাত-পা জ্বালার জন্য তিনি ছটফট করিয়া হাত বাড়াইতেছেন। ততটা হুঁশ নাই। ইহা দেখিয়া শরৎ মহারাজ গায়ের জামা খুলিয়া বিছানার একপাশে পা ঝুলাইয়া বসিলেন। মা মহারাজের পিঠে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, 'আঃ, আমার সমস্ত দেহটা ঠাণ্ডা হল। শরতের গাটি যেন পাথর।' শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'এই তো, মা, আমরা সব এসে পড়েছি। এখন আপনি সেরে উঠুন।' মা বলিতেছেন, 'হ্যাঁ বাবা, কাঞ্জিলাল ডাক্তারের একটু ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাব।' এই শুনিয়া শরৎ মহারাজের ও আমাদের সকলের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল।"

সরলাবালা দেবী (পরবর্তিকালে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) শ্রীশ্রীমার লীলাসংবরণের আগে কয়েক বৎসর সেবিকারূপে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীশ্রীমার শেষ অসুখের সময়কার বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন : "ঐ সময়ে মায়ের স্বভাবটি একেবারে পাঁচ বছরের বালিকার মতো হইয়া গিয়াছিল। একদিন রাত্রি বারটার সময় খাওয়াইতে গেলে বায়না ধরিলেন, 'আমি খাব না। তোর একই কথা, মা, খাও, আর বগলে কাঠি লাগাও।' মা খাইতেছেন না দেখিয়া বলিলাম, 'তবে কি, মা, মহারাজকে ডাকব?' অনেক সময় মহারাজের নাম করিলে তিনি খাইতেন। কিন্তু এবার একেবারেই খাইতে নারাজ হইলেন। বলিলেন, 'ডাক্ শরৎকে, আমি তোর হাতে খাব না।' মহারাজ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি মার কাছে আসিলেন। মা মহারাজকে বসাইয়া বলিলেন, 'একটু হাত বুলিয়ে দাও তো, বাবা' এবং তাঁহার হাত দুখানি লইয়া বলিতেছেন, 'দেখ না বাবা, এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে। খালি খাও, খাও এদের রব, আর জানে খালি বগলে কাঠি দিতে। তুমি ওকে বলে দাও যেন বিরক্ত না করে।' মহারাজ বলিলেন, 'না মা, ওরা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।' এই রকম সান্ত্বনা দিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, এখন কি একটু খাবেন?' মা বলিলেন, 'দাও'। মহারাজ আমাকে খাবার লইয়া আসিতে বলিলেন। মা এই কথা শুনিয়াই বলিলেন, 'না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, আমি ওর হাতে খাব না।' ফীডিং কাপে দুধ ঢালিয়া মহারাজের হাতে দিলাম, তিনি কোন রকমে একটু খাওয়াইলেন এবং বলিলেন, 'মা, একটু জিরিয়ে খান।' শুনিয়াই মা বলিলেন, 'দেখ তো, কি সুন্দর কথা—মা, একটু জিরিয়ে খান। এ কথাটা আর ওরা বলতে জানে না? দেখ তো, বাছাকে এই রাতে কষ্ট দিলে। যাও বাবা, শোও গিয়ে' বলিয়া

গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। পরে মহারাজ মশারি ফেলাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এখন আসি মা।' মা বলিলেন, 'এস বাবা, বাছার কত কষ্ট হল।"

উদ্বোধন কার্যালয়ের কর্মী চন্দ্রমোহন দত্ত একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলেন: "মা, আপনার পায়ে আমার হাতখানা বুলিয়ে দি।" মা বললেন: "আমার পায়ে হাত বুলোতে হবে না। আমার শরতের পায়ে হাত আমার পায়ে হাত বুলোনো হবে। যে আমার শরতের পায়খানা সাফ করবে তার ব্রহ্মজ্ঞান হবে।"

মুণ্ডকোপনিষদে ( ৩।১।১০-৩।২।১ ) আছে:

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ ॥
স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥

স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত অনুবাদ:

নির্মলান্তঃকরণ আত্মবিদ্ পুরুষ যে যে লোক বিষয়ে মনের দ্বারা সঙ্কল্প করেন এবং তিনি যে-সকল ভোগ প্রার্থনা করেন, সেই সকল লোক ও সেই সকল ভোগই প্রাপ্ত হন। সুতরাং যিনি বিভূতি কামনা করেন তিনি আত্মজ্ঞানীর পূজা করিবেন।

যে ব্রহ্মে জগৎ সমর্পিত রহিয়াছে এবং যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ পান, আত্মজ্ঞ পুরুষ পরম আশ্রয় সেই ব্রহ্মকে জানেন। বিভূতি-তৃষ্ণা-বর্জিত যে-সকল ধীমান্ ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করেন, তাঁহারা আর শরীর গ্রহণ করেন না।

যে কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সেবা সকাম হয়ে করলে অভীষ্টসিদ্ধি হয় আর নিষ্কাম হয়ে করলে মুক্তিলাভ হয়। তা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমা বিশেষ করে এই সন্তানটির কথাই বলেছেন তিনি তাঁর অতি প্রিয় কেবল এইজন্য নয়, এই 'ভারী'র উপর তিনি অনেক ভার অর্পণ করেছেন। লীলা-সংবরণের দু-তিন দিন আগে শরৎ মহারাজকে বলেছেন: "শরৎ, আমি চললুম। যোগেন, গোলাপ, এরা সব রইল, দেখ।" রোরুদ্যমান সেবককে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন: "শরৎ রইল, ভয় কী?"

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ, 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলামৃত'-রচয়িতা বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন:

"আমাদের মধ্যে শরৎই সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান। প্রভুর প্রসন্নতায় পরাজ্ঞান এবং মহাপ্রাণতায় স্বামীজীর কার্যে আত্মদানে তাঁহার স্নেহাশিসে ধন্য হন। কিন্তু জ্ঞানই বল, আর যোগই বল, স্নেহরস বিনা উৎকর্ষ হয় না; তাই করুণাময়ী শ্রীমাতৃদেবী পীযূষধারায় অভিষেক করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ছায়ারূপে গঠন করেন; সুতরাং শরতেরও পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইল। কেবল পূর্ণতা নয়, শ্রীশ্রীমার অন্তর্ধানের পর, মাতৃভাবে ভাবিত হইয়া, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে, তাঁহার সন্তানগণকে তাঁহারই মতো স্নেহ করিতে থাকেন। তাঁহার দেহাবসানে অনেক মাতৃসন্তান বলিয়াছেন—শ্রীমার অন্তর্ধানের পর শরৎ মহারাজের কাছে আমরা যে অবিকল মাতৃস্নেহ পাইয়াছি, আজ তাহার অবসান হইল, এবং আমরা আজ প্রকৃতই মাতৃহীন হইলাম। মাতৃভাবাপন্ন বলিয়াই মাতৃকন্যাগণ অসঙ্কোচে তাঁহার কাছে মনোব্যথা জানাইত; এবং তিনিও তাহাদের কল্যাণকামনায় এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে, অনেক সময় বিশ্রামলাভও ঘটিত না।

স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' অপূর্ব গ্রন্থ—শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বা অনুরাগী সকলেরই পরম আদরের ধন; অধ্যাত্মসাধনজীবন-গ্রন্থরূপেও এটি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থটির কথা মনে রেখেই শ্রীশ্রীমার লীলা-সংবরণের পর তাঁকে শ্রীশ্রীমায়েরও একটি জীবনীগ্রন্থ লিখতে অনুরোধ করা হয়। উত্তরে তিনি ঠাকুরের ব্রাহ্মভক্ত গীতকার সুগায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের একটি গান আবৃত্তি করেন:

রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি,
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।
এতকাল রইলাম কাছে, ফিরলাম পাছে পাছে,
কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি।
বিচিত্র তাঁর ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন দুই বেলা,
ঠিক যেন ছেলেখেলা—বুঝতে পেরেছি।

# মাতৃশরণম্

## শ্রীনবনাহরণ মুখোপাধ্যায়

ভগবতী জগন্মাতা মহামায়া চ পার্বতী।
দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥১॥
সীতা রাধা সারদা চ রামকৃষ্ণেণ পূজিতা।
যা সা ভবতু মাতা মে মুক্তিভক্তিপ্রদায়িনী ॥২॥
অকৃপণা দয়া যস্যাঃ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা।
তস্যাঃ ক্ষমা সদা হন্তু দোষান্ সর্বান্
কৃতান্ ময়া ॥৩॥
উদ্বেলকরুণাধারা যস্যাঃ নিত্যপ্রবাহিতা।
গূঢ়া সদা স্বরূপং সা পরদুঃখেষু কাতরা ॥৪॥
গতানামাগতানামনাগতানাং গতিঃ পরা।
মাতা ধাত্রী পাত্রী সৈব সমদৃষ্টিঃ
সুতান্ প্রতি ॥৫॥
অপি শশিনি কালঙ্কস্তস্য লেশর্নতু ত্বয়ি।
সর্বেষাং পাপমাদায় ত্বং হি স্বয়ং পবিত্রতা ॥৬॥
মালিন্যকারণাৎ কোঽপি ত্যাজ্যস্তব কদাপি ন।
ন শোধয়তি গঙ্গা চেৎ সদ্যঃ শুদ্ধিঃ
স্পর্শেন তে ॥৭॥
সা হি দেবী পরাবিদ্যা সর্বেষাং ক্লেশহারিণী।
সংসারবন্ধনামুক্তিজ্ঞানবিজ্ঞানদায়িনী ॥৮॥
জীবিতং মরণং বাপি ক্রোড়ে হি তে ভবেন্মম।
হান্যং মে শরণং নাস্তি ততঃ কৃপাং সুতে কুরু ॥৯॥
শুদ্ধাশুদ্ধী ন জানামি গদ্যে পদ্যে ন মে স্পৃহা।
প্রেরয়সি যথা মাতঃ কাঙ্ক্ষে কৃপাং হি
কেবলম্ ॥১০॥

# সকলের মা

## স্বামী প্রমেয়ানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "আমার ভাব মাতৃভাব —সন্তান ভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব।"[১] জনৈক ভক্ত একবার শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "'মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এবার আপনাকে রাখিয়া ঠাকুর পূর্বে চলিয়া গেলেন কেন?' মা বলিলেন: 'বাবা, জান তো ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'"[২] শ্রীশ্রীমায়ের এই আপাত-সামান্য কথাগুলির মধ্যেই রয়েছে তাঁর মর্ত্যলীলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। যদিও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে ত্যাগ, পবিত্রতা, ক্ষমা, সর্বজীবে সমদৃষ্টি, দয়া, সহনশীলতা, ধৈর্য, লোভরাহিত্য ইত্যাদি যাবতীয় দৈবীভাবের পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল, তথাপি তাঁর নিখিলমাতৃত্বের ভাবটি যেন অন্য সকল ভাবকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেখানে তিনি সকলের মা, বিশ্বজননী, 'নিখিল-মাতৃহৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা মুরতি' রূপে স্বমহিমায় বিরাজিতা। সত্যান্বেষী যেমন তাঁর কাছে আসতেন সত্যলাভের সন্ধান জানতে, ঐ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য শক্তি ও আশীর্বাদ সঞ্চয় করতে, তেমন অনেকেই আসতেন সংসারের অজস্র সমস্যার ও নানা দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণার কথা তাঁর কাছে বলে নিজেদের ভারাক্রান্ত হৃদয়কে ভারমুক্ত করতে, সান্ত্বনা পেতে। শ্রীশ্রীমাও অধ্যাত্ম-পথের পথিকদের যেমন চলার পথনির্দেশ দিতেন, তেমন সংসার জ্বালায় জর্জরিত মানুষের সংসারের নানা দুঃখের কথাও সমব্যথীর ন্যায় ধৈর্য ধরে শুনতেন এবং তাঁদেরকেও যথাযথ সান্ত্বনা দিয়ে তাদের তপ্ত প্রাণকে শান্ত করতেন। কি অধ্যাত্ম-পথের পথিক, কি সংসার-তাপে দগ্ধ মানুষ—কেউই তাঁর মাতৃস্নেহের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হত না। বস্তুতঃ তাঁর অপার মাতৃস্নেহ জাতি-বর্ণ, দোষ-গুণ, সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না। যে তাঁর কাছে এসে পড়ত, তার দোষ বা দুর্বলতা জেনেও তিনি তাকে অকাতরে স্নেহ করতেন, ওষুধপত্রাদি দিয়ে সাহায্য করতেন, শোকে প্রাণঢালা সহানুভূতি দেখাতেন এবং অপরকে ওরূপ করতে শেখাতেন। তাঁর সে অকৃত্রিম মাতৃত্বের প্রভাবে দুশ্চরিত্র লোকেরও স্বভাব পরিবর্তিত হত, দস্যুও ভক্তে পরিণত হত। মাতৃস্নেহে অভিভূত নাগমহাশয় একবার বলেছিলেন: "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।"[৩]

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃহৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় কিভাবে উদ্বেলিত হত তার দু-একটি চিত্র এখানে তুলে ধরছি। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের খুব অসুখ করেছে। কবিরাজ জল বন্ধ করে ওষুধ খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা জলের পরিবর্তে তাঁকে রোজ তিন-চার সের, শেষে এমন কি পাঁচ-ছয় সের পর্যন্ত দুধ খাওয়াতেন। দুধের পরিমাণ যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে না পারেন তার জন্য শ্রীশ্রীমা দুধকে জ্বাল দিয়ে দিয়ে কমিয়ে এক-দেড় সেরে নিয়ে আসতেন। কত দুধ জিজ্ঞাসা

১ কথামৃত, ৫।প।৯

২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ২৮০

৩ শ্রীমা সারদা দেবী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২০০

করলে বলতেন: "কত আর—এক সের, পাঁচপো হবে।"[৪] একদিন ঠাকুর দুধ সম্বন্ধে গোলাপমাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সব বলে দিয়েছিলেন। শুনেই তিনি বললেন: "এঁ্যা, এত দুধ?" শ্রীশ্রীমা যেতেই বলছেন: "বাটিতে কত ধরে? ক ছটাক, ক পো?" শ্রীশ্রীমা বললেন: "ক ছটাক, ক পো, অত জানিনে। দুধ খাবে, তা ক ছটাকের ঘটি, কত পো, অত কেন? অত হিসাব কে জানে?"[৫] এ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা গোলাপমাকে বলেছিলেন: "খাওয়ার জন্য মিথ্যা বললে দোষ নেই, আমি এই রকম করে ভুলিয়ে টুলিয়ে খাওয়াই।"[৬] মনে রাখতে হবে যে, এখানে শ্রীশ্রীমা মন ভুলানো কথাগুলির উপর দৃষ্টি না রেখে রেখেছিলেন সেবার উপর। তাঁর এই সেবা-যত্নে ঠাকুর সেবার সেরে উঠেছিলেন এবং তাঁর শরীরও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ শুধু যে শ্রীরামকৃষ্ণেই প্রযুক্ত ছিল তা নয়, যে-কোন ব্যক্তি—সে সমাজের যে স্তরেরই হোক না কেন—'মা' বলে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালে তিনি তাঁকে গ্রহণ করতেন, তাঁর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে এক বৃদ্ধা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আসতেন। বৃদ্ধার অতীত জীবন ভাল ছিল না। শ্রীশ্রীমা তা জানতেন। ঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে, সে এভাবে মায়ের নিকট আসে। মাকে তিনি একদিন তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশও করেছেন। মা কিন্তু ঠাকুরের এই কথা মেনে নিতে পারলেন না। মা জানতেন যে, বৃদ্ধার অতীত জীবন যাই হোক না কেন, এখন সে ধর্মপথে চলছে এবং মাতৃজ্ঞানেই তাঁর নিকট যাতায়াত করে। অতএব শুধু লৌকিক সাবধানতাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি শরণার্থিনীকে দূরে সরাবেন কিরূপে? কাজেই ঠাকুরের আপত্তির পরও বৃদ্ধার আসা-যাওয়া চলতে থাকল। ঠাকুরও মায়ের মনোভাব বুঝতে পেরে আর কিছু বলেননি।[৭]

সাধারণতঃ ঠাকুরের খাওয়ার থালা নিয়ে শ্রীশ্রীমা-ই ঠাকুরের ঘরে আসতেন এবং তাঁর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেন। একদিন যথাসময়ে খাওয়ার থালা হাতে করে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ঘরের সিঁড়ির বারান্দায় পা দিয়েছেন, এমন সময় এক মহিলা-ভক্ত এসে "দিন, মা, আমায় দিন" বলে মায়ের হাত থেকে থালাখানি নিয়ে ঠাকুরের সম্মুখে রেখে চলে গেলেন। ঠাকুর কিন্তু সেই অন্ন স্পর্শ করতে পারলেন না। শ্রীশ্রীমা এলে তাঁকে বললেন: "তুমি একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? তুমি কি ওর চরিত্র সম্বন্ধে জান না?" শ্রীশ্রীমা বললেন: "তা জানি; আজ খাও।" শ্রীশ্রীমায়ের মিনতির উত্তরে অবশেষে ঠাকুর বললেন: "আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বল।" শ্রীশ্রীমা করজোড়ে বললেন: "তা তো আমি পারব না, ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।"[৮]

রাত্রে বেশি খেলে ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। তাই যেসব বালক-ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপন করতেন তারা কে কখানা রুটি খাবে ঠাকুর তা বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন এবং সে-অনুযায়ী রুটি তৈরি করতে শ্রীশ্রীমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাতৃত্বের উপর এই কড়া শাসন কিন্তু

৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ১৮১

৫ ঐ, ১৮২   ৬ ঐ

৭ শ্রীমা সারদা দেবী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১১১

৮ ঐ, ১১৪

শ্রীশ্রীমা মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি বালক-ভক্তদের ক্ষুধার অনুপাতে রুটি দিতেন যা শ্রীরামকৃষ্ণের নির্ধারিত পরিমাণ থেকে নিঃসন্দেহে বেশি। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, তিনি রাত্রে পাঁচ-ছয়খানি রুটি খেয়ে থাকেন; যা তাঁর বরাদ্দ-পরিমাণের চেয়ে বেশি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট গিয়ে অনুযোগ করলেন যে, এরূপ বিবেচনাহীন স্নেহের দ্বারা তিনি বালকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন। প্রতিবাদে শ্রীশ্রীমা বললেন: "ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।"[৯] শ্রীরামকৃষ্ণ নিরস্ত হলেন। "মনে মনে সর্ববিজয়িনী মাতৃত্বশক্তিকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তখনই স্মিতবদনে সে স্থান হইতে বিদায় লইলেন।"[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বুদ্ধগয়ায় গিয়েছেন। সেখানকার মঠের অতুল ঐশ্বর্য, অপরদিকে তাঁর ত্যাগী সন্তানদের স্থায়ী আশ্রমের অভাব, অন্নবস্ত্রের অবর্ণনীয় কষ্ট ও মঠ-পরিচালনার জন্য অসীম দৈহিক ক্লেশ ইত্যাদি শ্রীশ্রীমাকে খুবই বিচলিত করে তুলেছিল। সঙ্ঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য তাঁর মনে স্বতই এক করুণ প্রার্থনা জেগেছিল। এ-সম্বন্ধে পরে এক সময়ে তিনি বলেছিলেন: "আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় আজ মঠ-টঠ যা কিছু।···ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলুম,···'তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে।'"[১১] কথাগুলির প্রতি ছত্রে শ্রীশ্রীমায়ের অসীম মাতৃস্নেহের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃস্নেহের পরিধি যে শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, পশুপক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীও তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের কোমল স্পর্শ অনুভব করত রাসবিহারী মহারাজ একদিন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "তুমি সকলের মা?" মা উত্তরে বলেছিলেন: "হ্যাঁ"। পুনরায় প্রশ্ন হল: "এইসব ইতর জীবজন্তুরও?" মা বললেন: "হ্যাঁ, ওদেরও।"[১২]

মায়ের বাড়ীতে গঙ্গারাম নামে এক পোষা চন্দনা ছিল। মা নিজে তাকে নিত্য স্নান করাতেন, খাঁচা পরিষ্কার করতেন, তার খাবার দিতেন এবং স্নেহভরে তার সঙ্গে কথা বলতেন। তার কাছে এসে মা বলতেন: "বাবা গঙ্গারাম, পড় তো।" পাখি বলত: "হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাম, রাম।" শ্রীশ্রীমায়ের মুখে শুনে ব্রহ্মচারীদের নামগুলি সে বেশ শিখে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে বলে উঠত: "মা, ও মা।" অমনি মা উত্তর দিতেন: "যাই, বাবা, যাই।"—বলেই ছোলা-জল দিয়ে আসতেন তাকে। পাখির ডাকার অর্থ তার যে খিদে পেয়েছে তা মা বুঝতে পারতেন।[১৩]

জয়রামবাটীতে ভক্তরা আসতেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে বা দীক্ষা নিতে। তাঁদের থাকা-

৯ ঐ, ১৬৯ ১০ ঐ, ১৭০ ১১ ঐ, ২২৭-২৮

১২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৫

১৩ শ্রীমা সারদা দেবী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৭৫

খাওয়া, সুখ-সুবিধা ইত্যাদির সব ব্যবস্থাই শ্রীশ্রীমা নিজে করতেন। সময়ে-অসময়ে কত ভক্ত আসতেন। সকলে যে তাঁর পরিচিত তাও নয়। মা কিন্তু সেসব দিকে দৃষ্টিপাত না করে আগত সন্তানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই ব্যস্ত। বস্তুতঃ এই ভক্তসেবা তাঁর জীবনে স্বাভাবিক দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। তাঁর এই সন্তানস্নেহ দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সর্বগ্রাসী মাতৃত্ব তাঁকে অচিরেই এমন এক স্তরে উপস্থিত করেছিল যেখানে দেশের দূরত্ব ও অঙ্গের বর্ণ মুছে গিয়ে বিরাজিত ছিল শুধু এক অতৃপ্ত মাতৃবাৎসল্য। তাই দেখি, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন ইংরেজ-বিদ্বেষ ধূমায়িত, তখনও তাঁর মুখে উচ্চারিত হত: "তারাও তো আমার ছেলে।"

একদিন শ্রীমা ভক্তদের এঁটো পরিষ্কার করছেন দেখে মায়ের এক ভাইঝি (নলিনীদিদি) বললেন: "মাগো, ছত্রিশ হাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!" মা শুনে উত্তর দিলেন: "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?" মায়ের কাছে সকলেই তাঁর সন্তান—ছেলে-মেয়ে। তা সে মন্ত্রশিষ্যই হোক বা আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত যে-ই হোক। স্নেহের সম্বোধন 'বাবা' অথবা 'মা' ডাকটি সবসময়ই তাঁর মুখে লেগে থাকত। কাউকে চিঠিপত্র লিখতে হলেও সম্বোধন হত 'বাবাজীবন' এমন কি যাকে পত্র লিখছেন সে হয়তো শিষ্য বা পুত্রস্থানীয় নয়, সম্পর্কে 'বেয়াই', তাকেও সম্বোধন করছেন 'বাবাজীবন' বলে। শ্রীশ্রীমা সকলের মা—বিশ্বজননী। তাঁর মাতৃস্নেহের পীযূষধারা সকল নরনারীর উপর সমভাবে বর্ষিত হয়েছে। গর্ভধারিণী জননীর নিকট সন্তান যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, শ্রীশ্রীমায়ের নিকটও যে-ই আসত সে-ই অনুভব করত অপার্থিব মাতৃস্নেহের আকর্ষণ। তাই দেখা যায় যে অল্প বয়সে মাতৃহারা, মায়ের কাছে এসে সে খুঁজে পেয়েছে আপন মাকে। গর্ভধারিণীর স্নেহ যেমন ভালমন্দ সকল সন্তানের উপর সমভাবে বর্তমান থাকে, কোন মন্দ ছেলের কাজকর্মে মনে কষ্ট পেলেও যেমন তার উপর গর্ভধারিণীর স্নেহ-আদরযত্ন কম হয় না, শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ-আদরযত্নও তেমনি বিদ্বান-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র সৎ-অসৎ সকলের উপর ছিল সমভাবে বর্তমান। তাই তাঁকে বলতে শুনি: "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" তাঁর এই বিশ্বজনীন মাতৃত্বের কাছে মহাজ্ঞানী সারদানন্দ এবং ডাকাত আমজদ সমান।

শ্রীশ্রীমায়ের অপার্থিব মাতৃত্ব দেশ-কাল, জাত-পাতের গণ্ডি ভেঙে সকল মানবজাতিকে স্পর্শ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেশ-বিদেশের নরনারী শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃত্ব অনুভব করে ধন্য হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলশরীরের অন্তর্ধানের পর সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে মাতৃভাব-বিকাশরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনব্রত পালন করতে করতে 'সকলের মা' শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে মিলিতা হলেন। ধরাধামে রেখে গেলেন শত শত ভক্ত-হৃদয়ে তাঁর পুণ্যজীবনের চির জাগরূক স্মৃতি-কাহিনী, যার প্রতি ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়েছে মাতৃস্নেহের প্রাণদায়িনী পীযূষধারা। তাতে অভিস্নাত হয়ে মুমূর্ষু মানব নতুন করে বাঁচতে শিখুক, অমৃতত্ব লাভে জীবন সার্থক করুক।

# জীবৎকালেই প্রবাদপুরুষ তৈলঙ্গস্বামী

অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

যদি এমন কারও উল্লেখ করতে হয় যিনি জীবদ্দশাতেই পরিণত হয়েছিলেন একজন প্রবাদ-পুরুষে, তাহলে নিশ্চয়ই মনে আসবে শ্রীশ্রীতৈলঙ্গ-স্বামীর নাম। অলৌকিকত্বের কুহেলি আবৃত করে রেখেছে তাঁর যথার্থ পরিচয়। প্রধানতঃ অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী রূপে পূজিত তিনি। অভাবনীয় বিভূতি-প্রদর্শনের অসংখ্য কাহিনী আরোপিত তাঁর প্রতি। তার মধ্যে কোন্‌গুলি সত্যি আর কোন্‌গুলি জনশ্রুতি তা আজও যথাযথ ভাবে নির্ধারণের অপেক্ষায় আছে।

অনিশ্চয়তার কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট হয়ে আছে তাঁর জন্ম, আয়ুষ্কাল ও কীর্তিকলাপ। তাঁর ভক্তদের একাংশের মতে এই মর্ত্যধামে তাঁর জীবনলীলার পরিধি অনধিক তিন শতাব্দী কাল (২৮০ বৎসর) পরিব্যাপ্ত। আবার অন্যদের মতে তাঁর জীবনের দৈর্ঘ্য ৯১ বৎসর মাত্র। কারো মতে মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে তিনি বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং একটি পুত্র ও একটি কন্যার জনক হন। আবার অন্যমতে তিনি ছিলেন চিরকুমার, সন্ন্যাসী।

অথচ তৈলঙ্গস্বামী একজন *ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কোন কল্প-সাহিত্যের চরিত্র নন! ভারতের মৃত্তিকাই তাঁর লীলাভূমি, আর সে লীলা সঙ্ঘটিত হয়েছে আমাদের স্মরণ-সীমার মধ্যেই। তাই তাঁর জীবনবৃত্তান্ত, বিশেষ করে তাঁর পূর্বাশ্রমের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার জন্য দায়ী যে আমাদের ইতিহাস-চেতনার অভাব—এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিদেশী ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন আমাদের জাতীয়চরিত্রের এই ত্রুটির প্রতি। আমাদের দেশের মণীষীরাও, বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আমাদের এই ইতিহাস-অনীহার বিষয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-র মতো একজন জীবনীকার লাভ করেছিলেন যিনি বস্‌ওয়েল-সদৃশ বিশ্বস্ততায় তাঁর পুণ্য জীবন ও অমৃতময় বাণীর দৈনন্দিন অনুলিপি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, তৈলঙ্গস্বামীর ক্ষেত্রে তেমন বসওয়েল-লাভ ঘটেনি। তাঁর মুষ্টিমেয় যে-কখানি জীবনী বিদ্যমান তার অধিকাংশই রচিত তাঁর অনুগত ভক্ত ও শিষ্যদের দ্বারা—যাঁরা তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্বে এসেছিলেন তাঁর সান্নিধ্যে। কাজেই তাঁর পূর্বাশ্রমের অধিকাংশই রয়ে গেছে অজানার অন্ধকারে নিমজ্জিত। যেটুকু বা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাও বিতর্কিত ও বহুলাংশে অনুমান-নির্ভর। তদুপরি এই জীবন-চরিতগুলির অন্যতম ত্রুটি হল সন-তারিখের অনুপস্থিতি। আর এই কারণেই তাঁর আয়ুষ্কাল তথা জীবনের ঘটনাবলীর পারম্পর্য নিরূপণ দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে তৈলঙ্গস্বামীর আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতানৈক্য থাকলেও তাঁর তিরোধান-তিথি সম্বন্ধে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। সেই লগ্নটি হল বাংলা ১২৯৪ সালের পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী তিথির সূর্যাস্ত-কাল। বর্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১৩৯৪ সালের ১৪ পৌষ, ইংরেজী ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সেই মহাসাধকের প্রয়াণ-শতবর্ষপূর্তির স্মরণীয় দিন।

* ১৪ পৌষ ১৩৯৪ তৈলঙ্গস্বামীর তিরোধানের শতবর্ষপূর্তি হবে। সেই উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল।—সম্পাদক

বর্তমানে বিদ্যমান স্বল্প-সংখ্যক জীবনীগ্রন্থ হতে প্রাপ্ত তৈলঙ্গস্বামীর কিংবদন্তী-সদৃশ জীবনের রূপরেখা এইরূপ :

দক্ষিণ ভারতে, তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভিজাগাপট্টমের হোলিয়া (অথবা হালয়ানা) গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে কয়েকজনের মতে তাঁর আদি নাম ছিল শিবরাম। আবার অন্যদের ধারণা, তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল গণপতি। আর, তৃতীয় এবং অধিকাংশের দ্বারা সমর্থিত মতটি হল যে, প্রথম থেকেই তিনি তৈলঙ্গধর বলে অভিহিত ছিলেন। তাঁর বাবার নাম নৃসিংহধর, আর মায়ের নাম বিদ্যাবতী।

বহু মহাপুরুষের মতো তৈলঙ্গস্বামীর ক্ষেত্রেও, এক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাঁর জন্মবৃত্তান্তকে ঘিরে। সন্তানসম্ভবা হবার আগে রোজকার মতো বিদ্যাবতী গৃহদেবতা শঙ্করের মন্দিরে ব্যাপৃতা ছিলেন পূজায়। হঠাৎ অপরূপ সুন্দর একটি শিশুপুত্র তাঁর কাছে ঠাকুরের প্রসাদ চাইল কচি কচি দুটি হাত পেতে। তৎক্ষণাৎ প্রসাদ হাতে নিয়ে বিদ্যাবতী মন্দিরের বাইরে এসে দেখলেন শিশুটি অন্তর্হিত। অনেক অনুসন্ধান করেও তার খোঁজ মিলল না। স্ত্রীর কাছে এই ঘটনার বিবরণ শুনে নৃসিংহধর একে ব্যাখ্যা করলেন বিদ্যাবতীর গর্ভধারণের শুভ সঙ্কেতরূপে। তাঁর এই অনুমান যথার্থ প্রমাণিত হল। যথাকালে জন্মগ্রহণ করলেন তৈলঙ্গধর।

বাল্যকাল থেকে লেখাপড়ায় তৈলঙ্গধরের অমনোযোগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণায় দেখা যেত তাঁর প্রবল অনুরাগ। মায়ের সঙ্গে শঙ্করের মন্দিরে তিনি যেতেন নিয়মিত। আর বাড়ির নিকটবর্তী এক বটগাছের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন ধ্যানে। আহার-নিদ্রার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতেন তখন। সন্তানের এই সংসার-বৈরাগ্য বিদ্যাবতীকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। তিনি তৈলঙ্গধরের বিবাহ দিলেন এবং যথাকালে তাঁর একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মাল। এখানে আবার মতদ্বৈধতা আছে তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে। তাঁদের অনেকের মতে তাঁর পিতা বিবাহের প্রস্তাব করলে বিদ্যাবতীই বাধা দিয়েছিলেন সে-প্রস্তাবের। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তৈলঙ্গধরের মন-প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত। বিদ্যাবতী অবশ্য তৈলঙ্গধরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে পিতামাতার জীবদ্দশায় তিনি সংসার ত্যাগ করবেন না। তৈলঙ্গধর সে প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। মাতার শবদেহ শ্মশানে সৎকার করে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। শ্মশানের সন্নিকটে একটি কুটির নির্মাণ করে শঙ্করের পূজায় ও ধ্যানে তিনি যাপন করতে লাগলেন নির্জন জীবন।

এইভাবে অতিক্রান্ত হল দীর্ঘ দশটি বছর। তৈলঙ্গধরের পিতৃবিয়োগ হল এই সময়। এতদিনে অব্যাহতি পেলেন তৈলঙ্গধর তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে। শুরু হল তাঁর পরিব্রাজক জীবন। তিনি তখন চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন।

তৈলঙ্গধর শুধু বিশাল ভারতবর্ষই পদব্রজে প্রদক্ষিণ করেননি, সন্নিহিত নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁর দীর্ঘ জীবনের বেশ কয়েক বছর কঠোর তপস্যায় কাটিয়েছেন।

প্রথমে তিনি উপনীত হলেন পবিত্র কাশীধামে। সেখান থেকে তিনি এলেন কাটোয়ার কাছে গঙ্গাতীরে মহাশ্মশান উদ্ধারণপুর ঘাটে এবং যোগ-সাধনায় কাটালেন কিছুকাল। তাঁর পরবর্তী গন্তব্যস্থল দক্ষিণ ভারতের নর্মদা তীর। সেখানে কয়েকটি বছর তপস্যায় অতিবাহিত করে দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থ পরিক্রমণ করে তিনি

এলেন পুরীধামে। সেখানে নিঃসন্তান এক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁর আশীর্বাদে পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। এরপর নানা তীর্থ ভ্রমণ করে তিনি উপস্থিত হলেন পাঞ্জাবের বাস্তর গ্রামে। সেখানে তিনি ভগীরথ স্বামী নামে এক সাধুর সান্নিধ্যে এলেন। তিনি তৈলঙ্গধরকে পুষ্করতীর্থে নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষাগুরু গত হলে তিনি এলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। সেখানে উৎসবের সময় ভিড়ের চাপে দলিত হয়ে একজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হলে তৈলঙ্গধর তাঁর কমণ্ডলুর জল সিঞ্চনে তাকে পুনর্জীবন দান করেন। এবার তিনি এলেন পুণ্যতীর্থ প্রভাস ও দ্বারকায়। তারপর তিনি যান নেপালে। সেখানে নিভৃত এক পর্বত-গুহায় বহুদিন যোগাভ্যাস করে তৈলঙ্গধর হলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

তাঁর অতি-প্রাকৃত শক্তির কথা রাষ্ট্র হতেই শুরু হল জনসমাগম। তাদের কাতর প্রার্থনা আর আর্তিতে তাঁর সাধনায় অভিনিবেশ ব্যাহত হতে লাগল। তিনি তাই গোপনে সেস্থান ত্যাগ করে এলেন উত্তর ভারতের ভীমরথী তীর্থে। শৃঙ্গেরী মঠের স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাসের প্রতীক স্বরূপ দান করলেন দণ্ড আর কমণ্ডলু। তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম হল স্বামী রামানন্দ সরস্বতী। গুরুর কাছে তৈলঙ্গধর লাভ করলেন বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞান, আয়ত্ত করলেন নানা যৌগিক ক্রিয়াকলাপ। তারপর বিদ্যানন্দ স্বামী তৈলঙ্গধরকে কিছুদিন যোগাভ্যাস করে তিব্বত ও মানস সরোবরে যাবার আদেশ দিয়ে ফিরে গেলেন দাক্ষিণাত্যে। ভীমরথীতে দীর্ঘ পাঁচ বছর কঠোর সাধনায় তৈলঙ্গস্বামী হঠযোগ, ক্রিয়াযোগ ও রাজযোগে সিদ্ধ হন। তিনি আত্মদর্শন করে নানা বিভূতি লাভ করেন—যার ফলে জলে, স্থলে ও আকাশে ইচ্ছামতো বিচরণ ও অবস্থান করবার ক্ষমতা তিনি অর্জন করেন।

এবার গুরুর আদেশ পালনার্থে তৈলঙ্গস্বামী গেলেন তিব্বত ও মানস সরোবরে। মানস সরোবরের তীরে তিনি কিছুকাল কঠোর যোগাভ্যাসে অতিবাহিত করলেন। মানস সরোবর থেকে তৈলঙ্গস্বামী এলেন নর্মদা তীরে—মার্কণ্ডেয় আশ্রমে। অনেক সাধু বাস করতেন তখন সেই আশ্রমে। তাঁরা তৈলঙ্গস্বামীকে সুনজরে দেখতেন না,—নানাভাবে তাঁকে বিদ্রূপ ও জ্বালাতন করতেন। তাঁদের নেতা খাকিবাবা। তিনি একদিন স্বচক্ষে দেখলেন নর্মদার জলরাশি দুধে পরিণত হয়েছে, আর তৈলঙ্গস্বামী সেই দুধ অঞ্জলি ভরে পান করছেন। তৈলঙ্গস্বামী সেখান থেকে প্রস্থান করবার পরই খাকিবাবা সোৎসাহে ছুটলেন সেই দুধ পান করতে। কিন্তু হায়! আশাহত হয়ে তিনি দেখলেন নর্মদার জলস্রোত পূর্ববৎ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তিনি তৈলঙ্গস্বামীর পদতলে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। অপরাপর সাধুরাও অনুসরণ করলেন খাকিবাবার দৃষ্টান্ত।

এরপর তৈলঙ্গস্বামীর যোগসাধনার স্থান নির্বাচিত হল প্রয়াগের গঙ্গাতীর। সেখানে কয়েক বছর তপস্যা করবার পর তৈলঙ্গস্বামী হিমালয়ের নানা দুর্গম অঞ্চলে কিছুকাল পরিভ্রমণ করলেন। তারপর তৈলঙ্গস্বামীর সব পথ এসে মিশে গেল কাশীর পঞ্চগঙ্গা তীরে। শুরু হয়েছিল পরিব্রাজক জীবন যেখান থেকে, সমাপ্তও হল সেই পুণ্যতীর্থ কাশীধামে। পঞ্চগঙ্গার বিন্দুমাধব মন্দিরের পাশে তিনি নির্মাণ করলেন তাঁর সাধন-আশ্রম। এখানেই তিনি অতিবাহিত করেন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট কাল। অধিকাংশ সময়েই তিনি নগ্ন দেহে থাকতেন।

কাশীতে বেশির ভাগ সময় থাকতেন মৌনী

হয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীতে তীর্থযাত্রায় এসে একদিন হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে আসেন তৈলঙ্গস্বামী-সমীপে। তিনি তখন মৌনব্রতধারী। তাই ইশারা-ইঙ্গিতেই হল কথোপকথন। আলাপে খুশি হয়ে তৈলঙ্গস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি নস্যের ডিবা উপহার দেন।

একবার উজ্জয়িনীর রাজা নৌকাযোগে আসছিলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এক অলৌকিক দৃশ্যের প্রতি। তৈলঙ্গ-স্বামী গঙ্গার উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় ভেসে চলেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নৌকাটি তৈলঙ্গস্বামী সমীপে নিয়ে যেতে বললেন। নৌকা নিকটবর্তী হতেই বিনা অনুরোধেই তৈলঙ্গস্বামী উঠে এলেন তার উপর। রাজার কোমরে শোভা পাচ্ছিল মূল্যবান একটি তরবারি—যেটি তিনি লাভ করেছিলেন বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ। তৈলঙ্গস্বামী তরবারিটি রাজার কাছ থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তারপর অকস্মাৎ সেটি নিক্ষেপ করলেন গঙ্গাগর্ভে। রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কটুবাক্য বর্ষণ করতে লাগলেন। তৈলঙ্গস্বামী কিন্তু নির্বিকার। তারপর মণিকর্ণিকার ঘাটের সন্নিকটে নৌকা আসতেই তিনি গঙ্গার জলে হাত ডুবিয়ে দুহাতে দুটি তরবারি তুললেন। দুটিই রাজার তরবারির এমন হুবহু অনুরূপ যে রাজা নিজেই সনাক্ত করতে পারলেন না কোনটি তাঁর। তৈলঙ্গস্বামী বিস্ময়-বিমূঢ় রাজার হাতে তাঁরটি প্রদান করে অপরটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন।

মঙ্গলদাস নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তৈলঙ্গস্বামীর সেবক। তৈলঙ্গস্বামী যখন মৌনী থাকতেন তিনি তখন তাঁর ইশারা-ইঙ্গিতের তাৎপর্য বুঝতে পারতেন এবং প্রত্যহ আগত অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থীকে তা বুঝিয়ে দিতেন। উমাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি--যিনি পরে তৈলঙ্গস্বামীর অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্যতমরূপে পরিগণিত হন—বহুদিন যাবৎ নিজের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ছিলেন। সেই অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করবার প্রত্যাশায় তিনি আসেন তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রমে। বেশ কয়েকবার স্বামীজীর নিষ্ঠুর তাড়না ও প্রত্যাখ্যানের পর মঙ্গলদাসের সহায়তায় অবশেষে উমাচরণের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। স্বামীজীর কাছ থেকে উমাচরণ জানতে পারেন পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন এক ব্রাহ্মণ জমিদার। তাঁর পূর্ব জন্মের বাসভবনের বিস্তারিত বিবরণ দেন তৈলঙ্গস্বামী। তিনি বলেন, উমাচরণের পূর্বজন্মের বাসভবনের দোতলায় শয়নঘরের দরজার উপরে ভিতরের দেয়ালে উমাচরণ স্বহস্তে তিনটি সংস্কৃত শ্লোক লিখেছিলেন। শ্লোকগুলি তৈলঙ্গস্বামী আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে উমাচরণ সেগুলি লিপিবদ্ধ করে নেন। স্বামীজীর কাছ থেকে উমাচরণ এও জানতে পারলেন যে, শ্লোকগুলি-সহ সেই বাসভবনটি তখনও যথাপূর্ব বিদ্যমান। কিছুদিন পর উমাচরণ যখন আসামের গোলাঘাটে তাঁর কর্মস্থলে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর পূর্বজন্ম-সম্বন্ধীয় তৈলঙ্গস্বামী-কথিত তথ্যটির সত্যতা যাচাইয়ের একটা সুযোগ ঘটে। তাঁরই বিভাগে একজন নব-নিযুক্ত তরুণ ওভারসিয়ারের কাছে উমাচরণ জানতে পারেন যে যুবকটির শ্বশুরবাড়ি আর তাঁর পূর্বজন্মের বাসস্থান অভিন্ন। কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য উমাচরণ যুবকটির শ্বশুরমশাইকে একটি পত্রে উক্ত শ্লোক তিনটির অনুলিপি পাঠাতে অনুরোধ জানান। পত্রোত্তরে শ্লোকগুলি পেয়ে উমাচরণ সবিস্ময়ে দেখলেন স্বামীজী-কথিত শ্লোক তিনটির সঙ্গে সেগুলির মিল রয়েছে অক্ষরে অক্ষরে। এর পর উমাচরণের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে প্রত্যয় সন্দেহাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত হল।

উমাচরণ তাঁর গোলাঘাট অফিসে ১২৯৪

সালের অগ্রহায়ণ মাসে তৈলঙ্গস্বামীর একখানি পত্র পেলেন। তাতে স্বামীজী একমাস পরে তাঁর ইহলোক ত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে উমাচরণকে ছুটি নিয়ে তাঁর পঞ্চগঙ্গার আশ্রমে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, উমাচরণ গুরুর আদেশ অনুসারে উপস্থিত হলেন তাঁর আশ্রমে। নির্ধারিত তিরোধান-দিবসের তখন মাত্র দশ বার দিন বাকি। এই কদিন তৈলঙ্গস্বামী শিষ্যদের উপদেশ ও ভক্তমণ্ডলীর সব রকম জিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রদানে নির্বাহ করলেন। অন্তিম কাল আসন্ন হলে তৈলঙ্গস্বামী শিষ্যদের আদেশ করলেন তাঁর শয়নের উপযুক্ত একটি সিন্দুক নির্মাণ করাতে। তাঁর দেহান্তের পর তাঁর শবদেহ সেই সিন্দুকের অভ্যন্তরে স্থাপন করে তার ডালাটি স্ক্রু দিয়ে এঁটে এবং তালাবদ্ধ করে সেটি পঞ্চগঙ্গায় বিসর্জন দেবার নির্দেশ দিলেন। প্রয়াণের পূর্বদিন তিনি শিষ্যদের ডেকে যার যা জিজ্ঞাস্য তা জেনে নিতে বললেন, কারণ পরদিন তাঁর সঙ্গে আর বাক্যালাপ হবে না।

অবশেষে এল পূর্ব-সঙ্কল্পিত মহাপ্রয়াণের দিন—বাংলা ১২৯৪ সালের পৌষ শুক্লা একাদশী তিথি। বেলা আন্দাজ নটার সময় তৈলঙ্গস্বামী প্রবেশ করলেন তাঁর সাধন-প্রকোষ্ঠে। আদেশ করলেন ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করতে—আর ভিতর থেকে আঘাত না করা পর্যন্ত কেউ যেন দরজা না খোলে।

অপরাহ্ণে শোনা গেল দরজায় করাঘাত। দ্বার উন্মুক্ত করা হলে স্বামীজী বেরিয়ে এলেন ধীর পদক্ষেপে—মহাভাবে বিভোর অবস্থায়। বারান্দায় এসে বসলেন যোগাসনে—মগ্ন হলেন সমাধিতে। সেই অবস্থায়ই ধীরে ধীরে লীন হলেন মহাসমাধিতে। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে অস্তাচলগামী। গঙ্গার জলরাশি তার রক্তিম রশ্মির আভায় রঞ্জিত।

অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবার ফলে তৈলঙ্গস্বামী জীবিতকালেই পরিণত হয়েছিলেন এক প্রবাদপুরুষে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'রাজযোগ'গ্রন্থের 'বিভূতি-পাদ'-শীর্ষক অধ্যায়ে প্রামাণ্য শাস্ত্রাদি থেকে যথোপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই অলৌকিক ক্ষমতালাভের পদ্ধতি-প্রকরণ। তিনি সেখানে আলোচনা করেছেন কেমন করে 'হঠযোগ' সাধনায় সফলতার ফলে যোগী লাভ করেন 'অষ্টসিদ্ধি'। তিনি তখন স্থান ও কালকে জয় করতে পারেন ; জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে তাঁর অবস্থান ও গমনাগমন হয় সাধ্যায়ত্ত।

তিনি নিজেকে ইচ্ছামতো 'অণু' করতে পারেন, খুব বৃহৎ করতে পারেন, পৃথিবীর ন্যায় গুরু ও বায়ুর ন্যায় লঘু করতে পারেন, যার উপর ইচ্ছা প্রভুত্ব করতে পারেন।

বর্তমান সংশয়বাদ ( scepticism ) ও অজ্ঞেয়বাদ ( agnosticism )-এর যুগে এইসব অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃতিক ঘটনাবলী মানুষ স্বভাবতই সংশয়-সঙ্কুল চিত্তে গ্রহণ করবে। বৈজ্ঞানিক-চিন্তন-প্রণালীতে অভ্যস্ত বর্তমান প্রজন্মের কাছে এগুলি অন্ধ-ভক্তি-সঞ্জাত অতিরঞ্জনরূপে প্রতিভাত হওয়া বিচিত্র নয়। তৈলঙ্গস্বামীর প্রতি দেবত্বারোপণই এইসব অলৌকিক কাহিনী-সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বলে এঁদের ধারণা। আর এই অনুমান দৃঢ়ীভূত হবার বিশেষ কারণ এই যে তৈলঙ্গস্বামীর স্বল্প-সংখ্যক জীবন-চরিতের অধিকাংশই রচিত তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত ও শিষ্যদের দ্বারা। তৈলঙ্গস্বামীর অতি-প্রাকৃত ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরঞ্জনের অভিযোগটি সমর্থন পায় অপর একটি কারণে। তা হল জীবনীকারদের বিবরণে পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতির অভাব। সঙ্গতি ও অভিন্নতাই সত্যের নিরিখ। তাই এই অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধ সঙ্গত কারণেই এদের যাথার্থ্য

সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না। ভক্তদের অন্ধভক্তি এবং শতাব্দীকালের ব্যবধান তাঁকে দান করেছে অতি-মানবত্ব। একজন ঐতিহাসিক পুরুষকে পরিণত করেছে পুরাণ-রূপে। অলৌকিকত্বের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে তাঁর ব্যক্তিসত্তা। ভারতের এই মহান অধ্যাত্মসাধককে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন। ক্ষোভ হয় যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এইরকম একজন মহাপুরুষ সম্পর্কে যথোপযুক্ত গবেষণাকার্য অদ্যাপি গৃহীত হল না।

মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামীর পূত চরিত্র সর্বপ্রযত্নে সাধারণের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা করতে গেলে গ্রহণ করতে হবে পক্ষপাত-হীন বস্তুগত ( objective ) দৃষ্টিভঙ্গি—আবেগ বা অতিরঞ্জনের মোহময়তায় যা কলুষিত নয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর জীবনী রচনার ক্ষেত্রে এই অলৌকিকত্ব আরোপ যাতে না হয় তার জন্য সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই শ্রীম-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করে উল্লসিত হয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন: "Never was the life of a great teacher brought before the public unfarnished by the writer's mind, as you are doing." ( লেখকের কল্পনা বা ভাবাবেগের দ্বারা অতিরঞ্জিত না হয়ে কোন মহান আচার্যের জীবনালেখ্য এমনভাবে ইতিপূর্বে কেউ সাধারণ্যে উপস্থিত করতে পারেনি, যেমনটি আপনি করছেন )।[১]

বর্তমান প্রজন্মের কাছে তৈলঙ্গস্বামীর প্রকৃত মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সত্যানুসন্ধানের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে দুরূহ গবেষণা-কার্যে ব্রতী হতে হবে। নয়তো তাঁর পূজার ছলে আমরা তাঁকেই ভুলে থাকব!

১ Letters of Swami Vivekananda, 4th Edn. 1948, p. 421

# মা

## পূর্ণিমা মুখার্জী

ঘাসের ডগায় শিউলি ফুলের মতো,
তুমি আমার অনেক কাছের তুমি।
সাঁঝের বেলায় সন্ধ্যারাগের মতো
পরশ তোমার নিত্য যে পাই আমি।

ভোরের বেলায় উষা-বিদায় কালে,
দেখাও যখন নতুন দিনের আলো
রাত্রিশেষে সতেজ তখন আমি,
বোঝাও আমায় কত বাস ভাল।

মাঝগগনে সূর্য যখন ওঠে—
মনের রথ কখন কোথায় ছোটে—
হারিয়ে ফেলি লাগামগুলি যত,
ভুলের ঘোড়া ছোটাই অবিরত।

ক্লান্ত আমি যখন দিনের শেষে—
অনেক স্নেহে নাও যে কোলে এসে,
জগৎজোড়া তোমার আঁচলখানি
জড়ায় আমায় অঢেল শান্তি আনি।

# রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাতীর্থ

## দ্বিতীয় পর্ব

### স্বামী প্রভানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

স্থানাভাব ও অর্থাভাব সত্ত্বেও আশ্রমের উন্নতি অব্যাহত থাকে। অখণ্ডানন্দজীর ১০ জানুআরি ১৮৯৯ তারিখের চিঠিতে পাই এক টুকরো খবর। তিনি লিখেছেন: "গত ১৭ ডিসেম্বর এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট Egerton বাহাদুর আমাদের আশ্রম দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনের পর হইতেই আমরা অনাথ বালক-দিগকে দর্জির কাজ শিখাইতেছি এবং একটি দেশী তাঁত বসাইয়া কাপড় বোনার কাজ আরম্ভ করিবারও আয়োজন হইতেছে। আমরা আশ্রমে এক্ষণে সর্বশুদ্ধ ১১ জন।" লক্ষ্য করবার বিষয় অনাথাশ্রমে বালকের সংখ্যা কমছিল বাড়ছিল।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত জমিদার উদারহৃদয়া মধুসুন্দরী বর্মনী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর জমিদারি সারগাছিতে চারবিঘা জমি [১৪] দান করেন এবং অনাথাশ্রমের একান্ত স্থানাভাব লক্ষ্য করে তিনি ভাবতা ও সারগাছির মধ্যে বড় রাস্তার পাশে শিবনগরে তাঁর কাছারিবাড়িটি ছেড়ে দেন। 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' গ্রন্থের লেখক দাবি করেছেন শারদীয়া মহাপূজার পর অনাথাশ্রম কাছারি-বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের প্রতিবেদন অনুসারে অনাথাশ্রম স্থানান্তরিত [১৫] হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি নাগাদ। পৌর্বাপর্য বিচার করে আমরা দ্বিতীয় মতটি যুক্তিসঙ্গত মনে করি। স্বামী সারদানন্দের উক্ত প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়: "( মধুসুন্দরী বর্মনী ) উক্ত কাছারি-বাটীতে অস্থায়ীভাবে আশ্রমের কার্য নির্বাহ করিবার অনুমতি দিয়া উহার স্থায়ী গৃহ নির্মাণের জন্য নামমাত্র খাজনায় প্রায় ৪ বিঘা জমিও দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ জমিতে অপর প্রতিপক্ষ জমিদারের দাবি থাকায় এবং উহার সংলগ্ন জমি অনেক চেষ্টায়ও না পাওয়ায় উহাতে সামান্য চাষবাস এবং ভবিষ্যৎ আশ্রমবাটীর জন্য ৩ লক্ষ ইট পোড়ান ব্যতীত কোনরূপ স্থায়ী গৃহ করিতে পারা যায় নাই।"

কাছারিবাড়ির দোতলায় বড় একখানি ঘর—সামনে উত্তরদক্ষিণে লম্বা বারান্দা। নিচেও দু-তিনখানি ছোট বড় ঘর ও খোলা রোয়াক। সীমানা-প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশের ফটক। দোতলার হলঘরের দেয়ালে ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি টাঙানো। মেঝেতে বসে ছেলেরা প্রার্থনা করত। উপরের বড় ঘরটিতেই অফিস, গ্রন্থাগার ও অখণ্ডা-নন্দজীর শয়নের স্থান। ফুল গাছ ও পাতাবাহারের গাছে সাজানো হয় আশ্রম-প্রাঙ্গণ। শিবনগরে এই বাড়িতে আশ্রম উঠে আসার পর থেকেই অনাথাশ্রমের বিবিধ উন্নতি হতে থাকে।

শিবনগরে তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। দুর্গাপূজার পূর্ব থেকে তিনবার জ্বরে ভুগে ওঠেন অখণ্ডানন্দজী। 'antimalarial pills' খেয়ে

**১৪** **'This noble lady has also granted for the construction of the orphanage building about $1\frac{1}{3}$ acre of land, at the nominal rent of Rs, 0-15-3 a year' ; ( Prabuddha Bharata, Vol, V, p. 44 )**

**১৫ অখণ্ডানন্দজী বলতেন : "১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রিলিফ এক বছর। রাস্তার ধারে আশ্রম ১৪ বছর। তারপর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ( সারগাছিতে ) ৫৩ বিঘা জমিতে এই আশ্রম" ( স্মৃতিদপ্তর, পৃঃ ১৩৬ )**

উপকার পান। কিন্তু রুগ্ন দেহ নিয়েই অনাথাশ্রমের সংগঠন ও সম্প্রসারণের জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তাঁর সম্বন্ধে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "নির্ভীক, সাহসী, অকপট এবং দৃঢ়নিষ্ঠ।" তাঁর এই সদ্‌গুণাবলী শতধারায় স্ফুরিত হয়েছিল আশ্রম সংগঠনের কাজে। অনাথাশ্রম ক্রমেই বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। আশপাশের সুধীব্যক্তি সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেন। অখণ্ডানন্দজী ২৫ মার্চ, ১৮৯৯ তারিখে স্বামীজীকে লিখেছেন আশ্রমের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের সংবাদ[১৬]: "I am glad to inform you that Messrs. P. Stark and P. E. Gourju, the two most influential silk merchants of the District have kindly subscribed each Rs. 2/- to the Orphanage per mensem and remitted it in advance for three months. They have also proposed to open a nursery for the sericulture department in our orphanage. They will provide us with a teacher who would teach the boys of the science of sericulture···In all respects the future prospects of the orphanage are very hopeful." অনাথাশ্রমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন তা ক্রমে বাস্তবায়িত হতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে ওঠে।

আশ্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকেও আশ্রমের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। 'ব্রহ্মবাদিনে' প্রকাশিত মে ১৮৯৮ থেকে এপ্রিল ১৮৯৯—এক বছরের হিসাব[১৭] থেকে দেখা যায় মোট আয় হয়েছিল ৬৪০৸/০ আনা। এর মধ্যে এককালীন দান ৪৮৯৷৶৩ পাই এবং মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১৪১৷৷৵০ আনা। সারা বছরে অনাথাশ্রমে খরচ হয় ৬২৪।৴৩ পাই। ফলে উদ্বৃত্ত থাকে ১৬।৶৯ পাই। লক্ষ্য করবার বিষয় অনাথাশ্রমের গৃহনির্মাণ ফণ্ডে মুর্শিদাবাদের নবাব দান করেছেন ২০০৲ টাকা, আলমোড়া থেকে মিসেস সেভিয়ার দান করেছেন ১০০৲ টাকা এবং বেলডাঙ্গার শেখ মহম্মদ মনিরুদ্দি দিয়েছেন ৫০৲ টাকা, নারায়ণ আগরওয়াল ৫৲ টাকা, সুরেশচন্দ্র ঘোষ ৫৲ টাকা, কালিদাস আঢ্যি ৫৲ টাকা এবং দেলকুণ্ডার হাজি শেখ নকিবুদ্দিন ২৫৲টাকা। আবার পরবর্তী আট মাসের ( মে ১৮৯৯ থেকে ডিসেম্বর ১৮৯৯ ) হিসাব[১৭] থেকে পাওয়া যায় অনাথাশ্রমের মোট আয় ৫৮৬৷৷৶৯ পাইয়ের মধ্যে এককালীন দান ছিল ১৫৪৶০ ও মাসিক চাঁদা ৪১৬৲ টাকা। মোট ৫৮৫৷৷৶০ ব্যয় করার পর উদ্বৃত্ত থাকে ৸৶৯ পাই। অর্থাগম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভক্ত উপেন্দ্রনাথ দেব এণ্টালি অঞ্চল থেকে মাসিক চাঁদা আদায় করে পাঠাচ্ছেন, লালগোলার রায় যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় দান করেছেন ৫০৲ টাকা, ৩৬ মন চাল ডাল ইত্যাদি ও কিছু কাপড়চোপড়। তাছাড়াও আজিমগঞ্জের রায় সেতার চাঁদ নাহার বাহাদুর ২৫৲ টাকা, কলকাতার মণিলাল মল্লিক ৫০৲ টাকা, কলকাতার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মাসিক ১০৲ টাকা ও মিস মূলার ( F. H. Muller )-এর মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য উল্লেখযোগ্য।

১৬ এই চিঠির সঙ্গে দু'টি ফটো পাঠিয়ে লিখেছিলেন : 'The house peeping out through the beautiful large trees is our present residence···; The land for our Orphanage is only about one mile north from this place where we will build our orphanage house'. এই জমির উপর অনাথাশ্রম কখনই স্থাপিত হয়নি, যদিও অখণ্ডানন্দজী ৫০০০ টাকায় একটি পাকা বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন।

১৭ The Brahmavadin, Vol. IV, Nos. 15 & 19 দ্রষ্টব্য। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আলমবাজার মঠ থেকে অনাথাশ্রমের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করা হয়েছিল।

আর এই কালে গৃহনির্মাণ ফণ্ডে দিয়েছেন বহরমপুরের সিভিল সার্জেন Major J. H. Tullwalsh ৫০৲ টাকা, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট J. R. Blackwood ৫০৲টাকা, ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট J. G. Cumming ৫০৲ টাকা, মাদ্রাজের রাজা বেঙ্কটরঙ্গ আপ্পা রায় বাহাদুর ২৫৲ টাকা, বাগবাজারের ক্ষীরোদচন্দ্র বসু ২০৲টাকা, কটকের রামকৃষ্ণ বসু ১০৲ টাকা ও কলকাতার হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২০৲ টাকা। দাতাদের তালিকা থেকে দেখা যায় ভক্তগোষ্ঠীর কয়েকজন ও অপরিচিত অনেকে এই হিতকর সেবাকাজে সাহায্য করেছেন। এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য অখণ্ডানন্দজী ইতিমধ্যে অনাথাশ্রমের জন্য একটি অর্থভাণ্ডার খুলেছিলেন এবং তার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। খবর পেয়ে অখণ্ডানন্দজী বেলুড় মঠে চলে আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন পাহাড়ী বালক-চারটি। প্রিয় 'গঙ্গাধর'-এর নিকট স্বামীজী সব কথা শোনেন। শোনেন কি প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে; এমন কি তাঁকে গ্রাম থেকে উৎখাত করবার জন্য ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সে-কাহিনীও শোনেন। সব শুনে স্বামীজী তাঁকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন, উৎসাহিত করে বলেন লোকের কথায় বিচলিত না হতে। স্বামীজীর পূত-সাহচর্যে অখণ্ডানন্দজী ভাবাগ্নিতে অগ্নিময় হয়ে উঠলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বলরাম ভবনে তিনি স্বামীজীকে অনাথাশ্রমে প্রবর্তিত ভজনগানগুলি নিজে গেয়ে শোনালেন। সব শুনে স্বামীজী সন্তুষ্টচিত্তে বললেন: "বেশ ভজন তো! Cosmopolitan character! সর্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক ভজন—সবাই করতে পারে!"[১৮] ২০ জুন স্বামীজী ইউরোপ যাত্রা করলে দু-একদিন পরে অখণ্ডানন্দজী শিবনগরে ফিরে এলেন।

বেলুড় মঠ থেকে ২৭ জানুআরি ১৯০০, রওয়ানা হয়ে স্বামী সচ্চিদানন্দ (মতিলাল) শিবনগর আশ্রমে কর্মিরূপে যোগদান করেন। মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ তাঁর সম্বন্ধে লেখেন: "He is one of the ablest of the monks." তাঁকে পেয়ে অখণ্ডানন্দজী খুশি হন। ফেব্রুআরির শেষের দিকে স্বামী সচ্চিদানন্দ 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর সম্পাদককে একটি মূল্যবান চিঠি লেখেন। তার অনূদিত কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে: "অনাথ বালকদের কাছে অখণ্ডানন্দজী একাধারে স্নেহময়ী জননী, করুণাময় পিতা ও জীবন্ত ভগবান।...এখানে আমার স্বল্পকালের অবস্থানের মধ্যে দুটি নতুন বালক অনাথাশ্রমে যোগদান করেছে। একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বরণ করে নেওয়া হয়। অখণ্ডানন্দজী তাদের দুজনকে গরম জল ও সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে দেন এবং অনুষ্ঠানের সর্বক্ষণ উচ্চারণ করতে থাকেন ঋগ্বেদের মন্ত্র: 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।'" চিঠির অন্য অংশে তিনি তুলে ধরেছেন অনাথাশ্রমের জীবনচিত্র: "বর্তমানে ছেলেদের শিক্ষিতব্য বিষয় প্রাথমিক ইংরেজী,[১৯] মাতৃভাষা, গণিত, বয়ন, সূত্রধর্ম, কাঠশিল্প ও রেশমশিল্প। শিক্ষা দেবার জন্য একজন তাঁতী, একজন

১৮ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একদিন বলরাম ভবনে অখণ্ডানন্দজীর মুখে এই প্রার্থনাগানগুলি শুনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন: "দেখ, তোমার ছেলেরা তাঁতের কাজ, ছুতোরের কাজ শিখে কি করবে বলতে পারি না, কিন্তু দুবেলা যদি এই ভজন করে তবে তারা তরে যাবে—তরে যাবে।"

১৯ স্কুলে শিক্ষিতব্য বিষয় সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ ২।১২।১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রমাধ্যক্ষকে লিখেছিলেন: 'English teaching alone would give them life.'

দর্জি, একজন ছুতোর ও একজন বাংলা পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়েছে। রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন সকালে পণ্ডিত ক্লাস নেন। তাঁতশিল্পের ক্লাস হয় প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার। কাঠশিল্পের ক্লাস হয় প্রতি বুধবার ও শনিবার। সেলাইয়ের ক্লাস হয় প্রতি রবিবার সকালে। বেঙ্গল সিল্ক কমিটির ব্যবস্থাপনায় একজন শিক্ষক প্রতি সোমবার ও শুক্রবার রেশমশিল্প সম্বন্ধে শেখান। অখণ্ডানন্দজী বা অন্য কোন সন্ন্যাসী প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইংরেজী শেখান।. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অনাথ বালক এখানে আশ্রমে স্থান পেয়েছে।···আপাতবিরোধী ধর্মমতসকলের প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বজনীন সহনশীলতা ও সত্যে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় এখানকার বারটি[২০] অনাথ বালকের মধ্যে দুটি মুসলমান। বালকেরা প্রতি সন্ধ্যায় প্রায় আধঘণ্টা উপাসনা করে থাকে। হিন্দু বালকদের নিষ্ঠার সঙ্গে গম্ভীর স্বরে প্রার্থনা 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়' চলতে থাকে, তার মাঝে মাঝে শোনা যায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' ইত্যাদি। ভিত্তিহীন আশঙ্কাতে যখন মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে এত তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে সে-সময়ে বালকদের এই প্রার্থনা শুনে শ্রোতা মাত্রেরই মনে ক্ষীণ আশা জাগে সকল প্রচলিত ধর্মের এবং ঈশ্বর ও তাঁর উপাসনা সম্বন্ধে ব্যক্তিমানুষের বিশ্বাসগুলির সমন্বয়সাধন ভবিষ্যতে সম্ভব।"[২১]

এই চিঠিতেই লেখক তুলে ধরেছেন অনাথাশ্রমের একটি বৃহত্তর ভূমিকা। তিনি লিখেছেন: "এখানে সেবাকাজ বুভুক্ষুকে অন্নদান অনাথকে আশ্রয়দানের মধ্যেই সীমিত নয়। অনাথাশ্রমের উদ্দেশ্য বালকদের কায়িক ও বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা, যাতে বালকদের ইচ্ছাশক্তি সঠিক ও সুদক্ষভাবে পরিচালিত হয়, অর্থাৎ তারা যাতে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে। সর্বোপরি তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের জীবন যাতে অপরকে বিশেষতঃ গ্রামের জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। গ্রামের সাধারণ মানুষ যাতে শিক্ষিত বালকদের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের কারিগরি বিদ্যা ও চরিত্রবলের দ্বারা উপকৃত হতে পারে সেজন্য দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে প্রথম থেকেই বালকেরা যাতে জনসাধারণের এবং জনসাধারণও তাদের নিয়ত ও সহজ সান্নিধ্যে বসবাস করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে অনাথাশ্রমের স্থান নির্বাচনের সময় শহরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ অগ্রাহ্য করে গ্রামের সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যই বেছে নেওয়া হয়েছে।" সংগঠক অখণ্ডানন্দজীর মননে নিঃসন্দেহে আধুনিককালের Community School-এর ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছিল।

আশ্রমের অনাথ বালক ও আশপাশের গ্রামের ছেলেদের জন্য ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্বামী সারদানন্দ তাঁর প্রতিবেদনে লেখেন: "গভর্ণমেণ্টের অধীন বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্বে সিস্টার নিবেদিতার পরামর্শে এই বিদ্যালয়ে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং স্কুল ইন্স্পেক্টরগণ পরিদর্শনে আসিয়া ইহার শিক্ষাপ্রণালীর উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। প্রথম দিকে কোন ভর্তির ফি বা

২০ এদের মধ্যে চারটি দার্জিলিং-এর গোর্খা ছেলে। একটি ছেলে পাঠিয়েছিলেন ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কামিং। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড পাঠিয়েছিলেন দুটি মুসলমান ছেলে—নাম বাবর শেখ ও ইমাম শেখ। কলকাতার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন একটি ছেলে।

২১ The Vedanta Keshari, Vol. 5, pp. 361-62

মাসিক টিউশন ফি ছিল না। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সঙ্গতিসম্পন্ন বাড়ির ছেলেদের কাউকে ৵০ আনা, আবার কাউকে ।০ আনা ভর্তির ফি দিতে হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৪, ১৯০২খ্রীষ্টাব্দে নতুন ভর্তি হয় ১২ জন, পরবর্তী বছরে নতুন ভর্তি হয় ৩১ জন। (বিদ্যালয়ের Admission Register-এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হল।) এই সময়ে কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অপর শিক্ষক। সাধুরাও কিছু ক্লাস নিতেন। অল্পসময়ের মধ্যে বিদ্যালয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সরকারি অনুদান পেতে থাকে। বিদ্যালয়টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত[২২] হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে।

আশ্রমস্থ শিল্পবিদ্যালয়ের প্রস্তুত কাপড় গামছা এবং টেবিল, চেয়ার, আলমারি ইত্যাদি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তিকালে কাশিমবাজার মহারাজের বাঞ্জেটিয়া বাগানে আয়োজিত বাৎসরিক শিল্প-প্রদর্শনীতে আশ্রমের ছাত্রদের হাতের কাজ বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।[২৩] আশ্রমকে অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করা ছাড়াও মহারাজ মণীন্দ্রকুমার নন্দী বেশ কিছুকাল "কৃষি-শিল্প বিভাগের সমুদয় ব্যয়ভার একা বহন করিয়াছেন।" তাছাড়াও তিনি বয়নশিল্প ও কাষ্ঠশিল্প-বিভাগের ব্যয়ভার কিছুটা বহন করেছেন। বলা বাহুল্য, শিল্পবিভাগের তৈরি দ্রব্যসকল আশ্রমের প্রয়োজন মিটিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় হতে থাকে।

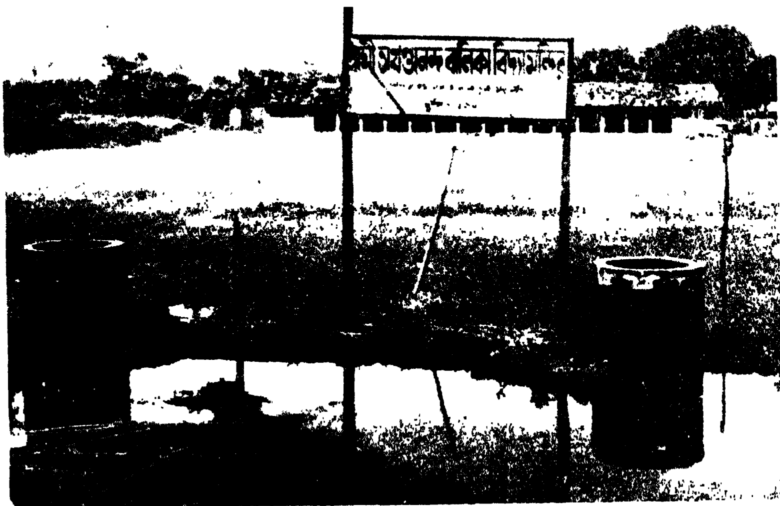
রুজি-রোজগারের শিক্ষা ছাড়াও অনাথাশ্রমের বালকদের জন্য ধর্মশিক্ষা ছিল আবশ্যিক। সকালে ও সন্ধ্যায় ভজনগান, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি সদ্‌গ্রন্থপাঠ বাধ্যতামূলক ছিল। যাবতীয় কর্ম-সূচীর লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থিগণ যেন ভগবৎপরায়ণ হয়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের প্রতি-বেদনের নিম্নলিখিত অংশ লক্ষ্য করবার মতো। তিনি লিখেছেন: "হৃদয়ের শিক্ষাপ্রদান বিষয়েও আশ্রম উদাসীন নহে। আশ্রমাধ্যক্ষ এ-বিষয়ে নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বালকগণকে সর্বদা প্রোৎ-সাহিত করিয়াছেন। নিকটবর্তী কোন গ্রামে যখনই কোনরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অথবা আগুন লাগিয়াছে, অথবা অন্য কোন প্রকার বিপদ-আপদ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই স্বামী অখণ্ডানন্দ ও তাঁহার পুত্রস্থানীয় বালকগণ যাইয়া তাহাদিগকে নারায়ণজ্ঞানে প্রাণপণে সেবা ও তাহাদের বিপদে সাহায্য করিয়াছেন।" এ-বিষয়ে আদর্শ দৃষ্টান্ত ছিলেন অখণ্ডানন্দজী স্বয়ং। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল কলেরা রুগীর কাছে তিনি ছিলেন করুণাময় ভগবানের মতো।[২৪] অখণ্ডানন্দজী বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু কিছু ঔষধপত্র সংগ্রহ করে দরিদ্র গ্রামবাসীদের সাহায্য করতেন; গ্রামীণ জীবনের তদানীন্তন দুরবস্থায় এরূপ সাহায্য ছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ। কয়েকবছর পরেই অখণ্ডানন্দজী দাতব্য চিকিৎসালয় শুরু করেছিলেন।

গ্রামের অবহেলিত সাধারণ মানুষের জন্য প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রাণ কাঁদত। অনাথাশ্রমের কাজ কিছুটা গুছিয়ে নিয়েই তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একটি

২২ তিনটি বালক নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা দেয় ও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে একজন বৃত্তি পায় এবং সেবছরেই বিদ্যালয় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

২৩ রামকৃষ্ণ মিশনের রিপোর্ট উল্লেখ করেছে: At the Banzetia Art Exhibition...the handi-work of the boys has invariably secured a first class certificate.

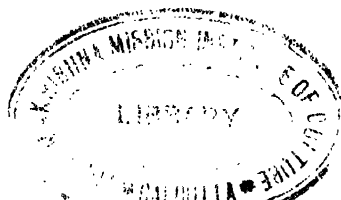
২৪ মহুলাতে ত্রাণকাজ শুরু হওয়া থেকে ১৯১২ পর্যন্ত তিনি ৪৫৯ জন কলেরা রোগীর সেবা করেছিলেন।



শিবনগর, ভাবতা ও মহুলার গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এই জুনিয়র গার্লস হাই স্কুল
( অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ) ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় ( শিবনগর )



মধুসুন্দরী বর্মনীর কাছারিবাড়ি ( শিবনগর )



Orphanage M. E. Ind. School Sargachhi, Murshidabad.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ২২শে [illegible] 22/11/09 | [illegible] | [illegible] | | ১০ | |
| ঐ | [illegible] | [illegible] | ২২শে [illegible] | ঐ | [illegible] | [illegible] | 0 | A. Khandananda [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ঐ | [illegible] | [illegible] | | 11. | A. Khandananda [illegible] |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | | 1. | A. Khandananda [illegible] |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | | 1. | A. Khandananda [illegible] |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | | 0 | A. Khandananda [illegible] |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | | 0 | A. Khandananda [illegible] |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | | 0 | A. Khandananda [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ঐ | ঐ | ঐ | | | A. Khandananda [illegible] |

আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রভর্তির রেজিস্টারের একটি পাতা

অবৈতনিক বিদ্যালয় আরম্ভ করেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরিতে। কয়েকবছর পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে নিরক্ষর কৃষকদের সুবিধার জন্য উহা নৈশ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ২০।২৫ জন বয়স্ক ছাত্র নিয়মিত যোগদান করতে থাকে।

নিজস্ব জমি ও বাড়ির অভাব সত্ত্বেও আশ্রমের কাজকর্ম সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। প্রতিবেশীদের দুটি ঘর নিয়ে কাজকর্মের প্রসারও ঘটে। গ্রামের কায়েমী স্বার্থের দুষ্টচক্রগুলি থেকে বিরোধিতা কিছুটা কমে। চারদিকে উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। ৪ জুলাই ১৯০১ মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. অ্যালান ( Mr. B. Allan ) আশ্রম পরিদর্শন করে আশ্রমের কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ১০৲ টাকা এককালীন দান করে মাসিক ২৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। কাশিমবাজারের মহারাজ একটি ঘোড়া দেন আশ্রমের কর্মীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য। এবছর লালগোলার রাজা আশ্রমের বালকদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভোজন করান, কয়েকটি ছাতা, ৫ খানা কাপড় ও ৮৫৲ টাকা দান করেন।[২৫] এভাবে দেখা যায় বহরমপুর ও অন্যান্য সুধী ব্যক্তিদের সহৃদয়তার ফলে আশ্রমপরিচালনার সমস্যা কিছুটা লাঘব

অখণ্ডানন্দজী ও তাঁর সহকর্মীদের উৎসাহ ও কর্মশক্তি শতগুণে বেড়ে যায় স্বামীজীর লেখা ২১ ফেব্রুআরি ১৯০০ তারিখের চিঠি পেয়ে। বারবার সকলে পড়েন। চিঠি তো নয়, শাশ্বত প্রেরণা-নির্ঝর। স্বামীজী তাতে লিখেছেন: "সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়।...হৃদয় যত দেখাতে পারবে, ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলে বোঝে।...এইটি বোঝ—ঐ দু-একটি গাঁয়ের উপর ঐ ২০টি অনাথ বালক সহিত অনাথাশ্রম, ঐ ১০ জন ২০ জন কার্যকরী—এই যথেষ্ট, এই বজ্রবীজ। ঐ থেকে কালে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবে; ...নির্ভয়ে কাজ করে যাও—ওয়াহ্ বাহাদুর!! সাবাস্, সাবাস্, সাবাস্!...আমাদের mission হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্র-লোকের জন্য। ঐ চাষাভূষোরা ভালবাসা দেখে ভিজবে; পরে তারাই দু-এক পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রামে মিশন start করবে এবং ক্রমে ওদের মধ্য হতে শিক্ষক বেরুবে।...জয় গুরু, জয় জগদম্বে, ভয় কি?...বাক্যি-যাতনা, শাস্ত্র-ফাস্ত্র, মতামত আমার এ বুড়ো বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজ করবে, সেই আমার মাথার মণি—ইতি নিশ্চিতম্।" দেখা যায়, স্বামীজীর এসকল বাণী একদিকে কর্মীদের মধ্যে প্রেরণা জুগিয়েছে, অপরদিকে আশ্রমের সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করতে সাহায্য করেছে।

আশ্রম-সংগঠন ও গ্রামোন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত থাকলেও অখণ্ডানন্দজীর কোমলপ্রাণ আর্ত-পীড়িত মানুষের ক্রন্দনে চঞ্চল হয়ে উঠত। এই প্রসঙ্গে অনেক ঘটনার একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাক। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গাপূজায় অখণ্ডা-নন্দজী আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন লালগোলা রাজবাটীতে। দেখেন, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। দরিদ্রের মধ্যে চোদ্দ-পনের হাজার কাপড় বিতরণ হতে দেখে প্রেমিক সন্ন্যাসী আনন্দিত। এমন সময় দুঃসংবাদ আসে ভাগলপুর জেলার গেরুয়া নদীর জলপ্লাবনে অনেক মানুষ বিপদগ্রস্ত। অখণ্ডানন্দজী ছুটে যান। নবমীর দিন পৌছান ঘোঁগা গ্রামে। প্রায় আড়াই মাস সেখানে আর্তদের মধ্যে ত্রাণকাজ করে তিনি শিবনগরে ফিরে আসেন।

২৫ উদ্বোধন, ৩য় বর্ষ ১৫ সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৪

মধুসুন্দরী বর্মনীর দেওয়া জমির উপর নির্ভর করে নতুন পাকা বাড়ির জন্য ইট তৈরি হতে থাকে। সবশুদ্ধ তিন লক্ষ ইট তৈরি করা হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা এর জন্য দু'হাজার মন কয়লা ও প্রয়োজনীয় অর্থ দান করেন। কিন্তু আইনঘটিত সমস্যায় এ-জমির উপর বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের পূর্বে ২৫ বিঘা নিষ্কর জমি সংগ্রহের জন্য অনেকখানি অগ্রসর হওয়া গেছিল। এমন কি কালেক্টরিতে ১২৬০॥৮ পাই জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনার এই সরকারি সিদ্ধান্ত নামঞ্জুর করে দেন। শেষ পর্যন্ত উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেনের বিশেষ চেষ্টায় হাজি মহরম আলি ও মিঞা আবদুল আজিজ এই দুই জমিদারের সারগাছির ৫০ বিঘা জমি ২০০৲ টাকা সেলামি ও বার্ষিক ২০৬।০ খাজনায় মৌরসি পাওয়া যায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে দলিল রেজিস্ট্রি হয়। কয়েকটি চালা ঘর তৈরি করে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে আশ্রম নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয়। এসকল অবশ্য আলোচ্যকালের এক দশক পরের কথা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা হল সারগাছিতে আশ্রম স্থানান্তরিত হলেও শিবনগর, ভাবতা ও মহুলার গ্রামবাসীদের মনে অখণ্ডানন্দজী বিরাট প্রভাব রেখে এলেন। দীর্ঘ ছয় দশকের ব্যবধানেও সেই প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়নি। স্থানীয় গ্রামবাসীরা ভুলে যাননি অখণ্ডানন্দজীকে যিনি নূতন আলোকের বার্তাবহরূপে তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে শিবনগর, ভাবতা ও মহুলার গ্রামবাসীদের উদ্যোগে শিবনগরে একটি জুনিয়র গার্লস হাই স্কুল (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) স্থাপিত হয়। গ্রামবাসীরা স্কুলটির নামকরণ করেছেন: 'স্বামী অখণ্ডানন্দ বালিকা বিদ্যামন্দির'।

আলোচ্য পাচ বছরের মধ্যে কর্মবীর অখণ্ডানন্দজী যতটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, সেটুকু তাঁর স্বপ্নসৌধের আভাস মাত্র, তাঁর বিশাল পরিকল্পনার সামান্য কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাশিত গ্রামীণ ভারতের জাগরণের জমি প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন তিনি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অখণ্ডানন্দজী চেয়েছিলেন কয়েকটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যা দেখে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গ্রামের জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে শিখবে, তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিস্তারের পদ্ধতি শিখবে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, এ-সকল প্রতিষ্ঠান ছয়টি বিভাগের সেবাকাজ পরিচালনা করবে: (ক) গ্রামীণ অনাথ শিশুদের জন্য অনাথাশ্রম গড়ে শিশুদের পিতামাতার ভূমিকা পালন; (খ) মহামারী, মানুষের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা ও আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য ত্রাণকাজ; (গ) সাধারণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা; (ঘ) কার্যকর শিল্পকলাদিতে প্রশিক্ষণ; (ঙ) আধুনিক কৃষি-পদ্ধতির জন্য প্রশিক্ষণ এবং (চ) রোগের চিকিৎসা ও মেয়েদের নার্সিং, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ। এই ছয়টি বিভাগের সেবাকাজ জেলা-ভিত্তিক কেন্দ্রে ও তার শাখাকেন্দ্রগুলিতে সংগঠন করতে হবে। এই সেবাকাজ করতে হবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এভাবে ধর্মীয় রীতিনীতির ভিত্তিতে জেলাকেন্দ্রে গড়ে উঠবে একটি কেন্দ্রীয় কর্মি-আশ্রম, যার লক্ষ্য হবে পাশাপাশি অবস্থিত ছয়টি স্বতন্ত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী সুসমন্বিত করা ও জনসাধারণের উন্নতিসাধন করা। জেলাকেন্দ্র হবে প্রধান কেন্দ্র, যেখান থেকে প্রসারলাভ করবে গ্রামীণ সংস্থাসকল। এই সংস্থাগুলি স্থানীয় চাহিদা অনুসারে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং ত্রাণকাজ সংগঠন করবে। সারগাছির জেলাকেন্দ্র ও অনাথাশ্রম

দরিদ্র সম্প্রদায়ের প্রশিক্ষিত যুবকদের সেবাব্রতে আত্মত্যাগ করবার জন্য উদ্বোধিত করবে। সে-সকল নিবেদিতপ্রাণ যুবক গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। সে-সকল যুবকর্মী রুজিরোজগারের জন্য কিছু কাজকর্ম করতেও পারে, না করতেও পারে। উদ্দেশ্য, গ্রামের লোক নিষ্ক্রিয় সেবাগ্রহণকারী মাত্র না হয়ে জাগরণের বার্তার প্রচারক হবে এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রবর্তিত মহৎ আদর্শে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করবে।[২৬] স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ ভারতের রূপায়ণে সমর্থ এই পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার রচয়িতা স্বামী অখণ্ডানন্দ। এবং এর প্রথম সার্থক রূপকারও স্বামী অখণ্ডানন্দ যিনি সগর্বে গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখেছিলেন: "আমার Mission work কেবল নিরক্ষর নিরন্ন চাষাভুষাদের জন্য।"[২৭] গ্রামের নিরক্ষর নিরন্ন খেটে-খাওয়া মানুষদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি সেবাতীর্থে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। অখণ্ডানন্দজীর পরিকল্পিত এই প্রতিষ্ঠানের ভাবরূপটি ফুটে উঠেছে তাঁর সহকর্মী স্বামী সচ্চিদানন্দের ১৯০০ লেখা এক নিবন্ধে। সেখানে তিনি লিখেছেন: "The institution, when fully organised, with its school, museum, library, collection of animals, scientific laboratory, agricultural, mechanical, industrial and mercantile pursuits, side by side with systems for spiritual development, will be a world epitomised, at a glance at which, one may get an idea of the diverse phases of advanced civilization up-to-date."[২৮]

বিবিধ কারণে অখণ্ডানন্দজীর এই স্বপ্নসৌধ বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ও সেবাযজ্ঞে যে আদর্শ ও নীতি প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেই আদর্শ ও নীতি একদিকে তাঁর কর্মক্ষেত্রকে পরিণত করেছে সেবাতীর্থে অপরদিকে সঙ্ঘমধ্যে অফুরন্ত প্রেরণা ও প্রাণশক্তি জুগিয়েছে। পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ কুম্ভকোণম্ বক্তৃতায় বলেছিলেন: "আমার আদর্শ—জাতীয় আদর্শে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি।"[২৯] আমাদের জাতীয় আদর্শ হচ্ছে অদ্বৈততত্ত্বানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত অভয় ও বৈরাগ্যের আদর্শ। এই উঁচু আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষে মানুষে ভাই বা সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান এসকল সম্বন্ধই ক্ষণভঙ্গুর। এই আদর্শের আলোকে সেবাযোগের ভিত্তি অভেদ আবিষ্কার, যার দ্বারা সেবক আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করে সকল প্রাণীতে স্বাভাবিকভাবেই নিজের প্রেম অর্পণ করে থাকে। এই আদর্শেরই অনুপ্রেরণাতে অখণ্ডানন্দজী ১৯ অক্টোবর ১৮৯৮ তারিখে লিখেছিলেন: "মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া যে আমি একদিন হিমালয়ের উচ্চ উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মস্তকে মস্তকে বেড়াইতাম, সেই আমি মনুষ্যেই সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি মানুষসমাজের সেবাই তাঁহার সেবা। ভগবান যেন আসিয়া আমার কানে কানে বলিতেছেন—ওরে, এই মানুষই বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও রামকৃষ্ণাদি অবতার—এই মানুষই সব।" অনাথাশ্রমে বিভিন্ন

২৬ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম জেনারেল রিপোর্ট, পৃ: ২৫-২৬
২৭ ১৬ নভেম্বর ১৯১৫ তারিখে লেখা চিঠি।
২৮ The Brahmavadin, Vol. V, No. 5, p. 361
২৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮৫

জাতপাতের ছেলেদের সেবা করেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন : "মনুষ্য-সন্তান মাত্রেই মহত্ত্বের আধার ও অমৃতত্বের অধিকারী।"[৩০] একই দৃষ্টিকোণ থেকে অখণ্ডানন্দজী একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন : "মনুষ্যের উপমা-স্থান এ-জগতে নাই! নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যের বিকাশস্থল একমাত্র মনুষ্যে! মানুষিক, অমানুষিক, লৌকিক ও অলৌকিক যাবতীয় শক্তি একমাত্র মনুষ্যেই কেন্দ্রীভূত। মানুষ এতাদৃশ শক্তিশালী হইয়াও যদি আপন শক্তি-সমষ্টির উন্মেষ করিবার চেষ্টা না করে তো তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। লুপ্ত-গৌরব মনুষ্য-সমাজের উন্নতি কামনা করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই পরম পুরুষার্থ।" ঐ নিবন্ধের শেষাংশে অখণ্ডানন্দজী সচেতন সহৃদয় দেশবাসীকে আহ্বান করে লিখেছেন : "সুতরাং জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও যাহাতে তাহারা সহজসাধ্য জীবিকা উপার্জনোপযোগী কার্যে দক্ষতা লাভ করিয়া সুখে কাল যাপন করণান্তর জীবনের অবশিষ্টকাল মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই কি আজ দেশের শিক্ষিত, সমর্থ, স্বদেশের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্তব্য নয়?"[৩১] এভাবে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন গ্রামোন্নয়নের গুরুদায়িত্বের কাজে। শুধু আহ্বান করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি তাঁর বিধৃত আদর্শ প্রয়োগ করে মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে প্রদর্শনক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন, তা দেখিয়ে দেশবাসীকে উদ্বোধিত করেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'সেবাযোগ' এই প্রদর্শনক্ষেত্রে সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রদর্শনক্ষেত্র পরিণত হয়েছে 'সেবাতীর্থে'। সেখানে পুণ্যলাভের জন্য, প্রেরণালাভের জন্য, সেবাকাজের পথানুসন্ধানের জন্য আজ লোকের ভিড়। এই সেবাতীর্থ সকল সেবাকর্মীর আলোকস্তম্ভ।

আজ যে অখণ্ডানন্দজীর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের তপস্যায় তীর্থীকৃত হয়েছে এই পুণ্যতীর্থ তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথাটি হচ্ছে, নারায়ণজ্ঞানে মানুষকে ভালবাসা ও মানুষের সেবা করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ' ভাবনায় তাঁর জীবন সমর্পিত এবং তাঁর সেই সেবামূর্তির উজ্জ্বলতম প্রতিফলন পড়েছে এই সেবাতীর্থে। তাঁর সেবক-জীবনের মূল সুর-ছন্দ-লয় গভীরভাবে স্পষ্টাকারে ধরা পড়েছে সেবাতীর্থে। এখানকার আকাশে-বাতাসে আজও কান পাতলে শোনা যায় তাঁর অন্তরাত্মা থেকে নিয়ত উৎসারিত প্রাণ-শিহরণ-কারী প্রার্থনা-মন্ত্র :

কো নু স স্যাদুপায়োঽত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য সততং ভবেয়ং দুঃখভারভাক্॥[৩২]

অর্থাৎ এ-সংসারে এমন কি উপায় আছে যার দ্বারা আমি সকল দুঃখী প্রাণীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের দুঃখ নিজেই ভোগ করতে পারি?

[ সমাপ্ত ]

৩০ স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৮০

৩১ উদ্বোধন, ৬০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১২১-২৪

৩২ স্মৃতিকথা, পৃঃ ১০৫। এই শ্লোকই কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারে দেখা যায় শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।২১।১২) রন্তিদেবের প্রার্থনায় :

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥

# স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম : স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

অগ্রজরা বলতেন, বাঙালীর তৎকালীন আত্মকেন্দ্রিকতাকে স্বামীজী তীব্র ভাষায় নিন্দা করতেন। স্বামীজী চাইতেন নিজেদের বাঙালী বলে শুধু না ভেবে ভারতীয় বলে যেন আমরা ভাবি এবং অন্য প্রদেশের মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে উদ্বুদ্ধ হই। স্বামীজীর এই চিন্তা কিভাবে রূপলাভ করেছিল তার সাক্ষী ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সারা বাংলা জুড়ে 'রাখীবন্ধন' উৎসব এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করার জন্য কলকাতায় 'শিবাজী উৎসব'। অনুশীলন-সমিতির এই দুটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

অনুশীলন-সমিতি বাংলাদেশে শ্রমজীবী বিদ্যালয় বা Working Men's Institution প্রবর্তন করে। সন্ধ্যাবেলায় আমরা দরিদ্র শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখাতাম। এইভাবে আমরা সমাজের অস্পৃশ্য ও দীনহীন দরিদ্র নরনারায়ণ তথা সমগ্র দেশবাসীর সেবা করবার চেষ্টা করেছি। অনুশীলন-সমিতির এইসব প্রচেষ্টার মূলে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবই যে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে, সেকথা বলা বাহুল্য। শ্রমজীবী মানুষদের, মূর্খ, দরিদ্র, অস্পৃশ্য মানুষদের সেবা করার কথা, তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার কথা স্বামীজীই প্রথম বলে গিয়েছিলেন। স্বামীজী আচণ্ডাল ভারতবাসীকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন, 'ভাই' বলে বুকে টেনে নিতে বলেছিলেন। তাঁর বাণী অনুসরণ করেই অনুশীলন-সমিতিতেও দেশের সকল মানুষ সম্পর্কে অনুশাসন ছিল : "Love all, hate none"—সকলকে ভালবাস, কাউকে ঘৃণা করো না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামীজীর প্রেরণা সম্যক্ উপলব্ধি করতে হলে তখনকার পটভূমি আলোচনা করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অভূতপূর্ব। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্রিটেনবাসীর গর্ব : The sun never sets in the British Empire, Britannia rules the waves. ভারত সেই সাম্রাজ্যের মুকুটমণি। পদানত ভারত নিদারুণ-ভাবে শৃঙ্খলিত। এই প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিকে আঘাত করবার প্রেরণা জোগাল স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান। তাঁর বাণী হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রচারিত হল। তিনি প্রমাণ করলেন পাশ্চাত্য জগৎ অজেয় নয়। স্বামী বিবেকানন্দকে যে 'বীর সন্ন্যাসী' আখ্যা দেওয়া হয় তা অত্যন্ত সমীচীন। তাঁর গভীর দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করেই তাঁর অনুজ, বাংলায় বিপ্লবের অন্যতম অগ্রণী নেতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে যে 'Patriot-Prophet' আখ্যায় ভূষিত করেছেন তা অত্যন্ত সার্থক। প্রবীণ বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর পাশ্চাত্য বিজয়ের ঘটনাকে প্রায়শঃ 'Conquest of the West'-এর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতেন। তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন : "বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যে জয় সেটা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জয় নয়, পরাধীন জাতির ঐতিহ্যের দাবি মিটিয়ে সে এক পরম বিত্ত

বলে প্রমাণিত ও পরিগণিত হয়েছিল।…দেশের দুর্দশা, পরাধীনতার হীনতা তাঁর অন্তঃসত্তাকে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল, তেমনি হয়তো খুব কম লোককেই দিয়ে থাকবে।"

স্বামীজী শুধু বাণী দিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি। ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। বিপ্লবের ইতিহাস লেখক প্রবীণ বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ তাঁর 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ( পৃঃ ৬৯—৭০ ) লিখেছেন : "স্বামীজী স্বয়ং ভারতের মুক্তির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। দেশীয় রাজন্যবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিদেশী অস্ত্র-নির্মাতার নিকট হতে হাতিয়ার সংগ্রহ দ্বারা তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন। একথা ভাবতেও আজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়।"[১]

বিবেকানন্দের বাণী যে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে তা বহু বিপ্লবীর আত্মজীবনীতে বা বিপ্লবের বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুতঃ বিপ্লবীরা স্বামীজীর বাণীগুলিকেই Sacred Scriptures (পবিত্র ধর্মগ্রন্থ) বলে জ্ঞান করতেন। স্বামীজীর জীবন ও কর্মতপস্যাকে গীতার বাস্তব রূপায়ণ বা Practical application of the Gita বলে ধারণা করা যেতে পারে। প্রবীণ বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ স্বামীজীর রচনাবলীকে "নব-গীতা" আখ্যা দিয়েছেন।

বাংলার অগ্নিযুগে পুলিশ বিপ্লবীদের গুপ্ত আড্ডা অথবা ঘর-বাড়ি অনুসন্ধান করে অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীজীর ছবি অথবা রচনার সন্ধান পেয়েছে। এতে কোন অতিরঞ্জন নাই। অবশ্য তার সঙ্গে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থও থাকত, যেমন গীতা, চণ্ডী। কারণ এগুলি বিপ্লবীদের অবশ্যপাঠ্য ছিল। বস্তুতঃ পুলিশ যখন কোন যুবককে প্রথম সন্দেহ করত সে বিপ্লবী দলে আছে কি না, তখন কিছুদিন তার অনুসরণ করত, পিছু নিত—দেখত কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে, কি করে ইত্যাদি। সন্দেহ একটু পাকা হলে কোর্ট থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট আনত এবং বাড়ি খানাতল্লাসী করত—বিশেষতঃ ঐ ছেলেটির পড়বার এবং শোবার ঘর। এবং যদি স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে গীতা ও স্বামী বিবেকানন্দের বই পাওয়া যেত তবে নিঃসন্দেহ হত যে সে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত। তখন তার আর নিস্তার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হত এবং যথারীতি তার শাস্তিবিধান হত। অর্থাৎ ঐ বইগুলিই ছিল পুলিশের কাছে বিপ্লবের স্থির নিদর্শন, বিপ্লবীর নিশ্চিত পরিচয়।

বিপ্লবীদের উপর প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষভাবে স্বামী বিবেকানন্দের—পরোক্ষভাবে রামকৃষ্ণদেবের। তাঁর প্রিয় শিষ্য নরেনের মধ্যে রামকৃষ্ণদেব যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে সেই শক্তি বিপ্লবীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণদেবের কালীসাধনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কালীই সকল শক্তির আধার। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় তিনদিন ব্যাপী নিখিল ভারত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়েছিল। বর্ষীয়ান্ বিপ্লবী নেতা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অবদানের কথা বলেছিলেন, প্রধানতঃ স্বামী

১ এই তথ্যটির সূত্র ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি জানিয়েছেন সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে তিনি এই সংবাদটি পেয়েছেন। ক্রিস্টিন তাঁকে বলেছিলেন স্বামীজীর নিজের মুখেই তিনি ( ক্রিস্টিন ) তাঁর ( স্বামীজীর ) ঐ পরিকল্পনার কথা শুনেছেন। দ্রঃ Swami Vivekananda : Patriot-Prophet, 'Foreword' VIII-IX.

বিবেকানন্দ যে ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতম করে দিয়েছিলেন তা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। সেই সভায় একজন প্রবীণ বাঙালী বিপ্লবী মন্তব্য করেছিলেন যে রামকৃষ্ণদেব যে শক্তিসাধনা করেছিলেন তাই ছিল বিপ্লবীদের আদি উৎস। এও লক্ষণীয় যে, বিপ্লবীরা প্রায়শঃ মা কালীর সামনে নিজ নিজ আঙুলের রক্ত দিয়ে জন্মভূমির মুক্তিকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতেন, মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতেন। অনেকে সকলের অগোচরে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তর্পণ করতেন। মা কালীর প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ চিরন্তন সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কালী-সাধনা এবং দক্ষিণেশ্বরে তাঁর মা ভবতারিণীকে জীবন্ত ও জাগ্রত করার সত্য ইতিহাস বাংলার বিপ্লবীদের মনে যে প্রচণ্ডভাবে প্রেরণা জুগিয়েছিল তাও সত্যি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিমন্ত্র :

জাগ বীর, ঘুচায়ে স্বপন,
শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার
প্রেতভূমি চিতা মাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

বিপ্লবীদের কাছে এ ছিল অগ্নিবেদ।

ভারতের স্বাধীনতালাভের পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় যে সাম্যবাদের স্বপ্ন বিপ্লবীরা দেখেছিলেন তারও মূলে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁরই নির্দেশনা—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

জনসাধারণের সেবা, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষকে মর্যাদা দান—এটাই আধুনিক সাম্যবাদের ভিত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান্ শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দ বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন।

ভারতের নবজাগরণের যুগে জাতির মনে স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা দিয়েছিলেন অনেক স্মরণযোগ্য নেতা। বাংলাদেশে দিয়েছিলেন রামমোহন রায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ। অন্যান্য প্রদেশেও বহু তেজস্বী রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব হয়েছিল, যথা বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ। কিন্তু যদি এ-বিষয়ে কোনও একজনের প্রাধান্য স্বীকার করতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে স্বামী বিবেকানন্দকে 'The maker of modern India' বলে অভিহিত করতে হবে। তিনি সকলের মধ্যমণি। সহজ কথায় বলতে গেলে বিস্ফোরণের জন্য পূর্বসূরীরা যে বারুদ সংগ্রহ করেছিলেন তাতে স্বামী বিবেকানন্দই অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। তিনিই প্রমাণ করেছিলেন যে আমরা হীনবল নই, আমরা অসাধ্য সাধন করতে পারি। বলা বাহুল্য, শুধু প্রেরণা দান নয়, বিজয়ের পথও তিনি দেখালেন। সহায় সম্বলহীন অনাহূত ভারতীয় সন্ন্যাসী যিনি আগের দিন শিকাগো সহরে রাস্তার ধারে প্যাকিং বাক্সে শুয়ে রাত কাটালেন, তিনিই পরের দিন ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বজয় করলেন, জগতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করলেন, প্রমাণ করলেন। ভারতবাসীর সুপ্ত আত্ম-সম্বিত আবার ফিরে এল। বস্তুতঃ তখন থেকেই ভারতের প্রকৃত জাগরণ সূচিত হল।

[ ক্রমশঃ ]

# তুমি, শুধু তুমি

মণিদীপা চট্টোপাধ্যায়

বাইবেলে আছে, আমাদের
প্রভু বড় হিংস্বক। ওগো,
তোমাকে ভালবেসে আমিও
যে খুব হিংস্বটে হয়ে যাচ্ছি।
আমি তোমাকে বলছি,
তুমি শোন—
তোমার উপর সম্পূর্ণ অধিকার
শুধু আমার একার, আর ঐ
অধিকার এতটুকু ও কেউ পাবে না।
তোমার নয়নদুটি শুধু
আমাকেই চাইবে, আর
কাউকেই নয়।

ওগো, আমার ধ্যান-জ্ঞান-তপস্যা সে
শুধু যে তোমাকেই নিয়ে।
তোমার চিন্তায় যে আমার
দেহ মন প্রাণ সব আচ্ছন্ন
হয়ে যেতে চাইছে। আমি
যে এক মুহূর্তের জন্যেও
হৃদয় হতে তোমাকে বিযুক্ত
করতে পারছি না।
তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ,
আমার আত্মার আনন্দ।
আমার দেহ দিয়ে, মন
দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আমার
আত্মা দিয়ে—আমার
যা আছে সব দিয়ে তোমাকে
একান্তে পেতে চাই।
তোমায় এত ভালবাসি তাই
তোমাকে পরিপূর্ণভাবে আমি
আস্বাদ করতে চাই।

আমার সাধ হয় তোমাকে
আমার নিবিড় আলিঙ্গনে পেতে।
কল্পনায় দেখি তোমার
সাথে আমি বিলীন
হয়ে গেছি। বরফ গলে
যেমন জলের সঙ্গে একাকার
হয়ে যায়, নুনের পুতুল
যেমন সাগরের মাঝে
হারিয়ে ফেলে নিজেকে তেমনি।

তোমায় দেখতে পাই না।
আমার ব্যাকুল হৃদয় গুমরে
গুমরে কাঁদে তোমায় না
দেখে। ওগো, কবে, কবে তোমার
দেখা পাব? কবে তুমি
আমার কাছে ধরা দেবে
প্রিয়তম, শুধু আমারই হয়ে।

স্বপ্ন দেখি আমি এক
ভুবন রচনা করেছি। সে
শুধু আমারই ভুবন।
না না, শুধু আমারই ভুবন
নয়, আমার আর তোমার ভুবন।

না না। আমি নেই সেই
ভুবনে। আমার আমি কখন হারিয়ে
গেছে তোমার মধ্যে।
আমি কখন তুমিময়
হয়ে গেছি। সে ভুবন
জুড়ে রয়েছ শুধু তুমি!
তুমি, শুধু তুমি!

# বিনয় সরকার ও নিরক্ষরের অধিকার*

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের বোধহয় সবচেয়ে প্রভাবশালী সমাজ-দার্শনিক। অজস্র ধারায় তিনি আমাদের জাতীয় চিত্তকে নবজীবন-রসায়নে সঞ্জীবিত করেছিলেন। আজ যে আমরা দেশের কথা বলতে গিয়ে জনগণের কল্যাণের কথা সকলের আগে উচ্চারণ করি এর মূলে তো দেখি স্বামীজীর প্রভাব। স্বামীজীর দেহাবসানের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিধির বাইরে স্বামীজীর ভাবাদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরী ছিলেন পরলোকগত মনীষী বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)। বিরাট প্রতিভার অধিকারী হয়েও এবং প্রভূত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পরও তিনি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ বলেই মনে করতেন। সমাজের দুর্গত, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষদের কথা তিনি জীবনভর চিন্তা করেছেন ও অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষদের ললাটে পরিয়েছেন মনুষ্যত্বের গৌরব-তিলক। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অজ্ঞাতকুলশীলরাই ইতিহাসে নতুন নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। পয়সা বা বিত্ত মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয় এবং বিত্তহীনতা বা দারিদ্র্য মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক নয়—এ ধারণা তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সমাজ-দর্শনে পাই: "দুনিয়ার সর্বত্র আজকের পারিয়া কাল হয়েছে ব্রাহ্মণে পরিণত। আজকের গরীবের হাতে কাল এসেছে ধনসম্পদ। আজকের কাপুরুষ কাল হয়েছে গুণ্ডা। আজকে যে গুণ্ডা কাল সে সেনাপতি।"[১] দুনিয়ার সর্বত্র সামাজিক রূপান্তর সাধিত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালীর সমাজ-জীবনে বর্ণহিন্দুর যে দাপট ছিল পরবর্তী ত্রিশ বছরে সে দাপট যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে মুসলমান শক্তি ও অন্যান্য অনুন্নত শক্তির স্পষ্ট জাগরণে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন' বইয়ের প্রথম ভাগে বিনয় সরকার "বঙ্গসমাজের রূপান্তর ও নিরক্ষরের অধিকার" সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "বাংলার নরনারী বলিলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের যুগে আমরা যে ধরনের লোকজন বুঝিতাম, ১৯৩২ সনে একমাত্র সেই ধরনের লোকজনই বুঝি না। নতুন নতুন রঙের, নতুন নতুন রূপের, নতুন নতুন নামের, নতুন নতুন ঢঙের নরনারী বাঙালী জাতের অন্তর্গত, একথা আমরা আজ বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে সহরে সহরে আর কলিকাতার মতন কেন্দ্রস্থলেও অহরহ বুঝিতেছি। সোজা কথায়, আমরা আমাদের চোখের সামনে বাঙালীর সামাজিক জীবনে একটা সুবিস্তৃত বিপ্লব দেখিতে পাইতেছি।"[২] বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতিতে শুধু মুসলমান শক্তি নয়, তথাকথিত অনুচ্চ শ্রেণীর নরনারী, 'আদিম' জাতির নরনারী ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ও বাঙালী জাতির হাড়মাসের মধ্যে ক্রমশঃ প্রবেশ করে বঙ্গসমাজে বহু ওলটপালট সাধন করছে। ভবিষ্যতে এই সমাজ-বিপ্লবের ঝোঁক আরও বেড়ে যাবে। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে 'বৈঠকে' বিনয় সরকার খুব দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে পরবর্তী ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে বঙ্গ-সংস্কৃতি মুসলমান, তপসিল ও অনুন্নত শ্রেণীর নরনারীর

* অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের জন্মের শতবর্ষপূর্তি (২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭) উপলক্ষে প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক

১ বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম ভাগ (১৯৪৪), পৃঃ ৪২৩

২ নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন, ২য় ভাগ (১৯৩২), পৃঃ ৩৭২

হাত-পার জোরে আর মাথার জোরে গরীয়ান হয়ে উঠবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে উপলব্ধি করছি।

বিনয় সরকার নিরক্ষরদের অধিকার নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছেন ও লিখেছেন। তাদের জন্য এই দরদের পেছনে ছিল তাঁর ছোটবেলাকার মালদহী জামতল্লীর গম্ভীরার প্রভাব। তাঁর জন্মভূমি মালদার কথা তাঁর পক্ষে ভুলে যাওয়া ছিল অসম্ভব। তিনি 'বৈঠকে' (২য় ভাগ) নিজেই বলেছেন: "মালদার লোকজনের সঙ্গে আমার হাড়-মাংস মাখানো রয়েছে। মালদার পোদ্দার, সাউ, চুনিয়া, নুনিয়া, কাঁসারি, পাঝ্‌রা, মহলদার ইত্যাদি জাতের ছোকরারা আমার পরম আত্মীয়। আমার জীবনের আসল ভিত এদের ভেতর রয়েছে। রক্তের যোগ, নাড়ীর যোগ, আঁতের যোগ মালদহীয়াদের সঙ্গে অতি নিবিড়।"[৩]

বিনয় সরকার তাঁর সমাজ-দর্শনে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত শব্দ দুটিকে একার্থক বিবেচনা করতেন না। সাধারণতঃ লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা নিরক্ষর-দের সম্বন্ধে ঘরোয়া কথাবার্তায় বা চাল-চলনে ও ব্যবহারে যে ধরনের তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকেন, তিনি তা থেকে মুক্ত ছিলেন। মানুষকে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবেই দেখতেন। অক্ষরজ্ঞান না থাকলে ভোটাধিকার থাকবে না এই সূত্রচালিত ধ্যান-ধারণার প্রতি তাঁর কোন সায় ছিল না। কারণ তিনি নিরক্ষরকে অশিক্ষিত বলতেন না। এম. এ. ক্লাসে পড়াবার সময় তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই বলতেন, লেখাপড়ায় পাশ-ফেল ছাড়াও জীবনে হাজার রকমের পাশ-ফেল রয়েছে। স্কুল-কলেজে কৃতকার্যতাই একমাত্র কৃতকার্যতা নয়। "The last boy in the class is not the worst figure in Bengal. Perhaps he is the most creative"—এই হল তাঁর উক্তি তিনি লিখেছেন: "নিরক্ষর শব্দে বুঝিতে হইবে অতি সোজা কথা। লোকগুলি লিখিতেও পারে না, পড়িতেও পারে না। কিন্তু নিরক্ষর বলিলে আমি লোকগুলিকে অশিক্ষিত বলি না। নিরক্ষর লোকেরাও বেশ শিক্ষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় পৃথিবীতে অশিক্ষিত কোন লোক আছে কিনা সন্দেহ। যে লোক বেত বুনিয়া টুক্‌রি তৈরি করে তাহার মগজে কিছু না কিছু ঘি আছেই আছে। যে লোক দিনের পর দিন নিয়মিতরূপে হাল চালায়, বলদ-সেবা করে, গাড়ি হাঁকায়, নৌকা বহে সে লোক হয়তো লিখিতে পড়িতে পারে না। কিন্তু তাহার মগজও আছে আর সেই মগজের ভিতর চিন্তা করিবার শক্তিও আছে। এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, কাজ করিতে করিতে প্রত্যেক লোকই, সে যত বড় নিরক্ষর হউক না কেন, দিনের পর দিন তাহার মগজ চষিয়া যাইতেছে। কাজের সঙ্গে সংস্পর্শে মগজ চষার ফলে তাহার জ্ঞান বাড়িতেছে। প্রতি মুহূর্তে সে সজ্ঞানে সজাগভাবে মাথা খেলাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। কাজেই বাংলা দেশের যে সকল নরনারী এখনও লিখিতে পড়িতে পারে না তাহাদিগকেও আমি শিক্ষিত জ্ঞানী চিন্তাশীল ও মস্তিষ্কজীবী নরনারীর ভিতর গণ্য করিতে অভ্যস্ত।...পেশা মাত্রই সম্মানের যোগ্য। যাহারা কোন না কোন পেশা চালাইতেছে তাহারা লিখিতে পড়িতে পারে কিনা তাহা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু লিখিতে পড়িতে না পারা সত্ত্বেও পেশা চালাইবার মতো যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা যে সকল লোকের আছে তাহারা লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের মতোই সমাজের মেরুদণ্ড।...লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণী হইতে নিরক্ষরদিগকে যে তফাৎ করিয়া রাখা হইয়াছে

৩ বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় ভাগ (১৯৪৫), পৃঃ ৬৫৫

তাহা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।"[৪] বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতার কথা হিসাব থেকে বাদ দিলেও চরিত্র হিসাবে নিরক্ষর শিক্ষিতের চেয়ে খাটো নয়। বিভিন্ন দেশের ও সমাজের নিরক্ষরদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা করে বিনয় সরকার এই নিরেট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 'নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন' গ্রন্থে তিনি বলেছেন: "এইবার নিরক্ষরদিগের নৈতিক চরিত্র ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির কথা বলিব। নিরক্ষর নরনারীকে চাষাভূষারূপে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা আমাদের দস্তর। কিন্তু নিরক্ষর লোকেরা চরিত্র হিসাবে বাস্তবিক খাটো কি? লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা অর্থাৎ ইস্কুলমাস্টার কেরানি সরকারি চাকুরে উকিল ডাক্তার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কংগ্রেসের জননায়ক ইত্যাদি শ্রেণীর নরনারী চরিত্র হিসাবে চাষী মজুর মিস্ত্রী ঘরামী ইত্যাদির চেয়ে উন্নত ধরনের লোক কি?···যাহারাই নিরক্ষর নরনারীর সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছে তাহারাই বুঝিয়াছে যে, ইহাদের নৈতিক চরিত্র তথাকথিত শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর নরনারীর নৈতিক চরিত্রের,—লিখিয়ে-পড়িয়ের চরিত্রের,—চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।···সুতরাং সকল কর্মক্ষেত্রেই নিরক্ষরের অধিকার প্রচার করা আমার নিকট সমাজশাস্ত্রের প্রথম স্বীকার্য।··· লোকগুলি সাঁওতাল হউক, রাজবংশী হউক, গারো হউক, পাহাড়ী হউক, অস্পৃশ্য হউক, চণ্ডাল হউক ডোম হউক, হাড়ি হউক, চাষী হউক, মিস্ত্রী হউক, মজুর হউক—তাহারা নিরক্ষর বলিয়াই—একমাত্র এই কারণে লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর শ্রেণী হইতে কোন অংশে খাটো নয়। বাঙালী জাতির হাড়মাসে, বাঙালী জাতির ধনদৌলতে, বাঙালী জাতির বাড়তিতে, বাঙালী জাতির শক্তিবিকাশে তাহারা সকলেই লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর মতোই কর্মক্ষম এবং গৌরবজনক কৃতিত্বের প্রতিনিধি। এই সকল নিরক্ষরদের বুদ্ধিমত্তা আর কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ হইয়াই আমাদিগকে বাঙালী জাতির আগামী অধ্যায়ের জন্য নতুন ধাপ গড়িয়া তুলিতে হইবে।"[৫] কি পরিমাণ সমাজ-সচেতন ও মুক্তবুদ্ধি হলে মানুষ এ-ধরনের কথা ঘোষণা করতে পারে আজ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ-ভাগেও তা রীতিমত দুঃসাহসিক উক্তি বলে মনে হয়। অধ্যাপক সরকার ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন' বইয়ে অধ্যাপক সরকার নিরক্ষরদের অধিকার সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখে-ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও সেই বক্তব্য জোরালো ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন: "···The illiterate is not a person who deserves to be differentiated from the so-called educated as an intellectual and moral being. And on the strength of this discovery we should be prepared to formulate a doctrine which is well calculated to counteract the superstition that has been propagated in Euro-America and later in Asia as well as of course in India to the effect that literacy must be the basis of political suffrage. Our observations entitle us to the creed that political suffrage should have nothing to do with literacy. The illiterate has a right to political life and privileges simply because of the sheer fact that as a normal human being he has factually demonstrated his

৪ নয়া বাঙ্গালার গোড়া পত্তন, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩১০-৩১৫

৫ ঐ, পৃঃ ৩১৫-৩১৯

intellectual strength and moral or civic sense. It is orientations like these that democracy needs today if it is to function as a living faith."[৬] অর্থাৎ গণ-তন্ত্রকে যদি একটা জীবন্ত প্রত্যয়ে পরিণত করতে হয় তবে তার ভিত্তি-প্রস্তর নিরক্ষরদের অধি-কারের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নব গণ-তন্ত্রের এই হল সমাজ-দর্শন। বিনয় সরকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের মধ্যে বাঙালীর নবজাগরণ ও বাড়তি দেখতে পেয়েছিলেন। ডক্টর আম্বেদকারকে 'একালের হিন্দু ঋষি' বলে বর্ণনা করে তিনি লিখেছিলেন: "হিন্দু-সমাজের সংস্কার ও উদ্ধার সাধন করিবে কে বা কাহারা? সনাতনীরা নয়, ব্রাহ্মণেরা নয়, তথাকথিত উচ্চবর্ণ বা উচ্চ জাতের লোকেরা নয়। হিন্দু-সমাজকে মেরামত করিবে, হিন্দু-সমাজকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ঢালিয়া সাজাইবে অস্পৃশ্য, পদদলিত, শিয়াল-কুকুরের মতন উপেক্ষিত, আর অমানুষিক-ভাবে অবনমিত 'ছোট লোকেরা'। তাহারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই আম্বেদকারকে বিংশ শতাব্দীর নবীন হিন্দু ঋষিরূপে পূজা করিতেছে।...আম্বেদকারের জাত বা দল বা পেটোয়ারাই হিন্দু-সমাজকে দুরস্ত করিয়া নয়া দিগ্বিজয়ের জন্য খাড়া করিয়া তুলিবে।"[৭] অত্যন্ত আনন্দের কথা আমাদের ভারতীয় সংবিধানে ডক্টর আম্বেদকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও নিরক্ষর মানুষদের রাষ্ট্রিক অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে।

৬ Dominion India in World-Perspectives, 1949, pp. 166-168

৭ সমাজ-বিজ্ঞান, ১৯৩৮, পৃ ১০১-১০২

# শাশ্বত মা সারদা মা

## শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

শ্বেতপদ্মের সে শতদল পবিত্র পুজোর
নিত্য নৈবেদ্যে সাজানো যাতে নিবিড় নজর—
অসতে-সতে বিমুগ্ধ চোখে বিস্ময় যোগায়
এলোচুলের ঘোমটা মুখে মাতৃত্ব মায়ায়।

শ্বেতহংসীর অপার ছন্দে সস্নেহ ভঙ্গিমা,
রূপ-অরূপে বোঝা না-বোঝা সারস্বতে সীমা—
অন্তরে ধ্বনি অসীমা প্রজ্ঞা বাণীর বীণার;
মাতৃকা মূর্তি বিছানো পায়ে—চিত্ত করুণায়।

শাস্ত্র অজানা, নীতিকে জানা—মিলে মিশে ছুয়ে
প্রকৃত প্রাণ প্রকাশে যেন অনুভূতি ছুঁয়ে—
সহজ সুর মানবতার সঞ্চিত শোভায়—
প্রচেষ্টা কোনো বাহ্যিকতার দেখেনি কোথায়!

একান্ত এক মাটি-মনের মেঠো-মায়া লাগা
কথাতে কাজে মমতা শুধু অফুরন্ত জাগা—
সরল দীপ্ত সচল জীবে মায়ের আসন
বসিয়ে রেখে মানছে মন স্বভাব শাসন।

কালের শুধু প্রতিমা নয়, সকল কালের—
মায়ের ঘর শূন্য যে নয় সকল চালের।

# পুস্তক সমালোচনা

**শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি-লীলাখণ্ড—স্বামী কৃষ্ণানন্দ। প্রকাশক: ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন', ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৩৭৬+১২, মূল্য: চল্লিশ টাকা।**

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম জীবনীকার তাঁরই অন্যতম গৃহী সন্তান—অক্ষয়কুমার সেন। তাঁর অমর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'। এই পুঁথির প্রশংসা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "তাঁর কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্য শাঁকচুন্নী! (স্বামীজী গুরুভাইদের মজা করে নানা নাম দিতেন। অক্ষয়কুমার সেনের ভাগ্যে জুটেছিল এই নামটি।)···শাঁকচুন্নী বাংলার জনসাধারণের কাছে [শ্রীরামকৃষ্ণের] ভাবী বার্তাবহ।" সরল সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে তিনি বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন-কথাকেও ইতিপূর্বে কেউ কেউ কবিতায় বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এপর্যন্ত কোন বৃহদাকার গ্রন্থ-রচনায় কেউ প্রয়াসী হননি। সেই কাজটি করার জন্য ব্রতী হয়েছেন স্বামী কৃষ্ণানন্দজী। পদার্থ-বিদ্যার যশস্বী অধ্যাপক, ইউরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত লেখক পরিণত বয়সে একটি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেছেন শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথাকে কবিতায় গ্রথিত করতে। কথায় আছে, ফিজিক্স-এর যাত্রার যেখানে সমাপ্তি, মেটাফিজিক্স-এর যাত্রার সূচনা সেখান থেকেই। কথাটি বোধ হয় প্রমাণিত হল আর একবার যখন স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর 'লেখকের নিবেদন'-টি পড়ি। সেখানে তিনি জানিয়েছেন একাধিক বার স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি এই দুরূহ কাজটিতে প্রয়াসী হয়েছেন। একে কি বলব বিজ্ঞান আর ধর্মের মিলনের আকুতি? বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন আমাদের শুনিয়েছেন: বিজ্ঞান এবং ধর্ম একে অন্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে চলতে পারে না, চলা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ, একে যে অপরের পরিপূরক: "Religion without Science is blind, Science without Religion is lame."—বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ, আর ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খঞ্জ। তাই স্বামী কৃষ্ণানন্দজী যখন 'লেখকের নিবেদন'-এ জানান যে অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স-এ উচ্চতর গবেষণা-শুরুর প্রাক্কালে শ্রীমা সম্পর্কে লেখার ব্যাপারে তিনি প্রথম স্বপ্নাদেশটি পান তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

সেই স্বপ্নাদেশের ফলশ্রুতি প্রায় চারশ পৃষ্ঠার 'শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি'। এখানে শ্রীশ্রীমাকে পাঠক দেখতে পাবেন স্নেহসুরধুনী, ভক্তজননী, সঙ্ঘজননী, জ্ঞানদায়িনী, দেবী-স্বরূপিণী ইত্যাদি রূপে। নানা ঘটনা ও শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন বাণীর আলোকে উন্মোচন করা হয়েছে শ্রীমায়ের একটির পর একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁর অনন্যতা, শ্রীরামকৃষ্ণভাব-আন্দোলনে —যে আন্দোলন ক্রমেই সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করে চলেছে—তাঁর অবিসংবাদী বিরাট ভূমিকা।

লেখক বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক। তাই শ্রীমায়ের জীবনের নানা ঘটনা ও তাঁর বাণীর যে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য তা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও শ্রীমায়ের আচরণ ও শিক্ষা যে এত গভীর অর্থবহ তা অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। গ্রন্থমধ্যে নানা বৈজ্ঞানিক উপমার সুপ্রযুক্ত অবতারণা এবিষয়ে পাঠককে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সাহায্য করবে। সময়ের সাথে সাথে বিবর্তনবাদ অনুযায়ী মানুষের চিন্তাশক্তি, মননশীলতার ধারা, রুচি পরিবর্তিত হয়। বর্তমান যুগ যুক্তিনিষ্ঠা, বিশ্লেষণ; বিচার ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পক্ষপাতী। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের অতীন্দ্রিয় জীবন সম্পর্কে পুঁথিকার দেখিয়েছেন কিভাবে অধ্যাত্মজগতের এই দুই বিশাল ব্যক্তিত্ব নিজেদের জীবনকে একটি

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরিণত করেছিলেন, কিভাবে তাঁরা বৈজ্ঞানিক মনস্কতাকে পুষ্টি দিয়েছেন, দেখিয়েছেন সাধনা ( 'Experiment' ) থেকে কিভাবে তাঁরা পৌঁছেছেন পর্যবেক্ষণ ( 'Observation' )-এ, এবং সেখান থেকে উত্তরণ করেছেন সিদ্ধান্তভূমি ( 'Conclusion' )-তে। লেখক আরও বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের জীবন শুধু যুগের চিন্তা, মনন ও রুচিকে সন্তুষ্ট করেছে তাই নয়, প্রমাণ করেছে তা যুগের হয়েও যুগাতীত। এর ফলে গ্রন্থটি শুধু জীবনী হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছে সেই মহাজীবনের ভাষ্যও। সেখানেই গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্ব।

গ্রন্থটির আর যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখের বিশেষ দাবি রাখে, তা হল বর্ণনার প্রসাদময়তা। সহজ সরল ভাষায় লেখা, সুললিত পয়ার ছন্দে গ্রথিত গ্রন্থটিতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের নানা প্রচলিত ঘটনা ও বাণী এমন সুন্দরভাবে, গতিময়ভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে তা সকলের চিত্তহরণ করবে। এই অপূর্ব মাতৃ-আলেখ্য ভক্ত-সাধারণকে উপহার দেওয়ার জন্য পুঁথিকারকে ধন্যবাদ। আমরা 'শ্রীশ্রীসারদা-পুঁথি'র পরবর্তী খণ্ডটির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করব।

গ্রন্থটির মুদ্রণ পরিপাট্য প্রশংসনীয়। কাগজও যথেষ্ট উচ্চমানের। প্রচ্ছদ-শিল্পীর কুশলতাও অনস্বীকার্য। শ্রীমায়ের বিখ্যাত একটি চিত্রকে কমলা রঙের পটভূমির উপর স্থাপন করে তিনি যেমন সামঞ্জস্য-বোধের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি রেখেছেন গাম্ভীর্য ও রুচিশ্রীর সাক্ষরও। করুণা ও শ্রী-রূপিণী সারদা সেখানে ফুটে উঠেছেন জীবন্ত হয়ে।

—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

**যুগমাতা সারদা**—শ্রীমতী মালতী গুহ রায়। প্রকাশক: পুস্তক মহল, ৩০ নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯। পৃ: ১৪৮+৬, মূল্য: ষোল টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটি বাংলা ভাষায় লিখিত শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনীগ্রন্থসংগ্রহে একটি নূতন সংযোজন। সাবলীল ভাষায় গ্রন্থখানিতে শ্রীমার জীবনী এবং উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। ভাষা ও বর্ণনাগুণে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য।

গ্রন্থখানির তথ্য পূর্বতন কয়েকখানি আকরগ্রন্থ এবং শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য এবং একনিষ্ঠ সেবক স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী এবং স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর ব্যক্তিগত সাক্ষ্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে গ্রন্থটির প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমার আবির্ভাব কাল এবং জন্মস্থান জয়রামবাটীর বর্ণনায় 'অন্ধকার যুগ' এবং "ধর্মের নামে, কুসংস্কারের ( মানুষের মধ্যে ) আধিপত্য বিস্তারের" দিকটিই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। লেখিকার বর্ণনায় সারদামণির জন্মলগ্নে—"কোন দলশঙ্খ বা উলুধ্বনি কিছুই সেই সন্তানের জন্ম-ঘোষণা করেনি।"…"এই কন্যার জন্ম সংবাদ বিজ্ঞাপিত হল, কেউই উল্লাস প্রকাশ করেনি।…কন্যা জন্মালো এই নিয়ে আক্ষেপ ধ্বনিই বরং শোনা গিয়েছিল…।" (পৃ: ১) কিন্তু আকর-গ্রন্থগুলির বিবরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন: "অতি শুভক্ষণে সারদামণি দেবী ভূমিষ্ঠ হইলেন। অচিরে মঙ্গল-শঙ্খ-ধ্বনিতে আকৃষ্ট গ্রামবাসী সে শুভ সংবাদ বিদিত হইয়া নবজাত শিশুর অশেষ মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল।" (শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন, ৪র্থ সং, পৃ: ২৫-২৬) ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য রচিত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থের বর্ণনাও (৩য় সং, পৃ: ৭) এইরূপ। (জয়রামবাটী) "অজ্ঞাত অখ্যাত অনুন্নত বর্ধিষ্ণু—একটি গ্রাম," (পৃ: ৫) এবং স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ সম্পর্কে—"স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তাঁর দেবীস্বরূপ সম্বন্ধে কিছু তাঁর শোনা" (পৃ: ১০০)—ইত্যাদি উক্তি খুব অস্পষ্ট। গ্রন্থখানির বহুল বানান ভুল খুবই পীড়াদায়ক।

—ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর



# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

### ত্রাণ

**পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ:** মালদা জেলার কালিয়াচক ৩নং ব্লকের প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে। ২৯ নভেম্বর থেকে এই জেলার গাজল, রাতুয়া ২নং ব্লক এবং বামনগোলা ব্লকের ৮২০০ জন বন্যাদুর্গতকে ধুতি, শাড়ি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদও বিতরণ করা হয়েছে। মালদা আশ্রমের মাধ্যমে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তপন ও রায়গঞ্জের ৩৪১৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত লোককে ধুতি, শাড়ি এবং শিশুদের পোশাক দেওয়া হয়েছে। এই জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও এই বস্ত্র বিতরণের কাজ চলছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাটুই, ভগবানগোলা ও ঝাউবনা ত্রাণশিবির থেকে চিকিৎসা এবং কাপড় বিতরণও করা হয়েছে।

হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ এই গোঘাটের বন্যাপীড়িত মানুষের মধ্যে কামারপুকুর কেন্দ্রের মাধ্যমে ধুতি, শাড়ি এবং শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

**বিহার বন্যাত্রাণ:** পাটনা আশ্রমের মাধ্যমে দানাপুর এবং মানার ব্লকের বন্যাপীড়িত মানুষকে খিচুড়ি বিতরণ করা ছাড়াও ১৪টি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে চাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস এবং ধুতি, শাড়ি গামছা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।

**বাংলাদেশ বন্যাত্রাণ:** দিনাজপুর আশ্রমের মাধ্যমে ২৮টি ত্রাণশিবির থেকে দিনাজপুরের ২৪টি শহর এবং ২২টি গ্রামের প্রায় ২৯,০০০ মানুষের মধ্যে চাল, কলাই, চিঁড়া, গুড়, আটা, ও পাউরুটি, কাপড়-চোপড়, বাড়ি তৈরির জন্য বাঁশ দেওয়া হয়েছে। ৮১৩১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। চিকিৎসাকার্য এখনও চলছে।

বালিয়াটি আশ্রমের সহযোগিতায় ঢাকা আশ্রম মানিকগঞ্জ জেলার ৬৯৬৯ জন বন্যাপীড়িত লোককে চাল, কলাই, পাউরুটি, শাড়ি এবং পুরনো পোশাক বিতরণ করেছে।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রের মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুরের বন্যাপীড়িতদের মধ্যে চাল, কলাই, শাড়ি ও পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে।

**গুজরাট খরাত্রাণ:** অব্যাহত আছে।

**শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ:** মাদ্রাজের ত্যাগরাজ নগর আশ্রম মণ্ডপম্ শিবিরের শরণার্থিদের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। রামেশ্বরম্ শিবিরের শরণার্থিরা চলে যাওয়ায় সেখানকার ত্রাণকার্য বন্ধ করা হয়েছে।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ২ নভেম্বর, সোমবার শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের এবং ৪ নভেম্বর, বুধবার শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বিকাশানন্দ ও স্বামী কমলেশানন্দ।

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** যথারীতি চলছে।

## গ্রন্থপ্রকাশ

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে একটি গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ৩১ অক্টোবর ১৯৮৭ বিকেল সাড়ে চারটায় শ্রোতা-পরিপূর্ণ 'সারদানন্দ হল'-এ গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন মঠ-মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই মূল্যবান গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। মঠ-মিশনের প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী-বৃন্দের রচনা ছাড়া গ্রন্থটিতে রয়েছে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট গবেষকদের প্রবন্ধ। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন : স্বামী প্রমেয়ানন্দ, অধ্যাপক শ্রীনলিনী-রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী চৈতন্যানন্দ।

# বিবিধ সংবাদ

## উদ্বোধন

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের নব পটে অর্ঘ্য প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। সেই সঙ্গে 'স্বামী ওঁকারানন্দ সভাগৃহের' উদ্বোধনও হয়। এই দিনে অনুষ্ঠিত এক ভক্ত-সম্মেলনে আশ্রমের ঐতিহ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী গহনানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ এবং স্বামী প্রমেয়ানন্দ। মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র থেকে শতাধিক সাধু এবং অসংখ্য ভক্ত সেদিন আশ্রমে এসেছিলেন। মধ্যাহ্নে সাধু-ভাণ্ডারা এবং ভক্তসেবার ব্যবস্থা হয়। সারাদিন ধরেই সাধু-ভক্তবৃন্দ ভজন-কীর্তন পরিবেশন করেন।

## পরলোকে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন শিক্ষা সচিব **ডঃ ডি. এম. সেন** গত ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তাঁর শান্তিনিকেতনের বাসভবনে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাশি বছর। তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র বর্তমান। ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখনই ডঃ সেন শিক্ষা-সচিব হয়ে দিল্লী থেকে আসেন। তাঁরই কর্ম-দক্ষতার গুণে ঐসময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে। অবশ্য ডাঃ রায়ও তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।

শিক্ষাসচিব থাকা কালে ডঃ ডি. এম. সেন রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রচেষ্টার সাথে প্রথম পরিচিত হন। রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি মিশনের সাধুদের বলেন : "অর্থাভাব এতদিন আপনাদের বড় অন্তরায় ছিল, সেই অন্তরায় আর থাকবে না।" সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর মিশনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে সে আশ্বাসও তিনি দেন। তাঁর কাছ থেকে এই আশ্বাসবাক্য পাবার পর থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের কর্মের পরিধি বাড়াতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে ডঃ সেনের অবদান অসামান্য। ডঃ সেন প্রথম জীবন রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় শান্তিনিকেতনে কাটান। কয়েক বছর শান্তিনিকেতনের স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন। ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের পরামর্শদাতা স্যর জন সারজেন্ট-এর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভারত সরকারে যোগ দিতে অনুমতি দেন। দিল্লীতে থাকাকালে বিখ্যাত সারজেন্ট কমিশন-এর সচিব হিসেবে ডঃ সেন কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব পদে থাকার সময় সরকার তাঁকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুতে মিশন একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে এবং দেশ একজন উৎসাহী একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীকে হারিয়েছে। তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশে সমবেদনা জানাই।

